উদ্বোধন—সূচী পত্র।

(২৫শ বর্ষ, ১৩২৯ মাঘ—১৩৩০ পৌষ)

উদ্বোধন।

(শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ)

ওরে ও নির্ভীক-ধীমান!

কেন ভীত বিচলিত কেন মুগ্ধ কেন ম্রিয়মান?

প্রেমের হিল্লোল ভরা সুবিশাল ধরা আঙিনায়,—

তোমার বন্ধন কোথা? মায়া-মুগ্ধ কে করে তোমায়?

নিত্য চির-মুক্ত তুই! অধীনতা কার ধার তুমি?

জয়-ধ্বজা উড়ে তোর পৎ পৎ নীলাকাশ চুমি!

ঐ শোন্ দূরে কার বাজে মধু-মুরলীর তান

বলে "আয় আয় আয় ছুটে—ওরে মোর স্নেহের সন্তান!"

তবে কেন হলি রে চঞ্চল?

কেন নত মুখ তোর? আঁখিপাতে কেন ভাসে জল?

সংসার তোমার চোকে ইন্দ্রজাল করিবে জাহির?

'তুমি যে অমৃত কণা'—ভুলে' কেন যাও তাহা বীর!

যার ইন্দ্রজাল বলে পলকেতে শত শত বার,

ভেঙে' চুরে' যায় পুনঃ গড়ে উঠে অদ্ভুত সংসার!

তুমি যে তাহারি রূপ, তাঁরি অংশ, তাহারি নন্দন!

তবে কেন বিভীষিকা তোর,—তবে কেন রে ক্রন্দন?

ওরে চির-নবীন-কিশোর!

তুই যে অজেয় চির—মহিমা যে সীমাহীন তোর্!

তবে কেন বলহীন? স্তব্ধ কেন হে বীর কুমার?

গগন ধ্বনিত করি'—গলাখুলি ডাক একবার—
তোমার হুঙ্কার-ডাকে—ত্রিভুবন রবে না'ক থির্
দুরন্তের সিংহাসন চকিতে যে টলে' যাবে বীর!
তোরি তরে চাঁদ-তারা নিশি নিশি বসে রয় জাগি'
বিজয়-মন্দার-মালা দেব-বালা গাঁথে তোর লাগি।

(তবে) আর কেন সাজ মিছে সাজ!
মায়া-নিদ্ মুছে ফেলা ?—এত তোর্ পলকের কাজ!
আর কেন রও তবে অবসাদে ঘুমে অচেতন ?
(ঐ দেখ) দিনমণি উড়ায়েছে আকাশেতে আলোক-কেতন।
আঁধারের বুকে চির জেগে'রয় আলোক-মিনার—
তাহার সন্ধান ওরে তুই বিনা কে করিবে আর ?
শকতির ধারা তব শিরো'পরে' ঝরে' অবিরল
ছিঁড়ে' ফেল একটানে—ছিঁড়ে'ফেল মায়ার শৃঙ্খল।

উঠ! উঠ! টুটেছে আঁধার!
বিজলী অঞ্জন ঐ—আঁখিযুগে ভাতিছে তোমার!
প্রভাতীর সুরে পিক তরুশিরে আগমনী গায়
ঐ শোন দ্বার-দেশে কেবা ডাকে "আয়, আয়, আয়।"
ঐ দেখ রথচূড়া! ঐ দূরে—কনক-দেউল!
চল ছুটে' হে ধীমান! পথ যেন হয় নাক ভুল।
আঁধার টুটেছে, এবে শত রবি দেখাইবে পথ
আগুয়ান হও বীর! অচিরে পুরিবে মনোরথ।

কথা-প্রসঙ্গে।

শ্রীভগবানের কৃপায় ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, আজ নূতন মাঘে উদ্বোধন তাহার পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। নবীন বর্ষে সে তাহার পাঠক-পাঠিকার নিকট শুভেচ্ছা ও ভাবের আদন প্রদান প্রার্থী।

* * *

নিজ কলেবর দিয়া সে আজ চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ ধরিয়া ধর্ম্ম ও বিদ্যার দ্বারা বিশ্বরূপ অন্তর্যামীর গণবিগ্রহের সেবা করিয়া আসিয়াছে। নবীন বর্ষে সে নবীন অল্প-সত্যকে গ্রহণ করিবে না, সে প্রাচীন অপরিবর্ত্তনীয় ভূমাকেই জন সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবে—মাত্র নবীন ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে।

* * *

আত্মা ভূমা। সেই আত্মা অণিমা, তাঁহাতেই সমস্ত, সেই আত্মা তুমি। তুমি পাপশূণ্য, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসা-হীন, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প। মেষের সঙ্গদোষে 'সিংহশিশু' নিজের স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র, অপদার্থ বলিয়া ভাবিতেছে। নিজ স্বরূপ স্মরণ করাইবার জন্যই উদ্বোধন নিজবক্ষে সেই অপৌরুষেয় বাণী অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত'।

* * *

পরমহংসত্বই তোমার স্বরূপ। কর্ম্মতরঙ্গের মধ্যেও স্থির ভাবে ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মাচ্ছাদিনী প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ কর। জ্ঞানসূর্য্যের করস্পর্শে ভক্তি কমল স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠুক। সে আসনোপরি জগদ্গুরু, জগন্নাথ, জগদাত্মার শিবজ্যোতিঃতে হৃদয়কন্দর উজ্জ্বল হউক।

* * *

কোনও কোনও-পণ্ডিত প্রশ্ন করিয়া থাকেন, দার্শনিক গুরুগম্ভীর ভাষায় বেদান্ত ধর্ম্ম উদ্বোধন প্রচার করে না কেন? তদুত্তরে আমরা এই

পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের মতামত পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিব।"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট্ ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখার বেলা একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ব-বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোনও তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ। (ভাববার কথা—বাঙ্গলা ভাষা)

* *

বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য বৈদান্তিক পরিভাষাযুক্ত শব্দ-কৌশল বুঝা অধিকাংশ ধর্ম্মালোচনাকারীদের সামর্থ্য আছে কি না জানি না। যাঁহারা সমর্থ তাঁহার অতি অল্প এবং বহুবর্ষ ধরিয়া নিশ্চয়ই তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এই অর্দ্ধ-সংস্কৃত বঙ্গভাষার তর্জ্জমা আদৌ

'উপাদেয় নহে—ইহার প্রমাণও আমরা পাইয়াছি, শাস্ত্রাদির দুই একটী তর্জ্জমা দেখিয়া। কিন্তু শাস্ত্রান্তর্গত মহান সত্য জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত না করিতে পারিলে ভারতবাসীর কল্যাণ নাই—ইহা বর্ত্তমানে এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। কাজে কাজেই সেই সকল সত্য সহজ সরল ভাষার মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিবার উপায় স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এবং সেই সকল সত্য যে সকল মহাপুরুষেরা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-চিত্র লোক সমক্ষে সাধারণ ভাষায় গদ্যে-পদ্যে ধারণ করা চাই। শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ তাঁহার শ্রীরামানুজ চরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব সত্য। "দুরূহ ও দুরধিগম্য উপদেশরাজি কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা মহাপুরুষগণের জীবন পাঠে অধিক লাভ আছে। তাহার কারণ এই যে, নিরবয়ব সুতরাং দুর্গ্রাহ্য উপদেশগুলি সাধু জীবনে সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাওয়ায় সাতিশয় সহজ-গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং সাধারণ মানবমণ্ডলীর পক্ষে সুখানুকরণীয় হওয়ায় তাঁহারা অজ্ঞাতসারে তত্তাবতের অনুসরণ করিয়া সাধুতার পথে অগ্রসর হয়েন, এবং জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দেবত্ব আশ্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।" এই হেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছন্দাকারে উদ্বোধনে সাধুজীবনীর অবতারণা।

*　　*　　*

নিরবয়ব ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ সাধারণের নিকট দুরূহ এবং দুরধিগম্য কিন্তু সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতবাদ সাধুজীবনে মূর্ত্ত হইয়া সাধারণের জ্ঞান বিষয়ীভূত হয়, সেইরূপ আদর্শ সমাজ-নীতিও নিরবয়ব ভাবে ব্যক্তিরা ধারণা করিতে পারে না, যতক্ষণ না তাহাদের সমক্ষে সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার পর্য্যুসিত অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান না যায় এবং তাহার মধ্যে আদর্শ মানবচিত্র ধারণ করিয়া উহার সুফল সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত না করান যায়। এই হেতু ইহাতে উপন্যাসেরও প্রয়োজন আছে'।

*　　*　　*

উদ্বোধন কেবল দার্শনিক ভাষায় দার্শনিক বা ঐতিহাসিক মত ব্যাখ্যা

করিবে না। ইহা জনসাধারণের নিকট সেই অতি প্রাচীন মহান্ সত্যকেই সাধারণের ভাষায় উপস্থাপিত করিয়া সেই মহাসত্যের উপর ধর্ম্ম, সমাজ এবং জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করিবার আমরণ চেষ্টাই করিবে। কুন্দেন্দু-ধবলতুষারা, বীণাবর-দান-রত-করা ভগবতী সরস্বতী আমাদের সহায় হউন।

ওঁ শান্তিঃ!

একবার।

তোমার ও বিশ্ব প্রেম, অপূর্ব্ব
প্রীতি ক্ষেম।
থাকুক তোমাতে নাথ, চাহি না
করুণা পাত।
চাহি শুধু একবার, নাহি চাহি
অনিবার,
হে কঠোর! হে নিঠুর! ও গো—ও
অজানা ঠাকুর!—
তোমারেই একবার॥

(শ্রীজ্যোতিঃ)

শিব ।*

(ভগ্নি নিবেদিতা)

প্রত্যেক হিন্দু বালককেই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ চিরদিন এই ভারতবর্ষে বাস করেন নাই। এদেশের অধিবাসীরা আর্য্য-নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে, তাঁহারা উত্তর প্রদেশ হইতে হিমালয়ের গিরিপথ অতিক্রম করিয়া এই উপদ্বীপে আসিয়াছিলেন। বাস্তবিক এখনও হিন্দুকুশ পর্ব্বতে 'লাল কাফির' নামে পাণ্ডুরবর্ণ কতক-গুলি সম্প্রদায় বাস করে। সম্ভবতঃ হিন্দুগণ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় তাহাদের আদিবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হন। (?)

যাহা হউক, হিন্দুগণের ইতিবৃত্তি ও বর্ত্তমান ধর্ম্ম তাঁহাদের এই পর্ব্বত অতিক্রমের পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (?) পুরাকালে তাঁহাদের কোন বিগ্রহ বা দেবমন্দির ছিল না। কোন উন্মুক্ত বা পরিষ্কৃত স্থানে তাঁহারা সমবেত হইয়া অগ্নিযজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। বৃষবাহিত কাষ্ঠে সেই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত। ঋত্বিকগণ পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন এবং কিরূপে জ্যামিতিক আকারে সুসজ্জিত ভাবে সেই কাষ্ঠ স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অর্ঘপ্রদান করিতে হয় তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। শস্যোৎপাদন, বস্ত্রবয়ন, প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তির কার্য্যের ন্যায় ইহাও ঋত্বিকগণের কার্য্য ছিল। তাঁহারা ইহার জন্য অর্থ পাইতেন ও তদ্দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন।

দূর অতীতে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুদের চিরন্তন বিশ্বাস যে, ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সমগ্র জীবন তাহার জন্য উৎসর্গ করিতে হয়। তাঁহারা বলেন, যে কোন সদ্ব্যক্তি তাঁহার সংসার কার্য্য চালাইতে পারেন কিন্তু কেহ সঙ্গীতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে

---

* Sister Niveditaর Siva and Budha নামক পুস্তক হইতে শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ, বি-এ কর্ত্তৃক অনূদিত।

তাঁহার সমস্ত যত্ন ও মনোযোগ সেই সঙ্গীতে নিয়োগ করিতে হয় এবং প্রতিভাসম্পন্ন হইতে হইলে অধ্যয়নে রত হইতে হয়। সত্যলাভ কি ইহা অপেক্ষা সহজ হইতে পারে? অতএব ধর্ম্ম বা ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহাদের যে অতি উচ্চ ধারণা ছিল তাহা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহারা যাইতেন কোথায়, মনে করেন? সঙ্গীতসাধক বীণা, মৃদঙ্গ, বংশী বা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের সম্মুখে আসন গ্রহণ করেন, আর বিদ্যার্থী কোন বিদ্যালয়ে গমন করেন। কিন্তু ধর্ম্মলাভের জন্য হিন্দুরা যাইতেন অরণ্যে। সেখানে তাঁহাদিগকে কোন গুহা বা বৃক্ষতলে বাস, সহজলব্ধ বন্য ফলমূল আহার ও শুভ্র ভূর্জ্জবল্কল পরিধান করিতে হইত। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিলে ইহা অতি অদ্ভুত চিত্র বলিয়া মনে হয় না কি? ইহার মূলে এই ধারণা বদ্ধ ছিল যে মনঃসংযম বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ধর্ম্মজীবনের প্রধান অঙ্গ। গ্রাসাচ্ছাদন ও সংসারের চিন্তাশূন্য হইয়া বিহগকুল ও বিটপীশ্রেণীর মধ্যে গভীর নীরবতা নিশ্চয়ই বিশেষ সাহায্য করিত। আরও দেখুন! লোকালয়ের বহুদূরে কাঁচি বা চিরুণীর অভাবে তাঁহাদের কেশের অবস্থা কি হইত? উহা অবিন্যস্ত ও ঘনভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত। মস্তোকোপরি এইরূপ অযত্নবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশকলাপ এই সকল আরণ্যকগণের একটী বিশেষ ধর্ম্মলক্ষণ ছিল। তাঁহাদিগকে প্রত্যহ স্নান ও কেশধৌত করিতে হইত, কিন্তু প্রায়ই ধ্যানে রত থাকায় তাঁহারা কেশ সুদৃশ্য করিবার সময় পাইতেন না। ভারতের কোন কোন দেশের রাজপথে ত্রিশূল ও কমণ্ডলুধারী এইরূপ সাধু আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু অরণ্যে বা পবিত্র নদীতীরেই ইঁহারা প্রধানতঃ বাস করিতেন। সে সকল স্থলে এখনও বল্কল পরিহিত এইরূপ মহাপুরুষ দৃষ্ট হন। তাঁহারা সহরের ভিতর দিয়া যাইবার সময় বহুশতাব্দীর ধর্ম্মচিহ্ন গৈরিক বসন পরিধান করিতেন।

বল্কলের আর একটী বিশেষ উপকারিতা ছিল। সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের চিন্তাসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উহা কাগজরূপে ব্যবহার করিতেন। এই জন্যই হিন্দুদিগের বহুপুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থরাজি ভূর্জ্জপত্রে

লিখিত এবং ইহাতে লিখিত না হইলে কোন স্তোত্র বা পুস্তকই পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত না।

আশাকরি ইহা হইতে বৈদিকযুগের সাধুগণের বিষয় কিছু ধারণা হইবে। এখন সেই বিপুল অগ্নিহোত্রের বিষয় কল্পনা করুন;—চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ব্যক্তি পূজারত, ঋত্বিক পবিত্র বেদমন্ত্রোচ্চারণের সহিত নির্দ্ধারিত ঘৃততণ্ডুলাদির অর্ঘ্য ও অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, দু'একজন বা আরণ্যক ঋষি এই যজ্ঞে সাধারণের সহিত যোগ দিয়াছেন। বোধ হয় এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তিও কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন,—অগ্নিনির্ব্বাপিত, কেবল প্রশস্ত শুভ্র ভস্মস্তূপমাত্র অবশিষ্ট, যাজ্ঞিকেরা সকলেই গৃহে প্রত্যাগত। স্থানটী এখন পরিত্যক্ত ও নির্জ্জন—হয়ত বা কোন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই স্তূপের নিকট অগ্রসর হইয়া একমুষ্টি ভস্মগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভূতিমণ্ডিত করিতেছেন। তাঁহার নিকট ইহাই যেন ঈশ্বরারাধনা ও সংসার ত্যাগরূপ পবিত্র ভূষণ। তৎপরে তিনি মনে মনে অধিকতর পবিত্রতা ও শান্তি অনুভব করিয়া তাঁহার সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া গেলেন। এই জন্যই আমরা এক সম্প্রদায় সন্ন্যাসীকে ভস্মমণ্ডিত ও গৈরিক বা বল্কল পরিহিত দেখিতে পাই।

দূর হইতে এইরূপ কোন যোগীকে দেখিলে সর্ব্বপ্রথমে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাঁহার শুভ্রতা। নিজ দেহে এইরূপ ভস্মমর্দ্দিত করিলে শুভ্রদেহ বলিতে কি বুঝায় তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে পূর্ণ পবিত্রতা এই শুভ্রতারই চিরসহর। তাঁহারা বিচরণ করিতেন হিমালয়ে, আর সতত তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত তাহার তুষার মণ্ডিত শিখরনিচয়। এই শুভ্রশিখরগুলি তাঁহাদিগকে কি স্মরণ করাইত তাহা ভাবিয়া দেখুন!

শিশু কেমন প্রত্যেক বস্তুকে মনুষ্যগুণোপেত বা মানুষ বলিয়া মনে করে তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সে টেবিল, চেয়ারকে ভাল বা দুষ্ট বলে, ফুললতাকে করতালি দিতে ও পশুপক্ষীকে ভ্রমণ করিতে দেখে। প্রত্যেক বস্তুকে এইরূপে মনুষ্যভাবে দেখিবার আসক্তিই স্বাভাবিক ব্যক্ত্যুৎপ্রেক্ষণ প্রকৃতি অর্থাৎ ইহা হইতেই গুণাদির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ কল্পনা

করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। আর যে জাতি সুন্দর জিনিষ ভালবাসে তাহার মধ্যে এই প্রকৃতি অতি প্রবল। প্রাচীন গ্রীকগণের সমুদ্র চিত্র ছিল ত্রিশূলধারী এক বৃদ্ধ রাজা নেপচুনের প্রতিমূর্ত্তি; এইরূপ এথেন্সবাসিগণেরও ছিল এথেনী, শস্যদেবী ডিমিটার (Demeter) ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি। প্রত্যেক দেবতার প্রতিকৃতিতে ত্রিশূল, ঢাল, শিরস্ত্রাণ, মশাল প্রভৃতি একটা নিদর্শন (symbol) থাকিত এবং ঐ সকল মূর্ত্তি ঐ ভাবে অঙ্কিত করার কারণস্বরূপ তত্রস্থ অধিবাসিগণ দীর্ঘকাহিনী বিবৃত করিতেন।

ভারতেও ঠিক উহাই ঘটিয়াছিল। ভারতবাসিগণ অনুভব করিয়াছিলেন যে, পর্ব্বত, নদী, তারকা প্রভৃতির বহিরাবরণের মধ্যে এক আত্মা বা চিচ্ছক্তি বিরাজিত এবং সেই জন্যই তাঁহারা উহাদিগকে দেবতাজ্ঞান করিতেন। সেই জন্যই গঙ্গাদেবী তাঁহাদের মাতা, সূর্য্যদেব তাঁহাদের দয়াময় বিষ্ণু, আর তরুলতা পর্ব্বতাদিও স্বতন্ত্র অন্তরাত্মা বিশিষ্ট।

সেই তুষারধবল পর্ব্বতমালা সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মনে হইত? এই পর্ব্বতশ্রেণী যেন তাঁহাদিগকে অগ্নি ও অগ্নিপূজার কথা বলিয়া দিত। যজ্ঞাগ্নির শিখাগুলি ঠিক হিমালয়ের মত শুভ্র, আর তুষারসদৃশ ভস্মস্তূপ নিম্নে ফেলিয়া শৃঙ্গগুলির ন্যায় তাহারা সদাই উদ্ধগামী! কালে ঐ সকল শুভ্রপর্ব্বতরাজি তাঁহাদের প্রধান প্রেমাস্পদ হইয়া দাঁড়াইল। একবার অবলোকন করুন! মৌনী ও জগতের বহু উদ্ধে উত্থিত, শৈত্য ও দূরত্বে অতি ভীষণ অথচ অনির্ব্বচনীয় শোভাশালী ঐ সকল পর্ব্বতমালা দেখিতে কিরূপ?—যেন ভস্মাচ্ছাদিত, ধ্যাননিমগ্ন, মৌনী ও নিঃসঙ্গ মহাযোগী—যেন স্বয়ং মহেশ্বর, শিব, মহাদেব!

এই ধারণায় উপনীত হইয়া হিন্দুগণ তখন আনুসঙ্গিক নিদর্শন সমূহের সমাধানে মনোনিবেশ করিলেন। ইহাতে কখন অগ্নিশিখা, কখন গিরিশৃঙ্গ, কখন বা যোগীর ভাব প্রাধান্যলাভ করিল—এইরূপে মহাদেব শিবের চিত্র পূর্ণত্ব লাভ করিল। কাষ্ঠসমূহ বৃষপৃষ্ঠে যজ্ঞস্থলে নীত হয় তাই শিবেরও একটা বৃষ আছে—সেটা তাঁহার বাহন। পর্ব্বতমালার উপরে চন্দ্রকিরণ দেয় সেইজন্য মহাদেবও চন্দ্রমৌলি। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে

ভিক্ষাকারী প্রকৃত তপস্বীর ন্যায় তিনি অতি সামান্য দানে পরিতুষ্ট। নির্ম্মল জল, সামান্য তণ্ডুল ও দুই তিনটী বিল্বপত্র মাত্র, ইহাই তাঁহার দৈনিক পূজার নৈবেদ্য। কিন্তু ইহা অতি-পূজ্য অতিথির সেবায় অর্পিত তণ্ডুলোদকের ন্যায় বিশেষ পবিত্র হওয়া উচিত। Shamrock অর্থাৎ আয়র্লণ্ডের জাতীয় চিহ্নসূচক ত্রিপত্রের ন্যায়, ত্রিমূর্ত্তি (Trinity) সূচক বলিয়াই বোধ হয় এই বিল্বপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই মহাদেব কত অল্পে প্রীত হন, সে বিষয়ে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। একদা অতি নীচজাতীয় কোন দীন শিকারী সমস্ত দিন মৃগয়ার পর একটীও জীব শিকারে সমর্থ হইল না। নিশা সমাগমে, সে তখন গৃহ হইতে বহুদূরে সেই অরণ্যে একা। অনতিদূরে একটি বিল্ববৃক্ষ, তাহার শাখা প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল। হিংস্রপশুকবল হইতে নিরাপদে রজনীযাপনের জন্য ব্যাধ হৃষ্টমনে সেই বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিল। যখন সে ঐ বৃক্ষের শাখায় সঙ্কুচিতভাবে শায়িত তখন অনশন-ক্লিষ্ট স্ত্রীপুত্রগণের চিন্তা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং তাহাদের অভাবজনিত দুঃখে তাহার গণ্ড বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হইল। উহা বিল্বপত্রের উপর পতিত হওয়ায় অশ্রুভরে পত্রগুলি স্খলিত হইল। ঐ পবিত্র বৃক্ষের পাদদেশে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিলেন। অশ্রুবিন্দুগুলি বিল্বপত্রসহ তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। (১)

সেই রাত্রে একটী কৃষ্ণসর্প বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া সেই নিষাদকে দংশন করিল। তৎপরে শিব-দূতগণ তাহাকে কৈলাশে লইয়া গিয়া মহাদেবের চরণপ্রান্তে স্থাপিত করিল। তখন সেই দিব্যালোকে এক মহাকলরব উঠিল—'এই অসভ্য এখানে কেন? একি অশুদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে নাই, একি বৈধ কোন যজ্ঞ করিয়াছে বা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছে?' তখন মহাদেব বিস্ময়ে তাহাদের প্রতি মধুর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "এই ব্যক্তি কি বিল্বপত্র ও অশ্রুজল দিয়া আমার পূজা করে নাই?" এইরূপে সামান্য চোখের জল দিয়াই তাঁহার কৃপা লাভ করা যায়।

যজ্ঞাগ্নিশিখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে একটী জিনিষ স্পষ্টরূপে

দৃষ্ট হয়—ইঁহার কণ্ঠনীল। আলোক প্রজ্জ্বলিত করিবার সময়ও আমরা এই নীলাভা দেখিতে পাই। সুতরাং শিবকে নীলকণ্ঠ করিবার জন্য নিম্নলিখিত কাহিনীটীর উদ্ভব।

একসময়ে দেবতাগণের ঐশ্বর্য্য ও গৌরব লোপ পাইতে থাকে (১)। [যখন ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি পুরাতন দেবগণ অনাদৃত হন ও ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বররূপ ত্রিমূর্ত্তি সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেন সেই সময়েই এই আখ্যানটী প্রথম বর্ণিত হয়।] দেবতাগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষ্ণুর নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। তিনি যেন একটু অবজ্ঞাভরেই তাঁহাদিগকে সমুদ্রমন্থন করিতে বলিলেন। তখন সেই হতভাগ্য দেবগণ আগ্রহের সহিত তাঁহার আদেশ পালনের জন্য ধাবিত হইলেন।

মন্থনকার্য্য চলিতে লাগিল। বহু মনোরম ও অদ্ভুত পদার্থ উত্থিত হইল, কোথাও এক বিশালাকার হস্তী, কোথাও এক সুন্দর অশ্ব, কোথাও বা ললামভূতা নারী, দেবতাগণ সকলেই মন্থনোদ্ভূত বস্তুগুলি গ্রহনের জন্য মহাব্যগ্র। হঠাৎ এক কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উত্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে উৎসারিত হইয়া অবশেষে উহা সমগ্র সমুদ্র আবৃত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। দেবগণ ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন "এ আবার কি ?" উহা হলাহল—উহা তাঁহাদের, সমস্ত পৃথিবীর, নিখিল বিশ্বের মৃত্যুস্বরূপ! ক্রমে উহা তাঁহাদের একেবারে পাদদেশে উপনীত হইল, তখন তাঁহারা ভয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহারা তমসায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের পলায়নেরও স্থান নাই, কারণ সেই ভীষণ কালকূট প্রায় সমগ্র বিশ্বগ্রাসী হইয়া উঠিল। এই মারাত্মক ভীতির সময় তাঁহারা সকলে শিবের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত মন্থনলব্ধ বস্তুগুলির কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। হয়ত এখন তিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ শুভ্রকায় শঙ্কর তাঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেবগণের সঙ্কট ও ভীতিদর্শনে ঈষদ্ধাস্য করিলেন এবং তরঙ্গের মধ্যে হস্তস্থাপন করিয়া সেই তীব্র হলাহলকে তাঁহার অঞ্জলীর মধ্যে আসিতে আদেশ করিলেন। তারপর তিনি উহা পান করিলেন—বিশ্ব রক্ষার্থ তিনি যেন স্বীয় মৃত্যুর জন্যও

প্রস্তুত। কিন্তু যে কালকূট সমগ্র সৃষ্টিধ্বংস করিবার পক্ষে যথেষ্ট—তাহা কেবল তাঁহার কণ্ঠ রঞ্জিত করিল মাত্র। তিনি কণ্ঠে চিরদিন সেই নীল চিহ্ন ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া রহিলেন।

মহাদেব সম্বন্ধে যে সকল সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে বরাহ শিকারের আখ্যানটী তন্মধ্যে অন্যতম। কুরুক্ষেত্র সমরের অন্যতম প্রধান রথী অর্জ্জুন শিবপূজা ও তাঁহার আশীষলাভের জন্য তিন মাস কাল পর্ব্বতে অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি যখন শিবলিঙ্গের সম্মুখে আরাধনা করিতেছিলেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেছিলেন তখন সহসা শৃঙ্গ ও সহর্ষমৃগয়াধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। পরমুহূর্ত্তেই অশ্বারোহণে সানুচর তুষাররাজ ও তন্মহিষী নয়নগোচর হইলেন এবং এক রুদ্ধশ্বাস অসহায় বরাহের অনুসরণ করিয়া প্রচণ্ডবেগে সেই সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে উপনীত হইলেন। বরাহটী আশ্রয়ের জন্য অর্জ্জুনের নিকট ছুটিয়া আসিল। পূজা হইতে উত্থিত হইয়া তিনি বরাহকে পলায়নের পথ নির্দ্দেশ করিলেন (?) এবং অদূরবর্ত্তী নৃপতির যুদ্ধাহ্বানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তৎক্ষণাৎ সকলে তাঁহার পুরোভাগে স্তব্ধগতি হইলেন। রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "ও শিকার আমার, তুমি কোন সাহসে উহাকে স্পর্শ কর?"—সেই স্বর গিরিমধ্যে শীতবাত্যার ন্যায় ধ্বনিত হইল। মহাবীর পার্থ পূজার পূর্ব্বে ধনুর্ব্বাণ পার্শ্বে রক্ষা করিয়াছিলেন, নৃপতির এই সম্বোধনে রোষদীপ্ত হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন—যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে মহাবীর অর্জ্জুন ভীত হইলেন—তাঁহার মনে হইল তিনি যেন কোন ভীষণ ছায়া মূর্ত্তিকে আক্রমণ করিয়াছেন, কারণ একে একে তাঁহার তীক্ষ্ণশায়ক সকল নৃপতির দেহে অন্তর্হিত হইল কিন্তু তথাপি তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

অর্জ্জুন তখন গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আসুন, আমরা মল্লযুদ্ধ করি" এবং ধনু নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর উপর পতিত হইলেন। তখন তিনি হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শীতল স্পর্শ অনুভব করিলেন এবং তাহাতে অভিভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি যখন সংগ্রামে বিরত হইলেন, তখন ভূপতি বলিলেন "অগ্রসর হও।" কিন্তু পার্থ যেন সম্পূর্ণ

মত্ত। শিবলিঙ্গকে অর্পণ করিবার জন্য তিনি এক পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন "অগ্রে আমি আমার পূজা সমাপ্ত করিব।" পরমুহূর্তে অর্জ্জুনের নয়ন উন্মিলিত হইল, তিনি দেখিলেন সম্মুখে পর্ব্বতরাজ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—আর তন্নিবেদিত পুষ্পগুলি তাঁহার গলদেশে শোভা পাইতেছে! "মহাদেব! মহাদেব!" বলিয়া উপাসক তখন মস্তকদ্বারা ভগবানের পাদস্পর্শ করিবার জন্য ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মৃগয়াকারী সানুচর তুষাররাজ অন্তর্হিত হইয়াছেন। (৬)

শিব সম্বন্ধে এইরূপ কতিপয় কাহিনী আছে। ভক্তগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁহাদিগের নিকট ত্রিভুবনে মহাদেবের ন্যায় প্রতাপান্বিত, পবিত্র ও দয়াশীল আর কেহই নাই এবং যাহাতে গভীর প্রেমানুরাগের সহিত তাঁহার উল্লেখ নাই, হিন্দুগণের এরূপ পুস্তক বা কবিতা সংখ্যায় অতি অল্প।

উত্তরভারতের সর্ব্বত্র সহর ও নগরের পথি-পার্শ্বে, নদী তীরে কিংবা সুসজ্জিত উদ্যানে, যদি কোন হিন্দুর গৃহের নিকট কোন বৃক্ষ থাকে তবে প্রায়ই তথায় এক বা ততোধিক শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাহাদের আকৃতি বিভিন্ন, কোন কোনটীতে মনুষ্যের মুখাবয়ব শুভ্রবর্ণে ন্যূনাধিক স্থূলভাবে অঙ্কিত বা খোদিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন-কালে ভক্তিভরে সেই শিবলিঙ্গের মস্তকে সামান্য তণ্ডুল ও জল দান করে। তৎপরে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম ও উপাসনা করিয়া চলিয়া যায়। কেমন সরল পূজা! সময়ে সময়ে হয়ত কোন বিশেষ প্রেমিকভক্ত এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতল ও স্নিগ্ধ রক্ত বা শ্বেত চন্দন দ্বারা দেবতার মস্তক বিলেপিত করেন।

যাহা হউক, মোটের উপর উহা তাঁহার অতি স্থূল উপাসনা। ইহা সেই পরমদেবতার পূজা নহে। তাঁহার আরও সূক্ষ্ম বিগ্রহ হইতেছেন, সেই সকল তাপস ও ভিক্ষু, যাহারা চলমান জনতার মধ্যে দৃষ্ট হন—কেহ ভস্মবিলেপিত ও জটাধারী, কেহ বা মুণ্ডিত মস্তক ও আকণ্ঠ পবিত্র গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদি এবং সকলেই কোন না কোন দণ্ড বা ত্রিশূল ও ভিক্ষাপাত্রধারী। এই সকল বিগ্রহ আবার শ্রেষ্ঠত্বলাভ করেন যখন

তাঁহারা অরণ্যে বা চিরতুষারপ্রান্তে গমন পূর্ব্বক কোন বৃক্ষ বা গিরির আশ্রয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও ধ্যান নিমগ্ন হইয়া ঐ প্রস্তর লিঙ্গেরই মত সম্পূর্ণঋজুভাবে উপবিষ্ট থাকেন।

এখনও কি মহাদেবের চিত্র, পারিপার্শ্বিক দৃশ্য, ও আনন্দধাম সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান? তাঁহার শিক্ষিত ও জ্ঞানী সেবকগণ ইহাতে হাস্য করিয়া বলিবেন, "শুন, মানবগণ, ইনিই সেই মহাদেব, যাহার কথা আমরা বলিয়া থাকি! তিনি নির্ব্বিকার অনন্ত অব্যক্ত, তাঁহার বাসভূমি, তাঁহার ইতিবৃত্ত বা তাঁহার সঙ্গী কিছুই থাকিতে পারে না। উহা কেবল মানবের অলীক স্বপ্ন মাত্র।"

কিন্তু হিন্দুগণ এই সকল বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা জানিবার যদি এখনও নির্ব্বন্ধপর হন তবে নিম্নলিখিতভাবে তাঁহার আবাসভূমির ভারতীয় চিত্র প্রদান করিতেছি। দূরে—বহুদূরে—ভারতের সীমান্তপ্রদেশে, গিরিশ্রেণীর মধ্যে যেখানে হিমালয় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সেই তিব্বত ও ভারতের সঙ্গমস্থলে মহান্ হিমশৈলের পাদদেশে মানস-সরোবর নামে এক হ্রদ আছে। তথায় গভীর নীরবতা ও অক্ষয় হিমানীর রাজত্ব। এই স্থানই ভগবান শিবের প্রিয় ও পবিত্র বাসস্থান,—এখানে চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছে সেই সকল সংসারক্লিষ্ট হতভাগ্যগণ—যাহারা সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে স্থান পায় নাই। পৃথিবীতে ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যাত অহিকুল এই কৈলাসে আসিয়া মহাদেবের মহান হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। অবসন্ন প্রাণীবর্গ এস্থানে আগমন করে, কারণ তিনি নাকি জীবের আশ্রয়। তাহাদেরই অন্যতম একটী কদর্য্য বৃদ্ধ বৃষ তাঁহার বিশেষ প্রিয়, তিনি উহার উপর আরোহণ করেন। আর তথায় আসে দুর্দ্দান্ত ক্লেশদায়ক সৃষ্টিছাড়া নরনারীর প্রেতাত্মা—এই সভ্য-জগতের যারা দুষ্ট বালক-বালিকা! যাহারা এত কুৎসিত যে কেহ তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে না, ক্ষতি করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও যাহারা সমস্ত পণ্ড ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়, যাহারা এক একটী বিশেষ ভাবে পরিচালিত ও তজ্জন্য বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া খ্যাত—সেই সকল হতভাগ্যগণের প্রতি কেবলমাত্র তাঁহারই অপার করুণা। যাহারা

তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, ভালবাসে ও পূজা করে। তিনি তাহাদের উপর নিজকার্য্যভার ন্যস্ত করেন—তাহারা শিবের গণনামে পরিচিত।

অনেকে এই সর্ব্বাশ্রয় পরমদয়ালু পরদেবতাকে বিশ্বের সংহার কর্ত্তা বলেন এবং তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি ও তাণ্ডব নৃত্যের কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ভীতির চক্ষে দেখেন। কিন্তু পূর্ণত্যাগীর সেই নৃত্য, বিরাট দেবতার আত্মবিস্মৃতিজনক সেই নৃত্য যে কি স্বর্গীয় ও অনির্ব্বচনীয় বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি? প্রলয়কালে তাঁহার এই মহানৃত্য কেন? ভগবান্ লীলাভিলাষী হইয়া আপনাকে যে বহুরূপে প্রকাশ করেন তাহাই হইতেছে সৃষ্টি। আবার যখন তিনি স্বেচ্ছায় আত্মস্থ হন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মমধ্যে প্রত্যাকৃষ্ট করেন তখনই হয় এই বিশ্বের প্রলয় বা সংহার। পাপী-তাপী সুখী-দুঃখী যে যেখানে আছে সকলে আজ এই প্রলয়ের দিনে তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে, তাঁহার সন্তানগণ যে আজ পুনরায় তাঁহার বক্ষে স্থান পাইবে—তাই আজ তাঁহার এই মহা আনন্দ, তাই এই উন্মাদ নৃত্য! ওগো তিনি যে আজ আত্মহারা হইয়া সমস্ত বিশ্বের জনমানব ও প্রাণীবর্গকে কোল দিতে ছুটিয়াছেন, তিনি যে প্রেমানন্দে দুই বাহু তুলিয়া সকলের উপর আশীষ ও শান্তিবর্ষণ করিতে-ছেন, তিনি কখনও কি রুদ্র হইতে পারেন?—ওগো তিনি যে দয়ার সাগর, অনন্তগুণাধার, 'আপনা হইতে হন আপনার'!

এক্ষণে আসুন, এই মরজগতের পাপতাপক্লিষ্ট শোকবিদগ্ধ ব্যর্থজীবন যে যেখানে অনাথ আতুর দীনহীন আছেন আসুন আমরা সকলে এই এই পরম কারুনিক, পরমযোগী, মহাজ্ঞানী আদর্শত্যাগী দেবদেব মহাদেব কৈলাসনাথের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণত হই ও তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লইয়া ধন্য হই।

কাশ্মীরে অমরনাথ।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

দেশ বেড়ান একটা বিষম বাতিক বলে মনে হয়। ভ্রমণকারী যখন একবার কোন স্থান থেকে বেড়িয়ে ঘরে ফিরে আসে তখন মনে করে বাহিরে বেরুলে বড় কষ্ট, আর কখনও বাড়ী থেকে বেরুন হবে না। খাওয়ার অনিয়ম, শোয়ার অনিয়ম, প্রভৃতিতে শরীর বড় খারাপ হয়, এবং টাল সামলাতে সামলাতে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু কিছুকাল গত না-হতে হতেই যখন একটা সুদৃশ্য অথবা পবিত্র স্থানের বর্ণনা সে শোনে বা পড়ে, অমনি তার প্রাণে একটা বিষম স্পন্দন এসে উপস্থিত হয়, এবং ভ্রমণের সব কষ্ট অসুবিধা ভুলে গিয়ে সেই স্থানটী দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যতক্ষণ না সেইটি দেখা হবে ততক্ষণে প্রাণে শান্তি নাই, ততক্ষণ নিস্তার নাই।

অন্ততঃ আমার এই হাল। ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করে এসে কাশ্মীরের বর্ণনা শুনে উহা দেখিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ল। শুনিলাম কাশ্মীর নাকি ভূস্বর্গ এবং মনে হতে লাগ্‌ল যতক্ষণ না ঐ স্থান দর্শন করা হয় ততক্ষণ আমার ভ্রমণ নিতান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা মনে উঠ্‌লেই তাহা কার্য্যে পরিণত করা অতি সুকঠিন, বিশেষতঃ আমাদের মত সরকারী কেরাণীর পক্ষে। আফিস হতে অবকাশ চাই; কিন্তু অবকাশ ত নিজের হাত ধরা নয়। আফিসের সুবিধা ও কর্ত্তৃপক্ষগণের মর্জ্জিমত ছুটি পাওয়া যায়। এই সুবিধার অপেক্ষায় ২।১ বৎসর কেটে গেল; অবশেষে গত জুলাই মাসে ২ মাসের ছুটি পাওয়া গেল, এবং কালবিলম্ব না করে ছুটি আরম্ভের পূর্ব্বদিনেই বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। আমি একক ছিলাম না। আমার দুইটী সহযাত্রী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গেই চলিলেন এবং অপরটি পরদিন রওনা হইয়া অম্বালায় আমাদের সহিত মিলিত হয়েন।

আমরা বাড়ী হইতে ২২শে আষাঢ় রওনা হই; কিন্তু ৺অমরনাথ দর্শনের দিন ২২শে শ্রাবণ। এতদিন আগে কাশ্মীরে গিয়া বসিয়া থাকা ভাল বোধ হইল না। সঙ্কল্প করিলাম ৺জ্বালামুখী মাতার দর্শন করিয়া পরে কাশ্মীর যাইব। আমরা Mogul Serai Express এ যাত্রা করি। গাড়ী গুহু করিয়া অনেক ষ্টেশন লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত বা বেশভূষা দ্বারা সজ্জিতগণের জন্য গরিব লোকেরা কত ত্যাগ স্বীকার করে তাহা এখানে একটু ইঙ্গিত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। আমাদের গাড়ীখানিতে যতলোক ছিল তাহাদের সকলের শুইবার স্থান ছিল না। তথাপি গরিব লোকগুলি আনন্দচিত্তে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিয়া আমাদের শুইবার স্থান করিয়া দিল। এইরূপ ত্যাগ-স্বীকার সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বস্থানে গরিব লোকেরা আমাদের জন্য দেখাইয়া থাকে। আর তার পরিবর্ত্তে আমরা অনবরত তাদের দাবিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা পাই, যাতে তারা কোনরূপে মাথা তুল্‌তে না পারে, আমাদের সমান অধিকার না পায়। হায়! এই আমাদের উচ্চচিন্তা ও শাস্ত্রপাঠের ফল। যাহা হউক আমরা পরদিন সকাল ৯টার সময় মোগলসরাই পৌছাই এবং Oudh Rohilkhand Railwayর গাড়ীতে চড়িয়া সন্ধ্যার সময় লক্ষ্ণৌনগরে উপস্থিত হই। উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি রেলে কাটান বড়ই কষ্টকর, এই জন্য আমরা আজ এই স্থানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিলাম। ষ্টেশন হইতে মাইলখানেক দূরে আমাদের পরিচিত শ্রীযুত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। আজকাল অনেক বাঙ্গালী লক্ষ্ণৌসহরে বাস করিতেছেন; বেশ ভাল ভাল বাড়ী করিয়াছেন। বিবাহাদিও অনেকের এইখানেই হইতেছে। অমৃতবাবু যদিও এখনও বাড়ী কেনেন নাই, তথাপি তিনি একপ্রকার এখানকার বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন। নিজে পেনসন পাইয়াছেন; এখন তাঁহার পুত্র M. A. পাশ করিয়া এখানকার কলেজে অধ্যাপক হইয়াছেন। যাহা হউক তিনি খুব যত্ন করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। ৮ই জুলাই বেলা ৩টার সময় লাহোর মেলে জলন্ধরের উদ্দেশে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করি।

জ্বালামুখী যাইবার দুইটী পথ আছে। একটি পথ জলন্ধর হইতে, অপরটি পাঠানকোট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম পথটীতে জলন্ধর হইতে রেলে হোসিয়ারপুর যাইতে হয়, এবং তথা হইতে একা করিয়া জ্বালামুখী যাইতে দুই দিন লাগে। পথটী বন্ধুর হওয়াতে একায় চড়িয়া বড়ই কষ্ট হয়; অপরন্ত Bias (শতদ্রু, সিন্ধু নদের একটি উপনদী) পার হইতে হয়; ইহাতে কখন কখন দৈববশে অনেক জল আসিয়া পড়ে. তখন জল নামিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, নয়ত নৌকা করিয়া গাড়ী সমেত পার হইতে হয়। এই অবস্থায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে এক-আধ দিন সময় অধিক লাগিয়া যায়। আরও এই পথে পানীয় জল পাওয়া বড় কঠিন। তবে যাইতে খরচ অনেক কম পড়ে। হুসিয়ারপুর হইতে জ্বালামুখী ৫০।৫২ মাইল। অপর পথটীতে প্রথমে অমৃতসর হইতে রেলে পাঠানকোট যাইতে হয়; তথা হইতে মোটরগাড়ী বা টোঙ্গায় কাঙ্গড়া, সেখান হইতে পুনরায় একা যানে জ্বালামুখী যাওয়া যায়। এই পথ ভাল কিন্তু খরচ বেশী পড়ে। পাঠানকোট হইতে জ্বালামুখীর দূরত্ব ৭৬ মাইল। এই পথে গেলে কাঙ্গড়ায় বিখ্যাত বজ্রেশ্বরী দেবীর দর্শন হয়; পক্ষান্তরে প্রথম পথ দিয়া যাইলে চিন্তাপূর্ণী নামক স্থানে ছিন্নমস্তা দেবীর বিরাট মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা খরচ কম বলিয়া প্রথম পথ দিয়া যাইব এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ হইতে জলন্ধরের টিকিট কিনিয়াছিলাম; বস্তুতঃ আরও আমরা দ্বিতীয় পথের সন্ধান জানিতাম না। গণেশানন্দ সরস্বতী নামে এক মাদ্রাজ দেশীয় সাধু রেলে যাইতে যাইতে আমাদের এই খবর দিলেন। তিনি ভারতের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অতি সরল ও অমায়িক ব্যক্তি। তিনি তৃতীয়বার অমরনাথ তীর্থে যাইতেছেন। এবং বলিলেন ইহা কঠিন তীর্থ, আমাদের গন্তব্য স্থানগুলির সুগম পথ এবং কোথায় থাকিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া দিলেন।

জলন্ধর ষ্টেশনে পৌঁছিলে ইতিপূর্ব্বে কৃত-বন্দোবস্ত অনুযায়ী আমাদের মধ্যে একজনের পরিচিত একব্যক্তি তাঁহার বাসায় আমাদের লইবার জন্য আসিলেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাধুটীর কথায় প্রথম পথটী দিয়া

যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পথ দিয়া যাইতে মনস্থ করায় এখানে আর নামিলাম না। সেই ভদ্রলোক আমাদের একখানি করিয়া অমৃতসরের টিকিট আনিয়া দিলেন এবং আমরা সরাসর অমৃতসরে চলিলাম। তথায় পৌঁছিতে বেলা ১০টা হইল। গণেশানন্দের পরামর্শ মত আমরা এখানে মহাত্মা গাগরমলের পাঠশালায় আশ্রয় গ্রহণ করি। ইহা একটি বিশাল অট্টালিকা এবং ষ্টেশন হইতে ৫।৭ মিনিটের পথ দূরে অবস্থিত। এখানকার ঘর দ্বার অতি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন; অতিথি-গণের কোন কষ্ট হয় না। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণের জন্য একটী টোল আছে। আমরা এই টোলে ২৬টী ছাত্র দেখিয়াছিলাম। বিস্তৃত উঠানের একদিকে রাধাগোবিন্দের মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত একটী সুন্দর মন্দির। কয়েকটী সাধুও এখানে থাকেন। টোলের পূজাদির ও সাধু সেবার খরচ নিতান্ত কম নহে। এই খরচ নির্ব্বাহের জন্য ৺গাগর-মল ১২,০০০৲ আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। গাগরমলের পুত্র প্রত্যহ এখানে আসেন; তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ভুলিবার নহে। যাহা হউক আমরা পাকশাক আহারাদি সারিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সহর পরিদর্শনে বাহির হইলাম। জালিয়ানওয়ালাবাগ, বাবা অটল, রামবাগ, Golden Temple বা দরবার সাহেব, প্রভৃতি দর্শন করিলাম। দরবার সাহেব বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্যস্থ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটী বড় মন্দির। এই মন্দিরের বিশাল গম্বুজটী স্বর্ণের হল করা তামার পাতে আবৃত। এই জন্য ইহার নাম "গোল্ডেন টেম্পল"। মন্দির মধ্যে শিখ ধর্ম্ম-গ্রন্থ বহু মূল্য পট্টবস্ত্রে আবৃত রহিয়াছে এবং সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে ও পূজা দিতেছে। বৈকালে এখানে খুব সঙ্গীতাদি হয়। মন্দিরটী জলাশয়ের তীরের সহিত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত এক সেতু দ্বারা সংযুক্ত। তীরভূমিও মার্ব্বেল মণ্ডিত; এখন ইহার সংস্কার কার্য্য চলিতেছে। উক্ত সরোবরটীর নাম অমৃতসরোবর বা অমৃতসর। ইহারই নাম হইতে সহরের নামকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বে সহরের এই নাম ছিল না। তখন ইহাকে চক্ বলিত। আকবরের রাজত্বকালে শিখদের চতুর্থ গুরু রামদাস বর্ত্তমান সরোবর কাটাইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে মন্দির নির্ম্মাণ

করান। তখন এই নগরের নাম রামদাসপুর হইল। পরে তাঁহার পুত্র অকজুন (অর্জ্জুন) সিংহ এইখানে শিখদের রাজধানী করিয়া ইহার অমৃতসর নামকরণ করেন। অমৃতসর শিখদের প্রধান তীর্থস্থান। মক্কাকে মুসলমান, জেরুজিলামকে খৃষ্টান, বুদ্ধগয়াকে বৌদ্ধ এবং কাশী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতিকে হিন্দু যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন শিখ ইহাকে সেই চক্ষে দেখেন। উক্ত সরোবরে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখেই একটি বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার নাম "ভুঙ্গ"। এখানে শিখগুরুদের অস্ত্র রক্ষিত আছে। "বাবা অটল" নামক সমাধিও দেখিতে চমৎকার; ইহার নিকটেই বৃহৎ "কৌলশর" নামক বৃহৎ পুষ্করিণী; গুরু গোবিন্দের স্ত্রীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই সহর পঞ্জাবের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। শাল বুনিবার জন্য কাশ্মীর অপেক্ষা এখানে অধুনা বেশী তাঁত আছে। কাশ্মীরের জোলারা অধিক রোজগারের জন্য এখানকার মহাজনের কাছে আসিয়া কার্য্য করে। সহরের অলি-গলিতে অনেক স্থানে শাল বুনা হইতেছে দেখিলাম।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাসায় ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রে আর আমাদের পাক করিতে হয় নাই, শিক্ষার্থিগণের সহিত দাল রুটি আহার করিয়াছিলাম। ঐ দিনই রাত্রি ১১টার ট্রেণে আমরা পাঠান-কোট যাত্রা করি। আমাদের কিছু কিছু মাল (যাহা সঙ্গে লইবার ছিল না) এইখানে একটি ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাই।

পরদিন ৭টার সময় পাঠানকোট পৌছিলাম; গাড়ী ৩ ঘণ্টা late হইয়াছিল। কি কারণে জানি না আজ অধিক motor গাড়ি ছিল না; যে ২।৪ খানি ছিল তাহা ভদ্র সাহেব এবং গোরা সৈনিক লইয়া চলিয়া গেল, আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৪৲ টাকায় কাঙ্গড়া পর্য্যন্ত একখানি টঙ্গা ভাড়া করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পার্ব্বত্য পথে চড়াই, ওৎরাই করিয়া ৫৪ মাইল যাইতে হইবে; বড় সোজা কথা নহে; বেশী চড়াই হইলে গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিতে হয়, তাহা না হইলে ঘোড়া টানিতে পারে না। এইরূপে চলিতে চলিতে ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় ৩০ মাইল দূরে ওকলা নামক চটিতে উপস্থিত হইলাম; সেখানে একটী সুন্দর

শিব মন্দিরে রাত্রি যাপন করি। পর দিবস ভোর ৪টার সময় রওনা হইয়া সাপুর নামক চটিতে স্নানাহার শেষ করিয়া বেলা ৩টার সময় কাঙ্গড়া নগরে উপস্থিত হই। তখনই এক পাণ্ডা আসিয়া জুটিলেন এবং আমাদিগকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তথায় থাকিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোকদিগের সহিত সংস্পর্শে আসিতে হইবে দেখিয়া আমরা রাজি হইলাম না। এদিকে সুবিধা মত ধর্ম্মশালাও খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অবশেষে ৺বজ্রেশ্বরী দেবীর মন্দির-সভার সেক্রেটারি মহাশয় একটি Guest House (নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ী) আমাদের থাকিতে দিলেন; ইহা মন্দিরের ধারেই থাকাতে আমাদের বেশ সুবিধা হইয়াছিল।

এই নগর পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত কাঙ্গড়া জেলার প্রধান সহর। জেলাটী প্রায় সর্ব্বত্র ৯৫০ হইতে ১৮০০০ ফিট উচ্চ গিরিমালায় সমাকীর্ণ, ঐরূপ হইলেও উপত্যকা সমূহ মধ্যে অনেক গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র আছে। প্রাচীন কালে ইহার এই নাম ছিল না। তখন ইহা মহাভারতোক্ত ত্রিগর্ত্ত দেশ নামে পরিচিত ছিল। ইহার অধিবাসিগণ অধিকাংশই রাজপুত। এই জেলায় প্রচুর বারিপাত হয়। প্রতি বর্ষে ৭০ হইতে ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়া থাকে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে এই সহরটীর উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফিট।

বর্ত্তমানকালে এই স্থানের জলবায়ু ভাল বলিয়া বোধ হইল না। অন্ততঃ ইহার অধিবাসিগণের আকৃতি দেখিয়া এইরূপ মনে হয়। এই জন্যই ইংরাজ বাহাদুর এখান হইতে পল্টনের ছাউনি উঠাইয়া ধর্ম্মশালায় লইয়া গিয়াছেন এবং তাহাকেই জেলার Headquarters করিয়াছেন। যাহা হউক কাঙ্গড়া সহরটী বড় নহে; ইহার লোকসংখ্যা ৬ হাজারের মধ্যেই হইবে। সুলতান মামুদের আক্রমণের পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১০০৯ সালের পূর্ব্বে) নগর এখানে ছিল না; সন্নিকটস্থ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল; তখন ইহার নাম ছিল নগরকোট বা ভীমনগর; এখনও এখানে কিছু লোকের বাস আছে। নগরকোটের ৺অম্বিকা দেবীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ ছিল এবং উহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির পঞ্জাব প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, মুসলমান ঐতিহাসিক মাহাম্মাদ কাশিম ফেরিস্তায়

বলিয়াছেন পৃথিবীর কোন রাজার ভাণ্ডারে এত ঐশ্বর্য্য ছিল না। ইহার দুর্গ পার্ব্বত্য নদীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত থাকায় অতি দুর্ভেদ্য ছিল; ইহারই মধ্যে ৺অম্বিকা দেবীর এবং অদূরেস্থিত জ্বালামুখীর মন্দিরের তাবৎ ঐশ্বর্য্য রক্ষিত থাকিত। কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই ১০০৯ সালে গজনীর সুলতান মামুদ দুর্গ ধ্বংস করিয়া সমস্ত লইয়া যান। প্রথম আক্রমণে তিনি হটিয়া যান এবং পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে হিন্দুর দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের প্রধান সেনাপতির হস্তী মুসলমানের বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া পলায়নপর হইল। সেনাপতি পলাইতেছেন মনে করিয়া হিন্দু সৈনিক পলাইতে লাগিল। তখন মামুদ তাহাদের অনুসরণ করিয়া অনেক ধ্বংশ করেন এবং বিজয়ী হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবীমূর্ত্তি ও বহুকাল সঞ্চিত ধনরত্ন স্তূপ লুণ্ঠন করিয়া গজনীতে লইয়া যান। রত্নরাশির কিছু পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল:—৭০ কোটি দিরহাম মুদ্রা, ৭০০৪ মণ স্বর্ণ খণ্ড, ২০ মণ মূল্যবান প্রস্তর (হীরকাদি), ইচ্ছামত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারা যায় এইরূপ ৮০ হাত লম্বা ও ৫০ হাত চওড়া একখানি রূপার অট্টালিকা, ৫০ হাত দীর্ঘ স্বর্ণ চন্দ্রাতপ এবং শত শত বহুমূল্য বেণারসী শাটি, মকমল প্রভৃতি।

আমরা বাসায় জিনিষ পত্রাদি গুছাইয়া রাখিয়া ৺বজ্রেশ্বরী দেবী দর্শন করিতে চলিলাম। মন্দিরটী বৃহৎ না হইলেও ছোট নহে। এখন ইহার সংস্কার কার্য্য চলিতেছে। দেবীমূর্ত্তি একখানি স্বর্ণ ও রৌপ্য সিংহাসনে আসীনা। সন্ধ্যায় ও সকালের ভোগরাগাদির ব্যাপার দেখিয়া মনে হইল দেবোত্তর সম্পত্তি বড় বেশী নাই। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডা প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি পূর্ব্বক শয়ন করিলাম। অবশ্য আহার্য্যের জন্য আমাদিগকে কড়ায় গণ্ডায় মূল্য গুনিয়া দিতে হইত। পরদিন বেলা ১১টার সময় মোটর যোগে জ্বালামুখী যাত্রা করিব; আমরা প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য, স্নান, দেবীদর্শন এবং আহারাদি করিয়া মোটরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ মোটর আসিল না; শুনা গেল জ্বালামুখী হইতে একটীও আরোহী না পাওয়াতে গাড়ী ছাড়ে নাই। পরদিন পুনর্বার ঐরূপ

ঘটীতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা যাতায়াতের জন্য ২৫৲ টাকায় একখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া রাখিলাম। উহা পরদিন সকালে ছাড়িবে। ঐ বন্দোবস্ত করিয়া আমরা বৈকালে স্থানীয় এক ভদ্রলোকের সহিত নগর-কোট বেড়াইতে চলিলাম। উহার আর একটী নাম কোট কাঙ্গড়া। গন্তব্য পথ বজ্রেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখ দিয়া পাহাড়ে উঠিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নগরকোটে পৌছিলাম। এখনও সেখানে অনেক লোকের বাস আছে; বাড়ীগুলি পরস্পর সংলগ্ন, যেরূপ সহরে থাকে; তবে অধিকাংশ বাড়ীই পরিত্যক্ত এবং পড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে সহর পরিত্যাগ করিয়া আমরা প্রাচীন দুর্গে আসিয়া পড়িলাম; বিশাল দুর্গ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম; চারিদিকের ভূমি হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত এবং খরবেগা নদীদ্বারা বেষ্টিত। ইহার অবস্থান দেখিয়া বুঝিলাম না মামুদ কি করিয়া তখনকার দিনে এই দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এই স্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলে প্রাচীন ইতিহাস যেন মানস চক্ষে ফুটিয়া উঠে এবং তীব্র নিরাশা আসিয়া মনকে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। ৺অম্বিকা দেবীর স্থান ও ধ্বংসমুখে পতিত ঘর-দ্বারগুলি দেখিয়া অতি বিষণ্ণ চিত্তে ভারতমাতার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মামুদ প্রতিমা লইয়া যাইবার পর তৎকালীন রাজা পুনরায় নূতন দেবী-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ফিরোজ সা তোগলক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন এবং দেবীমূর্ত্তি লইয়া মক্কায় পাঠাইয়া দেন। তদবধি এই দুর্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক এখানকার অধিবাসিগণ অতিথিপরায়ণ ও সদালাপী কিন্তু নিতান্ত ভীরুস্বভাব বলিয়া বোধ হইল। দেশে ধনী লোক খুব কম, নাই বলিলেই হয়। এখনও এই জেলা মীনার ও জড়োয়া কাজের জন্য বিখ্যাত। এখানকার ধূপ ও চিঁড়া প্রসিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

ভক্ত-কবীর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীযতী—)

চলিলেন কবীর পরে তীর্থ যাত্রায় ॥
মথুরা দর্শন করি গেলেন দিল্লীতে।
সিকন্দর লোদি ছিল দিল্লীর রাজত্বে ॥
দুষ্টলোক গিয়া বলে যবন রাজারে।
"দাম্ভীক জোলা এক বঞ্চিছে নগরে" ॥
সিকন্দর কবীরেরে আনেন ধরিয়া।
"নমস্কার কর" বলে সকলে মিলিয়া ॥
কবীর সহাস্য মুখে করেন উত্তর !
"নমস্কার যোগ্য নাহি সভার ভিতর ॥
এ সংসারে সবে বধ্য নমিব কাহায়"।
শুনি সিকন্দর লোদি ক্রোধে অগ্নিপ্রায় ॥
শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলে যমুনার জলে।
ডুবিল কবীর সেই কালিন্দীর জলে ॥
কিন্তু পরক্ষণে সবে পাইল দেখিতে।
কবীর সহাস্য মুখে যমুনা তীরেতে ॥
করেন ভ্রমণ সুখে দুষ্টেরা দেখিয়া।
ম্লেচ্ছরাজে বলে "দুষ্টে আনহ ধরিয়া ॥
ঐন্দ্রজালী বেটা দুষ্ট জোলা সে কবীর"।
ধায় রাজ-চর বাঁধে তাঁহার শরীর ॥
জলন্ত অনলে ফেলে বন্ধন করিয়া।
কেশ মাত্র নহে নষ্ট অনলে পড়িয়া ॥

অমানুষ এ ঘটনা দেখিল সকলে।
তথাপি চৈতন্য নহে রাজা ক্রোধে বলে॥
"হস্তীপদতলে ফেলে বধহ জীবন"।
রাজার আজ্ঞায় আসে উন্মত্ত বারণ॥
সহস্তে রক্ষেন যাঁরে আপনি ঈশ্বর।
কি করিতে পারে তারে সহস্র কুঞ্জর॥
মত্ত হস্তী কবীরেরে সিংহসম দেখে।
উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইল কে তাহারে রোখে॥
ভূয়সী প্রশংসা করে যতেক যবন।
সিকন্দর লোদি মন টলিল তখন॥
কবীরে আহ্বান করি বলিল সাদরে।
"ওহে সাধু মহাজন ক্ষমহ আমারে॥
না জানিয়া তব পদে করিয়াছি দোষ।
মম প্রতি মহাশয় ত্যাগ কর রোষ"॥
মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিয়া রাজারে।
কাশীধামে আসে ফিরে আপন আগারে॥
আত্মজ্ঞান লভি শিক্ষা দেন নরগণে।
কবীর বিপক্ষ হয় যত দুষ্টগণে॥
একদা দুষ্টেরা সবে দুষ্টামী করিয়া।
কাশীবাসী সাধুগণে নিমন্ত্রিল গিয়া॥
সহস্র সহস্র সাধু নিমন্ত্রণ পেয়ে।
কবীর কুটীরে সবে উপনিত গিয়ে॥
ঘটনাক্রমে কবীর ছিল স্থানান্তরে।
অতিথি ক্ষুধার্ত্ত দেখি সভয় অন্তরে॥
শিষ্যগণ ভয়ে প্রাণ গেল শুখাইয়া।
এলেন ভক্তবৎসল কবীর হইয়া॥
সহস্র সহস্র লোকে ভক্ষ ভোজ্য দেন।
সাধুগণ পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন॥

হইল আহার শেষ সকলে উঠিল।
সর্ব্বরূপী শ্রীহরির অন্তর্দ্ধান হ'ল॥
গৃহে ফিরি কবীর আসেন হেনকালে।
সমারোহ দেখি শিষ্যগণ প্রতি বলে॥
এত লোক সমাগম কেন বৎসগণ।
আশ্চর্য্য হইয়া শিষ্য বলিল তখন॥
আপনি সকল লোক ভোজন করায়ে।
কেমনে এখনি প্রভু গেলেন ভুলিয়ে॥
বুঝিলা কবীর এ সকলি হরিলীলা।
মনোভাব গুপ্ত করি শিষ্যেরে কহিলা॥
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত আমি শুন বৎসগণ।
সাধুর প্রসাদ আন করিব ভোজন॥
কবীর অনিষ্ট চেষ্টা যাহারা করিত।
মহত্ত্ব গুণেতে তারা সবে বশীভূত।
নিজ নিজ দোষ সবে স্বীকার করিয়া।
পদে ধরি মাগে ক্ষমা কাতর হইয়া॥
প্রেমানন্দে সকলেরে করি আলিঙ্গন।
উচ্চৈঃস্বরে করিলেন রামগুণ গান॥
কবীর কহেন "সবে শুন মন দিয়া।
ভগবানে দ্বেষভাব কর কি লাগিয়া॥
কাশীতে মক্কাতে সেই একি ভগবান।
দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ মিছা কর অকারণ॥
হৃদয়ে সন্ধান কর পাইবে উদ্দেশ।
একই ঈশ্বর বাস করে সর্ব্বদেশ॥
হিন্দু মুসলমান যেই আরাধ্য দেবতা।
সকলেরি ধাতা তিনি সকলেরি পাতা" ॥
গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল কবীর হৃদয়ে।
হিন্দু ও যবন এক করিব উভয়ে॥

মুসলমান সাধু এক তুষ্ট সে কবীরে।
কন "বৎস লহ বর দিব আমি তোরে"॥
কবীর বলেন "বর দেহ ভগবান।
একভাব করি যেন হিন্দু ও যবন"॥
ফকির বলেন "ইহা সাধ্যের অতীত।
বর দিব হবে তুমি সর্ব্ব শ্রদ্ধাজিৎ॥
উভয় ধর্ম্মের লোক মানিবে সকলে"।
ঘটিল তাহাই কবীরের ভাগ্যফলে॥
হিন্দুরা বলেন হিন্দু যবনে যবন।
সবে ভক্তি শ্রদ্ধা চক্ষে করে দরশন॥
একদা মৌলবি কোন বলিল কবীরে।
"আল্লা মসজিদ্ দিকে পা রাখ কি করে"॥
বিনয়ে কবীর কন "শুন ওহে ভাই!
ফিরাও চরণ আল্লা গৃহ যথা নাই"॥
লজ্জিত মৌলবি শুনি বচন তাঁহার।
কুর্নিশ করেন তাঁরে বিনয়ে আবার॥
কবীরের গুণে মুগ্ধ যত কাশীবাসী।
সুন্দরী নর্ত্তকী এক বলে তাঁরে আসি॥
নৃত্য গীতে তুষ্ট সদা করিব তোমায়।
শুনিয়া কবীর সাধু সবিনয়ে কয়॥
'নাচ গান সুখ ভোগ নাহি জানি আমি।
স্ত্রী নই পুরুষ নই জান মোরে তুমি॥
তোমার কামনা পূর্ণ কিরূপে হইবে"।
নর্ত্তকী কাকুতি করি কহিলেক তবে॥
'বড় আশা করে আসি নিকটে তোমার।
হতাস হইয়া যাব কেমন বিচার"॥
ধীরভাবে বলিলেন কবীর তাহারে।
বিরাজ করেন হরি সদা মম ঘরে॥

অতি রাগী মহাভোগী তাঁহারে জানিহ।
তাঁহারে শুনায়ে ভোগ পিপাসা মিঠাহ" ॥
নর্ত্তকী সন্তুষ্ট অতি সৌভাগ্য মানিয়া।
শ্রীহরি হবেন তুষ্ট সংগীত শুনিয়া ॥
কবীরের গৃহে আসি সেদিন হতে।
নৃত্যগীত করে সদা প্রত্যহ নিশাতে ॥
কিছুদিন এইরূপে বিগত হইল।
সাধু প্রতি প্রীতিচক্ষে নর্ত্তকী দেখিল ॥
গভীর রজনী নিদ্রাগত প্রাণীগণ।
নর্ত্তকীর চক্ষে নিদ্রা নহে আকর্ষণ ॥
আত্মসংযম ক্ষমতা না হয় তাহার।
মনের আবেগে চলে কবীরের ঘর ॥
গভীর অমারজনী শয্যার উপরে।
জ্যোতির্ম্ময় হরিমূর্ত্তি ঘুমায় অঘোরে ॥
ভোগবাঞ্ছা দূরে গেল প্রেমাশ্রু বহিল।
নর্ত্তকী সংসার ত্যজি অরণ্যে চলিল ॥
কবীর প্রত্যুষে উঠি না দেখি তাহারে।
সদ্গতি হইল তার বুঝিলা অন্তরে ॥

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বকথা

অদ্বৈতের চৈতন্যে নিত্যানন্দের স্ফূর্ত্তি।
জ্ঞানী ভাবে এক সব, ভক্ত, ভিন্ন মূর্ত্তি ॥
স্বরূপেতে ভেদ নাই, ভেদ আছে ভাবে।
জ্ঞানী, ভক্ত ভিন্ন বটে ভাবের স্বভাবে ॥
স্বরূপ সন্ধান নাই, জ্ঞানী, ভক্ত যত।
পরস্পর সদা তাই, হিংসা দ্বেষে রত ॥
জ্ঞানী, ভক্ত যদি পায় স্বরূপ সন্ধান।
ভিন্ন দেহে তারা কিন্তু হয় এক প্রাণ ॥

—বিজ্ঞানী।

পূজার আয়োজন।

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নির্ম্মলবাবু গ্রাম হইতে সহরে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ নাই। তাহা ছাড়া নিজেরও মনের অবস্থা যে রকম তাহাতে একস্থানে বসিয়া থাকা প্রায় অসম্ভব; তাই সস্ত্রীক বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সাঁওতাল পরগণা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলস্থ একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া গেলেন। সেখানেও তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতেন না, সুবিধা মত এদিক ওদিক বেড়াইতে যাইতেন। সম্প্রতি শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার অস্থায়ী বাসস্থানের অনতিদূরে পাহাড় জঙ্গল ও নদীর মাঝ খানে একটী প্রাচীন দেবমন্দির আছে—স্থানটী নাকি খুব মনোরম। তারপর স্ত্রীকে লইয়াই একদিন সেখানে বেড়াইতে যাইবেন স্থির হইল; কিন্তু তৎপূর্ব্বে একা একবার দেখিয়া আসা দরকার বিবেচনা করিয়া শেষ রাত্রির ট্রেণে রওয়ানা হইলেন। যে স্থানে তিনি গাড়ি ছাড়িলেন, সেই ষ্টেশন হইতে মন্দিরের দূরত্ব খুব বেশী ছিল না—কাজেই সূর্য্যোদয়ের একটু পূর্ব্বেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—মন্দির জনমানব—শূন্য। একটী মাত্র ভৃত্য পাহারা দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—বেলা প্রায় দশ এগারটার সময় মন্দির খোলা হয়; সেই সময়ই পুরোহিত এবং অন্যান্য যাত্রী এখানে আসেন। যাহা হউক তিনি দেখিলেন যে, স্থানটী বাস্তবিকই বড় মনোরম। একটী ছোট ঝরণার পাশে মন্দির অবস্থিত, আশে পাশে সামান্য সামান্য ঝোপ জঙ্গল। নীচের দিকে একটু দূরে একটী বড় নদী—পূর্ব্বোক্ত ঝরণা তাহাতেই গিয়া মিশিয়াছে। আর সেই স্থান হইতে গণ্ডশৈল-শ্রেণী ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মন্দিরটী অনেক দিনের এবং তাহার ছায়া হইতে মেঝে—প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত সবই পাথর দিয়া তৈরী। মন্দির গাত্রে খোদাই করা অনেক প্রকার মূর্ত্তি আছে। দেবীর প্রধান মন্দির ব্যতীত আশে পাশে আরও কতকগুলি ঘর আছে; সেখানে বিদেশী সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য যাত্রীরাও মাথা গুঁজতে পারে—কিন্তু সংস্কারের অভাবে বর্ষার প্রকোপে অনেক স্থান ধসিয়া পড়িয়াছে। যাহা উহক নির্ম্মলবাবু প্রথমতঃ সেই নির্জ্জন মন্দির ত্যাগ করিয়া পাহাড়ের দিকে গেলেন। তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত—রাত্রির ঘন তমসাবৃত বিজন প্রান্তর ঈষৎ রক্তিমাভ আলোকে যেন হাসিয়া উঠিতেছে! যেদিকে দৃষ্টি যায়—উচ্চ—অনুচ্চ শ্যামল মাঠ—তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে। ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী সেই বিস্তৃত প্রান্তরে জটাজুট-সমন্বিত মৌন যোগীর ন্যায় শান্ত, গম্ভীর মূর্ত্তিতে বসিয়া আছে, নিম্নে পাদমূল ধৌত করিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কল কল ধ্বনিতে সেই শান্ত নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। স্থানটী নির্ম্মল বাবুর বড় ভাল লাগিল—তিনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া প্রকৃতির প্রশান্ত—পবিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কত পূর্ব্ব স্মৃতি—কত বৈজ্ঞানিক চিন্তা কত দার্শনিক মীমাংসার আলোচনায় বিভোর হইয়া গেলেন। এমন কি এক মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতেছেন কিনা তাহাও তিনি বুঝিতে পারে নাই। এই সময়—একটী কথায় তাঁহার চিন্তা-স্রোত ভাঙ্গিয়া গেল,—"ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—কীটানুকীট মহাপারাবারের অন্ত কেমন করিয়া পাইবে?" তারপর যাহা ঘটিয়াছিল পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সন্ন্যাসিনীর অদৃশ্যের পর বিষণ্ণ মনে তিনি যখন মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে, কিন্তু দুই একজন লোকের বেশী আর কেহ সেখানে আসে নাই। কাজেই মন্দির পার্শ্বের ক্ষুদ্র ঝরণার তীরে বসিয়া তিনি আপনার জীবনের অনেক কথা মনে করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেশ বিদেশাগত স্ত্রী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসিদ্বারা সেস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনিও

তাহা নিজের চক্ষেই অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তখন আর মৃত্যুর দুয়ারেও মুক্ত পথ পাওয়া যায় না, চারিদিকে নিজের হাতে গড়া ভীষণ কণ্টকময় বেড়া পথ রোধ করে' দাঁড়ায়। তখন আবার তর্ক ছেড়ে সরল মীমাংসা—বিচার ছেড়ে বিশ্বাসকেই মাথা পেতে নিতে হয়। ক্ষুদ্র মানুষ আমরা কি করতে পারি? তাঁর অপরিমেয় করুণার কিবা বুঝ্‌তে পারি? অমৃতের সাগরে পাড়ি দিয়ে তাকে মন্থন করতে যাওয়ার দরকার? তার একটা তরঙ্গ লাগলেই ত আমরা ভেসে যাব—অমর হয়ে' যাব!"

নি—"তবে কি যে যা বল্‌বে তাই বিশ্বাস করে' নিতে হবে? আমার শক্তি কি কোন কাজেই লাগ্‌বে না? না—তা হতে' পারে না। মানুষের শক্তিও অপরিমেয় এখনও তার সীমা রেখা দেখা যায় নি।"

স—"না, তা দেখা যায়নি বটে, কিন্তু সব রহস্য-উদ্ঘাটনকারীই প্রবল ধাক্কা খেয়ে' একদিন না একদিন সোজা রাস্তায় এসে দাঁড়ায় এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নি—"তবে কি আপনি বলেন—চিরদিন নিজেকে অক্ষম ভেবে দুনিয়ার ছোট-বড় সব সমস্যাকেই মহাপারাবার ভাবতে হবে?"

স—"না—তা কেন? যতটুকু আপনার ক্ষমতা ততটুকু জানবার চেষ্টা নিশ্চয়ই কর্‌তে হবে। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সৃষ্টিকর্ত্তা আপনাকে যে সকল শক্তি দিয়েছেন তা নিয়ে আপনি চুপ করে' বসে থাক্‌তে পারেন না। কিন্তু যতই চেষ্টা করুন—যতক্ষণ আপনি চেষ্টার সফলতা অনুভব করে আনন্দ পাবেন ও নিজেকে সেই আনন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা বলে' ভাব্‌বেন—ততক্ষণ অজ্ঞাত কিছু থাক্‌বেই। কারণ আপনার ইচ্ছায় কিছুই হয় না।"

নি—"তবে কি এর সীমা কেউ পায় না? আর আমার ইচ্ছাশক্তির কি কোন মূল্য নেই?"

স—"সে কথা ঠিক বল্‌তে পারলাম না—তবে অন্ততঃ এটা বোধ হয় সত্য যে, যদি কেও তাহা পায় তবে নিজেই পায়। অন্যকে সে পাওয়ার অবস্থা বুঝিয়ে দিতে পারে না।"

নি—"কিন্তু মানুষের সৃষ্টি আধুনিক বিজ্ঞান অনেক কল্পনাতীত শক্তি-

রহস্য অন্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিতে পারে। সুতরাং সে তার ইচ্ছাশক্তিকে অন্যের অধীন করে' দেবে কেন?"

স—"দেবে কেন?—একথার উত্তর আমি দিতে পারব না—তবে দিতে সে বাধ্য হয়। আপনি যে নগণ্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বসে আছেন, সেটার শক্তি যদি এতই বেশী—তবে আজ দুনিয়ার এত বড় বড় শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক জাতির ওপর সমস্ত বুকখানা জুড়ে একটা বিকট ক্রন্দনের হতাশ-সুর বেজে উঠেছে কেন? আজ মৃত্যুর আঁধারে দিশেহারা হয়ে' তারা জগৎময় ছুটে বেড়াচ্ছে কেন?—বল্‌তে পারেন? প্রতিকার কর্‌তে কি পেরেছে? কিন্তু এই জাতি যখন মৃত্যুকে কতবার উপহাস করে' তাড়িয়ে দিয়েছে—কিসের উপর নির্ভর করে' জানেন?—শুধু নিজেকে কর্ত্তা না ভেবে, তাঁর অসীম কর্ম্মচক্রে একটা ক্ষুদ্রতম উপাদান মনে ধরে নিয়ে। আমাদের একমাত্র ভরসা—একমাত্র নির্ভরতা, সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অধীনে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। আমাদের আদর্শ, উচ্ছৃঙ্খলতা—নাস্তিকতা নয়, তার পরিবর্ত্তে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

বিশ্বাস চাই! তাঁর অসীম শক্তিকে জয় করবার অহঙ্কার ছেড়ে—'হে জীবনস্বামী আমি তোমার দাসানুদাস বলে চরণে লুটিয়ে পড়তে হবে, তবেই তাঁর দয়া হবে। আমাদের আবর্জ্জনাপূর্ণ শূন্য মন্দিরে সেই প্রেমের রাজাকে বন্দী কর্‌তে হবে। কিন্তু কি দিয়ে? আপনার শক্তি দিয়ে কি? কুলিয়ে উঠ্‌তে পারবেন না—তাঁর রাঙ্গা চরণ দুখানিতে—মনের মৈত্রী—আর ভক্তিরস দিয়ে গিল্টী করা শৃঙ্খল পরিয়ে দিতে হবে। তবে আর পলাবার ভয় থাক্‌বে না। কেমন পারেন কি?"

নি—"পারি—কিন্তু বিশ্বপিতার চরণে আত্মসমর্পণের জন্য মাটী অথবা পাষাণ প্রতিমার দরকার কি বুঝলাম না। তিনি ত সর্ব্বব্যাপী অনন্ত পুরুষ। তাঁকে একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্রভাবে দেখ্‌লে বা পূজা কর্‌লে তাঁর গৌরবের অবমাননা করা হয় না কি?"

স—"কে বল্লে ক্ষুদ্রভাবে দেখ্‌তে হবে? আপনার যেমন শক্তি তেম্‌নি

ভাবে দেখ্‌তে হবে। প্রতিমা পূজা কর্‌লেই কি তাঁকে ক্ষুদ্র করা হ'ল?—তাঁর অবমাননা করা হ'ল?"

নি—আমার বিশ্বাস তাই। আর যদি প্রতিমা পূজাই কর্‌তে হয়—তবে তাঁর সজীব প্রতিমার পূজা কর্‌লেই বা ক্ষতি কি? তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জীব মানুষের সেবা কর্‌লে কি প্রতিমা পূজার কাজ হয় না?"

স—"এক'শ বার!—কখন করেছেন কি? যদি প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়ে একটী মানুষেরও সেবা করে' থাকেন—আপনি ধন্য! করেছেন কি?"

নির্ম্মল বাবু কোন উত্তর দিলেন না—নির্ব্বাক হইয়া সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে তাকাইলেন। সন্ন্যাসিনী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মনে করুন আমরা সকলেই একই পিতার সন্তান। একসন্তান আর এক সন্তানের সেবা করিলে—পরস্পর প্রাণের বাঁধনে আবদ্ধ হইলে তিনি অত্যন্ত সুখী হন; এমন কি, সে সেবা তিনি নিজের বলিয়াই ধরেন। আমরাও সে সেবার আনন্দে ভরপূর হই সে কথা খুব সত্য—কিন্তু তাই বলে কি তাঁহার কৃত্রিম প্রতিমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান পাপ বলে বিবেচিত হবে? আপনি কি অচেতন বলে আপনার পিতার তৈল-চিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবেন? যে প্রতিমা পূজা করে, সে পূজা কেবল মাটীর পুতুলের পূজা করে না—ভগবানের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আর এককথা,—এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা যদি কেহ থাকেন, আর যদি তাঁকেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে বিবেচনা করেন—তবে তিনি অসীমের মাঝে সসীম, আবার নিরাকারের মাঝে সাকারও হতে পারেন। কিন্তু তাঁকে যদি কেবল নির্গুণ নিরাকার বলেই ধরে নেন—তবে আবার সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময়, সৃষ্টি-কর্ত্তা পরমেশ্বর বলে ডাকবেন কেন? যিনি কেবলই নির্গুণ, তাঁর বোধ হয় সৃষ্টির চিন্তা থাকা সম্ভব নয়। তাই আমরা প্রাণের আবেগ মিটাবার জন্য প্রথম থেকেই তাঁর দর্শন আশ পূর্ণ করিবার জন্য বলি, তিনি সর্ব্বগুণাধার, মঙ্গলময়, দয়াময়, আবার সন্তানের আকুল ক্রন্দন থামাইবার জন্য ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু। আমরা সেই হরিরই চিন্ময়ী মূর্ত্তির কাছে হৃদয়ের প্রার্থনা জানাই, সেই

চরণেই দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু উপহার দিয়ে সান্ত্বনা পাই, তাহাতে ক্ষতি কি? তার পর তাঁকে যদি আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের শৃঙ্গে চিন্তা করা সম্ভব হয় তবে মানুষের মত মূর্ত্তি গড়ে তাহাতে সেইরূপ কল্পনা করা সম্ভব কেন হবে না? বহুযুগের বহু সাধনা বলে এর সৃষ্টি হয়েছে, নিতান্ত মূল্যহীন্ ভাব্‌বেন না।" এত গুলি এক নিঃশ্বাসের কথা নির্ম্মলবাবু নীরবে শ্রবণ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "বেশ, আমি আর প্রতিমা পূজায় অবিশ্বাসী নই কিন্তু একটী কথা আছে,—তার মধ্যে আপনাকে সহায় হতে হবে।" "শুধু সহায় কেন?—আমি ত তাঁর পূজারই দাসী! আমার দ্বারা যা হয় করব! আপনি নিজের পিতৃপিতামহের গ্রামেই সেই পূজার আয়োজন করুন—আমি সেখানে উপস্থিত থাক্‌ব। আজ তবে মা 'কল্যাণেশ্বরীর' * চরণামৃত নিয়ে বাড়ী ফিরে যান। কেমন রাজী আছেন ত?" "আমি ত আগেই বলেছি—আমার ইচ্ছা আপনি জয় করেছেন!" সন্ন্যাসিনী একটু মৃদু হাসিয়া, মন্দিরের দিকে গেলেন। তখন বলী আরম্ভ হইয়াছে। রক্তরঞ্জিত প্রাঙ্গণের চারিদিক্ লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে—তার সঙ্গে পূজারীর জয়-নিনাদ—আসন্ন-মৃত্যু ছাগ শিশুর অন্তিম-কাকুতি স্বর এবং বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনিতে সেস্থান যেন অসুরমর্দ্দিনী চণ্ডির ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সন্ন্যাসিনী আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কি জানি একটা অজ্ঞাত বেদনায় বুক কাঁপিয়া উঠিল। মূর্ত্তিমতী-করুণা মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। নির্ম্মলবাবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

(ক্রমশঃ)

* ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ডলাইনের ধারে 'আলামপুর' নামক একটী ছোট ষ্টেশন হইতে অনতি দূরে একটী প্রাচীন দেবমন্দির আছে, তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'কল্যাণেশ্বরী'।

সাধুর বেশ।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, বি, এ)

হিমাচল পাদমূলে যমুনার উপকূলে
শ্যামপত্র নিবিড় কানন,
তা'র মাঝে করে বাস, বিজ্ঞ রাজা রুহিদাস
নবরাজ্য করিয়া স্থাপন।
দিন যায়, বর্ষ যায়, কালের লহরী ধায়
নাহি মানে নরের বারণ ;
যুবকে করিয়া বৃদ্ধ, দরিদ্রে করিয়া ঋদ্ধ
বেগে ধায়—বলেনা কারণ !
কালের কুহক-বলে নৃপতির ভাগ্যফলে,
কুষ্ঠব্যাধি করি' আক্রমণ,
হরিল সকল সুখ ; বাড়িল দেহের দুখ ;
রূপহীন সুন্দর গঠন !
রাজবৈদ্য আসি কয়' "এব্যাধি যা'বার নয় ;
পাই যদি রাজ-হংস-পিত্ত,
ঔষধ প্রস্তুত করি', দেখি'—বাঁচি কিম্বা মরি—
স্থির তব হয় কিনা চিত্ত।
বলি তাই মহারাজ, মানসের হংসরাজ
আনাইতে পার যদি কভু,
তবে তব এই দেহ, পাবে পূর্ব্ব বল স্নেহ ;
হংসহেতু কর যত্ন প্রভু।"
রাজার আদেশ লভি' অনুসরি' সান্ধ্যছবি
বহু ব্যাধ মানসেতে যায় ;
ব্যাধেরে দেখিয়া হংস পক্ষি-কুল অবতংস
ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়।

ধরিতে পারেনা হংস,　　　ফিরে' এল ব্যাধবংশ
　　নিবেদিল রাজার সদন—
"অক্ষম ধরিতে পক্ষী",　　　শুনি' চিন্তাকুল অক্ষি
　　হ'ল রাজা বিষণ্ন বদন ।
নিরজনে মন্ত্রী তবে,　　　বলে, "পুনঃ যাও সবে ;
　　সাধুবেশ করহ ধারণ ;
পারিবে ধরিতে পক্ষী,　　　মিষ্টদ্রব্যে যথা মক্ষী,
　　ইহা সত্য—বিহীন কারণ !"
মন্ত্রীবাক্য অনুসরি'　　　গেল সবে ত্বরাকরি,
　　গিয়া হংস মানসেতে পায় ;
স্থির সান্ত সরোজলে,　　　ক্রীড়া করে কুতূহলে,
　　অন্ধকার দিগন্তে ঘনায় ।
দেখিয়া সাধুর বেশ,　　　নাহি যায় অন্য দেশ,
　　এক স্থানে করে অবস্থান ;
তখন তাহারে ধরি',　　　পক্ষ দু'টী বন্ধ করি'
　　গিয়ে' করে রাজারে প্রদান ।
শুনিয়া বৃত্তান্ত সব,　　　অচকিতে অভিনব
　　হ'ল ভাব হৃদয়ে রাজার—
'সাধু বেশে ব্যাধ দেখি　　　দূরে না পলায় পাখী,
　　নাহি হিংসে বিশাল সংসার !
প্রকৃত সন্ন্যাসী হ'লে,　　　এবিশ্ব-ভূতল-তলে
　　অসাধ্য না রহে কিছু তা'র !—
দূরে যায় শোকভয়,　　　ঘৃণা-লজ্জা-মানচয়,
　　রোগ-জ্বালা অসীম অপার ।'
যমুনার কূলে কূলে　　　উর্ম্মিরাশি তান তুলে,
　　কত কথা কহে চিন্তিতেরে ।
ঢলিয়া পড়িছে রবি, .　　　তুষারে আঁকিয়া ছবি
　　ফুটাইয়া গত জীবনেরে ।
রাজা ছাড়ি' দিল হংস,　　　ত্যজিল সকল অংশ
　　—রাজ্যপাট ভূষণ বসন ,
'অনুসরি' সান্ধ্যছবি,　　　পথশ্রান্ত ক্লান্তরবি,
　　সাধুবেশে পশিল কানন ?

ত্যাগের পথে।

(শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্যাগ-ভোগের সমন্বয়বাদী—অস্থিমজ্জাগত দুরতিক্রম্য ত্যাগপ্রভাবের সহিত চিরাভ্যস্ত ভোগলিপ্সার একটা গোঁজামিল দিতে আজকাল বিশেষ ভাবে একদল লোকের সৃষ্টি হইয়াছে—ইঁহারা ত্যাগভোগের সমন্বয়-বার্ত্তা প্রচারক। ইঁহারা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে চাহেন। দুইটী সমান্তরাল রেখার মিলন বাঞ্ছার মত ইঁহাদের সমন্বয় বাঞ্ছা কেবল সেই স্থলেই সফলতা লাভ করিতে পারে, সেই দেশকালাদি সীমার অতীত প্রদেশে। আলো আঁধারের, অমাবস্যা পূর্ণিমার, দিবারাত্রির পাপপুণ্যাদির সমন্বয় সাধনও যদি সম্ভবপর হয় তবুও ত্যাগভোগের সমন্বয় সাধন বাস্তবজগতে সম্ভবপর নহে। জগতের ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে, যাঁহাদের বাক্য বা কার্য্য জগতে স্থায়িত্বের রেখা সম্পাতিত করিয়া গিয়াছে—তাঁহারা সকলই ত্যাগী ছিলেন—ত্যাগই তাঁহাদের জীবনাদর্শ ছিল। আর তাঁহাদের প্রাণপূর্ণ ত্যাগবাণীই যুগযুগান্তর ধরিয়া অক্ষয় শক্তিতে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশু" "ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরম" "বিষয়ান বিষবৎত্যজ"

"যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহি, যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম।

রব রজনী কভি নহি এক ঠাম॥"

"No one can serve both God and Mamnon at the same time" প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত ত্যাগবাণীর মধ্যেও ত কোথাও ত্যাগ ভোগের ব্যর্থ সমন্বয় প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। একাধারে ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ উপভোগের সাধ বা কল্পনা আকাশকুসুম। এটা আর যুক্তি দিয়া বুঝাইতে যাওয়া

নিষ্প্রয়োজন; উহা উপলব্ধির জিনিষ। কায়মনোবাক্যে চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে।

তারপর দেখা গিয়াছে যখনই যুগাবতারের শুভাবির্ভাবে জগতে ত্যাগের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তখনই এই দুর্নিবার গতি নিরোধ করিতে বা ইহার সহিত স্বার্থানুকূল স্বকল্পিত কৃত্রিম ত্যাগ ভাবের মিল দিয়া আপনাকে অবতার প্রতিপন্ন করিতে অল্পবিস্তর শক্তি জাগিয়াছে। মেকী অবতার আপন প্রভাব বিস্তার কল্পে চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই জলবুদ্‌বুদের মত কাল সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাসুদেব, দেবদত্ত প্রভৃতি মেকী অবতারগণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর এমন অবতার কয়েকটী দেখা দিয়াছিল। গোপাল নামক মেকী অবতার পূর্ব্ববঙ্গে সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থকার তাহাকে 'পাপিষ্ঠ' বলিয়া গালি দিয়াছেন। "সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল"।

যিশুখৃষ্ট পূর্ব্বাহ্ণেই ভক্তবর্গকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—Beware of false prophets, for many shall come in my name, saying I am Christ"। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এগুলি আবার অবতার-লীলার সাহায্যকারী লীলাপুষ্টকারী বলিয়া বোধ হয়। প্রায় প্রত্যেক অবতার-লীলার সঙ্গেই এরূপ মেকী অবতারের সম্মিলন পরিদৃষ্ট হয়। এও তাঁর ইচ্ছা! কেবল ইহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া এদের প্রভাবে প্রভাবিত না হইয়া ইহাদের গতিবিধি কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে ক্ষতি হয় না বরং লাভই হয়, আনন্দই হয়। তবে সর্ব্বোপরি এদের এলাকায় না যাওয়া, এদের তোয়াক্কা না রাখাই ভাল।

বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এ সকল মহতী বাণী ও অবস্থা আমাদের প্রাণে সর্ব্বদা জাগরূক রাখা অতীব প্রয়োজন। কারণ ইতিমধ্যেই একাধিক মেকী অবতার দর্শন দিয়াছে এবং আরও কয়েকটার অবতরণ বার্ত্তা অল্পবিস্তর বিঘোষিত হইয়াছে। তাই মহাসাগর সঙ্গমে মহামিলনের যাত্রী সাবধান! খুব সাবধানতার সহিত তোমার প্রত্যেক পাদবিক্ষেপ লক্ষ্য

করিয়া চলিতে হইবে। নয়ন মন মুগ্ধকর কতই না ভাব তোমাকে প্রলোভিত করিতে—বিপথগামী করিতে আসিবে। এই প্রতারকগণ (Pretenders) তোমাকে তোমার স্থূল দৃষ্টির অধিগম্য ত্যাগের কঠোরতা দেখাইয়া ত্যাগ ভোগের অলীক অসার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করিতে চাহিবে। একাধারে ভোগানন্দ ও জ্ঞানানন্দের স্বাদ মিটাইতে ভরসা দিবে, হয়ত আরও অগ্রসর হইয়া ত্যাগের অভিনয় দেখাইয়া ভোগের মধ্যেই তোমাকে টানিয়া লইবে। 'ভেম্পায়ার' পক্ষীরমত পাখার বাতাস দিয়া আরামে তোমায় ঘুমের কোলে লুকাইয়া রাখিয়া তোমার উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত অতি সুস্থাবস্থায় পরিণত হইলেও ত্যাগের পবিত্র রক্তটুকু নিঃশেষে পান করিয়া তোমাকে পঙ্গু করিয়া দিবে। তোমার পূত রক্ত প্রবাহের অলক্ষ প্রভাবে তুমি কেবল এপারের সমস্যা সমাধানের আশায় তৃপ্ত হইবে না, যে মীমাংসায়, যে সিদ্ধান্তে তুমি এপার ওপার বা অগত্যা কেবল পরপারের সমাধান না পাইবে তাহাতে তুমি আকৃষ্ট হইবে না; তাই ইহারা তোমাকে কৃত্রিম সমাধানের উপর খাঁটি বার্ণিশ লাগাইয়া ভুলাইতে চাহিবে। তাই আবার বলি সাবধান!

তোমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর যুগাবতার কে? যুগপ্রয়োজন কি? যুগের গতি কোথায়, কোন খাতে প্রবাহিত—নিয়ন্ত্রিত? মনমুখ এক করিয়া তাঁহার শরণাগত হও, তিনিই তোমার হাত ধরিয়া বিল্বমঙ্গলের মত ঠিক পথে লইয়া চলিবেন বহিশ্চক্ষু বন্ধ হইলেও অন্তশ্চক্ষু ফুটাইয়া দিবেন, গতিতে দিব্য শক্তি সঞ্চারিত করিবেন—তোমার মহাযাত্রা সফল হইবে—নিত্যবৃন্দাবনের নিত্যলীলা দর্শনে ধন্য হইবে।

তুমি আরও দেখিতে পাইবে তাঁহার আশ্রিত সন্তানগণ ক্ষণিক উত্তেজনাবশে আপাত জয়শীল হুজুগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মঘাতি অভিসারে যাত্রা করেন না—সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চরোলে বাদ্যযন্ত্রের তুমুল নিনাদে তাহাদের প্রাণের স্থির রাগিণী সময়ে অশ্রুত হইলেও তাঁহারা আদর্শ হইতে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হন না। তাঁহারা আরও জানেন যে, তাঁহাদের আদর্শ চরম, চিরস্থায়ী ও বিশ্ববিজয়ী। তাঁহারা আরও জানেন যে, দেহস্থিত রক্তস্রোত বিশুদ্ধ সতেজ না হইলে বাহিরের মলিনতা, অপরিচ্ছন্নতা

শত মাজাঘসা, সহস্র মলম প্রয়োগে স্থায়ীভাবে বিদূরিত হইবে না, হইতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে তাহারই সন্ধানে অধ্যাবসায়শীল, যাহা পাইলে মানুষ হওয়া যায়। মানুষ না হইলে মনুষ্যোচিত গুণনিচয় দেহাবলম্বনে স্থায়ীফলপ্রসূ হয় না, পোষাকের মত দুদিন আসিয়া ছিঁড়িয়া যায়—বায়ু কর্পূরের মত আবরণ বিহীন শিশি হইতে উড়িয়া যায়। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণাবলী সভাসমিতি বা বক্তৃতাদির দ্বারা লাভ হয় ন'—এগুলি সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। 'ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য' বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? স্পষ্ট দেখিতেছি তুমি ব্রহ্মচর্য্য হইতে বহুদূরে! একি যে সে অবস্থা—"ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্বিষ্ণু স দেব নতুমানবঃ" তুমি কি কেবল বক্তৃতা করিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া একদিনেই ইহা লাভ করিবে? গাঁজা নাম করিলেই কি নেশা হইবে? কাটিতে হইবে টিপিতে হইবে—কল্কিতে দিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া ধূমপান করিতে হইবে—তবেত! তোমার চিরাভ্যস্ত ভোগাভ্যাসের উপর এ সকল ত্যাগমূলক ভাবরাজির প্রলেপ মাখাইয়া আপনাকে ও অপরকে কয়দিন প্রতারিত করিতে সমর্থ হইবে? চরিত্রভ্রষ্ট তুমি ব্রহ্মচর্য্যের ভান করিয়া কয়দিন টিকিবে? তোমার ভিতর হইতে যাহা আসিবে না—বাহির হইতে ধার করিয়া কয়দিন বজায় রাখিতে পারিবে? একমাস, দুইমাস—না হয় বৎসর। এর বেশীও নহে? কিন্তু ঐ দেখ সেই আশ্রিত সন্তানগণ তাহাদের যাহা আছে তাহা খাঁটি এতটুকু ভেজালও তাতে নাই। তাহারাই থাকিবে! প্রলয়ে সমগ্র বিশ্ব বিধ্বংস হইয়া গেলেও—মহাবীজাকারে! কারণ তাহারা অক্ষয়! অব্যয়!!

বৈষ্ণবগ্রন্থে একটী সুন্দর বাক্য আছে :—

"আমারই গৌরাঙ্গের নামে নাচিয়া গাহিয়া কতজন রতন হইবে।
আমারই গৌরাঙ্গের নামে নাচিয়া গাহিয়া কতজন রৌরবে যাইবে॥"

(পতিতপাবন গৌরাঙ্গ নামে)　　(ক্রমশঃ)

দুটী চিত্র।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

গর্জ্জে ভৈরব ফেনিল সিন্ধু
কল্লোল রোলে বধির কর্ণ।
পর্ব্বত চূড়া লঙ্ঘি ঊর্ম্মি
দিক্ দেশকাল করিছে চূর্ণ। ১

উন্মাদ বায়ু যুঝিছে রঙ্গে,
কোটি তরঙ্গ গরজে তায়।
রুদ্র উরসি তাণ্ডবপরা,
মহাকালী যেন নগন কায়॥ ২

জীমূতমন্দ্রে কম্পে মেদিনী
স্তিমিত স্তোমে গরাসে সৃষ্টি;
অস্তি-নাস্তি লুপ্ত সকলি
হস্তিশুণ্ডে বরষে বৃষ্টি॥ ৩

প্রেত রুদ্র ভৈরোঁ বিমানে
নাচে ;—ব্যোম ব্যোম আকাশ গর্জ্জে!
ভীরু কাপুরুষ ভয়ে মূরছিত ;
দিশি নিশি কাঁপে ডমরু তূর্য্যে। ৪

ভ্রষ্টকক্ষ সূর্য্য চন্দ্র
ছোটে গ্রহতারা—বেগপ্রচণ্ড।
নিরোধে নিমিষে প্রলয় দৃশ্য
মহাকাল—হাতে ত্রিশূলদণ্ড॥ ৫

অভীরভী নাদে ধ্বনিল বিশ্ব
মৃত দেহে পুনঃ উঠিল স্পন্দ।
তুঙ্গ লহরী শীর্ষে নাচিছে
সন্ন্যাসী গুরু বিবেকানন্দ॥ ৬

কমল-গন্ধ-অন্ধ ভোমরা
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জি ধায়।
পূর্ণ ইন্দু প্লাবী জোছনা
তরঙ্গে তরঙ্গে উছলি যায়॥　৭
পীক-পঞ্চ কুজিত কুঞ্জে
উঠিছে বংশী মধুর তান্।
সদ্যঃ স্ফোট পদ্ম পরাগে
ধূসরিত কেলী-বন-বিতান॥　৮
স্নিগ্ধ-মধুর-কোটি কমল
গন্ধ মোদিত ধরণীতল।
শীকর সিক্ত মলয় বায়ু
বহিছে মুক্ত প্রেম বিহ্বল॥　৯
নাহি ভীতি জরা জন্ম মৃত্যু
প্রেমবিভোলা সবি বিকাম।
ঢল ঢল ঢল তরল অক্ষি
ঝরিছে অশ্রু মুকুতা দাম॥　১০
দ্বন্দ্বভাব নষ্ট সকলি
নিরমান-মোহ-চরণভয়।
দেব দানব মানব মিলিত
গাইছে উচ্চে প্রেমের জয়॥　১১
নষ্ট-ধ্বান্ত-ভ্রান্তি-বিরহ
শান্তি রাজিত মেলন মঞ্চে।
দিশি নিশিকাল ভেদভগ্ন
মগ্ন বিশ্ব প্রেম প্রপঞ্চে॥　১২
নিরবাধ স্রোত স্নাত কমলে
রঙ্গে ভঙ্গে ব্রজরাখাল।
নাচিয়ে নাচিয়ে ভাসিয়ে যায়
দেব গন্ধর্ব্ব ধরিছে তাল॥　১৩
মধ্য কমলে ব্রজরাজ সনে
কে নাচিছে ওই সন্ন্যাসী সাজ।
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ নূপুর চরণে,
মোদেরি বুঝি বা "রাখালরাজ"॥　১৪

ভারতীয় আচার্য্যগণ ও সমন্বয়

(শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী)

কালক্রমে কামনাত্মক ধর্ম্মের বাহুল্যে—যাগ্ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের ঐকান্তিক প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ সত্তা বিলুপ্ত হইল.—ধর্ম্মের নামে প্রেমভক্তিভাবরস শূন্য শুষ্কতা সকলের হৃদয় অধিকার করিল। পরিশেষে অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, ঐহিক ও পারত্রিক সুখের টানে যাগ, যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্মকাণ্ডকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া সমাজ সাবাস্ত করিয়া লইল। হিন্দুধর্ম্মের যে সার্ব্বভৌমিক আদর্শ—সচ্চিদানন্দরূপ মহাসমুদ্রে আপনার ক্ষুদ্র মানবীয় অস্তিত্বটুকু মিশাইয়া ফেলা—তাহা কর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর বাহুল্যে সমাজ বিস্মৃত হইল.—জন্মজন্মান্তর 'একটানা' সুখসৌভাগ্য লাভ করাই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। হিন্দুর জাতীয় জীবন এই সময় এমন বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ কর্ম্মবহুল হইয়া গিয়াছিল যে, ভগবান বুদ্ধের পরবর্ত্তী হিন্দুর বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বেদ যে কেবল কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত তাহা নহে; ইহার মধ্যে সকল ধর্ম্মমত ও পথের সার তত্ত্ব নিহিত আছে. কিন্তু বেদকে কর্ম্মকাণ্ড বাহুল্যে বীতশ্রদ্ধ শঙ্করাচার্য্য কেবল সংসার প্রতিপাদক,—শ্রীধর স্বামী কর্ম্মফল প্রতিপাদক এবং আনন্দগিরি কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম্মভার-প্রপীড়িত ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া অধ্যাত্মতত্ত্বান্বেষী কতিপয় ঋষি ভগবানকে একমাত্র উচ্চস্তরের জ্ঞানগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ বিচারবিতর্কে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন, তাঁহাদের এই প্রয়াসের অমৃত-প্রসূ ফল ভারতের বিখ্যাত ষড়দর্শন শাস্ত্র। দর্শন শাস্ত্রে বেদের প্রামাণ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে। মহান উদ্দেশ্য সাধনার্থ কার্য্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিলেও উহা কেবল উচ্চস্তরের জ্ঞানীদেরই অধিগম্য বলিয়া সমাজের আপামর জনসাধারণের যথার্থ আধ্যাত্মিক হিতার্থে নিয়োজিত হইতে পারিল না। অধিকন্তু চার্ব্বাক

দর্শনের "শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য"* প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদ প্রচারের ফলও সমাজের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিল।

ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক ধর্ম্ম বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইলে কতিপয় অদূরদর্শী সমাজ নিয়ন্তা ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি ব্রাহ্মণেতর জাতির উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন এবং সমাজের উপর অদ্ভুত প্রকারের "খামখেয়ালী" বিধি ব্যবস্থার বোঝা চাপাইয়া দেন। ভগবান্ বুদ্ধের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে মন্বাদি শাস্ত্র-কর্ত্তা নামধেয় তথাকথিত ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব অত্যাচার ও অনাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে 'মগের মুলুক' বাসীরাও উহা কল্পনায় আনিতে পারে না ?†

* সাঙ্খ্য প্রবচন সূত্র, ১ম অধ্যায়, ৪৪ সূত্র। সূত্রার্থ যথা :— "শূন্যই তত্ত্ব অর্থাৎ শূন্যকেই স্থায়ী বা সার বলা যায়। ভাব বিনাশধর্ম্মী। বিনাশকে শূন্য বলা যায়। সুতরাং প্রথমে শূন্য ও অন্তেও শূন্য কাজেই মধ্যস্থিত যৎকিঞ্চিৎ কাল, তাহাও শূন্য। অতএব প্রতীত হইল যে, শূন্যই পরমার্থ।" (পূর্ব্ব-পক্ষ)

† পাঠকগণ মনুসংহিতা, যমসংহিতা ও পরাশর সংহিতাদি নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিলে এ বাক্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচয় পাইবেন। প্রমাণ স্বরূপে আমরা কেবল মনুসংহিতা হইতে শূদ্র জাতির প্রতি অত্যা-চার ও অবিচার মূলক বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কতিপয় বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১। "যেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরণুশাসনং॥

অর্থ—"অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতির কোনও ব্যক্তিকে প্রহার করিবে তাহার "সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিতে হইবে।"

২। "পাণি মুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।"
„ পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদন মর্হতি।"

অর্থ—"শূদ্র শ্রেষ্ঠ জাতীর ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য যদি হস্ত কিম্বা দণ্ড উত্তোলন করে তাহা হইলে শূদ্রের হস্ত ছেদন করিয়া দিতে

যাহা হউক, বেদ-বেদান্ত, দর্শনের ধর্ম্ম কালক্রমে বিকৃতাকার ধারণ করিয়া ভগবান্ বুদ্ধের আবশ্যকতা আনয়ন করিল। মহাত্যাগী বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধদেব যাগ, যজ্ঞ, ব্রহ্ম ও দেবতা প্রভৃতিকে তদীয় ধর্ম্মরাজ্যের সীমানার বহির্ভূত করিয়া দিয়া জীবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ নির্ব্বাণ-মোক্ষ প্রচার করিলেন। তিনি বেদাদি কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর না করিয়া তীব্র পুরুষাকার প্রভাবে নিজ জীবনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করিয়া জন্মজরারোগ শোক ও মৃত্যু পাশাবদ্ধ জীবের জন্য পরম শান্তি বা নির্ব্বান মোক্ষ, 'মা হিংসাৎসর্ব্বভূতানি মৈত্র করুণ এবচ', মায়াবাদমূলক বৈরাগ্য, কর্ম্মফলকে সুখ-দুঃখের একমাত্র কারণ জানিয়া উহার উৎকর্ষ বিধানার্থ নীতি ও পবিত্রতা প্রভৃতির মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব উপনিষদেরই মতবিশেষ সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে এক অভিনব আকারে প্রচার করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস না থাকিলেও শ্রদ্ধাহীনতা ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ ও মায়াবাদ প্রভৃতি অনেক বিষয় তিনি অবিকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মতের প্রধান বিশেষত্বটুকু তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটককে স্বামী বিবেকানন্দ গীতার স্থানীয় বলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন *।

হইবে; যদি কোপ বশতঃ পদদ্বারা প্রহার করে তাহা হইলে পদচ্ছেদন করিতে হইবে।"

৩। "শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেববা।
দাস্যায়ৈবহি স্বষ্টোসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥"

অর্থ—"শূদ্র ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক, ব্রাহ্মণ তাহাকে ধরিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন; কারণ ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবার জন্যই ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

* ত্রিপিটক তিন অংশে বিভক্ত। (১) 'সূত্রপিটক' নামক প্রথম খণ্ডে বুদ্ধের কথোপকথন; (২) 'বিজয়পিটক' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে ভিক্ষুদের পালনীয় নিয়মাবলী; এবং (৩) 'অভিধর্ম্ম পিটক' নামীক তৃতীয় খণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব সমূহ সন্নিবিষ্ট আছে।

কালক্রমে মত বৈষম্য ধ্বংসশীল চির উদার হিন্দুধর্ম্ম আপনার বিরাট বদন ব্যাদান করিয়া ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত মতগুলি গ্রাস করতঃ আপনার ভিতরে হজম করিয়া পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা, মহাসমন্বয় ও ঔদার্য্য গুণে বিশ্ববিজয়ী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্ম বেদবিরোধী হইলেও হিন্দুর উদারহৃদয় মনস্বিগণ বুদ্ধদেবকে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার রূপে হিন্দুধর্ম্মে স্থান দান করিলেন। প্রাচীন কালের বেদ, উপনিষদ্, গীতা, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতির ধর্ম্মে যে বিকৃত ভাব যে, সংকীর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের উদার নীতি প্রভাবে তাহা তিরোহিত হইল। কালধর্ম্মের বিকৃত বেদের বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ যজ্ঞাদি ভোগমূলক কর্ম্মকাণ্ডের স্থান—বিহার ও সংঙ্ঘারামের জীবসেবারূপ নিষ্কামকর্ম্ম অধিকার করিল, উপনিষদের মায়াবাদ সংসারের অসারতা জ্ঞানে এবং ব্রহ্মবাদ নির্ব্বাণে যাইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিল, যড় দর্শনের জন্মান্তর বাদ, কর্ম্মফল বাদ ও মুক্তি প্রভৃতি এক অভিনব আকার প্রাপ্ত হইল এবং ধর্ম্মের নামে ব্যক্তি, জাতি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং সামাজিক ভেদবৈষম্য অত্যাচার ও অবিচার অন্তর্হিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় নয় শতাব্দী কাল আপন স্বাতন্ত্র্যই রক্ষা করিয়া সগৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষে বিরাজিত ছিল। ভারতের একছত্র সম্রাট

৪। বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্রব্যোপাদান মাচরেৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহিসঃ॥"

অর্থ—"শূদ্র যদি কোন দ্রব্য উপার্জ্জন করে ব্রাহ্মণ অসঙ্কোচে সমস্তই কাড়িয়া লইবেন, কারণ শূদ্রের ধনে অধিকার নাই; সে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে সে সমুদায় তাহার প্রভুর।"

৫। "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ নচ সংস্কার মর্হতি।
ন চাস্যাধিকারো ধর্ম্মেহস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং॥"

অর্থ—"যে অখাদ্যাদি ভোজনে ব্রাহ্মণের পাতক, তাহাতে শূদ্রের পাতক নাই; শূদ্রের কোন প্রকার ধর্ম্ম-সংস্কার নাই; তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই, সুতরাং ধর্ম্ম হইতে নিষেধও নাই।"

ইত্যাকার অসংখ্য বিধি-ব্যবস্থা আছে। অবশ্য আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, সংহিতাদি স্মৃতি শাস্ত্রে ভাল বিষয় কিছুই নাই। পরন্তু ইহাতে অনেক ভাল বিষয়ও আছে।

অশোক ও হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি প্রথিতনামা রাজচক্রবর্ত্তীদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম অর্দ্ধ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অদ্যাবধি পৃথিবীর প্রায় পঞ্চ দশ কোটি মানব ভগবান্ বুদ্ধের অত্যুদার ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিতেছে। দুঃখের বিষয় বৌদ্ধধর্ম্ম তদীয় জন্মভূমি ভারতবর্ষে অধিককাল আপন স্বতন্ত্র-গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না।

বৌদ্ধধর্ম্মের উদারতা আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও মহাসমুদ্রের ন্যায় গভীর হইলেও উহা অজ্ঞেয়বাদমূলক বলিয়া অসম্পূর্ণ—নিরীশ্বরবাদমূলক বলিয়া প্রাণ শূন্য। বুদ্ধের 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত বটে কিন্তু উহা জীবজগতের আত্মরূপী ভগবানে পৌঁছিয়া পূর্ণত্ব লাভ করে নাই। কালক্রমে ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত নির্ব্বাণ মোক্ষের স্থান কর্ম্মকুণ্ঠ ও 'লোক দেখান' মোক্ষকাম অধিকার করিয়া বসিল; বৌদ্ধ হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ই প্রাণহীন বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব বিস্মৃত হইল, এবং শ্রমণগণ ধর্ম্মের নামে শ্মশানে-মশানে নানা প্রকার অনাচারে মত্ত হইয়া পড়িলেন।

ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক মহাবীর নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার 'কৈবল্য' লাভ করিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। ধর্ম্মপ্রাণ পার্শ্বনাথ এই ধর্ম্মের ঐতিহাসিক প্রবর্ত্তক। জৈনধর্ম্ম প্রায় সর্ব্বাংশেই বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরূপ হইলেও ইহা প্রতিমা পূজার পক্ষপাতী জীব মাত্রের প্রতিই সম্পূর্ণ অহিংসা এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। প্রাণিগণের হিত সাধনোদ্দেশ্যে জৈনগণ ভারতের অনেকস্থানে 'পিঁজরাপোল' স্থাপন করিয়াছেন। তীর্থঙ্করদের * প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এই ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। জৈনগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক দুই সম্প্রদায় ভুক্ত। জৈনধর্ম্মগ্রন্থ আগম, অঙ্গ, সূত্র ও পূর্ব্বী ইত্যাদি নামে অভিহিত।

বৌদ্ধ ও তৎপ্রভাবাপন্ন জৈনধর্ম্ম বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিহার প্রদেশবাসী স্বনামপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার শিষ্যবর্গ বৈদিক কর্ম্মবাদ পুনঃ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কুমারিল ভট্টের কর্ম্মবাদে হতশ্রী বৌদ্ধধর্ম্ম আরও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, অবশেষে তদীয় শিষ্য

* যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া কতিপয় বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী হিন্দুনরপতির সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্মকে তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিতাড়িত করেন। বেদোক্ত ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে তিনি জগতের কার্য্যকারণরূপী নিগুর্ণ ব্রহ্মের অধিষ্ঠিতত্ব প্রমাণ করিতেই প্রধানতঃ যত্নপর ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ দর্শনভাবাপন্ন তাৎকালীক নিরীশ্বরবাদের নিরাসন কল্পেই এই প্রকার মত প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মায় ও কর্ম্মফলবাদকে তিনি অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়া সাঙ্খ্য দর্শনের প্রকৃতি ও যোগের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপনিষদুক্ত সগুণ-ব্রহ্মের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন "জগন্মিথ্যেতি;" ভগবান শঙ্কর বেদান্ত সাহায্যে বলিলেন—"যদা ইত্যেষা ভেদবুদ্ধিঃ তদৈব পরমার্থতা সত্যার্থজ্ঞতা সম্পন্নেত্যর্থঃ" অর্থাৎ 'মনুষ্য যৎকালে ঈদৃশ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয় তৎকালেই তাহার সত্যপদার্থে জ্ঞান জন্মে বা প্রজ্ঞানের উদয় হয়'। সত্য ও মিথ্যা দুটী পরস্পর এরূপ সম্বন্ধাবদ্ধ যে একটীকে ছাড়িয়া অপরটী থাকিতে পারে না। সত্য জ্ঞান না হইলে তোমার কখনও মিথ্যা জ্ঞান হইতে পারে না এবং মিথ্যাজ্ঞান না থাকিলেও সত্য জ্ঞান আসিতে পারে না। অতএব সে সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান হওয়ায় তোমার মিথ্যা জ্ঞান আসিল; অতএব তাহাকে নির্ব্বানই বল, শূন্যবাদই বলে, অথবা তৎসম্বন্ধে কোন কিছু ভাষায় প্রকাশ নাই কর, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাই ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যেতি।'

(ক্রমশঃ)

বাণী বন্দনা।

(শ্রীভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—)

তোমারি কৃপায়, ভারতী মাতা, ভারত তোমায় পূজিল আগে।
সফল হইল, সাধনা তাহার, লভিল কীর্ত্তি বিপুল ভবে॥
তুষিল তোমায়, প্রাচীন ভারত, ভোগ বিলাসে বিরত থাকি।
ছড়াল জ্ঞানের, ময়ুখমালা, অন্ধ জগৎ মেলিল আঁখি॥
জয় মা ভারতি, বীণাবাদিনি, ললিত ঝঙ্কারে ধর গো তান।
উঠুক আবার ভারত জুড়িয়া জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান॥

তুমি না নাশিলে, ভ্রান্তিতমসা, নরের দুঃখ হয় কি দূর।
বীণাবাদিনি, যন্ত্রে তোমার, উথলে তত্ত্ব জ্ঞানের সুর॥
তাইত ভারত, বাহ্য জগৎ, ভুলিয়া করিল তোমার ধ্যান।
রচিল কত, মুক্তিশাস্ত্র জগত-জীব পাইল ত্রাণ॥
জয় মা ভারতি, বীণাবাদিনি, ললিত ঝঙ্কারে ধরগো তান।
উঠুক আবার, ভারত জুড়িয়া, জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান॥

ঋষির আশ্রমে বিজন বনে, গৃহীর আলয়ে বৃক্ষতলে।
পূজিল তোমায়, বিদ্যারূপিনি, ভারতের যত মনীষিদলে॥
সাধন-তুষ্টা, তুমি মা জ্ঞানদা ভক্ত নিকরে করিলে দান।
মুক্তি স্বরূপা ব্রহ্মবিদ্যা---মিটিল তাঁদের তৃষিত প্রাণ॥
জয় মা ভারতি, বীণা বাদিনি ললিত ঝঙ্কারে ধরগো তান।
উঠুক আবার, ভারত জুড়িয়া জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান॥

নিষ্কল সাধনা, ব্যর্থকামনা তুষিতে জ্ঞানদা পুষ্প দলে।
নিত্য ভক্তির করে যে অর্চ্চনা ব্রহ্মচর্য্য সাধন বলে॥
তাঁহারি পূজায়, হও মা তুষ্ট, সকল ইষ্ট করগো দান।
জড় বুদ্ধি, নাশিয়া তাঁহার কণ্ঠে কর গো অধিষ্ঠান॥
জয় মা ভারতি, বীণাবাদিনি, ললিত ঝঙ্কারে ধরগো তান।
উঠুক আবার, ভারত জুড়িয়া জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান॥

ভারতী পূজার পুণ্য ক্ষেত্র ভারত ভূমির সন্তান মোরা।
ভুলে গেছি মাগো, প্রকৃত সাধনা ইন্দ্রিয় বিলাসে-আত্মহারা॥
বাজাও জননি, বীণাটি আবার, শিহরি' উঠুক্ অসার প্রাণ।
মোহের গভীর তিমির নাশিয়া উজলি' উঠুক্ সত্য জ্ঞান॥
জয় মা ভারতি, বীণাবাদিনি, ললিত ঝঙ্কারে ধরগো তান।
উঠুক আবার ভারত জুড়িয়া জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান॥

উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

যে বাক্যের পদার্থ অন্য প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না তাহাকে আগম প্রমাণ বলে। যেমন উপনিষৎ।

উপনিষৎ পঞ্চবিধ। (১) লক্ষণপর :(২) ঐক্যপর (৩) নিষেধপর (৪) উপাসনাপর (৫) সৃষ্টিপর।

(১) লক্ষণপর শ্রুতি।

লক্ষণ দ্বিবিধ, তটস্থ ও স্বরূপ। স্বরূপ অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ। আর একটীকে অপেক্ষা করিয়া কোন জিনিষ বুঝানকে তটস্থ লক্ষণ বলে। যেমন জগৎকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্ম বুঝান হয়।

(ক) তটস্থ লক্ষণ পর শ্রুতি।

(১) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।

যিনি সামান্যরূপে সব জানেন, বিশেষরূপে সব জানেন, যাঁর জ্ঞানময় চেষ্টা।

(২) সর্ব্বস্য বশী

ব্রহ্মা ইন্দ্র সব যাঁর বশে আছেন।

(৩) এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

(৪) যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ পৃথিবী যস্য শরীরং পৃথিবী যং ন বেদ যঃ পৃথিবীং অন্তরঃ যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ॥

যিনি পৃথিবীতে রহিয়া পৃথিবীর অন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাঁর শরীর, পৃথিবী যাঁকে জানে না, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ হইয়া, পৃথিবীকে নিয়মন করিতেছেন, সেই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।

(৫) স অকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।

তিনি কামনা করিলেন কিরূপে বহু হইব, উৎপন্ন হইব।

(৬) স ঐক্ষত।

তিনি আলোচনা করিলেন।

(৭) তৎ তেজঃ অসৃজত।

তিনি প্রত্যক্ষ তেজ সৃষ্টি করিলেন।

(খ) স্বরূপ লক্ষণ পর শ্রুতি।

(১) সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ অর্থাৎ অব্যাভিচারী বিকার শূন্য। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞপ্তি-স্বরূপ, অববোধ স্বরূপ। তিনি সান্ত নহেন, অনন্ত।

(২) বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ।

(২) ঐক্যপর শ্রুতি।

(১) তত্ত্ব স

তুমিই সেই ব্রহ্ম। এটী সামবেদীয়, ছান্দগ্যান্তর্গত।

(২) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।

জ্ঞাতাই ব্রহ্ম। এটী ঋগ্‌বেদীয়, ঐতরেয়ান্তর্গত।

(৩) অহং ব্রহ্মাস্মি।

আমিই ব্রহ্ম। এটী যজুর্ব্বেদীয়, বৃহদারণ্যকান্তর্গত।

(৪) অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

এই আত্মা ব্রহ্ম। এটী অথর্ব্ববেদীয়, মাণ্ডুক্যান্তর্গত।

এই চারটীকে মহাবাক্য বলে।

(৩) নিষেধপর শ্রুতি।

অস্থূলম্ অননু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্।

তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্মনহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।

তাঁর শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই।

(৪) উপাসনাপর শ্রুতি।

য আত্মা অপহতপাপ্মা স অন্বেষ্টব্যঃ স জিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥ আত্মা ইতি এব উপাসীত ॥ আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত ॥

আত্মা নিষ্পাপ তিনিই অন্বেষণীয় তাঁহাকেই জানিবে। আত্মাই ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে। এই লোকই আত্মা এইরূপে উপাসনা করিবে।

(৫) সৃষ্টিপর উপনিষৎ।

যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।

যাঁহা হইতে এই সকল জীব জন্মিয়াছে, জন্মিয়া যদ্দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইবে, যাঁহাতে লয় হইবে তিনিই ব্রহ্ম।

কর্ম্মপর শ্রুতি।

(১) যাবৎ জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ।

যতকাল জীবিত থাকিবে অগ্নিহোত্র হোম করিবে।

(২) তম্ এতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।

এই পরমাত্মাকে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা, দান দ্বারা, তপস্যাদ্বারা, অনাশক অর্থাৎ সন্ন্যাসদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।

সর্ব্বশ্রুতির তাৎপর্য্য।

আচার্য্য দেখাইয়াছেন, যদি চ এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রুতি আছে বটে, কিন্তু সমস্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা অদ্বৈত ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। কর্ম্মপর শ্রুতির তাৎপর্য্য এই সব কর্ম্ম করিলে 'বিবিদিষা' অর্থাৎ তাঁকে জানিবার ইচ্ছা হয়। উপাসনাপর শ্রুতির তাৎপর্য্য, উপাসনা করিলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মায় ও চিত্তশুদ্ধি হয়। সৃষ্টিপর শ্রুতির তাৎপর্য্য বৈরাগ্য উৎপাদন করা। অর্থাৎ সর্ব্বদা জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি প্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য আসে। নিষেধপর শ্রুতির তাৎপর্য্য যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব নিরংশ, তাঁতে কোন রূপ জড়ত্ব নাই। ঐক্যপর শ্রুতির তাৎপর্য্য যে, ব্রহ্ম

ছাড়া অন্য আত্মা নাই। সত্য বটে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব এক হইতে পারে না কিন্তু চৈতন্যাংশে উভয়ের ঐক্য হইতে পারে অর্থাৎ জীবত্ব ঈশ্বরত্ব রূপ বিশেষণ ত্যাগ করিলে বিশেষ্য এক বুঝা যাইতে পারে।

লক্ষণপর শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিবিদিষা, ঐকাগ্র্য, বৈরাগ্য এগুলি সাক্ষাৎ অদ্বৈতপর না হইলেও পরম্পরা অদ্বৈতপর, কারণ ইহার দ্বারা অদ্বৈত বুদ্ধি হয়। এই রূপে আচার্য্য দেখাইয়াছেন সকল শ্রুতি অদ্বৈতপর অর্থাৎ নিগু ণ ব্রহ্মকে প্রতি পাদন করিতেছে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের উপদেশ।

অনাদিকাল হইতে অদ্বৈত বাদ প্রচলিত। মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে অদ্বৈত বাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা শ্রীগৌড়পাদ স্বামী রচনা করেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য উহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন মাণ্ডুক্যোপনিষদের অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥

এই আত্মাব্রহ্ম। জীবাত্মাই ব্রহ্ম।

আত্মা চতুষ্পাৎ ॥

আত্মার চার অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়।

জাগরিত স্থানঃ স্থূলভুক্ * * * বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।

জাগ্রত অবস্থায় আত্মা স্থূল বিষয় অনুভব করেন।

তাহাকে বৈশ্বানর বলা যায়। অর্থাৎ স্থূল শরীরাভিমানী।

স্বপ্নস্থানঃ প্রবিবিক্তভুক্ * * * তৈজসঃ দ্বিতীয় পাদঃ।

স্বপ্নাবস্থায় আত্মা সূক্ষ্মবিষয় অনুভব করেন। তাঁহাকে তৈজস বলা যায়। তৈজস অন্তঃকরণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী।

সুষুপ্তস্থানঃ আনন্দভুক্ * * * প্রাজ্ঞঃ তৃতীয় পাদঃ।

সুষুপ্তি অবস্থায় তিনি কেবল আনন্দ অনুভ করেন।

সুষুপ্তিকালে রোগী আরোগী হয়, শোকার্ত্ত শোক ভুলিয়া যায়। সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর থাকে না, কেবল অজ্ঞান থাকে। অজ্ঞানকে কারণ শরীর বলে।

প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে।
স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥

তুরীয় অবস্থায় প্রপঞ্চের লয় হয়, তখন তিনি শান্ত মঙ্গলময় অদ্বৈত। তাঁহাকে চতুর্থ বলে। তিনিই আত্মা তিনিই বিজ্ঞেয়।

এই কয়টী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে, জাগ্রত অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম থাকে; স্বপ্নাবস্থায় স্থূল থাকে না, কেবল সূক্ষ্ম থাকে; সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই থাকে না, মাত্র অজ্ঞান বা কারণ থাকে। আর তুরীয় অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কিছুই থাকে না। স্থূলের সূক্ষ্মে লয় হয়; সূক্ষ্ম অজ্ঞানে লয় হয়; অজ্ঞান তুরীয়ে লয় হয়। তুরীয় অবস্থাই প্রকৃত আত্মা। অতএব আত্মাতে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা ত্রয় নাই। অর্থাৎ আত্মা স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে এবং অজ্ঞান বা কারণ নহে। তিনি শান্ত শিব (মঙ্গলময়) অদ্বৈত। কোন রূপ দ্বৈত তাঁতে নাই। তিনি অস্থূল অনণু অদ্রেশ্য অগ্রাহ্য অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত। শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। বাঙ্গালা ভাষায় অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কুলাচার দেশাচারকে ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া আমরা আমাদের যথার্থ ধর্ম্ম যাহা তাহা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ইত্যবসরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতীয় ধর্ম্মোদ্যানে প্রবেশ করিয়া অযথা ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের দ্বারা সে উদ্যানের শোভা সম্পদ একেবারে উৎসন্ন করিতে বসিয়াছিলেন। লেখকের ভাষায় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব। "ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা না করিয়া কোনও গ্রন্থের স্থলবিশেষ দেখিয়াই ঐরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, এবং এরূপ সিদ্ধান্তকেই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমাদের মনে হয় জাতীয় ইতিহাস অন্য জাতির

পক্ষে লিখা অসম্ভব। জাতীয় জীবনের উপাদান স্বজাতি যেরূপ বুঝিতে পারে, সেরূপ অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। * * ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তই (শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়) বৈজ্ঞানিক ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এ ব্যাধি এখনও দেশ হইতে বিদূরিত হয় নাই। দেশের ইতিহাস স্বজাতী ও স্বদেশী ব্যক্তিই লিখিতে সমর্থ। ঐতিহাসিক ব্যক্তির হৃদয় দেশীয় ভাবে ভাবিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদেশী ও বিজাতীর পক্ষে তদ্দেশীয় প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব।"

উদাহরণ স্বরূপে লেখক বলেন "বেদান্ত সূত্রের শঙ্কর ও রামানুজ ভাষ্যের অনুবাদক ডাক্তার থিব (Dr. Thibaut) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই শ্রুতি ও সূত্রসম্মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * * * ডাক্তার থিব তাঁহার সহজাত সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম করা এক প্রকার অসম্ভব।

"They (Upanishads and the Sutras) do not set forth the distinction of a higher and lower knowledge of Brahman; they do not acknowledge the distinction of Brahman and Iswara in Sankara's sense; they do not hold the doctrine of the unreality of the world; and they do not, with Sankara, proclaim the absolute identy of the individual and the highest self." *

তাঁহাদের পক্ষে দেশীয় দর্শনের প্রভাব অতিক্রম করাও সম্ভব নহে। আরও একটি কারণ ইঁহার অন্তর্নিহিত খৃষ্টান ধর্ম্ম। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে তদ্‌ধর্ম্মের প্রতি সমধিক আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক।"

কিন্তু এ বিষয়ের আর একটা দিক আছে। বিদেশীর পক্ষে বেদান্ত আলোচনায় ভ্রম-প্রমাদ খুব সম্ভব বলিয়া তাহাদের ঐ শাস্ত্র আলোচনা করিতে কেহ নিষেধ করিতে পারেন না। সার্ব্বজনীন বেদান্ত ধর্ম্ম দেশ-কাল-পাত্র-জাতি-বর্ণ বা ধর্ম্মকে অপেক্ষা করে না। সূর্য্যের আলোকে

* (ইহা সম্পাদক বা লেখককর্ত্তৃক উপযুক্ত মত সমর্থনের জন্য George Thibaut র বেদান্ত সূত্রের অনুবাদের ভূমিকার ১০০ শত পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে)।

যেমন সকলের অধিকার বেদান্তে তেমনি মনুষ্য সমাজের সকল অঙ্গের অধিকার আছে। শিশু উঠিয়া পড়িয়া তবে গমন করিতে শিখে—এই উদাহরণ তেমনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পক্ষে প্রযুক্ত। প্রাচীন শাস্ত্র প্রচার সম্বন্ধে যে ভারতবাসী তাঁহাদিগের নিকট ঋণী নহে একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।—প্রমাণ, এই "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস।" আবার স্বজাতি কর্ত্তৃক লিখিত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ইতিহাসে ভুল-ভ্রান্তি ঢাকা পড়িবার সম্ভব। জর্জ থিবর একটী কথা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

"But on the modern investigator who neither can consider himself bound by the authority of a name, however great, nor is likely to look to any Indian system of thought for the satisfaction of his speculative wants, it is clearly incumbent not to acquiesce from the out set in the interpre tations given of the Vedanta-Sutra—and the Upanishads—by Sankara and his school, but to submit them, as far as that can be done, to a critical investigation."—Vedanta-Sutras Intro duction, Page, xv.

সত্যমেব জয়তে নানৃতম। সত্য স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ। ইহা দেশ-কাল-পাত্র বা কোনও সম্প্রদায়কে অপেক্ষা করে না। ইহা নিজেই নিজের প্রমাণ। অতএব প্রাচ্য পণ্ডিতদের ভয় পাইবার কিছুই নাই।

কোনও লোকের প্রতি যাহাতে অপবাদ প্রচারিত না হয়—ইহা একটী সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য। "ডাক্তার থিব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই শ্রুতি ও সূত্র-সম্মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন" এ কথা অসত্য। তাঁহার মত বিশিষ্টাদ্বৈত সূত্র-সম্মত কিন্তু অদ্বৈত শ্রুতি-সম্মত। প্রমাণ—

"Sankara, for instance, should in the end have to be declared a more trustworthy guide with regard to the teaching of the Upanishads than concerning the meaning of the Sutras." (Page ciii).

নিজ মত সমর্থনের জন্য গ্রন্থকার বা সম্পাদক থিব হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও অনুপযুক্ত। কারণ তাহা আরম্ভ করা হইয়াছে এইরূপ ভাবে—"As to the teaching of the Sutras, I must give it as my opnion that they do not etc (Page. C.). কাজে কাজেই "They" এই সর্ব্বনাম "Upanishads and the

Sutras" এই দুই পদের পরিবর্ত্তে বসে নাই, মাত্র "Sutras" পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে।

"বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম একপ্রকার অসম্ভব। একথাই বা কি করিয়া স্বীকার করি। কারণ Dr. Thibaut বলিতেছেন,

"But the task once being given, we are quite ready to admit that Sankara's system is most probably the best which can be devised" (P. cxxii). "Sankara's method thus enables him in a certain way to do justice to different stages of historical development, to recognise clearly existing differences which other systematisers are intent on obliterating. And there has yet to be made a further and even more important admission in favour of his system. It is not only more pliable, more capable of amalgamating heterogeneous meterial than other systems, but its fundamental doctrines are manifestly in greater harmony with essential teaching of the Upanishads than those of other Vedantic systems." (P. cxxiv).

বেদান্ত আজ স্বমহিমায় প্রকাশিত হইতেছে। জগতের সমগ্র চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কের মধ্যে উহা ধীরে ধীরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতেছে।—উদ্দেশ্য সমগ্র জগদ্ব্যাপী এক সার্ব্বজনীন সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এক্ষণে এই যুগধর্ম্মে সকলের সহায় হওয়া কর্ত্তব্য; অযথা মতবাদ প্রকাশের দ্বারা উহার বিরোধী হওয়া উচিত নয়। পাশ্চাত্য মনীষী যাঁহারা বেদান্তের আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের বন্ধুভাবে সংশোধন করাই ভারতীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর ইদানীং কর্ত্তব্য।

আর একটী প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাস্য আছে। পাণিনীগুরু ভগবান উপবর্ষ "জৈমিনীয় মীমাংসার ও বেদান্ত দর্শনের বর্ত্তিকার" এবং "ভগবান শঙ্কর উপবর্ষের নিকট হইতে অদ্বৈতভাষ্যের উপাদন গ্রহণ করিয়াছেন" একথা লেখক কোথা হইতে পাইলেন? প্রমাণ স্বরূপে আচার্য্যের ৩।৩।৫৩ সূত্রের লোকায়ত-মত খণ্ডন-ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে এইরূপ আছে, "অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমতন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃকৃতঃ"—এখানে "প্রথমে তন্ত্রে" অর্থে ত "পূর্ব্বমীমাংসা"! আমাপার উত্তরমীমাংসা কোথা হইতে

পাইলেন ? ভাষ্যে ইহার সহিত, "আচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণ লক্ষণে বর্ণিতম্" আছে। আচার্য্য শবর স্বামীও পূর্ব্ব মীমাংসার ভাষ্যকার। উপবর্ষ ও শবর উভয়েই দেহাত্মবাদরূপ লোকায়ত মত খণ্ডন করিয়াছেন—আচার্য্য উহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতুতেই কি স্বীকার করিতে হইবে যে আচার্য্য শঙ্কর উপবর্ষ হইতেই অদ্বৈত ভাষ্যের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন আচার্য্য রামানুজ বোধায়ণ * হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদান গ্রহণ করিয়াছেন ?

পুনশ্চ ব্রঃ সূ ১, ৩, ২৮ সূত্রে "বর্ণা এব তু শব্দঃ" ভগবান্ উপবর্ষের এই মত আচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। † এবং উপবর্ষের ঐ উদ্ধৃত বাক্য বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্য বা বৃত্তি হইতে উদ্ধৃত। কারণ উক্ত সূত্রের "ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধমাশ্রিত্য 'অনপেক্ষত্বাৎ' ইতি বেদস্য প্রামাণ্য স্থাপিতম্" ভাষ্য বাক্য পূর্ব্বমীমাংসা ১, ১, ৫ সূত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। এই হেতুতে আমরা উপবর্ষকে মীমাংসক বলিতে ইচ্ছুক বৈদান্তিক নহে। তবে মীমাংসা এবং বেদান্তের মধ্যে কয়েকটি বিষয় সমভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। যথা দেহাতীরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করশবর স্বামী এবং উপবর্ষের এবং শব্দবিজ্ঞান কেবল উপবর্ষের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক স্বামীজি এই গ্রন্থ লিখিয়া হিন্দু ধর্ম্মের এবং মাতৃভাষার

---

* আমাদের বোধ হয় আচার্য্য ভাষ্যে যে বেদান্ত বৃত্তিকারের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন উহা বোধায়নের। বৃত্তিকার জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী। শ্রীরামানুজও এই মত নিজ ভাষ্যে প্রচার করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন বৃত্তিকার উপবর্ষ। কিন্তু উপবর্ষের বেদান্ত বৃত্তির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না; পরন্তু শ্রীরামানুজ বৃত্তিকার বোধায়নের মতবাদ নিজ মত সমর্থনের জন্য গ্রহণ ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন বোধায়নবৃত্তি অলীক, আমরা তাঁহাদের মত অপেক্ষা শ্রীরামানুজাচার্য্যের বাক্যই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য।

† বিগত পৌষের উদ্বোধনে কথা-প্রসঙ্গের ৭১০ পৃ, ২য় প্যারার, ৮ লাইনের পাঠ এইরূপ হইবে—"ইনি বৈয়াকরণ পাণিনীর গুরু মীমাংসক উপবর্ষ। শঙ্কর ইঁহার শব্দ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিয়া স্ফোটবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।"—পাঠক-পাঠিকা এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মুখোজ্জল করিয়াছেন। তিনি এস্থলে, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ফেলোসিপের বক্তৃতা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "বাস্তবিক চন্দ্রকান্তের গ্রন্থের ন্যায় সুন্দর দার্শনিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই বলিলেও চলে। * * * কিন্তু এই গ্রন্থের সমাদর আমরা এরূপ করিয়াছি যে আর পুনঃ সংস্করণ হইল না। আমাদেরও ভয় হয় পাছে "বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস" সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। ভগবান যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব এবার বেলুড় মঠে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। খৃষ্টমাস ইভ্ সন্ধ্যাকালে খৃষ্ট ক্রোড়ে মেরীর আলোক-চিত্র ফল পুষ্পে অতি সুন্দররূপে বেদীর উপর সাজান হয়। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা সমবেত স্বরে "প্রেমানন্দে রাখপূর্ণ আমারে দিবস রাত" এই সঙ্গীত করার পর শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ মহারাজ সকলকে কিয়ৎক্ষণের জন্য ধ্যান করিবার আদেশ করেন। শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দ জি, হৃদয়কন্দরে যীশুখৃষ্টের মানস পূজা সম্বন্ধে ধীর গম্ভীর স্বরে ইংরাজীতে উপদেশ করিলেন; কারণ ব্রহ্মচারী গুরুদাস প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় ভক্ত এবং আমেরিকা হইতে নবাগতা মিস কন্ত্র ভগিনিদ্বয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ধ্যান ভঙ্গের পর স্বামী প্রকাশানন্দজিকে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য" এই ভগবৎ বাক্যের ইংরাজী এবং বাঙ্গালাতে ব্যাখ্যা করিতে বলেন। তাহার পর ব্রহ্মচারী গুরুদাস St. mathew হইতে Nativity of Christ, Sermon on the Mount এবং "Our Father which art in Heaven" এই প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপরে স্বামী অভেদানন্দ জি ভাগবান্ যীশুর জন্ম তিথি, জেরুজেলামে খৃষ্ট জন্মোৎসব, বেদান্তের আলোকে বাইবেল এবং খৃষ্টজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং তাহার জীবনীর দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রমুখ সকল ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন লাভ সম্বন্ধীয় একটী নাতিক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। ইহার পর ফল পুষ্পাদির নিবেদন ও "ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম" সঙ্গীত এবং প্রসাদ বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

২। বিগত ২৭শে ডিসেম্বর স্বামী প্রকাশানন্দজি বাজেশিবপুর গৌড়ীয় সভায় একটী বক্তৃতা করেন।

৩। আগামী ৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার শুক্লাদ্বিতীয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা এবং ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলুড়মঠে জন্মোৎসব।

৪। বিগত ২রা জানুয়ারী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের বেলুড় মঠে তিথিপূজা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস ঠাকুরের পূজা অর্চ্চনাদি বিশেষ ভাবে সম্পাদিত হয়। রাত্রে তাঁহার জীবনী আলোচনার জন্য মঠের সমগ্র সাধু এবং ব্রহ্মচারী সমবেত হন। বসুমতী হইতে তাঁহার বাল্যজীবনী পাঠ করা হয়; শ্রীশ্রীমহাপুরুষজি তাঁহার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ এবং বরাহ নগরে অবস্থান কালীন ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থাদিতে তাঁহার তপস্যা ও কঠোরতাদি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাপন করেন, স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ আলমবাজার মঠের কয়েকটি ঘটনা তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাপন করেন, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজি তাঁহার আমেরিকা যাত্রা ও অপরাপর কার্য্য কলাপ বিবৃত করেন; [illegible] তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও কি-প্রকারে তাঁহার [illegible] জীবন আমেরিকাবাসীদের আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাঁহার [illegible] ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তঃপাতী শান্তিআশ্রম সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ সংক্ষেপে তাঁহার সমগ্র জীবনীর আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ [illegible] করেন; ইহাও পূর্ব্বে দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫। বিগত [illegible] জানুয়ারী কলিকাতা জন সাধারণ কর্ত্তৃক স্বামী প্রকাশানন্দজি অভিনন্দিত হন। অভিনন্দন পত্রের সহিত রূপায় মোড়া একটী কমণ্ডলু তাঁহাকে অর্পিত হয়। অন্ধ্র দেশীয় ভক্তেরাও তাঁহাকে তেলেগুভাষায় অভিনন্দিত করিয়া কর্পূরের মালারদ্বারা ভূষিত করেন। ডাঃ মরেনো তাঁহার বাঙ্গলা অভিনন্দনের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেন। অপর দুই জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীকিশোরী মোহন কাব্য স্মৃতি তীর্থ, এবং শ্রীদাশরথী স্মৃতি ব্যকরণ তীর্থ তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দিত করেন।

স্বামী প্রকাশানন্দ তাহার যে উত্তর দেন তাহার এই কয়েকটী

কথা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, "আমেরিকা বাসীরা হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কত জিজ্ঞাসু; কিন্তু যে সকল ছাত্রেরা আমেরিকায় জড় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে যান, তাঁহাদিগকে যখন তদ্দেশীয় লোকেরা গীতা এবং উপনিষদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তাঁহারা নির্ব্বাক মূকবৎ অবস্থান করেন। ইহা কি শোভনীয়?" পরে মিস ফক্স ভগ্নিদ্বয়কে উপলক্ষ্য করিয়া বলেন, "ভারতের দাসত্ব ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও বহু আমেরিকাবাসী ভারতকে সকল ধর্ম্মের তীর্থরূপে গ্রহন করে এবং তাহারা যখন ভারতে তীর্থ যাত্রীর ন্যায় উপস্থিত হয় তখন কি ভারতবাসীকে যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবন লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে?" আমেরিকায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কার্য্যকলাপের সফলতা সম্বন্ধে বলেন, "আজ ২০ বৎসরের পূর্ব্বে সে দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ছাড়া অপর কোনরূপ ধর্ম্মালোচনা করা দুসাধ্যছিল। কিন্তু আজ বেদান্তের প্রভাবে তাহাদের সেই উন্মাদ-ধর্ম্মপ্রবণতা দূর হইয়া তাহারা কতদূর উদার হইয়াছে, তাহা সেখানে যাইলেই অবধারণ করা যায়।" শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন ভূষিত করেন এবং কলিকাতার বহু গণ্যমান্য হিন্দু ও মুসলমান সভাস্থল অলঙ্কৃত করেন।

কথা প্রসঙ্গে।

উদ্বোধনের কোনও কোনও ব্রাহ্মণ পাঠক বেদ-বিভাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। বেদ-বিভাগ সম্বন্ধে আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ
১।	ঋক্ বেদ ...	ঐতরেয়	... ঐতরেয়	ঐতরেয়
		কৌষীতকি	... কৌষীতকি	কৌষীতকি
		পৈঙ্গী		
		শাট্টায়ণা		
২।	কৃষ্ণ যজুর্বেদ (ক)	তৈত্তিরীয়	... তৈত্তিরীয়	তৈত্তিরীয়
		বল্লভী		শ্বেতাশ্বতর
		শাট্টায়ণী		নারায়ণ
		মৈত্রেয়ানী		
		কঠ		কঠ
	শুক্ল যজুর্বেদ (খ)	শতপথ	... শতপথ	... ঈশ
				বৃহদারণ্যক
				জাবাল
৩।	সামবেদ ...	সামবিধান		... কেন
		মন্ত্র		ছান্দোগ্য
		আর্ষেয়		
		বংশ		
		দৈবতাধ্যায়		
		তলবকার		
		তাণ্ডব		
		সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ		

৪। অথর্ব্ব বেদ ... গোপথ ... মুণ্ডক মাণ্ডুক্য প্রশ্ন

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইয়াছে কোন কোন গ্রন্থ অবলম্বনে বেদান্ত-মীমাংসার সূত্র সকল ব্যাস গঠিত করিয়াছেন ? নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল।

১। ঈশাবাস্য, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দগ্য, বৃহদারণ্যক শ্বেতাশ্বতর, কৌষীতকি ব্রাহ্মণ, কৈবল্য এবং জাবাল এই উপনিষদ্ নিচয়।

২। কাণ্বশাখা, অগ্নিরহস্য, তাণ্ডিশাখা, শাট্যায়ণীশাখা, পৈঙ্গীরহস্য এই ব্রাহ্মণ সকল।

৩। মনুসংহিতা, মহাভারত ও তদন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবত গীতা এই স্মৃতিগুলি।

৪। পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত মতবাদ।

৫। কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম, জৈমিনি বিরচিত দর্শন শাস্ত্র।

৬। বুদ্ধ পূর্ব্বযুগে, আধুনিক চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন ও মাহেশ্বর প্রভৃতি মতানুরূপ মতবাদ।

কিন্তু শ্রীশঙ্কর স্বীয় মতের দ্বারা সূত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উপর্যুক্ত গ্রন্থ ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন,—

১। ঐতরেয় আরণ্যক, ২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩। আপস্তম্ব ধর্ম্ম-সূত্র, ৪। আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, ৫। গৌড়পাদকারিকা (ব্যাস পরবর্ত্তী) ৬। মৈত্রায়ণীয় সংহিতা, ৭। নিরুক্ত (ব্যাস পরবর্ত্তী) ৮। পাণিনী (ব্যাস পরবর্ত্তী), ৯। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, ১১। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১২। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১৪। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১৫। বাজসনেয়ী সংহিতা, ১৬। বিষ্ণুপুরাণ (ব্যাস পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়), ১৭। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর (ঐ), ১৮।

শিবপুরাণ (ঐ), ১৯। শিবধর্ম্মোত্তর (ঐ), ২০। উপবর্ষবৃত্তি, (ঐ), ২১। বৃত্তিকারের গ্রন্থ (ঐ), (এই মত খণ্ডিত হইয়াছে) *।

শ্রীরামানুজ এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের উদ্ধার করিয়াছেন, যথা,—

* এই বৃত্তিকারকে আমাদের শ্রীরামানুজ লিখিত বোধায়ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়, তাঁহার "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২২২) বলেন,—

"শঙ্কর যে বৃত্তিকারের নাম করিয়াছেন, তাহা অনেক কারণে উপবর্ষকেই বুঝাইতে পারে, কারণ উপবর্ষ,—

"ক। ব্রহ্মসূত্র ও পূর্ব্বমীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার, ইহা পার্থ সারথী মিশ্রের "শাস্ত্র দীপিকাতে" উক্ত হইয়াছে।

"খ। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে যে স্থানে উপবর্ষের নাম করিয়াছেন, সেখানে টীকাকারগণ যেন উপবর্ষকেই বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন।"

"গ। উপবর্ষ অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও বৈয়াকরণিক পাণিনীর গুরু।

"ঘ। উভয় মীমাংসার টীকাকার হওয়ায় উপবর্ষ রামানুজের মত জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী হইতে পারেন ইত্যাদি।"

কিন্তু, (ক) কোন প্রকারের সাক্ষাৎ প্রমাণ না থাকায় উহা পার্থ সারথী মিশ্রের কল্পনা বলিয়াই বোধ হয়। (খ) ব্রহ্মসূত্রের যে পাদের যেখানে উপবর্ষের নামোল্লেখ ভাষ্যে আছে, তাহার টীকাদি পড়িয়া তিনি বেদান্তের বৃত্তিকার ছিলেন বলিয়া কিছুই বোধগম্য হয় না। (গ) উপবর্ষের ন্যায় বোধায়ণও অতি প্রাচীন। (ঘ) উপবর্ষ উভয় মীমাংসার বৃত্তিকার এই সিদ্ধান্ত সঠিক না হওয়ায় তিনি জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী নাও হইতে পারেন। এবং উভয় মীমাংসার বৃত্তিকার হইলেই যে তিনি জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী হইবেন ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় না। বাচস্পতি মিশ্র ষড়দর্শনের টিকাকার হইলেও তিনি অদ্বৈতবাদী বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করি কি করিয়া?

পক্ষান্তরে স্রৌতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থকার বোধায়ন ঋষি বিখ্যাত এবং ব্যাস শিষ্য বা প্রশিষ্য হইতে পারেন। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশ ৪র্থ অধ্যায়ে বোধ্য বা বোধি বলিয়া একজন ব্যাস প্রশিষ্যের বর্ণনা যখন আছে, তখন শ্রীরামানুজের বোধায়ণের উল্লেখ আমরা একেবারে অলীক বলিয়া ত্যাগ করিতে পারি না।

১। দক্ষস্মৃতি, ২। গর্ভোপনিষৎ, ৩। গৌতম ধর্ম্মসূত্র, ।
৪। চুলিকোপনিষৎ, ৫। মহা নারায়ণোপনিষৎ, ৬। মহোপনিষৎ,
৭। মৈত্রায়ণ উপনিষৎ, ৮। সনৎ সুজাতীয় (ইহার উপর একটী শঙ্কর ভাষ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা শঙ্কর কৃত কিনা তাহা ঠিক জানা যায় না)। ৯। সুবালোপনিষৎ, ১০। যাজ্ঞবল্ক্য, স্মৃতি ১১। যামুনাচার্য্য ও শঠকোপাদিকৃত গ্রন্থ (শঙ্কর পরবর্ত্তী)।

* * *

বিগত পৌষের উদ্বোধনে আমরা ব্যাস পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্মরথ্য প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্য্যগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। এক্ষণে আমরা ব্যাস পূর্ব্ববর্ত্তী অপরাপর আচার্য্যগণের মতবাদ কিঞ্চিৎ এস্থলে বিবৃত করিব।

আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনি বৈদান্তিক। কারণ ব্রহ্মসূত্র ৩।১।৯ সূত্রে ভাষ্যে দেখা যায় যে শ্রুতিতে যে "রমণীয় চরণ" এবং "কপূয় চরণ" মানবের জন্মান্তর গ্রহণের কারণ রূপে গৃহীত হইয়াছে, সে স্থলে 'চরণ' শব্দের অর্থ আচরণ অর্থাৎ শীল এবং তাহা দ্বারাই জীবের অপর যোনি প্রাপ্তি অর্থাৎ সংসরণ হইয়া থাকে। জৈমিনির মতে "চরণ" শব্দের অর্থ অনুশয় (ভুক্তফলাৎ কর্ম্মণোঽতিরিক্তঃ কর্ম্ম)। মীমাংসাদর্শন ৪।৩।১৭ সূত্রে কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত এবং ১৮ সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে; পুনরায় ৬।৭।৩৫ সূত্রে তাঁহার মত উদ্ধার করিয়া ৩৬ সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন এবং জৈমিনি মত নিরসন করিয়াছেন।

* * *

কার্ষ্ণাজিনির মত সমর্থনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের ৩।১।১১ সূত্রে বাদরির নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইনিও একজন ব্যাস পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদান্তিক আচার্য্য। "রমণীয় চরণ" এবং "কপূয় চরণ" যাহা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, সেইস্থলে "চরণ" শব্দের অর্থ মানবের সুকৃত দুষ্কৃত এই অর্থ-ই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতিতে জীবাত্মার গতি উল্লেখ থাকায়—জীবাত্মা সুকৃতি বলে কার্য্যব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম)-কেই প্রাপ্ত হন—নির্গুণ ব্রহ্ম নহে ইহাই তাঁহার অভিমত (৪।৩।৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তাঁহার মতে অমানব পুরুষেরাই

কার্য্যব্রহ্মকে প্রাপ্ত করায়; মুক্ত পুরুষের শরীরাদি নাই। কিন্তু আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে এ বিষয়ে শ্রুতির বহুবিধ ভাব দৃষ্ট হয়; সুতরাং মুক্তিতে মনের ন্যায় শরীরাদি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বাদরায়ণ উভয় সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। মুক্ত পুরুষ ইচ্ছা করিলেই সশরীর বা অশরীর হইতে পারেন (৪।৪।১২ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বাদরি যে বেদান্তাচার্য্য ছিলেন তাহার আর একটী প্রমাণ মীমাংসা দর্শনের ৩।১।৩ সূত্রে তাঁহার মত (দ্রব্য গুণ ও সংস্কার শেষ শব্দে গৃহীত হইবে, যাগ ফল পুরুষ প্রভৃতিতে গৃহীত হইবে না) পূর্ব্ব পক্ষরূপে গৃহীত হইয়া ৩।১।৪ সূত্রে জৈমিনি কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে; এবং ৬।১।২৭ সূত্রে বাদরির মত (সকলেরই বৈদিক কার্য্যে অধিকার আছে) পূর্ব্বপক্ষ রূপে গৃহীত হইয়া জৈমিনি ৬।১।২৮ সূত্রে শূদ্রের বৈদিক যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই ইহা দেখাইয়াছেন।

*　　　　*　　　　*

ব্রহ্মসূত্রের ৩।৪।৪৪ সূত্রে আর একজন ব্যাসপূর্ব্বাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়—ইনি পূর্ব্বে মীমাংসক আত্রেয়। ইঁহার মতে, "যজমান যজ্ঞাদি উপসনার ফলভাগী, সুতরাং সে সকল উপাসনা যজমানেরই কর্ত্তব্য, পুরোহিতের নহে"। এই মত বাদরায়ণ ঔড়ুলোমির মতোল্লেখ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন (৩।৪।৪৫ ব্রঃ সূঃ)। কিন্তু জৈমিনি মীমাংসা দর্শনের ৪।৩।১ সূত্রে কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত করিয়া ৪।৩।১৮ সূত্রে আত্রেয়ের মতের দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন; এবং ৬।১।২৬ সূত্রে আত্রেয়ের মতে শূদ্রের যজ্ঞাধিকার নাই ইহা প্রপঞ্চিত করিয়া ৬।১।২৭ সূত্রে বাদরির মত উল্লেখ করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব ও রাখাল

(ব্রহ্মচারী আনন্দ চৈতন্য)

বৈশাখের খরতর দিবা দ্বিপ্রহর।
মার্ত্তণ্ড তাপেতে তপ্ত দিক দিগন্তর।
দিবাকর করে দগ্ধ হইয়া বাতাস।
মাঝে মাঝে ছাড়িতেছে উত্তপ্ত নিশ্বাস।
নৈরঞ্জনা নদীতীরে অশ্বত্থের মূলে,
ধ্যান মগ্ন বুদ্ধদেব চরাচর ভুলে।
বিলুপ্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়া মনোবৃত্তিবল।
সোণার মূরতি মত নিস্পন্দ নিশ্চল।
শীর্ণদেহ তবু দীপ্ত মহিমা ছটায়।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তপ্ত নহে কায়।
করিবেন যিনি এই জগত উ঳
উত্তপ্ত রবির কর কি করিবে তাঁর?
পত্রহীন তরুশাখা শোভে বৃক্ষোপর,
বস্ত্রহীন ছত্র যথা মস্তক উপর।
রাখাল বালক এক এমন সময়,
বেগে চলে তরুতলে লভিতে আশ্রয়।
মেষদল সঙ্গে তার, একি অকস্মাৎ,
গতি রুদ্ধ বালকের নেত্রে অশ্রু পাত।
"আহা কোন্ দেবতাগো, এই খরকালে,
রৌদ্রতপ্ত জ্বালা সয়ে বসিয়া বিরলে,
মুদিত নয়নে কিবা করিছ চিন্তন।
কেন সহ, অসহ এতাপ অকারণ?
জনক জননী কিগো নাহিক তোমার,
আশ্রয় দিতে কি কেহ করেনা স্বীকার?

ওগো কৃপাময় দেব, চল মম সনে,
কুটীর নিরমি দাস রাখিবে যতনে।"
বলিয়া বালক কাঁদে চাহি মুখপানে,
শ্রবণ বিবর রুদ্ধ, বুদ্ধ মহা ধ্যানে।

মেঘদল অচঞ্চল বুদ্ধে নিরখিয়া,
দুঃখী হয়ে বুদ্ধ পানে রহিল চাহিয়া।
বুঝিল মেঘের দল এই দেব-প্রাণ,
তাহাদের তরে দিবে স্বীয় প্রাণদান।
কাঁদিল পশুর প্রাণ মহা প্রাণতরে।
ধন্য সেই, যাঁরতরে পশু আঁখি ঝরে।

পত্রযুক্ত তরুশাখা লইয়া রাখাল,
করে ধরি বুদ্ধ পাশে রহে কিছু কাল
তপ্তদেহ অকস্মাৎ ছায়া পরশনে,
বাহিরে টানিল ধরি অন্তর চেতনে।
ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব মেলিলেন আঁখি।
কহিলেন সকরুণ ক্ষীণে কণ্ঠে ডাকি।
"কে বৎস! আমার এ বিষম সময়ে,
ছায়া করি শিরোপরে রয়েছ দাঁড়ায়ে।
করুণার হৃদি তব লভহ কল্যাণ,
কর শীঘ্র এ ক্ষুধার্ত্তে কিছু অন্ন দান।
শুষ্ক কণ্ঠ প্রাণ বুঝি হইবে নির্গম।
পার যদি কর বৎস! ইহার রক্ষণ।"

"দেবতাগো!

অস্পৃশ্য জাতির গৃহে আমার জনম।
উচ্চ জাতি ছায়া কভু করিনি স্পর্শন।

কিন্তু আজ হেরি দেব এদশা তোমার,
দুঃখেতে হৃদয় কাঁদি উঠিল আমার।
ভাবিলাম, হয় হব পাপেতে মগন,
কিন্তু এই দেব দেহ হইবে রক্ষণ।
তাই দেব এই বৃক্ষ শাখা লয়ে করে,
ধরিয়া রয়েছি প্রভো, তব শিরোপরে।
কেমনে গো, হায়, তব পূত মুখে এবে,
অস্পৃশ্য এ হস্তমম ভক্ষ্য প্রদানিবে?
দুগ্ধবতী মেষ এই করিয়া দোহন,
যত ইচ্ছা দুগ্ধ দেব করগো গ্রহণ"।
শীর্ণ করে রাখালেরে করি আলিঙ্গন,
ক্ষীণ কণ্ঠে বুদ্ধদেব বলেন তখন।
"শোন বৎস! একভূমে লভিয়া জনম,
একই পবন বারি করিয়া গ্রহণ।
একই আহারে দেহ করিয়া পোষণ,
নহে কেহ কাহারও অস্পৃশ্য কখন।
তোমার আমার দেহে একরক্ত বহে,
একই বেদনা দুঃখ এই প্রাণে সহে।
পরম পবিত্র তুমি মহৎ হৃদয়,
অনাহারে দেহ মম অবশ এখন,
দুগ্ধ দিয়া কর এর জীবন রক্ষণ।
আসিবে সেদিন নব পবিত্র মঙ্গল,
নবীন আলোকে হবে দিক সমুজ্জ্বল।
প্রীতির মহান ধ্বজা ভেদিবে অম্বর,
মহা মিলনের ধ্বনি গাবে চরাচর"।

প্রবুদ্ধ রাখাল! বুদ্ধ দুগ্ধ করি পান,
আঁখি মুদি শুনিলেন বাল কণ্ঠ তান,

"নরে নরে ভেদ নাই, বল ভাই বল ভাই,
কর সব কোলাকুলি দূরে না সরিও ভাই,
করিও না ভেদাভেদ মিছে বাদাবাদ তুলি,
ভ্রমিও না মিছে পথে পরি অজ্ঞানের ঠুলি,
মহাধ্যানে ওই হের নরদেব বসিয়া,
জগতের দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া,
জয় জয় নরদেব জয় বুদ্ধ অবতার,
মহামিলনের তরী, করিলেন ভবপার"।

কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার বি, এল)

ছয়টী মুখ্য দর্শন ছাড়া অন্যান্য দর্শনও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন প্রসিদ্ধ। বেদান্ত দর্শনের বিষয় বুঝিতে হইলে অন্যান্য দর্শনের আলোচ্য বিষয় কিছু কিছু জানিতে হয়।

(১) বৌদ্ধ দর্শন।

ভগবান্ বুদ্ধের চারিটী শিষ্যের নামে (?) চারটীমত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (১) সৌত্রান্তিক (২) বৈভাষিক (৩) যোগাচার (৪) মাধ্যমিক।

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সর্ব্বাস্তিত্ব বাদী। ইঁহাদের মতে বাহ্য ঘটপট ও আন্তর সুখদুঃখ পদার্থের অস্তিত্ব আছে। যোগাচার বা বিজ্ঞানাস্তিত্ব-বাদীদের মতে বাহিরে কিছু নাই,—সবই অন্তরে। অন্তরের বিজ্ঞান আছে; তাহাই বাহিরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বাহ্যার্থ নাই, কেবল মাত্র

বিজ্ঞান আছে। মাধ্যমিক বা সর্ব্বশূন্যবাদীদের মতে অন্তরের বিজ্ঞানও নাই, বাহ্য বস্তুও নাই, বিজ্ঞানও নাই।

(ক) সর্ব্বাস্তিত্ববাদ।

পৃথিবী আদিকে ভূত বলে, রূপাদি ও রূপাদিগ্রাহক চক্ষুরাদিকে ভৌতিক বলে। পরমাণু চতুর্বিধ,—পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয়। এই সকল পরমাণু সংহত বা মিলিত হইয়া পরিদৃশ্যমাণ পৃথিব্যাদি উৎপাদন করিয়াছে। স্কন্ধপঞ্চক (১) রূপ অর্থাৎ সবিষয় ইন্দ্রিয় গ্রাম। (২) বিজ্ঞান অর্থাৎ আমি আমি এইরূপ বিজ্ঞান ধারা। (৩) বেদনা—সুখাদি অনুভব। (৪) সংজ্ঞা—গো, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি জ্ঞান বিশেষ। (৫) সংস্কার অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহ, এসকল অধ্যাত্ম অর্থাৎ আন্তর। এ সমুদয় সংহত বা মিলিত হইয়া আন্তর ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। বিজ্ঞান স্কন্ধই আত্মা।

তাঁহারা কোন ভোক্তা নিয়ন্তা সংঘাত কর্ত্তা মানেন না। তাঁহারা বলিলেন, এইরূপ মানিবার প্রয়োজন নাই। কারণ অবিদ্যাদির মধ্যে পরস্পর যে কার্য্য কারণ ভাব আছে তাহাতেই লোকযাত্রা উপপন্ন হইতে পারে। লোক যাত্রা উপপন্ন হইলেই হইল, অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। অবিদ্যাদি বলা হইয়াছে অর্থাৎ অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা মরণ, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ, দুর্থনস্তা প্রভৃতি।

(১) অবিদ্যা, যাহা ক্ষণিক তাহাকে স্থির বলিয়া জানা।

(২) সংস্কার, রাগ দ্বেষ মোহ।

(৩) বিজ্ঞান, ইহাকে আলয় বিজ্ঞান বলে। অহংঅহং এইরূপ জ্ঞান।

(৪) নাম রূপ, নাম—পার্থিবাদি পদার্থের সমবায়। রূপ—শুক্র শোণিতে সংঘাত।

(৫) ষড়ায়তন, বিজ্ঞান পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় ও রূপ অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহই ষড়াতন।

(৬) স্পর্শ, নাম রূপ ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধ।

(৭) বেদনা, সুখাদি অনুভব।

(৮) তৃষ্ণা, ভোগেচ্ছা।

(৯) উপাদান, চেষ্টা।

(১০) ভব, পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি।

(১১) জাতি, দেহ বিশেষ প্রাপ্তি।

(১২) জরা, (১৩) মরণ-শোক-পরিবেদনা-দুঃখ— দুর্মনস্তা বা মনোব্যথা।

এ সকল পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের কারণ। এই অবিদ্যাদি সকলেরই স্বীকার্য। এই অবিদ্যাদি পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তক ভাবে ঘটী যন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকায়, সংঘাত সিদ্ধি হইয়া থাকে। সংসার অনাদি, সংঘাত ও বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি প্রবাহ যুক্ত। একটী সংঘাতের অব্যবহিত পরেই, আর একটী সংঘাত জন্মে।

সৌত্রান্তিক বাহ্য বস্তু স্বীকার করেন বটে কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন না। আমাদের জ্ঞান বিষয়াবলম্বনে হইয়া থাকে। ঘট পট বাহ্যবিষয় না থাকিলে ঐরূপ জ্ঞান হয় না, অতএব বাহ্যবিষয় অনুমেয়। বৈভাষিক বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, বাহ্য বিষয় অনুমেয়। বৈভাষিক মতে বাহ্য বিষয় ও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান উভয়ই প্রত্যক্ষ।

সমস্ত বস্তুই উৎপাদ্য, ক্ষণিক ও বুদ্ধিবোধ। যেমন একটী তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, সেটী আবার অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, এইরূপ একটী ভাব অন্য ভাব জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপ চিরজন্ম বিনাশের স্রোত বহিতেছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া মরে, সংস্কার বিজ্ঞান জন্মাইয়া মরে ইত্যাদি। অবিদ্যার নিরোধ বা বিনাশই মোক্ষ। সমস্ত বস্তু ক্ষণিক, অতএব আত্মা বা বিজ্ঞানও ক্ষণিক।

অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, যেমন বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর

জন্মে, বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দধি জন্মে, মৃৎপিণ্ডের বিনাশ হইতে ঘট জন্মে। কূটস্থ থাকিলে তাহা বিনষ্ট বা বিকৃত হইতে পারে না। অভাবগ্রস্ত বীজাদি হইতে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয়, সেহেতু অভাবই ভাবের উৎপাদক।

(খ) ক্ষণবিজ্ঞান বাদ।

বিজ্ঞান বাদে প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় ফল সমস্তই অন্তর কিছুই বাহিরে নহে। ঐ সকল বুদ্ধ্যারূঢ় রূপে সেই সেই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। সমস্ত ব্যবহারই অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ কিছুই নহে। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তু নাই।

বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব কারণ বাহ্য বস্তু কি? পরমাণুই কি স্তম্ভাদি—না পরমাণুপুঞ্জ? বস্তু পরমাণু অথচ জ্ঞান হইবে স্তম্ভ, এ কিরূপ কথা? পুঞ্জও স্তম্ভ নহে। পুঞ্জ বা সমূহ পরমাণু হইতে ভিন্ন—কি অভিন্ন? ইহা নিরূপণ হয় না। বলিবে জ্ঞান বিষয়াকার হয়, অতএব বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু জ্ঞানের প্রকার ভেদ দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। আরও জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলব্ধি নিয়ম আছে। বিষয় ব্যতীত জ্ঞান, জ্ঞান ব্যতীত বিষয় অনুভব হয় না। অতএব বিষয় ও বিজ্ঞান দু'এর অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে। বাহিরে কিছুই নাই, অন্তঃস্থ জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞেয় উভয়াকার ধারণ করে, ইহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, মরুনীর আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগর। বাহিরে সেই সেই বস্তু না থাকিলেও ঐসকল যেমন অন্তরে গ্রাহ্য-গ্রাহকাকারে প্রকাশ পায়, জাগ্রত কালের স্তম্ভ-জ্ঞানও ঐরূপ। বাহিরে কিছু না থাকিলে অন্তরে কিরূপ বিচিত্র জ্ঞানের উদয় হয়? বিচিত্র বাসনা (সংস্কার) প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সংসার বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি, সংস্কারও সেইরূপ অনাদি সে হেতু জ্ঞানবৈচিত্র্য হয়। স্বপ্ন কালে যে বিনা বস্তুতে জ্ঞান হয়, তাহার কারণ বাসনা। অতএব বাহিরে কিছু নাই, সবই অন্তরে।

বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানকেই আত্মা বলা হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞান বা আত্মা ক্ষণিক। বিজ্ঞান একক্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণে বিনষ্ট হয়।

বাহ্য বস্তু এবং নিজ শরীরও বিজ্ঞানের আকার বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(গ) শূন্য বাদ।

মাধ্যমিক মতে বাহ্য বস্তুও নাই, বিজ্ঞানও নাই. সর্ব্ব শূন্য তাহাই পরমতত্ত্ব। * * *

নানাবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন।

এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের মতে "দ্বাদশ আয়তন" পূজা শ্রেয়স্কর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক, পাণি, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ আয়তন। ইহাদের সন্তোষ সাধনই কর্ত্তব্য।

আর এক সম্প্রদায়ের মতে, সুগতই বৌদ্ধগণের পরম দেবতা। তত্ত্ব চতুর্ব্বিধ, দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ। দুঃখ অর্থাৎ সাংসারিক পঞ্চ স্কন্ধ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয়, মন ও ধর্ম্মায়তন, এই দ্বাদশটী আয়তন। আত্মার জ্ঞান সমুদয়। সর্ব্ববিধ সংস্কারই ক্ষণিক এইরূপ জ্ঞান বাসনাই মার্গ অর্থাৎ মোক্ষ।

সর্ব্ব সম্প্রদায় মতে রাগাদি জ্ঞানের সন্তানরূপবাসনার উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়।

(২) আর্হত বা জৈন দর্শন।

জৈন দ্বিবিধ, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

ইঁহাদের মতে জীব, অজীব, অস্রাব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ এই সপ্ত পদার্থ।

(১) জীব—বোধাত্মক। যাহাতে চেতনা আছে, তাহা জীব।

(২) অজীব—অবোধাত্মক। যাহাতে চেতনা নাই, তাহা অজীব।

(৩) আস্রব—ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি পুরুষকে বিষয়ে গাঢ় আসক্ত করে; এজন্য ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিই আস্রব। কর্ম্মবন্ধনই আস্রব।

(৪) সম্বর—আস্রব নিরোধের নাম সম্বর।

(৫) নির্জ্জর—সঞ্চিত কর্ম্মের জরণ অর্থাৎ ক্ষয় করার নাম নির্জ্জর।

(৬) বন্ধ—জীব কষায় বশে কর্ম্মভাব যোগ্য 'পুদ্গল' সকলকে যাহা পরিগ্রহ করে। তাহাকে বন্ধ বলিয়া থাকে। [পুদ্গল-শরীর]

(৭) মোক্ষ—সমুদায় কর্ম্মের নিঃশেষে বর্জ্জন করার নাম মোক্ষ। মোক্ষের পর আলোকান্ত হইতে উর্দ্ধে গমন হইয়া থাকে।

জৈনরা সপ্তভঙ্গিলয় নামক ন্যায়ের অবতারণা করেন।

(১) স্যাদস্তি...ঘট এক প্রকারে আছে।

(২) স্যান্নাস্তি...ঘট অন্যপ্রকারে নাই। ঘট ঘট রূপে আছে অন্য রূপে নাই।

(৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ...আছেও বটে, নাইও বটে।

(৪) স্যাদ্ বক্তব্য...একরূপে আছে বলিবার যোগ্য, একরূপে নাই বলিবার যোগ্য।

(৫) স্যাদস্তি চ অবক্তব্য...কোন রূপে আছে বলা যায় না।

(৬) স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্য ...কোন রূপে নাই বলাও যায় না।

(৭) স্যান্নাস্তি চ অস্তি চ অবক্তব্যঃ—কোন রূপে আছে ও নাই বলা যায় না।

ভঙ্গি অর্থাৎ বিভাগ। নয় অর্থাৎ যুক্তি। স্যাৎ কথঞ্চিৎ।

সৎ, অসৎ, সদসৎ ও অনির্ব্বচনীয় মতভেদে প্রতিবাদী চতুর্ব্বিধ। 'কথঞ্চিৎ আছে' বলিলেই সকলকেই নিরস্ত করা যাইতে পারে এবং সে জন্য 'স্যাদ্ বাদে'র সর্ব্বত্র জয় নিশ্চয়।

দর্শন, জ্ঞান ও চরিত্র এই তিনটীর সমুচ্চয়ে মুক্তি হয়। জিন দেবই গুরু ও সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেষ্টা। জিনোক্ত তত্ত্বে শ্রদ্ধাই দর্শন। তত্ত্বজ্ঞানের অববোধ জ্ঞান।

অহিংসা সুনৃত অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে চরিত্র বলে।

জৈন মতে এক পদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে। একরূপে এক, অন্যরূপে অনেক। জৈন মতে আত্মা মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ শরীর পরিমাণ। অতএব দেহভেদে জীব পরিমাণ পৃথক্ পৃথক। তবে মুক্তাবস্থায় জীব পরিমাণ নিত্য। (ক্রমশঃ)

পূজার আয়োজন।

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

শরতের মেঘ-মুক্ত নির্ম্মল গগনে দিনমণির নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ হাস্যে দিগন্ত ভরিয়া উঠিয়াছে, কূজন-তান-মুখরিতা ধরিত্রীবক্ষে শ্যাম জলধির ন্যায় নব-শস্য-সাগরে নির্ম্মল বাতাস তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া যাইতেছে—পূর্ণ সরোবরে প্রফুল্লিত কমল-দল হর্ষাবেগে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে—সেই আনন্দময়ী শারদীয়ার রক্ত-চরণ-কমলের সঙ্গে মিলিবে বলিয়া! সকলেই আজ আয়োজনে ব্যস্ত। মার আগমনের বার্ত্তা পাইয়া অচেতন জড় প্রকৃতিও আনন্দে সজীব হইয়াছে। মরণোন্মুখী বৃহৎ পল্লী বিজয়পুর আজ সেই আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেখানকার সকলেই আজ দুঃখ, বেদনা, লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া পূজার আয়োজনে ব্যস্ত! কারণ বহুদিন পরে তাঁহাদের পিতৃতুল্য জমিদারপুত্র নির্ম্মলবাবু সস্ত্রীক এখানে পূজা করিতে আসিয়াছেন। আজ তাঁহার ভাণ্ডার মুক্ত—হাত মুক্ত। সকলেরই সেখানে অবারিতদ্বার। এই কয়দিন পীড়িতের ঔষধ-পথ্য, অন্নহীন বস্ত্রহীনের অন্ন-বস্ত্র-চিন্তা নাই; নির্ম্মলবাবু তাহাদের সব দৈন্য দূর করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প। এদিকে পূজার আয়োজন খুব আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইতেছে—তাহাতে পল্লীবাসিগণ সকলেই আপন আপন বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। কোন স্থানে কোন নূতন বালিকা-বধূ বা কুমারীদের কার্য্যে ত্রুটী দেখিয়া গিন্নী গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতেছেন, এবং, তাঁহারা যে ঐ বয়সে কি রকম কর্ম্মকুশলা ও পবিত্র ভাবাপন্ন ছিলেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন! ইতিমধ্যে একদিন সেই সন্ন্যাসিনী আসিয়া সেখানে দর্শন দিলেন। ইনি বিজয়পুরে আরও দুই

একবার আসিয়াছিলেন, সকলেই এই কথা বলিতে লাগিলেন; কিন্তু স্পষ্ট ভাবে দেখিয়াছেন বলিয়া কাহারও মনে হইল না। কিন্তু আজ তিনি অনুপম রূপরাশিতে উৎসব মেলা উদ্ভাসিত করিয়া সকলের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। আজ বিজয়পুরে বড় সৌভাগ্য—তাই স্বয়ং করুণা-রূপিনী মা তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন! স্নেহময়ী বুঝি আর সন্তানের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই ভাবিল এ সমস্ত তাহাদের জমিদার বাবুরই পুণ্য ফল। দিন নাই—রাত নাই—সকল সময় যেখানে পীড়িতের যন্ত্রণা-কাতর বিকট চীৎকার, যেখানে ক্ষুধার্ত্তের হা অন্ন রব, যেখানে শোকার্ত্তের করুণ বিলাপ—সেইখানেই এই করুণাময়ী সন্ন্যাসিনীর হৃদয়-নিঃসৃত স্নেহ-মন্দাকিনী-ধারা সকল জ্বালা নিভাইয়া শতমুখে বহিয়া যাইতে লাগিল। নির্ম্মলবাবু সেই সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে অল্প কয়দিনের মধ্যেই গ্রামের আশাতীত শ্রী ফুটিয়া উঠিল

এদিকে নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী শোভা এখানে আসিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। সে নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া এবং একটা নূতন জায়গা ও সেখানকার অদ্ভুত মানুষগুলাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল। এখন দেখার আশা মিটিয়াছে—তাই মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে সে কত অনুপম পল্লী-সৌন্দর্য্য দেখিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিল তাহার বিপরীত। যাহারা তাহার সকল সময়ের সঙ্গিনী, সেই জ্ঞাতি বালাগণ না জানে কায়দা করণ,—না জানে সাজসজ্জার বিচিত্র কৌশল—না জানে একটা কথা বলিতে! শোভা ভাবিল,—'ছিঃ এখানে মানুষ বাস করে?' এখানে পূজার আয়োজনও একটু অন্য রকমের দেখিল। সে আজন্ম সহরের পারিপাট্যময়ী আধুনিক শিক্ষিতা নারী, সুতরাং পূজার আয়োজন বলিতে একমাত্র বুঝে—নূতন সাজ-সজ্জা, নানাবিধ নূতন পুরাতন পদ্ধতির খাদ্যসম্ভারের আয়োজন। কিন্তু পল্লীগ্রামে সকল বিষয়েই চিরন্তনীটুকু বজায় থাকা চাই—তাই প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেদের খাওয়াপরার আয়োজন ছাড়া যথাসাধ্য পবিত্রতা রক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ প্রস্তুত করিবেই। অবোধ শিশুর লোলুপ

দৃষ্টির অন্তরালে ৺মার ভোগের মিষ্টান্ন ইত্যাদি প্রস্তুত সকলেই করিয়া থাকে। পূজার দিনে যাহার শাকান্নও জুটে না, সেও শুধু মঙ্গল-ঘট আর আম্রপল্লবে তাহার ভগ্নকুটীর সজ্জিত করিয়া মার [illegible] করিয়া থাকে। এটা তাহাদের চিরন্তনী রীতি।

দেখিতে দেখিতে—"শারদ সপ্তমী-উষা গগনেতে [illegible] দশদিক আলো করি' দশভূজা মা আসিল।" খুব আড়ম্বরের সহিত মার বোধন উৎসব শেষ হইল, নির্ম্মলবাবু অনশনে থাকিয়া নিজে [illegible] করিলেন। সেই বৈকাল বেলায় বাড়ীর মধ্যে আসিয়া [illegible] যেন স্ফূর্ত্তি নাই, মনটা ভারী ভারী। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে [illegible] "আমার এখানে মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না।" নির্ম্মল—"[illegible] কেন?" শো—"আপনি এলেন কেন?" নি "আমার বাপ[illegible] আমি জন্মেছি, সুতরাং আস্‌তে বাধ্য।" শো—"তবে স্ত্রী আ[illegible]ক ছেড়ে কোথায় থাকে?" নি—"তাই যদি বুঝে থাক, তবে আমি আজ যে কাজের ভিড়ে প্রাণ ঢেলেছি, তুমি তা থেকে দূরে কেন?" [illegible] "আমার প্রাণ এত সস্তা নয় যে, এই নরককুণ্ডে ঢেলে দিয়ে [illegible] হব।" নি—"উত্তম! তবে তুমি স্বর্গে ফিরে যাও, পূজার পরে [illegible]র ব্যবস্থা করে' দিব।" নির্ম্মলবাবু এই কথাগুলি একটু জোরে বলিলেন, তাহাতে বিরক্তির ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিল। শোভা একেবারে দ[illegible] ফণিনীর ন্যায় ভিতরে ভিতরে গর্জ্জিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে বলিল, "আপনার এ ভাবান্তর আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করে এসেছি। [illegible] আমিই যদি আপনার সকল সুখের অন্তরায় হয়ে' থাকি আমায় পাঠিয়ে দিন আমার বাপ-মার কাছে। আমি এখানে থাকতে চাই না" এই কথা শুনিয়া নির্ম্মলবাবু বলিলেন—"তুমি এখানে থাকবে সে [illegible] ও আমি করিনি, তবে আমার কর্ত্তব্য করেছিলাম মাত্র। কিন্তু মনে [illegible]— আমি আজ পর্য্যন্ত শুধু নিত্য নূতন সখ মিটাবার জন্য জলের মত অর্থব্যয় করে' এসেছি, কখনও বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ চিন্তা করিনি। এখন চোখ ফুটেছে—আর নয়! আমার দোষে আমার পিতৃপিতামহের [illegible]র-পবিত্র সুখের রাজ্য ছারখার হতে' বসেছে, তাও বুঝেছি—আর না! এখন থেকে

আমার এই পাপে-ভরা শরীরটা পর্য্যন্ত পল্লীমাতার জীর্ণ শীর্ণ আসন্ন মৃত্যু সন্তানদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। কাজে কাজেই বুঝেছি, তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে না।" ক্রোধে, অভিমানে, মিষ্টভৎর্সনায় শোভার চক্ষে জল আসিল—সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। নির্ম্মল বাবুও উঠিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, এমন সময় সন্ন্যাসিনী আসিয়া বলিলেন,—"চলুন মার আরতি দেখ্‌বেন!" শোভার নিকটে গিয়া বলিলেন,—"চল বোন! মার আরতি দেখ্‌বে।" শোভা প্রথমে কোন কথাই বলিল না, পরে অনেক পীড়াপীড়িতে—"আমার ওসব ভাল লাগে না এবং শরীরও বেশ ভাল নেই" বলিয়া জবাব দিল। নির্ম্মলবাবু ও সন্ন্যাসিনী বাহিরে গেলে শোভা বলিল,—"এই হতভাগিনীটাই যত অনর্থপাতের মূল। আজ আমার সখের তুলনা দেওয়া হল—কিন্তু এ যে এসে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না!"

অষ্টমীর দিন একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল। কারণ গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই পূজা দেখিতে আসিয়াছিল। ভদ্রলোকেরা পূজার দালানের বারান্দায় প্রতিমার সম্মুখে এবং ছোট লোকেরা তৎসম্মুখস্থ নাট মন্দিরে বসিয়াছিল। কিন্তু উহাদেরই মধ্যে কয়েকটী নীচ জাতীয় বালক-বালিকা বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল। হোমানলে পূর্ণাহুতি দিয়া পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন সকলের কপালে যজ্ঞীয় ফোঁটা দিতেছিলেন, তখন ভুলক্রমে উহাদের ছুঁইয়া ফেলেন। ইহাতেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি তাহাদের ভৎর্সনা করিতে করিতে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। নির্ম্মলবাবু এটা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—"মহাশয় ওরকম বাড়াবাড়ি এখানে চল্‌বে না! আমার এই পূজা-মন্দিরে সকলেরই সমান অধিকার আছে, এটা যেন মনে থাকে"! কথাটায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অত্যন্ত চটিয়া উঠিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। একজন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিলেন,—"সেকি বলেন? মন্দিরটা না হয় আপনার—তা বলে কি পূজার সময়ে শাস্ত্রের বিধি মেনে চল্‌তে হবে না? অস্পৃশ্য জাতি পূজারী ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে দিবে এটা কি রকম আস্পর্দ্ধার কথা? এযে একেবারে ম্লেচ্ছের মত কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছি?

নির্ম্মলবাবু বলিলেন,—“হতে পারে ম্লেচ্ছের কাণ্ড ! কিন্তু আমার বিশ্বাস বিশ্বজননীর পূজায় ওরূপ ভণ্ডামী উচিত নয়, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান।” অতঃপর পূজা শেষ হইলে সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য, নির্ম্মল বাবুর উপর তাঁহারা একেবারে খড়্গহস্ত হইলেন। অনেকে ভাবিলেন,—ঘোর কলিকাল ; ধর্ম্ম বুঝি আর থাকে না !

নবমীর দিন মহাসমারোহে মার প্রসাদ বিতরণ করা হইল। গ্রামের সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ভট্টাচার্য্যের দল বাজে আপত্তি দেখাইয়া আসেন নাই। যাহা হউক, নির্ম্মলবাবু ও সন্ন্যাসিনী ইতর-দরিদ্র লইয়াই সেই মহোৎসব সুসম্পন্ন করিলেন। আজ সেখানে যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা মা দুই হস্তে ক্ষুধাতুর সন্তানদের অন্ন বিলাইলেন। সে কি মহিমময় দৃশ্য ! নির্ম্মলবাবু আত্মহারা হইয়া গেলেন ; কারণ এত আনন্দ তিনি কখনও পান নাই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবিলেন, “যদি মানুষ হয়েছি— ধনসম্পদ্ পেয়েছি, তখন এই অপার্থিব আনন্দের বিনিময়ে তাহা বিলিয়ে দিব না কেন ? তারপর সেই আনন্দ-ময়ী হাস্যময়ী পল্লীভূমি শোকরাগে রঞ্জিত করিয়া বিজয়া দশমী উপস্থিত হইল। অপরাহ্নে সকলেই অশ্রু-ভারাক্রান্ত চক্ষে বিসর্জ্জনের গান গাহিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিল। নির্ম্মলবাবু বিষণ্ণ মনে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বসিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিনের বিপুল আনন্দের উত্তেজনাজনিত অবসাদ আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল। নির্ম্মলবাবু যেন কাঁপিতে কাঁপিতে তাহা খুলিয়া পড়িলেন,—

“আজ আমি চল্‌লাম, যদি তাঁর ইচ্ছা হয় আবার দেখা হতেও পারে, না হতেও পারে। আপনি আমার পরিচয় চেয়েছিলেন, কিন্তু কি পরিচয় দিব ? আপনার বাল্য সহচরী ‘মনি’কে মনে পড়ে কি ? যেদিন এক সঙ্গে খেলিয়া বেড়াতাম—এক চিন্তায়, এক আনন্দে আত্মহারা হ’তাম সেদিন মনে পড়ে কি ? আমি কুলীনের মেয়ে, কিন্তু আমার বাবা গরীব ! তাই তিনি রাজরাণী করবার আশায়—আমাকে আপনার শৈশব-সঙ্গিনী ক’রে একসূত্রে বেঁধে দিলেন। জানি না কিম্বা মনে নেই,

আমাদের বিবাহ হয়েছিল কি না! তারপর—আপনি যখন সহরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষিত হ'য়ে আমার কোন খবরই নিলেন না, তখন আমার গরীব পিতা নিষ্ঠুর অদৃষ্টকে উপহাস ক'রে আমার যথাসাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌লেন। অবশ্য তা স্কুল-কলেজের শিক্ষা নয়, তাঁহার স্ব-বুদ্ধির শিক্ষা। তারপর কুলীনের মেয়ে পিত্রালয়েই জীবন কাটায়, এই ভাবিয়া—তিনি আমায় নিয়ে তীর্থ-পর্যাটনে গেলেন। অনেক স্থান ঘুরে কাশীতে এক সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে তিনি এই চির অভাগিনীকে এক অজ্ঞাত অভি-ভাবকের হাতে সমর্পণ ক'রে বিদায় নিলেন। মা ত আগেই গিয়েছিলেন। তারপর?—তারপর সেইদিন থেকে এই ভিখারিণী মুক্ত কণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে তার নূতন অভিভাবকের মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে পড়ল। অনেকদিন পরে সেই মেলায় আপনাকে দেখেছিলাম, আপনি চেনেননি, আমি চিনেছিলাম। তারপর সব জানেন। এখন আমার সঙ্গ আপনার ভাল লাগ্‌লেও আমি একটু দূরে থাকব, কারণ এ শরীর ও মন আর আমার নয়, সেই নূতন অভিভাবকেরই অধিকারে। আপনি শত চেষ্টা করলেও আমায় দেখ্‌তে পাবেন না, তবে যদি কখন দিন আসে, যদি সমস্ত পার্থিব বাসনা কখন একেবারে তাঁর চরণে ফেলে দিতে পারি—আবার আসব। আপনিও প্রস্তুত হন—আপনার সব ইচ্ছাশক্তিকে একবার পূর্ণবেগে সেই সুধাসিন্ধুপানে ছুটিয়ে দিন দেখি? মিলনের পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ করবেন—তাই বল্‌ছি আবার পূজার আয়োজন করুন। জীবনের অনেক পূজা এখনও বাকী রয়েছে। আবার এই সন্ন্যাসিনী আস্‌বে—যেদিন আপনি কেবল পূজার আনন্দেই ভরে উঠবেন, অন্যদিকে তাকাবেন না। আজ তবে বিদায়।" ইতি—

'সন্ন্যাসিনী'

(সমাপ্ত)

ভারতীয় আচার্য্যগণ ও সমন্বয়।

(শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম প্রধানতঃ শঙ্কর-প্রদত্ত আকারেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। মহাত্মা বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, বেশভূষা, অস্থি ও ভস্ম প্রভৃতি লইয়া অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৈত্য, সঙ্ঘারাম ও বিহার প্রভৃতি তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দ্বারা ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, মঙ্গোলিয়া শ্যাম, ইনাম ও জাপান প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণ ধর্ম্মরাজ্যের নিম্নস্তরের বিরাট জনসঙ্ঘের ধর্ম্মোন্নতির জন্য বৌদ্ধ আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র স্থপতি ও ভাস্কর বিদ্যার চরম অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মঠ, মন্দির ও আশ্রম প্রভৃতি সংস্থাপন করিলেন। জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্করের অশ্রুতপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ অদ্বৈতবাদের অন্যতম প্রতিপাদ্য হিন্দুশাস্ত্রের অসংখ্য দেবদেবী প্রতিমূর্ত্তিরূপে উক্ত মন্দিরাদিতে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতে লাগিল। এইরূপে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও মূর্ত্তিপূজা হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সময় দেবদেবীগণের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তারূপে বিষ্ণু এবং সংহারকর্ত্তারূপে মহেশ্বর এই তিনটী দেবতার মূর্ত্তিপূজাই অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত দেখা যায়। এই তিনটী দেবতার মূর্ত্তিই তৎকালীন অধিকাংশ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়াছিল। শঙ্কর নিজে বেদান্তের অদ্বৈতবাদমূলক নির্গুণ ব্রহ্মের প্রচারক হইলেও মহেশ্বরের পরমভক্ত ছিলেন, এই জন্য শঙ্কর মতাবলম্বিগণ অদ্বৈতবাদী হইয়াও শৈব বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। ব্যাস পরবর্ত্তীকালে এই তিনটী দেবতার মধ্যে এক একটীকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক একজন ঋষি নানাপ্রকার উপাখ্যানের ভিতর দিয়া ইহাদের কোন একজনের

মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছেন। সকল পুরাণই কোন দেবদেবী বিশেষকে প্রধান করিয়া অপর দেবদেবীগণকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও, উহাদের কোনটীতে সমন্বয় ব্যঞ্জক শ্লোকাবলীর অভাব নাই।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের কয়েক শতাব্দী পর শাঙ্কর বৈদান্তিকদের ধর্ম্মও বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর মতাবলম্বী শৈবগণ কালক্রমে সগুণ ব্রহ্মকে নিকৃষ্টাবস্থা মনে করিয়া প্রেম-ভক্তিশূন্য শুষ্ক জ্ঞান-বিচার অবলম্বন করিলেন। ভক্তিশূন্য জ্ঞান-পক্ষপাতিত্য দোষ শঙ্কর মতাবলম্বিগণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া ধর্ম্মের মধ্যে একটা শুষ্কতা ও কঠোরতা আনয়ন করিল। অসমুচ্চয়-বাদ কর্ম্মে ঔদাসিন্য আনয়ন করিল। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'তত্ত্বমসি' ও 'অহংব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি তত্ত্বপূর্ণ বেদান্ত বাক্য বিকৃতার্থে প্রযুক্ত হইয়া ধর্ম্মের নামে সমাজে বিবিধ অনর্থের সূত্রপাত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্ শঙ্করের প্রচারিত উন্নত বেদান্ত ধর্ম্ম বিকৃতাকর প্রাপ্ত হইল।

শাঙ্কর-বৈদান্তিক ধর্ম্মের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক ধর্ম্মকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্ম। বৈষ্ণব বলিতে এস্থলে বিষ্ণুর উপাসক সম্প্রদায়কেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি,—ভগবান্ রামানুজ বা চৈতন্য অথবা তাঁহাদের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোন বৈষ্ণব মহাত্মগণের প্রচারিত বৈষ্ণব মতকে লক্ষ্য করিতেছি না। তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, "বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদেরই ভিতরে এই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল—তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি" (১)। বৌদ্ধ ধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়িলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তে এই বৈষ্ণব, শৈব ও তান্ত্রিকমত বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পৌরাণিক বৈষ্ণব ও শৈব এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মও কালক্রমে নানা-প্রকার দোষযুক্ত হইয়া পড়িল। জ্ঞানকর্ম্ম বিদ্বেষ তৎকালীন বৈষ্ণব

(১) ভারতে বিবেকানন্দ।

সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিয়া উহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। সগুণ ঈশ্বরকে ধর্ম্মের চরমাদর্শ মনে করিয়া নির্গুণব্রহ্ম, একেশ্বরবাদ ও জ্ঞানবিচারাদির প্রতি তাহারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। শৈব সম্প্রদায় ও এতদ্বিপরীত বিষয় গুলির পক্ষপাতিত্ব নিবন্ধন বিকৃত দশা প্রাপ্ত হইল। ওদিকে তান্ত্রিক সম্প্রদায় অশাস্ত্রীয় প্রণালী বামাচার বীরাচার ও পঞ্চমকার প্রভৃতি অতুচ্ছ তান্ত্রিক সাধন প্রণালীর অনুসরণ করিতে যাইয়া অনাচারে মত্ত হইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মের পবিত্র নামে সমাজকে অধর্ম্মানলে দগ্ধ করিতে লাগিল। পৌরাণিক বৈষ্ণব ও শৈব এবং তান্ত্রিকধর্ম্মের লক্ষ্যৈক আদর্শ এক এবং সমন্বয় ভাবমূলক হইলেও ইহাদের পূর্ণ অধঃপতনের যুগে ইহারা পরস্পরকে বিদ্বেষ নয়নে দেখিতে লাগিল। ভারতের সুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্র এবং গুপ্ত বংশের চৌহান, প্রমার, রাঠোর, সোলাঙ্কী, চের, চোল, কেরল, চালুক্য, দ্বার-সমুদ্র, বরঙ্গল, পাল ও সেন প্রভৃতি স্ব স্ব প্রধান স্বাধীন রাজবংশের হিন্দু নরপতিগণের অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যের রামানুজ ও আর্য্যাবর্ত্তের শ্রীচৈতন্যের অববির্ভাবের কতিপয় বৎসর পর পর্য্যন্তও এই তিনটী মতের কোন একটীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপর মতাবলম্বিদের প্রতি যে গোঁড়ামীপূর্ণ অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তিসহিষ্ণু হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক বলিয়া পরিগণিত। (৮)

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও আত্মকলহের পূর্ণ প্রভাবের সময়,—হিন্দুধর্ম্মের এই শোচনীয় অধঃপতনের যুগে সাম্য মৈত্রীর মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ইসলামধর্ম্ম বিজয় গর্ব্বে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া ভীমবিক্রমে ভারতে প্রবেশ লাভ করতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব প্রলয়ঙ্করী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। ঈশ্বর প্রেরিত মহাত্মা মহম্মদ প্রচারিত মহানসত্য কোরাণ সরিফের উপদেশ ও বেদবেদান্ত দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এক এবং অভিন্ন হইলেও দিগ্বিজয়-গর্ব্বস্ফীত গোঁড়া মুসলমানগণ ও ভেদবিরোধে মদান্ধ অর্বাচীন আত্মকলহ প্রমত্ত তৎকালীন অবনত হিন্দু সমাজ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইতে পারিল না। কোরাণের "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং

বেদান্তের "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" মূলতঃ একার্থবোধক হইলেও দেশকাল পাত্রগত আপাত ভেদবাহুল্যে মুসলমান হিন্দু পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষ নয়নে দেখিতে লাগিল। এই বিদ্বেষের মাত্রা রাজকীয় শক্তি সাহায্যে সময়ে সময়ে প্রবলবেগ ধারণ করিয়া প্রায় সহস্র বৎসর কাল যাবৎ ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতীয় জীবনকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় পঙ্গু, করিয়া রাখিয়াছে! হিন্দু-মুসলমানের আপাত ভেদ ও অসামঞ্জস্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এবং রাজকীয় ইসলাম ধর্ম্মের ঐকান্তিক প্রভাব হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বিশেষত্বকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মুসলমান রাজত্ব কালে মহাত্মা রামানন্দ, মধ্ব, কবীর, রামানুজ ও চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণ প্রায় এককালে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমত বিভিন্ন হইলেও; ইঁহাদের মধ্যে মুসলমানধর্ম্মের দৃঢ় একেশ্বরবাদ ও সামাজিক ঔদার্য্য প্রভৃতির প্রভাব ও মূলগত ঐক্য বিদ্যমান দেখা যায়। ইঁহারা প্রায় সকলেই প্রচার করিয়াছেন যে 'সকল ধর্ম্মই মূলতঃ এক,—নামে ভিন্ন মাত্র, কারণ এক ঈশ্বরই সকলের উপাস্য'। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মুসলমানদের সময় হইতে হিন্দুর সকল ধর্ম্মাচার্য্যই জাতি ভেদ ও জল-অচল প্রথার একান্ত বিরোধী ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মের জাতীয় জীবন যখন সতেজ ছিল,—হিন্দুধর্ম্ম যখন উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরূঢ় ছিল, তখন সে শতসহস্র গ্রীক, শক, হুন ও পার্শি প্রভৃতিকে আপনার বিরাট অঙ্গে স্থান দান করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়াছ বটে কিন্তু ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে ভারতকে সমন্বয় ধর্ম্মের পুণ্যতীর্থে পরিণত করিবার জন্যই হিন্দু ধর্ম্ম মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া তাহাকে আপনার ভিতর মিশাইয়া ফেলিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, হিন্দুধর্ম্মের জীবনী শক্তি যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও আত্মকলহে নিস্তেজ হইয়া অবনতির নিম্নতম স্তরে উপনীত হইয়াছিল—হিন্দুধর্ম্মের সেই দুর্দ্দিনে ইসলামধর্ম্ম ভারতে প্রবিষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ বিজয় গর্ব্বস্ফীত মুসলমানগণ সাম্য মৈত্রীমূলক ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করায় এবং তাহার ফলে ইসলামধর্ম্ম

রাজকীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় উহা হিন্দুধর্ম্মের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয়তঃ বিজয়ী ইসলামধর্ম্ম ভারতের রাজকীয় ধর্ম্মরূপে গোঁড়া পীর ফকীর ও মোল্লাগণ দ্বারা রাজসহায়ে রক্তাক্ত অসিদ্বারা প্রচারিত হয়। হিন্দুগণ জড় বিজ্ঞান-উন্নত সুসভ্য বৃটিশ জাতির ধর্ম্ম-জাতি-বর্ণনিরপেক্ষ সুশাসনে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় আটশত বৎসর কালে রাজকীয় ইসলামধর্ম্মের অল্লাধিক প্রভাব ক প্রতিহত করিয়া যে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে,—ইহা তাহার অশ্রুতপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক অজেয় শক্তিমত্তার পরিচায়ক। পৃথিবীর আর কোনও জাতি এরূপ অসামান্য প্রভাবকে প্রতিহত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

যাহা হউক, শাঙ্কর-বৈদান্তিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিকৃত দশা প্রাপ্ত হইলে, এবং নবোত্থিত ইস্লাম-ধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুর সকল ধর্ম্ম-প্রথা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই সময় হিন্দুধর্ম্মভুক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপাতবিরোধী মুসলমান-ধর্ম্মের প্রভাব হইতে আপনা ক সম্যক্ রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার সংকীর্ণ বিধিব্যবস্থার গণ্ডিভুক্ত হয়। পাঠান-রাজত্ব কালে খৃষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য ও বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য আবির্ভূত হন। প্রায় এই সময়েই রঘুনন্দনাদি স্মৃতি সংগ্রহকারগণ বর্ত্তমান ছিলেন। বর্ত্তমান কালের— প্রচলিত জাতিভেদ, জল অচল, সমুদ্র যাত্রা ও সবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি অধিকাংশ সামাজিক নিয়ম প্রণালী এই সময় রঘুনন্দনাদি স্মৃতি পণ্ডিতদের প্রভাবে ধর্ম্মের নামে হিন্দু সমাজে স্থানলাভ করে। এই সকল সামাজিক নিয়ম প্রণালী ধর্ম্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র, ইহাদের সহিত ধর্ম্মের বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। এই সকল সামাজিক বিধি ব্যবস্থা তৎকালীন হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণের উপযোগী হইলেও উহাদের ঠিক ঠিক অনুসরণ বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যাহা একদিন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছে,— তাহাই আবার বর্ত্তমান যুগের উন্নত সমন্বয়বাদ ও বর্ত্তমান ভারতের নেশন্ প্রতিষ্ঠার ঘোর পরিপন্থীরূপে বিরাজমান! হিন্দুর সমাজ ইতিহাস পাঠে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্মৃতি শাস্ত্রের পরিবর্ত্তনশীল বিধি-

ব্যবস্থা যুগে যুগে অবাহমান কাল হইতেই আপনার বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

মুসলমানদের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে এক বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র শাঙ্কর-বৈদান্তিক শৈব-সম্প্রদায় এবং বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিকৃত ভাবের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। এই সময় ভারতের কোন কোন স্থানে পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম্মও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া নির্জীব অবস্থায় কোন রকমে আত্মরক্ষা করিতেছিল। শঙ্করাদ্বৈতিগণের ভক্তি-বিহীন কর্ম্ম-শৈথিল্য জ্ঞান-পক্ষপাতিত্ব দোষ ও পৌরাণিক বৈষ্ণবগণের জ্ঞান-কর্ম্মবিদ্বেষ ও বিকৃত প্রেমভক্তির পক্ষপাতিত্ব দোষ দূরীকরণার্থ দাক্ষিণাত্যে ভগবান্ রামানুজ আবির্ভূত হইয়া জ্ঞান-ভক্তিমূলক বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন। তিনি জ্ঞানমূলক বৈদান্তিক ধর্ম্ম সাধন করিবার পূর্ব্বে কর্ম্ম ও ভক্তির আবশ্যকতা শাস্ত্র যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিলেন। তৎপ্রচারিত অভিমত বৈষ্ণব ধর্ম্মদ্বারা বৈদান্তিক, শৈব ও পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হইল।

বিকৃত ভাবাপন্ন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রিয়তা ও বেদান্তদর্শনের প্রেম-ভক্তিময় ধর্ম্মের নামে শুষ্ক জ্ঞানবিচার মত্ততা নিষ্কাম প্রেমভক্তির জীবন্ত আদর্শ ভগবান্ মধ্বাচার্য্য ও ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবশ্যকতা আনয়ন করিবে। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবদোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলারূপ নিষ্কাম প্রেমোন্মত্ততার চরম মাধুর্য্যের প্রচারক, এবং এই দিক্ দিয়া প্রেমভক্তির আধ্যাত্মিক রাজ্যে তিনি যে পূর্ণতা নিজ জীবনে অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা জগতের ধর্ম্মেতিহাসে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইলেও উহা কেবল শ্রীকৃষ্ণগত বলিয়া অসম্পূর্ণ। বিশ্বরূপী অনন্ত শক্তি ভগবানের অনন্তভাবের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ মূর্ত্তি স্বরূপ দেবদেবীগণের নাম ও রূপ, বেদান্তদর্শনের ভক্তি প্রেমপূর্ণ কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড এবং সগুণ-নিগুর্ণ ব্রহ্মপদ, তন্ত্রশাস্ত্রের উন্নত মাতৃভাব এবং বৌদ্ধ ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সীমানার বহির্ভূত। প্রধানতঃ এই কারণেই তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও

তৎপ্রাপ্তি সাধনোপায় ভিন্ন অন্যান্য সকল রূপ ও ভাব এবং ভগবল্লাভের প্রণালী সমূহের উপর কটাক্ষপাত করিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যুদার প্রেমধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিষ উদ্গিরণ করিয়াছেন।

মুসলমানগণের ভারতে আগমনের পর হইতে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে সকল অবতার ও ধর্ম্মাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের রামানুজ ও বঙ্গের চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। তদ্ব্যতীত বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি রামানন্দ প্রবর্ত্তিত রামাৎ বা রামায়েৎ, ভক্তবর রামদাস প্রবর্ত্তিত রয়দাসী, প্রেমিক প্রবর মুলুকদাস প্রবর্ত্তিত মুলুকদাসী, হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্ম-সমন্বয় প্রচারক মহাত্মা কবীর প্রবর্ত্তিত কবীর পন্থী, উদার হৃদয় দাদু প্রবর্ত্তিত দাদু পন্থী, তুলসীদাস প্রবর্ত্তিত কুড়া-পন্থী, সন্ন প্রবর্ত্তিত সন্ন-পন্থী, প্রেমিক ভক্ত চরণদাস প্রবর্ত্তিত চরণ-দাসী জিতেন্দ্রিয় রামশরণ পাল প্রবর্ত্তিত কর্ত্তাভজা ও মহাত্মা বলরাম হাড়ি প্রবর্ত্তিত বলরামী (১) প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ভারতের প্রদেশ বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিলেও হিন্দুধর্ম্মের উপর উহাদের প্রভাব কম নহে

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গের শ্রীচৈতন্যের সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশে মহাত্মা নানক শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। ধর্ম্মপ্রাণ গুরু গোবিন্দসিং ও তেগবাহাদুর প্রভৃতি স্বনামধন্য শিখ গুরুগণের আত্মত্যাগে শিখ সম্প্রদায় পাঞ্জাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মের সংমিশ্রণে রাজনৈতিক কারণে শিখ সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। ইহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেবের' উপদেশ উন্নত, উদার, গভীরতত্ত্বপূর্ণ এবং পরধর্ম্মদ্বেষ বিবর্জ্জিত।

(ক্রমশঃ ।

(১) ৺অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।

ঠাকুরের আলেখ্য সম্মুখে।

(শ্রীমতী চিন্ময়ী রায়)

ছবি নয় এ ছবি নয় এ
অপূর্ব্ব এ দান
এই দানেতে ভরেছে মোর
সকল গৃহ খান।
এই দানেতে ভরেছে মোর
সকল মন প্রাণ।
ছবি নয় এ ছবি নয় এ
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার
এ যে সকল ভুবন আলো করে
ঘুচায় অন্ধকার।
ছবি নয় রে ছবি নয় রে
কি ভাবছিস্ ওরে
প্রেমের সাগর মহা সিন্ধু
উপচে পড়ে ছেরে।
হৃদয় ছেয়ে আলোর কণা
ঠিকরে যেন পড়ছে সোণা
এ প্রেমের নাই তুলনা
পাগল হয়ে যারে,
ঐ ছবিটীর পানে চেয়ে
দৃষ্টি হারা হ'রে।
ছবি নয় রে ছবি নয় রে
এ যে মোদের তরে
কালের ধ্বংস বিনাশ করি
বিজয় গর্ব্ব ভরে

চির দিনের তরে যেরে
রইল মোদের ঘরে।
ঐ ছবিটার পানে চেয়ে
অবাক হয়ে যারে;
দেখবি ভুবন আলোকরা
ব্রহ্মাণ্ড পায় দেয় সে ধরা
ফুলের গন্ধে পাখীর গানে
শোকের অশ্রু ভারে
(এযে) শান্তিরসে হৃদয় মন
স্নিগ্ধ করে যেরে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
কেন্দ্রচ্যুত হয় না তারা
ঘুরে ঘুরে নয়ন রাখে
ঐ নয়নের পরে।
(তুই) চরণ পদ্মে দৃষ্টি-রাখি
স্তব্ধ হয়ে যারে।
বিন্দু মাঝে সিন্ধু কেমন
লুকিয়ে থাকতে পারে
ঐ ছবিটির পানে চেয়ে
বুঝতে পারবি যেরে।

কাশ্মীরে অমরনাথ।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাশ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা বাসায় ফিরিবার কিছুক্ষণ পর হইতে দারুণ মেঘ গর্জ্জন ও বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত তুমুলধারে বৃষ্টি হইল। এত বৃষ্টি আমাদের বাঙ্গালায় কখনও দেখি নাই। আমাদের ভয় হইতে লাগিল হয়ত রাস্তা ধস খাইয়া গিয়াছে আর যাইতে পারিব না, তাহা ছাড়া এত জলে বাহিরই বা হইব কি প্রকারে। অবশেষে ৭টার সময় জল থামিল এবং আমরা কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করতঃ বাহির হইয়া পড়িলাম। ভগবানের কৃপায় রাস্তায় বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। রাস্তায় একটা চটিতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া, বেলা আন্দাজ ৪ টার সময় জ্বালামুখী উপস্থিত হইলাম। আসিয়াই পাণ্ডার বাড়ী আশ্রয় লইলাম। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর পাণ্ডাঠাকুর কে কি রকম পূজা দিবেন জানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং আমরা পুরোহিত মহাশয়ের সহিত মন্দিরে যাইয়া পূজাদি সমাপন করিলাম। বিস্তৃত একটা মন্দিরের গর্ভগৃহের সাত স্থানে সাতটা অগ্নিশিখা পৃথিবী ভেদ করিয়া লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রধান শিখাটা ছোট এবং সুন্দর নীলাভ ; ইহা একটা রৌপ্য দ্বারা বাঁধান কুলুঙ্গির মধ্যে জ্বলিতেছে। পূজার প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি এই শিখা সমীপে সম্পাদন করা হইয়া থাকে এবং ইহাকেই সত্যযুগে পতিত সতীর জিহ্বা স্বরূপে গণ্য করা হয়। অন্য ছয়টি শিখাও পবিত্র বলিয়া গণ্য হয় এবং কেবল মাত্র পুষ্প দ্বারা পূজিত হয় ; শেষোক্ত ছয়টির মধ্যে একটা এক গহ্বর মধ্যে আছে এবং উহা অপেক্ষাকৃত বড়। শুনিয়াছিলাম শিখা সমীপে নৈবেদ্য ধরিলে উহা বক্র হইয়া আসিয়া ভোজ্য স্পর্শ করে কিন্তু সে কিম্বদন্তী অলীক দেখিলাম। পূজার বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই। গর্ভগৃহ ও তাহার সম্মুখের দালানটুকু মার্ব্বেল পাথরের বাঁধান।

মন্দিরের শীর্ষ দেশ সোনালি গম্বুজ ও চূড়া দ্বারা অলঙ্কৃত এবং দরজা কাজকরা রূপার পাত দ্বারা আচ্ছাদিত। একটি কুণ্ড মধ্যে পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে একটি জলধারা-আসিয়া পড়িতেছে; ঐ কুণ্ডের পূজা হয় এবং উহার জলেই পূজা কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই কুণ্ডাতিরিক্ত জল আর একটি কুণ্ডে গিয়া পড়িয়াছে; উহা স্নানার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রাঙ্গণের কিয়দংশ ভাঙ্গা পড়িয়া আছে। এখানে দেবীর নাম মালিনী, সাধারণে ইঁহাকে লটনওয়ালী দেবী বলিয়া থাকে। এই স্থানে বলিয়া রাখি জ্বালমুখী গ্রামটী এক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত; বাড়ীগুলি থাকে থাকে উপরে উঠিয়াছে। মন্দিরের উপরিভাগে দুই একটা ভিন্ন আর বাড়ী নাই। আমরা পূজাদি সমাপন করিয়া এখান হইতে বহুউচ্চে অবস্থিত ভৈরবের (নাম—উন্মত্ত ভৈরব) মন্দির এবং পর্ব্বতের অন্যদিকে প্রায় শিখরের নিকট অপর একটী শিব মন্দির দর্শন করিলাম। ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গেলেন এবং আমরা আর বাসায় না আসিয়া আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথা সময় আরতি দেখিয়া ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি সরিয়া বাসায় আসিলাম ও পাণ্ডার লোক দ্বারা প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া শয়ন করিলাম।

জ্বালামুখী গ্রামটীতে বাড়ীগুলি প্রায় পাশা-পাশি অবস্থিত এই জন্য ইহার আকারের তুলনায় লোক সংখ্যা অধিক। গ্রামের চতুর্দিকের ধ্বংশরাশি দেখিলে বুঝা যায় ইহা এককালে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১৯৫৮ ফিট। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে এই গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হয়; এখনও তাহার ধ্বংশ চিহ্ন বর্ত্তমান। মন্দির সংলগ্ন পাতিয়ালা মহারাজ-কৃত একটি সরাই আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে আটটী ধর্ম্মশালা আছে। দুর্গাপূজার সময় এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। গ্রামের অদূরে ছয়টি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, জ্বালামুখী সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ আছে যথাঃ মহাদেব জলন্ধর নামক দৈত্যকে এখানে পর্ব্বত চাপা দিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারই মুখ হইতে উক্ত অগ্নিশিখাগুলি নির্গত হইতেছে। যাহা হউক আমরা প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি ও দেবী দর্শনাদি করিয়া রওনা হইলাম এবং

বৈকালে বেলা ৪ টার সময় কাঙ্গাড়ায় উপস্থিত হইলাম। পরদিন সকালে আমরা পাঠানকোট যাইব এই জন্য সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া পাণ্ডাদিগের চুকাইয়া দেওয়া গেল এবং মন্দির ফণ্ডেও কিঞ্চিৎ দিলাম। পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মাল পত্রাদি সব লইয়া Motor stand এ আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শুনিলাম সাধারণ মোটরগাড়ি সেখানে আজ আসিবার কথা তাহা পথে বিগড়াইয়া গিয়াছে, কখন আসিবে তাহার কিছু ঠিকানা নাই। এই হেতু আমাদিগকে Postal mail motor এর আশ্রয় লইতে হইল; ইহার ভাড়া দ্বিগুণ ৬।৵০ স্থানে ১৩।০। কিন্তু ইহা খুব দ্রুত চলে এবং রাস্তায় বিগড়াইবার ভয় খুব কম। ৯॥০ টায় ছাড়িয়া ১০॥০ টার সময় সাপুর নামক চটিতে আসিয়া সকলে স্নানাহার করিয়া লইলাম। এখানে চটি-গুলিতে ব্রাহ্মণের প্রস্তুত দাল ভাত এবং চচ্চড়ি সর্ব্বদা তৈয়ারি পাওয়া যায়; লোক প্রতি ।০ লাগে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবস্থিতি করিয়া গাড়ী পুনরায় চলিল এবং বেলা প্রায় ২টার সময় পাঠানকোটে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষার পর রেল গাড়ী আসিল এবং আমরা সানন্দে তাহাতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় অমৃতসরে সাগর মলের পাঠশালায় পুনরাগমন করিলাম। পাঠশালার পণ্ডিতজী আজও আমাদের জন্য দাল রুটির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; আমরা তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিলাম এবং রাত্রি ১১টা বাজিলে অনাবৃত উদ্যানে শয়ন করিলাম। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সকলেই অনাবৃত স্থানে শয়ন করে তাহাতে কোন অসুখ করে না; কারণ এখানকার বায়ু খুব শুষ্ক, আমাদের দেশের ন্যায় আর্দ্র নহে, হিমও পড়ে না!

পরদিন (১৬ই জুলাই) সকাল ৮টার ট্রেণে আমরা লাহোর আসিয়া তত্রস্থ কালীবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমার বন্ধুদ্বয় তাঁহাদের আসবাব পত্রাদি তথায় রাখিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি টঙ্গা করিয়া প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিতে গেলেন। আমি গেলাম না কারণ আমার কাপড়-গুলি সাবান দিয়া পরিস্কার করিবার দরকার ছিল ও দুটী অন্নের

জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম। কাপড়গুলি পরিষ্কার করিয়া এবং কালীমাতার প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় এখানে যাঁহার বাড়ীতে থাকিবার কথা ছিল তিনি খবর পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের বাড়ী না গিয়া কালীবাড়ীতে আসার দরুণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের সংকল্প আজই রাত্রি ১১টার ট্রেণে লাহোর ত্যাগ করা; কিন্তু তিনি তাহাতে বাধা দিতে লাগিলেন অবশেষে স্থির হইল আজ সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে খাইয়া তবে যাইতে পাইব।

লাহোর খুব প্রাচীন সহর; কিম্বদন্তী এইরূপ যে, ইহা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের দ্বারা স্থাপিত; কিন্তু ইহার বিপক্ষে আপত্তিও আছে। যাহাই হউক না কেন লাহোর যে অতি প্রাচীন সহর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক বাড়ী ও সমাধির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর এখানে খওয়াবাগ (শয়নপ্রাসাদ), মতিমসজিদ ও আনারকালীস্থ সমাধিস্থান নির্ম্মাণ করেন; লাহোর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে রাভি (ইরাবতী—সিন্ধুনদের উপনদী) নদীর অপর পারে জাহাঙ্গীরের অতি সুন্দর সমাধি মন্দির, অদূরে নূরজেহান ও তাঁহার ভ্রাতা আসফ খাঁর সমাধি। সাহাজান এখানে সম্মন বুরুজ, শীসমহল, এবং জাহাঙ্গীরকৃত কাশ্মীরের শালিমার বাগের অনুকরণে একটি শালিমারবাগ নির্ম্মাণ করান। উক্ত শীসমহলে বসিয়া পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং বৈদেশিক সামন্ত রাজগণকে অভ্যর্থনা করিতেন এবং ঐখানে বসিয়া দলীপ সিং ইংরাজের হস্তে পাঞ্জাবরাজ্য সমর্পণ করেন। এই সকলগুলিই শিখদিগের দ্বারা অল্প বিস্তর ভগ্নাঙ্গ হইয়াছে। রণজিৎ সিংহের সমাধিও একটি দেখিবার জিনিস। এতদ্ব্যতীত আধুনিককালের আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য আছে, যথা:—সেট্রাল মিউজিয়ম, পশুশালা, লরেন্স গার্ডেন্স্ এবং মুসলমানদিগের কয়েকটি দরগা। আমরা সব কয়টি দেখিতে সময় পাই নাই; ভাল ভাল কয়েকটি বাছিয়া দেখিয়াছিলাম মাত্র। উক্ত ভদ্রলোক (ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়) অতি যত্নের সহিত আমাদের ঐ স্থানগুলি দেখাইয়া তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গেলেন এবং অতি সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনাদি করিলেন।

তৎপরে আমাদের সহিত ষ্টেশনে আসিলেন এবং আমাদের গুছাইয়া, গাছাইয়া ট্রেণে বসাইয়া দিলেন। যতক্ষণ না ট্রেণ ছাড়িল ততক্ষণ তিনি উপস্থিত রহিলেন।

গাড়ী ছাড়িবার কিছুক্ষণ পরেই আমার ও একটি সতীর্থের জ্বর হইল। জ্বর ভুগিতে ভুগিতে পরদিন বেলা ১১টার সময় রাউলপিণ্ডি পৌছাইলাম এবং ষ্টেশনের খুব নিকটে কালীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক বড় বড় স্থানে কালীবাড়ী আছে; এইগুলি সমস্ত স্থানীয় বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। বাস্তবিক এইসকল বাঙ্গালীর কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ। কত ব্যক্তি যে এখানে আশ্রয় ও প্রস্তুত অন্ন পাইয়া কৃতার্থ হন তাহা বলা যায় না। আমার মনে হয় প্রত্যেক গৃহস্থ বাঙ্গালী যে কেহ এখানে আশ্রয় লন তাঁহাদের মন্দির পরিচালনার্থে কিছু কিছু দান করিয়া যাওয়া উচিত। যাহা হউক যখন কালীবাড়ীতে পৌছিলাম তখন একপ্রকার অশক্ত; দুই দিন শয্যাগত থাকিয়া এবং ঔষধ খাইয়া জ্বর কমিল। একটী সঙ্গী আমাদের এই অবস্থা দেখিয়াও দ্বিতীয় দিনে আমাদের ত্যাগ করিয়া কাশ্মীর রওনা হইলেন, একবারও ভাবিলেন না যে, যদি অসুখ বাড়ে তাহা হইলে আমাদের কি অবস্থা হইবে। জীবনে মিত্র অধিকাংশ এইরূপই জুটে। যাহা হউক তৃতীয় দিন সুস্থ হইয়া ডাক্তার বাবুর আদেশ মত মুগের দালের খিচুড়ি খাইলাম। কালীবাড়ীর পূজক খুব যত্নের সহিত আমাদের তদারক করিতেন। ঐদিন বৈকালে টঙ্গা করিয়া রামবাগ দেখিয়া আসিলাম। এক পাঞ্জাবী ধনী ইহার নির্ম্মাতা; বিস্তৃত বাগান; বিস্তর ফলের ও ফুলের গাছ; স্থানে স্থানে সাধুদিগের জন্য এক একটি পাকা কুটীর। কুটীরস্থ সাধুগণই সমস্ত ফলভোগ করেন। বড়ই মনোরম স্থান। দেখিয়া পাঞ্জাবীদের উপর খুব শ্রদ্ধা হইল। বাস্তবিক এই জাতি ধর্ম্মের জন্য দানে বড়ই মুক্ত হস্ত। আরও একটি শিখদের বাগান দেখিয়া সহর দেখিতে দেখিতে বাসায় আসিলাম। এই সহরটী বেশ পরিস্কার, পরিস্কৃত রাস্তাগুলি চওড়া চওড়া; অনেক দোকান পশারী। সহরের আয়তনও ছোট নহে।

চতুর্থ দিনে সকালে উঠিয়াইয়া কাশ্মীর যাইবার জন্য মোটরের সন্ধানে চলিলাম। কাশ্মীর যাইবার কয়েকটী পথ আছে, তন্মধ্যে দুইটী আমাদের পক্ষে সুবিধা জনক। একটী জম্মু হইয়া এবং একটী রাওলপিণ্ডি হইয়া। প্রথমটিতে খরচ কম, কিন্তু পথটী সম্প্রতি তৈয়ার হওয়ায় যানের সংখ্যা কম অপিচ সর্ব্ব সময়ে মেলে না।

কালে এই পথটীরই ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় পথটীতে সর্ব্বপ্রকার যান সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, এই জন্য কোন প্রকার বিব্রতে পড়িতে হয় না। আজকাল চার প্রকার যান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ঃ—এক্কা, টঙ্গা, মোটর লরি ও মোটর কার। ধনবানেরা শেষোক্ত যান, সাধারণ গৃহস্থ তৃতীয় যান এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্রেরা প্রথম ও দ্বিতীয় যান ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন যানেরই ভাড়ার নির্দ্ধারিত হার নাই; যাত্রীর সংখ্যা বুঝিয়া ভাড়ার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আমরা লরিতে যাইব। ইহার ভাড়া ৮৲ হইতে ২৭।২৲ পর্য্যন্ত হয়। এই দিন সুবিধামত মোটর খুঁজিয়া পাইলাম না। পরদিন অর্থাৎ ২১শে জুলাই সকালে একখানি সম্মুখের Seat ২০৲ করিয়া ঠিক হইল। গাড়ীর মধ্যের Seat গুলিতে বড় গরম হয় ও ধূলা লাগে, এই গুলির ভাড়া ৩।৪৲ কম। গাড়ী ঐদিনই বৈকাল ৫টার সময় রওনা হইবে। অতএব আমরা বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। দুইটা বাজিবার পর মাঝে মাঝে বড়রাস্তায় গিয়া দেখিতেছি আমাদের মোটর আসিল কি না। আন্দাজ ৩॥০টার সময় ঐরূপে মোটারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে দেখি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যপ্রবর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ এক ব্রহ্মচারী সঙ্গে করিয়া মোটর যোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলে তিনি বলিলেন "লাহোরে কালীবাড়তে শুনিয়া আসিলাম তুমিও ৺অমর নাথ যাইতেছ, আমরাও চলিয়াছি"। সাধু সঙ্গে তীর্থ স্থানে যাইতে পাইব ভাবিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। আমি বলিলাম "মহারাজ, দয়া করে আমাকে আপনার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দিন"। তিনি সুখী হইয়া বলিলেন 'বেশত'। তাঁহাকে নামাইয়া কালীবাড়ীতে আনিলাম, কারণ তখন যাত্রায়

অন্ততঃ ২ ঘণ্টা দেরী ছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে তাঁহাকে কালীবাড়ীর পৃষ্ঠপোষক তত্রত্য খ্যাতনামা ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দত্তের ডাক্তারখানায় লইয়া গেলাম। তিনি সাদর সম্ভাষণে মহারাজকে আপ্যায়িত করিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। প্রায় ৫।০ হইলে তিনি তাঁহার মোটরে আসিয়া বসিলেন। ইত্যবসরে আমাদেরও মোটর আসিল এবং আমরা ৺মহামায়ীকে প্রণাম করিয়া আমাদের মাল পত্রাদি লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ী সমতল পথ অতিক্রম করিয়া নগাধিপ হিমগিরির মধ্যে প্রবেশ করিল। গতির হার কমিয়া গেল; ১৫ মিনিট অন্তর জলপান করিতে করিতে মন্থর গমনে অনবরত পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে চড়িতে লাগিল! ২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া পাঞ্জাব লাটের গ্রীষ্মাবাস মরি পাহাড়ে আসিয়া পড়িল। মরি ভারতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস; এবং রাউলপিণ্ডি হইতে ৩৭ মাইল দূর। এখানে অনেক লোকের বাস এবং বহু দোকান পশারি; প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায়। স্থানটী দেখিতে দেখিতে আমরা আরও ৩।৪ মাইল অগ্রসর হইয়া একটা অতি ছোট চটিতে উপস্থিত হইলাম; সন্ধ্যা হইয়াছে, আজ আর গাড়ী যাইবে না। এখানকার পার্ব্বত্য পথে আজ কাল মোটর গাড়ীকে সন্ধ্যার পর চলিতে দেয় না। আগে এই নিয়ম ছিল না; কিন্তু ২।১ খানি গাড়ী চালকগণের গোঁয়ারতমি বা অনবধানতা বশতঃ যাত্রী শুদ্ধ খাদে পড়িয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান নিয়ম হইয়াছে। এখন মালবাহী গরুর গাড়ী রাত্রে চলে এবং মোটর দিনে চলে। আরোহিগণ গাড়ী হইতে নামিয়া নিজ নিজ শয্যা মাত্র লইয়া মনোমত এক একটী দোকান ঘর বা হোটেলে যাইয়া আশ্রয় লইল। এই সব হোটেলে পাওয়া যায় মাত্র দালরুটি, কদাচিৎ দালভাত, এবং পিঁয়াজ যত চাও আর শুইবার জন্য এক খাটিয়া। রাউলপিণ্ডি জেলার ভিতর যত চটী আছে, তাহার কোনটীই ভাল নহে; বিশ্রামের ঘরগুলি অতি কদর্য্য। কিন্তু কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত চটি সমূহে বিশ্রাম স্থানগুলি রাজসরকার দ্বারা নির্ম্মিত এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; পুনশ্চ ইহার ভাড়া লাগে না। কিন্তু পাহাড়ীগুলা এত

নোংরা যে তাহাদের হাতে খাইতেই ঘৃণা করে। দুই এক স্থান ভিন্ন এঁটো বাসন মাজিয়া একখানা অতি ময়লা নেকড়া দিয়া মুছিয়া ফেলে। এইরূপ স্থলে আমরা আপনারাই জল দিয়া ধুইয়া লইতাম। এখানে ভাতেই কি, রুটিতেই কি কড়াইয়ের দালই প্রচলিত; তা আবার প্রায়ই খোসা শুদ্ধ। কদাচিৎ এক আধটী হোটেলে মুগ মেলে বটে, কিন্তু সে আস্ত (অর্থাৎ খোসাশুদ্ধ) মুগসিদ্ধ; যাহাই হউক তাহা পাইলেও মাঝে মাঝে মুখ বদলাই। তবে একটা সুখের বিষয় এই যে এখানকার ঘী বা আটা ভাল।

পরদিন প্রাতে সকলে মোটরে উঠিয়া যে যাহার স্থান গ্রহণ করিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় চালক ও যাত্রিগণের স্নানাহারের জন্য এক চটীতে গাড়ী ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিয়া পুনরায় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা গাঢ়ী নামক চটিতে আশ্রয় লইলাম। স্থানটী অতি মনোরম, বিতস্তার উপরেই অবস্থিত। নিকটস্থ একটী সেতুর উপর দাঁড়াইয়া স্বামী অভেদানন্দজী এক ইংরাজের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন ও নদীর এবং পর্ব্বতমালার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। মালপত্রাদি যাত্রিবাসে রাখিয়া এবং তখনও সন্ধ্যা হয় নাই দেখিয়া আমি তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম ও তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম। পরে জানিয়াছিলাম সাহেবটা একজন কাপ্তেন তাঁহার স্ত্রী কাশ্মীরে গুলমার্গে আছেন এবং তিনি তথায় যাইতেছেন। যাহা হউক তাঁহাদের বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতেছিল কাপ্তেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "আজ আমি নূতন আলোক পাইলাম" এবং স্বামীজিকে গুলমার্গে তাঁহার আবাসে যাইয়া দিনকতক থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ধ্যা আগত হইলে আমরা বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে আবার গাড়ী চলিতে লাগিল এবং মধ্যাহ্নে বরাহমূলা নামক চটিতে স্নানাহারের জন্য আসিয়া থামিল। বলিতে ভুলিয়াছি স্নানাহারের নিমিত্ত ব্যতীত আরও তিন বার তিনটী চটিতে 'টোল' দিবার জন্য গাড়ীকে আসিতে হইয়াছিল। এই স্থানগুলিতে গাড়ীর সমস্ত মাল সরকারী লোক পরীক্ষা করে

এবং নিয়ম মত কর যাত্রিগণের নিকট হইতে এবং চালকের নিকট হইতে, আদায় করিয়া লয়। মোটের উপর প্রত্যেক যাত্রীকে প্রায় ৩৲ করিয়া ট্যাক্স দিতে হইয়াছিল। আহারাদি সমাপ্ত হইলে গাড়ী পুনরায় চলিতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত আমরা পার্ব্বত্য পথে আসিতেছিলাম এবং বিতস্তা আমাদের নয়ন পথবর্ত্তী ছিল; কিন্তু বরাহমুলা হইতে বিতস্ত অদৃশ্য হইলেন এবং পথ সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে উচ্চশীর্ষ সফেদা Popler বৃক্ষশ্রেণী সরল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা পরস্পরের ব্যবধান অধিকাংশ স্থলে ৪।৫ফুটের বেশী হইবে না। দূর হইতে মনে হয় যেন রাস্তারদুইধারে গাছের দেয়াল দেওয়া রহিয়াছে; অতি মনোরম দৃশ্য। এই বৃক্ষ ভারতের আর কোন প্রদেশে দৃষ্ট হয় না। এই গাছের কাণ্ডটি যেন চুণকাম করা সাদা; এই জন্যই অনুমান হয় ইহার ঐ 'সফেদা' নাম হইয়াছে।

উভয় পার্শ্বে মাঠের মধ্যে শস্য ক্ষেত্র বর্ত্তমান। জলের অভাব নাই; ইহা এই প্রদেশের উর্ব্বরতার পরিচয় দিতেছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বৈকাল ৪ টার সময় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

ভক্ত-কবীর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমতী—)

শিষ্যগণে ডেকে কন মহাত্মা কবীর।
"যাবার সময় মম হইয়াছে স্থির॥
সংবাদ প্রদান কর কাশীবাসিগণে।
মণিকর্ণিকার ঘাটে যাবে সর্ব্বজনে॥"
শিষ্যেরা গুরুর আজ্ঞা ঘোষণা করিল।
দলে দলে লোক গঙ্গাতীরেতে ছুটিল॥

প্রিয়জন সকলেরে উপস্থিত দেখে।
সবারে সম্বোধি কন সাধু প্রিয় মুখে॥
"ইহজীবনের লীলা ফুরাল আমার।
সংসার ত্যাজিয়া আজি যাব পরপার॥
ম্লেচ্ছ ঘরে জনমিয়া হরিনাম রসে।
বৈষ্ণব হলাম আমি কর্ম্মসূত্র বশে॥
রাখিয়া কি ফল আর অপবিত্র দেহ।
মগর রাজ্যেতে মোক্ষ হইবে জানিহ॥"
কবীরের কথা শুনে সর্ব্বসাধারণ।
হাহাকার করি সবে করেন রোদন॥
মধুর বাক্যেতে কন "শুন বন্ধুগণে।
অনিত্য দেহের তরে শোক কি কারণে॥
সান্ত্বনা করিয়া লয়ে সঙ্গে সকলেরে।
চলিলেন মণিকর্ণিকার পরপারে॥
এইখানে এসে নিদ্রাকর্ষণ হইল।
শুলেন ভূমিতে শিষ্য বস্ত্রে আচ্ছাদিল॥
দুই প্রহর অতীত না ওঠে কবীর।
দেখি লোকবৃন্দ সবে হইল অস্থির॥
কবীরে জাগাতে বলে সর্ব্বসাধারণ।
অগত্যা শিষ্যেরা খোলে দেহ আচ্ছাদন॥
শূন্য ধরাশন দেখে বসনের নীচে।
কবীর পরমপদ নির্ব্বাণ লভেছে॥
বস্ত্র আচ্ছাদন পুনঃ ভূমিতে ফেলিয়া।
হাহাকারে কাঁদে সবে কাতর হইয়া॥
কবীর মহৎ লোক মহৎ হৃদয়।
হিন্দু ও যবনে তাঁর সমভাব হয়॥
আলী ও করীম রাম খোদা বস্তু এক।
তাঁহারি সন্তান সবে ভেদ কেন দেখ॥

পীর প্যায়গম্বর যে একই শ্রীহরি।
কেন ভেদ ভেবে মর আঁধারেতে ঘুরি
হিন্দু কি যবন তিনি নির্দ্ধার্য্য না হয়।
এ সম্বন্ধে আছে গাঁথা কবিগণে গায়।
কবীরের মৃত্যু হলে হিন্দু শিষ্যগণ।
সৎকার উদ্যোগ করে করিয়া যতন॥
যবন শিষ্যেরা চাহে কবর দিইতে।
বিষম বিবাদ চলে উভয় দলেতে॥
সহসা কবীর সাধু আসেন তথায়।
"মৃত আচ্ছাদন তোল" বলেন সবায়।
ভূমি হতে বস্ত্র তুলে দেখিল সকলে।
সুগন্ধি কুসুম রাশি বসনের তলে॥
দেখিয়া সকলে অতি বিস্মিত অন্তর।
অন্তর্দ্ধান হইলেন কবীর সত্বর॥
কাশী অধীশ্বর বীরসিংহ নরপতি।
পুষ্প অৰ্দ্ধ দাহ করি সযতনে অতি॥
কবীর-চৌর নামক স্থানে সমাহিত।
করিলেন পুষ্প ভস্ম ভক্তির সহিত।
পাঠান রাজ বিজলী খাঁ অৰ্দ্ধ অপর।
গোরক্ষ পুর নিকটে দিলেন কবর॥
মগর নামক গ্রামে করেন স্থাপন।
সুন্দর সমাধি স্তম্ভ উপরে নির্ম্মাণ॥
কাশীতে সৎকার করি আনন্দ অন্তরে।
করেন কীর্ত্তি স্থাপন সে কবীর চৌরে॥
উত্তর-পশ্চিম দেশ মধ্য ভারতেতে।
কবীর পন্থীর দল অসংখ্য সেথাতে॥
কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ বৃত্তি দেন।
পুত্র চৈৎসিংহ করে সংখ্যা নিরূপণ॥

কাশীর নিকটে রাজা মেলা বসাইল।
পঁয়ত্রিশ হাজার কবীর পন্থী সেথা এল।
শ্রীরাম কবীর রূপী প্রভু ভগবান্।
অসংখ্য প্রণমি বিভু ও রাঙা চরণ॥
সুকূল নামেতে তীর্থ নর্ম্মদা তীরেতে।
চাণক্য উজ্জয়িনী রাজ যান সে তীর্থে।
উড়ান নৌকার পাল কৃষ্ণ বর্ণ ছিল।
তীর্থ মাহাত্ম্যেতে পাল শুভ্রবর্ণ হল॥
কবীর বট নামে বটবৃক্ষ যে তথায়।
সাতটি হাজার লোকে বৃক্ষের তলায়।
আশ্রয় লইতে পারে, তার ভিতরেতে।
হেন বৃক্ষ নাহি আর পৃথিবী মাঝেতে।
কবীরের দন্তকাষ্ঠে জনম তাহার।
বিষ্ণু মন্দির তথা নাম হুঙ্কারেশ্বর॥
কবীর নামেতে তীর্থে বটবৃক্ষ রয়।
কবীর মাহাত্ম খ্যাতি করিতে ধরায়॥
কবীর রূপেতে অবতীর্ণ ভগবান্।
কবীর-চৌর, মগর, বট, এই তীর্থস্থান
কাতরে সারদা নমে কবীর চরণে।
শ্রদ্ধা ভক্তি দেহ প্রভু এই দীন জনে।

(সমাপ্ত)

স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ।

(বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি)

স্থান :—বেলুড় মঠ, Visitors' room.

সময় :—বৃহস্পতিবার, ইং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১৫, রাত্রি ৮॥০ ঘটিকা ;

(ধ্যান জপান্তে সকলে একত্রিত হইলে পর)

কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ ক'রে ভৃত্যবৎ যে কোনও কাজ করা যায় তাই বড়, তাই থেকেই চিত্তশুদ্ধ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের ছোট বড় নেই। চিত্তশুদ্ধির জন্যই তো কাজ! "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ফলের দিকে দৃকপাত না করে নিঃস্বার্থভাবে কেবল কাজ ক'রে যাও। মনকে খোঁচাতে হ'বে, মাঝে মাঝে বিচার করতে হ'বে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে কাজ হ'চ্ছে কি না, বাহিরে নিঃস্বার্থপরতার ভাণ ক'রে ভিতরে স্বার্থপরতা, অহংভাব লুকান আছে কি না। খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে কাজ করতে হ'বে স্বার্থপরতা যেন তোদের ভিতর না ঢোকে! সাবধান!! ঢেঁকিতে যখন চাল কাঁড়ে মাঝে মাঝে ছ্যাখে ঠিক কাঁড়া হ'লো কি না; তেমনি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে হ'বে, মনে মনে বিচার কর্‌তে হ'বে কর্ম্মের দ্বারা স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসা, আশক্তি, অপবিত্র ভাব মন থেকে ক্রমে ক্রমে দূর হ'চ্ছে কি না।

খুব বড় বড় কাজ ক'রে যদি অহংভাব না কমে, তার চেয়ে অহংশূন্য হ'য়ে ছোট ছোট কাজ করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মেই বন্ধন, আবার কর্ম্মেই মুক্তি তবে কৌশল ক'রে করা চাই। এ কৌশলের নাম যোগ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" উদ্দেশ্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখলে নাম, যশ, লোকনিন্দার দিকে আর দৃষ্টি থাকে না, কাজটাও বেশ সুসম্পন্ন হয়। মানুষের কাছে ফাঁকি চলে, কিন্তু ভগবান্ অন্তর্য্যামী তাঁর কাছে ফাঁকি চলবে না। আর কাকে ফাঁকি দেবে? ফাঁকি দাও, নিজেই ফাঁকে পড়বে, জীবন ব্যর্থ হ'বে।" এই বলিয়া গাহিলেন :—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না ।
এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ কর্‌লে ফলতো সোনা ।
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হ'বে না ।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে তো যম ঘেঁসে না ।
অদ্য অব্দে শতাব্দে বা বাজেয়াপ্ত হ'বে জান না ।
আছে একতারে মন, এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ।
গুরুদত্ত বীজ রোপন ক'রে ভক্তিবারি তায়ে সেঁচনা ।
(ওরে) একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ।"

তাই তোদের বলি, যদি জীবন সার্থক করতে চাও—মন মুখ এক কর, নিঃস্বার্থপর হও, ত্যাগী হও, ইহাই আমি বুঝি। "নান্যপন্থা বিদ্যাতেঽয়নায়।"

যে নাড়ু পাকাচ্ছে, গরুর সেবা কচ্ছে, পূজারির কাজের চেয়ে তার কাজ কোনও অংশে হীন নয়, যদি ঠাকুরের ভেবে করে। এই স্বার্থশূন্যভাব আন্‌বার জন্যই তো তোদের আমি খাটিয়ে নিই। কর্ম্ম না করলে কর্ম্মত্যাগ অবস্থা আসে কি? তাতে কুঁড়ে হ'য়ে যেতে হয়। গীতাতেও ঐকথা বলছে। "ন কর্ম্মণামনারম্ভাং নৈষ্কর্ম্মং পুরুষোঽশ্নুতে।" সংসারে গৃহস্থরাও সারা দিন নাকে দড়ি দিয়ে খাটে বটে, কিন্তু সে নিজের ছেলে মেয়ে পরিবারের স্বার্থে। তাই তাদের কাজে অনেক বন্ধন বাড়ে। তারা যদি ঐ সংসারের সেবাই ভগবৎ বুদ্ধিতে করে, তাই থেকেই ধীরে ধীরে তাদের বন্ধন খসে যায়। কিন্তু মহামায়ার এমনি খেলা, তা কি সহজে পারে—ঐ "আমার," "আমার" করেই তো মরে !!

বিরুপাক্ষ (এক্ষণে স্বামি বিদেহানন্দ) যে এখন ঠাকুরের পূজা কচ্ছে, এদিকে (লেখা পড়ায়) তো খুব পণ্ডিত, কিন্তু আগে মঠে গরুর সেবা করিত। সে যখন সেবারে ৬কাশীধাম গেছলো, পণ্ডিত হ'য়েও গরুর জন্য খড় কাটে এই নিরভিমানিতার কথা মহারাজ (শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী) শুনে, তার উপর খুব ভাল opinion হ'য়েছিল। আমি নিজেও তো তোদের সঙ্গে নাড়ু পাকাচ্ছি। ভক্তদের শুধু পায়ের ধূলা দিয়ে

কি নিজের পরকালটা খাব? তাই গোবরও কুড়ুই, নাড়ুও দিই, গরুর সেবাও করি, আবার ঠাকুর পূজাও করি। অভিমান থাক্‌লে কিছু হ'বে না, অভিমান ত্যাগ কর্‌তে হ'বে। আমি দেখ্‌ছি তোদের ভিতর কাহারও কাহারও অভিমান আছে। ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসেছিস্ দড়কচা মেরে থাক্‌বি কেন? এখানে সবাইকে সিদ্ধ অর্থাৎ নরম হতে হ'বে। তোরা ঘরের ছেলে অভুক্ত থাক্‌বি কেন? ভাব, ভক্তি, প্রেমে সব নরম হ'য়ে যা। অহংকে নাশ ক'রে ফ্যাল এই বৃথা অহংকারই জীবকে ভগবান থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। বল্, নাহং নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু, "আমি" না, "আমি" না, প্রভু "তুমি," "তুমি," "যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়!" আহা ঠাকুর কি নিরভিমানী ছিলেন! কি রকম ক'রে অভিমান ত্যাগ করতে হয় নিজে করে জীবকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অহংকে নাশ করবার জন্য কাঙ্গালীদের এঁটো পাতা মাথায় ক'রে গঙ্গায় ফেলে আসতেন। মাথায় বড় বড় চুল দিয়ে কালীবাড়ীর পাইখানা সাফ্ করেছেন। আর নাগ মহাশয়ের জীবনী দেখনা,—এতো সেদিনের কথা তাঁর অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। আমি ঐ রকম জীবনই পছন্দ করি। গিরিশবাবু বলেছিলেন "মহামায়া নাগ মহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে তিনি এত ছোট হ'য়ে গেছেলেন যে আর বাঁধতে পারেন নি।"

আমার সর্ব্ব প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্ম দর্শনের তিন চার দিন পরে একদিন হঠাৎ রামলাল বাবুর সঙ্গে বাগবাজারে দেখা হয়। তিনি আমায় ডেকে বল্লেন, "তোমায় পরমহংসদেব ডেকেছেন একবার যেয়ো।" আমি আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বল্লুম, "আমায় ডেকেছেন? কেন?" আহা, তিনি যে এত দয়াময় তখন তা বুঝতে পারিনি। তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। তখনও তিনি আমায় "তুই," "মুই" ক'রে কথা বলতেন না। যাবামাত্রই আমায় বল্লেন, "এই কাঠগুলো পঞ্চবটীতে নিয়ে যাও তো।" সেদিন ঠাকুর সেখানে চড়ুইভাতি করিবেন। এই রকম ক'রে তিনি আমাদের খাটিয়ে নিতেন কত?

কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি যেন স্বামীজি এসেছেন। তাঁকে

দেখে কেঁদে পায়ে পড়ে বল্লুম, আর তোমায় যেতে দেব না, তুমি থাক, তোমার দর্শনে আবার ভারত জেগে উঠ্‌বে। তিনি বল্লেন, "রাখালের সঙ্গে তোর বনে না বুঝি?" আমি মহারাজের পা জড়িয়ে ধরে বল্লুম, "মহারাজ, স্বামীজীকে ছেড়ো না, অনেক দিন পরে এসেছেন" আর স্বামিজীকে বল্লুম, "না তা নয়, ঠাকুরের কৃপায় আমার অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত শিক্ষা হ'চ্ছে।"

ত্যাগের পথে।

[শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নাচিয়া গাহিয়া আবার নরকে যায় কি করিয়া এ অদ্ভুত কথার গূঢ়ার্থ আজ জগতের দিকে চাহিলে সরল হইয়া যায়। দেখা যায় নাচগানের মধ্যে স্বর্গনরক দুইই বর্ত্তমান। নাচিয়া গাহিয়া কেহ কেহ নিজেত নরকে যাইতেছেই অধিকন্তু আরও দুই দশজনকে তাহার সাথী করিয়া লইতেছে। দেশজোড়া আগুণ জ্বলিয়াছে। মহাসমুদ্রর উত্তাল তরঙ্গ অভ্রভেদী পর্ব্বতসানু চুম্বন করিতেছে। এ দুর্ব্বার তরঙ্গ রোধিবে কে—হরে মুরারে হরে মুরারে। বহু বর্ষ পূর্ব্বে যুগাবতারের শ্রেষ্ঠতম সন্তান দিব্য চক্ষে ভারতের এ যুগাবস্থা দেখিয়াছিলেন—এ উত্তাল তরঙ্গের উৎপত্তি স্থান লক্ষ্য করিয়াছিলেন আর এ তরঙ্গ যাতে আত্মঘাতী পথে প্রধাবিত না হয় তজ্জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হাজার হাজার ভারত সন্তানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আজ যদি সেই আহুত সন্তানের কানে সাড়া পৌঁছিয়াই থাকে—ত্যাগের পথে যদি সত্য সত্যই আসিয়া দাঁড়াইয়া থাক তবে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চল—অন্যথা নিজের সর্ব্বনাশত

করিবেই দেশের তথা জগতের সকল আশা ভরসা চিরকালের জন্য নিরাশার অতলস্পর্শী সাগরতলে ডুবাইয়া দিবে। তাই আবার বলি সাবধান—তোমার পাদবিক্ষেপের সহিত যখন দশের জগতের সম্পর্ক রহিয়াছে তখন বুঝিয়া শুনিয়া চল।

বাহিক উত্তেজনার মধ্যে একটী ভাবের সাড়া প্রায় সকলগুলিকেই ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে—মিলনের সাড়া পড়িয়াছে—বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমানের মিলিতে হইবে। কিন্তু কি করিয়া মিলন হইবে? তোমাদের অনুষ্ঠিত উপায়টী ত ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না! ধর্ম্ম যাহাদের কাছে সখের জিনিস, তাহারা ভাবিতেছে—ঐ যে আল্লাহোআকবর বা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া হিন্দু-মুসলমান শোভাযাত্রা করিয়া ছুটিল, বা উভয় সম্প্রদায়ের কেহ কেহ একত্রে বসিয়া দুই এক পেয়ালা চা পান করিল বা আরও উর্দ্ধে উঠিয়া একত্রে পান ভোজন করিল—এতেই কি মিলনের পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। কিন্তু ভিতরেরদিকে কেহ চাহিল না। অকৃত্রিম হইল না—ফাঁকি রহিল—সুতরাং আশঙ্কা হয় অল্পদিনের জন্য উহা একটা ফ্যাসানে পর্য্যবসিত হইল। বহিরাবণের কিয়দংশ দিয়া নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর অবস্থায় লোকচক্ষুর সমক্ষে উপনীত হইল।

প্রবল বন্যায় দেশ ভাসাইয়া চলিল। বিশাল জলরাশির মধ্যে একটুখানি স্থলভাগের উপর ব্যাঘ্র শূকর শৃগাল ও গৃহপালিত পশু মেষাদির দুই একটী আশ্রয় গ্রহণ করিল—পরস্পরের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল—প্রত্যেকই আপন আপন প্রাণ নিয়া ব্যস্ত,—হিংসাদ্বেষ এককালে বিস্মৃত। কিন্তু বন্যাশেষে কি আর সেই ভাব থাকিবে?

কুকুর অন্যের থালার দিকে সতৃষ্ণলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল—ঠেঙ্গার গুঁতা খাইয়া দূরে সরিয়া আসিল। যে ঠেঙ্গাইল তার প্রতি কট্‌মটাইয়া চাহিল—আর স্বীয়দলে মিশিয়া ঘেউ ঘেউ করাই সমীচীন বোধ করিল। হয়তঃ পরক্ষণেই উচ্ছিষ্ট তার সম্মুখে আসিল—আর লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করতঃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইল। দল ছাড়িল।

মোটকথা এভাবের মিলনচেষ্টা আশানিরাশাদি দ্বন্দ্বপ্রসূত, সুতরাং ভিত্তি নিতান্ত দুর্ব্বল এবং সম্পূর্ণ বাহ্যিক। মিলনের জন্য যে মিলন তাহাই খাঁটি এবং স্থায়ী। কোনও নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিলনকে উপায়স্বরূপে গ্রহণ করিয়া মিলন ব্যাপার সংঘটিত হইলেও স্থায়ী থাকিতে পারে না—বড়জোর উদ্দেশ্য সিদ্ধির (যদি সম্ভবই হয়) সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অবসান হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন এই কৃত্রিমতা হই তই অকৃত্রিমতা আসিতে পারে—কারণ অনেক সময় ধর্ম্মেরভাণ হইলেও ব্যবহারগত হইয়া থাকে—তবে সে একপ্রকার দুরাশা—বিশেষতঃ স্থানকাল পাত্র বিবেচনায় এক্ষেত্রে। বাহিরের চাপে যে কোন জিনিষেরই অভ্যন্তরস্থ মিলনের অন্তরায় বিদূরীত হয় এবং ফলে বিক্ষিপ্ত অণুপরমাণু কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে—জমাট বাধে—একথা ঠিক কিন্তু এ জমাট অবস্থাও স্থায়িত্বের কোনও দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। ইহাও ভাসা ভসা বহিরাবরণের স্বভাবসাপেক্ষ। কিন্তু গভীর মিলনের জন্য, প্রকৃত মিলনের জন্য বাহিরের কোনও উদ্দীপক কারণের প্রয়োজন থাকে না। মানবের অন্তর্নিহিত মিলনের অন্তরায় অপসারিত হইলেই মিলন হয়। এই অন্তরায়—সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টির অভাব। এই অভাব পূরণের জন্যই চেষ্টা করিতে হয়—সাধন করিতে হয়, অন্যবিধ চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

হিন্দু তুমি, মসজিদ বা গীর্জ্জা দর্শনে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা না রাখিয়া যদি তোমার প্রাণে ঝঙ্কার উঠে যে, ইহা শিব, বিষ্ণু বা কালীমন্দির—আমারই উপাস্যের আর এক উপায়ে এখানে উপাসনা হইয়া থাকে। দেব-মন্দির দর্শনে তোমার হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে—এক্ষেত্রেও যদি ঠিক তাহাই হয় অথচ তোমার ইষ্টমন্দিরের বা ইষ্টের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার হানি না হয় তবে বুঝিব যে, সত্যসত্যই তুমি সমন্বয়ের অধিকারী—তোমার মিলনধ্বনি সার্থক! অন্যথা তোমার চীৎকারকে বা মিলনের ভাবকে প্রহসন বা অভিনয় ছাড়া আর কি বলিব?

হিন্দুর পক্ষে এ কথা যেমন প্রযোজ্য খৃষ্টান বা মুসলমানের পক্ষেও তাহাই। খৃষ্টান বা মুসলমানেরও যদি পূর্ব্বোক্ত মন্দিরাদি দর্শনে বর্ণিত ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়, তবে বলিতে বাধ্য হইব যে, হে

হিন্দুমুসলমান খৃষ্টান ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের মিলনমন্দির নিতান্তই হাওয়ায় গড়া হইতেছে—এবং ইহা হাওয়াতেই বিলীন হইবে নিশ্চিত। তাই বলি বন্ধু ধীরে, ধীরে। অত ব্যস্তবাগীশ হইও না। পেটে দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে বলিয়া দুই হাতে খাইতে যাইও না। গল্প শুনা যায়—একটী দরিদ্র চাপ্‌রাশী চিঠিখেলায় হঠাৎ লক্ষ টাকা পাইয়াছে শুনিয়া হাসিতে হাসিতে মারা পড়ে। যাহারা রাতারাতি এমনিভাবে বড় মানুষ হইতে চাহেন—তাঁহাদের অবস্থাও 'অর্দ্ধাঙ্গীর' মত হওয়া বিচিত্র নহে! তাই বলি গোড়ায় যাও, মিলনের কর্ত্তা যখন মিলনের বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়াছেন—তখন মিলন হইবে নিশ্চয় কিন্তু তোমাদের ঐ কল্পিত উপায়ে নহে। সেই মহামিলন ক্ষেত্রে কেবল মুসলমান ভ্রাতার নিমন্ত্রণ থাকিবে না—খৃষ্টানেরও থাকিবে। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই নিমন্ত্রণ থাকিবে। তবে হিন্দুর ভাগ্য এই যে, এ বিরাট ব্যাপারের উদ্যোক্তা তাঁহারাই এবং তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণের ভারার্পণ করিয়াছেন— আমার, ভারতের, জগতের প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম ঈশ্বরকল্প অতিমানব, তাঁহাকে চিনিয়া লও—তাঁহার শরণাগত হও—সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে।

ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত এবং সহস্রকণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে যে বিভিন্ন জাতির উন্নতির মূলসূত্র বিভিন্ন। ভারতের উন্নতির মূলসূত্র ধর্ম্ম—যাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্ববিধ লোকহিতকর কার্য্য ব্যষ্টিভাবে এই ধর্ম্মবৃক্ষের এক একটী শাখা প্রশাখামাত্র! সমষ্টিভাবে শাখাপ্রশাখা সমন্বিত পত্রপুষ্পাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড মহীরুহ। সুতরাং জল-সিঞ্চন যদি করিতেই হয় তবে শাখাপ্রশাখা ছাড়িয়া এই বৃক্ষের মূলে করাই সমীচীন নহে কি? "যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং মতঃ," সেই লাভের জন্য মনপ্রাণ নিয়োগ করাইত যুক্তিযুক্ত!

অবশ্য বলা কহার অপেক্ষা না রখিয়াই আজ ত্যাগের ধ্বনি জগতের সর্ব্বত্র অল্পবিস্তর শ্রুত হইতেছে, ভারতব্যাপিয়া বিশেষভাবে ত্যাগের পাঞ্চ-জন্য বাজিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ত্যাগের আস্ফালনের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহের মত আমরা ভোগবারির চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। ইহারও মূলে অপূর্ব্ব ভোগবাসনার দশন-বিকাশ, হিংসাদ্বেষ

অভিমানাদি রাক্ষস রাক্ষসীর ভ্রিকুটি কুটিলানন স্ফুরিত হইয়া আমাদের প্রাণের শান্তি হরণে সচেষ্ট। যেদিন দেখিব তোমার সম্মুখে একব্যক্তি বা একজাতি চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি ভোগে আকণ্ঠনিমজ্জিত, স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলে সোনার পাত মুড়িয়া সিঁড়ি দিয়াছে, দিব্য আসনবসনে সুসজ্জিত হইয়া গাড়ী ঘোড়া মটর দৌড়াইতেছে, রূপরসাদি উপভোগের জন্য জগতের শেরা উপকরণে পরিবেষ্টিত আছে বহিরিন্দ্রিয় উপভোগ্য কিছুরই তাহার অভাব নাই—অথচ তুমি পরিষ্কার দেখিয়া শুনিয়া মনে প্রাণে বলিতেছ—"কৌপীনবন্তং খলুভাগ্যবন্তং" তাহার এবম্বিধ অবস্থা সন্দর্শনে বরং তোমার প্রাণে ঈর্ষাদ্বেষাদির পরিবর্ত্তে করুণার উদ্রেক হইতেছে—তখন বলিতে বাধ্য হইব যে, তোমার ত্যাগই ঠিক ঠিক ত্যাগ! সে যাহা হউক এ অবস্থা তোমার এখনই অধিগম্য না হইলেও আজ যখন অনেকেই ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছ—তখন বিপথে আর ঘুরিও না,—ভোগ পিচ্ছিল-কর্দ্দমাক্ত পথে ছুটিয়া বৃথা দুর্ল্লভ শক্তির অপচয় করিও না। ত্যাগাচার্য্য তোমার জন্য সুগম সুন্দর পথ রচনা করিয়া রাখিয়াছেন তুমি একবার প্রাণপণ চেষ্টায় এপথে আসিয়া পড়; মহাশক্তির আধার ঠাকুর তোমায় পথ চলিবার শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিবেন। তুমি একবার আত্মজাহিরের (self-assertion) ভাবটা বর্জ্জন করিয়া এসদেখি, পরিষ্কার দেখিতে পাইবে তোমার গন্তব্য পথ—ত্যাগের পথ যুগচক্র সে পথ সুগম করিয়া চলিয়াছে। তবে আর কেন এদিক সেদিক ছুটাছুটি? যুগচক্র প্রবর্ত্তনে তোমার ক্ষুদ্রশক্তি প্রয়োগ কর। জানিও শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনরূপ বিরাট ব্যাপারেও ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর বালুকণা নিক্ষেপে সাহায্যটুকুও উপেক্ষিত হয় নাই, তাহাও সাহায্য-শক্তির অতি ক্ষুদ্রাংশ হইলেও কার্য্যকরী ছিল।

ভাবিয়া দেখ ভাই, কি কঠোর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে! চাহিয়া দেখ কি বিশাল তরঙ্গ মুখে সমগ্রজগৎ শান্তিলাভের আশায় তোমারদিকে অগ্রসর!! ভারতের কুরুক্ষেত্রের পর ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—আর আজ জগতের কুরুক্ষেত্রের পর জগতের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল—আর কেন্দ্র হইল সেই ভারতবর্ষ। তোমার রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ এ ভবিষ্যৎবাণী বহু পূর্ব্বেই বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। তুমি জান! না জানিলে চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে। আর বিবেকানন্দ বহু পূর্ব্বেই এ ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তদুপরি সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের ভার দিয়া গিয়াছেন—তোমার উপর—হে বঙ্গীয় যুবক প্রধানতঃ তোমারই উপর!

তুমি আবার জানিয়া রাখ ত্যাগ বৈরাগ্যই তোমার পথ—এবং ভগবানই তোমার গন্তব্য স্থল। আর ভগবান্ খুঁজিতে তোমাকে দূরেও যাইতে হইবে না। স্মরণ কর তাঁহার সেই মহতী বাণী :-

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ”

অতএব হে কর্ম্মি. পবিত্র সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া জীবসেবার খাঁটি ভাব গ্রহণ করিয়া এই ভিত্তির উপরই এস আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম্মরাজ্য গঠনে সহায়তা করি। সকল কর্ম্মের পূর্ণতা সাধন হউক—সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাউক। এস, সেই চির পুরাতন, চির নূতন বেদবাণী, স্বামিজীর শ্রীমুখ নিঃসৃত মন্ত্রপূত সেই গুরুগম্ভীর বাণী উচ্চারণ করিয়া আমরাও পবিত্র হই, নববলে বলীয়ান এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠি :—

উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!! প্রাপ্য বরান্নিবোধত!!!

প্রতীক্ষা।

(কুমারী ফুল্লরাণী সিংহ)

প্রভু, তোমারি হাসি তোমারি বাঁশি
পাগল করা গান,
বিভোর প্রাণে জাগায় নিতি
আপন ভোলা টান।
তাইত আমি তোমার লাগি'
হে মোর মহারাজ,
চেয়ে থাকি পথের পানে
সাঙ্গ হলে কাজ!

বন্যাসেবাকার্য্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিসন।

সেবাকার্য্য সুচারুরূপ সাধন করিতে হইলে দুইটী জিনিষের বিশেষ আবশ্যক—হৃদয় ও বিচারশক্তি। দুঃখী তাপী আর্ত্তের জন্য প্রাণ কাঁদা চাই, তাহাদের প্রতি প্রাণের সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া চাই নতুবা সেবক হওয়া যায়না। কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে আর একটী জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন—বিচারশক্তি। শুধু পুত্রস্নেহপরায়ণ সাধারণ জননীর ন্যায় পুত্র কন্যাকে ভালবাসিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াইয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিলে চলিবে না—মানুষ করিতে হইলে তাহাদিগকে বিচারপরায়ণ পিতা ও আচার্য্যাদিরও শাসনাধীনে রাখিতে হইবে। যে কথা বলিলাম তাহা সকলেই জানে। ইহার ভিতর কিছু গূঢ় রহস্য নাই—কিন্তু কার্য্য কালে প্রয়োগের সময়ই আমাদের যত গোলমাল হয়। অদ্য উত্তরবঙ্গের ভীষণবন্যায় লোকের যে কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যেন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি জাগরিত হইয়াছে—সকলেই তাহাদের দুস্থ ভ্রাতৃবর্গের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেছে—ইহা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির এক শুভ সূচনা সন্দেহ নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি রাখিতে হইবে আমরা লোককে সাহায্য করিতে গিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পরমুখাপেক্ষী অলস ভিক্ষুক ও নির্লজ্জ করিয়া না তুলি। গৃহিগণই যখন সমাজের মেরুদণ্ড—আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্নদাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করাই বিধেয়।

সুতরাং আমরা তাহাদিগকে এমনভাবে সাহায্য করিব, যাহাতে তাহারা নিজের পায়ের উপর আবার দাঁড়াইতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটী গল্প মনে পড়িল,—গল্প নহে ইহা সত্য ঘটনা। আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ সেবাব্রতী সন্ন্যাসী একদিন ৺কাশীধামের মণিকর্ণিকা ঘাটের নিকট বেড়াইতেছিলেন,—দেখিলেন জনৈক বৃদ্ধ অতি কষ্টে স্নানার্থী হইয়া ঘাটে নামিতেছে। বৃদ্ধের কষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর

হইলেন। বৃদ্ধ কিন্তু সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয় বলিল, সন্ন্যাসি,' আপনি আমার কষ্ট দেখিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন,—ইহা আপনার সন্ন্যাস ধর্ম্মেরই উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আজ আপনি আমার সাহায্য করিয়া আমার কষ্টের লাঘব করিলেন সত্য, কিন্তু কালত আর আপনাকে আমি পাইব না। আমাকে প্রত্যহ গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতে হইবে—আজ যদি আমি আপনার সাহায্য লই, কাল আমাকে সাহায্যকারীর অন্বেষণ করিতে হইবে,—না পাইলে এখন আমার যে কষ্ট আছে, তদপেক্ষা কষ্ট অনেক বাড়িবে। তার চেয়ে নিজের উপর নির্ভর করিয়া যতদিন চলে ততই ভাল। এই বৃদ্ধের আদর্শ মনে রাখিয়া যদি আমরা সদা সর্ব্বদা চলি, তবে আমাদের পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুব অল্প।

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে আশ্রয় লাভ করিয়া নানা দুর্ভিক্ষপীড়িত ও বন্যাক্লিষ্ট স্থানের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া এই দীন সেবকের দেশের যথার্থ অবস্থা ও সেবাকার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। এখানে বিশেষভাবে আমার বন্যাসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার কথা কিঞ্চিৎ বলিব। প্রসঙ্গক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন কি প্রণালীতে এরূপস্থলে কার্য্য করেন, তাহারও যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। আর আমার দেশবাসী যদি আমার অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিঞ্চিৎ উপকৃত হন তবেই আমার এই লেখনী ধারণ সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, সেবাকার্য্যের দুটী বিভাগ করা যাইতে পারে ১মটী স্থায়ী সাহায্য অর্থাৎ দেশবাসীকে গৃহশিল্পাদি (Home industry) কিছু শিখাইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দৈব উৎপাতজনিত কষ্ট হইতে রক্ষা করিবার উপায় বরাবরের জন্য করিয়া দেওয়া—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সেবা বা সাহায্য হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার কোন আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই। কারণ, এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কার্য্য সফলকাম হইতে হইলে দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে হয়। আর সামান্যভাবে ইহার অনুষ্ঠান কথঞ্চিৎ সম্ভব

হইলেও একটা সমগ্র জেলা বা দুইচারিখানি গ্রামকেও এইরূপ শিখাইতে গেলে তাহার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। যদি সাধারণ অর্থে এই অনুষ্ঠান করিতে হয়, তবে এতদর্থেই সাধারণকে জানাইয়া অর্থসংগ্রহ করাই আবশ্যক।

সুতরাং আমরা এখানে অস্থায়ী সাহায্যের বিষয়ই আলোচনা করিব। অস্থায়ী সাহায্য বলিতে আমাদের লক্ষ্য এই যে, হঠাৎ বন্যা, ঝটিকাবর্ত্ত বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে দেশের অংশবিশেষের প্রজাবর্গের যে বিশেষ অন্নকষ্ট, গৃহকষ্ট প্রভৃতি উপস্থিত হয়, সাময়িক সাহায্য দ্বারা তাহাদিগের সেই কষ্ট কতকটা নিবারণ করা। তাহাদিগকে পূর্ব্ব অবস্থায় তুলিয়া দিতে সাহায্য করা। এখানে আমরা অবশ্য বন্যা সম্বন্ধেই বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান লেখক ১৯১৩ সালের কাঁথির বন্যা দেখিয়াছে, ১৯১৫ সালের উত্তর ত্রিপুরার ও কাছাড়ের বন্যা দেখিয়াছে, ১৯১৮ সালের উত্তর বঙ্গের প্রথম বন্যা দেখিয়াছে, ১৯২০ সালের তমলুকের বন্যা দেখিয়াছে, আর এই ১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গের দ্বিতীয় বন্যা দেখিল।

বন্যা মোটামুটি দুই প্রকারে হইয়া থাকে—প্রথম প্রকারটীতে বৃষ্টির জলরাশি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া গৃহাদি ভূমিসাৎ করে, উত্তর বঙ্গের দুইটী বন্যাই এই প্রকার। আর এক-প্রকার বন্যা উহাতে নদীর জল প্রবল ঝঞ্ঝাবেগে স্ফীত হয়—পরে বৃষ্টির জলরাশির সহযোগে আরও বর্দ্ধিত হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া গ্রামের পর গ্রাম চিহ্নশূন্য করিয়া চলিয়া যায়—যেমন বর্দ্ধমান ও কাছাড়ে হইয়াছিল।

বন্যা হইলে আজকাল রামকৃষ্ণ মিশন ব্যতীত দেশের অনেক বিভিন্ন সমিতি নানাস্থান হইতে উক্ত বন্যাপীড়িত স্থানসমূহে যাইয়া সাহায্য করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত আজকাল দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মিলিয়া সাময়িক সমিতি গঠন করিয়া বহু সেবাব্রত কর্ম্মীর সহযোগে বন্যাপীড়িত-দিগকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন। আমাদের কথিত সেবাকার্য্যের মূলনীতিগুলি অনুসরণ করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে পারা যায় বা রামকৃষ্ণ মিশন ঐরূপ স্থলে কিরূপ প্রণালীতে কার্য্যে অগ্রসর হইয়া

থাকেন, তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা কল্পনাসহায়ে ভাবিবার চেষ্টা করিব যে, কোন সমিতি বা সম্প্রদায় অথবা গবর্ণমেণ্টও যদি বন্যা-পীড়িতগণের সাহায্যার্থ অগ্রসর না হয়, তবে বন্যাপীড়িতগণের কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। এই কল্পনাসহায়ে আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারিব, ঐ সকল দুঃস্থগণের আত্মশক্তিতে নিজেদের সাহায্য নিজেদের করিবার কতটা শক্তি আছে এবং বাহির হইতে সাহায্যেরই বা কতটা প্রয়োজন।

যখন বন্যার জল বাড়িতে থাকে, তখন সকলে প্রাণভয়ে নৌকা বা কলাগাছের ভেলার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে যাইবার চেষ্টা করে। যে ঐ রূপে উচ্চভূমিতে যাইবার কোন উপায় করিতে পারিল না, সে প্রথমে কখন হতাশ ভাবে, কখনও বা দৈবে যদি কোন উপায় হয়, এই ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গৃহে দাঁড়াইয়াই ভাবিতে থাকে, শেষে যখন দেখে—জল ক্রমেই বাড়িতেছে, গৃহে দাঁড়াইয়া থাকিলে আর রক্ষা নাই, তখন একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড বর্জ্জিত হইয়া উচ্চভূমির সন্ধানে আত্মীয়স্বজন গরু-বাছুর লইয়া সারি হইয়া ছুটিতে থাকে—তাহার সন্মুখে মাটির ঘরগুলি দুমদাম করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—ভীষণ মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া সকলের আতঙ্ক বাড়াইয়া তুলিতেছে। তারপর কে কোথায় গেল—কে পালাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিল, কেবা প্রবল জলের বেগে ভাসিয়া গেল, কে বাঁচিল, কে মরিল—তাহার খোঁজ কে রাখে?

এই ভীষণ বিপ্লবের পর স্বাভাবিক নিয়মে জল ধীরে ধীরে কমিতে লাগিল—তখন কেহ সেই উচ্চভূমির উপর থাকিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতে লাগিল—যাহার বাটী একটু উচ্চভূমির উপর, সে নিজ বাটীর জমির উপর আসিয়া দাঁড়াইল। এই ভীষণ বিপদ্ হইতে প্রাণরক্ষা হইল—নিজ আত্মীয়স্বজনও হয় সকলে, না হয় কেহ কেহ বাঁচিল—এখন যে কোন উপায়ে হউক, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে—কোন না কোন কর্ম্ম তাহাকে করিতেই হইবে—ধান রক্ষা পাইলেও উহা ভানিবার বন্দোবস্ত করিয়া চাউলের যোগাড় করিতে হইবে—অর্থ

থাকিলেও শুধু অর্থের পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না—কোননা কোন রূপ আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিতেই হইবে।

এখন দেখা যাক্, গ্রামে সাধারণতঃ কি প্রকার লোক বাস করে। সাধারণতঃ গ্রামে কৃষক ও শ্রমজীবী বা মজুর এই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষকগণকে আবার জমির পরিমাণ অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শ্রমজীবিগণের অবস্থা পরিবারে খাটিবার লোকের ও ক[illegible] খাইবার লোকের সংখ্যার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ দরিদ্র বিধবাকেও এই শ্রমজীবীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে; কারণ অপরের ধান ভানাই তাহাদের উপজীবিকা। তা ছাড়া আর একদল লোক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা নিত্য ভিক্ষা করিয়াই খায়। ইহারা (Professional beggars) পেশাদার ভিক্ষুক।

বন্যার জল কমিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তম শ্রেণীর কৃষকবর্গ মজুর লাগাইয়া ঘর তুলিবার চেষ্টা করিতে এবং বিধবাগণকে ধান যোগাইয়া চাউল যোগাড় করিতে প্রবৃত্ত হইল। মধ্যম শ্রেণীর কৃষকগণ কতকটা মজুরের সাহায্যে, কতকটা নিজেরা [illegible] মাথা রাখিবার স্থান করিল। ধান্যও ঐরূপ কতকটা নিজেরা ভানিল, কতকটা বিধবাদের দ্বারা ভানাইল। অধম শ্রেণীর কৃষকগণও মাথা গুঁজিবার স্থান করিবার জন্য চেষ্টিত হইল বটে, কিন্তু অর্থাভাবে উহাদের [illegible] না হইয়া উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর কৃষকগণের নিকট অথবা মহাজনের নিকট ঋণ করিতে ছুটিল। মজুর ও বিধবাগণ উত্তম ও মধ্যম কৃষকগণের সাহায্যে থাকিবার স্থান ও অন্নের চেষ্টা করিতে লাগিল।

বন্যায় অবশ্য ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় ভারতের সর্ব্বত্রই লোকে বিষম কষ্টে পড়িয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে মাত্র বাঁকুড়া জেলায় এরূপ অবস্থায় লোকের বিষম কষ্ট হইয়া অনাহারে মরিয়াও থাকে! অন্যান্য জেলার ফসলনষ্ট হইলেও মানুষ সহজে মরিতে পারে না, বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে জলে মাছ, বাগানে শাক ও বিলে কলমি প্রভৃতি আছে—সুতরাং তাহারা ঐরূপ বিষম কষ্টের সময়ও ঐ

শাক-মাছের সহিত স্বল্প চাউল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া কষ্ট করিয়া খাইয়া, প্রাণ ধারণ করিতে দেখিয়াছি। তাহারা দেশবাসীর পরস্পরের প্রতি চিরন্তন সহানুভূতিও এই সময়ে পরিবার বিশেষকে অনাহার হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং সহজে অন্নাভাবে কেহ বড় মারা পড়ে না।

আবার আশু ও আমন ধান উভয়ই ডুবিয়া যাওয়া এবং আশুধান তুলিবার পর শুধু আমন ডুবিয়া যাওয়া—এই উভয় অবস্থার পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। এ ছাড়া গত তিন বৎসরের ফসলের অবস্থা ও জানিয়া লইতে হইবে। উত্তম ও মধ্যম কৃষকগণের বা মহাজনগণের ঋণ সাহায্যে অধম কৃষকগণের নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে, একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যদি তাহারা এইরূপে নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই দেশে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইয়া থাকে। আর চুরি ডাকাতির সংখ্যাধিক্যে বুঝিতে হইবে অবস্থা কি গুরুতর হইতে চলিয়াছে; সে অবস্থায় বাহির হইতে কোন সাহায্য না আসিলে স্বল্পাহারে বা কদর্য্যাহারে রোগাদির সূত্রপাত হয় এবং তাহাতে অল্পবিস্তর লোক মরিতে থাকে।

বন্যার এই কাল্পনিক চিত্রের সাহায্যে আমরা বুঝিলাম, লোকের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায় লোকে বিষম বিপদে পড়িয়াও স্বভাবের নিয়মবশে আবার পূর্ব্বাবস্থা আনিবার চেষ্টা করে, তাহাতে অনেকস্থলে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়, কিন্তু আবার অনেকস্থলে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত অনেকে বিষম বিপদে, এমনকি, মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া দেখিব, বাহিরের সেবা ও সাহায্য কি ভাবে হইলে লোকের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, অথচ তাহারা আত্মচেষ্টা ও আত্মসম্মান পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে পারে। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ও সেবাকার্য্যের মূল নীতিগুলি কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান উত্তর-বঙ্গের বন্যাকার্য্য হইতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইব।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে, বন্যার তিন অবস্থা—

(১) গৃহাদি ত্যাগপূর্ব্বক উচ্চভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করা। এ অবস্থায় সাধারণতঃ লোক ৪।৫ দিন থাকে। (২) জল কিছু কমিয়া গেলে লোকে যখন নিজ নিজ বাস্তুভিটায় ফিরিয়া আসে, তাহার পর হইতে জল খুব কমিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, (৩) জল কমিয়া গিয়া রবিশস্যের চাষ আরম্ভ হইতে আশুধান্যের ফসল পাওয়া পর্য্যন্ত।

প্রথম অবস্থায়, উপযুক্ত সাহায্য দিতে পারে, এমন সেবকদল এদেশে নাই বলিলেই হয়। ঐ সময়কার কাজ—নৌকাযোগে লোকদিগকে উচ্চভূমিতে লইয়া যাওয়া, চিড়ামুড়কি প্রভৃতি খাইতে দেওয়া—ত্রিপল প্রভৃতি দিয়া মাথা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। মহাপ্রাণ স্থানীয় লোকগণ বা সেবকসমিতি এবং গবর্ণমেণ্ট এ অবস্থায় যথাসম্ভব সাহায্য করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। যদি এইরূপ স্থানীয় সাহায্য সমিতি সমূহের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হয়, তবে বন্যার প্রথম অবস্থায় অনেক পরিমাণে সাহায্য করা যাইতে পারে এবং অনেকের প্রাণরক্ষাও হইতে পারে। কলিকাতা ও মফঃস্বল হইতে যখন সেবক-সম্প্রদায়গণ উপস্থিত হন, তখন বন্যার দ্বিতীয় অবস্থা। সংবাদ পত্রে বন্যার বিষয় প্রকাশিত হইলে বা স্থানীয় লোকের নিকট হইতে অবগত হইয়া ইঁহারা আসিয়া থাকেন। ইঁহাদের আসিবার পর যাহাদের অন্নকষ্ট তাহাদের চাউলাদি সাহায্য আরম্ভ হইয়া থাকে এবং যাহাতে একদল সাহায্যপ্রার্থী দুইতিনটি সেবক সম্প্রদায় হইতে সাহায্য না পায়, তজ্জন্য সীমানা ভাগ হইয়া থাকে।

এই সকল সেবকসম্প্রদায়ের সহিত নিম্নলিখিত চারিশ্রেণীর সাহায্য-প্রার্থীর সাক্ষাৎ হইয়া থাকে,—

(১) ভিক্ষুক (Professional beggars)—ইহারা বারমাস ভিক্ষা করিয়াই খায়।

(২) বিধবা—যাহারা ধান ভানিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

(৩) মজুর—যাহারা দিন মজুরি করিয়া খায়।

(৪) অধমশ্রেণীর কৃষক—যাহাদের জমির আয়ে সংসার চলে না।

রেল ষ্টেশন হইতে নামিবার পর হইতে কেন্দ্রখোলা পর্য্যন্ত এই

ব্যাপার। তদান্তের সময় এবং বিতরণের সময় লোকের অবস্থা পর্য্যালোচন করা এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যে, তাহারা কতদিন সাহায্য চায় এই গুলিই এই বিষয় নির্ণয় করিবার উপায়। সেবকগণের প্রকৃতি অনুসারে এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে কিছু কিছু পার্থক্য হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে এবং সেবকগণ সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেই যে একেবারে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, তাহাও বলা যায় না। এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এবং স্থানীয় লোকের সঙ্গে গুরুতর মতভেদও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও যতটা সম্ভব সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন এবং এবিষয়ে সেবকগণের মতামতের সহিত দূরে অবস্থিত কর্ত্তৃপক্ষগণের মতভেদ হইলে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য পাঠান উচিত এবং আবশ্যক হইলে মিশন ইহা করিয়াও থাকেন।

এবার প্রথম চাউল বিতরণ কার্য্য ৮ই অক্টোবর তারিখে ডুবলহাটি কেন্দ্রে হইয়াছিল। ১১ই তারিখে হাঁসাদবাড়ি কেন্দ্রে, ১৩ই তারিখে বলিহার কেন্দ্রে এবং ১৪ই তারিখে শৈলগাছি কেন্দ্রে প্রথম চাউল বিতরণ কার্য্য হয় এবং কিছুদিন ধরিয়া সাহায্যদান নিয়মিতরূপে চলিতে থাকে। সেবকগণ গ্রামতদন্তের সময় আর একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, সেটী গ্রামবাসিগণের শরীরের অবস্থা। শরীরের অবস্থা বিশেষ ব্যতিক্রম না দেখিলে তাঁহারা সাহায্যের মাত্রা বাড়ান না। আর যাহাতে লোকে ক্রমে আত্মনির্ভর হারাইয়া আলস্যপরায়ণ না হইয়া পড়ে এবং দেশের সাধারণ জীবন অচল না হইয়া যায়, তজ্জন্য তাঁহারা পূর্ণ সাহায্যও সব সময় প্রদান করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, 'ক' একজন জোয়ান লোক তাহার গৃহে ৫টী খাইবার লোক তাহাকে আমরা প্রথম সপ্তাহে তিন জনের সাহায্য দিব দ্বিতীয় সপ্তাহে দুই জনের কারণ শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে বিশেষ দুরবস্থা ব্যতীত পূর্ণ সাহায্য প্রদান করিলে তাহাদের আলস্যপরায়ণতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং তাহারা মজুরি করিতে সহজে চাহিবে না বলিয়া গ্রামের পুনরুজ্জীবনে বিলম্ব হইবে। ঐরূপ কোন দুই জন সবল সুস্থ বিধবা থাকিলে আমরা তাহাদের এক জনকে মাত্র সাহায্য করিব,

নতুবা ধান ভানা কার্য্য বন্ধ হইবার সম্ভাবনা, সাধারণতঃ এই নিয়মেই কাজ চালাইবার চেষ্টা হয়। অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ইহার ব্যতিক্রম করিবারও সেবকগণের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। পূর্ব্বে যে বারমেসে ভিক্ষুকসম্প্রদায়ের (professional beggars) কথা উল্লেখ করিয়াছি, মিশন হইতে তাহাদিগকে কখন নিয়মিত সাহায্য করা হয় না, ইহাদের অবস্থা মধ্যম কৃষকগণের ন্যায়, তবে ইহাদের মধ্যে কেহ অত্যধিক বৃদ্ধ হইলে বা অতিরিক্ত রুগ্ন হইয়া পড়িলে স্বতন্ত্র কথা।

তার পর কাপড় ও ঘর তুলিবার সাহায্যের কথা। এ বিষয়ও ব্যক্তিবিশেষের কাহার কোন্‌টীর অভাব, বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তবে তাহাকে সেই সাহায্য করা হয়। চাউল বিতরণ কার্য্যের সহিত এই সাহায্যের কোন সম্বন্ধও নাই অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা পরিবারকে নিয়মিতভাবে চউল সাহায্য করা হইতেছে বলিয়াই যে তাহাকে বস্ত্র বা গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যেও সাহায্য করিতে হইবে, তাহা নহে। সুতরাং নিয়মিত ভিক্ষুকগণও উপযুক্ত হইলে এই সকল সাহায্য পাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত মিশন ঔষধ পথ্যাদির সাহায্যও করিয়া থাকেন।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হয় আমাদের বক্তব্য অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সেবাকার্য্যে যেমন হৃদয়বত্তার প্রয়োজন, তেমনি মস্তিষ্ক চালনার ও প্রয়োজন। নতুবা উদ্দেশ্য খুব মহৎ হইলেও সেবা অনেক সময় অপরের অনিষ্টের কারণ হইতে পারে।

উপসংহারে আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত সেই কথারই দৃষ্টান্তটী আমাদের বক্তব্য বিষয়ে বিশেষ উপযোগী বলিয়া উহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

লোকে পরোপকার দানাদির কথা উল্লেখ করিয়া উহার প্রশংসা করিলে তিনি বলিতেন, সকল সময় ঐ কার্য্য পুণ্যজনক নহে, অবস্থা বিশেষে উহাতে পাপও সঞ্চিত হইয়া থাকে। জনৈক ধনী ব্যক্তি কোন স্থানে অতিথিশালা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিয়ম ছিল, যে কোন

ব্যক্তি অতিথি হইবে, সেই অতি উত্তম খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাইবে।' জনৈক কশাই একটী গরু কিনিয়া উহা কাটিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল—অনেক দূর হাঁটীয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়াতে গরুটাকে আর লইয়া যাইতে পারিতেছিল না। এইরূপ অবস্থায় সে উক্ত অতিথিশালায় উপস্থিত হইয়া তথায় অতিথি হইয়া ভূরি ভোজনে তৃপ্ত ও সবল হইয়া গরুটাকে টানিতে টানিতে যথাস্থানে লইয়া গিয়া জবাই করিল এখন সেই কশাএর গোহত্যা জনিত যে পাপ তাহার অধিকাংশ সেই ধনী ব্যাক্তিতে অর্পিল—কারণ, তাহার আতিথ্য না পাইলে সে ব্যক্তি ঐ কার্য্যে সমর্থ হইত না তাই দেশের লোকের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, তাঁহারা তাহাদের দুঃখে কাঁদুন, তাহাদের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা প্রাণপণে করুন, কিন্তু কেবল উত্তেজনা পরিচালিত হইয়া যেন তাহাদের আরও ক্লেশ বাড়াইবার কারণ না হন।—স্বামী ভূমানন্দ।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়

বন্দনা—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কবিতার তোড়া। ইহার অধিকাংশ কবিতা বাংলার বহু বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশটী কবিতা পূর্ব্বে উদ্বোধনে প্রকাশিত এবং "যুগাবতার মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিশ্বমানব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে চিহ্নিত থাকা অবশ্যম্ভাবী" বলিয়া লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য মণ্ডলীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে বহু কবিতা উৎসর্গ করিয়াছেন। কয়েক স্থলে উপমা ও শব্দ বিন্যাস কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য হইলেও বহু স্থলে উহা এত সুন্দর যে তাঁহাকে সুকবি বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হয়।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। বিগত ১৫ই জানুয়ারী নদীয়া কৃষ্ণনগরবাসী ও ছাত্রবৃন্দেরা স্বামী প্রকাশানন্দজিকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হইতে শোভাযাত্রার সহিত তাঁহাকে টাউন হলে লইয়া যাওয়া হয়। সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণনগর Boys' Scouts তাহাদের সুমধুর বাদ্যের সহিত গমন করে। তিন চারি সহস্র লোকের সমাগম হেতু হল সুসজ্জিত করা সত্ত্বেও মাঠে সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলী তাঁহাকে মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করায় স্বামীজি অনভ্যাস সত্ত্বেও বাংলায় একঘণ্টা বক্তৃতা করেন। স্থানীয় লোকেরা অভিনন্দন পত্র খদ্দরের উপর লিখিয়া ও প্রবীণ কারিগরদের তৈয়ারী একটী মাটীর স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্ত্তি উপহার স্বরূপ তাঁহাকে দান করেন। কৃষ্ণনগরের বহু ভদ্র মহিলারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। তাঁহার সহিত স্বামী শঙ্করানন্দ ও বাসুদেবানন্দও গমন করেন।

২। বিগত ২০শে জানুয়ারী জামসেদপুর বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামী বাসুদেবানন্দ সেখানে গমন করেন। ২১শে জানুয়ারী ঠাকুর ও স্বামীজির বিশেষ পূজা অর্চ্চনা, দরিদ্র নারায়ণ সেবা ও সন্ধ্যাকালে এক সভার অধিবেশন হয়। মিঃ মাডান সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর বালক বালিকাদের এই সভায় মিসেস চ্যাটর্জ্জি কর্ত্তৃক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। একটী সুন্দর চরকা প্রথম পুরস্কাররূপে জনৈক ছাত্রীকে দেওয়া হইয়াছিল। ঐ স্কুলের অপর বালক বালিকারা তাহাদের অবৃত্তি দ্বারা সভাস্থলীর মনরঞ্জন করে। পরে বহু বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী এবং পার্শি ভদ্রলোকেরা স্বামীজির জীবনী আলোচনা করেন। পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ প্রায় একঘণ্টাব্যাপী স্বামীজি সম্বন্ধে আলোচনা করার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তব্য বলিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

৩। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী কলমা গ্রামের রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির কার্য্য বিররণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সেবা সমিতিকর্ত্তৃক

পরিচালিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটার নাম নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালা—অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, (খ) শ্রীকালী পাঠশালা—অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, (গ) বিবেকানন্দ শিল্প-ভবন—অবৈতনিক বয়ন বিদ্যালয়, (ঘ) ঔষধ বিতরণ। ইঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ কল্পে প্রায় ৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য এই কার্য্যে একান্ত প্রয়োজন।

৪। স্বামীজির জন্মোৎসব সম্বন্ধে আমরা ঢাকা, ব্যাঙ্গালোর, জামালপুর, কোয়লালামপুর, গোহাটী হইতে সংবাদ পাইয়াছি এবং দেওঘরে ঐ উপলক্ষে স্বামী নিগুর্ণানন্দ ও ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য গমন করেন। ফরিদপুর হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—

বিগত ১০ই মাঘ বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় টাউন থিয়েটার হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোতিথি উপলক্ষে একটি বিরাট স্মৃতিসভা হইয়াছিল। প্রবীন উকীল শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্র বি, এল্ মহাশয়ের অনুমোদনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় রাজেন্দ্রকলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ মিত্র, এম্, এ, মহাশয় স্বামিজীর জীবনী এবং শিক্ষা সম্বন্ধে একটী, সুচিন্তিত, সুললিত এবং সারগর্ভ প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবীন সাহিত্যিক ভারতবর্ষের সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এবং সংস্কৃত কলেজের প্রথিতনামা অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতা দ্বারা সকলেরই হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীগুপ্ত সেন, বি, এল, এবং স্থানীয় উকীল সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র বি, এল মহাশয় সভাপতি এবং বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়।

৫। আমেরিকার অন্তঃপাতী বোষ্টন নগরের বেদান্ত কেন্দ্র হইতে স্বামী পরমানন্দ বিগত ১লা অক্টোবর হইতে ২৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত, Spiritual Medium-ship, Psychology of Yoga, Creative Power of Silence, Reincarnation and Evolution এবং Psychic Unfoldment এই পাঁচটী বক্তৃতা করেন।

৬। বিগত ২২শে জানুয়ারী জনাই বৈদান্তিক-সঙ্ঘ মন্দিরে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উপলক্ষে ব্রহ্মচারী অখণ্ড চৈতন্য সেখানে গিয়া সদুপদেশ দান করেন।

আহ্বান।

(শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার, বি, এ)

অমৃত শীকরবাহী, ধায় সপ্তধারা মধুর নিক্কণে ,
কুলু-কুলু স্বরে, ছোটে ওই মন্দাকিনী অসীমের পানে,
গোমুখী-নিঃসৃতা, পূত বারিধারা, তুলি অমরার তান
শ্রবণে পশিছে, ত্রিদিবের মোহন সঙ্গীত, কেড়ে লয় প্রাণ।
গৈরিক নিঃস্রাবী সপ্তচক্র বেষ্টি, ভেদি ত্রিদিব গগনে
বিরাজিছে সপ্তর্ষিমহান,—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধের ধেয়ানে॥
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ধাম, ব্রহ্মজ্যোতিঃ অতিক্রমি ব্রহ্মলোক ;
সপ্তলোক ব্যাপী ক্ষরিতেছে স্বরগ সুষমা, জীবলোক
করি সঞ্জীবিত। সমীরণ সৃজিতেছে অমৃত প্রবাহ .
জল স্থল অনিল অনল, ধায় যেন মত্ত অহরহ
অমৃতের আস্বাদনে ;—বিরচিয়া মধুচক্র, যার তরে
পিয়াসী মানব আস্বাদিতে ছুটিতেছে জন্ম জন্মান্তরে।

আয় আয় আয়রে মানব অমৃতের অধিকারী ওরে,
জ্যোতির তনয় এই দিব্য ধাম, সপ্ত সিন্ধু সুধা পারাবারে
মগ্ন হ'য়ে অনন্ত জ্ঞেয়ানে, পাবি নর দুঃখে পরিত্রাণ,
শোন্ ওই আশ্বাসের বাণী, পূর্ণ যাহে জগত পরাণ।
যুগ যুগ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে, ঘোষে বেদ আনন্দের বাণী—
—অতি পুরাতন (এই)—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি"।
সুখ দুঃখ স্বপনের মায়া, পরিহর মোহের স্বপন,
খোল খোল হৃদয়ের দ্বার, উদিতেছে জ্ঞানের তপন,—

তমিস্রার হইবে বিলয়। তবু পথভ্রান্ত আত্মভোলা
পথিকের দল মুগ্ধচিত, হেরি অই আলেয়ার আলো
ধায় পিছু সুখ সুখ করি; মূঢ় নর! সুখ কোথা হেথা?
মরুভূমে মরীচিকা সম; অসৃজের ধারা বহে কত,
গণ্ডদেশ বাহি (তবু) উষ্ট্র ধায় আস্বাদিতে তৃণ কণ্টকিত।

সপ্তঋষি ধ্যানমগ্ন হেথা; জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক পারে,
প্রণবের অনাহত ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে কি মধুর বাজে।
ভূলোকে, দ্যুলোকে ধ্বনিতেছে "ওঁ" শৃঙ্গে শৃঙ্গে ল'য়ে প্রতিধ্বনি
কেবা কার, মেশে পরস্পরে, দুয়ে এক, একে দুই মানি।
সপ্ত ঋষি স্তিমিত নয়ন;—নির্বাত-নিষ্কম্প-দীপ প্রায়,
(কিছু নয়) প্রলয় কল্লোল!—মুক্তপাশ ব্রহ্মঋষি বাসনার ক্ষয়!!
সহস্রার ক্ষরিত যে সুধা, পিয়ে ঋষি আনন্দ বিহ্বল,
যত চায় তত পায়,—বিকসিত সাধনার সহস্র কমল।
সমাধি-বিলীন মন, বাহ্যেন্দ্রিয় করি আকর্ষণ
পদ্মবনে হংস হংসীরূপে, হ'ল তার বাঞ্ছিত মিলন।
দূর কর রূপ, রস, গন্ধ! ব্রহ্মানন্দ পিয় অবিরাম,
কেবা চায় ইহার বিরাম? বিরাম তাহার প্রাণারাম।
কভু নির্ব্বিকল্প সমাধির আশে, সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মান্তরে,
ধায় মন, ব্রহ্মজলধিতে মীনরূপে ভাসে তাহে;—হেরে
গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য হ'তে মহাশূন্যে লয়।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উঠে, ভাসে ডোবে পুনঃ, মনরূপী তায়—
বিরাট আকাশে, ক্ষীণ রেখা আমিত্বের বুঝি মুছে যায়।
হেরি তাহে জগত জীবন হ'ল তাঁর চঞ্চল হৃদয়।

ব্যথিতের কাতর ক্রন্দন, উৎপীড়িত জগতের জন,
জড়বাদ নাস্তিক্য প্রধান, কলুষিত কৈল ধর্ম্মধন।
কর্ম্মভূমি ভারত জননী, কর্ম্মহীনা হ'ল আরবার,
অধর্ম্মের পাপ হলাহলে জর্জ্জরিত দেহ বসুধার।

পশে ওই সপ্তলোক ভেদি, মানবের কাতর ক্রন্দন,
দীননাথ !　(তাই) দীনের আহ্বান টলাইল গোলক-আসন।

(তাই) স্ব স্বরূপে হইয়া চিন্ময় আবির্ভূত ঋষির মণ্ডলে
চিন্তান্বিত আকুল-হৃদয়, ভগবা হৃদি তাঁর গলে ;—
(হেরি) সমাধি-মগন ঋষি, হ'য়ে পরব্রহ্ম প্রেমে আত্মহারা
অর্দ্ধবাহ্য স্তিমিত-নয়ন ঢুলু ঢুলু দুই আঁখি-তারা ;
এক অরূপের রূপ-মগ্ন যতি, সুধাপান করে নিরবধি
আনন্দ, আনন্দ অবিরাম, আনন্দের নাইরে অবধি।
করযোড়ে ঋষিবরে কহিলেন তাই,—"নর-নারায়ণ।
হও স্বপ্রকট, খোল আঁখি অপেক্ষিছে করুণার জন,
তমরাহু গ্রাসিয়াছে ভারত-জীবন, পশিয়াছে তাহে
আলস্যের বিষাদ রজনী ; নরহিয়া আচ্ছাদিত মোহে।
কর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, আছে শুধু তার ইন্দ্রিয় তাড়ন,
আত্মসুখে মত্ত অহর্নিশি, কামনার দাস ঋষির সন্তান।
লুপ্ত বেদ এ মহীমণ্ডলে, বেদমন্ত্র করহ প্রচার
রসাতলে চলিয়াছে পৃথ্বী, কর্ম্মচক্রে রক্ষহ এবার।
অবিবেকী পাশ্চাত্য অসুরে জাগাও হে বিবেকের নাদে,
নিরানন্দ জ্যোতির তনয়ে, আনন্দেতে ধরে লও সাথে ॥

"সাধু ও দাতা"।

(শ্রীউপেন্দ্র কৃষ্ণ দাস।)

ক্ষুধিতেরে অন্ন দিতে যেই জন পারে,
জীবে শিব দেখে যেই সাধু বলি তাঁরে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য তাঁর কাছে স্বতঃ পরাজিত,
দাতা বলে সেইজন জগতে পূজিত।

কথা-প্রসঙ্গে।

দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণ-কেন্দ্র সমগ্র ভারত ও ভারতেতর প্রদে
বিস্তার লাভ করিতেছে। আবার যে দেশে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের লো
কখনও যায় নাই, যাইবার বর্ত্তমানে আশাও করে নাই সেখানে
স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বালোড়নকারী মহাসমন্বয়ের শঙ্খধ্বনি পৌঁছিয়া
এবং প্রত্যুত্তরও আসিতেছে। বাঙ্গালী কি কখনও ভাবিয়াছিল তাহ
ভগবান্ সুদূর মেসোপটিমিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আমেরিকায় পূজা লা
করিবেন, বাঙ্গলার নূতন তীর্থ দর্শন করিতে ইউরোপ আমেরিকা হই
দলে দলে যাত্রীর সমাবেশ হইবে ?

* * *

অবতারের অবতারত্বের ইহাই অপর প্রমাণ। তুমি তাঁহার সেব
ব্রত গ্রহণ কর, আর না কর তিনি তাঁহার পার্থিব লীলার প্রস
নিজেই অতি অভাবনীয় উপায়ে করিয়া লইবেন। তবে যিনি স্বেচ্ছ
ব্রতী—তিনিই ধন্য! আমরা ভাবি, 'মূর্ত্তির বা ব্যক্তির প্রচার
হইলে অবতারত্বের প্রচার হইল কৈ'? কিন্তু ভাবিয়া দেখ দে
এত বড় গোঁড়া জাত খৃষ্টান-মুসলমান, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগার
হইতেই তাহারাও পরধর্ম্ম-সহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে কেন? বর্ত্তম
মুসলমান শাসনকারীদের ঘোষণাবাণীই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নয় কি
ভাবময় শ্রীভগবানের ভাব প্রচারই যথার্থ প্রচার—উহাই নব ধ
পত্তন। হঠাৎ কোনও মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের বা মূর্ত্তির প্র
করিতে গিয়া জগতে যত রক্তের স্রোত প্রবাহিত করা হইয়া
তাহার তুলনায় জার্ম্মান যুদ্ধ বুদ্বুদ মাত্র; ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করি
জগতে যত অত্যাচার, অবিচার, ব্যাভিচার মহামারীর ন্যায় পু
পুনঃ বিস্তৃত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ ব্যক্তিগত ধর্ম্মোন্মাদ।

* * *

মানুষ জীবজগতের রাজা—কারণ সে বিবেকী—ইষ্টানিষ্ট বস্তু বিবেক তাহার আছে। ধর্ম্মোন্মাদ বাহুবলের দ্বারা জাতিকে জাতি উজাড় করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম জগতে বিস্তার করিয়া যায়। কিন্তু সে প্রচার স্থায়ী হয় না—কারণ মানুষ তাহা বুঝিয়া লয় নাই—পশুবলে ভীত হইয়া লইয়াছে কিম্বা গড্ডালিকা প্রবাহে যোগ দিয়াছে মাত্র। ফলে তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে হয় সে জাতি নাস্তিক, বন্য-বর্ব্বর হইয়া উঠে অথবা অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্তগণকে জগতে, এক্ষণে নিজ নিজ জীবনের দ্বারা এই শিক্ষাই প্রচার করিতে হইবে। 'অনন্ত-প্রকার ধর্ম্মমত অনন্ত-ভাবময়ের রাজ্যের বিভিন্ন পথ মাত্র। প্রত্যেক সাঙ্গোপাঙ্গ-ধর্ম্ম যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত হইলে একই সত্য বস্তুকে লাভ করা যায়। চাউল রোপণ করিলে গাছ হয় না—ধান্য রোপণ করা চাই। খোসা পরে অব্যবহার্য্য বটে কিন্তু প্রারম্ভে অবশ্যম্ভাবী-প্রয়োজন। কিন্তু খোসাকে উপলক্ষ্য করিয়া যদি হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যথার্থ ধর্ম্ম হইতে আমরা বিপথে যাইতেছি। ধর্ম্মের গৌণ অঙ্গগুলির প্রয়োজন ততটুকু যতক্ষণ তাহারা সার্ব্বভৌম মহাব্রত সত্য, জ্ঞান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের সহায় স্বরূপে থাকে—নচেৎ উহাদের প্রয়োজনীয়তা অতি অল্পই। উপায়কে ফলস্বরূপে গ্রহণ করিলেই সর্ব্বনাশ। জগতের সকল সর্ব্বনাশ এই অবিবেকিতার ফলেই হইয়াছে। জড়-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান-লাভেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া মানুষ লোহা-বিদ্যুৎ, গ্যাস-বারুদেই সংহার হয়; ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে গিয়া যোগ-বিভূতি, মান-যশে শৃঙ্খলিত হয়।

* * *

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের গৃহস্থ ভক্তেরা মনে করেন যে এই অসম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রচার কার্য্য কেবল সন্ন্যাসী ভক্তেরাই করিবেন; তাহাদের এ বিষয়ে কোনও কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কেবল সন্ন্যাসী শিষ্য ছিল না—নাগ-

মহাশয়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অত্যদ্ভুৎ চরিত্র গৃহস্থ ভক্তেরাও ছিলেন। তাঁহারাও স্বীয় জীবনের আন্তরিকতা ও ভক্তিদ্বারা জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে চাই প্রতি রামকৃষ্ণ-ভক্তের গৃহ পবিত্র ঋষির আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই শাস্ত্র-কুশল হওয়া চাই; প্রতি পর্ব্বদিনে যথাসাধ্য পূজা-পাঠ ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবারদ্বারা গৃহস্থলী অলঙ্কৃত হইলে বাংলা দেশের বর্ত্তমান ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিবে।

বেদ-ব্রাহ্মণ কথা।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র পাণ্ডা)

নিন্দন্তু নীতি নিপুণা যদি বাস্তবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্ত যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎপথঃ প্রবিচলন্ত পদং ন ধীরাঃ॥

অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিন্দা করুক, অথবা প্রশংসা করুক, লক্ষ্মী দেবী গৃহে প্রবেশ করুন অথবা যথেচ্ছায় চলিয়া যাউন, অদ্যই মরণ হউক বা যুগান্তরে হউক সে জন্য ভাবিবার কিছুই নাই কিন্তু যেন পণ্ডিতগণ ন্যায়পথ হইতে একপদও বিচলিত না হন ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

ন জাতু কামান্নভয়ান্নলোভাৎ
ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতেস্যাপি হেতোঃ।
ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

অর্থাৎ তুচ্ছ জীবনের জন্য কামভয় ও লোভ বশতঃ কথনই ধর্ম্ম

পরিত্যাগ করা উচিত নহে যেহেতু ধর্ম্ম নিত্য, সুখদুঃখ অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর মাত্র। জীব নিত্য, জীবের হেতু কর্ম্ম অনিত্য।

বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মঃ
অধর্ম্মস্তদবিপর্য্যয়ঃ।

অর্থাৎ বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম তাহার বিপর্যয় যাহা তাহাই অধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব ন্যায় মার্গে সতত বিচরণ করা পণ্ডিত-গণের স্বাভাবিক কার্য্য

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থসংযুক্তবচঃ প্রমাণম্।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচন প্রমাণম্॥

প্রথমতঃ সর্ব্বথা বেদবাক্য প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণ হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রের বাক্যও প্রমাণ হয়। যাহার বাক্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না, কে তাহার বাক্যকে প্রমাণরূপে আদর করিবে?

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।

বেদশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হইলেই শ্রুতিরই অর্থাৎ বেদবাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং বেদবাক্য নির্ভুল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বেদাবিভিন্না স্মৃতয়োবিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

অর্থাৎ বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রও নানারূপে অবতীর্ণ। এমন মুনি নাই যে যাহার মত বিভিন্ন নহে, ধর্ম্ম-তত্ত্ব অতীব দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং মহাজন অর্থাৎ পুজ্য ও আপ্তলোক যে পথে গমন করিয়া থাকেন তাহাই সুপ্রশস্ত মার্গ।

বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও মহামান্য।

অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ, শং ব্রাহ্মণা যস্য নিশ্বসিতং বেদাঃ। (বৃহদারণ্যক)

বেদ পরমেশ্বরের নিশ্বসিত অর্থাৎ নিশ্বাস স্বরূপ। নিশ্বাস যেমন অনায়াসে শরীর হইতে বহির্গত হয় এবং পুনরায় শরীরে প্রবিষ্ট হয় সেই প্রকার বেদও পরমাত্মা হইতে উদ্ভব হয় এবং পুনরায় তাঁহাতে বিলীন হয়। তাহার বহির্গমনের কাল ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ ৪৩২০০০০০০০ বৎসর। এই পরিমাণ কাল জগৎ বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিবে। ইহার নাম উদয় কল্প। আবার এতাবৎ সংখ্যাই পরমাত্মার নিশ্বাস নিরোধের কাল। ইহার নাম ব্রহ্মার রাত্রি বা ক্ষয় কল্প। এই কাল পর্য্যন্ত কার্য্যজগৎ সৃষ্ট হইবে। এই প্রকারে সৃষ্টির অনন্ত প্রবাহ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কত যুগ, কত মন্বন্তর ও ব্রহ্মকল্প অতীত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই বা ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। উদয় কল্পে যখন পরমাত্মার নিশ্বাস বহির্গমন হইবে তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হইবে এবং বেদের উদ্ভব হইবে। ক্ষয়কল্পে যখন পরমাত্মার নিশ্বাস নিরোধ হইবে এবং বেদও তাহাতে বিলীন হইবে। এই প্রকার বেদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। একথা আর্য্য জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রমাণানুগত সুতরাং সর্ব্বথা আমাদের শ্রদ্ধেয়।

অক্ষর সৃষ্টি সম্বন্ধে বাদিগণ নানা কথা বলিয়াছেন। তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ বস্তুতঃ তাহা অগ্রাহ্য। প্রথমতঃ ব্রহ্মা লোক শিক্ষার জন্য বেদ স্বয়ং প্রকাশ করেন এবং যখন তিনি বেদ প্রকাশ করেন তখনই তিনি অক্ষর সৃষ্টি করেন। কারণ ছয় মাস অন্তরে মনুষ্যের বিস্মরণ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত তিনি পত্রারূঢ় অক্ষর সৃষ্টি করেন। আহ্নিকতত্ত্ব-ধৃত বৃহস্পতি বলেন যে—

ষাণ্মাষিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে নৃণাম্।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টাণি পত্রারূঢ়াণ্যতঃ পুরা॥"

এই পুরা শব্দের অর্থ অতি প্রাচীন কাল অর্থাৎ বেদ প্রচারের সমকাল। বেদশাস্ত্র উদাত্তাদি স্বরের সহিত যেরূপ গ্রথিত, তাহা লিখিত

না হইলে যে ধারাবাহিক একরূপ থাকিতে পারে না—সহজেই আমাদের বোধগম্য হয়।

ত্রয়ী শব্দের অর্থ গদ্য, পদ্য ও গান এই তিন প্রকারে বেদ গ্রথিত, সুতরাং ত্রয়ী শব্দে এই তিন প্রকারে গ্রথিত সব বেদকে বুঝায় অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব।

"ত্রয়োঽবয়বা গদ্য পদ্য গানরূপা অস্যা সন্তীতি ত্রয়ী দ্বিত্রিভ্যামযট
ইতি অয়ট্ টিত্বাৎ ঈ।"

"স্ত্রিয়ামৃক সাম যজুষী ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।"

এই অমরকোষের উক্তিতে ইতি শব্দের অর্থ ইদমর্থ বুঝিবে। অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়কে ও ত্রয় এবং ত্রয়ী শব্দে অথর্ব্ব বেদও বাচ্য হইবে। কারণ বেদরচনা প্রণালী মতে ত্রয়ী শব্দে সকলবেদকেও বলিলে কোন আপত্তির আশঙ্কা থাকে না। যেহেতু বেদ গদ্য, পদ্য ও গান ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত ত্রয় অথর্ব্ববেদে বিশদভাবে গ্রথিত আছে—

"বিনিযোক্তব্য রূপশ্চ ত্রিবিধঃ সম্প্রদর্শ্যতে।
ঋগ্ যজুঃ সামরূপেন মন্ত্রো বেদচতুষ্টয়ে।" (সায়ন)

অর্থাৎ বিনিয়োগ যোগ্য ঋক্, যজুঃ ও সাম রূপে তিন প্রকার মন্ত্র চারি বেদেও দেখা যায়।

"বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সাম যজুরেব চ।"
'শব্দাত্মিকা সুবিমলগ্ যজুষাং নিধান
মুদ্‌গীথরম্য পদ পাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্॥'

এই গীতা ও চণ্ডীর দুইটী চ কারের অনুক্ত সমুচ্চয় রূপ অর্থের দ্বারা অথর্ব্ব বেদের গ্রহণ করিয়া একদেশদর্শী পণ্ডিত মহাশয়গণ বহুদর্শী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে স্বধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা হয়। শাস্ত্রে চ কারের অর্থ নিশ্চয় উক্ত সমুচ্চয় ও অনুক্ত সমুচ্চয় প্রভৃতি হইয়া থাকে।

স্ব স্ব ব্রাহ্মণগণের উৎকর্ষ কলহ।

"অভ্যর্হিতং পূর্ব্বম্" "সর্ব্ববেদেষু ঋক্‌মন্ত্রস্য ন্যূনাধিকতয়া ব্যাপকত্বাৎ।" ইত্যাদি ন্যায়ের দ্বারা ঋগ্বেদ প্রধান বলিয়া অভিহিত হন।

"একএব যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়েৎ।"

এই বিষ্ণু পুরাণের বচনবলে যজুর্ব্বেদ শ্রেষ্ঠ। "যজুঃসর্ব্ব ব্রগীয়তে।" "শূদ্রাণাং যজুষাং মতম্।" ইত্যাদি ন্যায়ের বচনও তাহার পৃষ্ঠপোষক।

"বেদানাং সামবেদোঽস্ম।" এই গীতার বচন বলে সামবেদও উৎকৃষ্টতা লাভ করেন।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সম্বভুব
বিশ্বস্থ কর্ত্তা ভুবনস্থ পোপ্তা।
সব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠা,
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥'

এই মুণ্ডকোপনিষদের উক্তি বশতঃ অথর্ব্ববেদও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। বস্তুতঃ সকল বেদই এক ব্যাহৃতি, একপ্রাণ, এক গায়ত্রী তবে বেদের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা হয় কেন? তাহার কারণ ভাগবতের ১২শ স্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে :—

তেনাসৌ চতুরোবেদানাং চতুর্ভির্বদনৈঃ প্রভুঃ।
স ব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চতুর্হোত্র বিবক্ষয়া।

চতুরাগ্নিহোত্র বলার অভিপ্রায় এই যে চতুর্মুখ হইতে ব্রহ্মা ব্যাহৃতি এবং ওঙ্কারযুক্ত চতুর্ব্বেদ বলিয়াছেন। অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এইগুলিকে চতুরাগ্নিহোত্র বলে। ঋগ্বেদকে হোতা, যজুর্ব্বেদকে অধ্বর্য্যু, সামবেদকে উদগাতা ও অথর্ব্ববেদকে ব্রহ্মা বলে। শাস্ত্রের বচন যথা :—

"ঋগ্ভির্হোত্রং যজুর্ভিশ্চাধ্বর্য্যবং যজ্ঞ কর্ম্মণি।
উদ্গাত্রং সামভির্জ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥"

বেদ যজ্ঞের নিমিত্ত প্রবৃত্ত। এবং চতুরাগ্নিহোত্র দ্বারা যজ্ঞ সাধিত হয়। এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মা স্বয়ং বেদবিভাগ করেন নাই। বেদ যে চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে তিনি ইহার দ্বারা তাহার আভাষ দিয়াছিলেন। এই আভাষ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস দ্বাপর যুগে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বেদ বিভাগ করিলেন। ত্রেতা যুগে বেদের

এই প্রকার বিভাগ ছিল না, তখন ব্রহ্মর্ষিগণ হৃদয়স্থিত অচ্যুত প্রণোদিত হইয়া বেদকে ব্যাস করিয়া অগ্নিহোত্রানুসারে মন্ত্র বিনিয়োগ করিতেন। দ্বাপরাদি যুগে ব্রাহ্মণেরা ক্ষীণসত্ব, অল্পায়ু ও হীনবুদ্ধি হইলেন সুতরাং তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাবে বেদকে ব্যাস করিবার ক্ষমতা রহিল না। ইহা দেখিয়া দেবগণ ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। দেবতাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত পরমাত্মার এক অতি সূক্ষ্ম কণা ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এই বিষয়ে ভাগবতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—

অস্মিন্নপান্তরে ব্রহ্মন্ ভগবানলোকপাবনঃ
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোক পালৈর্যাচিতোধর্ম্মগুপ্তয়ে।
পরাশরাৎ সত্যবত্যামশাংশকলয়াবিভুঃ
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধম্ ॥
ঋগথর্ব্ব যজুঃ সাম্নাং রাশীরুদ্ধৃত্যবর্গশঃ
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে সূত্রে মণিগণাইব॥”

অনন্তর ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মেশাদি লোকপাল কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম কলাতে পরাশর হইতে সত্যবতীতে অবতীর্ণ চারি ভাগে বেদ বিভাগ করিলেন। সূত্রে যেরূপ মণি গ্রথিত হয় সেই প্রকারে বেদরাশি হইতে বর্ণানুসারে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া ঋক, অথর্ব্ব, যজুঃ, ও সাম এই চারি সংজ্ঞা গ্রথিত করতঃ পৈল, বৈশম্পায়ণ, জৈমিনি ও সুমন্ত মুনিগণকে ক্রমে ক্রমে ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, সংহিতা বিতরণ করিলেন। এই প্রকার বেদের উৎপত্তি ও বিভাগ হয়।

বেদের পৌর্ব্বাপৌর্য্যক্রম নাই কারণ সমস্ত বেদ একসময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে উচ্চারিত হয়। ভবদেব স্বনাম প্রসিদ্ধ পদ্ধতির মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন যে :—

চতুর্ব্বদন সদ্মস্থ চতুর্ব্বেদ কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠান ষট্কর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ।

অর্থাৎ চতুর্ম্মুখরূপ গৃহে অবস্থিত চতুর্ব্বেদের বন্ধ স্বরূপ আর দ্বিজগণের অনুষ্ঠেয় যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ কর্ম্মের সাক্ষী ব্রহ্মাকে নমস্কার।

"ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।
বিন্ধ্য-কিস্কিন্ধ্য-হিমালয়াঃ ॥"

ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাসে অল্পাচ স্বরের প্রাগ্ভাব স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে। এজন্য ঋক্‌শব্দের প্রাথম্য হইয়াছে, বাস্তবিক কোন বেদই প্রথম নহে। সকল বেদই সমান, শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাব কাহারও নাই।

বেদ অপৌরুষেয়।

"সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে সতি অস্মর্য্যমান কর্ত্তৃকত্বাৎ আত্মবৎ।"

এইরূপ অনুমানের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে বেদের সম্প্রদায় অর্থাৎ প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন, উহা কেহ রচনা করিয়াছে এরূপ জানা যায় না কারণ—

"গুরুপাঠাদনুশ্রূয়তে ন তু কেনচিৎ ক্রিয়তে ইতি অনুশ্রবোবেদঃ।"

গুরুমুখ হইতে পরম্পরা শুনা যায় কিন্তু কাহার রচিত তাহা জানা যায় না। অনুশ্রব, বেদ, নিগম, ছন্দ, শ্রুতি, ত্রয়ী, আম্নায় ও ব্রহ্ম এইগুলি বেদশব্দের এক পর্য্যায়। অতএব আত্মার ন্যায় বেদ অপৌরুষেয়।

বেদের উদ্ভব যে পরমাত্মা হইতে হইয়াছে স্বয়ং বেদই তাহার প্রমাণ। যথা ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের সপ্তম মন্ত্র :—

"তস্মাৎ সর্ব্বানৃতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥"

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ ও সামবেদ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ অথর্ব্ববেদ ও যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল।

"কর্ম্মকর্ত্তৃসাধনবৈগুণ্যাৎ।"

বর্ত্তমান সময়ে বেদোক্ত ক্রিয়া সম্যক ফলবতী হইতেছে না কিন্তু তাহা বলিয়া বেদ ও বেদ বাক্য ভ্রমপ্রমাদদুষ্ট হইতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াতে পঞ্চশুদ্ধির আবশ্যক। আত্মশুদ্ধি, পত্নীশুদ্ধি, ঋত্বিক-শুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেশশুদ্ধি; এই পঞ্চ শুদ্ধির অভাবে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা সম্যক ফলের অভাব হইবে। শুধু শুধু পুরোহিত ঠাকুরকে দোষ দিলে চলিবে না।

বেদের ছয়টী অঙ্গ :—

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। শিক্ষা—স্বর বোধক শাস্ত্র। কল্প—যজ্ঞাদির বিধিপ্রদর্শক গ্রন্থ। ব্যাকরণ—প্রত্যক্ষ শব্দাদির শাসক। নিরুক্ত—বেদের অর্থবোধের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে পদবৃন্দের সমাবেশদ্যোতক শাস্ত্র। ছন্দ—অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দ বিজ্ঞাপক। জ্যোতিষ—কালাদি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়কগ্রন্থ।

"ছন্দঃ পাদৌতু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে,
জ্যোতিষাময়নং চক্ষু নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষাঘ্রাণংতু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং,
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

বেদ পুরুষের শিক্ষা ঘ্রাণ অর্থাৎ নাসিকা স্বরূপ। কল্প হস্ত সদৃশ, ব্যাকরণ মুখ তুল্য, নিরুক্ত কর্ণ, কল্প ছন্দ চরণ, জ্যোতিষ নয়নোপম হয়। সুতরাং ষড়ঙ্গের সহিত বেদার্থ যিনি অবগত থাকেন তিনি ব্রহ্মলোকে পূজ্য হন।

উপাঙ্গ ছয়টি —

ছন্দ, ভাষা, ধর্ম্ম, মীমাংসা, ন্যায় ও তর্ক।

চারি বেদের চারিটী উপবেদ :—

ঋগ্বেদের উপবেদ—অর্থশাস্ত্র।
যজুর্ব্বেদের " —ধনুর্ব্বেদ।
সামবেদের " —গন্ধর্ব্ববেদ।
অথর্ব্ববেদের " —আয়ুর্ব্বেদ।

"বিধাতাথর্ব্ব সর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্।
স্বনাম্না সংহিতাঞ্চক্রে লক্ষ শ্লোকময়ীমৃজুম্॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব সরল লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া নিজ নামে সংহিতা প্রকাশ করিলেন। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সংহিতা বলিয়া নাম রাখিলেন।

বেদের তিনটী প্রস্থান ঃ—

"আত্মবন্নিরুক্ত যাজ্ঞিকা"। অর্থাৎ বেদ তিন প্রকারে খ্যাত হয়—অধ্যাত্ম, নিরুক্ত ও যজ্ঞ পক্ষে।

অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা—জ্ঞান ও মুক্তি পক্ষে।

নৈরুক্ত ব্যাখ্যা—বস্তুতত্ত্ব বিজ্ঞান পক্ষে।

যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা—যজ্ঞাদি পক্ষে।

কামন্দকীয়ে উক্ত হইয়াছে "অথর্ব্ববেদীর ব্রাহ্মণ শান্তিক, পৌষ্টক কার্য্যে অর্থাৎ গ্রহযজ্ঞাদি ও দুর্গোৎসব, বৃষোৎসর্গাদি কার্য্যে অত্যন্ত কুশল ছিলেন।"

"ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ।
অথর্ব্ববিহিতং কর্ম্ম নিত্যং শান্তিক পৌষ্টিকম্॥"

অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে যিনি কুশল, প্রবীণ, তিনি পুরোহিত পদবাচ্য হইবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে প্রায় অথর্ব্ববেদীর ব্রাহ্মণ উক্তদ্বয়শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলেন।

মহামহোপধ্যায় স্মার্ত্ত চূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে—

চক্রুঃসাম ঋগ্‌যজুর্ম্মন্ত্রৈরথর্ব্বারক্ষাৎ দ্বিজোত্তমাঃ।
পুরোহিতোঽথর্ব্ব বিদৈর্জুহাব গ্রহশান্তয়ে।

রুক্মিণীর বিবাহে অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইয়াছিলেন। পুরাকালে প্রায় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদনে অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিতেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত ব্রাহ্মণ বিরল। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেওড়ামাল পরগণার ভূতপূর্ব্ব জমিদার বদান্য ব্রাহ্মণ নরনারায়ণ মহাশয়ের অধিকৃত প্রদেশে উক্ত ব্রাহ্মণ বসতি করেন। খাজনামুঠা পরগণার জমিদার বদান্যতম যাদবচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের শাসিত দেশে কতিপয় অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন। উক্ত জমিদারদ্বয় শান্তিক, পৌষ্টিক ক্রিয়াকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া উক্ত অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণকে নিজ নিজ দেশে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

তুলাপুরুষ প্রভৃতি মহাদানাদি কার্য্যে উক্ত ব্রাহ্মণগণের আবশ্যক হয়। উহারা জমিদার প্রদত্ত ভূসম্পত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। ব্রাহ্মণেতর জাতির যাজন করেন না। সম্প্রতি উক্ত ব্রাহ্মণ দেশের আচার অনুসারে অতিকষ্টে কালাতিপাত করেন। ফলতঃ, উঁহাদের সমাজ দারিদ্র্য বশতঃ বিদ্যাচর্চ্চায় বঞ্চিত ও অপর বেদীয় ব্রাহ্মণগণের কৌটিল্য ব্যবহারে নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়াছেন। বোধ হয়, আর কিছুদিন পরে অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ স্মরণীয় দশায় উপনীত হইবেন।

অতি পূর্ব্বকালে কোন ব্রাহ্মণ কবি রাজগণকে আশীর্ব্বাদ করিবার মানসে বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহাতে অথর্ব্ববেদ পরিত্যক্ত না হইয়া অতি সূক্ষ্ম গন্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"ওঁকারপ্রোঢ়মূলঃ ক্রমপদজঠরশ্ছন্দবিস্তীর্ণশাখঃ ঋক্‌পত্রে সামপুষ্পো যজুরধিক ফলোঽথর্ব্ব গন্ধং দধানঃ।

যজ্ঞচ্ছায়া সুশীতোদ্বিজমধুপগণৈঃ সেব্যমানঃ প্রভাতে।

সায়ং মধ্যাহ্নকালে চিরমমৃতনিভঃ পাতুবো বেদবৃক্ষ

ইতি বেদ[illegible]সারঃ।

অর্থাৎ ওঁকার যাঁহার সমুন্নত মূলস্বরূপ, বেদের পাঠক্রম ও পদগুলি যাঁহার জঠর স্থানীয় অনুষ্টুপাদি ছন্দ সমুদয় যাঁহার বিশাল শাখা হইতেছে, যিনি ঋগ্বেদকে পত্র, সামবেদকে পুষ্প, যজুর্ব্বেদকে ফলরূপে ধারণ করিতেছেন; অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ যাঁহার শীতলছায়া স্বরূপ হইতেছে; ব্রাহ্মণ-গণ ভ্রমররূপে ত্রিসন্ধ্যায় যাঁহার উপাসনা করেন, সেই অমৃতোপম বেদবৃক্ষ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে ঃ—

ঋগযজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভিমুখৈঃ

শাস্ত্রমিজ্যাং স্তুতি স্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ ॥

(৩য় স্কন্দ ১২অঃ)

অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদকে পূর্ব্বাদি দিকচতুষ্টয় ক্রমে স্ব স্ব আচার্য্যগণ উপবেশনের বিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে ঋক্‌বেদীয়

ব্রাহ্মণ গানবর্জ্জিত মন্ত্রের স্তব অর্থাৎ হোতৃকার্য্য করিবেন। দক্ষিণদিকে যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ইজ্যা অর্থাৎ অধ্বর্য্যু কার্য্য করিবেন। পশ্চিমে সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ স্তোম বা সাম গান করিবেন। উত্তরদিকে অথর্ব্ব-বেদীয় ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মকার্য্য সমাধা করিবেন

"ত্রয়াণামপরাধস্তু ব্রহ্মা পরিহরেৎ সদা।" (ত্রয়ী চতুষ্টয়)

ঋক, যজু, সাম বেদীয় ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাদিকার্য্যে ত্রুটী ঘটিলে তাহা ব্রহ্মা সংশোধন করিবেন। (ব্রহ্মা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ)।

ঋগাদি শব্দের উৎপত্তি :—

ঋক্—অর্চ্যতে পূজ্যতে স্তুয়তে বা ইন্দ্রাদিদেবো যয়া যা ঋক্ ঋচ স্তুতৌ ক্বচিদ কর্ত্তরিতেতিক্কিপ।

যজুঃ—যজ্যতে ইতি যজুঃ বপাদেরুস্ ইতি উস্।

সামন্—স্যতি গানাদিনা স্তাবকস্য পাপং নাশয়তীতি সামন্ সোঽস্ত কর্ম্মাণি এতোঽশিতি সাধাতোঃ শ্রাদেমনিভ্।

অথর্ব্বন্—মঙ্গলানন্তরারম্ভ প্রশ্নকাৎস্নেষ্বক্ষেঽথ ইতি মেদিনী অথকাৎস্নং সকলং ইয়র্ত্তি জানাতীতি ক্রাদেঃ ক্বণ ইতি বন্।

"সর্ব্বেগত্যর্থাজ্ঞানার্থাপ্রাপ্ত্যর্থাঃস্যুরিতি ঋগতৌ ইত্যস্য জ্ঞানার্থত্বম্।

অতএব উপসংহারে বক্তব্য হে ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ! স্ব স্ব অভিমান, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্বেষ, মমতা, পক্ষপাতিতা ও খলতা প্রভৃতি অসদ্গুণগুলি পারত্রিক ফলের অন্তরায় স্বরূপ, তাহা ব্রহ্মণ জাতির অবশ্য পরিত্যজ্য। ব্রাহ্মণের ক্ষমা, দয়া, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, সমদর্শিতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী চিরভূষণ। এই পরিত্যজ্য ও গ্রাহ্য বিষয়ে সতত দৃষ্টি রাখিলে ব্রাহ্মণ সমাজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অয়ি! ব্রাহ্মণপোষক যজমানগণ! আপনারা কৃপাদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ-গণের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুন। নচেৎ ব্রাহ্মণ জাতি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না। এই ভারতবর্ষ কর্ম্মক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ সেই কর্ম্মের উপদেষ্টা। তাহাদিগকে সযতনে দানমানাদি দ্বারা আপ্যায়িত না করিলে উক্ত জাতির

রক্ষা হয় না। ব্রাহ্মণ তোমাদের সাক্ষাৎ দেবতা। বর্ত্তমান সময়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সমালোচনা করিলে তাহা উপলব্ধি ঘটিবে যে, উক্ত জাতির সর্ব্বস্ব অন্তর্হৃত হইতেছে। স্বধর্ম্মপরায়ণ রাজগণ আর নাই; সুতরাং উক্ত জাতির আর সংস্থান হইতেছে না। ইহাদের পতনের সহিত ভারতের অন্যান্য শ্রেণীর উন্নতিআকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে। যে ব্রহ্মতেজে এই ভারত এক সময়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়াই, নৃপবল্লীর শিরোমণি মহারাজ দিলীপ ব্রহ্মদ্রষ্টা বশিষ্ঠ মুনিকে বলিয়াছিলেন যে :—

"পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ।
যন্মদীয়া প্রজাস্তস্য হেতুস্তদ্‌ব্রহ্ম বর্চ্চসম্‌॥"

আমার প্রজাপুঞ্জ ভয় ও ও ঈতি শূন্যে দীর্ঘজীবী হইয়া রহিয়াছে। তাহার হেতু আপনার ব্রহ্মতেজ। আপনি ব্রহ্মতেজে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি মুষিক, শলভ, খগ ও রাজগণের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি পৃথিবীর অমঙ্গল ধ্বংস করিয়াছেন। এজন্য আমার প্রজাবৃন্দ সুখে কালযাপন করিতেছে।"

অতএব সেই ব্রহ্মতেজ কিরূপ তিরোহিত হইয়াছে একবার ভাবিয়া দেখুন। সম্প্রতি অতি ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়া আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে তাহা দেখিয়াও দেখ নাই কারণ হিংসা বুদ্ধি আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছে। পরস্পরের সহৃদয়তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের ভিতরে সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের সম্মান হানি করা আমাদের একমাত্র ব্যবসা হইয়া পড়িয়াছে।

"আত্মোদয় পরগ্লানিদ্বয়ং নীতি রীতিয়তি।
তদুরীকৃত্য কৃতিভির্বাচস্পত্যং প্রতায়তে॥"

অর্থাৎ নিজের প্রশংসা পরের কুৎসা করা এই দুইটী আমাদের নীতি হইতেছে। ঐ দুইটী লইয়াই বর্ত্তমান কৃতী পুরুষ বৃহস্পতি বলিয়া পরিচিয় প্রদান করেন। কাহারও উন্নতি আমরা চোখে দেখিতে পারি না। দেখুন! বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন কালে ব্রহ্মণাদি স্বজাতিগণ কিরূপ কবিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তাহা স্মরণ করিলে বুঝা যায় পূর্ব্বতন রাজগণ কিরূপ ব্রাহ্মণাদির উৎকর্ষসাধক ছিলেন। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে কথিত আছে যে :—

"যাবতীর্বৈ দেবতা তাঃ সর্ব্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে
বসন্তি তস্মাদ্বেদবিদ্ভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোদিবে দিবে
নমস্কুর্য্যাৎ। নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ। এতাএব দেবতা
প্রীণাতি।"

"যত দেবতা আছেন তাঁহারা সকলেই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ শরীরে বাস করেন, তন্নিমিত্ত বেদবিদ ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন নমস্কার করিবে। অশ্লীল কীর্ত্তন করিবে না তাহা হইলে দেবতা তৃপ্ত হইবেন"। এই শ্রুতিমূলক স্মৃতিও বলেন :—

"তুষ্টিতমা ব্রাহ্মণা যদ্বদন্তি তদ্দেবতা কর্ম্মাভিরাচরন্তি।
তুষ্টেষু তুষ্টা সততং ভবন্তি প্রত্যক্ষ দেবেষু পরোক্ষ দেবাঃ॥"

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়া যাহা মুখে বলিবেন দেবতারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দিবেন। প্রত্যক্ষ দেবতা ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইলে পরোক্ষ দেবতা ইন্দ্রাদি সতত প্রসন্ন থাকেন।" দুঃখের বিষয় এই যে, এতাদৃশ শৌচসম্পন্ন বেদবিদ ব্রাহ্মণ দিন দিন তিরোহিত হইতেছেন। তাহার কারণ ভারতীয় দ্রব্যজাতের অবিশুদ্ধি বশতঃ সৎক্রিয়ার অভাব ঘটিতেছে।

ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন হইলে সদাচার নাশ হয়। সদাচার নাশ ঘটিলে শস্যাদির অনুৎপন্নতা অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণকে সৎপথে রাখিতে অভিলাষী হয় না—ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র, কলত্র, বৃত্তি, ধর্ম্ম ও মহত্ত্ব প্রভৃতিকে ধ্বংস করিতে সদাই সচেষ্ট। হায়! কি কালের প্রবল স্বভাব। ভাবিয়া দেখ ব্রাহ্মণজাতি অতি নিন্দিত ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। হা ভগবান! আপনি কৃপাদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করুন। আপনার শরণ করুণা ব্যতীত ব্রাহ্মণদের গত্যন্তর নাই।

অতীত কালের যজমানগণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে স্তুতি দ্বারা ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের চরণরেণু স্বীয় উত্তমাঙ্গে স্থাপন করতঃ নিম্নস্থ শ্লোক পাঠ করিয়া কৃতকৃত্য হইতেন :—

বিপদ্‌ক্ষণধ্বান্ত সহস্রদানবঃ
সমীহিতার্থাঃ ফলকামধেনবঃ।
অপার সংসার সমুদ্রসেতবঃ
পুণ্যন্তু মাং ব্রাহ্মণ পাদরেণবঃ॥

অর্থাৎ বিপদরূপ নিবিড় অন্ধকার বিনাশে সহস্র সূর্য্য স্বরূপ মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে কামধেনু সদৃশ দুস্তরণীয় ভব সমুদ্রের পার হওয়ার সেতুতুল্য ব্রাহ্মণগণের পদধূলী আমায় রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণের বৈদিক উপাধি।

চতুর্ব্বেদী, ত্রিপাঠী, দ্বিবেদী, আচার্য্য, মিশ্র, হোতা, পাণ্ডা, পাঠক, বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রোচিত উপাধি রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ।

দেশবিদেশের ব্রাহ্মণগণের নাম।

"সারস্বতা. কান্যকুব্জা, গৌড়াচোৎকল মৈথিলা,
পঞ্চ গৌড় সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।
আন্ধ্রাকার্ণাটকাচৈব মহারাষ্ট্রশ্চ গুজ্জরাঃ
দ্রাবিড়াশ্চৈতি বিজেয়া বিন্ধ্যাদ্দক্ষিণবাসিনঃ॥

বিন্ধ্যাপর্ব্বতের উত্তরবাসী সারস্বত আদি পাঁচটী ব্রাহ্মণ আছেন। আর তাহার দক্ষিণপ্রদেশবাসী ত্রৈলিঙ্গ প্রভৃতি পাঁচটী ব্রাহ্মণও আছেন। এই উভয়বিধ দশ ব্রাহ্মণের মধ্যে চারিটী বেদও আছে। ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের শাখা শাকলাদি, যজ্জুর্ব্বেদীয়দের কন্বাদি, সামবেদীয়গণের কুথুমাদি, অথর্ব্ববেদীয়দের পৈপ্পালাদ ও শৌণকাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বেদের শাখা লোপ হইয়াছে। সম্প্রতি সমস্ত শাখা পাওয়া যায় না। অনেক ব্যক্তি বলেন যে, ঋক্ সংহিতাই শ্রেষ্ঠ। অপর সংহিতাগুলি ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই কথা নিতান্ত ভ্রান্তিজ্ঞানপোষক। কারণ, ঋক্ সংহিতাই স্বয়ং অতি স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে :—

"চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বেশীর্ষে সপ্তহস্তাসোঽস্য।
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহোদেবো মর্ত্ত্যামবিবেশ॥ (ঋং সং ৪, ৫৮, ৩)

এখানে চত্বারি শৃঙ্গপদে চারিটী বেদ। আশ্বলায়ন, বাধায়ন মুনির কল্পগ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন বর্ত্তমান কালে বৈদিক গ্রন্থের আলোচনা এদেশে বিরল হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র বেদের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বুঝা মন্দমতি ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

চলার গান

(শ্রীসরোজকুমার সেন)

বেদনা-বিধুর হিয়ার মাঝারে
কাহার মাধুরী ফুটিয়া রয়
ধরণীর তৃষা দূর করি দিতে
নিয়ত ক্ষুধার উৎস বয়।
তটিনী যেমন বেগে বহি যায়
সাগরে মিশাতে আপন ধারা।
অজানার পানে আকুল আবেগে
ছুটেছে নিখিল পাগল-পারা।
মথিত করিয়া দুঃখ-বেদনা
ব্যথিয়া উঠেছে চিত্ত খানি;
বঁধুরে জানাতে মরমের কথা,
আপনার মনে সরম-মানি।
দুঃখ-দহন করিয়া বহন
তবুও চলেছি বঁধুর পানে—
আঁধারের পারে আলোর ঝরণা
সে শুধু মোদের চিত্ত জানে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১)

চিকাগো

১১ই জানুয়ারি, ১৮৯৫।

প্রিয় জি, জি,

তোমার ১৩ই ডিসেম্বরের পত্র এই মাত্র পেলাম। ঐ সঙ্গেই আলাসিঙ্গার ও মহীসুরের মহারাজার পত্র পেলাম নরসিংহা যে আমেরিকা এসেছিল, সে ভারতে ফিরে তথা হতে মিসেস হেগকে একখানা পত্র লিখেছে—তাতে হিন্দুদের বর্ব্বর আখ্যা দিয়েছে আর আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখে নি। আমার আশঙ্কা হচ্চে, তার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। যাতে সে আরোগ্যলাভ করে, তার চেষ্টা কর। চিরদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না।

ডাঃ—তোমার পত্রের জবাব কেন দিলে না জানি না আর কল্‌কেতার লোকদের যা উত্তর দিয়েছেন, তাও দেখিনি।

এখানকার ধর্ম্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—সব ধর্ম্মের চেয়ে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা, কিন্তু উহার উদ্যোক্তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তার বিপরীত হয়ে গেল। ডাঃ—ও ঐ ধাঁজের লোকেরা বেজায় গোঁড়া—তারা সর্ব্বান্তঃকরণে আমায় ঘৃণা করে, কিন্তু প্রভুই আমার সহায়। আমি তাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। প্রভু এদেশে আমায় যথেষ্ট বন্ধু দিচ্চেন আর তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ওরা আমার অনিষ্ট কর্‌বার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করেছে—এখন হয়রান হয়ে আমায় ছেড়ে দিয়েছে—প্রভু ওদের মঙ্গল করুন।

ডাঃ—ও ঐ ধাঁজের অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত—

জেনে রাখ, ওদের সঙ্গে আমার কোন প্রকার সংস্রব নেই। বাল্টিয়োরের ঘটনা নিয়ে যে বাজে গুজব উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই, তথায় এখন আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু রয়েছেন—আর বরাবরই তথায় আরও অধিকসংখ্যক বন্ধু পাব। আর আমি এক মুহূর্ত্তও অলসভাবে কাটাচ্ছি না—আমি এদেশের দুটা প্রধান কেন্দ্র বোষ্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি—এর মধ্যে বোষ্টনকে মস্তিষ্ক ও নিউইয়র্ককে টাকার থলি বলা যেতে পারে। এই উভয় স্থানেই আমার আশাতীত কার্য্যের সফলতা হয়েছে আর যদি তোমাদের সংবাদ প্রেরকগণ তোমাদের নিকট ও সম্বন্ধে কিছু না পাঠিয়ে থাকে, তাতে আমার কিছু দোষ নাই। যাহা হউক, বৎসগণ, আমি এই খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি আর আমি তোমাদের নিকট ওর কিছু পাঠাব আশা কোরো না। কাজ আরম্ভ করবার জন্য একটু হুজুগ দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমাকে দেখাও, তোমরা কি করতে পার। এখন আহাম্মকের মত বাজে বক্‌লে চল্‌বে না—এখন আসল কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে। আমি কি ভাবে কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে, তা তোমাদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি—আয়ারকেও পত্র লিখেছি। হিন্দুরা যে বড় বড় কথা বলে, তার সঙ্গে আসল কাজ দেখাতে হবে। তা যদি তারা না পারে, তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। ব্যস্, এই কথা। তোমাদের নানাবিধ খেয়ালের জন্য আমেরিকা টাকা দিতে যাচ্ছে না। কেনই বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি চাই—যথার্থ সত্য শিক্ষা দেওয়া হক—তা এখানেই হক আর অন্যত্রই হক—আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।

এখন আর আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে, সে দিকে কান করো না। সিংহ বিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আমার যতদিন না দেহত্যাগ হচ্ছে সদাসর্ব্বদা কাজ করে যাব আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ কর্‌তে থাক্‌ব। অসত্য হাল্‌কা জিনিষ—সত্যের তার চেয়ে অনন্তগুণে ভার আছে। সাধুতারও

তাই। যদি ঐ সত্য ও সাধুতা তোমাদের থাকে, তবে তাদের ভারেই তারা জগতে জয়ী হবে।

থিওজফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। বোলছো, আমায় সাহায্য করবে—দূর! তোমরা যেমন খাজা আহাম্মক! তোমরা কি মনে কর, এখানে আমাকে লোকে তাদের সঙ্গে একদরের মনে করে? তাদের এখানে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, কিন্তু হাজার হাজার ভাল ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এইটী জেনে রাখ ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হও।

কথাটী খুব গোপন রেখো যে, খবরের কাগজে হুজুগ করে আমাকে যত না বাড়াতে পারে, এদেশে ধীরে ধীরে তার চেয়ে অনেক গুণে লোকের উপর প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। গোঁড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌ছে, তারা কোন মতে এটা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছে না, তাই যাতে আমার প্রভাবটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করছে না। কিন্তু তারা তা পেরে উঠ্‌বে না—প্রভু একথা বল্‌ছেন।

এটা হচ্ছে চরিত্রের প্রভাব, পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের প্রভাব। যতদিন এগুলি আমার থাক্‌বে, ততদিন কোন চিন্তার কারণ নেই, ততদিন তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোওগে—কেউ আমার মাথার একগাছা কেশও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। বইপত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কি হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ কর্‌তে হলে জ্যান্ত লোকের মুখ থেকে যে জ্যান্ত ভাষা বেরোয় সেইটীই হচ্ছে প্রধান উপায়;—সেই ভাষার ভিতর দিয়ে সেই ব্যক্তির ভিতরে যে ভাবের বিদ্যুৎপ্রবাহ খেল্‌ছে, তা অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তোমরা ত এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হইতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ—কাজ—কাজ।

*   *   *   *

ওসব বাজে বকুনি ছেড়ে দাও—প্রভুর কথা কও, জুয়াচোর ও মাথা-পাগলাদের কথা নিয়ে আলোচনা কর্‌বার সময় আমাদের নেই—জীবন যে আমাদের ফুরিয়ে এল বলে।

সদাসর্ব্বদা তোমাদের এটী মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজের উদ্ধার সাধন কর্‌তে হবে। সুতরাং অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করো না। আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারি—এই পর্য্যন্ত। যদি উহার উপর ভরসা করে তোমাদের থাক্‌তে হয়, তবে বরং কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দাও। আরও জেনে রাখ যে, আমার ভাব বিস্তার কর্‌বার এটী বিশেষ উপযুক্ত জায়গা আর আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হক, মুসলমানই হক আর খ্রীষ্টিয়ানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না—যারা প্রভুকে ভালবাসে তাদেরই সেবা কর্‌তে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি জান্‌বে।

আমাকে বাজে খবরের কাগজ আর পাঠিও না—উহা দেখ্‌লেই আমার গা আঁৎকে ওঠে। আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ কর্‌তে দাও—প্রভু আমার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা রয়েছেন। যদি ইচ্ছা হয় ত সম্পূর্ণ অকপট, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে আমার অনুসরণ কর। তোমরা যেখানেই থাক, আমার আশীর্ব্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাক্। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পর প্রশংসা বিনিময় কর্‌বার আমাদের সময় নেই। যখন এই জীবন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন প্রাণভরে কে কতদূর কি কর্‌লাম তুলনা কোর্‌বো ও পরস্পরকে সুখ্যাতি কোর্‌বো। এখন কথা বন্ধ কর—কেবল কাজ—কাজ—কাজ। ভারতে তোমরা স্থায়ী কিছু কোরেছো, তা ত দেখ্‌তে পাচ্চি না। তোমরা কোন কেন্দ্র স্থাপন করেছ—তাত দেখ্‌তে পাচ্চি না। তোমরা কোন মন্দির বা হল প্রতিষ্ঠা করেছো—তাওত দেখ্‌ছি না। অপর কেউ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে—তাও দেখ্‌ছি না। কেবল চীৎকার—চীৎকার—চীৎকার। আমরা খুব বড়—আমরা খুব বড়! পাগল—আমরা পশু—তা ছাড়া আমরা আর কি?

এই জঘন্য নাম যশ ও অন্যান্য বাজে ব্যাপারগুলি—ও গুলিতে আমার কি হবে? ওগুলি আমি কি গ্রাহ্যের ভিতর আনি? শত শত ব্যক্তি এসে প্রভুর আশ্রয় নেবে—কোথায় তারা? আমি তাদের চাই—

তাদের দেখ্‌তে চাই। তোমরা ত এরূপ লোক আমার কাছে এনে দিতে পারনি—তোমরা আমায় কেবল নাম যশ দিয়েছো। নাম যশ চুলোয় যাক্‌! কাজে লাগো, সাহসী যুবকবৃন্দ, কাজে লাগো। আমার ভিতর যে কি আগুন জ্বল্‌ছে, তার সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠে নি। তোমরা এখনও পর্যান্ত আমায় বুঝতে পারো নি। তোমরা এখনও আলস্য ও ভোগের পুরাতন রাস্তায় চলেছো। দূর কোরে দাও যত আলস্য—দূর কোরে দাও ইহলোকে ও পরলোকে ভোগের বাসনা। আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এসো।

ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভিতরে যে আগুন জ্বল্‌ছে, তা তোমাদের ভিতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে, তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মর্‌তে পারো—ইহা সদাসর্ব্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

পুঃ—আলাসিঙ্গা, কিডি, ডাক্তার, বালাজি এবং আর আর সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে এবং বল্‌বে, তারা যেন রাম শ্যাম যত আমাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি বল্‌ছে, এই নিয়ে দিন রাত মাথা না ঘামায়—তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে কাজে লাগায়। জগতে যত রাম শ্যাম আছে, সকলকে আশীর্ব্বাদ কর—তারা ত শিশু মাত্র—আর তোমরা কাজে লেগে যাও।

ইতি—

বি:—

পুঃ—সংবাদ পত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদের কথা গ্রহণ কর্‌তে হবে। কারণ, যদি কোন রিপোর্টারকে দেখা সাক্ষাৎ কর্‌তে না দেওয়া হয়, সে গিয়ে যা তা কতকগুলি স্বকপোল কল্পিত বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয়। সেই জন্যই ত তোমরা ব্যাল্টিমোর সংক্রান্ত বাজে খবরগুলো পেয়েছ। লোকগুলো কি করে ঐসব লেখ্‌বার উপাদান পেলে, আমি ত নিজেই তা জানি না। আমেরিকার কাগজ-গুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুসি তাই লেখে। বক্তৃতার রিপোর্ট

গুলোও বার আনা বাজে কথায় ভরা। রিপোর্টাররা নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিষ পূরণ করে দেয়। আমেরিকার কাগজ থেকে কিছু তুলে ছাপাবার সময় খুব সাবধান।

ইতি বিঃ—

(২)

আমেরিকা।

১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি গত কল্য জিজিকে পত্র লিখেছি, কিন্তু আরও কতকগুলি কথা বলা দরকার বোধ হচ্ছে—তাই তোমায় লিখ্‌ছি :—

প্রথমতঃ, আমি পূর্ব্বে কয়েকখানি পত্রে তোমাদের লিখেছি যে, বইটই ও খবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না, কিন্তু দেখ্‌ছি, তথাপি তোমরা পাঠাচ্ছ—ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত। কারণ, আমার ঐগুলি পড়বার এবং ঐগুলি সম্বন্ধে খেয়াল করবার সময় মোটেই নেই। অনুগ্রহপূর্ব্বক ওগুলি আর পাঠিও না। আমি মিশনরি, থিওসফিষ্ট বা ঐরূপ লোকদের মোটেই আমলে আনিনা—তারা সবাই যা পারে তা করুক। তাদের কথা নিয়ে আলোচনা করিতে গেলেই তাদের দর বাড়ান হবে। মান্দ্রাজ অভিনন্দের উত্তরটা মিসেসকে পাঠিয়ে তোমরা ঠিক কর নি। তিনি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান—সুতরাং গোঁড়াদের সম্বন্ধে উহাতে আমি যে সমালোচনা করেছি, তা তাঁর ভাল লাগ্‌বে না। যাই হক, যার শেষ ভাল, তা ভাল বলেই ধরে নিতে হবে।

যাই হক্, এখন তোমরা একেবারেই জেনে রাখ যে, আমি নাম যশ বা ঐরূপ ভুয়ো জিনিষ একদম গ্রাহ্য করিনা। আমি জগতের কল্যাণের জন্য আমার ভাবগুলি প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় কাজ করেছো বটে, কিন্তু কাজ যতদূর হয়েছে, তাতে শুধু আমারই নাম-যশ হয়েছে। কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্য জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের আরও

বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। ঐ সব আহাম্মকির জন্য আমার মোটেই সময় নেই জান্‌বে। তোমরা ভারতে ভাবগুলি বিস্তারের জন্য ও সঙ্ঘবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছো?—কই, কিছুই না।

সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন—উহাতেই হিন্দুদিগকে পরস্পরের সাহায্য কর্‌তে ও পরস্পরের ভাল ভাবগুলির আদর করতে শেখাবে। আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য কল্‌কাতায় ৫০০০ লোক জড় হয়েছিল—অন্যান্য স্থানেও শত শত লোক এসেছিল—বেশ কথা—কিন্তু তাদের প্রত্যেককে এক একটা করে পয়সা সাহায্য কর্‌তে বল দেখি—অমনি তারা সরে পড়বে। আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রটা দাসসুলভ আত্মনির্ভরের অভাব ও পরের উপর নির্ভরের ভাবে পূর্ণ। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তারা খেতে খুব প্রস্তুত, আবার কারও কারও সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পার্‌লে ভাল হয়। আমেরিকা তোমাদের কিছু টাকা কড়ি পাঠাতে পার্‌বে না—কেনই বা পার্‌বে? যদি তোমরা নিজকে নিজে সাহায্য কর্‌তে না পার, তবে ত তোমরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও তুমি যে পত্র লিখে আমার কাছে জান্‌তে চেয়েছো—আমেরিকার কাছ থেকে বছরে বছরে কয়েক হাজার টাকার নিশ্চিত ভরসা করা যেতে পারে কিনা, তাই পড়ে অমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেছি। তোমরা এক পয়সাও পাবে না। সব টাকাকড়ি যোগাড় নিজেদেরই করে নিতে হবে—কেমন, পারবে কি?

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্পনা ছিল, আমি উপস্থিত তা ছেড়ে দিয়েছি। উহা ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি চাই এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারকের দল। বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনায় আলোচনা করে শিক্ষা দিবার জন্য এবং সংস্কৃত ও কয়েকটী পাশ্চাত্য ভাষা ও বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য শিক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজে একটা কলেজ কর্‌তেই হবে। উহার মুখপত্রস্বরূপ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কাগজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে। এর মধ্যে একটা

কিছু কর—তা হলে জানবো, তোমরা কিছু করেছো—কেবল আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না।

তোমাদের জাতটা দেখাক্ যে তারা কিছু করতে প্রস্তুত। তোমরা ভারতে যদি এরূপ কিছু কর্‌তে না পার, তবে আমাকে একলা কাজ কর্‌তে দাও। আমার জগৎকে কিছু দিবার আছে—যারা উহা আদর পূর্ব্বক নেবে, ও কাজে পরিণত কর্‌বে তাদের কাছে উহা দিতে দাও। কোন ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ উহা নেয় আমি তা গ্রাহ্য করি না। "যারা আমার পিতার কার্য্য কর্‌বে, তারাই আমার আপনার জন।"

যাই হক্ আবার বল্‌ছি এই জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করো—একেবারে ছেড়ে দিওনা। এইটী মনে রেখো আমার নাম খুব বেজে যায়, এটী আমি চাই না। আমি চাই দেখ্‌তে যেন আমার ভাব গুলি কার্য্যে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল গুরুর উপদেশ গুলির সঙ্গে সেই ব্যক্তিটীকে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। * * তোমরা ভাবগুলি বিস্তারে চেষ্টা করো প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সদা আশীর্ব্বাদক—

বিবেকানন্দ।

(৩)

ব্রুকলিন

জানুয়ারী, ১৮৯৫।

('ধীরামাতা' বা মিসেস ওলিবুলকে তাঁহার পিতার দেহত্যাগের সময় লিখিত)

* * * *

আপনার পিতা যে তাঁর জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবেন, আমি পূর্ব্বেই তার কতকটা আভাস পেয়েছিলাম, কিন্তু যখন এইরূপ গোল-মেলে মায়ার তরঙ্গ কাউকে আঘাত করতে যাবার উপক্রম হয়, তখন তাকে সেই বিষয় লেখাটা আমার দস্তুর নয়। তবে এই

সময়গুলি জীবনের এক একটা অধ্যায় পাল্‌টানের মত—আর আমি জানি, আপনি এতে সম্পূর্ণ অবিচলিত আছেন। সমুদ্রের উপরিভাগটা পর্য্যায়ক্রমে ওঠে নামে বটে, কিন্তু যে আত্মা ধীরভাবে উহা পর্য্যাবেক্ষণ কর্‌ছেন, সেই জ্যোতির তনয়ের নিকট প্রত্যেক পতন উহার ভিতরদিক্‌টা এবং নিম্নদেশস্থ মুক্তার স্তর ও প্রবাল সমূহকেই বেশী বেশী করে প্রকাশ করে দেয়। আসা যাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। আত্মা কখন আসেনও না, যানও না। যখন সমুদয় দেশ আত্মার মধ্যেই রয়েছে তখন সেই স্থানই বা কোথায় যেখানে আত্মা যাবে? যখন সমুদয় কাল আত্মাতেই রয়েছে তখন উহার দেহান্তরে প্রবেশ কর্‌বার এবং উহা ছাড়বার সময়ই বা কোথায়?

পৃথিবী ঘুরছে, কিন্তু ঐ পৃথিবীর ঘোরাতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, সূর্য্য ঘুর্‌ছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্য ঘুর্‌ছে না। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুরছে। পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করছে, এই মহান গ্রন্থের পাতার পর পাতা-উল্টে যাচ্ছে এদিকে সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অবিচলিত ও অপরিণামী থেকে জ্ঞানসুধাপানে বিভোর আছেন। যত জীবাত্মা পূর্ব্বে ছিল বা বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে, সকলেই বর্ত্তমান কালে রয়েছে আর জড়জগতের একটী উপমা ব্যবহার কর্‌লে বলা যায় যে, তারা সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে রয়েছে। যেহেতু আত্মাতে দেশের ভাব থাক্‌তে পারে না, সেই হেতু যারা সকলে আমাদের ছিলেন, আমাদের রয়েছেন এবং আমাদের হবেন, তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই রয়েছেন, সর্ব্বদাই ছিলেন এবং সর্ব্বদাই থাক্‌বেন। আমরা তাঁদের মধ্যে রয়েছি। তাঁরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

এই কোষগুলির কথা ধর। যদিও প্রত্যেকটী পৃথক, কিন্তু তথাপি তারা সকলেই ক ও খ এই বিন্দুতে সম্মিলিত রয়েছে। সেখানে তারা এক হয়েছে। প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু সকলেই ঐ ক খ নামক অক্ষে সম্মিলিত। কোনটাই সেই অক্ষরকে

ছেড়ে থাক্‌তে পারে না, আর ঐ সকল কোষের পরিধি যতই ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন হোক না কেন, কিন্তু অঙ্কেতে দাঁড়িয়ে আমরা এর মধ্যে যে কোন ঘরে ঢুকতে পারি। এই অঙ্কটাই ঈশ্বর। এখানেই আমরা তাঁর সঙ্গে এক—ইহাতেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগ আর সকলেই সেই ভগবানে সম্মিলিত।

একখানা মেঘ চাঁদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে, চাঁদটাই চলেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ, জড়—এই গুলিই সবল, গতিশীল—ইহাদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান (অথবা দৈবপ্রেরণা ?) দ্বারা সর্ব্বজাতির উচ্চনীচ সব রকমের লোক মৃতব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য।

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ আর এই সব নক্ষত্ররাজি ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্ম্মল নীল আকাশে বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থস্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই। কতকগুলি জীবাত্মা তারকা—যারা আমাদের চক্রবালের অতীত প্রদেশে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম্ম জিনিষটার আরম্ভ আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হল, যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে পেলাম। সুতরাং ভিতরের কথা হচ্ছে এই যে, আপনার পিতা যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেছিলেন, তা ত্যাগ করেছেন এবং অনন্তকালের জন্য যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থিত রয়েছেন। তিনি কি এজগতে বা অন্য কোন জগতে আর একটা ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করে পরিধান কর্‌বেন ? আমি ভগবৎসমীপে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করছি, তা যেন তাঁকে না কর্‌তে হয়, যতক্ষণ না পূর্ণ জ্ঞানের সহিত না কর্‌তে পারছেন। আমি প্রার্থনা করি, কেউ যেন তার নিজকৃত পূর্ব্ব কর্ম্মের অদৃশ্য শক্তিতে পরিচালিত হয়ে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও না যায়। আমি প্রার্থনা করি যে, সকলেই যেন মুক্ত হতে পারে অর্থাৎ জানতে পারে যে, আমরা

মুক্ত। আর যদিই তাদের আবার স্বপ্ন দেখতে হয়, তবে তাদের স্বপ্ন যেন শান্তি ও আনন্দপূর্ণ হয়।

ইতি বিবেকানন্দ।

(৪)

আমেরিকা।

৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকার দরুণ তুমি হয়ত কত কি ভাব্‌ছো কিন্তু হে বৎস, আমার যে বিশেষ কিছু লিখ্‌বার ছিল না—খবরের মধ্যে সেই পুরাতন কথা—কেবল কাজ, কাজ, কাজ।

তুমি ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ও ডাঃ ডে, কে, যে পত্র লিখেছো, তার দুখানাই আমি দেখেছি—সুন্দর লেখা হয়েছে। আমি যে কোনরূপে এখনি ভারতে ফিরে যেতে পার্‌বো, তা ত বোধ হয় না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভেবো না যে, ইয়াঙ্কিরা ধর্ম্মটাকে কাজে পরিণত কর্‌বার এতটুকু মাত্র চেষ্টা করে—এ বিষয়ে কেবল হিন্দুরই বচন ও আচরণের সামঞ্জস্য আছে। ইয়াঙ্কিরা টাকা রোজগারে খুব মজবুত। সুতরাং আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা কিছু একটু ধর্ম্মভাব জেগেছে, সবটাই একেবারে উড়ে যাবে। সুতরাং চলে যাবার পূর্ব্বে কাজের ভিতরটা পাকা করে যেতে চাই। সব কাজই আধাআধি না করে সম্পূর্ণ করা উচিত।

আমি—আয়ারকে একখানা পত্র লিখেছিলাম তাতে যা লিখেছিলাম, তোমরা সেই সব বিষয়ে কি কোচ্ছ?

তোমরা লোককে পীড়াপীড়ি করে রামকৃষ্ণের নাম প্রচার কর্‌তে যেয়ো না। আগে ভাবটা দাও ঐ ভাবটা গ্রহণ করুলেই লোকে যার ভাব সেই লোকটাকে মান্‌বে। যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে মানুষটাকে মানে, তারপর তার ভাবটা লয়। কিডি ছেড়ে দিয়েছে—বেশ ত সে একবার সবদিক্‌ চেয়ে চেয়ে দেখুক—সে যা খুসি তাই প্রচার করুক না—কেবল গোঁড়ামী করে যেন অপরের ভাবের উপর আক্রমণ না করে।

তুমি ওখানে তোমার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা পার করবার চেষ্টা কর, আমিও এখানে একটু আধটু সামান্য কাজ করবার চেষ্টা করছি। কিসে ভাল হবে, তা প্রভুই জানেন। আমি তোমাকে যে বইগুলির কথা লিখেছিলাম, সেগুলি কি পাঠিয়ে দিতে পার? গোড়াতেই একেবারে বড় বড় মতলব নিয়ে পড়ো না—ধীরে ধীরে আরম্ভ কর—আগে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেইটাকে শক্ত করে ধরে ক্রমে উপরে উপরে উঠবার চেষ্টা কর। * * *

হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও—আমরা একদিন না একদিন আলো দেখতে পাবই পাব।

জি, জি, কিডি, ডাক্তার এবং আর আর বীরহৃদয় মান্দ্রাজী যুবকবৃন্দকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ—

পুনঃ—যদি সুবিধা হয়, কতকগুলি কুশাসন পাঠাবে

পুনঃ—যদি লোকে পছন্দ না করে তবে সমিতির 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা বদ্‌লে আর যা খুসি করে দাওনা কেন।

সকলের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে থাক্‌তে হবে—আর ল্যাণ্ডস-বর্গের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান কর। এইরূপ কাজটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকুক। রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। মহীশূরের মহারাজার দেহত্যাগ হল—তিনি আমাদের অন্যতম বিশেষ আশার স্থল ছিলেন। যাই হক্—প্রভুই মহান—তিনি অপরাপর ব্যক্তিকে আমাদের সাহায্যার্থ পাঠাবেন।

ইতি—

বি—

ভারতীয় আচার্য্যগণ ও সমন্বয়।

(শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতঃপর বিরাট হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ই অল্পাধিক পরিমাণে বিকৃতাকার ধারণ করায় যখন ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভণ্ডামী প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্রভাব ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক কলহপ্রমত্ত হীনশক্তি ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ উহার অপ্রতিহত প্রভাবের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রবল ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ মহাবিপ্লব সাগরে মগ্ন হইল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মভাবের মহাসমন্বয় সাধনোদ্দেশ্যেই যে মঙ্গলময় বিধাতা পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগামী দূত ইংরাজরাজের মস্তকে ভারতের রাজমুকুট পরাইয়া দিয়াছেন, তাহা তৎকালীন সুধীমণ্ডলী বুঝিতে পারিলেও আপামর জনসাধারণ—বিশেষতঃ রক্ষণশীল সমাজনিয়ন্তা প্রাচীন সম্প্রদায় কেবল তাঁহাদের ধর্ম্মসমাজ নিরপেক্ষ শাসকরূপে ইংরাজরাজকে ভারতের রাজসিংহাসনে সমাসীন দেখিতে অভিলাষ করিল; ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। যাহা হউক, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইলে দুইটী প্রধান দল সংগঠিত হয়। একদল ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, আচার, নিয়ম ও বেশভূষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপরই খড়্গহস্ত হইয়া উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করতঃ সকল বিষয়েরই অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিয়া সমগ্র দেশকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইঁহারা নব্য সম্প্রদায় বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। ইঁহাদের বিপরীত মতাবলম্বী অপর একদল এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতির উপর পাশ্চাত্যের সর্ব্বপ্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধবাদী হইয়া যাহা কিছু ভারতীয় তাহা ভালই হউক আর মন্দই

হউক তাহাকেই সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। ইহারা প্রাচীন বা গোঁড়া সম্প্রদায় বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। ইংরাজরাজের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানসঞ্জাত শাসন-শৃঙ্খলা দৃষ্টে ভারত অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে তাহার জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। ওদিকে খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ ভারতের তৎকালীন বিকৃত ধর্ম্ম ও সমাজ সমূহের রাশি রাশি দোষোদ্ঘাটন করিয়া সত্যমিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিয়া ভগবান যীশুখৃষ্টের পতিতপাবন ধর্ম্মমতে অসংখ্য লোককে দীক্ষিত করিতে লাগিল। ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। এবম্বিধ শোচনীয় অধঃপতনের সময়,—উন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারের যুগে হিন্দুর বিরাট অঙ্ক ভুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ ধর্ম্ম, সমাজ ও উপধর্ম্মী এবং উপসমাজ এই প্রকার ভয়াবহ বিপদ-শঙ্কুল বিরোধী মতারণ্যের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে ইতঃস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সমূহের তৎকালে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তুলনায় এক বৌদ্ধ বিপ্লব ভিন্ন সকলগুলিই সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ সদৃশ।

প্রাগুক্ত প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের সংস্কার আন্দোলন এবং খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবের পূর্ণ জোয়ারের সময়,—হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের এই শোচনীয় অধঃপতনের যুগে বঙ্গদেশে মহান ধর্ম্মাচার্য্য মহাত্মা রামমোহন রায় উপনিষদোক্ত নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ ব্রাহ্ম-সমাজ এবং ইহার কতিপয় বৎসর পর গুজরাট প্রদেশের যুগাচার্য্য দয়ানন্দ সরস্বতী প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম নূতন আকারে প্রচার করিয়া আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করতঃ প্রাচীন সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী ও নব্য সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিষয়ে পাশ্চাত্যানুকরণ এবং খৃষ্টধর্ম্মের ঐকান্তিক প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব করিয়া ফেলিলেন। এতদুভয় ধর্ম্মসমাজ একেশ্বরবাদ মূলক হইলেও ভারতের চিরন্তন একেশ্বরবাদের বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া আত্ম প্রকাশ করে নাই, বিশেষতঃ ইহাতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, সগুণব্রহ্ম,

একেশ্বরের নানা প্রকার প্রকাশমূর্ত্তি ও ভাব প্রভৃতি স্থান লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া ইহারা অসম্পূর্ণ। অধিকন্তু এই দুইটী ধর্ম্ম সমাজ ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের ঘোর দুর্দ্দিনে আবির্ভূত হইয়া এক সুমহান উদ্দেশ্য সাধন করিল বটে কিন্তু ইহারা ভারতের জাতীয় জীবনের বিশেষত্বকে বজায় রাখিয়া তাহার সঙ্গে পাশ্চত্যের জড়বাদমূলক আবশ্যকীয় উন্নত প্রভাবের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ হইল না। প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজে নব্য সম্প্রদায়ের উপর একটু বেশী ঝোঁক দেওয়ায় তাহাও দূরীভূত হইল না। আবহমান কাল হইতে ধর্ম্মই প্রাচ্যদেশের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড বলিয়া পরিগণিত; পৃথিবীর সকল বিষয়কে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া গ্রহণ করাই প্রাচ্য জাতির চিরন্তন রীতি। এই জন্য প্রাচ্যদেশে ধর্ম্মরাজ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে পারিলে অন্যান্য সকল বিষয়ে ঐক্য বিধান সহজসাধ্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রাচ্যদেশে ধর্ম্ম সমন্বয়ের ভাব ভিন্ন অন্য কোন বিষয় দ্বারা প্রকৃত জাতীয় ঐক্য বিধান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার! ওদিকে উন্নতিকামী বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের বিশেষত্ব সংরক্ষণ একদিক দিয়া যেরূপ আবশ্যকীয় মনে করিল পাশ্চাত্যের উন্নত জড়ধর্ম্মকেও অপর দিক দিয়া তদ্রূপ ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার এক অপরিহার্য্য উপাদান বলিয়া ধরিয়া লইল। পাশ্চাত্য জড়শক্তির অপূর্ব্ব প্রেরণায় ভারতের সকল ধর্ম্ম ও সমাজ আপাত দৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য পূর্ণ হইয়াও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ভারতে নেশন্ প্রতিষ্ঠা করিবার আশায় ঐক্য ও সামঞ্জস্যের পথ—বহু হইয়াও একত্বের পুণ্য মিলন ভূমি অন্বেষণ করিতে লাগিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নত শিক্ষা ভারতীয় নেশন সংগঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করাইলে উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি স্ব স্ব শাখা প্রশাখাসমেত এক অশ্রুতপূর্ব্ব মহা সমন্বয় সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইবার জন্য মন্দাকিনীর ন্যায় ভগীরথের আশায় উগ্রীব হইয়া রহিল;—অবশেষে ভগীরথ আগমন করিলেন,—বেদের যাগ

যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্তোপনিষদের ব্রহ্মবাদ, গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ, দর্শনের ব্রহ্মজ্ঞান, বুদ্ধের অহিংসা ও নির্ব্বাণ মোক্ষ, তন্ত্রের মাতৃভাব, পুরাণের দেবদেবী পূজা, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম, রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান, খৃষ্টের স্বর্গস্থিত পিতা (Father in heaven) এবং মহম্মদের 'লা এলাহা ইল্‌ল্লাহ' আপনাপন স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের মূর্ত্তিরূপে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসে আত্ম-প্রকাশ করিল। তিনি অশ্রুতপূর্ব্ব সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজ জীবনে ঐ সকল ধর্ম্মের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া উহাদের প্রত্যেকটীকেই জীবন্ত দার্শনিক সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেন, একাধারে সর্ব্বধর্ম্মের উপদেষ্টা ও অনুষ্ঠাতা হইয়া সকল ধর্ম্মের মহাসমন্বয় সাধন করিলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ধর্ম্ম শিক্ষার তদীয় সুযোগ্য শিষ্য বর্ত্তমান যুগাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ এই সমন্বয় ধর্ম্মকে ধর্ম্মমতের বিরোধ-বিদ্বেষে হীনবল ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে—পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যথার্থ সাম্য-মৈত্রীর পবিত্র ভাব আনয়নের পক্ষে,—ধর্ম্মজগতের সার্ব্বভৌমিক সনাতন আদর্শের পক্ষে একমাত্র উপযোগী বলিয়া উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামিজী কেবল পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সমন্বয় প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তিনি প্রাচ্যের বৈরাগ্য ধর্ম্মকে পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানের সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া এতদুভয়েরও সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

ধর্ম্ম মত সমূহের সমন্বয় হিন্দুশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে উল্লেখ থাকিলেও ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যথার্থ সমন্বয় ধর্ম্মের কোন জীবন্ত আদর্শ ইতিহাসে দেখা যায় না। বড় জোর কোন কোন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যকে অপরাপর সম্প্রদায় সমূহের উপর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে, অথবা সকল ধর্ম্মমত ও পথকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে. অথবা নিজ ইষ্ট দেবদেবীর মধ্যে সর্ব্ব দেবদেবীর দর্শন লাভ করিতে দেখা যায়। কিন্তু সকল ধর্ম্মমত ও পথকে জীবন্ত দার্শনিক সত্যজ্ঞানে উহাদের প্রত্যেকটী পৃথকভাবে

অনুষ্ঠান করতঃ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া এক বিশ্বজনীন মহাসমন্বয় ধর্ম্মের প্রচার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন বলিয়া পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাস প্রমাণ দেয় না। অবতারগণের মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধ বিদ্বেষ লোক বিশ্রুত, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মদ্বেষী হিন্দু নরপতিগণের সহায়তার অসংখ্য শ্রমণকে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন। (?) শ্রীচৈতন্য মহম্মদীয় এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি একেবারেই সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। মোটের উপর বৈদিক ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল অবতার এবং ধর্ম্মাচার্য্যই এক একটী মত বিশেষের অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় মতের আবিষ্কারক অনুষ্ঠাতা ও প্রচারক হিসাবে পূর্ণ হইলেও ইঁহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক আচার্য্য বলিয়া পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন অভিনব ধর্ম্মমত বা পথ আবিষ্কার করেন নাই, অথবা তিনি সকল ধর্ম্মমত বা পথের খিচুড়ী পাকাইয়া কোন একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বা পথও বাহির করেন নাই। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমানকালে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম মত ও পথ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টান-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রত্যেকটীকে পৃথক্‌ভাবে নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া সকল গুলিকেই অভ্রান্ত ও সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ, রামপ্রসাদ ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি স্বনাম ধন্য সাধকগণ নিজ ইষ্টদেবীকে সর্ব্ব দেবদেবীরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এই উন্নত ভাব উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম সাধনার পরিচায়ক ও সমন্বয় ধর্ম্ম মূলক হইলেও ইহাকে যথার্থ সমন্বয় ধর্ম্ম বলা যায় না। কারণ কালাকে কৃষ্ণ শিব রাম রূপে এবং কালীকে একবার কৃষ্ণ শিব রাম রূপে ও কালী রূপে দর্শন করা এক কথা নহে। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মভাব আপন ভাবে অধীন করিয়া লওয়াও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বটে কিন্তু ইহা প্রকৃত সমন্বয় ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। সকল ধর্ম্মমত ও পথের স্ব স্ব সম্প্রদায় গত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া প্রত্যেকটী পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করতঃ উহাতে সিদ্ধিলাভ করাই যথার্থ সমন্বয় ধর্ম্ম। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাই করিয়াছেন, তিনি তান্ত্রিক ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া মহাশক্তি-

রূপা কালীকে যেমন কালী ভাবে ও কালীকে সর্ব্ব দেবদেবীরূপে দর্শনলাভ করিয়াছেন, বৈষ্ণবমতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণ এবং সর্ব্বদেবদেবীরূপে দর্শনলাভ করিয়াছেন। তিনি যেমন বহুকে বহুরূপে স্ব স্ব পৃথকভাবে দেখিয়াছেন, বহুকে তেমন একরূপে—বহুর মূর্ত্তি তেমন এক ভগবানের বিশ্বরূপে দর্শনলাভ করিয়াছেন। অন্যান্য অবতারগণের বিশেষত্ব তাঁহাদের আবিষ্কৃত, অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত স্ব স্ব যুগধর্ম্মে সাম্প্রদায়িক পূর্ণতায়,—আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব অবতার ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের মহান্ সত্য তাঁহাদের স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া প্রত্যেকটীকে পৃথকভাবে নিজ জীবনে পরিণত করিয়া সকলগুলির সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক বর্ত্তমান যুগধর্ম্মোপযোগী এক মহাসমন্বয়ধর্ম্ম প্রচারে। সমন্বয়াচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাসমন্বয় ধর্ম্মের সহিত নর-নারায়ণ সেবাধর্ম্ম সমগ্র জগতের আদর্শরূপে স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা ভারতের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম, অবতার ও ধর্ম্মাচার্য্য সকলের প্রচারিত ধর্ম্ম যেন ধর্ম্ম-মহাসমুদ্রের এক একটী তরঙ্গ; যেমন সমুদ্রের এক তরঙ্গ উত্থিত ও পতিত হইয়া খাদ করিয়া দিয়া অপর তরঙ্গটীর উত্থানলাভ করিবার কারণ সৃষ্টি করে, তেমন অবতার ধর্ম্মাচার্য্যসকলের প্রচারিত ধর্ম্মমতসমূহের অভ্যুত্থান ও পতন ঘটিতেছে। এ স্থলে আরও দেখা যাইতেছে যে একটীর পতন অপরটীর উত্থানের কারণ, সুতরাং আমাদিগকে কেবল উত্থানের দিক দেখিলে চলিবে না; পতনের দিক আমাদের অনুকরণীয় না হইলেও উহাকেই উত্থানের কারণ জানিয়া উহার প্রতিও আমাদিগকে সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে হইবে। বৈদিক ধর্ম্ম বিকৃতাকার প্রাপ্ত না হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ শুষ্ক জ্ঞানবিচারে পর্য্যবসিত না হইলে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও তান্ত্রিক ও বেদান্তধর্ম্ম বিকৃত না হইলে চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম, মুসলমানধর্ম্ম ভারতে প্রবেশ না করিলে রামানন্দ, মাধ্ব ও চৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম্মমত এবং য়াহুদী ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম ও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি না হইলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যক হইত না। সুতরাং একটীর পতন যদি অপরটীর

উত্থানের একমাত্র কারণ হয় তাহা হইলে পাতিত্যের প্রতি আমরা কেন সহানুভূতি সম্পন্ন হইব না ? আর আমাদের মধ্যে যদি কোন অবতার মহাপুরুষের উপর কাহারও যথার্থ শ্রদ্ধা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাবের একমাত্র কারণটীর প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা থাকা কি উচিত নহে ? মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন একটী অপরটীর পরিণতি এবং তরঙ্গহিসাবে সকলেই এক ও অভেদ অবতারগণ ও তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমত-পথও ঠিক তদ্রূপ। গীতাকার বলিয়াছেন,—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" অর্থাৎ সূত্রে মণি থাকার ন্যায় আমি অবতারগণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত। (?) শ্রীমদ্ভাগবতেও "অবতারহ্যসংখ্যেয়া" প্রভৃতি শ্লোকে এবং বেদান্তোপনিষদ সমূহে অবতারগণের একত্ব ও অভেদত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। (?)

ধর্ম্মমতরূপ অসংখ্য নদী সমূহ যে একই সমুদ্রগামী,—ধর্ম্মমতরূপা নানা প্রকার গাভী সমূহ যে একই প্রকার দুগ্ধ প্রদান করে তাহা স্বতঃ প্রমাণিত হইলেও অবিশ্বাসীদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে বর্ত্তমান জগতের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ব্যক্তিগত জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্যতালোকে সর্ব্বজন সমক্ষে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ধর্ম্মের অমৃত ফলোদ্যানে ধর্ম্মমতরূপ অমৃত ফলের অসংখ্য বৃক্ষ আছে, মানুষ দর্শক-সমালোচকের ন্যায় এই অপরূপ উদ্যান দূর হইতে অবলোকন করিয়া বাহ্যাকৃতির ভিন্নতা দৃষ্টেই এক বৃক্ষের ফলকে অপর বৃক্ষের ফলাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলিয়া সমালোচনা করিতেছে ; সে জানেনা যে এই সকল বৃক্ষের ফলগুলি ভিন্নাকৃতি বিশিষ্ট হইলেও সকলগুলিই অমৃত ফল। উদ্যানের যে মালিক, তাঁহার অনুমতি না পাইলে ইহাতে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, সুতরাং ফলের আস্বাদ গ্রহণ করা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। যাঁহারা ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন রুচি অনুসারে এক এক প্রকার ফলের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই উহার স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্য গুণে এমন আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন যে অপর বৃক্ষের ফলের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় নাই। উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষের ফলই এইরূপ

ভাবে এক এক দল লোক কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া সকলগুলিই অমৃত-ফল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কেহ বাগানে প্রবেশলাভ করিয়া সকল প্রকার ফল ভক্ষণ করিবার সুযোগ পান নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বাগানের সকল প্রকার ফলকে যখন একই গুণবিশিষ্ট অমৃত ফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর বাগানের বাহিরে আসিয়া ফলগুলির বাহ্যাকৃতির ভিন্নতামাত্র লইয়া তোমার আমার বিরোধ করা শোভা পায় না। জগতের সকল ধর্ম্ম একই আদর্শ নানা প্রকারে প্রচার করিতেছে.—জগতের সকল ধর্ম্ম একই লক্ষ্যে নির্দ্দেশিত রহিয়াছে,—জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় একই অমৃতত্ব লাভের আশায় ছুটিয়া চলিয়াছে।

হে ভারত! যদি তুমি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুর পূজ্য পদবী লাভ করিতে বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাসমন্বয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। পুণ্যপ্রতিম আচার্য্য দেবের সমন্বয় ধর্ম্মের পুণ্যপ্রভাবে তোমার জাতীয় জীবন স্বার্থক হইবে, এবং তোমার শিক্ষা—তোমার সাধনা, জগতের ভেদবৈষম্যকে চিরতরে বিনষ্ট করিয়া সাম্য-মৈত্রী স্বাতন্ত্র্যতা আনয়ন করিয়া জগতে প্রকৃত শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে।

(সমাপ্ত)

বিবেকানন্দ-স্মৃতি।*

(১)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

কলিকাতা নিবাসী ভাই সকল!

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী এই দুর্দ্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চেষ্টা ও নিরন্তর প্রার্থনা।

২। যে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন, সকলে ব্যস্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগে যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব। কারণ, তোমরা সকলে ভগবানের মূর্ত্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনায় কোনও প্রভেদ নাই। যে অহঙ্কারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানতায় অন্যথা মনে করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও মহাপাপ করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

৩। তোমাদের নিকট আমাদের সবিনয় প্রাথনা, অকারণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থিরচিত্তে উপায় চিন্তা কর, অথবা যাহারা তাহা করিতেছে তাহাদের সহায়তা কর।

৪। ভয় কিসের? কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে বলিয়া সাধারণের মনে যে ভয় হইয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই। আর আর স্থলে প্লেগ যেরূপ রুদ্রমূর্ত্তি হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় কলিকাতায় সেরূপ কিছুই হয় নাই। রাজপুরুষেরাও আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকূল। তবে আর ভয় কি?

---

* যে বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্লেগ মহামারী প্রথম উপস্থিত হয়, এই বিজ্ঞাপনখানি স্বামিজী সাধারণে বিতরণ করেন।

৫। এস সকলে বৃথা ভয় ছাড়িয়া ভগবানের অসীম দয়াতে বিশ্বাস করিয়া কোমর বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নাবি। শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করি। রোগ মারীভয় প্রভৃতি তাঁহার কৃপায় কোথায় দূর হইয়া যাইবে।

৬। (ক) বাড়ী, ঘর দুয়ার, গায়ের কাপড়, বিছানা, নর্দ্দমা প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

(খ) পচা বাসি খাবার না খাইয়া টাট্‌কা পুষ্টিকর খাবার খাইবে। দুর্ব্বল শরীরে রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

(গ) মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে। কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে বারম্বার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে।

(ঘ) অন্যায় পূর্ব্বক যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে, যাহারা অপরের অমঙ্গল ঘটায়, ভয় কোনও কালে তাহাদের ত্যাগ করে না। অতএব এই মহা মৃত্যুভয়ের দিনে, এই সকল বৃত্তি ত্যাগ করিবে।

(ঙ) মহামারীর দিনে গৃহস্থ হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিরত থাকিবে।

(চ) বাজারের গুজবাদি বিশ্বাস করিবে না।

(ছ) ইংরাজ সরকার কাহাকেও জোর করিয়া টীকা দিবেন না। যাহার ইচ্ছা হইবে, সেই টীকা লইবে।

(জ) জাতি ধর্ম্ম ও স্ত্রীলোকের পরদা রক্ষা করিয়া, যাহাতে আমাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে, নিজের হাঁসপাতালে, রোগীদের চিকিৎসা হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ধনীলোক পালাক্, আমরা গরীব, গরীবের মর্ম্মবেদনা বুঝি। জগদম্বা স্বয়ং নিঃসহায়ের সহায়; মা অভয় দিতেছেন—ভয় নাই! ভয় নাই!!

৭। হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদাসদিগের নিকট খপর পাঠাইবে! শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য হয় তাহার ত্রুটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থ সাহায্যও সম্ভব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পল্লীতে পল্লীতে মারীভয় নিবারণের জন্য নাম সংকীর্ত্তন করিবে।

(২)

ডাক্তার শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিত।—১৮৮০ ইং, সম্ভবতঃ শীতকালেতে বেলা ৯ হইতে ১০ ঘটিকার সময় আমি কার্য্য গতিকে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে খ্যাতনামা ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী যাইতে তৈয়ার হইয়াছি। ঈশানবাবুর পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। গিয়া দেখিলাম, সতীশ পাখোয়াজ বাজাইতেছে। ২।৩টী ৯।১০ বৎসরের বালক হাতে চৌতালের মান রাখিতেছে এবং একটী তেজঃপুঞ্জ যুবক ধ্রুপদ গাহিতেছে। আমি সঙ্গীত ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু কোন আলাপ না থাকায় আমি কোন প্রশ্ন করিতে পারিলাম না। প্রস্থান করিলে পর আমি আমার বন্ধু সতীশকে পরদিবস জিজ্ঞাসা করিলাম, যুবকটি কে? এবং তাহার বিষয়ে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। পরে জ্ঞাত হইলাম যুবকের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাড়ী সিমুলিয়া কলিকাতা এবং পরমহংসদেবের অতি প্রিয়পাত্র। এই হইল আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়।

ইং ১৮৮৮ সালে যোগানন্দ স্বামী (যোগেন) প্রয়াগে সন্ন্যাসী অবস্থাতে পরিভ্রমণ করিতে আসেন এবং সৌভাগ্যক্রমে মদীয় ভবনে আতিথ্য স্বীকার করেন। কিছু দিবস পরে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম যোগেন পরমহংস দেবের সন্ন্যাসি-শিষ্য এবং তাহার সঙ্গে নানাপ্রকার শাস্ত্রালাপ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও পরমহংস দেবের নানা কথা-বার্ত্তায় অতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমি অতিশয় চিন্তিত হইলাম এবং যোগেনের অনুজ্ঞা-ক্রমে বরাহনগরে পরামাণিকের ঘাটে নব স্থাপিত মঠে সংবাদ পাঠাইলাম। তার পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, অভেদানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ এবং যোগেন মা, গোলাপ মা ত্বরিত কলিকাতা হইতে মদীয় ভবনে (গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ চক্) আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অভেদানন্দ একদিন কথা-প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন, ডাক্তার, ঠাকুর বলেন নরেনকে ভোজন করাইলে হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করানর ফল হয়।

নরেন—কিরে শালা দোকানদারি বাড়াচ্চিস্, পসার জমাচ্চিস্, তা' শালা করবি বই কি? কিছু রেস্ত চাই ত?

একদিন আমরা সকলে বসিয়া নানাবিষয় সদালাপ করিতেছি, এমন সময় স্বামিজী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলিলেন Burmese not allowed here আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এর মানে কি? তিনি বল্লেন Burmese *—* * এখানে আস্‌তে দিও না।

একদিন অপরাহ্নে সকলে অর্থাৎ সকল স্বামিমহোদয়গণ ও আমি একত্রিত হইয়া ভজন ও সঙ্গীত করিতেছিলাম। ভাব জমিয়া গেল! সঙ্গীত ও ভজনাদি কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। আমার মনে বিশেষ ভক্তি ও আনন্দ উদ্দীপিত হইল এবং মধুর সঙ্গীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুই নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। স্বামিজী প্রভৃতি গানে বিশেষ আবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত দেখিয়া তিনি আত্মভাব সম্বরণ করিয়া আমাকে উপহাস ও ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, "তোর বড় পান্‌সে চোক"।

এই সময় একদিন বৈকালে আমরা অনেকে বসে নানারকম চর্চ্চা করিতেছিলাম (গিরিশচন্দ্র বসু তিনি পরে জজ হইয়াছিলেন, তখন তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন) গিরিশ আসিয়া Theosophy বিষয় নানাপ্রকার ব্যাখ্যা ও চর্চ্চা করিতেছিল। স্বামিজী গিরিশের কথোপকথনে বিশেষ শ্রদ্ধা বা মনোযোগ করিলেন না, পরন্তু জ্ঞানমার্গের নানাপ্রসঙ্গ ও উচ্চ অবস্থার কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। গিরিশ হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল "স্বামিজী কর্‌লে কি? আমার দশ বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড কর্‌লে"। স্বামিজি বলিলেন "তোমার পণ্ড হলো বা না হলো তাতে আমার কি"?

একদিন গিরিশ বলে "স্বামিজী চলুন সিন্দুক সা নামক জনৈক সাধুকে দেখিতে যাই"। আমরা সকলে সন্ধ্যার সময় গিয়া সেখানে উপস্থিত

হইলাম। সিন্দুক সা ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাধের উপর থাকিতেন। তাঁহার যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সিন্দুকে ভরিয়া রাখিতেন এবং তদুপরি আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন। স্বামিজী বলিলেন "এই সাধুটী রামাৎ বৈষ্ণব বৈরাগী। এর দোকানদারের মালপত্র এই সিন্দুকের ভিতর থাকে"।

অপর একদিন এক বাঙ্গালী সাধু বৈরাগীর নাম মাধব দাস বাবা যিনি চিটগঞ্জে এক বাড়ীর মধ্যে এক গণ্ডির মধ্যে ৪০ বৎসর ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন—বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। বৈরাগী মহাশয় অতি হর্ষিত হইয়া আমায় বলিলেন, "গোবিন্দ তুমি কি সৎসঙ্গই না কচ্চ"।

একদিন স্বামিজী ও তদীয় গুরুভ্রাতাগণ ও আমি ঝাঁসি দর্শন করিতে দয়ারামের আশ্রমে উপস্থিত হই। সারা দিন অপার আনন্দে অতি বাহিত হইয়াছিল, তাহা আর বর্ণনা করিবার নয়। কি জমাট ভাব, কি কথা-প্রসঙ্গ কি হৃদয় স্পর্শী ভালবাসা এবং মাঝে মাঝে হাস্যোদ্দীপক কৌতুক রহস্য তাহা অদ্যাপি আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে এবং অল্প দিনের কথা বলিয়া যেন মনে হয়। দৃশ্যটী যেন আমার চক্ষের সামনে রহিয়াছে। সায়ংকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। স্বামিজীর পরিধানে একটী মাত্র কোপীন ও গৈরিক বহির্বাস অতি মোটা ভেড়ার কম্বল গাত্রাচ্ছাদিত ও নগ্নপদ! নগ্নপদে গতাগতি অনভ্যস্ত থাকায় এবং বন্ধুর ও বালুকাপূর্ণ স্থানে চলিতে হওয়ায় স্বামিজীর চরণ চর্ম্ম যেন ফাটিয়া গিয়া শোনিত বাহির হইবার মতন হইল দেখিয়া আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল ও আত্মগ্লানী উপস্থিত হইল। কারণ আমার পায় ভাল জুতা এবং তাঁহারা সকলে নগ্নপদ আমি ত্রস্ত হইয়া জুতা খুলিয়া হস্তে লইয়া চলিলাম। স্বামিজী তাহা দেখিয়া আমাকে স্নেহপূর্ণ ভাবে বলিলেন "জুতা খুল্লে কেন"? আমি কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও বিমনা

হইয়া বলিলাম, "স্বামিজী আপনারা সকলে নগ্নপদে এরূপ কষ্ট করিয়া চলিতেছেন এবং আমি জুতা ধারণ করিয়া চলিব ইহা সঙ্গত হয় না। আপনাদিগকে শ্রান্ত ও নগ্নপদে চলিতে দেখিয়া আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিতেছে, আমি জুতা পায়ে দিতে পারিলাম না"।

একদিন স্বামিজী ও তাঁহার গুরু ভ্রাতারা আমার গৃহে রাত্রে আহার করিতেছিলেন। তখন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঠণ্ঠী মলের কুটি, পাড়ারাণী মণ্ডিতে ছিলেন; এমন সময় জনৈক সাধু - অমূল্য (পরে যাহাকে গুরুজী অমূল্য বলিয়া এলাহাবাদের লোকেরা জানিত) সকলে একসঙ্গে আহার করিতে বসিয়া স্বামিজীকে দেখাইয়া একটী শুক্‌না লঙ্কা খাইল; স্বামিজী দুইটা খাইলেন, অমূল্য তিনটা খাইল, স্বামিজী চারটা খাইলেন; এরূপ উত্তোরত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে অমূল্য পরাস্ত হইল। সকলে হাসিতে লাগিল। এই সামান্য ব্যাপারেতেও স্বামিজীর এরূপ মাধুর্য্য ও হৃদয়স্পর্শিভাব লক্ষিত হইয়াছিল। সামান্য লঙ্কা খাওয়াটাও যে বিশেষ কার্য্য ও গুরুতর ব্যাপার তাহা অদ্যাপিও স্মৃতিপথে রহিয়াছে। অতি সামান্য কার্য্যেতে তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য এরূপ প্রকাশ হইত যেন বেদান্তের উচ্চ তত্ত্ব ব্যখ্যা করিতে-ছিলেন। আহারান্তে স্বামিজী আমায় একান্তে বলিলেন "অমূল্য যদি মঠে যায় তাহা হইলে তুমি তাহাকে বরাহনগরের মঠে পাঠাইয়া দিও"। একদিন স্বামিজী আমায় বলিলেন "আমরা আজ রওনা হইব"। আমি অতি কাতর হইয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম যেন তিনি অন্ততঃ আর একটা দিন থাকিয়া যান। কারণ তাঁহাদের সঙ্গ বিচ্যুত হইতে আমার প্রাণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। স্বামিজী গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন, "ইহাতে সত্যের অপলাপ হইবে আমি আজকেই যাইব", এবং তাঁহারা সকলে সেইদিনেই মদীয় ভবন হইতে প্রস্থান করিলেন।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমি উত্থাপন করিলাম মৎস্য ও মাংস আহার করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত বা অনুচিত; কারণ আমি নিরামিষ্য-ভোজী; মৎস্য মাংস কখনও ব্যবহার করি নাই এবং অপরের পক্ষে

ইহা অপ্রয়োজনীয় ও ধর্ম্মপথের অন্তরায় আমার এরূপ ধারণা ছিল। স্বামিজী সহাস্যবদনে স্নেহপূর্ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ গোবিন্দ, সিংহ ব্যাঘ্র মাংসাশী এবং চটক পক্ষী (চড়াই) ইহারা তণ্ডুলকণা ও কাঁকর খাইয়া জীবন ধারণ করে কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদির বৎসরান্তে সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তি (Self-Procreation) একবার হইয়া থাকে এবং চটক প্রভৃতি নিরামিষ্যভোজীরা সততই সন্তান উৎপাদনে (Self-Procreation) ব্যগ্র। মাংসাহার ধর্ম্মপথের কোন অন্তরায় নহে।

এইখান থেকে তাঁহারা সকলে গাজিপুর রওনা হইলেন। কিছুদিন পরে গাজিপুর হইতে পত্র পাইলাম। সে পত্রখানি মদীয় ভবনে প্লেগের আশঙ্কা হওয়ায় আমি গৃহ পরিত্যাগ করায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার মর্ম্ম আমার যাহা স্মরণ আছে তাহা বলিতেছি। তিনি লিখিয়াছিলেন, "গোবিন্দ, আমি গাজিপুরে পোঁছিয়াছি পাহাড়িবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়াস করিতেছি, দর্শন হইলে বোধ হয় তাঁহার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন পাইব ইত্যাদি মর্ম্মে পত্রখানি আমায় লিখিয়াছিলেন। তারপর হইতে তাঁহার দর্শন বা কোন পত্রাদি পাই নাই। তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় ১৫ দিন মাত্র হইয়াছিল এবং এই অল্পদিনের মধ্যে আমার ভিতরে এরূপ গভীর মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন যে এত বৎসর অতীত হইলেও আমার হৃদয় মধ্যে প্রত্যেক জিনিষ নবজাত বলিয়া জাগরুক রহিয়াছে। নানা বিষয়ের স্মৃতি যদিও বিভ্রম হয় কিন্তু তাঁহার প্রসঙ্গ এত জ্বলন্ত ও জীবন্ত—অদ্যাপি তাহা পূর্ব্বাহ্নের কথা বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যেন মধুর সঙ্গ, স্নেহপূর্ণ মুখ জ্যোতির্ম্ময় কলেবর ও বিশাল হৃদয়ের কথা যখনি মনে মনে চিন্তা করি তখনি অতীব পুলকিত হইয়া উঠি।

ইং ১৯২১ সালেতে শীতকালে একদিন প্রায় সমস্তরাত্রি স্বপ্নাবস্থায় আমি স্বামিজীর সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, যদিও কোন কোন বিষয়ে বিশেষরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমার স্মরণ

নাই কিন্তু পূর্ব্ব পরিচিত এবং অতীব প্রিয় ব্যক্তির সহসা সমাগম, হইলে মন যেরূপ প্রফুল্ল ও হর্ষিত হয় আমার তদ্রূপ হইয়াছিল। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম বোধ হয় স্বামিজীর জন্মোৎসব অতি ত্বরায় হইবে, মনে মনে করিলাম স্বামিজী আমাকে পূর্ব্বাহ্ণে এ বিষয় প্রেরণা ও প্রবোধিত করিলেন। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা নিশ্চয় করিব।

প্রাতে প্রাগ্‌দ্বারেতে দেখিলাম ব্রহ্মবাদিন ক্লাবের হরেন্দ্রনাথ দত্ত উপস্থিত। তাহাকে দেখিতে পাইয়া আমি সহাস্যে বলিলাম "আমি সব জানি তোমার বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। স্বামিজী কাল রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় আমায় সব বলিয়া গিয়াছেন উৎসবের দরুণ যাহা করিতে হইবে তাহা আমি সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।" হরেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ চমকিত হইল এবং বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আমি প্রয়াগে ৪০ বৎসর অবস্থান করায় নানাপ্রকার সাধুর সহিত মিশিয়াছি এবং কুম্ভ মেলা প্রভৃতি এখানে হওয়ায় অনেক প্রকার সাধু মহাত্মার দর্শন করিয়াছি এবং চিকিৎসা ব্যবসা থাকায় বহুপ্রকার লোকের সম্মিলনে আসিয়াছি কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতন অত অল্প বয়সে ত্যাগ ও বৈরাগ্য অপর কাহারও ভিতর দেখি নাই। তাঁহার ওজস্বী বাণী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দূরদর্শিতা, গম্ভীর বাণী ও সাহসপূর্ণ উক্তি, মধুময় সান্ত্বনা বাক্য এবং কৌতুক ব্যঙ্গ ও হাস্যোদ্দীপক কথাবার্ত্তার এরূপ এক সঙ্গে সমাবেশ কুত্রাপি দর্শন করি নাই!

কাশ্মীরে অমরনাথ।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এতক্ষণ বেশ আসিতেছিলাম; কিন্তু নামিয়াই ভাবনা হইল কোথায় গিয়া উঠিব, কারণ এখানে থাকিবার স্থানের বড়ই অভাব যে দু'একটী ধর্ম্মশালা ছিল, তাহা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। অবশেষে আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া এক ধর্ম্মশালার তেতলার উপর ছোট দালানে মালপত্র রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম কোথায় আশ্রয় পাওয়া যায়। এমন সময় এক পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন যে স্বামী অভেদানন্দজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। ইনি পরমানন্দ পাণ্ডার (যিনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণের পাণ্ডা) ভ্রাতা; আমিও ইঁহাদের উপর রামকৃষ্ণ মিসনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী শিবানন্দজীর নিকট হইতে পত্র আনিয়াছিলাম। যাহা হউক, একটা কিনারা হইবে ভাবিয়া আনন্দচিত্তে পাণ্ডার অনুগমন করিলাম। সহরের ইংলিশ কোয়ার্টারে Kashmir Supply Syndicate এর প্রতিষ্ঠাতা রসিকরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে স্বামিজীরা উঠিয়াছেন; আমি তথায় আসিয়া দেখিলাম, স্বামিজী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন এবং নিকটে রসিক বাবু এবং আমাদের কাশ্মীর-প্রবাসী বন্ধু সুলেখক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছেন। আমরা কোন আশ্রয় পাই নাই শুনিয়া তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া রসিক বাবুর বাড়ীর Compou d এর মধ্যে একটি O... - ... এর দ্বিতলস্থ ঘর আমাদের জন্য ঠিক করিয়া দিলেন। আমরা অবিলম্বে আমাদের মালপত্রাদি লইয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিলাম। উক্ত C upou এর মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালী গৃহস্থগণের বালকবালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল; স্বামিজীর অবস্থানের জন্য সেইটি নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং তিনি যতদিন থাকিবেন, তত দিনের জন্য ছাত্রছাত্রীগণকে ছুটি দেওয়া হইল। অতএব স্বামিজীর

এত নিকটে থাকিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। বাস্তবিক বলিতে কি, খাওয়া দাওয়া এবং বেড়ান ছাড়া প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতাম এবং অনেক সময়ে তাঁহার সেবা করিতে পাইয়া ধন্য হইতাম। সন্ধ্যার সময় অনেক লোক (বিশেষতঃ কলেজের ছাত্রগণ) তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন; ঐ সব শুনিতাম। আবার নির্জ্জন হইলে নিজেদের সাধনের কথা ও ঠাকুরের কথা শুনাইতেন।

৺কেদারনাথ ৺বদারনারায়ণাদি দর্শন করিতে হইলে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন হইতে ৺শ্যামা পূজার দিন পর্য্যন্ত যাত্রিগণ যে যখন ইচ্ছা যাইতে পারেন; কারণ ততদিন পর্য্যন্ত পথ খোলা থাকে; বিশেতঃ ঐ পথে ২।৩ মাইল অন্তর চটি আছে। কিন্তু ৺অমরনাথ দর্শনের অত সুবিধা নাই। একটি মাত্র দিন শ্রাবণী-পূর্ণিমা—দেবদর্শনের জন্য ধার্য্য আছে, অধিকন্তু, পথে কোন প্রকার চটি নাই; সকলকে তাঁবু ও আহার্য্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এই হেতু সকল যাত্রী একত্র হইয়া যাত্রা করে। শ্রীনগরে দশনামী সন্ন্যাসিগণের এক বিখ্যাত মঠ আছে। শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীর দিন দুইগাছি ছড়ি পূজিত হইয়া বাদ্য সহকারে অমরনাথ যাত্রা করে এবং শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন অমরধামে উপস্থিত হয়। মঠের মোহান্ত সশিষ্য এই ছড়ি লইয়া গমন করেন। পঞ্চমী ও ষষ্ঠী দুইদিনে উহা ৪০ মাইল দূরে মটন (অপর নাম ভবন) নামক গ্রামে উপস্থিত হয়, এবং সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়। উক্ত গ্রামে পাণ্ডাগণের বাস; এইখানে তাঁবু, কুলি, ঘোড়া, ঝামপান, ডাণ্ডি প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং এই অবধি মোটরে বা টঙ্গায় আসা যায়। এই হেতু যাত্রিগণ ছড়ির সঙ্গে না আসিয়া আপন সুবিধামতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা ২৩শে জুলাই শ্রীনগরে পৌছাই এবং মটন হইতে যাত্রা করিতে হইবে ১লা আগষ্ট; এখনও ৯ দিন আছে দেখিয়া আমরা সপ্তাহকাল শ্রীনগরে থাকিয়া তত্রত্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে লাগিলাম।

প্রাচীনকালে কাশ্মীর রাজ্যের পরিসর কতটুকু ছিল, তাহা বলা বড়

কঠিন। মোগল বাদশাগণের সময়ে রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ উপত্যকাটী (যাহাকে Vale of Kashmir বলে) সাধারণতঃ কাশ্মীর বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে পামীর এবং চাইনিজ্ তুর্কিস্থান, পূর্ব্বে তিব্বত, পশ্চিমে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং দক্ষিণে পাঞ্জাব। কহ্লণকৃত রাজতরঙ্গিণীর মতে কাশ্মীর এক সময়ে জলপূর্ণ ছিল; প্রজাপতি কশ্যপঋষির চেষ্টায় ইহ ভূমিতে পরিণত হয়। এই কারণ তাঁহারই নাম হইতে (কশ্যপমীর হইতে) কাশ্মীর নাম হইয়াছে। ইহা যে একটি খুব প্রাচীন দেশ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ মহাভারতাদি পুরাণে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

শাঙ্খায়ন ভাষ্যে বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন :—

প্রজ্ঞাততরা বাগুগ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে

বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতী প্রসাদার্থং উদঞ্চে।"

অর্থাৎ কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সরস্বতীই বাক্; তাঁহার প্রসাদলাভের জন্য লোকে উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। ইহাতে বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে লোকে কাশ্মীরে ভাষা শিখিতে যাইত। কোন কোন মতে এইখানে সতীর অঙ্গ পড়িয়াছিল বলিয়া ইহাকে শারদাপীঠ কহে। যাহাই হউক, খুব প্রাচীনকাল হইতে যে আর্য্যজাতি এইস্থানে বাস করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

কাশ্মীর পর্ব্বত এবং উপত্যকায় পূর্ণ। জগতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে এত চিরহিমানী মণ্ডিত উচ্চশীর্ষ পর্ব্বত বা এত বিশাল তুসারক্ষেত্র (glacier) বর্ত্তমান। হিমগিরির সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাংশ এই প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশে স্থিত কারাকোরাম্ পর্ব্বতশ্রেণীর গডুইন অষ্টিন নামক চূড়াটি ২৮,২৭৮ ফিট উচ্চ, উচ্চতায় উহা জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তিনটী নদী এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা, যথা :—উত্তরে সিন্ধু, মধ্যে বিতস্তা (Jhelum) এবং দক্ষিণভাগে চন্দ্রভাগা (Chenub)। কিন্তু বিতস্তাই ইহার

প্রধান নদী ; ইহা কাশ্মীর উপত্যকার পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া উত্তর পশ্চিমবাহিনী হইয়া হিমালয় ভেদ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীর প্রদেশকে সাধারণতঃ দেখিলে যেন বিতস্তার অববাহিকা (basin) বলিয়া অনুমতি হয়। এখানে অনেকগুলি হ্রদ আছে ; পার্ব্বত্য প্রদেশের হ্রদগুলি উপত্যকাস্থ হ্রদগুলি অপেক্ষা ছোট। ইহাদের মধ্যে ডল, মানস বল ও উলার হ্রদ বিখ্যাত। শেষোক্ত হ্রদটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ; ভারতে স্বাদু জলপূর্ণ হ্রদ এত বড় আর নাই। সাধারণতঃ ইহার পরিসর ১৩ বর্গমাইল ; কিন্তু বন্যার সময় ইহা ১০০ বর্গমাইল অধিকার করিয়া বসে। কাশ্মীরে উৎসও যথেষ্ট সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎসকে চলিত ভাষায় কাশ্মীরিগণ চশ্‌মা বলিয়া থাকে। সকল চশমারই জল নির্ম্মল স্বচ্ছ ও সুস্বাদু। আবার বিখ্যাত চশমাগুলির জল এক একটি এক এক বিশেষ গুণের জন্য প্রসিদ্ধ, ইহাদের মধ্যে ২।৪টির অবস্থান অতি রমণীয়, এবং বহু পর্য্যটক যত্ন করিয়া এইগুলি দেখিতে যান।

কাশ্মীরের উত্তরাংশ যথার্থপক্ষে তিব্বতের অংশ এবং এখানে তিব্বতের ঋতু বর্ত্তমান ; গ্রীষ্মও যেরূপ প্রখর, শীতও তদ্রূপ। দক্ষিণাংশের আবহাওয়া কিন্তু অতি আরামদায়ক ; এখানে শীতের তীব্রতা নাই এবং গ্রীষ্মও কষ্টদায়ক নহে। বাস্তবিক পক্ষে এখানকার লোকেরা গ্রীষ্ম কাহাকে বলে তাহা জানে না। বৈশাখ হইতে ৭ মাস কাল বসন্ত বিরাজমান এবং পরবর্ত্তী ৫ মাস শীতের অধিকার। শ্রাবণ ভাদ্র মাসের দ্বিপ্রহরের সময় সামান্য একটু গরম হয় মাত্র। এখানকার ঋতু সম্বন্ধে কাশ্মীরি ভাষায় একটী পদ্য আছে, তাহার অর্থ এই :— "দগ্ধজীবও কাশ্মীরে আসিলে প্রাণ পায় ; এমন কি কাবাব করা পাখীও পক্ষপ্রাপ্ত হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়"। প্রকৃতই এখানকার বায়ু অতি নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর। বৈদেশিকগণের মুখে যে কাশ্মীরের জলবায়ুর সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এইস্থানের।

(ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দের প্রতি।

(নছরু)

চোখে কভু দেখি নাই—

শুধু ঐ ছবি পানে চেয়ে

অপার বিস্ময়ে মন ফেলিয়াছে ছেয়ে।

ঐ দু'টি সুগভীর বিশাল নয়ন

কি কথা বলিতে চায় ? কিরূপ হেরিছে নিশি-
দিনমান ধরে—তাই বুঝি চেয়ে আছে
বিস্ময়-আকুল—দু'টি তারা মেলি'—দূরে দূরে
কোন্ সে রহস্যের পুরে—আবেগ-আনন্দ
কত অপার পুলকে ;—ভরে আছে আঁখি-জল
করুণ-বিহ্বল ! কত কি যে ভাব, লীলা তরঙ্গিত
হইতেছে যুগপৎ বুঝিতে না পারি। আপনি
কি বুঝেছিলে হৃদয়ের কথা ? বুঝিলে কি কত বড়
বহ্নি-তেজ আছে লুক্কায়িত ঐ তব নয়নের
তলে ? তুমি বোঝ নাই ;—আমি কিন্তু
দেখিতেছি সুদিব্য নয়নে—

পারিতে ফেলিতে বিশ্ব নিমেষে উপাড়ি
নয়ন পলকে সব ভাঙ্গিতে আছাড়ি ,—

শুধু আঁখি-পাতে—হ'য়ে যেত প্রলয়ের
মহান বিভ্রাট ;—ওগো, পারিনা চাহিতে যেন
জ্বলিতেছে ধিকি ধিকি কিবা রুদ্র তেজে
কিবা বহ্নি জ্বলিতেছে হৃদয় কন্দরে ;—
থামাও থামাও দেব—ভয়ে মরি আজ
বশ্যতা মেনেছি আমি—জয় মহরাজ !

* * *

কি করুণা !

শ্রাবণের ধারা সম গলে উছলিয়া—

মনে হ'ল অশ্রু বিনা তব আর নাহিক সম্বল—
হৃদয় কোমল জানে শুধু কাঁদিবারে দেশবাসী
অনশনে যেতেছে মরিয়া—
সহসা ছাড়িয়া
কোমল শয়ন-খানি নিশি সুগভীরে
ধীরে ধীরে লুটাইয়া পড়িলে
মেঝেতে—ও অতল আঁখি-সিন্ধু উথলি' উঠিয়া
যে ধারা পড়িল ঝরি সেদিন নিশীথে,
তুমি নাহি জানো—কিন্তু ইহা সুনিশ্চয়
যাবেনা বিফলে, এর আছে বিনিময়!
ঐ দু'টী নয়নের দিব্য আঁখিধার
পারে শত ভারতেরে করিতে উদ্ধার!

* * *

সাধ হয়—সব আজি বলি,
দেখাইব মোর বুকে কিযে কথা উঠিতেছে দুলি। ভাষা নাই
কথা মোর ফিরে কেঁদে কেঁদে—যে কথা
বলিতে যাই পলায় সভয়ে—মনে হয়
হ'লো নাকো বলা···যাহা ঠিক হৃদয়ের বাণী
যাহা ঠিক কহিতে চাহিছে মন,
অকিঞ্চন, দু'টি কথা
বলি' পারা কিগো যায় তাহা বলা?—যে সেবা-
আশ্রম তুমি দিলে ভারতেরে—যে 'ত্যাগ' আদর্শ
তুমি দিলে জগতেরে,—সাম্য-মৈত্রী-প্রেম
বিলাইলে দু'হাতে আপন,—আপনার বলি'
সবে দিলে আলিঙ্গন—
ওরে ভোলা মন,
কেমনে বর্ণিবি তাহা?
ওগো দেব,
যতদিন আছে চন্দ্র আছে দিবাকর,
তোমার পবিত্র নাম রহিবে ভাস্বর।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

শিখ গুরু—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র বি-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান সুলভ গ্রন্থমালা কার্য্যালয়, ১৩নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা। মূল্য বার আনা মাত্র।

দরিদ্র নিঃসম্বল অথচ ঐশীশক্তিতে সমধিক বলসম্পন্ন যে দশজন শিখগুরু অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তি এবং স্বদেশ প্রেম, ত্যাগ ও বীর্য্য সহায়ে আদর্শভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন শিখজাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব সঞ্চারণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাহাকে একটী অমিত বলশালী অথচ সংযত সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়া বিরাট মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের নেতৃত্বে শিখজাতি রাজশক্তির তুলনায় অতি নগণ্য মাত্র হইলেও উহাকে হেলায় প্রতিহত করিয়া প্রায় দুই শতাব্দী কাল যাবৎ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এই পুস্তকখানি নানক হইতে গোবিন্দ সিং পর্য্যন্ত সেই দশজন শিখ গুরুর অলোকসামান্য কার্য্যাবলীর একখানি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস। হিন্দুজাতির মেরুদণ্ড যে ধর্ম্ম—সেই ধর্ম্মভাবকে সতেজ ও সবল করিলে অন্যান্য আনুসঙ্গিক ভাবরাশি স্বতঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া তাহার সকল দৈন্য যে এককালে বিদূরিত করে—শিখগুরুগণের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ। গুরু নানক শক্তিপ্রদ বীজমন্ত্রে কিরূপে জীবনীশক্তিহীন শিখজাতির ভিতর প্রথম প্রাণ সঞ্চার করিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েকজন নির্বীর্য্য গুরুর ব্যর্থ জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মরণোন্মুখ শিখজাতি হরগোবিন্দ ও গোবিন্দ সিংহের সুদক্ষ পরিচালনায় কিরূপে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন, শিখগুরু ও শিশু বালকগণ ঘাতকের হস্তে নির্ভীক অন্তরে স্বীয় জীবন বলিদান করিয়াও কিরূপে নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এই পুস্তকে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন।

সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়দিক দিয়াই পুস্তকখানি বিশেষ স্থান আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তিনি শিখজাতি ও শিখগুরুগণের জীবন, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস, বিজাতীয়দিগের সহিত তাহাদের

বৈশিষ্ট্য, শিখজাতির উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সম্যক বিচার সহায়ে তিনি যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে লেখকের চিন্তাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যখন নিবিড় রাজনৈতিক কুজ্ঝটিকায় পথহারা হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ আজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যখন অস্মদেশীয় মনীষা পাশ্চাত্য কূট রাজনীতির ঐন্দ্রজালে এখনও বিমুগ্ধ, তখন শিখগুরুগণের জীবনেতিহাস ধ্রুবতারার ন্যায় তাহাকে গন্তব্যপথে পরিচালিত করিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

রচয়িতা পুস্তক পরিচয়ে লিখিয়াছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাই তাহার প্রথম প্রয়াস। লেখক নবীন হইলেও লেখনী চালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লেখনীশক্তিতে শিখগুরুগণের দেশহিতব্রত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন দীর্ঘ দুই শতাব্দীর জড়তারাশি ভেদ করিয়া পাঠকের অন্তরে নিস্কাম স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা আনিয়া দেয়।

"ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত

কথা কও, কথা কও———" কবির এই প্রাণের প্রার্থনা লেখক বাস্তবে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধান অতি সুন্দর। এই নবীন লেখককে সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহার লেখনী বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবে ইহা আমাদের বিশ্বাস।

এই সংস্করণের স্বত্ব বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ গ্রন্থকার জয়রামবাটী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীমন্দিরে প্রদান করিয়াছেন। (স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ)

পরকাল-তত্ত্ব (প্রথম খণ্ড) শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর লিখিত "ত্রিশূল" হইতে উদ্ধৃত—মূল্য ।৵০। ইহাতে হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত পরকালতত্ত্ব বা জন্মান্তরবাদ অতি সরল এবং সহজ ভাষায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। ছাত্রগণকে যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ দিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ১১৯।১ করপোরেশন ষ্ট্রীটে যে ছাত্রনিবাস (Student's Home) খুলিয়াছেন, লোকের সহানুভূতি এবং অর্থাভাবে উহার কার্য্য যথাযথরূপে পরিচালিত হইতেছে না। হুগলি, বরিশাল, সিলেট, ২৪পরগণা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা এখানে অবস্থান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ইহারা স্বহস্তে সকল প্রকার গৃহকর্ম্মাদি করিয়া থাকে এবং যথাবিধিক্রমে ইহাদিগকে পূজাপাঠ ও ধ্যান ধারণাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁহারা নিজ সন্তানদের যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ করিতে ইচ্ছুক, অসচ্চরিত্রবিদ্যাবত্তার কোন মূল্য নাই যাহারা বুঝেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে এখানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। দরিদ্র বালকদিগকে বিনা অর্থে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাতে বহুছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিয়া যথার্থ চরিত্রবান হইতে সমর্থ হয় সে বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমরা ইচ্ছুক—যাহাতে তাঁহাদের সাহায্যে ইহা একদিন এক বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

২। বহুবাজার হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন ও কার্য্যবিবরণী পাঠে আমরা সুখী হইয়াছি। এই সৎকার্য্যে সাধারণের সহানুভূতি বিশেষ প্রয়োজন।

৩। বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ষ্টার থিয়েটার হলে বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের ৬১ তম জন্মোপলক্ষে এক সভার অধিবেশন করেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্ত্তৃক উপনিষদ হইতে শান্তিপাঠ সমাপ্ত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। স্বামী প্রকাশানন্দজী মহারাজ তাঁহার সুন্দর পুষ্পিত ভাষায় স্বামিজীর জীবনী ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত

প্রভুদয়াল শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য, রায় চুনীলাল বাহাদুর প্রভৃতি মনীষিগণ ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীভাষায় বর্ক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সোসাইটীর সেক্রেটারী মহাশয় বিবেকানন্দ সোসাইটীর বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন এবং কতিপয় ভদ্রলোক স্বামিজীর লিখিত কবিতার আবৃত্তি করেন, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র গড়াই তাঁহার ধ্রুপদ সঙ্গীতের দ্বারা সভার পূর্ব্বে ও পরে শ্রোতৃবৃন্দকে আপ্যায়িত করেন।

৪। **সিংহলে বেদান্ত প্রচার।** বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সিংহল হিন্দু-বাঙ্গালীদিগের একটি উপনিবেশ ছিল। তারপর মহারাজ অশোকের পুত্র মাহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিতা তথায় গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সময়েই সমস্ত লঙ্কাদ্বীপবাসী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিংহলের তৎকালীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার! অনুরাধাপুরম্ নামক স্থানেই ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তিগৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কালের পরিবর্ত্তনে লঙ্কার বৌদ্ধধর্ম্মিগণেরও অবনতি আরম্ভ হইল ক্রমে তাহাদের সমাজ এবং রাজশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ক্রমে দক্ষিণ ভারত হইতে তামিলগণ লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল, বৌদ্ধ-রাজা তামিলগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া কান্দি নামক লঙ্কার পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। জাফনা প্রভৃতি সিংহলের উত্তরাঞ্চল সম্পূর্ণ উক্ত দাক্ষিণাত্যবাসী তামিল হিন্দুগণের অধিকারভুক্ত হইল।

খৃঃ ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে আগমন করে। সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার ইচ্ছায় তাহারা সিংহলেও গতিবিধি আরম্ভ করে। ক্রমে সিংহলের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে তাহারা সিংহলের সমস্ত অধিত্যকা ভূমি করতলগত করিয়া লয়। তাহার পরও প্রায় পঞ্চাশবর্ষ কাল প্রবল প্রতাপে পর্ত্তুগীজগণ সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিল।

উক্ত প্রায় দেড়শতবর্ষকাল পর্ত্তগীজ রাজত্ব কালে সিংহলের অশেষ

প্রকার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। সিংহলবাসীদিগের রাজ্য, ধন, মান ত গেলই, সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ধর্ম্মকেও তাঁহারা হারাইলেন। পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু-বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে ক্রিশ্চিয়ান হইতে লাগিল। হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল ধ্বংস হইল! কিম্বদন্তী আছে যে, তৎকালে কেহ নিজকে হিন্দু বা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে পর্ত্তুগীজ ভয়ে সাহসী হইত না। সুতরাং আচার ব্যবহার প্রভৃতি সকল রকমে সিংহলবাসী ক্রিশ্চিয়ান হইলেন।

পর্ত্তুগীজগণ রোমানক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান। তাহাদের বিশ্বাস যাহারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, তাহাদের চিরন্তন নরক অবশ্যম্ভাবী; কাজেই জোর করিয়াও যদি বিধর্ম্মীকে 'ক্যাথলিক' করা যায়, তাহা হইলেও সেই লোকের কল্যাণ সাধিত হয়। সম্ভবতঃ এই ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তাহারা সিংহলে 'রোমান ক্যাথলিক' মত প্রচারে এত উৎকট চেষ্টা করিয়াছিল। ফলে দেড়শত বৎসরের মধ্যেই সিংহল হইতে হিন্দু আচার নীতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান অন্তর্হিত হইল!

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্ত্তুগীজগণ ওলন্দাজ জাতি কর্ত্তৃক সিংহলে পরাভূত হইয়া বিতাড়িত হন। সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ-প্রভাব তথায় বিস্তার লাভ করিল। তাহারা প্রটেষ্টাণ্ট ক্রিশ্চিয়ান, রোম্যানক্যাথলিকদিগের প্রতি ধর্ম্মবিদ্বেষ মজ্জাগত। তাই বোধ হয় ওলন্দাজগণ, পর্ত্তুগীজ কীর্ত্তি সিংহল হইতে মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াশী হইলেন।

ওলন্দাজগণ সিংহলবাসীকে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের জাত্যাভিমান, অর্থলোলুপতা এবং বিজয়ীর মদগর্ব্বে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা ১৩৮ বর্ষকাল সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ অধীনে প্রায় তিনশত বর্ষকাল সিংহলবাসী শাসিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল, হিন্দু আচারনীতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই বিস্মৃত হইল, সমাজ ও নৈতিক জীবনের চূড়ান্ত পতন হইল।

খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই পতিত অবস্থার সময় সিংহলের

জাফনা নামক স্থানে একজন শিবভক্ত মনীষী জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম 'আরমুলম্‌নাবলর,'। তিনি দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে ক্রমে ক্রমে বহু ভ্রষ্টাচার হিন্দু শৈবায়িত নামধেয় হিন্দু হইতে আরম্ভ হইল। ঐ সময়েই কয়েকটী শিব, দেবী, গণপতি এবং মায়লাবাহনম্‌ বা কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইল, তাহাই বর্ত্তমান সিংহলের প্রাচীন হিন্দু মন্দির। সেই সময় বৌদ্ধগণও আপন ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান কলম্বো প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধমন্দিরগুলিও ঐ কালের প্রস্তুত বলিয়া কিম্বদন্তী।

খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ওলন্দাজগণ সিংহলে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। বর্ত্তমানে সমস্ত সিংহলে ইংরাজ প্রভুত্ব সর্ব্বত্র।

জাতিবর্ণের গোলমাল সিংহলে কিছুমাত্র নাই, ধর্ম্মের বন্ধনও তদ্রূপ ছিল, আজ হিন্দু—কাল ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে কিছু আটকায় না, আবার হিন্দু বা শৈবায়িতের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানদিগের বিবাহাদিতেও কোন বাধা নাই, পিতা হিন্দু—মা ক্রিশ্চিয়ান ইত্যাদি উল্টা পাল্টা প্রায়ই দেখা যায় অর্থাৎ তথায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে ভুবনবিখ্যাত আচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী সিংহলে শুভ পদার্পণ করেন। তখন হইতেই তথায় এক অদ্ভুত জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আচার্য্যদেব যে বীজ তথায় বপণ করিয়াছিলেন এখন তাহা অঙ্কুরিত। কালে তাহা যে মহীরুহে পরিণত হইবে সন্দেহ কি? স্বামিজীর জীবদ্দশা হইতে অদ্যাবধি সিংহলবাসীর ভাবগতিক এবং কার্য্যাবলীই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

১৮৯৯ খৃঃ অব্দে সিংহলের রাজধানী কলম্বোবাসী হিন্দুগণ তথায় এক জন স্থায়ী সন্ন্যাসী ধর্ম্মপ্রচারকের জন্য বারংবার স্বামিজীর নিকট আবেদন করেন। স্বামিজীর অনুরোধে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামিজী মহারাজ কলম্বো গমন করিয়া প্রায় চারমাস কাল তথায় সর্ব্বসধারণের জন্য মাঝে মাঝে বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তর ক্লাস দ্বারা বেদ ও আগম কথিত সনাতন

হিন্দুধর্ম্মের আবশ্যকতা এবং তৎসাধনের উপায় সকল বর্ণনা করেন। তাঁহার প্রচারদ্বারা তথাকার হিন্দুসমাজ উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

১৯০২ খৃঃ অব্দে আচার্য্যদেব তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া মহাসমাধি লাভ করিলে সিংহলবাসী সশিষ্য হিন্দুগণ মিলিত হইয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ, বেদ ও আগমকথিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার এবং আর্য্য-সন্তানগণের হৃদয়ে তাহার ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে "বিবেকানন্দ সোসাইটী" নামক একটী সাধারণ ধর্ম্মপ্রচার সমিতি স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে তাহার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সমিতির মেম্বরগণ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে একটী বিস্তৃত জমি সহ বাটী ৬১ নং হিল ষ্ট্রীট কলম্বোতে উক্ত সোসাইটীর জন্য ক্রয় করিয়াছেন। সোসাইটীর মেম্বর সংখ্যা তিন শতের উপর। সোসাইটীতে একটী সাধারণ পুস্তকাগার আছে, সভ্যগণ প্রত্যহ এবং নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট দিনে মিলিত হইয়া নৈতিক জীবন, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রত্যহই কোন না কোন ধর্ম্মগ্রন্থ কিছু কিছু পাঠ হইয়া থাকে। উপযুক্ত ধর্ম্মবক্তা পাইলে তাঁহারদ্বারাও বক্তৃতাদি প্রদান করাইয়া সাধারণের উপকার করা হয়।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন কালে কলম্বো নগরে অবতরণ করেন, তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ কলম্বোতে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার অধিবাসিবৃন্দ মিলিত হইয়া সবিশেষ অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তৎকালে কলম্বো, ক্যাণ্ডি, অনুরাধা পুরম্ ও জাফনা প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া তথাকার হিন্দু সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজমঠের অধ্যক্ষ স্বামী সর্ব্বানন্দজী কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। সেই সময়ে তিনি কলম্বো, ক্যাণ্ডি, জাফনা প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি

বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জাফনায় তাঁহার "সনাতন হিন্দুধর্ম্ম" নামক বক্তৃতার প্রশংসা অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। এবং জাফনাতে একদল স্কুল, কলেজের ছাত্র লইয়া তিনি প্রতিদিনই "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের আলোচনা করিতেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে জফনাবাসী যুবকগণ ছাত্রসংঘ বা Young Men's Hindu Association নামক একটি সমিতি স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া তাহার উদ্বোধন করিবার জন্য স্বামী সর্ব্বানন্দজীকে নিমন্ত্রণ করেন। তদুপলক্ষে তিনি তথায় গমন করেন এবং উক্ত Association স্থাপন করেন। সেই সময়ে "শিক্ষা ও চরিত্র" বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিংহলের অন্যান্য স্থানেও তিনি ঐকালে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

জাফনাবাসী ছাত্রবৃন্দ ও কতিপয় সংগৃহস্থ মিলিত হইয়া তথায় Colomboর অনুরূপ Vivekananda Society নামক একটি ধর্ম্ম-সমিতি স্থাপনে যত্নবান হন। ঐ সময়ই উক্ত সমিতি স্থাপিত হয় এবং তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রচারিত পুস্তকাবলী পাঠ ও আলোচনা হইতে থাকে। সর্ব্বানন্দজী তাহার উৎসাহদাতা এবং প্রবর্ত্তক। এই Societyটীতেও Colomboর অনুরূপ কার্য্যাদি হইয়া থাকে, এইক্ষণে তাহার Member সংখ্যা প্রায় ৫০ জন উৎসাহী ও শিক্ষিত যুবক ভদ্র মহোদয়গণ।

Batlicolon (ভাটেকলোন্) নামক স্থান হইতে কতিপয় আচার্য্য-দেবের শিষ্য Admirers তথায় একটি হিন্দুস্কুলের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বানন্দজীকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি তথায় গমনপূর্ব্বক হিন্দুস্কুল উদ্ঘাটন করেন এবং কয়েকটি হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। Batlicolonএ পূর্ব্ব হইতে একটি Vivekananda Society স্থাপিত হইয়াছিল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার সর্ব্বানন্দজী জাফনাবাসীর অনুরোধে তথায় গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত জাফনার Vivekananda Societyর চেষ্টা ও উদ্যমে তথায় বৈদ্যেশ্বর বিদ্যালয় নামক একটি হিন্দু স্কুল স্থাপিত

হইয়াছিল। ছাত্রবেতন এবং স্থানীয় লোকের সাহায্যে ঐ স্কুল চলিত। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ Working memberগণের শৈথিল্য প্রযুক্ত উক্ত স্কুলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। School committee Sri Ramakrishna Missionর কর্ত্তৃত্বাধীনে স্কুলটী অর্পণ করিতে সংকল্প করিয়া তাহার ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি স্কুলটী Madras Mathএর অন্তর্ভুক্ত করেন; বর্ত্তমানে এই স্কুলের নাম The Ramkrishna mission Vaidyeswar Vidyalaya. জাফনার বৈদ্যেশ্বর নামক একটী ৺শিব মন্দির আছে। এই স্কুল উক্ত মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্বে তাহার নাম রাখা হইয়াছিল 'বৈদ্যেশ্বর বিদ্যালয়' এইক্ষণে নাম হইয়াছে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বৈদ্যেশ্বর বিদ্যালয়"। ছাত্রবেতন, স্থানীয় লোকের চাঁদা এবং সরকারী সাহায্য দ্বারা Schoolটি চলিতেছে। বর্ত্তমানে Schoolএর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২০০ শতের অধিক। তথায় সর্ব্বানন্দজী একটি Committee স্থাপন করিয়া স্কুলের ভার Committeeর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন এবং তিনি President স্বরূপ স্কুলের পরিচালনা করেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে School Committeeর নিমন্ত্রণে সর্ব্বানন্দজী তথায় গমন করেন। তথায় স্কুলের বাৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইবার পর, Vivekananda Societyর Memberগণ উক্ত Societyকে একটি স্থায়ী Sri Remkrishna Mathএ পরিণত করিতে প্রস্তাব করেন। তাহাদের ইচ্ছা—ভারতের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অনুরূপ এখানেও একটি স্থায়ী মঠ স্থাপিত হয় এবং তাহাতে অন্ততঃ ২।৪ জন সন্ন্যাসী বাস করিয়া স্থানীয় হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম প্রচার ও যুবকগণের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে সাহায্য করেন। উক্ত মঠের ব্যয়ভার তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক।

আগষ্ট মাসের তিন সপ্তাহকাল ধরিয়া স্বামী সর্ব্বানন্দজী জাফনা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ক্লাশ করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। এখানকার লোকের শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য্য স্বামিজীর প্রতি

অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা এবং তৎসাধনেরও আগ্রহ বেশ আছে। কএকজন উৎসাহী শিক্ষিত যুবক বিবেকানন্দ সোসাইটীর' কাজে অন্তরের সহিত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত জীবন যাপন করিতে লালায়িত ও চেষ্টিত।

জাফনা হইতে সর্ব্বানন্দজী কলম্বো 'বিবেকানন্দ সোসাইটী'র বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। উক্ত সোসাইটীর মেম্বার-গণের মতানৈক্য হওয়ায় তিনি তাঁহাদের মধ্যস্থতা করেন। 'সোসাইটী'র মেম্বারগণের মধ্যেও 'কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটী'কে ভারতের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতে প্রস্তাব হয় এবং অধিকাংশ মেম্বারগণের ইচ্ছা তাহাই।

কলম্বোতেও দেখিলাম, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য্য স্বামিজীর ভাব এক অভিনবভাবে কার্য্য করিতেছে। এইক্ষণে ভারতের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্থায়ী প্রচারকের অভাব কলম্বোবাসিগণও অনুভব করিতেছেন।

সিংহলে আচার্যাদেব, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি ও অভেদানন্দজী মহারাজ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ের যে মহান ভাব প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, স্বামী সর্ব্বানন্দজী তাহাই প্রায় পূর্ণরূপে সিংহল বাসীর অন্তরে জাগাইয়া তুলিতেছেন। তথাকার অধিবাসিগণ ক্রমেই সেই মহান-আদর্শ গ্রহণে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। হিন্দু (শৈবায়িত) এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের আগ্রহাতিশয়ই তাহার প্রমাণ। প্রতিদিন বক্তৃতার সময় এবং প্রশ্নোত্তর ক্লাশে লোকের ভিড় দেখিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। এইক্ষণে সিংহলে স্থায়ী প্রচারক গমন করা বিশেষ আবশ্যক। (স্বামী নরোত্তমানন্দ)

নব-তীর্থ।

(শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী)

শতাব্দীর গাঢ়সুপ্তি-পাষাণের, প্রতিবিম্বমুখে
যে মেঘ জমিয়াছিল—নিদ্রিতের তৃপ্তিহেন সুখে
যার রক্ত মরিচীকা উজ্জ্বল আলেয়া ধীরে ধীরে
জগতের পলে পলে দূরান্তের ধ্বংসশোক নীরে
দিয়াছিল পথ—
মাদক বিভ্রমে যথা—কাঁপিল জগৎ
উন্মাদ নেশায়—সেথা বসুধার প্রাণ
হেরিল মরণ মাঝে জুড়াবার স্থান!
দেহের উৎসব করি দীর্ঘদিন ভার
দিনান্তের অন্তরালে মরমে সঞ্চার
উঠিতে দেখিল তারা বিষাক্তের বাসা
অচপল রশ্মি ভরা—
অন্তহীন অপূর্ণের বাসা!
শত শত মন্ত্রে যার আত্মমন্ত্র স্থান
বিষাক্ত বিকল হ'য়ে, ব্রাহ্মাণ্ড সমান
বদন ব্যাদন করি চাহিল ভীষণ
শত কলরব নিয়ে! বিকট মরণ
(শত সাজ সজ্জা নিয়ে আসিল পূজিতে যেন-
ব্যর্থতার পুঞ্জ পুঞ্জ প্রসাধন) হেন
কাঁপিল উদভ্রান্ত প্রাণ উচ্ছ্বাসে আবেগে
অনন্ত অনলভরা হাঁকিল সবেগে—

চিৎকারি তাহারা।

অবসন্ন ক্লান্ত দেহে উন্মত্ত প্রলাপে
বিন্দু বিন্দু করি রক্ত অন্তর উত্তাপে
হ'ল শেষ বাসনার—বসুধার মাঝে
বাড়িল বহ্নির শিখা উন্মত্তের সাজে
—তারপরে ?
ধীরে ধীরে ভগ্নবুক অশ্রান্তের স্বরে
ভাষাহীন মূর্চ্ছনায় ধ্বনিল নীরবে-
"আরোদূরে—কতদূর—কোথাওরে—তবে।"
কালিমা ব্যথিত তপ্ত অশান্তির রোলে
পথ কোথা—শান্তি কোথা—প্রাণ কোথা ব'লে ;—
যে ভীম উদাস দৃষ্টি হানিল ধরিত্রী
ঘণায়ে আনিল যেই তমসা কুরাত্রি
সেই সব ক্ষোভ সুপ্তি অজ্ঞানতা পাশে
সর্ব্ব অগোচরে যিনি উদিলা বিলাসে
বিশ্বালোক এ প্রাচ্যের তুচ্ছ এক কোণে
'শোন ওরে শোন মূঢ়'
তাহারে ধরণী আজি কাণ পাতি শোনে !
যে মহা মিলন বাণী বিশ্বের বুকেতে
যে ধ্বনি জাগায়েছিল নীরবে নিভৃতে
দরিদ্র বঙ্গেরে মাঝে আড়ম্বর হীন
হয়নি তাহাতো আজ অনন্তে বিলীন।
ভোলেনি তো সে সুবাস গন্ধবহ ওরে।
বিশ্বের অন্তর প্রান্তে রাখিয়াছে ধীরে
বসন্তের মুক্তিময় সুবাসের মত
অনন্ত সৌরভে, আছে—থাকিবে সতত !
তাহার জীবন্ত ভাষা উদাত্তের বাণী
দিয়াছে যে বসুধারে যৌবনের ব ণী

আজো তাহা বাজিতেছে—বাজিবে অনন্তকাল
বজ্রবীণ সম ! আকাশের বুকে যত মেঘের জঞ্জাল
ছেদি—যেই তাকাইবে—
সেই তো হেরিবে সেই সুতীক্ষ্ণ আলোক !
　　হানি যদি একটী পলক
কেহ চায়—কেহ ডাকে—কেহ গায় গান
মহান্ সে তন্ত্রজ্ঞের সুনিবিড় তান
　　সেই ত শুনিবে—
সকরুণ পুষ্পবৃন্তে সুবাসের মত
　　সেই ত পাইবে—
একবার প্রাণমন যেবা ভাসাইবে
　　অশ্রুধার গান।
পাইবে পাইবে স্থির অমৃতের খনি
ভাষা নাই সুর নাই নিঃশব্দের মণি !
　　সুবিশাল সেই সুর মান
দেহময় পশ্চিমেতে আনে প্রাণজ্ঞান
তারা দেখ লুটাইছে সেই পদতলে
আত্মভোলা অপলক অশ্রু গঙ্গাজলে !
রে মূঢ় ভারত ! তুই দেখ চাহি আজ
কি গভীর কি মহান কি মিলন সাজ।
　　সকলেরে—
"আপনার ভাবে নিজ মহত্ত্ব আনিয়া
প্রতিষ্ঠিত কর তারে তার মাঝ দিয়া।
সবাকারে একস্থানে একসূত্রে কভু
বেঁধোনা যেনরে -কারাগার সেও তবু
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে শুধু ভীত বয় ; কিন্তু ওরে
অন্তর হত্যার সেই প্রাচীর পাষাণ ঘেরা
দিগন্তেরে ক্ষীণ করি ক্ষীণ আত্মবেড়া।

যে ভীষণ মড়কের ব্যাধি ভীতি আনে
তাহার বিষাক্ত শ্বাস বালুসম হানে
জ্বালাময় তীব্রতার বিশ্বমরু মাঝে" !

এই নীতি দিয়া
বিশ্বের বিবেক সম বিবেকানন্দ
অনন্ত বিষাদ মাঝে ঢালিল আনন্দ

অপবিত্র খণ্ড তুচ্ছ অবিশ্বাস ফাঁড়ি
উচ্চ নীচ একাকাশে এক করি ছাড়ি
সবার অলোকে হেন ওঠে সর্ব্ব পথ
ইচ্ছামত চালাইতে নিজে নিজ রথ।

সে মহা আলোক হবে জীবন্ত মিলন,
বিশ্ব মানবের চির আলোক বন্ধন,
সেই আছে পথ মাত্র অন্য পথ নাহি—
এ ভারত জাগিয়াছে সেই পথ চাহি !

যুগান্তের যত পাপ রয়েছে সঞ্চিত
স্তরে স্তরে পঞ্জরের কটী অস্থি মাঝে ! বঞ্চিত
করিতে হবে সেই সবতৃষ্ণা ! মাতৃত্ব !
স্থির ভিত্তি সম যাহে গড়ে সে জাতিত্ব—

সুবিপুল বিশ্বনীড় সেই প্রাণ মাঝে
জড়কীট সম শত কীট বদ্ধ আছে
মড়কের মত তাই শত অনাচার
ব্যর্থতার শত রব শত হাহাকার ?
(দুর্ভিক্ষের কালে জ্ঞানহীন প্রায় মানুষের
নর-মাংসে লোলুপ আহার)—জগতের
ক্ষীণ বক্ষ তার শক্তি করিয়া ছেদন
(ডাকিছে নিমেষে পলে কেবলি মরণ
যাহা)—জাগিতে পারে না তাই ওই

ব্যর্থতার দোলনের কম্পন দেখিয়া
বিজয় পতাকা তুলি সৌর্য্য বিঘোষিয়া
'কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ' মহান আলোক
জগতেরে দিলা তুলি ভুলিবারে শোক !
এ নহে কখনও রে নারীত্বের ঘৃণা !
মাতৃত্বের মাঝে এযে উদ্বোধন বীণা !
নারীত্বের মাতৃত্বের করি অপমান
যে পুঞ্জপাপের বোঝা ব্রহ্মাণ্ড সমান
সঞ্চিত হয়েছে—শত শত ব্রহ্মচারী
নবীন শোণিত দেবে সে ব্রত আচারি
তা হ'তে কলঙ্ক যাবে, নবস্নাত সাজে
আসিবেরে প্রাণ—
মাতৃত্বের বিশ্ব গাথা বিশ্ব জয় গান !
প্রায়শ্চিত্তের বোঝা কভু নয় এযে নয়
উন্মুক্ত আলোক সম ইহাতে অভয়
নেমে আয় রে পৃথিবী আজি নেমে আয়
জগতের কোল ঘিরি পুলক-ব্যাথায় !
অত্যুজ্জ্বল সঙ্গীতের প্রমত্ত ইঙ্গিত হ'তে
সকল অহমি-মাখা ব্যর্থতাকে ম'থে
প্রস্ফুটিত নববৃন্তে নবপুষ্প সম
কাঁপাইবে জগতের প্রাণের স্পন্দন
নেমে এস, হৃদিবান তমসা ঘুচিবে
জগত স্বাধীন হবে প্রবুদ্ধ গৌরবে !
যে আহ্বান এসেছে আজ রে শুদ্ধ নবীন !
শোন্ ওরে শোন তাহা আজ ! সে অচিন
রূপা ঘন নিঃশব্দের গান !
নিদ্রা নাহি শান্তি নাহি নাহি ভোগসুখ !
আলোকের প্রান্তে বাঁধি বিশ্ব মেঘ মুখ !

রুদ্ধশ্বাসে তপ্তবুকে ভগ্নপ্রাণে আজ
বসুধার ক্লান্ত দেহ নিয়ে শ্রান্ত সাজ
ছুটিতেছে আজ শুধু চাহিছে বিরাম
"শান্তি দাও—আলো দাও—দাও দিব্যধাম

তাই আজি কহি—

জাগো সবে জাগো মিলনের তরে
জগত কাঁপায়ে তোল কোটী মন্দ্র স্বরে !
দিগন্তের প্রান্তে প্রান্তে সবে কাঁপাইয়া
রণিয়া রণিয়া বিশ্ববীণে তান দিয়া
প্রচণ্ড তাণ্ডব সম প্রখর কিরণে
অনন্ত জীবনে কিম্বা অনন্ত মরণে
অত্যুজ্জ্বল শুভ্র স্বর্গালোক বাণী
ঢালিবে অসীম প্রাণ জ্ঞানদীপ্তি আনি !
বিশ্বের দুর্য্যোগ মাঝে যে বিদ্যুৎ

গিয়াছে রে বাঁধি—

প্রকৃতির শীর্ণ বুকে ধূম ধূলি মাঝে
বিফলতা স্বার্থ করি
পুলক আনিস যদি রে প্রমত্ত ! আজ
তবে পাবি বিশ্বালোক বিশ্ব-প্রাণ-সাজ ?
আলোকের দীপ্তি মুখে মেঘশিরপরে
আঘাত করিতে হবে সবলে সজোরে
তন্দ্রাগত ধরণীর ভাঙ্গুক শরম
ঘুমন্তের ভেঙ্গে যাক্ বিভল স্বপন
ব্রহ্মাণ্ডের দিক ভরি উঠুক সে দিশা
মিটুক সকল ক্ষোভ ক্ষণিকের তৃষা !

চারি আর্য্য সত্য।

(শ্রীচারুচন্দ্র বসু)

ষট্‌বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার পর বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ভগবান্ দেখিলেন, যে জগৎ জন্মজরাব্যাধি ও মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত। এই জরা-ব্যাধি ও মৃত্যুর অগ্নিতে প্রদীপ্ত হইয়া জীবকুল নিরন্তর দুঃখ পাইতেছে। জন্ম ও মৃত্যুর কঠিন শৃঙ্খল হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় অবিদ্যার নাশ বা ধ্বংস। জগতের কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তিনি চারিটী মূল সত্যে * উপনীত হইলেন। উহা হইতেছে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় বা মার্গ। প্রজ্ঞা বলে তিনি দেখিলেন, জগৎ দুঃখময়, দুঃখ যখন রহিয়াছে, অবিচ্ছিন্নভাবে উহার কারণও রহিয়াছে, সেই দুঃখের নিরোধ সাধন করাই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ এবং যে উপায় অবলম্বনে সেই দুঃখের সম্যক নিরোধ সাধন হয়, উহাই শ্রেষ্ঠ উপায়; গৌতম বুদ্ধ সেই উপায়ই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

ভগবান্ বুদ্ধ জগতের দুঃখ বিমোচনের উপায় স্বরূপ চারি আর্য্য সত্যের উপদেশ দান করিয়াছেন, (দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় বা মার্গ) চিকিৎসা শাস্ত্রেও এই প্রকার চারি মূল সত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা রোগ, রোগের হেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা শারীরিক ব্যাধি প্রমোচনের নিমিত্ত যেমন রোগের উৎপত্তি ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ যোগশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি ভবব্যাধি হইতে জীবের মুক্তির বিষয় বর্ণন প্রসঙ্গে সংসার, সংসার হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন। "তত্র দুঃখবহুলোসংসারঃ হেয়ঃ,

---

* (১) দুঃখ, (২) দুঃখ-সমুদয়, (৩) দুঃখ-নিরোধ ও (৪) দুঃখ-নিরোধ প্রতিপদ বা মার্গ।

প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায় সম্যগ্‌দর্শন।" দুঃখ বহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংসার হেতু, সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি হান, হানের উপায় সম্যগ দর্শন। মহর্ষি কপিলের মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানই সম্যাগ্‌দর্শন, ও মহর্ষি পতঞ্জলির মতে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ। ভগবান্ বুদ্ধ জগতের দুঃখ বিমোচনের উপায় স্বরূপ চারিটী মূল সত্যের উপদেশ দান করিয়াছেন, এই প্রকার মূল সত্যের উল্লেখ যে কেবল তাঁহার উপদেশেই আবদ্ধ তাহা নহে, ভারতীয় প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে ও মহা পুরুষদিগের উপদেশের মধ্যে, এইরূপ চারি মূল সত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার দুঃখের আলয়, এই দুঃখ হইতে জীবকুলকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করাই সকল দর্শন শাস্ত্রের ও সকল যুগের মহাপুরুষদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই গৌতম বুদ্ধ ক্লেশব্যাধি প্রপীড়িত জীবকুলকে মুক্তির উপায় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই জরাব্যাধিক্লিষ্ট মানব মণ্ডলীকে দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :—

ধিগ্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন,
আরোগ্যধিগ্ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চির স্থিতেন,
ধিক্ পণ্ডিতস্য পরুষস্য রতি প্রসঙ্গঃ॥
যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ণমৃত্যু
স্তথাপিচ মহদুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুন জরব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধাঃ
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত, চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম॥

ললিত বিস্তর পৃ ২৩০॥

"যৌবনে ধিক্, যে হেতু জরা ইহার পশ্চাৎ ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্, যে হেতু ইহা বিবিধ ব্যাধিদ্বারা পরাহত, জীবনে ধিক্, যে হেতু ইহা চিরস্থায়ী নহে এবং পণ্ডিত পুরুষের রতি প্রসঙ্গেও ধিক, যদি জরা-ব্যাধি বা মৃত্যু না থাকিত। তথাপি পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিতে জীবের মহা

দুঃখ হইত। জরাব্যাধিও মৃত্যুর সহ চিরানুবদ্ধ লোকের দুঃখের কথা আর কি বলিব, অতএব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মুক্তির উপায় চিন্তা করি।”

কিরূপে জগতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, এই তথ্যের বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তিনি দেখিলেন, যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের কারণ. এই অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (ছয় ইন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, এবং জাতি হইতে জরামরণ শোক-পরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনসা ইত্যাদি। অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান) বা অজ্ঞানই সকল দুঃখের কারণ, এই অবিদ্যার ধ্বংসই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই কারণই পরস্পরকে প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্ম বলা হয়, অর্থাৎ একটীর সংযোগে অন্যটীর উৎপত্তি। ইহারই আর এক নাম দ্বাদশ-নিদান। জাগতিক দুঃখকষ্টের মূল কারণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহার উচ্ছেদ সাধন করাই এই প্রতীত্যসমুৎপাদ বা দ্বাদশনিদানের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন ব্যাধির কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহার প্রতি-বিধান করাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সেইরূপ জন্ম জরা ও মৃত্যুরূপ ব্যাধির কারণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহা হইতে জীবকুলকে মুক্তি প্রদান করাই, এই দ্বাদশ নিদানের ধর্ম্ম। সংক্ষেপে ভবব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করাই, ইহার মূল উদ্দেশ্য। এই জন্যই ভগবান বুদ্ধকে জরামরণ বিঘাতী ভিষকবর বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান কোথা হইতে এবং কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। এই অজ্ঞানের বশীভূত হইয়াই আমরা নিজ নিজ সংসারের সৃষ্টি করিতেছি ও করিয়াছি। এই অজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা ঘট্-পট্, মনুষ্য, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি। এই অবিদ্যা সম্ভূত যে জ্ঞান, উহা অজ্ঞান মাত্র। এই অবিদ্যা সম্ভূত-জ্ঞান আমাদের মনোমধ্যে যে চিহ্ন রাখিয়া যায়, তাহারই নাম সংস্কার বা perception. অতীত কালে আমরা যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, আমাদের

মনোমধ্যে সেই সকল পদার্থের জ্ঞান বা সেই সকল কার্য্যের যে ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহাকেই সংস্কার বলে। এই সংস্কার হইতে বিজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। বিজ্ঞান সাধারণতঃ পঞ্চবিধ বলিয়াই সকলে স্বীকার করেন। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, ইহাই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ইহাদের কার্য্য দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শই বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদি সংস্কার সমূহ আমাদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে দর্শন, শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত না এই জ্ঞান এক দিকে যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও অপরদিকে আবার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়ের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। এই বিজ্ঞান হইতে নামরূপের উৎপত্তি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চের প্রত্যেক পদার্থকে নামরূপে (Name and Form) অভিহিত করা হয়। পঞ্চ-স্কন্ধের সমষ্টি স্বরূপ জীব বা পুগ্দল, এই নাম রূপের নামান্তর মাত্র। নামরূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন।) ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা বা বিভিন্ন মনোভাব উৎপন্ন হয়; বেদনা তিন প্রকার, সুখ, দুঃখ ও অদুঃখাসুখ ; এই বেদনা হইতে তৃষ্ণা আনয়ন করে এবং তৃষ্ণা হইতেই উপাদান বা কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্ম ত্রিবিধ, কায়িক, বাচিক ও মানসিক। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল ভোগের নিমিত্তই পুদ্গল জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্ম হইতেই "জরামরণ-শোকপরিদেবদুঃখদৌমনস্য" ইত্যাদি ফল ভোগ করিতে হয়।

বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ আছে। অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত হইতে নিম্নলিখিত ক্রম আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

শৃনুত শ্রেয়সে সর্ব্বে যূয়ং নির্ম্মলমানসাঃ।
তৎ প্রতীত্য সমুৎপাদং বক্ষ্যামি বো যথাক্রমম্॥
অবিদ্যাবাস নৈবেয়ং দুঃখস্কন্ধস্য ভূয়সঃ
সংসারবিষবৃক্ষস্য মূলবন্ধ বিধায়িণী॥

তৎপ্রত্যয়াস্তু সংস্কারাঃ কায়বাঙ্‌মানসাত্মকাঃ।
সংস্কারোৎথম্ চ বিজ্ঞানং মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়াত্মকম্॥
তৎপ্রত্যয়ং নামরূপ সংজ্ঞাসন্দর্শনাভিধম্।
মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়স্থানং ষড়ায়তনমপাতঃ॥
ষড়ায়তন সংশ্লেষঃ স্পর্শ ইত্যভিধীয়তে।
ষট্‌স্পর্শানুভবো যস্তু বেদনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥
তয়া বিষয় সংক্লেশ রাগ তৃষ্ণা প্রজায়তে।
কামাদিষু তদুদ্ভূতমুপাদানং প্রবর্ত্ততে॥
উপাদানোদ্ভবঃ কামরূপারূপময়োভবঃ।
নানা যোনি পরাবৃত্ত্যা জাতির্ভব সমুদ্ভবা॥
জরামরণ শোকাদি সন্ততির্জাতি সংশ্রয়া।
অবিদ্যাদি নিরোধেন তেষাং বুৎপরাতিক্রমঃ॥

"বিবিধ প্রকার দুঃখ ও সংসারবিষবৃক্ষের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সংস্কার সমূহের উৎপত্তি হয়। সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ছয় ইন্দ্রিয়, উহা হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি হইতে জরামরণশোক ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। অবিদ্যাদির নিরোধ দ্বারা ক্রমে এই সমুদায়ের নিরোধ হয়॥"

জাগতিক সকল দুঃখ-কষ্টের কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান। ললিত বিস্তর গ্রন্থে এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

"চিরপ্রসুপ্তম ইমং লোকং তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিতম্
ভবান প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্থ প্রতি বোধিতুম॥"

জীব গভীর নিদ্রাবস্থা বা সুষুপ্তি হইতে যখন জাগরণের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তখন ক্রমে অর্দ্ধ জাগরণে আগমন করে। এই সময় পূর্ব্বতন স্মৃতি বা সংস্কারসমূহ অল্পে অল্পে মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে, তৎপরে পূর্ণ জাগরণের সহিত এই দৃশ্যমালা নামরূপ বিশিষ্ট

জগৎ দৃষ্টিপথে উদয় হয় ও ক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য আরম্ভ হইতে থাকে। যখন বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা স্পর্শ হয়, সেই সময় বেদনা বা মনোমধ্যে সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়, ক্রমে এই স্পর্শ ও বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, এই তৃষ্ণায় যখন ক্রমেই নূতন ইন্ধন যোগ হইতে থাকে, নশ্বর পদার্থের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়, ইহা হইতে ভব বা পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হইতে থাকে। এই তৃষ্ণা যেমন একদিকে বারম্বার জন্ম বা উৎপত্তি আনয়ন করে, অপরদিকে তেমনই বিনাশও উৎপাদন করে, কারণ উৎপত্তি হইলেই বিনাশ অবশম্ভাবী, ইহা যৌগিক পদার্থের ধর্ম্ম।

উদীচ্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিবিধ গ্রন্থ মধ্যে এই দ্বাদশ নিদান ধর্ম্মের ব্যাখ্যা বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। পরবর্ত্তিকালে মানবজীবনের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর সহিত এই দ্বাদশ নিদানের সাদৃশ স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অজন্তাগুহার চিত্রাবলীমধ্যে এই দ্বাদশ নিদানের এক চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিব্বতীয় গ্রন্থ মধ্যেও এইরূপ চিত্র দৃষ্ট হয়; তিব্বতীয় লামাগণ ইহাকে জীবনচক্র বা সংসার-চক্র বলিয়া থাকে। এই চক্রের কেন্দ্রস্থলে কপোতরূপী রাগ, সর্পরূপী দ্বেষ এবং শূকররূপী মোহ বিদ্যমান আছে। এই রাগ, দ্বেষ, ও মোহের দ্বারাই সংসারচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে। সর্ব্ব প্রকার দুঃখ-কষ্টের মূলীভূত কারণ হইতেছে অবিদ্যা। মানবজীবনের উপর এই অবিদ্যার প্রভাব প্রতিপন্ন করাই এই সকল বর্ণনা বা চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। একমাত্র প্রজ্ঞাদ্বারাই এই অবিদ্যার নাশ বা ধ্বংস সম্ভব।

দেখা গেল, জগতে যত প্রকার দুঃখ-কষ্ট আছে, সকলের মূলীভূত কারণ হইতেছে অবিদ্যা। এই অবিদ্যার নাশ বা ধ্বংস দ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই নির্ব্বাণ লাভ হয়। এক্ষণে দেখা যাউক এই, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ, ইহার নিরোধের উপায় কি? গৌতম-বুদ্ধ বলিয়াছেন, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রবেশের উপায় স্বরূপ দশটী অকুশল কর্ম্ম পরিহার

করিতে উপদেশ দিয়াছেন, মহাবস্তু নামক প্রাচীন গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তৃত বিবরণ আছে।

প্রাণাতিপাতো অধর্ম্মো, প্রণাতিপাত বৈরমণো ধর্ম্মো, অদিন্নাদানো অধর্ম্মো, অদত্তাদান বৈরমণো ধর্ম্মঃ, কামেষু মিথ্যাচারো অধর্ম্মো, কামেষু মিথ্যাচার বৈরমণো ধর্ম্মো, সুরাসৈরেয় মদ্যপানং অধর্ম্মো, সুরাসৈরেয় মদ্যপানাতো বৈরমণো ধর্ম্মো, মৃষাবাদো অধর্ম্মো, মৃষাবাদাতো বৈরমণো ধর্ম্মো, পিশুনা বাচো অধর্ম্মো, পিশুনা বাচাতো বৈরমণো ধর্ম্মো ; মিথ্যা দৃষ্টি অধর্ম্মো, সম্যগ দৃষ্টি ধর্ম্মো। দশ কুশলা কর্ম্মপথা ধর্ম্মো, দশহি মহারাজ অকুশলেহি কর্ম্মপথেহি সমন্নাগতাঃ সত্বা নরকে রূপ পদ্যন্তি। মহাবস্তু।

প্রাণাতিপাতঃ অদত্তাদান, কামমিথ্যাচার, মৃষাবাদ, পৈশুণ্য (পরনিন্দা) পারুষ্য (অপ্রিয়ভাষণ), সম্ভিন্ন প্রলাপ (অসংলগ্ন বাক্য) অভিধ্যা (পরদ্রব্যে লোভ) ও মিথ্যা দৃষ্টি। এই দশটা অকুশল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে রাগ, দ্বেষ ও মোহ দূরে যাইবে। পালি বৌদ্ধগ্রন্থে এই দশবিধ নিষেধবিধি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে দশশীল নামে প্রচলিত আছে ঃ—

১। পাণাতিপাতো বেরমনী সিক্খা পদং সমাদিযামি

প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।

২। অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

অদত্তগ্রহণ হইতে—অর্থাৎ পরদ্রব্য গ্রহণ হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৩। কামেষুমিচ্ছাচারা বেরমণী সিকখা পদং সমাদিয়ামি

কাম সমূহে মিথ্যাচার হইতে, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি দোষযুক্ত কামাচার হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খা পদং সমাদিয়ামি।

মুসাবাদ (মৃষাবাদ) অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।

৫। সুরামেরেয় মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

মত্ততার কারণস্বরূপ সুধা মৈরেয় প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করিব না......এই শিক্ষা পদ গ্রহণ করিতেছি।

৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

দিবা দ্বিপ্রহরের পর হইতে পরদিন সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কিছু আহার করিব না, এই শিক্ষা পদ গ্রহণ করিতেছি।

৭। নচ্চগীত বাদিত্র উৎসব দর্শন হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৮। মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মস্তক বিভুসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

মালা ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার, অলঙ্কারাদি ধারণ, শরীরের শোভার নিমিত্ত শরীর মার্জ্জনা প্রভৃতি হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৯। উচ্চসয়নঃ মহাসয়না বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

উচ্চশয্যা বা মহাশয্যা ব্যবহার করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। পরিমাণে একফুট অপেক্ষা উচ্চ খাট পালঙ্ক কিম্বা তুলাভরা শয্যায় শুইব বা বসিব না এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

১০। জাতরূপ রজত পটিন্‌গহনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

দশবিধ অকুশল ধর্ম্মের পরিহার বা দশশীল পালন, অষ্টমার্গ পালনের সহায়স্বরূপ। এই দশশীল বা দশবিধ কুশল ধর্ম্ম, কায়, বাক্য ও মনের উপর সংযম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে গৌতম বুদ্ধের বিশেষত্ব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কায়, বাক্য ও মন সংযমের বিভিন্ন উপদেশ প্রণালী প্রচলিত আছে। কায়, মন ও বাক্যের উপর সংযমের চিহ্নস্বরূপ এ দেশের ব্রহ্মচারিগণ—ত্রিদণ্ড ধারণ করিতেন, এখনও এ প্রথা প্রচলিত আছে। (ক্রমশঃ)

জয়দেব-চণ্ডীদাস। *

(শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

বীরভূমের আকাশ বাতাস, প্রান্তর কান্তার—জয়দেব চণ্ডীদাসের সঙ্গীতে মুখরিত। কত কত বৎসর—কত নূতনকে পুরাতন করিয়া, কালস্রোতে আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু সময় এবং তাহার অবাধ গতি বীরভূমে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতকে পুরাতন করিতে পারে নাই! কালজয়ী গীত, একদিন অজয়ের বালুময় তীরে যে মাধুর্য্যের প্লাবন বহাইয়াছিল, কেন্দুবিল্বের আকাশকে যে ভাবমোহে স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়াছিল—আজিও তাহার সুর, লক্ষ লক্ষ প্রাণে নিত্য ঝঙ্কার তুলিয়া, আপনার মহিমায় আপনি মহিমান্বিত হইয়া আছে। তাই বীরভূমে আসিয়া প্রথমেই জয়দেব-চণ্ডীদাসকে মনে পড়ে, তাঁহাদেরই কথা কহিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কি বলিব? অনেক কৃতবিদ্য সাহিত্যরথী ইঁহাদের সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। সে সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা থাকিতে নূতন কিছু বলিবারও নাই। তবে, সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা যত হয়, যে ভাবেই হয়, ততইভাল। আর এক কথা—প্রিয় তো কখনও পুরাতন হয় না।

চণ্ডীদাস বাঙ্গলার আদি কবি। অনেকের মতে নয়। হাজার বছরের বাঙ্গলা পুঁথীর নজীরও আছে। তা' থাক্, তথাপি চণ্ডীদাসই বাঙ্গলার আদি কবি। ভাবে, ভাষায়, মাধুর্য্যে, রসবিকাশের ভঙ্গীতে, চণ্ডীদাসের পদই বাঙ্গলা সাহিত্যের আদি সম্পদ্। জয়দেব আবার চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে। কিন্তু জয়দেব বাঙ্গালী কবি হইলেও, অনেকের মতে ঠিক বাঙ্গালীর কবি নহেন। তবে তাঁহার গীতি বা পদাবলী অনেকটা বাঙ্গলা-ঘেঁসা—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ভাষায় এক না হইলেও, ভাব ও রসের বিচারে আমরা অনেক সময়েই, জয়দেব চণ্ডীদাসকে এক শ্রেণীতে স্থান দিই। এক জেলায় বাড়ী বলিয়া নয়, উভয়েই এক ভাবের ঘরে বাস

---

* বীরভূম জেলায়—হেতিয়া গ্রামে 'সাহিত্যিক সম্মিলনে' পঠিত।

করেন বলিয়া ঐরূপ স্থান দেওয়া হয়। এই জন্য আমরাও জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কথা একসঙ্গেই বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্যেও এ বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। সাহিত্যে, অর্থাৎ বাঙ্গলা সাহিত্যে—খাঁটী বাঙ্গলা সাহিত্যে—মহাজন-পদাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য আমরা বিশেষভাবে দেখিতে পাই। এই গীতির ঝঙ্কারে আমরা, পূর্ব্বযুগের বাঙ্গালীর স্পন্দন অনুভব করি। সমগ্র বাঙ্গলার মধ্যে বীরভূম ও নদীয়ায়, বাঙ্গালীর এই প্রাণের সুর এক শুভ স্মরণীয় শতাব্দীতে একটী তারে বাজিয়া উঠিয়া, বাঙ্গালাকে এবং বঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছিল। নদীয়ায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং বীরভূমে শ্রীমন্নিত্যানন্দ এই সুরের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাই বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়, বাঙ্গালীর প্রাণের পরিচয়, আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন পাই, তেমন আর কোথাও পাই না। জয়দেব ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণবসাহিত্যের মুকুটমণি তাঁহারা বাঙ্গালীর চির প্রণম্য।

রসের কথা যাতে থাকে তাহাই কাব্য। (?) জয়দেব ও চণ্ডীদাস সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্মগ্রন্থ হইলেও কাব্য। কেননা উহাতে রসের কথাই আছে। তবে সুরলয়ে গীত হয় বলিয়া উহা শুধু কাব্য নহে—গীতিকাব্য। রসের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ রস—(পাঠক, চম্‌কাইবেন না)—আদিরস। কেন না সকল রসের উৎপত্তি এই আদিরস হইতে। জয়দেব চণ্ডীদাসের গীতিকাব্য আগাগোড়া নিছক্ আদিরস লইয়া। আদিরস লইয়াই মাখামাখি—আদিরসেরই ছড়াছড়ি। কাজেই, রসের হিসাবে এবং বিষয় গৌরবে জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। এই শ্রেষ্ঠ রসকাব্যের আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের বা বাঙ্গালীর প্রাণের বৈশিষ্ট্য কোথায়, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক।

অনেকের মতে জয়দেবে আদিরসের কিছু বাড়াবাড়ি! সুতরাং মধুর হইলেও, উপভোগ্য হইলেও, উহা অশ্লীল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ওকালত-নামা লইয়া শ্লীল অশ্লীলের বিচার করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই, তথাপি এ সম্বন্ধে দু'একটী কথা না বলিলে বোধহয় আমাদের বক্তব্য বিষয় বিশদ

হইবে না। এই নিমিত্তই প্রথমেই আমরা শ্লীল অশ্লীলের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

জয়দেব শিক্ষিত রুচিবাদীর নিকট ঘোর অশ্লীল! আবার মার্জ্জিত-রুচি পরম-জ্ঞানবান্ রসজ্ঞ বৈষ্ণব যাঁহারা, তাঁহারা বলেন জয়দেব পরম পবিত্র। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, কামকাঞ্চন বর্জ্জিত মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকে যাঁহার পূজা করে, সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবই নিত্য এই অশ্লীল জয়দেবের শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, উচ্চকণ্ঠে ইহার পদগান করিতেন, এই মহাগ্রন্থের পূজা করিতেন!

কেন এই মতবৈষম্য? অবশ্য ইহার কিছু নিগূঢ় কারণ আছে। কি সে কারণ?

জয়দেব আদিরসাশ্রিত। এই আদিরস কি? যে রস সৃষ্টির আদি বা সৃষ্টির উৎপত্তির হেতু, তাহাই আদিরস। এই রস হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে। ক্রিয়মান ভগবান্ রসস্বরূপ, সর্ব্বরসের আধার। প্রকৃতির সংযোগে প্রথমে এই আদিরসের বিকাশ; এই রসই জগতের প্রাণরস; আর সমস্ত রসই এই রসের অধীন। এই রস যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রাণপূর্ণ এ সংসারের আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না, সৃষ্টির বিকাশই হইত না। আদিরসকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির ধারা অব্যাহত আছে; এবং এ রস যতদিন না শুকাইবে ততদিন এই ধারা অনন্ত অনন্তকাল প্রবাহিত হইবে। এই রস ফুটিয়া উঠে—পুরুষ প্রকৃতির মিলনেচ্ছায় পরস্পরের আকর্ষণে। এ আকর্ষণের শক্তি অমোঘ সমস্ত প্রাণী জগতে এই আকর্ষণের—এই মিলনেচ্ছার লীলা চলিতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ইহার গতি অবাধ, দুর্ব্বার! পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—এমন কি ফলপুষ্প প্রসূ তরুলতা বৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্য পর্য্যন্ত এই রসে মজিয়া আছে, ডুবিয়া আছে, ভুলিয়া আছে। ঈশ্বর যতদিন নিষ্ক্রিয়, ততদিন এ রসের সন্ধান ছিল না; যেই এই রসকে আশ্রয় করিয়া এক তিনি বহু হইলেন, অমনি চরাচরে এই রস উথলিয়া উঠিল, রসে জগৎ ডুবিল, মহাপুরুষ মহাপ্রকৃতির আকর্ষণে মিথুন হইলেন, যুগ্ম হইলেন,—এই রূপে ইচ্ছা বা বাসনা বা কামনার জয় হইল। তাই কাম ভগবানের

মানস-সঞ্জাত। এই কাম বা মিলনেচ্ছা, বা আকর্ষণ জগতের সৃষ্টি করিতেছে, জগৎকে পোষণ করিতেছে, জগৎকে শাসন করিতেছে—তাই "মন্মথঃ দুর্নিবারঃ।"

আদিরস কি মোটামুটি একটা বুঝিলাম। এই রসের নানা বিভাগ আছে। কিন্তু সে আলোচনার স্থান এ নয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে, এই আদি রসের নানা বিভাগের মধ্যে মধুর রসেরই প্রাধান্য। পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে যে রস তাহাই মধুর রস। কিন্তু এই মিলনাত্মক রস বড় মারাত্মক! কেন না, ইহা শ্লীলও বটে, আবার অশ্লীলও বটে। কিন্তু শ্লীলই হউক আর অশ্লীলই হউক, ইহার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি কাহারও নাই। নিষ্কৃতি হইলে রুচিবাদী আর থাকেন না বা জন্মান না। কেন না এই মিলন-সঞ্জাত মধুর রসই জীবকে এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন।

সৃষ্টিতে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এই রসেরই প্রাধান্য। জগতের সমস্ত কাব্য সাহিত্যে এই মধুর বা আদি রসেরই লীলা, ইহারই অভিব্যক্তি, ইহারই বহু বিকাশ। যেমন কানু ছাড়া গান নাই, তেমনি এই আদিরস ছাড়া কাব্য নাই, নাটক নাই, উপন্যাস নাই। মূলে রস—এই আদি। তবে তাহার বিন্যাস নানা মূর্ত্তিতে। ইহাই সৃষ্টিবৈচিত্র্য! ইহারই এক নাম কাম—অপর নাম প্রেম। প্রেম ততক্ষণ, যতক্ষণ আকর্ষণের টানাটানি চলিতেছে। অপিচ, যখন বহু হইবার কামনায় পরস্পরের আত্মদানে এই প্রেম পরম চরিতার্থতা লাভ করে, তখনই ইহা কামনামে অভিহিত হয়। এই যে মিলনের ইচ্ছা—এই যে আপনাকে বিকাশ করিবার—বহু হইবার ইচ্ছা—ইহা মানুষের সহজাত—ইহাই সহজিয়া। কিন্তু ইহা কুটিল হইতেও কুটিলতর হয় অপ্রাকৃত হয়, ব্যবহার দোষে, যখন পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পরের আকর্ষণের মধ্যে কোন বাধা আসিয়া পড়ে, যখন এই মিলনেচ্ছার গতি আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই সহজ গতি ও তাহার আঘাত হইতেই প্রধানতঃ জগতের সমস্ত নাটক, কাব্য, উপন্যাস বা রসগ্রন্থের জন্ম। এই আঘাত হইতে Dramatic এর উৎপত্তি, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। ইহা বিচিত্র, অপূর্ব্ব

পরম উপভোগ্য, এক কথায়—মোহকরী! এই রসকে আশ্রয় করিয়াই জয়দেবের পদাবলী রচিত।

আমাদের দেশে একটা বড় কথা ছিল—"অধিকার"। অনধিকার-চর্চ্চার আমাদের শাস্ত্রে ছিল বড় কড়া শাসন। বিদ্যা শিখিব, তাহাও অধিকার বুঝিয়া। সকল বিদ্যা সকলের পক্ষে নয়; গুরুশিষ্যের মধ্যেও আবার অধিকার বিচার ছিল। এই অধিকার বিচার ছিল—আমাদের সকল কার্য্যে, সকল বিদ্যা অভ্যাসে; এমন কি ঈশ্বরারাধনাতেও প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র অধিকার ছিল। এই নিমিত্তই এ দেশে নানা ধর্ম্মমতের সৃষ্টি। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার উদার সাম্যনীতির প্রভাবে এ অধিকার বিচার উঠিয়া গিয়াছে। এখন আর অধিকারী অনধিকারী নাই, গুরুপরম্পরায় বিদ্যা আর দান করা হয় না, মন্ত্রগুপ্তির দিন গত হইয়াছে। ছাপাখানা ইউনিভার্সিটীর কল্যাণে আমরা এখন পেটে সয় বা না সয়, ভূরিভোজন করিতেছি। এই অভিনব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচিও বদলাইয়াছে, আমরাও বদলাইয়াছি।

কবে, কোনদিন হইতে এই বদলান সুরু হইয়াছে, কখন কোন সময়ে আমরা কিরূপ বদলাইয়াছি, তাহার পরিচয় পাই আমাদের জাতীয় সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারা, ধারাবাহিক রূপে আলোচনা করিলে এই পরিবর্ত্তন সহজেই ধরা পড়ে। এবং এই পরিবর্ত্তন ধরিতে পারিলেই আমরা বুঝিতে পারিব জয়দেব-চণ্ডীদাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, জয়দেব অশ্লীল কিনা, এবং জয়দেব চণ্ডীদাস এক ভাবের ঘরে বাস করিলেও উভয়ের সুর একই স্থান হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে। কিন্তু এবিচার বিশ্লেষণ করিতে হইলে অনেক সময়ের প্রয়োজন; তাহা আমাদের নাই। আমরা ইসারায় একটু সুর ধরাইয়া দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব, নহিলে পুঁথী বাড়িয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা ইংরাজের আমলে বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছি এবং সে বদলানর গতি এত দ্রুত যে আমরা এখন ঠিক বহুরূপী! কোনদিকেই—কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে, কি politics এ, কি সামাজিক

আচার ব্যবহারে, কি অশনে বসনে, বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব রূপ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বলিতে হয়, পূর্ব্বের রূপ হারাইয়া আমরা এখন অপরূপ হইয়াছি। মুসলমানের আমলে এমনটী ছিলনা, এমনটী হয় নাই।—কেন?

কারণ, মুসলমানেরা আমাদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের ভাব কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। Mentality টা প্রায় বজায় ছিল।—কেন পারেন নাই? পারেন নাই, কারণ তাঁহাদের সাহিত্য কিছু ছিল না; তাই আচার ব্যবহারগত সামান্য পরিবর্ত্তন ভিন্ন আমাদের সাহিত্য, আমাদের তখনকার ভাবের ঘরে, মুসলমান প্রভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। এই নিমিত্ত বহু শতাব্দীর মুসলমান শাসনেও আমাদের সাহিত্যের ধারা কিছুই বদলাই নাই। বদলাইতে আরম্ভ হইল ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে। ইংরাজ এখানে আসিলেন—নানা বিদ্যা-ভরণভূষিত, দর্শন-বিজ্ঞানপ্রভা-সমন্বিত, কাব্য-নাটক, গীতি-কবিতা ও উপন্যাস-সমাযুক্ত, এক মহাপ্রভাবশালী জাতি বিবিধ পণ্যের সহিত এক বিরাট বিস্ময়কর সভ্যতা ও সাহিত্য সম্ভার লইয়া,—যাহা দেখিবা-মাত্র আমরা মুগ্ধ হইলাম, অবাক্ হইলাম, নিজেদের ধিক্কার দিয়া শ্রীচরণে প্রাণ বিকাইলাম! অমনি, অতি প্রাচীন দিন হইতে আমাদের সাহিত্যের স্বাদে যে রস প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে এই ইংরাজের আমদানী নূতন রস হুড়্‌হুড়্ করিয়া মিশিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের ধারা বদলাইল, প্রাচ্যের ভাব প্রবাহে পশ্চিমের লোণা জল ঢুকিয়া আমাদের শিক্ষা বদলাইল, সংস্কার বদলাইল, হৃদয়, রুচি, দৃষ্টি সব বদলাইল; বৈষ্ণবযুগে যাহা শ্লীল, তাহা ঘোর অশ্লীল হইল। আমা-দের পূর্ব্বপুরুষেরাও অন্তরীক্ষ হইতে আমাদের এই অপরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; আমরা ছিলাম "নর", তাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ নর!" এই টুকুই আমাদের ইদমধিকম্। ইহাই আমাদের পুরস্কার!

এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনের যুগে আমাদের সাহিত্যের রূপ বদলাইল। নানা নূতনের সহিত, আমরা রস-সাহিত্যে একটা নূতন জিনিষ ইংরাজের

নিকট পাইলাম—Tragedy বিয়োগান্ত রস। আর পাইলাম আদি রসের মধ্যে, মধুর রসের মধ্যে এক বিকট জ্বালাময় রস—করুণ-বীভৎস-ভয়ানক-মিশ্রিত কটু-তিক্ত-কষায় ঝালের Mixture। প্রেমে মিলনে, আঘাত নয় ব্যাঘাত, তীব্র বিষস্বরূপ ঈর্ষা, অসূয়া—Zealousy, Depression—মনোভঙ্গ। এবং তাহার Nemesis অপঘাত, হাহাকার, মৃত্যু, ধ্বংস!' আমাদের রসসাহিত্যে, কি সংস্কৃতে, কি বাঙ্গালায়, এতদিন এ Tragedyর প্রচলন ছিল না। প্রেমে ঈর্ষা ছিল, কিন্তু তাহাতে বিষ ছিল না। এই যুগের সাহিত্যেই তাই আমরা ভূরিভূরি পাই গলায় দড়ী, বুকে ছুরী, বন্দুক পিস্তল, আফিম, Prussic Acid, জলে ডোবা, ছাদ থেকে লাফিয়ে মরা, ইত্যাদি। নানা মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়া এইরূপ হাহাকারেরই একটা না একটা মূর্ত্তি আধুনিক সাহিত্যে বাহির হইয়া পড়ে, এবং তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ, ও রুচিকর হয়। সাহিত্যের এই অপরূপ নবমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা অবাক বিস্ময়ে সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের তুলনায় গাহিলাম—"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি!"

প্রেমের এই বিকৃত মূর্ত্তি আমাদের সাহিত্যে কেন ছিল না, সে আলোচনা করিতে গেলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রণয়-কল্পনায় প্রভেদ কোথায় এবং কেনই বা প্রভেদ সেই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু এই রস আলোচনা ক্রমশঃ নীরস হইয়া উঠিতেছে, তথাপি অল্প কিছু বলিয়াই আমার ইহার শেষ করিব।

সংস্কৃত সাহিত্যে—কাব্য-নাট্যে নায়কের একাধিক নায়িকা আছে, কিন্তু তাহারা ঈর্ষা পরবশ হইয়া কখনও আত্মহত্যা করে নাই, কিম্বা, কোন বিপ্লবও বাধায় নাই। মান অভিমান সবই আছে, নাই মৃত্যুর বাড়াবাড়ি।—কেন? এখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, Psychologyর প্রভেদ। পশ্চিম জড়বাদীর দেশ, রক্তমাংস লইয়াই উহাদের কারবার। আমাদের দেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ; আমাদের প্রেম এ জগতে শেষ হয় না, আমাদের মিলন এ জীবনে ফুরায় না, পরজগতেও তাহার জের চলে—কারণ আমরা পরজীবন মানি, কর্ম্মফল মানি, আত্মায় আত্মায় মিলন মানি, অদ্বৈতবাদ—দ্বৈতবাদ মানি। আমরা প্রেমের বিরাট আশ্রয়-

স্থল ভগবান্ ইহা জানিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় প্রেমের চরম আদর্শ স্থাপন করিয়াছি। তাই আমাদের ভগবান্—নটবর, নায়কশ্রেষ্ঠ। আর শ্রীমতী বা মহাপ্রকৃতি পরমা নায়িকা। তন্ত্রেও এই আদর্শ। রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমই আমাদের জাতীয় প্রেমের আদর্শ, আর ইহারই অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার প্রেমকল্পনা, তাহাদের রসবিকাশের পদ্ধতি ও গতি এবং পরিণতি। কাজেই, প্রেমে বিকট ভাব আমাদের সাহিত্যে নাই, আমাদের সাহিত্য ওরসে বঞ্চিত। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রেও তাই—Tragedy নিষিদ্ধ। কিন্তু সে কথা থাক্।

এখন পূর্ব্বের কথা—জয়দেব কতটা শ্লীল কতটা অশ্লীল আমাদের জাতীয় মাপকাঠীতে! জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রায়শঃ প্রধানতঃ রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা, রক্তমাংসের ক্ষুধার উপরই স্থাপিত। আর সেই জন্যই অনেকের চক্ষে, পাশ্চাত্য মাপকাঠীতে, ইহা অশ্লীল। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। যখনই পরম পিতা ও পরম মাতা নায়ক নায়িকা, তখনই ক্ষুদ্র বিরাটে পরিণত হইয়াছে; এবং তাহা অশ্লীল নয়। কেন না, এই প্রেমেই সৃষ্টির আদিরস নিহিত। মানুষকে লইয়া এই প্রেমচিত্র আঁকিলে ইহা অশ্লীল হইত। বিশ্বপিতা বিশ্বমাতার প্রেমলীলা বলিয়াছেন ভক্ত-অনুরাগী ধার্ম্মিক, উদ্দেশ্য বুঝিলে ইহা অশ্লীল হয় না, হইতেও পারে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এ দেশ হইতে তন্ত্র শাস্ত্রকে দ্বীপান্তরে পাঠাইতে হইত। বৈষ্ণবগ্রন্থে পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির মিলনের শেষ রাসে,—রসের চরম অবস্থা। তন্ত্রেও এই মিলন শিবশক্তির মিলন বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা কেবল ভাবে এই মহামিলনের পূজা করি না, symbol গড়িয়া এই মিলনের পূজা করি।

ইংরেজী সাহিত্যের প্রকোপে, প্লাবনে, প্রভাবে, আমরা ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে আমাদের জাতীয় কল্পনার যে বিশিষ্টতা, মুকুরে প্রতিবিম্বিত ছায়ার ন্যায় ফুটিয়া উঠিত, তাহা আর নাই—আর তাহা হইবেও না। আর এই বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছি বলিয়া জয়দেবকে এখন আমরা অশ্লীল বলি।

চণ্ডীদাসের কথা স্বতন্ত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একই প্রেমের দুইটী রূপ—প্রেম ও কাম। জয়দেবে এই কাম-চিত্র। কিন্তু ইহা মহা-কাম—অশ্লীলতা বর্জ্জিত! চণ্ডীদাসে কেবল প্রেম। এ প্রেমে রক্তমাংসের ক্ষুধা নাই, প্রাণের ক্ষুধা আছে। আকর্ষণ আছে, মিলন আছে, কিন্তু রতি এখানে বিরতি হইয়াছেন। কবির ভাব এখানে সৃষ্টির উপরে চলিয়া গিয়াছে, দেহ মন আত্মা সব একত্রে মিশিয়া গিয়াছে,—লয় হইয়াছে। সম্বন্ধ নাই, কায়িক কার্য্য নাই—মহাসমাধিতে মহাপুরুষ ও মহামায়া সমাচ্ছন্ন! চণ্ডীদাস তাই বলিতে পারিয়াছেন 'হে রজকিনী! তুমি আমার সব, গুরু, পিতা-মাতা, প্রণয়নী সব।' এক বহু হইয়াছিলেন, এখানে বহু এক হইয়াছেন। দুঁহু মিশিয়া গিয়াছে; আর তাঁহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই আমাদের মনে হয়, জয়দেব যেখানে সুর ছাড়িয়াছেন, চণ্ডীদাস তাহার পর হইতে সেই সুর ধরিয়াছেন। তাই জয়দেব হইতে চণ্ডীদাসের স্বরগ্রাম আরও উচ্চে, উহা আরও বিরাট, আরও মহান্। তাই চণ্ডীদাসের প্রেমে "কামগন্ধ" নাই, উহা খাঁটী সোণা। পৃথিবীর গীতিকাব্যে রসকাব্যে তাই চণ্ডীদাসের তুলনা নাই।

এই যে সুর—পবিত্র-উচ্চ-মহান-চিরভাস্বর—ইহা জড়বাদীর দেশে নূতন। ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না। অধুনা এই রসের ছিটে ফোঁটা, অনুকরণে, অনুবাদে, বিকল্পে উহারা আস্বাদন করিয়া মোহিত—অবাক্! তাই ভরসা হয়, এমন দিন আসিবে, যখন ঐ জড়-বাদীর দেশ আমাদের সাহিত্যের এই অনাবিল ধারায় ডুবিবে মজিবে, উহাদের দেশের সাহিত্যের ধারাও বদলাইবে। আমরা এই পরম উপভোগ্য রসমাধুর্য্য—যাহার কল্পনায় আনন্দ, আলোচনায় আনন্দ, বিকাশে আনন্দ, বিন্যাসে আনন্দ, যাহা পাঠককে কেবল আনন্দমাত্রই দান করে, যাহার উদ্দেশ্যই কেবল আনন্দ, অব্যভিচারী আনন্দ দান—তাহা হারাইতে বসিয়াছি। হারাইতেই হইবে—উপায় নাই। বহুকালের ঝড়ে সব ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল,—প্রাণ হারাইয়াছিল, শবে পরিণত হইয়াছিল, আবার গোড়া হইতে হাতে খড়ি আরম্ভ হইয়াছে; তাই এ

জড়বাদের উপর আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। এখন ভাব চলিবে, যতদিন অধ্যাত্মবাদ আবার আত্মপ্রক * না করে—ততদিন ইহা অবাধে চলিবে। কিন্তু এ কথাও ধ্রুব সত্য, এ জড়বাদের উপর সাহিত্যের বনিয়াদ্ চিরদিন থাকিবে না। যদি থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছি, পূর্ব্বের আমরা ধ্বংস হইয়াছি, জাতি অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। পশ্চিমের অনুকরণে এখন আমরা যাহাই গড়িতেছি তাহাই জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। Politics আমাদের দেশে ছিল না; (?) সাহিত্যের নূতন ধারার সঙ্গে, ইহাও আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি কিন্তু ইহাও টিঁকিবে কি না সন্দেহ। কেন না, ইহাকে এখনও আমরা খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। তাই Politicsএর মধ্যে non-violence, non-co-operation আনিতে হইয়াছে। এই non-violence non-co- parction ও অধ্যাত্মবাদ। যদি এ দেশে পশ্চিমী politics টিকিয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা বৈশিষ্ট্য হারাইব, এ জাতি আর থাকিব না, একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে। এই তেলে-জলে মিশিতেছে না বলিয়াই politicsএ এত ডিগবাজী চলিতেছে—leader কেহ টিকিতেছেন না। কিন্তু সে কথার আলোচনার এ স্থান নয়, আর আমরা তাহার অধিকারীও নই।

জয়দেব-চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার বাকী রহিল; মোটা-মুটি কিছু কিছু বলিয়া আমরা উপস্থিত নিরস্ত হইলাম। ইচ্ছা রহিল এই রসগ্রন্থ দ্বয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও কিছু বলিব। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের মাঝখানে আর একজন কবি আছেন, তিনিও এই একঘরের লোক। তাঁহার কথা কিছু বলিবার আমাদের অবসর হইল না। তিনি বিদ্যাপতি। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের সুরের মাঝখানে তাঁহার সুর। সে সুরও বিচিত্র, অপূর্ব্ব, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং জয়দেব অশ্লীল কি না, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা আপাততঃ বিদায় হইলাম।

যতিরাজ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

জীব দুঃখে দ্রবমান্— কে তুমি যতি প্রধান
বিবস্বান্—ভূতলে উদয়।
নয়নে অরুণ ভাতি, হৃদয় করুণ অতি,
ভীতি শূন্য—মূরতি বিস্ময়॥
রূপে জিনি রতি পতি, রসনাগ্রে সরস্বতী,
বেদ বিধি বদনে বিস্তার।
বিশ্ব-প্রেম-বিপ্লাবন্ হত শাস্ত্র প্রহরণ,
প্রাণার্পণ—জীবের উদ্ধার॥
গৈরিক বসনধারী, উষ্ণীষ মস্তকোপরি
দণ্ড কমণ্ডলু পদ্ম করে।
মুক্তিরূপা মূর্ত্তি ধরি, পদে ধরা ত্যাগ করি,
কে তুমি ফিরিলে দ্বারে দ্বারে
চির শান্তি পারাবার— কটাক্ষে মোক্ষের দ্বার,
খুলে দেও পদাশ্রিত জনে।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু— দয়াময় দীনবন্ধু
কৃপাবিন্দু মাগি শ্রীচরণে॥
মহাসিংহ পরাক্রম— ভয়ে ধায় চন্দ্র যম,
মহাতমো নিরস্ত মিহির।
বিবেক কৃপাণ কর, বীরদর্পে অগ্রসর,
পদভরে টলে শেনশির॥
মহা রুদ্র অবতার, অভীরভী হুহুঙ্কার,
দিগ্‌দেশ কাঁপে ঘনে ঘনে।
আসমুদ্র ধরাতল পদভরে টলমল
"উত্তিষ্টত" গর্জ্জন গগনে॥
বিভূতি ভূষণ কান্তি, জটায় জলদভ্রান্তি
তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড বিদ্রাবন।
"হর হর বোম্ বোম্"— স্তিমিত তিমির স্তোম
রবি সোম নিরস্ত কিরণ॥
অখণ্ড মণ্ডলে পুনঃ চমকিল জ্যোতিঃ ঘন
ভূলোকে সঞ্চারি মহাপ্রাণ্।
স্মৃতি রাখি ধরাতলে চকিতে মিশিয়া গেলে,
কাঁদাইয়ে অকৃতি সন্তান্

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

আমেরিকা।

৪ঠা এপ্রিল, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই মাত্র তোমার পত্র পেলাম। কোন ব্যক্তি আমার অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও তুমি তাতে ভয় পেয়োনা। যতদিন প্রভু আমাকে রক্ষা কর্‌বেন, ততদিন অভেদ্য প্রাচীরের মত আমি অটুট থাকবো। তোমার আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা বড় অস্পষ্ট। মিসেস হেল ছাড়া গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে এখানে উদারভাব ও চিন্তাও যথেষ্ট আছে। মিঃ লণ্ড বা ঐ ধাঁজের লোকেরা গোঁড়া পর্ব্বসমূহে নিজের খরচায় এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে কুঁদে তারপর বাড়ী ফিরে যায়। এ একটা প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ ব্যক্তিই ধর্ম্মের 'ধ'রও ধার ধারে না। শতকরা ৯৯.৯ লোক ঐ ধরণের। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিপত্তি কেবল উহা এদের দেশের ধর্ম্ম বলে, তা ছাড়া আর কিছু নয়। খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুরা এখানে কোনরূপ চেষ্টা বেষ্টা করলে তার ফলে একটা গুরুতর কেলেঙ্কারি হয়ে দাঁড়াবে, কারণ, গোঁড়ারাও দলত্যাগীর উপর একটা ঘৃণা পোষণ করে।

প্রিয় বৎস সাহস হারিও না, আমি—আয়ারকে একখানি পত্র লিখেছিলাম, তোমাদের পত্রে উহার কোন উল্লেখ না দেখে মনে হয়, তোমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জান না, আর আমি তোমাদের নিকট যে কতকগুলি বই চেয়ে ছিলাম, তার সম্বন্ধেও তুমি কিছু লেখনি। যদি তোমরা সব সম্প্রদায়ের ভাষ্যের সহিত বেদান্তসূত্র আমায় পাঠাতে পার ত ভাল হয়, সম্ভবতঃ সামান্না তোমায় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। আমার জন্য এক বিন্দুও ভয় পেয়ো না।

তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন—ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে? ভারত ত আমার ভাবরাশি বিস্তারের সাহায্য করতে পারবে না। এই দেশ আমার ভাব নেবে, এখনও খুব নিচ্ছে। আমি যখন আদেশ পাব, তখন ফিরে যাব। ইতিমধ্যে তোমরা খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে কাজ করে যাও। যদি কেউ তোমার বা আমার উপর আক্রমণ করে, তা হলে ওসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ করে যাও—সে লোকটার অস্তিত্বই ভুলে যাও। যদি কেউ ভাল মন্দ বলে, তবে পার ত তাকে ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ দাও আর কাজ করে যাও। আমার ভাব হচ্ছে, তোমরা এমন একটা শিক্ষালয় স্থাপন কর, যেখানে ছাত্রগণকে ভাষ্যসমেত বেদবেদান্ত সব পড়ান যেতে পারে। উপস্থিত এই ভাবে কাজ করে যাও, তা হলেই বোধ হয় এক্ষণে মান্দ্রাজীদের কাছে খুব বেশী সহানুভূতি পাবে। এইটী জেনে রেখো যে, যখনই তুমি দুর্ব্বল বোধ কর তখন তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট কোরছো, তা নয়, তুমি কাজেরও ক্ষতি কোরছো। অসাম বিশ্বাস ও ধৈর্য্যই কৃতকার্য্য হবার একমাত্র উপায়।

সদা আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

পুঃ—জিঃ জিঃ, ডাক্তার, কিডি, বালাজি এবং আর সবাইকে আনন্দ করতে বল—তারা যেন কারও বাজে কথা শুনে মনকে চঞ্চল না করে—তোমরা সকলে নিজেদের আদর্শকে খুব দৃঢ় করে ধরে থাক আর অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল কোরো না—সত্যের জয় হবেই হবে। সর্ব্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা তাদের উপর শাসন করতে অথবা ইয়াঙ্কিরা যেমন বলে, অপরকে "boss" করতে যেও না—সকলের দাস হও।

বিঃ—

নং ৬

আমেরিক।

৬ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা এবং রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের প্রথমভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একখানা পত্র পেয়েছিলাম।—আয়ারের কাছ থেকেও একখানা পত্র পেয়েছি।

আমি ভাল আছি—কাজ কর্ম্ম সেই পূর্ব্বেরই মত চলেছে। তুমি লণ্ড বলে একজনের বক্তৃতার কথা লিখেছ। তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তার কিছুই জানি না। হতে পারে তিনি খ্রীষ্টীয়ান চার্চ্চের একজন বক্তা। কারণ, তিনি যদি বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিতেন, তা হ'লে আমরা তাঁর কথা নিশ্চয় শুনতাম। হতে পারে, তিনি কোন কোন খবরের কাগজে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট বার করেছেন এবং ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আর মিসনরিরা তাঁর সাহায্যে নিজেদের পসার জমাবার চেষ্টা কচ্ছেন। আমি তোমার চিঠির সুর থেকে ত এই পর্য্যন্ত অনুমান করছি। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণের ভিতর এমন কিছু সাড়া পড়ে যায় নি, যাতে আমাকে তার জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কারণ, তা হলে এখানে প্রত্যহ আমাকে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এখন এখানে ভারতের খুব সুনাম বেজে গেছে এবং ডাঃ ব্যারোজ এবং অন্যান্য গোঁড়ারা সবাই মিলে এই আগুনটা নিভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়তঃ, গোঁড়াদের ভারতের বিরুদ্ধে এই বক্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি রাশি রাশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই। এখানকার গোঁড়া নরনারীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল কুৎসিৎ গল্প রচনা করে প্রচার করছে, তার কিছু যদি শুন, তা হলে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এখন তোমরা কি বলতে চাও, এখানকার কুচরিত্র নর-নারীরা আমার উপর যে সকল কুৎসিৎ, পাশব, কাপুরুষোচিত আক্রমণ করছে, সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে সেইগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আত্মসমর্থন করে যেতে হবে? এখানে আমার কতকগুলি অকপট বন্ধু আছেন, তারা

মাঝে মাঝে উঠে এঁদের কথার জবাব দিয়ে এঁদের চুপ করিয়া দেন। আর হিন্দুরা যদি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমায় তবে হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন করতে আমার এত মাথা ঘামাবার দরকার কি বল? তোমাদের বিশ কোটি হিন্দু—বিশেষ যাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে এত গর্ব্বিত—তাঁরা কি কর্চ্ছেন বল দেখি? কেন, লড়াই করবার ভারটা তোমরা নিয়ে আমাকে কেবল প্রচারকার্য্য ও উপদেশের জন্য ছেড়ে দাও না কেন? এখানে আমি দিনরাত একটা শত্রুর জাতের ভিতর থেকে প্রাণপণে কাজ করবার চেষ্টা করছি প্রথমতঃ নিজের অন্নের জন্য, দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ভারতীয় বন্ধুগণকে সাহায্য করবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা। ভারত কি সাহায্য পাঠচ্ছে বল? জগৎ কি ওদেশের মত স্বদেশ-হিতৈষণা শূন্য আর কোন জাত দেখেছে? যদি তোমরা দ্বাদশজন সুশিক্ষিত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারের জন্য পাঠাতে এবং কয়েক বৎসরের জন্য তাদের এখানে থাকবার খরচ জোগাতে পারতে, তা হলে তোমরা ভারতের পক্ষে নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার উপকারই করতে পারতে। যে কোন ব্যক্তি নৈতিক হিসাবে ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, সে রাজনৈতিক বিষয়েও তার বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য জাতেরা তোমাদের উলঙ্গ বর্ব্বর জাতির মত মনে করে এবং সুতরাং ভাবে চাবুক মেরে তোমাদের ভিতর সভ্যতা ঢোকাবে। তোমরা কুকুর বিড়ালের মত কেবল বংশবৃদ্ধি করতে পার। * * যদি তোমরা বিশ কোটি লোক দুষ্ট মিশনারিদের ভয়ে ভীত হয়ে কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক এবং একটা কথা বলতেও সাহস না কর, তবে এই সুদূর দেশে একটা লোক আর কি করবে বল? আমি তোমাদের জন্য যতটা করেছি, তোমরা তারও উপযুক্ত নও। তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন করে কেন পাঠাও না? কে তোমাদের ধরে রেখেছে? দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সব বিষয়ে কাপুরুষের জাত—পশুতুল্য—তোমরা যেমন, তদ্রূপ ব্যবহার পাচ্ছ—দুটো জিনিষে কেবল তোমাদের লক্ষ্য—কাম ও কাঞ্চন। তোমরা একজন সন্ন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াই করাতে

চাও আর তোমরা নিজেরা সাহেব লোকের, এমন কি মিশনরিদের ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে !!! আবার তোমরা বড় বড় কাজ করবে—হাঁ !!! কেন, তোমরা কয়েকজন মিলে বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করে বোষ্টনের এরিনা পাবলিশিং কোম্পানির কাছে পাঠাও না। এরিনা একখানি সাময়িক পত্র—উহা খুব আনন্দের সহিত উহা ছাপাবে আর হয়ত উহার পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমাদের যথেষ্ট টাকা দেবে। তা হলেই ত চুকে গেল। যখনই তোমাদের মিসনরিদের আক্রমণে আহাম্মুকের মতন লেখবার ইচ্ছা হবে, তখনই তোমরা এই কথাটা ভেবো ! এইটে মনে রেখো যে, এ পর্য্যন্ত যে সব হতভাগা হিন্দু এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে, তারা অর্থ বা সম্মানের জন্য নিজের দেশ ও ধর্ম্মের কেবল কু-সমালোচনা করেছে ; আরও এইটে মনে রেখো, আমি এখানে নাম যশ খুঁজতে আসি নি—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার নামযশ হয়ে পড়েছে। ভারতে গিয়ে আমি কি কোরবো ? কে আমায় সাহায্য করতে আসবে ! ভারতের কি দাসসুলভ স্বভাব বদ্‌লেছে। তোমরা ছেলে মানুষ—ছেলে মানুষের মত কথা বলছো—তোমরা কিসে কি হয় তা জান না। মান্দ্রাজে এমন লোক দেখি না যারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সংসার ত্যাগ করবে ! দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি একদিনও একসঙ্গে চলতে পারে না। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছি—আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আশাই করে নি, তাই আমি তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইট মেরেছে, তার বদলে আমি পাটকেল মেরেছি—সুদে আসলে। এখন তারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে—কিন্তু আমি কখনও তোমাদের মত কাপুরুষ হবো না। আমি কাজ করতে করতেই মরবো—পালাব না।

কিন্তু এই দেশে হাজার হাজার লোক রয়েছে যারা আমার বন্ধু এবং শত শত ব্যক্তি রয়েছে যারা মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করবে। কপট হিন্দু শিষ্যগণের মত নহে। প্রতি বৎসরই এদের সংখ্যা বাড়বে আর যদি এখানে আমি তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করি, তবে আবার ধর্ম্মের আদর্শ, জীবনের আদর্শ সফল হবে—বুঝলে ?

এখানে যে সার্ব্বজনীন মন্দির (Temple Universal) প্রতিষ্ঠা হবার কথা উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে আর বড় উচ্চবাচ্য শুনতে পাই না, তবে মার্কিন জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্কে আমার আড্ডা গেড়ে বসেছে এবং আমার কাজ চল্‌তে থাকবে। আমি শীঘ্র আমার শিষ্যদের যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তির জন্য একটি গ্রীষ্ম কালোপযোগী নির্জ্জন স্থানে লয়ে যাচ্চি—যাতে আমার অবর্ত্তমানে তারা কাজ চালাতে পারে। এই ভাবে আমার কাজ চলেছে। আমার ভাবসমূহ ভারতে ছড়াতে বা বাড়তে পারবে না।

যাহা হউক বৎস আমি তোমাদের যথেষ্ট তিরস্কার করেছি। তোমাদের তিরস্কার করার দরকার হয়েছিল। এখন কাজে লাগ—কাগজ-খানার জন্য এখন উঠে পড়ে লাগ। আমি কলিকাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি—মাসখানের ভিতর তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারবো। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাবো, কিন্তু পরে নিয়মিতরূপে কিছু কিছু পাঠাতে পারবো। এখন কাজে লাগ। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেয়ো না। আমি নিজের মস্তিষ্ক এবং দৃঢ় দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব কোরবো। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি কলকেতা ও মান্দ্রাজ দু'জায়গায় কাজের জন্য টাকার যা দরকার তা নিজেই রোজগার কোরবো। রামকৃষ্ণকে অবতার বলে মান্‌বার জন্য লোককে বেশী পীড়াপীড়ি কোরো না। আমি এখন তোমাদের কাছে আমার নূতন আবিষ্কারের কথা বোল্‌বো। সমগ্র ধর্ম্মটাই বেদান্তের মধ্যে আছে—অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটী সোপানের ভিতর আছে—একটী আর একটীর পর এসে থাকে। এই তিনটী মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটী সোপানস্বরূপ। ইহার প্রত্যেকটীরই প্রয়োজন আছে; এই বেদান্ত—অর্থাৎ ধর্ম্মের এই সারভাগ। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচারব্যবহার ও ধর্ম্মমতের ভিতর দিয়ে যা দাঁড়াইয়াছে, সেইটা হচ্চে হিন্দুধর্ম্ম। ইহার প্রথম সোপান অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভিতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম্ম—আর সেমিটিকজাতিদের ভিতর হয়ে দাঁড়িয়েছে

মুসলমান ধর্ম্ম। অদ্বৈতবাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ধর্ম্ম বলতে বোঝায় বেদান্ত—বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে উহার প্রয়োগ বিভিন্নরূপ অবশ্যই হবে। তোমরা বলিবে যে, মূল দার্শনিকতত্ত্ব যদিও এক, তথাপি শাক্ত, শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির ভিতর উহা বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করে নিয়েছে। এখন তোমাদের কাগজে এই তিন বাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে উহাদের মধ্যে একটী অপরটীর পর আসে, এই ভাবে উহাদের সামঞ্জস্য দেখাও—আর আনুষ্ঠানিক ভাবটা একেবারে বাদ দাও —অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবটার প্রচার কর, লোকে সেগুলি তাদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদিতে লাগিয়ে নিক্। আমি এই বিষয়ে এক খানি বই লিখিতে চাই—সেই জন্য আমি সব ভাষ্যগুলি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাছে উপস্থিত কেবল রামানুজভাষ্যের একখণ্ড মাত্র এসেছে।

আমেরিকান থিওজফিষ্টেরা অন্য থিওজফিষ্টদের দল ছেড়ে দিয়েছে—এখন তারা ভারতকে ঘৃণা করে। গরিব বেচারারা করবে কি? মিথ্যার কখনও জয় হয়? ইংলণ্ডের ষ্টার্ডি সাহেব যিনি সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন এবং যাঁর সঙ্গে আমার গুরুভ্রাতা শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি আমাকে এক পত্র লিখে জানতে চেয়েছেন আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁকে একখানি শিষ্টাচারপূর্ণ পত্র লিখেছি। বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের খবর কি? আমি তাঁর কাছ থেকে আর কিছু খবর পাই নি। মিশনারিগণ ও অপরাপর সকলকে তাদের যা প্রাপ্য, তা দিয়ে দাও। আমাদের দেশের কতকগুলি বেশ দৃঢ়চেতা লোককে ধর—ভারতে ধর্ম্মের বর্ত্তমান সম্বন্ধে বেশ সুন্দর ওজস্বী অথচ বেশ সুরুচিসঙ্গত একটা প্রবন্ধ লেখ আর উহা আমেরিকার কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দাও। আমার সঙ্গে ঐরূপ ২।১ খানা কাগজের জানাশুনা আছে। তোমরা ত জান, আমি একজন বিশেষ লিখিয়ে নই আর লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানোরও আমার অভ্যাস নেই। আমি চুপ চাপ বসে থাকি আর যা কিছু আস্‌বার আমার

কাছে আসে—তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিনি। নিউইর্ক থেকে "দার্শনিক পত্র (Metaphysical Magazine)" বলে একখানা নূতন কাগজ বের হয়েছে—ওখানা বেশ ভাল কাগজ। পল কেরসের কাগজটা মন্দ নয় তবে উহার গ্রাহক সংখ্যা ওখানে বড় কম বৎস আমি যদি বিষয়ী কপট হতাম তবে একটা বড় সঙ্ঘ গঠন করে খুব বাজি মাৎ করতে পারতাম। হায়, হায়, এখানে ধর্ম্ম বলতে তার বেশীকিছু বুঝায় না। টাকার সঙ্গে নামযশ এই হোলো পুরহিতের দল, আর টাকাব সঙ্গে কাম যোগ দিলে হল সাধারণ গৃহস্থের দল। আমাদের এখানে একদল নূতন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্য করবেনা। অবশ্য এটী ধীরে—অতি ধীরে হবে। ইতি-মধ্যে—তোমরা কাজ করে চল আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে এবং সাহস থাকে, তবে মিশনারিরা যা পাবার উপযুক্ত, তাদের তাই দাও। যদি আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাই, আমার শিষ্যেরা চমকে যাবে—মিশনারিরা ত আর তর্ক করে না, তারা কেবল গালাগাল করে। সুতরাং আমাকে ওদের সঙ্গে বিবাদ করলে চলবে না। সেদিন রমাবাই নামক খ্রীষ্টিয়ান মহিলাটী আমার একজন বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক জেমসের কাছ থেকে খুব জোর ধাক্কা খেয়েছেন—কাগজের সেই অংশটা তোমাকে পাঠালাম। সুতরাং তোমরা দেখছো, তারা আমার এখানকার বন্ধু-বর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইরূপ ধাক্কা খাবে আর তোমরাও ভারতে মধ্যে মধ্যে তাদের ঐরূপ দুচার ঘা দিতে থাকে—আর ঐ গুতোর মধ্যে আমি আমার নৌকা সিধা চালিয়ে নিয়ে যাই। এখন আমার কাগজ-খানা কোনরূপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে—উহার সুর যেন ছেবলা না হয়—ধীর গম্ভীর উঁচু সুরে বাঁধা চাই। আমি তোমাদের টাকা পাঠাবো—ভয় করো না—কাজ আরম্ভ করে দাও—আমি তোমাদের টাকা পাঠাবো—আমি এখানে অনেক গ্রাহক জোগাড় করে দেবো—আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখবো এবং সময়ে সময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখকদের ধর। তোমার ভগিনীপতি ত একজন খুব ভাল

লেখক। তারপর আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস ভাই খেতরির রাজা লিম্‌ড়ি ঠাকুর সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেব, তারা কাগজটার গ্রাহক হবে—তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাজ করে যাও। আমরা বড় বড় কাজ কোর্‌বো—ভয় করো না। এইটি একটা নিয়ম কোরো যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যার পূর্ব্বোক্ত তিনটী ভাষ্যের মধ্যে কোন না কোন একটার খানিকটা অনুবাদ থাক্‌বে। আর এক কথা:— তুমি সকলের সেবক হও, একদম অপরের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চেষ্টা কোরো না—ঐ রকম কর্‌তে গেলে তার ভিতর ঈর্ষ্যার উদ্রেক হবে, তাইতেই সব মাটি করে দেবে। কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি উহার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখ্‌বো আর ভারতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ লও—তার মধ্যে একটা যেন দ্বৈত ভাষ্যের অংশ-বিশেষের অনুবাদ হয়। কাগজের উপর-পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম থাক্‌বে। আর ঐ উপরের পৃষ্ঠার চারিধারে খুব ভাল প্রবন্ধ গুলির ও উহাদের লেখকদের নাম থাক্‌বে। আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাটাব। কাজ করে চল। তোমরা বড় অদ্ভুত কাজ করেছ। আমরা আমাদের ভিতর থেকে ছাড়া অন্য সাহায্য চাই না। হে বৎস, আমরাই এটা কাজে পরিণত কোর্‌বো—তোমরা বিশ্বাসী হও ও ধৈর্য্য ধরে থাক। আশা করি, সামান্য তোমায় কিছু সাহায্য কর্‌তে পারে। আবার অপর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যেও না—সকলের সঙ্গে মিলে মিসে চল। সকলকে আমার প্রনয় ভালবাসা।

সদা আশীর্ব্বাদক

তোমাদের বিবেকানন্দ

পুঃ—আয়ার এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করে চল্‌বে। যদি তুমি নিজকে নেতারূপে সাম্‌নে দাঁড় করাও, তা হলে কেউ তোমার সাহায্য কর্‌তে আস্‌বে না, আর বোধ হয় তোমার কৃতকার্য্য না হবার গুপ্ত রহস্য ইহাই।—আয়ারের নামটাই

যথেষ্ট—তাঁকে যদি না পাও, অন্য কোন বড় লোককে তোমাদের নেতা কর। যদি কৃতকার্য্য হতে চাও, অহংটাকে আগে নাশ করে ফেল।

ইতি বিঃ

নং ৭

নিউইয়র্ক।

৫৪ নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।

৭ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিস্ ফার্ম্মারের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেল্‌বার দরুন আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ভারতবর্ষ থেকে একখানা খবরের কাগজ পেলাম, তাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে ধন্যবাদ পাঠান হইয়াছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বেরিয়েছে। মিস্ আর্স্‌বি আপনাকে সেটা পাঠায়ে দেবেন।

গতকল্য আমি মান্দ্রাজ অভিনন্দন সভার সভাপতির কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম—তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্যবাদ দিয়েছেন, আমাকেও একটা অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁকে আমার মান্দ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে বলেছিলাম। এই ভদ্রলোকটী মান্দ্রাজ সহরের অধিবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আর মান্দ্রাজের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের একজন বিচারপতি—ভারতে ইহা একটী অতি উচ্চপদ।

আমি নিউইয়র্কে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে আর দুটি বক্তৃতা দেবো—মট্ স্মৃতি-মন্দিরের' উপর তলায় এই দুটী বক্তৃতা হবে। প্রথমটী আগামী সোমবার হবে। বিষয়—'ধর্ম্ম-বিজ্ঞান' দ্বিতীয়টীর বিষয় 'যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।'

মিস্ আর্স্‌বি প্রায়ই ক্লাসে আসেন। মিঃ ফ্লন এক্ষণে আমার কার্য্যের উপর বিশেষ অনুরাগ দেখাচ্ছেন ও উহার প্রসারের জন্য যত্ন নিচ্ছেন। ল্যাণ্ডস্‌বার্গ আসে না। আমার আশঙ্কা হয়, সে আমার প্রতি বেজায়

বিরক্ত হয়েছে। মিস্ হ্যাম্‌লিন কি ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমার ইচ্ছা আপনার ভাই বইখানি পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বুঝেন যে ইংরাজ শাসন বল্‌তে ভারতে কি বুঝায়।

আপনার চিরকৃতজ্ঞ সন্তান
বিবেকানন্দ।

নং ৮

নিউইয়র্ক
১৪ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

বইগুলি সব নিরাপদে পৌঁছেছে। তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। শীঘ্রই তোমায় আমি কিছু টাকা পাঠাতে পারবো—খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন কয়েক শতমাত্র, তবে যদি বেঁচে থাকি, সময়ে সময়ে কিছু পাঠাবো।

এখন নিউইয়র্কের উপর আমার একটা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে—আশা কর্‌ছি, একদল স্থায়ী কর্ম্মী তৈয়ারি করে যেতে পারবো—যারা আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে কাজ চালাবে। বৎস, দেখচো, এই সব খবরের কাগজের হুজুগ কিছুই নয়। যখন আমি চলে যাব, তখন এখানে আমার কার্য্যের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়া উচিত। আর প্রভুর আশীর্ব্বাদে তা শীঘ্রই হবে। অবশ্য টাকাকড়ি লাভের দিক দিয়ে ধরলে এতে সফলতা দাঁড়াল না বল্‌তে হবে। কিন্তু জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান্।

অতএব তুমি আমার জন্য মাথা ঘামিও না—প্রভু সদাই আমায় রক্ষা করছেন।

আমার এদেশে আসা আর এত পরিশ্রম করণ বৃথা হতে দেওয়া হবে না।

প্রভু দয়াময়—আর যদিও এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কোনরূপে হোক আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আবার এরূপ লোকও অনেক আছে, যারা শেষ পর্য্যন্ত আমার সহায়তা করবে

অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়—এই তিনটী জিনিষ থাকলে যে কোনও সাধু-আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়—সিদ্ধির ইহাই রহস্য।

সদা আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

"মুক্তি"

(শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়)

গভীর ঘন বনানি মধ্যে
　　উঠিল একটী স্বর।
পূর্ণ হউক সাধনা মোদের
　　দাও মাগো এই বর॥
কম্পিত করি দশদিক দেবী
　　বলিল, "কি তোর পণ"?
ভক্ত কহিল, "কি আছে আমার
　　করিনু জীবন-পণ"।
দেবী কহে, "সে ত তুচ্ছ অতি—
　　প্রাণ দিয়ে চাও মুক্তি"?
চমকি ভক্ত বলিল তখন—
　　........."তারও সনে দিব ভক্তি"॥

ভক্তি ও প্রেম।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার)

ভক্তি কাহাকে বলে? ভজ ধাতু সেবার্থে বুঝায়; অর্থাৎ সেবাই ভক্তি। নারদ ভক্তিসূত্রে বলেন—ওঁ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম।

"ওঁ সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা॥"

পতঞ্জলি বলেন—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"। শাণ্ডিল্য বলেন "সা পরাণুরক্তিরীশ্বরে।" অর্থাৎ নারদের মতে ভক্তি অনির্ব্বচনীয় প্রেম স্বরূপ। পতঞ্জলি ঈশ্বরানুভূতিকে ভক্তি বলেন। শাণ্ডিল্য ঈশ্বরের প্রতি পরানুরক্তি বা পরম অনুরাগকেই ভক্তিনামে অভিহিত করিয়াছেন। উল্লিখিত বচনানুসারে 'ভক্তি' অতিশয় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ভক্তি সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক করণীয়; তাহা দুর্ব্বোধ্য বা দুঃসাধ্য হইলে ব্যবহারিক জগৎ অচল হয়। যে হেতু পিতা মাতা আদি গুরুজন, এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নিত্য, ভক্তি করিতে হয়। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সংসারের প্রধান অবলম্বনীয়।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" ১৭ অঃ ৩ শ্লোক। অর্থাৎ সংসারী জীব শ্রদ্ধাময়; যে ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে যাদৃশী শ্রদ্ধা যুক্ত সে এই জন্মে তাদৃশী শ্রদ্ধা যুক্তই হয়॥ সুতরাং শ্রদ্ধা ও ভক্তি মানুষের প্রকৃতি গত স্বাভাবিক, অতএব দুঃসাধ্য বা দুর্ব্বোধ্য নহে।

ঈশ্বরারাধনায়, জ্ঞান বা কর্ম্ম, যিনি যে পথেই যান, তাঁহাকে ভক্তি অবলম্বন করিতেই হইবে। যে হেতু ভক্তিহীন সাধনা বা উপাসনা হয় না। সাধারণতঃ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, সাধনার তিনটি পথ বলিয়া প্রচলিত আছে; কিন্তু গীতায় দেখাযায় যে শ্রীভগবান জ্ঞান ও কর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ করিয়াও পুনরায় তাহার সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যথা—লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম॥ গীতা ৩অঃ ৩শ্লোক

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অনঘ ইহলোকে অধিকারী ভেদে দ্বিবি নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে কহিয়াছি। সাংখ্যদিগে শুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের) জ্ঞান যোগ দ্বারা এ

যোগীদিগের (জ্ঞান ভূমিতে আরোহণার্থী চিত্ত শুদ্ধিকাম ব্যক্তিদিগের) কর্ম্ম যোগ দ্বারা নিষ্ঠা হয়। কিন্তু পুনরায় কহিয়াছেন—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ গীতা ৫অঃ ৪।
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একংসাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫অঃ ৫।

অর্থাৎ অজ্ঞেরাই জ্ঞানযোগকে পৃথক বলিয়া থাকে; পণ্ডিতেরা বলেন না; সম্যক রূপে একটীর অনুষ্ঠান করিলেই উভয়েরই ফল (মোক্ষ) পাওয়া যায়। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান লাভ করেন যোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ কেবল জ্ঞান ও কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য, সমন্বয় করিয়াছেন মাত্র। এখানে ভক্তির কোনও উল্লেখ নাই; যে হেতু জ্ঞানী ও যোগী উভয়েই ভক্ত। গীতা ৭অঃ ১৭ শ্লোক এবং ৬ অঃ ৪৭ শ্লোক। এখন দেখা গেল যে, ভক্তি বস্তুটী সাধক মাত্রেরই অবলম্বনীয়, সুতরাং ইহার কিছু সরল ও সুবোধ্য ব্যাখ্যা আবশ্যক।

ব্যাকরণ মতে ভজধাতু সেবার্থে বুঝায় অর্থাৎ সেবাই ভক্তি কিন্তু 'সেবা' ভক্তি নহে, ভক্তি বা শ্রদ্ধার ফলই সেবা; যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই তাঁহার সেবা করা কখনই সম্ভব হয় না। কিন্তু বাধ্যতা বশে বা ভয়ে, অশ্রদ্ধেয়কেও অনেক সময় সেবা করিতে হয়। সুতরাং সেবা মাত্রই ভক্তি হইতে পারে না। তবে যেখানে 'ভক্তি' সেখানে সেবা স্বাভাবিক। নারদ ও পতঞ্জলীর মতে ভক্তি অনির্ব্বচনীয়া পরম-প্রেম-রূপা, এবং ঈশ্বর প্রনিধান। এই কয়টি বাক্যেরই প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং শ্রীভগবান্। যে হেতু একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান ব্যতীত অনির্ব্বচনীয় ও পরম প্রেমস্বরূপ আর কিছুই নাই। আর তিনি ব্যতিরেকে উপাধিগ্রস্ত গুণময় যাবতীয় পদার্থই বাচনীয় বা প্রকাশ যোগ্য। ঈশ্বর প্রণিধান বা উপলব্ধি, তাহাও ভক্তি সাপেক্ষ। যে হেতু সাধনা মাত্রেরই পরিণাম ঈশ্বরোপলব্ধি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ। সুতরাং তাহা ভক্তি ব্যতিরেকে

কদাচ সম্ভব নহে। ভক্তিই সাধনার মূল। নারদ সূত্রাদিতে যে ভক্তির উল্লেখ আছে তাহা সাধারণ বা সাধকাবস্থায় অবলম্বনীয় নহে; উহা ভক্তির চরম পরিণতি। এক্ষণে ভক্তি বস্তুটী কি? এবং কিরূপই বা তাহা জীবের হৃদয়ে উদয় হয় তাহাই বিচার্য্য।

ভক্তি সাধনের ধন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি সাপেক্ষ; যিনি যেমন সুকৃতিশালী তিনি সেইরূপ ভক্তিলাভের অধিকারী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন:—"স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কভু সাধ্য নহে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণভক্তিলাভ কৃষ্ণের কৃপাব্যতীত কেবল পুরুষকারের সাধ্য নহে। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপাও যে ভক্তি সাধ্য অভক্ত অথবা ক্রূরকর্ম্মাদিগের প্রতি তাঁহার কৃপা নাই! (?)
গীতায় বলিয়াছেন:—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৬ অঃ ১৯ শ্লোক।

আমার বিদ্বেষী, অর্থাৎ শ্রীভগবানে প্রীতি হীন। সেই ক্রূরকর্ম্মা নরাধমদিগকে সংসারে আসুরী-যোনিতেই নিরন্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকি। সুতরাং একমাত্র ভক্তিসাধন দ্বারাই ভগবৎ কৃপালাভ করা যায়। এখানে শাণ্ডিল্য সূত্রই গ্রহনীয় যথা:—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগই ভক্তি। ইহাই সহজ ও সুবোধ্য এবং করণীয়।

ভক্তির সাধারণ নাম, অনুরাগ বা ভালবাসা। ভালবাসারই অবস্থা ও পাত্রভেদে নামান্তর ঘটে। নিম্ন শ্রেণী বা ইতর প্রাণীর প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে দয়া বলে। পুত্র কন্যা প্রভৃতির প্রতি ভালবাসার নাম স্নেহ; বন্ধুবান্ধব বা সমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগের নাম ভালবাসা বা প্রীতি; পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে ভালবাসার নাম ভক্তি। আর ঈশ্বরের প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে প্রেম বলে। ভক্তির প্রথম সোপান শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হইতে প্রীতি, প্রীতি হইতে অনুরাগ, প্রগাঢ় অনুরাগই ভক্তি এবং ভক্তির পরিণতি বা চরম অবস্থাই প্রেম নামে অভিহিত।

এখন দেখা যাক্, শ্রদ্ধা কিসে হয় ? সাধারণতঃ দেখাযায় যে, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য এই কয়টীর মধ্যে অন্ততঃ একটীতেও চিত্ত আকৃষ্ট না হইলে শ্রদ্ধা জন্মে না। যিনি একাধারে এই চারিটী সম্পত্তির অধিকারী, তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে এমন জীব জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন বস্তু বা ব্যক্তির, রূপ গুণাদিতে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে যতই তাহা চিন্তা বা আলোচনা করা যায় ততই তৎপ্রতি আশক্তি বা অনুরাগ ও ক্রমে তাহা ভক্তি প্রভৃতিতে পরিণত হয়। সুতরাং ভক্তির সূচনায় শ্রীভগবানের লীলামাহাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য, রূপ, গুণ ও শক্তির বর্ণনা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও মননাদি নিরন্তর করিতে হয়। ইহা ক্রমে প্রীতি ও অনুরাগাদি বৃদ্ধি করে এবং পরে ভক্তি ও প্রেমে পরিণত হয়। যতক্ষণ ভক্তির অবস্থা ততক্ষণ 'দুই' অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান্ (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা) থাকেন। যে হেতু জ্ঞেয় বা ঈশ্বর না থাকিলে ভক্তি করিব কাহাকে ?

প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মই মিলনের চেষ্টা। প্রেম দুইটীকে একটী করিবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ দুইটী প্রাণী মিলিয়া একটী হইবার ইচ্ছা না করে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে তাহাদের প্রেম জন্মে নাই। প্রেমে আত্মসুখ চেষ্টা কিম্বা বিচ্ছেদ নাই। কেবল নিরন্তর পরস্পরের ভাবে বিভোর হইয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া যায়। প্রেমে আত্মবিস্মৃতি আসে।

ব্রজলীলায় শ্রীমতীরাধিকার প্রেমই উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গোপীরাও লীলার সহচরী বটে, কিন্তু মিলন রাধিকার সহিতই ঘটিয়াছিল। যুগলমিলন বলিলে রাধাকৃষ্ণেরই মিলন বুঝায়। অন্য গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন সত্য কিন্তু শ্রীমতীর ন্যায় সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ও কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে আর কেহই পারেন নাই। শ্রীরাধা জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেন, এমন কি কখন কখন আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণরূপে উপলব্ধি করিতেন (তখন আর আমি, থাকে না) ইহাই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। ভক্তির অবস্থায় ভয় ও সম্ভ্রম জ্ঞান থাকে কিন্তু প্রেমে কোন সঙ্কোচ থাকে না ; সেই হেতু শ্রীমতীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধারোহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ

অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে ভগবদ্ভাবের সমাবেশ হয়। তখন ভক্ত সর্ব্বত্র ভগবানের বিকাশ দেখিতে পান ও নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যান। সুতরাং বৈষম্য দর্শন, শোক ও আকাঙ্ক্ষা থাকে না ; এই অবস্থায় পরাভক্তি লাভ হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮ অঃ ৫৪।

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি, শোক করেন না এবং আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমার পরাভক্তি অর্থাৎ মদ্‌বিষয়ক শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করেন। যেহেতু তিনি তখন শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব অর্থাৎ তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব জানিতে পারেন। ভক্তির এই অবস্থাই অনির্ব্বচনীয়। ইহাকেই নারদ "অনির্ব্বচনীয়" পতঞ্জলী "ঈশ্বর প্রণিধান ;" এবং শাণ্ডিল্য "পরানুরক্তি বা পরাভক্তি" বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিয়াছেন :—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততোমাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

১৮ অঃ ৫৫ শ্লোক।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, পরাভক্তি লাভ হইলে ভক্ত গুণাতীত হন সুতরাং তখন তিনি শ্রীভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব অর্থাৎ তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তিনিও ব্রহ্ম হইয়া যান। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়া যেমন সমুদ্র হইয়া যায় ইহাও তদ্রূপ। বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, বস্তু বা ব্যক্তির কখনই মিলন সম্ভব নহে। যেমন তৈল কখনই জলের সহিত মিশ্রিত হয় না ; উহাকে জলের সহিত মিশাইতে হইলে উভয় পদার্থকেই সমধর্ম্মী করিতে হইবে অর্থাৎ তৈলকে রাসায়নিক প্রকরণে জলে পরিণত করিতে হইবে। শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ গুণাতীত পূর্ণব্রহ্ম ; সুতরাং জীবকে শ্রীভগবানে প্রবেশ করিতে অথবা মিলিত হইতে হইলে তাহাকেও নির্গুণ হইতে হইবে। ইহাই সাধক ভক্তের চরম পরিণতি অর্থাৎ নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্তি বা পরম প্রেমের চরম নিদান, তাহাই নারদ বলিয়াছেন :—

"ওঁ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্॥"

হরি ওঁ তৎসৎ

বিশ্বাত্ম-বোধ।

(শ্রীসাহাজি)

ব্রহ্মানুভূতির অমৃতফল এই বিশ্বাত্ম-বোধ। যাঁহার বিশ্বে আত্মবুদ্ধি জন্মে নাই, বুঝিতে হয়, তাঁহার ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয় নাই। মানব কিন্তু ক্ষুদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ মনে করিতে নাই। কারণ, ক্ষুদ্র "ভূমারই মোহন হাস্য।" ভূমাই ক্ষুদ্র হন। আবার, ক্ষুদ্রকে সর্ব্বস্ব জ্ঞানও করিতে নাই। কারণ, ভূমা না থাকিলে ক্ষুদ্রের কোনও সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু ভূমা ক্ষুদ্র হন কিসের জন্য?—আপনার অনন্তত্বকে সম্ভোগ করিবার জন্যই ভূমার এই ক্ষুদ্র হওয়া। বস্তুতঃ, নিরাকার সার্থক হন সাকারের মধ্য দিয়াই। সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাহাই,—আকারে প্রকটিত হইয়া নিরাকারের উপলব্ধি করা। এই ভাবে, সাকারের মধ্য দিয়া নিরাকারের যিনি যতখানি উপলব্ধি করিতে পারেন, জীবন তাঁহার ততখানি সার্থক হয়। জগতের এই সকল অনন্তরূপের মধ্যে যিনি সেই অরূপের সন্ধান না পান, এই অসংখ্য ক্ষুদ্রের মাঝে যিনি সেই ভূমারই "মোহন হাস্য" দেখিয়া মুগ্ধ হইতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে নিরর্থক হইয়া যায় সকলই। * * কিন্তু এই দিব্যদর্শন লাভ আবার সম্ভবপর হয় প্রেমের চক্ষুতে। বিশ্বের এই অসংখ্য ক্ষুদ্রকে যিনি প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারেন, তিনিই ক্ষুদ্রের মাঝে ভূমার দিব্যদর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন। ভূমার এই ক্ষুদ্র হওয়ার সার্থকতাও তখনই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। জগতের প্রত্যেক ভালবাসার উদ্দেশ্যও তাহাই। যে ভালবাসায় এই দিব্যদর্শন লাভ হয় না, তাহা ব্যর্থ, তাহা ভালবাসাই নহে। যে মাতা আপন পুত্রকে ভালবাসেন, কিন্তু অন্যের পুত্রের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না, বুঝিতে হয়, তিনি আপন পুত্রকেও ভালবাসিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই পুত্রস্নেহ শুধু ভুয়া ফাঁকিবাজি, কারণ, তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র পুত্রের মাঝে ভূমার সন্ধান পান নাই। পুত্রের মাঝে পুত্রাতীতকে

পাওয়া চাই, তবেই পুত্রকে পাওয়া সার্থক হয়। আপনার ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যে যিনি বিশ্বের অনন্তশিশুর সন্ধান পান, তিনিই যথার্থ মাতা, তাঁহারেই সার্থক ভালবাসা। যে ভালবাসায় এইরূপ বিশ্বাত্ম-বোধ না জন্মে, তাহা ভালবাসা নামের অযোগ্য। যশোদাও আপনার শিশুকৃষ্ণের মুখ-বিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণের মাঝে কৃষ্ণাতীতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই তিনি মাতৃত্বের মহান্ আদর্শরূপে আজও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। শ্রীরাধারও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন শুধু রাধাবল্লভরূপে নহে, ফলতঃ, যশোদা ও রাধা সংসারী জীব হইলেও একের পুত্র এবং অন্যের উপপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বাত্ম-বোধ জন্মিয়াছিল। অর্জ্জুনের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। তিনিও যখন শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মাঝে শ্রীকৃষ্ণাতীতকে পাইয়াছিলেন, তখনই তাঁহার সকল ক্লৈব্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার অধুনাতন অনেক পণ্ডিতের মতে গীতার বিশ্ব-রূপ দর্শন অধ্যায়টী আগাগোড়া শুধু গাঁজাখুরিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সত্যই কি উহা তাহাই? বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই সসীম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সকল মনুষ্যেরই সসীমত্বের দিক একান্ত পরিস্ফুট, কিন্তু তাহাদের অসীমত্বের দিক্ ধারণা করিতে হইলে বহু সাধনার প্রয়োজন। যাহার যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই অসীমত্বের দিক যতখানি পরিস্ফুট হয়, তিনি তাঁহার পক্ষে ততখানি অবতার। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বাত্মবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন অবতার। সুতরাং বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়টী যে গীতার প্রাণস্বরূপ তাহা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ, অবতার, গুরু, Godman প্রভৃতি মহাপুরুষেরা অনুবীক্ষণও ও দূরবীক্ষণ ধর্ম্মাত্মক সুবৃহৎ দর্পণস্বরূপ। ভক্তেরা তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের স্বকীয় সত্তাকে এবং নিখিলজগৎকে (উহার ছোট বড় সমস্ত পদার্থসহ) প্রতিবিম্বিত দেখিতে পান। সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল মহাত্মার সহায়তায় আপনাদের সঙ্গে সমস্ত জগতের সমপ্রাণতা বুঝিতে সমর্থ হন। * * কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে

আশ্রয় করিয়া অর্জ্জুনেরও যদি এইরূপ বিশ্বাত্মবোধ না জন্মিত, তাহা হইলে তিনিও সামান্য মায়িক জীব মধ্যেই পরিগণিত হইতেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহা হইলে তাঁহার নিকটে অবতাররূপে পূজিত হইতেন না। তাঁহাদের প্রীতিও সেরূপস্থলে সামান্য জৈবপ্রীতিরূপেই সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র অনাদৃত হইত। * * তবে এই বিশ্বাত্মবোধ যে শুধু অবতারাদি গুরুর সাহায্যেই হইতে পারে, তাহা নহে। পুত্রকলত্রাদি দ্বারাও যে তাহা হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া যদি যথার্থ ভালবাসা স্ফুরিত হয়, তবে তাহা হইতেই বিশ্বাত্মবোধ ফুটিয়া উঠিতে পারে। তবে এ কথাও নিশ্চিত, প্রদীপ জ্বালিতে হইলে যেমন প্রজ্বলিত অন্যপ্রদীপের নিকটে যাইতে হয়, তেমনই নিজের বিশ্বাত্মবোধ জাগরিত করিতে হইলে, বিশ্বাত্মবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির শরণ লওয়াই সুবিধাজনক। * * * পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের আদর্শ হইলেও তিনি তাঁহার অন্ধ অনুকরণ করেন নাই। দণ্ডীকে উপলক্ষ করিয়া যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অষ্টবজ্রধারী প্রধান অষ্টদেবতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রোষানল উপেক্ষা করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের একান্ত অনুগত শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাঁহার গুরুর অন্ধ অনুকরণ করেন নাই; বরং অনেকস্থলে তাঁহাদের মধ্যে মনের আপাতদৃষ্ট পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ, ইঁহারা ইঁহাদের গুরুকে পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের গুরুত্বকে অরূপের সত্তায় ডুবাইয়া অরূপের রূপরসে মজাইয়া মাখাইয়া আপনাদের মনের মত মধুর করিয়া। গুরুকে যাহারা ঐরূপ বিশ্বময় করিয়া লইতে না পারেন, তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কদাপি সফল হইতে পারে না। সুতরাং যখন দেখি, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছেন, তখন বুঝি, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই। যখন দেখি, হিন্দুর সহিত মুসলমানের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে, তখন বুঝি তাঁহারা নিজ নিজ গুরু, অবতার, প্রেরিত মহাপুরুষের সসীমত্বের দিক্ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অসীমত্বের পরাদর্শনলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং ঐ সকল ব্যর্থদর্শন ব্যক্তিগণের দ্বারা

জগতের কোনও উপকার সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের দ্বারা না হয় ধর্ম্মপ্রচার, না হয় কিছু যাহা মানবসমাজের যথার্থ কল্যাণকর। * * বৌদ্ধসঙ্ঘ যেদিন এই বিশ্বাত্মবোধের মূল সূত্রটি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের পতনের আরম্ভ হইয়াছিল। সামান্য একটী পরিবার, সেও যখন এই বিশ্বাত্মবোধের নীতি ভুলিয়া গিয়া পরস্পর কলহবিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার সর্ব্বনাশ হয়। * * * আবার মানবের যখন এই বিশ্বাত্মবোধের উদয় হয়, তখনই সে অর্জ্জুনের ন্যায় বিশ্বকর্ম্মের অধিকারী হয়। সংসারী অথবা সন্ন্যাসী, অথবা ভোগী, সমাজের অথবা নেশনের কর্ত্তা, যাহাই হউন, তখনই তিনি নৈষ্কর্ম্ম্যের অধিকারী হইয়া জগতের যথার্থ হিতসাধনে সমর্থ হন। অন্যথা, যতই বড় হউন, বিশ্বাত্মবোধবর্জ্জিত ব্যক্তি যদি মহাজাতি সঙ্ঘেও থাকেন, তবে সেই জাতিসঙ্ঘ ফরাসি আন্তর্জাতিকসঙ্ঘের ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপারে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিকসঙ্ঘের কার্য্য দূরের কথা, সংসারের সামান্য একটী কার্য্যকেও সার্থক করিয়া তুলিবার ক্ষমতা ঐ সকল আত্মদর্শনহীন ব্যক্তির নাই, থাকিতেও পারে না। ফলতঃ যাঁহার এই ব্রহ্মানুভূতি হয়, তিনি যদি সংসারী হন, তবে তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহ মঠে পরিণত হয়! তিনি যদি সন্ন্যাসী হন, তবে তাঁহার সেই মঠে গৃহের শান্ত শ্রী ফুটিয়া উঠে! স্বদেশ হয় তাঁহার সর্ব্বদেশ! স্বজাতি হয় তাঁহার মানবজাতি! আত্মীয় হয় তাঁহার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, আবিষ্কৃত-অনাবিষ্কৃত, স্থাবর-জঙ্গম তাবৎ চরাচর! * * * আবার, জগতের প্রকৃত ইতিহাসও এই বিশ্বাত্মবোধেরই ইতিহাস। সৃষ্টির আদিতে মানব আপনাকে লইয়াই আপনি পরিতৃপ্ত থাকিত। পরে, তাহার বিশ্বাত্মবোধ যখন কিয়দংশে জাগরিত হইল, তখন (Socialism) সমাজধর্ম্মের উদ্ভব হইল। তাহার পর, ক্রমে (Nationalism) জাতিধর্ম্মের উৎপত্তি। বিগত কতিপয় শতাব্দীর ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা এই দেশাত্মবুদ্ধির রক্তিমায় অনুরঞ্জিত। কিন্তু মানবের ইহাতেও তৃপ্তি হইল না। তাই আজ আবার (Internationalism) আন্তর্জাতিকতা ধর্ম্মের শুভ্রধ্বজা বিশ্বমানবতার মন্দিরশীর্ষে ঈষৎ পরিদৃশ্যমান! তাই—

And made me think
What man has made of man.

ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই গভীর দুঃখ দূরীভূত হইবার সময় অধিক দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। তাই মনে হয়, শুধু পঞ্চমহাদেশে কেন, দৃশ্যাদৃশ্যমান অনন্ত বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া একদিন এই বিশ্বাত্মবোধের বিজয় নিশান উড়িতে থাকিবে। সুদূর অতীতযুগে ভারতের যে প্রাচীন সভ্যতা একদিন বহুর মধ্যে একের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই সভ্যতাই যে একদিন এই কল্পনাকে বাস্তবতায় পরিণত করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

হে দেবতা! আজ নিখিল অবনী সেজেছে পূজাতে তব,
সাঁঝের আঁধারে আলোকের রেখা—চাঁদের কিরণে নব।
প্রতি গৃহে গৃহে মঙ্গল গীতি, মঙ্গলারতি কত;
সোণার বরণ আঙিনা গৃহে—প্রদীপের সারি শত।
অগুরুর সাথে গন্ধ মিলায়ে চন্দন চূয়া আদি—
স্নিগ্ধ-মধুর গন্ধে মোহিছে,—ভ্রমর ফিরিছে কাঁদি!
অর্ঘ্য তোমার সাজায়ে রেখেছে রত্নে জড়িত করি;
আজ সাঁঝ শেষে আমার এ কুটীর আঁধারে রহিল পড়ি!
আমার আলোক গগনের ঐ চন্দ্র-কিরণ-রাশি;
চন্দনসম গন্ধ আসিছে বনানী-ফুলের ভাসি।
ব্যজন করিতে সমীরণ ছুটে সঙ্গে কুসুম বাস;
মঙ্গল গীতি হৃদয়ের সুধু করুণ-কাতর-ভাষ।
অর্ঘ্য আমার দীন হে দেবতা!—ফুলের মালিকা চারু,—
বিরলে তাহার ফুটায়েছি বসে প্রাণের যতেক কারু।
অর্ঘ্য ওপদে—সঙ্গে ভকতি-চন্দন হৃদি-গড়া;
শোভাহীন গৃহে দীনতার মাঝে আজি কি দিবে না ধরা?

—শৈলেন্দ্রনাথ রায়

সংসার।

(শ্রীঅজিত নাথ সরকার)

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

"শান্তি একবার এখানে আয় ত মা !" বলিয়া আহ্বান করিতেই গৃহ-কর্ত্তা কিশোরী মোহন বাবুর আদরের কন্যা "যাই বাবা !" বলিয়া দৌড়িয়া আসিল। সে যেন এই ডাকের প্রত্যাশায় নিকটেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু নিকটে আসিয়াই তাহার পায়ের গতি বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য একবার অতি আগ্রহের সহিত সে পিতার হাত ও মুখের দিকে তাকাইয়া স্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ মুখ নীচু করিয়া পিতার আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিল। মেয়েটার বয়স আন্দাজ বার তের বৎসর, কিন্তু তাহাতে কৈশোর-চাঞ্চল্যের মাত্রাধিক্যও নাই, তাহার পরিবর্ত্তে বয়সের গাম্ভীর্য্যই যেন তাহাকে সমধিক গৌরবিনী করিয়াছে। তাহার স্থির প্রশান্ত ভাল দেখিলে মন সত্যই স্নেহের এক অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠে। মনে হয় এই বুঝি আমাদের সেই সুদূর অতীতের ভক্তি-স্নেহ-রূপিনী আদর্শ মাতৃমূর্ত্তির পুনরাবির্ভাব !

পিতা কিশোরীমোহন বাবু সেই স্নেহের পুত্তলীর দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন, ক্রমে তাঁহার দুইচক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। দুই বিন্দু অশ্রুও অলক্ষ্যে তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িয়া বক্ষস্থল সিক্ত করিল। অবশ্য তাহা শান্তির দৃষ্টি অতিক্রম করিল না ; কিন্তু শান্তি পিতার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। যাহাই হউক, একটা অজানিত আতঙ্কে তাহার নির্ম্মল হৃদয়ে একটা ক্ষুদ্র তুফানের সৃষ্টি করিল। সে ভিতরে ভিতরেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। কিশোরীমোহনবাবু ইতিমধ্যে নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন,—"বিনয়ের খবর পেলাম। সে কলিকাতা

থেকে পত্র লিখেছে; কিন্তু বোধ হয় আর এখানে আসবে না। কারণ সেখান থেকে শীঘ্রই পশ্চিমে যাবে লিখেছে। পশ্চিমের কয়েকটী জায়গায় বেড়ান তার একান্ত ইচ্ছা বলে বোধ হয়। তোর মাকে একবার ডাক্ ত মা।" বলিতেই শান্তি সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া মা'র উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের দিকে গেল। কিন্তু এই অসম্ভাবিত দুঃসংবাদে তাহার চিন্তা-শূন্য হৃদয় আজ আলোড়িত হইয়া উঠিল। কারণ বিনয়কে সে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। সকল কাজেই তাহার সঙ্গে সে আপন সহোদরের ন্যায় পরামর্শ করিত। এতদিন পড়াশুনার জন্য কোনরূপ চিন্তা যেন তাহার নিজের ছিল না, সব 'বিনুদার' স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিত। শুধু তাই নয়, যখন যে স্কুলে পড়িত, তখন কোন বিষয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলে বিনয়কে ভয় দেখাইয়া বলিত, "কেমন! এবার যদি আমি পরীক্ষায় ফেল হই, তবে মজাটা বুঝ্ বেন।" অর্থাৎ ফেল হওয়ায় যেন বিনয়েরই আশঙ্কা সমধিক। সুতরাং বিনয় আসিবে না শুনিয়া সে অতর্কিত ভাবে ভিতরে একটা আঘাত পাইল।

তারপর রান্নাঘরে যাইয়া "মা! বিনুদার পত্র এসেছে দেখ্ বে এস।" বলিতেই গৃহিনী ব্যস্ত হইয়া যে ঘরে কিশোরীমোহন বসিয়া ছিলেন সেই-খানে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কর্ত্তা প্রথমে বিনয়ের চিঠি-সংক্রান্ত সমস্ত কথাই বলিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন—"বিনয় এরকমভাবে চলে যাবে তা আমি বুঝ্ তে পারি নাই। তার অতবড় উদার হৃদয়ও যে এরূপ অভিমানে নুয়ে পড়্ বে সে কথা আমি মোটেই ভাবি নাই। ওঃ আজ বুঝ্ তে পারছি তাকে আমি কতখানি স্নেহ করতাম। সে চলে যাওয়াতে আজ আমার হৃদয়ের একটা মস্ত বড় অংশ যেন শূন্য বলে বোধ হচ্ছে। তার ব্যবহার—তার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা ও আত্মত্যাগের কথা আমি জীবনেও ভুল্ তে পার্ ব না। সেবারের কথা তোমার মনে পড়ে কি? সেই যে ওপাড়ার প্রতাপ মণ্ডলের ছেলেটা কলেরায় মারা গেল? ওঃ তার আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শী যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল, একটু জল দিয়ে সাহায্য কর্ বার লোকও যখনও পাড়ায় থাকল না—তখন বিনয় এসে আমায় বল্ লে,—'কাকাবাবু! প্রতাপ মণ্ডলের কষ্ট আমি

আর সহ্য কর্‌তে পারি না। আমার শুধু হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থায় ফল হতেও পারে, না হতেও পারে, কিন্তু শুশ্রূষাভাবে যে ছেলেটী মারা যায়! বাপ হয়ে ঐরকম মুমূর্ষু পুত্রের সেবা করা কি সম্ভবপর? সমস্ত জগৎ আজ তার চক্ষে আঁধার বোধ হচ্ছে। এ অবস্থায়—মানুষ আমি, আমার কি করা কর্ত্তব্য কাকাবাবু? যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমায় গীতার ব্যাখ্যা, চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাবার্থ বুঝাতেন, তাঁকে ত এখন দেখ্‌ছি না? কেন শাস্ত্র কি গরীবের বিপদে সাহায্য কর্‌তে নিষেধ করেছে? কলেরার নাম শুনেই তিনি ওপাড়ার নাম পর্য্যন্ত নেন্‌ না। আবার শুনছি সপরিবারে নাকি কোথায় সরবার ব্যবস্থা করছেন। বোধ হয় তাঁর ধারণা মৃত্যু সেখানে পৌঁছতে পার্‌বে না! অথচ দেখুন ঐ প্রতাপ মণ্ডল তাঁর পাদোদক ছাড়া জলগ্রহণ করে না'।

"বল্‌তে কি যে বিনোদ ভট্টাচার্য্যকে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলে যে এতদিন শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্‌ত, সেইদিন থেকে যেন তাঁর উপর একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এসে পড়েছিল। আমায় কেবলই বল্‌ত—'কাকাবাবু! এই সব ভণ্ডামার জন্যই আমাদের আজ এত দুর্দ্দশা! ধর্ম্ম কাকে বলে? ব্যাকরণের সূত্র আর সংহিতার বিধি মুখস্থ কর্‌লেই কি মানুষ ধার্ম্মিক হয়, না কতকগুল সদাচার বলে ছুৎমার্গ অবলম্বন করলেই ধার্ম্মিক হয়? ধর্ম্মের নামে এইরূপ নিষ্ঠুর অবমাননা আর ঘৃণা করার নামই যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্মের অস্তিত্ব ভগবানের রাজ্যে থাক্‌বে না; একদিন না একদিন এর ভিত্তি ধ্বসে পড়বেই'। তারপর আর অপেক্ষা না ক'রেই সে প্রতাপের বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে যেন সমস্ত বিপদকে মাথায় তুলে নিল। আমার সে সময় একটু ভয়ও হয়েছিল, কিন্তু তার শতগুণ আনন্দে হৃদয়টা ভরে উঠেছিল। সেইদিন থেকে আমি বেশ বুঝেছিলাম—জীবনে একটা উপযুক্ত দোসর পেয়েছি। বোধ হয় এই ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা মঙ্গলময়ের ইচ্ছার কোন ক্ষুদ্র অংশ পূর্ণ হ'তেও পারে। কিন্তু একি? এ যে উল্টো হয়ে গেল! আমার নিজের ছেলে আজ উচ্চশিক্ষিত মার্জ্জিত রুচি হ'লেও বিনয়ের দ্বারা আমি অনেক আশা করতাম।"

গৃহিণী এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিশোরীমোহন বাবুর

এক নিঃশ্বাসের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন। এতক্ষণের পর বলিলেন, "কেন বিনয় যে আর এখানে আস্‌বে না তা' কেমন করে' বুঝ্‌লে? না আসার কারণই বা কি?"—"ও তা' বুঝি তুমি জান না? তুমি বুঝি ভেবেছ বিনয় সখ্ করে' বেড়াতে কিম্বা কোন কাজে কলিকাতায় গিয়েছে? সেটা একটা বাজে কৈফিয়ৎ মাত্র। ভিতরে অনেক কথা আছে। আর তা কেবল ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাঁর পরিষদগণের কৃপায় হয়েছে! সেই মড়াফেলার ব্যাপারটাই ওদের উপলক্ষ হয়ে' দাঁড়িয়েছে। অনেকদিন থেকেই উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটা বেশ জুটে গেল! আর যায় কোথায়? আমাদের রসিককে নিয়ে নানা রকম ভাবে আঁট-ঘাট বেধে ফেলেছে। গত রবিবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে এক সভা বসেছিল, তাতে ব্রাহ্মণ পাড়ার তারণ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর সকলেই বিপক্ষে ছিলেন। আমাদের কায়স্থ পাড়ারও প্রায় অধিকাংশই ছিল, কিন্তু তোমার স্নেহের রসিক দেবরটীই তাঁদের কর্ম্মধার। তারপর সেই সভায় আমার পরিবারের সকলকেই পতিত কর্‌বার প্রস্তাব করা হয়; আর বিনয় যাতে গ্রাম ছেড়ে পালায় তারও অনেক ঠিক করা হয়। তাতে হেড পণ্ডিত তারণ মুখুজ্যে নাকি বলেছিলেন,—'কেন ওর এমন কি অপরাধ যে পতিত করা হবে?' আর যায় কোথায়? ভট্টাচার্য্য মহাশয় বল্লেন,—'কি অপরাধ? তুমিও বল্‌ছ কি অপরাধ? কেন আমরা কি এমনই অমানুষ যে, সমাজের মাথায় চড়ে যা ইচ্ছে তাই কর্‌বে? তুমি কি জান না বিনয় মাষ্টার সেদিন সদ্‌গোপের মড়াটা নিজে কাঁধে নিয়ে ফেলেছিল? তার না আছে প্রায়শ্চিত্ত, না আছে কিছু;—আবার কিশোরী তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে কত বাহবা দিলেন! আমরা যদিই বা কিছু না বলি, কিন্তু ওর জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা ওকে নিয়ে চল্‌বে কেন? তা ছাড়া আমরা বল্‌বই না বা কেন? আমি সেদিন ডেকে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে বল্‌লাম, তাতে আবার ঠাট্টা-তামাসা করা হ'ল!"

"বিনয় কি জন্য সেদিন ও পাড়ায় গিয়া সব পরামর্শ শুনে এসেছিল, কিন্তু আমায় বলে নাই; আমি তারণ ভায়ার কাছে সব শুনলাম।

সেইদিনই আমি বিনয়ের বেশ ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু অতটা বুঝ্‌তে পারি নাই। তারপর সে যখনই কলিকাতা যাবার প্রস্তাব কর্‌লে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। না যেতে দিবার জন্য চেষ্টাও করেছিলাম, শেষে বিশেষ আগ্রহ দেখে আর বাধা দিলাম না। এখন দেখ্‌ছি আমায় পতিত করবে শুনেই সে ভয় পেয়েছে, নতুবা নিজের কোন রকম চিন্তা সে মনে স্থান দেয় না। বিনয় দেখ্‌ছি আমার সম্বন্ধে বুঝ্‌তে ভুল করেছে। যাই হোক্ আমি নরেনকে একখান পত্র লিখে দিলাম যেন তাকে পশ্চিমে যেতে না দেয়। তারপর বোধ হয় পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে ওদের কলেজ বন্ধ হচ্ছে, যাতে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌তে পারে তার জন্য বিশেষ ভাবে লিখেও দিয়েছে।" এই কথা শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন "যদি এতই বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে,—আর একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই সব গোল মিটে যায় তাতে আপত্তি কি?" "যদি দিনের মধ্যে দুইজন নিঃসহায় গরীবের সাহায্যের জন্য মড়া ফেল্‌তেও হয় বা কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করতে হয়, তবে কি দিন দুট করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বল্‌ছ? এ কর্ত্তব্যের শেষ কখন হবে তার কি কিছু একটা সীমা নির্ণয় করা আছে? তা যদি থাক্‌ত তবে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করা যেত। আর প্রায়শ্চিত্ত মানে কি? যদি কেহ কোন দোষ করে তবে তার শাস্তির জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, আমি কি দোষ করেছি? বিনয়ই বা কি দোষ করেছে? সে কি গো ব্রাহ্মণ না স্ত্রীবধ করেছে যে প্রায়শ্চিত্ত করবে—গলায় কাপড় দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? যে কাজ সে করেছে, সকল বাধা অগ্রাহ্য করে, শত সহস্রবার তা করতে সে প্রস্তুত। যদি কোনখানে তার দ্বিধা বোধ হয় তবে বুঝব মনুষ্যত্বের গণ্ডিথেকে নীচে নামতে আরম্ভ করেছে। কেও মাকে ভাত দেয়না, কেও ভাইএর গলায় ছুরী দেয়, কেও ভিখেরীর মুখের অন্ন কেড়ে খায়, কই তাদের ত কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেখি না?"

"ঐ যে বিনোদ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্র আওড়ান,—তাঁর মুনিষ কুঞ্জ বাগ্দী একদিন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল বলে—'বাবু! কি আর বলব? বর্ষার কাদা মেখে, জলে ভিজে না খেয়ে চাষ করলাম, এখন পাকা

ধানে ঠাকুর আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি এতগুলি পুষ্যি নিয়ে কোথা দাঁড়াই আপনি বিচার করে দেন।' আমি আর কি বলব? ওকে কিছু ধান, আটগণ্ডা পয়সা দিয়ে সেদিনকার মত বিদেয় করলাম। ভট্টাচার্য্যের তাতে রাগ কত। যাক আমি যদি কোন রকমে মিটমাট করে দিলাম—কিন্তু কে কার কথা শুনে? ধান মাড়া হলে মাত্র দেড়মন ধান দিয়েই ওকে তাড়িয়ে দিলেন। আবার বলেন কি না, 'ওর অনেক বাকী পড়েছে। যদি না দেয় তবে আমি নালিশ করব'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম বাকী কিসের? তার উত্তরে বলা হ'ল 'আগে থেকে খেয়ে বসে আছে'। খাওয়ার কথাও ত আমার জানা আছে। বর্ষার সময় আট মণ ধান আর তিনটী টাকা সে নগদ নিয়েছিল। তা আবার তাঁর ক্ষেতে ধান রোপার জন্য। তারপর সময়ে বারমন ধান ও নগদ টাকাটা আদায় করেও বলেন যে, 'এখনও তোর বাকী আছে। গত বৎসর ধান মরে গিয়েছিল তার দরুন অনেক বাকী'। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি, এই অত্যাচার গুল কোন্ শাস্ত্রানুমোদিত। এর জন্য কি কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই। যদি না থাকে তবে সংসারে 'ধর্ম্ম' কথাটাও একটা বাজে কথা মাত্র। সহৃদয়তা, পরোপকারের জন্য যদি লোককে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তবে আর কোন্ ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, মানুষ উন্নত হবে? আমাদের এখন শাস্ত্রের গণ্ডগোল আর লোককে পতিত করাই প্রধান ধর্ম্ম হয়ে পড়ছে। হায়রে ধর্ম্ম! কি অন্যায় কাজ করেছিল বিনয়? একজন বিপন্নকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল এই ত। হোক না সে তার চেয়ে ছোট জাত। সেও ত আমাদেরই মত একজন মানুষ? কি করবে গ্রামে মানুষ কে আছে। যাঁহারা এখানকার বিধাতা পুরুষ তাঁদের হৃদয় ত পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। সেখানে কোন অনুভূতিই নেই। নতুবা গরীব বেচারী, যার আজ খেতে কাল নেই তাকে পরামর্শ দিলেন, 'যদি চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত না করাও তবে তোমার বাড়ী কেও মড়া ফেলতে যাবে না'। কিন্তু কি দিয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করে সে খবর ত কেও রাখলে না। আর তারই বা সময় হয়ে উঠল কই! প্রাতঃকালে বিধি দেওয়া হল, দুপুরেই মারা গেল। তাই

বলে কি তার বাড়ীতে মড়া পড়ে থাকবে? বিনয়ের অপরাধ যে সেই হতভাগ্যের একটা সংকারের ব্যবস্থা করেছিল—না হয় নিজেও যোগ দিয়েছিল; উচ্চ জাতি বলে অভিমান ও গর্ব্বে ফুলে উঠেনি এই ত!"

"এই দেশের জন্য বিনয় যদি আমার বাড়ীতে থাকে তবে আমায় পতিত করা হবে!—"তা দশ জনে যদি মনে করে তোমায় পতিত করবে, তুমি একা কি করতে পার?" "আমি একা কি করতে পারি? আচ্ছা!—দেখতেই পাবে আমি কি কর্‌তে পারি! ঐ বিনোদ ভট্টাচার্য্য আর তাঁর চেলা গুলিই যে কেমন বীরপুরুষ এবং আমিই বা কেমন কাপুরুষ, তা আমি যথাসাধ্য দেখে নেব। মনে করোনা যে তাদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করাই আমার উদ্দেশ্য। তবে আমি যা কর্ত্তব্য বলে মনে করব, যা ভগবানেরই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলে মনে করব তাতে কেও বাধা দিতে পারবে না। শত ভট্টাচার্য্যও আমায় এক পা পিছু হটাতে পারবে না। আমি যদি না খেয়ে মরি, আমার ছায়াও যদি কেউ না মাড়ায় তথাপি ভণ্ডামীর দলে মিশে সত্যের অবমাননা করতে আমি কখনই পারব না। ওদের যতদূর ক্ষমতা করে যাক্ আমি সমস্তই সহ্য করে যাব, নিজে যা ভাল বুঝব তাই করে যাব। দরকার হলে পৈত্রিক ভিটে ছারখার করে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাব সেও ভাল, তথাপি আমি যে পথে চল্‌ছি সেই পথ থেকে এক পাও এদিক ওদিক যাব না। সনাতন পন্থীদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

"রাখবনা বল্‌লেই ত আর হয় না! তুমি ত একা ফকির মানুষ নও। তোমার ঘর সংসার আছে, ছেলে মেয়ে আছে। তাদের যখন বিয়ে দিতে হবে তখন কি উপায় করবে—ভেবেছ কি? এই ত হাতেই তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!" "হাঁ আমি খুব ভেবেছি। তোমার চেয়ে আমি কম ভাবি না, তবে তফাৎ—আমি অন্যায়কারীদের ভয় করিনা। বিষহীন সাপের ফোঁস্ ফোঁস আমার সহ্য হয় না। হাঁ—অবশ্যই যাদের গুণ আছে, মানুষের মত বিচার করবার যাদের শক্তি আছে, অনুভব করবার হৃদয় আছে, তাদের পায়ের ধূলা মাথায় নিতে

আমার কোন আপত্তি নেই ; কিন্তু তুমি কি জান চব্বিশ ঘণ্টা ওরা কি কাজে অতিবাহিত করে ?"

"আমার অত খবর রাখবার দরকার নেই। আমি মেয়ে মানুষ সহজ কথায় বুঝি বিবাদ বিসম্বাদ কোন কালেই ভাল নয়। বিশেষতঃ সংসারী মানুষদের পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে মিলে মিশে না থাক্‌লে চল্‌বে কেন ?"

"আমিও তাই চাই গো আমিও তাই চাই। আমি কি কেবল ঝগড়া খুঁজেই বেড়াই তা নয়। তবে ঘরে এসে যদি কেও ঝগড়া কর্‌তে আসে, তাকে মাথায় রেখে পূজা কর্‌তে হবে ? আমি তা পারব না। এতে ছেলে মেয়ের বিয়ে হোক আর না হোক, কিম্বা ঘরসংসার ভেসে যাক্।" "আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা যে তুমি কি করবে। একদিকে ভাণ্ডার খুলে দান, আর জ্ঞাতি কুটুম্ব নিজ জাতিকে বাদ দিয়ে ছোট লোকের সঙ্গে মেলা মেশা আমার ত ভাল বোধ হচ্ছে না।" "ভাল বোধ না হতে পারে ;—কিন্তু ছোট লোক বল না। তাতে আমার বড় লাগে। কে ছোট লোক ? কাকে তুমি ছোট লোক বলতে চাও ? যারা ময়লা কাপড় পরে, আর রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করে তোমার দোরে খাট্‌তে আসে তারাই ছোট লোক ! আর আমি এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দল সব বড় লোক, কেমন ? গোলা মরাই বেঁধেছি কাদের বলে সেটা ভাব কি ? ঐ ছোট লোক গুলোর দ্বারাতেই।—যারা খেতে পায় না পরতে পায় না, একটা কথার সহানুভূতিও পায় না তাদেরই রক্ত জল হয়ে এই সব গোলা মরাই ! দেখ্‌তেই ত পেলে সেদিন পূজার সময় ? ছোট লোকদের খাওয়ালাম ডাল আর ভাত তাতে তারা দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ আর জয়ধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী গেল ; কিন্তু ব্রাহ্মণ-কুটুম্বদের খাওলাম নানা রকম ষোড়শোপচারে ব্যবস্থা করে ;—কোথায় মিষ্টান্ন, কোথায় ফল ফুলুরি—তার ফলে পেলাম নানারকম সমালোচনা আর ঠাট্টা বিদ্রুপ ! এখন বল দেখি কে ছোট লোক ?"

গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"না আমি তা বলিনি। সে হিসাবে আমি কিছু বলিনি তবে সবদিক্ রেখে ত চল্‌তে হবে ? গরীবদের

আমি ছোট লোক বল্‌ছি না, তাদের উপকার না করতেও বল্‌ছি না; কিন্তু ওদের নিয়ে ত আর তোমার কুটুম কুটুম্বিতা চল্‌বে না ? সে সকলের জন্যে ত তোমার জাতির সঙ্গে মিশতে হবে ! সমাজে থেকে ত যথেচ্ছাচার চল্‌বে না ! আমি বল্‌ছি বিনয় আসুক তার না হয় একটা যা হয় মিটমাট করে ফেল।” “মিটমাট আর কি করব। গোলমাল ত কিছুই দেখ্‌ছি না ! বিনয় যদি মানুষ হয়, তার হৃদয়ে যদি বল থাকে, তবে সে আমার কথা গ্রাহ্য না করে আরও শত শত বিপন্ন ডোম চাঁড়ালকেও রক্ষা কর্‌তে ছুটে যাবে। কোন রকম বাধা-বিঘ্ন তার সে গতিরোধ করে দাঁড়াতে পারবে না। নিতান্ত যদি তার সাহস না হয় আমিত আছিই ! দেখি একবার কে কি করতে পারে। আমার ধন আমি বিলিয়ে দেব, আমার শরীর মন আমি আর্ত্ত দুঃখীর সেবায় নিয়োজিত করব কার কি বল্‌বার আছে ? আমি দৃঢ়ভাবে বল্‌তে পারি এতে ভগবান্ আমার উপর কখনই নারাজ হবেন না। যদি হন, তবে ‘দীনবন্ধু’ বলে কোন দিন ডেকোনা।”

“আচ্ছা বিনয়কে যখন আস্‌তে লিখেছ তখন আসুক তারপর যা হয় করা যাবে, কিন্তু মিটমাট্ তোমার করতেই হবে। না হয় স্বীকার করলাম তোমাদের মতের সঙ্গে ওদের মত মিলে না। তাই বলে তোমার কি কর্ত্তব্য নয় যাতে সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলকে নিজের মতে আনা যায় ? সকলে মিলে গ্রামের বা দেশের যতখানি উপকার করা যায়, একা তার কতখানি হ’তে পারে ? তাছাড়া এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির কথা লোকে যত শ্রদ্ধার সহিত মানে অন্যের কথায় তত গ্রাহ্য করে না। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ অধিকাংশ ভদ্র লোক একদিকে দল বেধেছে তুমি কি তাদের সঙ্গে জেদাজেদিতে পেরে উঠ্‌বে ?”

কিশোরীমোহন বাবু গৃহিনীর এই কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন তার-পর অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—“দেখ—এত আর দাঙ্গাহাঙ্গামা নয় কিম্বা মাম্‌লা মোকদ্দমাও নয়, এর মধ্যে পারা না পারার কথা কি থাক্‌তে পারে ? আসল কথা এইযে আজকাল যত ভদ্র লোকই প্রথম শ্রেণীর স্বার্থপর। তাদের স্বার্থে একটু আঘাত লাগ্‌লেই তারা লাফিয়ে উঠে।

গলাবাজিতে নিজের স্বার্থ অটুট রাখ্‌তে চায়। কিন্তু চিরদিন কি আর তাই চলে? কেও পোলাও কালিয়া খাচ্ছে আর তারই দোরে একটা লোক যখন শুধু চারটী নুন ভাতের অভাবে প্রাণ দিচ্ছে অথচ তার ভ্রুক্ষেপ নেই—এটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমি আর কিছু পারি না পারি নিজের সম্পত্তিটাও অন্যের জন্য ব্যয় করে দিয়ে যেতে পারব? বিনয়কে নিয়ে এসে স্কুলটা বেশ যাগাচ্ছি, যাদের ছোট লোক বলে সমাজের নেতারা পদাঘাত করেন—তাদের একটু আধটু লেখা পড়া শিখাবারও বন্দোবস্ত করছি, এটা তাঁদের সহ্য হচ্ছে না। ভয় পাচ্ছে কোন দিন চোখ্ ফুটে তারা নিজের অধিকার বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। কেন? চিরদিন যে তোমরাই একচেটিয়া ভোগদখল করবে তারই বা কারণ কি? এখন পর্য্যন্ত এই সব পাড়াগাঁয়ে নিতান্ত চরিত্রহীন নামে মাত্র উচ্চ জাতিতে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে সাধারণ লোকে দেবতার অংশ বিশেষ মনে করে। তা করুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কেও যদি তাহার দাবির অতিরিক্ত সম্মান আপনা আপনিই পেয়ে যায় মন্দ কি? কিন্তু সেই সম্মানের প্রতিদানস্বরূপ যদি আবার সম্মানদাতাকে সে পদাঘাত করে তবে কয়দিন মানুষ সহ্য করতে পারে?”

“যাদের পদাঘাত করে তারা যদি সহ্য করে তোমার তাতে ক্ষতি কি? যার ব্যথা সে যদি বুঝ্‌তে না পারে অন্যে কি করবে?”

“অন্যে কি করবে বল? যদি কিছু করবার থাকে অন্যকেই করতে হবে। কারণ যার ব্যথা তার এখন বাহ্যজ্ঞান নেই। আঘাতের পর আঘাতে তাহার জীবনী শক্তি যেন নষ্ট হয়ে পড়েছে। ভিতরে ভিতরে প্রাণ যন্ত্র অতি মৃদু গতিতে চলে যাচ্ছে মাত্র। যে মুমূর্ষু, আপনাকে নড়াবার শক্তিও যার নেই—সে নিজের জন্য কি করতে পারে? তাই বলে যে সুস্থ শরীরে এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে, তার কি কর্ত্তব্য নয় তাকে সজীব করে তোলা? তা যদি না হয় তবে সংসারে মানুষ হয়েছিলাম কেন? কাজে কাজেই আমার দৃঢ়পণ—মান সম্মান ধন সম্পদ যার সাহায্যে পেয়েছি,—সে সমস্তই তার কাজে বিলিয়ে দিব! এ ক্ষেত্রে তুমিও যদি আমার সহায় হও তবে আরও শান্তি পাব। আর যদি বাধা দাও—রাখ্‌তে

পারবেনা কেবল দুই জনেই অশান্তি ভোগ করব মাত্র।” “আমি কি কোন দিন তোমার কোন কাজে বাধা দিয়েছি—না বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য? আমি তোমার সহধর্ম্মিনী সুতরাং তোমার কর্ত্তব্যই আমার কর্ত্তব্য; তোমার ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম একথা কি আমি জানি না? তবে কিনা আমার ভয় হয়—পাছে কেউ কিছু অনিষ্ট করে বসে। “কিছুই ভয় নেই। নিশ্চিন্ত বসে বসে সেই ভয়হারীকে ডাক, সব ভয় কোথায় চলে যাবে। কিসের ভয়, কার জন্য ভয়? সংসারে যদি কিছু পাপ থাকে তবে ঐ ভয়। মানুষকে সত্যের পথ থেকে বিচলিত করার এমন শত্রু আর নাই। সত্যের পথে যেতে যেতে যদি ক্ষণস্থায়ী জীবনও পরিত্যাগ করতে হয় তাতেও বিচলিত হওয়া কখন উচিত নয়।”

“আমি কি কেবল নিজের কথাই ভাবি মনে কর? এইযে পাড়ার মেয়েরা কেউ আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলেনা, কত ঠাট্টা বিদ্রুপ করে—তাতে কি আমি কাণ দিই? কেবল আমাদের উপর দিয়েই যদি যেত তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমাদের কাজের ফল অন্যকে ভোগ করতে হবে এই টাই-ত ভাববার কথা।”

“বুঝেছি তুমি নিজের কথা ভাবনা—ছেলে মেয়েদের কথা ভাব কিন্তু যা কর্ত্তব্য তার জন্য আবার ভাবা ভাবি কি? তোমার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কি তুমি ভেবে কিছু পরিবর্ত্তন করতে পার? অন্য মেয়েদেরও যা হয় একরকম ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। বাকী কেবল শান্তি আর নরেন। শান্তির জন্য কোন চিন্তাই আমি করিনা, কারণ তার হৃদয় আমি বেশ ভালরকম করেই পরীক্ষা করেছি, কোন চিন্তা নাই; কিন্তু নরেনের দ্বারা বিশেষ কিছু আশা বোধ হয় করা যায় না। সে রাস্তা ভুলেছে, এমন কি ফেরাবার কোন ব্যবস্থাও আমাদের হাতে নাই, যদি সে নিজে বুঝতে না পারে এবার ছুটীতে বাড়ী এলে আমি তাকে কাজে লাগাব মনে করেছি। দেখা যাক্ কি হয়।” তাঁহাদের এই সব কথা বার্ত্তার মধ্যেই শান্তি একখানা চিঠি আনিয়া বাবার হাতে দিল। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়াই খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহা স্কুলের হেড্পণ্ডিত হরিতারণ মুখোপাধ্যায়এর লেখা। তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ একবার তাঁহাকে স্কুলে যাইতে

অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ হেড্ মাষ্টার অনুপস্থিত, এ অবস্থায় কোন বিষয়ে পরামর্শ লইতে হইলে স্কুলের সম্পাদককেই জানান একান্ত দরকার। হরিতারণ মুখোপধ্যায় কিশোরা মোহন বাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু। ছেলে বেলায় তাঁহারা অনেক দিন এক স্কুলে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতা বশতঃ তিনি বেশী দূর পড়িতে পারেন নাই। মধ্য-ইংরাজি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া নর্ম্ম্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ছিলেন। তার পর নর্ম্ম্যাল পাশ করিয়া গ্রামের মধ্যবাঙ্গালা স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। আজ কিশোরী মোহন বাবুর যত্নে মধ্যইংরাজী স্কুলে পরিণত হওয়ায় তিনি হেড্পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন। তিনি এক জন উপযুক্ত শিক্ষক বলে আজ পর্য্যন্ত অনেক প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন। চিঠি পাইয়াই কিশোরী মোহন বাবু বুঝিলেন কিছু নূতন বিভ্রাট ঘটিয়াছে। কাজেই তিনি স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

কৃপা বাতাস বইছে জোরে
　　ভয়ের সাগর মাঝে
ভক্তি বাদাম উড়িয়ে দেনা
　　ভাবনা কি তোর সাজে
সাহস বেঁধে থাক্ না বসে
　　ডুব্‌বে না তোর তরী
এক মনেতে হালটা ধরে
　　ধর না এবার পাড়ি
এক টানেতে লাগবে তরী
　　অপর কূলের ধার
ওরে আমার নায়ের মাঝি
　　ভাবিস্ না তুই আর॥

— ত্যাগ চৈতন্য।

মীরা।

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ)

অনুসরি দূর ব্রজের পন্থ
রাজবধূ মীরা ধায় ;
হেরিতে বৃন্দাবিপিন ইন্দু
কুঞ্জ-গগন গায়।

রুদ্ধ হয়েছে প্রাসাদের দ্বার,
নাহি আজি তার কোন অধিকার,
পৌরজনের স্নেহ অনুরাগ,
সান্ত্বনা যাতনায়—

সে যে গাহে গান বাতায়ন তলে,
ত্যজি অবরোধ অবাধে সকলে,
বিলাইতে চায় চির দুর্লভ,
নন্দন গীতিকায়।

ছেদিয়া চাঁচর চিকুর গুচ্ছ,
গায়ে নামাবলী দিয়া,
চির আরাধিত তুলসী-মাল্য,
কণ্ঠে বিলম্বিয়া—

পরিহরি মণি মুক্তার সাজ,
নবীনা যোগিনী সে হয়েছে আজ,
শোভে করঙ্ক বাম করতলে,
ভকতি সৌম্য হিয়া।

দলিয়া অসীম বাসনার সীমা,
সসীমের ধ্যান ধারণা গরিমা,
কর্ণ বিসারি করুণ নয়নে,
উঠিতেছে ঝলকিয়া।

পথের পান্থ থমকি দাঁড়ায়;
হেরিয়া রূপের রাশি,
নমিত আননে স্বর্গীয় বিভা,
নীরবে উঠিছে ভাসি।

পুরবধূকুল গুণ্ঠন তুলি,
বলে তুমি কে গো কি মায়াতে ভুলি,
কোথায় ছুটেছ ? কর বিশ্রাম
আমাদের গৃহে আসি।

না দিয়া কর্ণ কাহারো কথায়,
চ্যুত অম্বর উল্কার প্রায়,
সে শুধু ধাইছে করি বিদলিত,
প্রকৃতির বাধারাশি।

একদা ফাগুনে পলাসে যখন
ছাইয়াছে বনতল,
ফাগ উৎসবে লাল হ'য়ে গেছে,
স্বচ্ছ যমুনা জল।

প্রবেশিলা মীরা ব্রজের সীমায়,
কম্পিতা নত বেতসের প্রায়,
কণ্টকময় সকল গাত্র
ভাবাবেশে বিহ্বল,

নীরদ নিন্দী তমালে হেরিয়া,
ধরিবারে ধায় বাহু প্রসারিয়া,
ব্রজের ধূলায় লুটায়াইয়া কাঁদে,
বক্ষেতে দাবানল।

শ্রীরূপ তখন ভাণ্ডীর বনে,
মাধবী-কুঞ্জতলে,
হরিনাম গানে ছিলেন মগ্ন,
লইয়া শিষ্যদলে।

ব্রজবাসী এক আসি জোড় করে
কহিলা "গোঁসাই, হেরিতে তোমারে
মীরা নামে এক রমণী যাচিছে
প্লাবিতা অশ্রুজলে"।

কহে যতিবর "আমি বনবাসী
নহি কভু নারী সঙ্গ-প্রয়াসী
কহিও তাহারে সে যেন না আসে
আমার দরশ ছলে"।

এ কথা যখন শুনিলা তরুণী
দীপ্ত অরুণ আঁখি,
কহি পাঠাইলা "এখনো তাঁহার
শিক্ষা অনেক বাকি।

"একা ব্রজভূমে ব্রজনাথ বিনা,
দ্বিতীয় পুরুষ আমি ত দেখিনা,
বৃন্দাবনের লীলার অর্থ
ব্যর্থ হইল নাকি ?

"যে দিকেতে চাই, সেইদিকে হেরি,
অতি অপরূপ রূপের মাধুরী,
তৃণ লতা দল কুঞ্জ অচল
একরূপে মাখামাখি ।"

পরদিন প্রাতে গাহন অন্তে
পরিয়া বহির্বাস,
শ্রীরূপ চলেছে মীরার কুঠিরে
দর্প হয়েছে নাশ ।

দ্বারের প্রান্তে কহিছে আসিয়া
"কে মা তুমি মোর ধ্বান্ত নাশিয়া,
এত দিন পরে করিলে আমার
সার্থক সন্ন্যাস ?"

ছুটে আসি মীরা নত হ'ল পায়,
চরণের রেণু লইয়া মাথায়,
কহে জোড় করে "দাও মোরে প্রভু
অনন্ত বিশ্বাস ।"
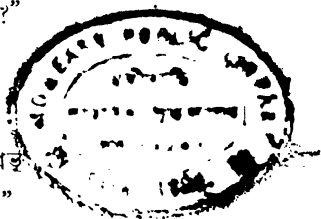
সংবাদ ও মন্তব্য

১। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজোপলক্ষে ৺ভুবনেশ্বর গমন করিয়াছেন—শীঘ্রই পুনরায় বেলুড়ে ফিরিবেন ; পূজায় ছয় হাজার দরিদ্র নারায়ণ ভোজন হয়।

২। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ ৺কাশীধাম হইতে ফিরিয়াছেন—শীঘ্রই তিনি জয়রাম-বাটী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠোপলক্ষে গমন করিবেন। প্রতিষ্ঠা কার্য্য আগামী অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

৩। শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দ কাঁথি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসবে যোগদান ও বক্তৃতাদির পর কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

৩। বিগত ২৪শে ফাল্গুন দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ, সেবক ও ছাত্রগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ সেখানে বক্তৃতা করেন। দেওঘর বিদ্যাপীঠের বয়স একবৎসর মাত্র। বর্ত্তমানে সেখানে ১৭টী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত আছে। শিক্ষক ছয় জন। শীঘ্রই আরও ১২টী ছাত্র ইহাতে যোগদান করিবে। তাহার পর তিনি পাটনা জনসাধারণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে বক্তৃতাদি করেন।

৫। নিম্ন লিখিত স্থান হইতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সম্বন্ধে খপর পাইয়াছি—কোয়ালালামপুর, দিল্লী, ময়মনসিংহ, জামালপুর (ময়মনসিংহ), ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রাঙ্গুনীয়া (চট্টগ্রাম,) সীতাবলদি (নাগপুর), বেতিলা (মাণিকগঞ্জ), দৌলতপুর (পাবনা), পঞ্চখণ্ড (শ্রীহট্ট), ত্রিবেণী (হুগলী), ডিব্রুগড় (আসাম) এবং ভারুকাটী (বরিশাল)। স্থানা ভাবে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল না। স্থানীয় সকল গন্য মান্য লোকই ইহাতে যোগদান করেন।

ঠাকুর।

(শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী বি, এ।)

রাজপথে তোমা খুঁজিয়া বেড়াই,
তুমি সরে থাক পথের নাচে
রথে চেয়ে দেখি তুমি সেথা নাই,
তুমি আছ দেখি রথের পিছে।
রাজ প্রাসাদে যথা অবিরল
হীরা মতি কত করে ঝলমল,
সেথায় তোমায় না পাই খুজিয়া,
তুমি থাক সদা দীনের কাছে

প্রেমে ঢলঢল, হাসি খলখল,
বিলাসের হাট যেথায় রাজে,
দূর হ'তে দেখে' হেসে চলে যাও,
যাওনা কখনো তাদের মাঝে।
সব হারা যেই অবনীর তলে,
ভাসে সদা বসি নয়নের জলে,
আদর করিয়া অঞ্চলে তার
নয়নের বারি দেও গো মুছে।

কত আয়োজন, কত ধূমধাম,
যেথায় তোমার সেবার লাগি,
সেথায় তোমার নাহি মিটে ক্ষুধা,
"বিদুরের ক্ষুদ" লওগো মাগি।
দয়া করি তুমি যাও যার পাশ,
যারে ভালবাস,—কর সর্ব্বনাশ,
তুমি যদি আস, ক্ষুদ্র সত্য
হ'য়ে যায় দেখি সকল মিছে।

হিন্দুত্বের ভিত্তি।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

উপক্রমণিকা।

ভারতের মহত্ত্ব যোগ। আমরা ভারতবাসী আমাদের শক্তিবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি—অতীত ইতিহাসের গর্ব্ব করিবার গৌরব করিবার, যা কিছু স্মৃতি আমাদের আছে, সমস্তই এক মহিমাময় জীবনের ধ্বংসচিহ্ন, আর, সেই জীবন যোগের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভারতের দেব দেবীর অকলঙ্ক আলেখ্য, পুরাণের রাজেন্দ্র মনীষীগণের অলৌকি চরিত্র কাব্য, দর্শন, বেদাঙ্গ সমস্তই একমাত্র শিক্ষার নির্দ্দেশক এক লক্ষ্যের সোপান-পীঠ-পরম্পরা,—সেই লক্ষ্য যোগ।

যোগী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আর যোগমার্গগামী কৃষ্ণভক্ত। জীবনে যে টুকু যোগমার্গ ধরিয়া চলিবার প্রয়াস সেই টুকুই ব্যক্তিতে ব্যক্ত ঈশ্বর; আর যেটুকু সেই প্রয়াসের সাধনা তাহাই জীব। জীব শিবে লয় হইলে। ব্যক্তি ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পরে নিবৃত্ত ভবযন্ত্রণা হইয়া মোক্ষ পাইবে,

সমস্তই বিভিন্ন ভাবে একমাত্র কথার ব্যাখ্যা। ঐ যোগমার্গ ধরিয়া গমন, যাত্রার শেষ প্রয়াসের পরিসমাপ্তি—লক্ষ্যে আগমন, তারপর যোগিত্ব প্রাপ্তি এই ক্রম বর্ণনারই ব্যাখ্যা।

যোগই পরমপদ, যোগই ভক্তের ঈপ্সিত বৈকুণ্ঠ, যোগই তপস্বীর লক্ষ্য।

আমরা যোগ বলিতে জানি পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগ—যোগশ্চিত্তবৃত্তে নিরোধঃ—জানাটা ভুল নহে, কিন্তু অসম্পূর্ণ। আমাদের জানিবার মধ্যে সাধারণতঃ এই ভুল স্থান পাইয়া যায় আমরা শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরি না। আরও অনেক জানিলে তবে যোগের পথে প্রবেশ লাভ ঘটে; ততখানি জানিতে হয়ত সবুর সয় না, কাজেই, সমস্ত জীবনটাকে আমরা যোগবিহীন যোগ দিয়াই ভরাইয়া তুলিবার উপক্রম করি, যে যোগে এই জীবন ত্যাগের পথে অকলঙ্ক শুভ্র পতাকার মত বহন করা চলে কিন্তু জীবনের অন্তরে শূন্যতা ভরে না।

পতঞ্জলি যাহা দিয়াছেন তাহা কতকগুলি processes (পদ্ধতি); কি করিয়া হইবে তাহারই অনুশীলন, কিন্তু কি হইবে সে কথা তাঁহার দর্শনে নাই। তিনি বলিয়াছেন এই এই নিয়মে থাকিয়া এই এই উপায়ের অনুষ্ঠানের দ্বারা যোগ সাধন হয়.—সে কথা তো সব নহে! তার পরও ত অনেক কথা, আসল কথাই অনুক্ত রহিল। কাহার সহিত যোগ সাধন হয় তাহাই তিনি যোগ দর্শনে লিপিবদ্ধ করেন নাই। যাহারা লিখিয়াছেন তাঁহারাও অতি কুহেলিকাচ্ছন্ন ধূম্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং প্রস্তাবনাতেই তাহা দর স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে. যে বিষয় আমাদের ব্যাখা করিতে হইতেছে, তাহা—

> ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
> ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥

অর্থাৎ তথায় চক্ষু বাক্য মন কেহই যায় না। আমরা সে যে কি তাহা জান না, কিরূপে তৎসম্বন্ধে শিষ্যকে উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। কেনোপনিষৎ ৩॥

সুতরাং আধুনিক রবীন্দ্র সাহিত্যের যেমন হেঁয়ালী জড়িমা ছাঁদ তাঁহাদের সমস্ত শিক্ষারও তেমনি আরও ততোধিক হেঁয়ালী জড়িমা ছাঁদ।

অনুভব রাজ্যের নিবিড় নীড়ে বসিয়া তাঁহাদের ভাষা অব্যক্তের স্পর্শপুলকে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল—যেন বহুদূর ছুটিয়া আসিয়া তাহার শৃঙ্খলাহারা শব্দরাশি ছিন্ন ভিন্ন মালিকার ফুলের মত প্রকাশের তটপ্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে আবার ঐ অনুভব স্পষ্ট ছিল ঐ অনুভূতিই তাঁহাদের জীবন বিকাশের মূল শক্তিকে গতি দিতে পারিত। ঐ processes এবং excercises দ্বারা আপনাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সরল ভাবে ধরিয়া রাখিয়া তাঁহারা সেই অনুভব বোধকে বিকৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন। শিষ্যকে যোগ দিতেন আপনার যোগদ্বারা আর তাহাদের মধ্যে যোগবল বৃদ্ধি করাইতেন ঐ সমস্ত processes এবং excercises দ্বারা।

সামান্য একটু উদাহরণ এখানে কার্য্যকরা হইতে পারে, সন্তানে মা বাপের কাছে যে শিক্ষা পায় তাহার সবটা হাতে কলমে দিতে হয় না। এমন কতক শিক্ষাও তাহারা তাঁহাদের কাছে লয় যাহা হাতে-কলমে দেওয়া যায়ও না এবং দিতে হয়ও না। ধর তাঁহাদের অভ্যাস। সেটা তাঁহাদের অভ্যাস হইতেই উহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

যোগের দ্বারাই যোগ শিক্ষার প্রচলন ছিল,—সেটুকু গুরু পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে—সাধু সঙ্গ এই জন্যই প্রশস্ত, হরি কথার এত মাহাত্ম্য,—তপস্যার দ্বারা এই যোগবল শিষ্যে বর্দ্ধিত করিয়া লইতেন। পাতঞ্জল দর্শনের সূত্র তপস্যার formulæ।

সুতরাং যোগ বলিতে আমাদের জানিতে হইবে কেবল কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নহে। জানিতে হইবে, ঐ ক্রিয়া প্রক্রিয়ার প্রাণবস্তু, যাহার অভাবে ওগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠান, মালা ঠক্‌ঠকি, নাক টেপাটেপি হইয়া পড়ে সেই ভাবকেই। যোগ সাধনার অঙ্গগুলি অঙ্গমাত্র; ঐ অঙ্গের প্রাণ আছে, সেই প্রাণই সাধনার সাধ্য যোগ। তাহারেই লাভ করিলে যোগী হয়। দীর্ঘ জন্ম অবধি ব্যাপিয়া ঐ অঙ্গগুলির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে যোগী হয় না। বুঝিয়া রাখিতে হইবে যোগিগণ যোগের দ্বারাই যোগী করিতেন আমরাও যোগের দ্বারাই যোগী হইব।

যোগ গ্রহণে যোগসাধ্য (যাঁহাতে যোগ) যিনি তাঁহাকেই লক্ষ্য

করিতে হয়, সাধন-ভজন পদক্ষেপ মাত্র। তাঁহাকেই ধীরে ধীরে জীবনময় করিয়া ফেলিতে হইবে ইহাই যোগ।

স্পষ্টতঃ যোগ একটা অবস্থা মাত্র; যোগীত্ব একটা পদ; যোগী সেই পদারূঢ় হইয়া একটা স্থান লাভ করেন তাহাকে ঈশ্বরের ঘর বলিতে পার—যিনি সেইখানে গিয়াছেন তিনিই যোগী। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যোগী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

* * * * * *

আমরা হিন্দু আমরা বলি জীবনের চরম উন্নতি ঈশ্বর লাভ এবং এই কথা বলাই আমাদের নূতনত্ব। এই নূতনত্বটুকু বিশ্বে কেবল আমাদেরই আছে—আমাদের জাতীয়তাও এই নূতনত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর সকল জাতেরই ধর্ম্ম আছে—ঈশ্বর বিশ্বাসী জাতেরও অভাব নাই, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে এই আদর্শের উপর অপর কোনও জাতেরই জীবন-সমাজ ও জাতীয়তার ভিত্তি বিন্যস্ত নহে। যোগের উপর কোনও জাতিই এ ভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে।

অবশ্য জীবনের ক্ষেত্রে প্রাণের দিক দিয়া বিচার করিলে—এতবড় কথাটা আমাদের ধাক্কা দিতে পারে। সত্যই ত! পৃথিবী হইতে একেবারে আলাদা যেন স্বতন্ত্র গ্রহ লোকের অধিবাসী হইতে হইবে; কাজ কি এ বৈশিষ্ট্যে? ঈশ্বর বিশ্বাস আমার আছে অপরেরও আছে। ধর্ম্ম আমার আছে, অধিকাংশ জাতিরই আছে। ঈশ্বর লাভ এখনও ত করি নাই, করিব কি না জানিও না। আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া বিশ্বমানবের সহিত যদি পৃথক হইতে হয় তবে, আমাদের বিবেচনা করিয়া লাভালাভ তৌল করিয়া বোধগম্য হইলে আদর্শের ছাঁট-কাট করিয়া লওয়া মন্দ কি! শুধু শুধু বিশ্বমানব হইতে নিজের জাতিকে স্বতন্ত্র করা ভাল বুঝি না! বিশ্বে যখন থাকিতে হইবে পালে মিশিয়া থাকা ভাল।

এমন ধাক্কাকে কখনই অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না। স্বভাবে জ্ঞানও আছে অজ্ঞানও আছে। জীবন স্বভাবেই বিরচিত। আমাদের আদর্শ জ্ঞানে গঠিত, অতএব তাহা নির্ব্বিবাদে জয়যুক্ত হইবে এ কথা অযৌক্তিক! জীবন জ্ঞানের উপাদানে গড়িতে হইলে তাহাকে অজ্ঞানের

ধাক্কা সহ্য করিয়াই গড়িয়া লইতে হইবে। সুতরাং অজ্ঞানের দিক হইতে যত প্রতিবাদ সে' ত করিবেই, জ্ঞানের দিক হইতে সত্য উত্তর তাহার আগমন পথ মুক্ত করিয়া রাখাই ইহার একমাত্র প্রতিকার।

ইহা যে দিন অবধারিত হইয়া উঠিবে আমরা স্বতন্ত্র, সে দিন স্বভাবতঃ স্পষ্ট হইবে যে এক হওয়া চলে না, অর্থাৎ স্বভাববশেই আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারি। কোনও বস্তু হইতে তাহার স্বভাবসিদ্ধ উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করা যেমন তাহাকে ভাঙ্গিবার প্রয়াস তেমনি কোনও বস্তুতে তাহার বিপরীত প্রকৃতিগত উপাদান জোর করিয়া মিলাইতে যাওয়া তাহাকে বিকৃত করা। (ক্রমেই আমরা দেখিব জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের যতগুলা ধাক্কা সহিতে হইয়াছে তাহার কোনওটা আমাদের ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং কোনওটা বা বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছে)। যদি আমাদের বৈশিষ্ট স্বাভাবিক হয় তবে আমাদের জগতের সহিত চলিবারও বিশিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি আছে। সেই নিয়ম-পদ্ধতিতে যদি পালে মিলিয়া থাকার সমর্থন না থাকে তবে পালে মিশিতে গেলে পালও আমাদের প্রতি শৃঙ্গ আস্ফালন করিয়া ধাইয়া আসিবে, আমরাও যে কাজের জন্য সৃষ্ট নহি তাহা করিতে গিয়া বৃথা নিজেদের নষ্ট করিতে থাকিব। তার উপর আরও কথা আছে, যাহার বৈশিষ্ট আছে তাহার বিশিষ্ট স্থানও আছে। আদর্শ অনুসরণ করিয়া যদি বিশ্বমানব হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ি, সে ভয়ের কথা নহে,—ভরসার কথা। সেই স্বাতন্ত্র্যের উপরই আমাদের নিজস্ব,—আমাদের জীবন বিকাশ।

বড়ই জটিল কথা; জটিল এই জন্য যে, বিজ্ঞান আমাদের বোধের মানদণ্ড সেই বিজ্ঞানে এই সকল তত্ত্বের অধিকাংশ ধরা পড়ে না। কিন্তু আমাদের জিনিস সত্যই আমাদের কাছে জটিল নহে। পরের শিক্ষা-পদ্ধতি যাহা শিখিয়াছি তাহাদের সত্যকে আয়ত্ত করিতে বোধের যে মানদণ্ড অবলম্বন করিয়াছি সেটা শুধু তাহারই শিক্ষাশালার উপযোগী আমার নিজস্ব জিনিস আয়ত্ত করিবার কৌশল আমার মধ্যেই আছে—এই টুকু চেতনা চাই, সমস্ত জটিলতা দূর হইবে।

সংসার।

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এখন একবার কিশোরীমোহন বাবু এবং বিনয়ের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কিশোরীমোহন বাবু কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামের সম্রান্ত গৃহস্থ। তাঁহার পূর্ণ নাম কিশোরীমোহন ঘোষ জাতিতে কায়স্থ—কুলীন। সূক্ষ্মদর্শীকে বলিব তিনি তথাকথিত উপাধি-ধারী কুলীন নহেন, প্রকৃতই কুলীন, এবং আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ইংরাজী নবীসের মানুষ আবার শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে খুব আস্থাবান কিন্তু গোঁড়ামীর পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার হৃদয় খুব উচ্চ এবং উদার। তাঁহার স্বভাব সুন্দর, মুর্ত্তি পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া আর্ত্ত দুঃখীর প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। তিনি সকল সময়ই গরীবদের দুঃখে কাতর। শুধু তাই নয় তাহাদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তিনি সকল সময়ই প্রস্তুত। তাঁহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দানের জন্য সদা উন্মুক্ত। অপর দিকে নিজের সংসারটীকেও একটী প্রকৃত সুখের সংসার করিবার জন্য সকল সময় চেষ্টিত। ইহাতে যদি কেহ তাঁহাকে স্বার্থপর বলেন, তবে বলিব, সংসারধর্ম্ম পালনের শ্রেষ্ঠ উপায় তিনি জানেন না। কারণ, যিনি অন্যকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতে হয়। আদর্শ গৃহস্থের নিজের সংসার সকল সময়ই সুশৃঙ্খলাপূর্ণ। যাহার নিজের মধ্যেই আগাগোড়ায় গলদ তিনি অন্যের কিছু করিতে পারেন না।

কিশোরীমোহন বাবুর একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। কন্যা শান্তিও পিতার আদর্শেই গঠিত হইয়া দিন দিন নারী-সুলভ গুণে ভরিয়া উঠিতেছিল। পিতা সেই আদরের

কন্যার শিক্ষার ফল দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। এবং নিজকে সেজন্য ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী তাই সকল মেয়েকেই স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াইয়াছিলেন। অবিবাহিতা শান্তি সম্প্রতি সেখান হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ীতে পড়িত। তিনি নিজে এবং তাঁহার আশ্রিত বিনয় শান্তির পড়াশুনার ভার লইয়া ছিলেন। মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়াও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু কলেজী বিদ্যা আর পাশের উপরে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। বিশেষতঃ সহরের কোন স্কুলে মেয়েকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তিনি ভাল বিবেচনা করিতেন না, কারণ জানিতেন,—ইহাতে পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সুফল অপেক্ষা কুফল পাওয়ার আশঙ্কাই বেশী। সেরকম ভাবে শিক্ষিতা হইলে মেয়ে বিলাসিনী হইয়া পড়িবে এবং সাধারণ ভাবে সংসার চালাইতে অক্ষম হইয়া পড়িবে। এ দেশের মেয়েদের এখন ফ্যাসান আর বাবুয়ানা লইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নয়, কাজ করিবার সময়।

পুত্র নরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবাসে বাস করিয়া যেন সেই রকমই হইয়াছিল। যদিও সে পিতাকে রীতিমত ভয় করিত এবং খুব সাবধান হইয়া চলিত, তথাপি সময়ের সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু ছেলের জন্য তিনি বড় বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। যেহেতু তিনি বুঝিয়াছিলেন, 'ধাক্কা খাইলে আপনিই শুধরিয়া যাইবে; আর রাশও এখন আমার হাতে আছে চেষ্টা করিলে বেগ ফিরান যাইতে পারে'। কিন্তু মেয়েকে অত আল্‌গা ভাবে ছাড়িয়া দিতে তিনি সাহস করেন নাই, তাই বাড়ীতেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কিশোরীমোহন বাবু যেরূপ ভাবে বাড়ীতে মেয়ের শিক্ষা বিধান করিতেন, তাহা বর্ত্তমান সমস্যার দিনে উপযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। প্রথমতঃ ছেলে অপেক্ষা মেয়ের আদর তাঁহার বাড়ীতে কম ছিল না বরং বেশী। ইহাতে যদি কোন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা—যাঁহাদিগকে মেয়ের জন্য ভিক্ষাংদেহী বলিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাঁহারা যদি আশ্চর্য্য বোধ করেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু

আসল কথা, মেয়েকেও তিনি ছেলের ন্যায় মানুষ করিতে জানিতেন। অবশ্য একথা খুবই সত্য যে, পুত্রব্যবসায়ী পিতা উপযুক্ত মূল্য না পাইলে আজ কাল বিবাহ দিতে চান না; এমন কি অধিকাংশ স্থলে কন্যার রূপগুণ বিচার না করিয়া কোথায় মূল্য বেশী পাওয়া যাইবে সেই আশায় ঘুরিয়া বেড়ান। তাহা হইলেও কিশোরীমোহন বাবুকে অতটা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। তাঁহার রূপগুণ সম্পন্না গৃহিণীর উপযুক্ত কন্যা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং বিবাহান্তে বাস্তবিকই বরকর্ত্তা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেন না। আর তিনিও যে একেবারে বিনামূল্যেই জামাতা ক্রয় করিতে পারিতেন এমন নয়, তবে মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত না; কারণ সেখানে বরকর্ত্তারও আগ্রহ থাকিত। এইরূপে তিন চারিটি কন্যাকেই তিনি উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠা শান্তির জন্য তিনি কোন চিন্তাই করিতেন না—তাহাকে একটী আদর্শ গৃহিণী করিয়া পাত্রস্থ করাই তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত ছিল।

যখন শান্তি তাঁহার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে স্কুলে যাইত তখনও তাহাদের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিতেন। ভোর ও সন্ধ্যা বেলা কাছে ডাকিয়া নানারূপ উপদেশ, গল্প, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যের ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সাধারণতঃ স্কুলে যে ইতিহাস ছেলেদের পড়ান এবং যে প্রণালীতে পড়ান হয়, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। এক একটী চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া এরূপ ভাবে তাহাদের শুনাইতেন, যাহাতে ইতিহাস পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার, কঠোর অধ্যবসায়ের অসম্ভাবিত সাফল্যের চিত্র তাহাদের সুকোমল হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ শিবাজীর ইতিহাস পড়িয়া সাধারণতঃ ছেলে মেয়েরা তাঁহাকে দস্যু ছাড়া আর কিছু ধারণা করিতে পারে না। তাঁহার অলৌকিক স্বদেশপ্রিয়তা ও আত্মত্যাগ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত দৃঢ় চরিত্রের বিষয় অন্ধকারেই ঢাকা থাকে। কিশোরীমোহন বাবু ঐতিহাসিক চরিত্রের সেই উপেক্ষিত অংশগুলি এরূপ প্রাঞ্জল ভাবে

বর্ণনা করিতেন যে, তাহাদের পক্ষে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হইত। তাহা ছাড়া মাসিক ও সংবাদ পত্রিকার অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় গুলিও যথাসময়ে তাহাদের শুনাইতেন।

তাঁহার সংসারে পাচক-পাচিকা ছিল না, এবং চাকর-চাকরানীর বাহুল্য ছিল না। নিতান্ত অসাধ্য কার্য্য চাকরের দ্বারা সম্পন্ন হইত, এবং অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত কাজই গৃহিণী ও মেয়েরা নিজের হাতে করিত। সম্প্রতি অন্যান্য মেয়েরা শ্বশুরালয়ে থাকায় শান্তি একাই মা'র সমস্ত কাজে সাহায্য করিত। সে প্রতিদিনই ভোরে বাবার বিছানার পাশে বসিয়া নানারূপ ধর্ম্মমূলক গল্প শুনিয়া, কোনদিন বা দুই একটী বন্দনা গান পিতাকে শুনাইয়া প্রাতঃকৃত্য সারিত এবং পড়িতে বসিত। বেলা প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিত। এ সময় বিনয় কিংবা কিশোরীবাবু তাহার পড়ার সাহায্য করিতেন। তারপর স্নান করিয়া নিজের হাতে পিতা এবং অন্যান্য সকলকে খাবার দিয়া, চাকর-চাকরাণীদের খাওয়াইয়া মা'র সঙ্গে নিজে খাইতে বসিত। মধ্যাহ্নে খাওয়ার পর যখন সকলে বিশ্রাম করিতেন তখন সে সেলাইয়ের কাজ অভ্যাস করিত, কোনদিন বা দুই একখানি ভাল বই লইয়া পড়িতে বসিত। কিরূপ বই তাহার পড়া উচিত তাহা কিশোরীমোহন বাবু নিজে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মোটের উপর এই বয়সেই যাহাতে তাহার হৃদয়ে প্রকৃত শিক্ষার বীজ বপন করিতে পারেন, যাহাতে ধর্ম্মের মন্ত্র প্রাণস্পর্শ করিতে পারে সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে শান্তি ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া বিছানা পাতিয়া ধূপ দীপের ব্যবস্থা করিত। এই গুলি তার অবশ্যকরণীয় নিত্য-কার্য্য ছিল। ইহাতে তাহার কোনরূপ বিরক্তি বা আলস্য ছিল না। এতগুলি কাজ যেন তাহার অগোচরে কোন স্বাভাবিক প্রেরণা আপনিই সুসম্পন্ন করিয়া সফলতার আনন্দ পুরস্কার স্বরূপ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিত। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনই সে রান্নার কাজ করিত, দরকার হইলে মা'র নিকট হইতে উপদেশ লইত মাত্র। সময়োপযোগী ব্রতোপাসনা সবই আন্তরিক ইচ্ছার সহিত করিত, তাহা ছাড়া সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন বিশেষ ভাবে

একটা পূজা করা তাহার আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের মধ্যে ছিল। বাড়ীর ভিতর প্রাঙ্গণে একটি হরিমন্দির সে নিজের হাতে তৈয়ার করিয়াছিল, সেখানে প্রত্যহই ধূপ দীপ দিত; এবং রবিবারে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ কতকটা স্থান গোবর দিয়া লেপিত। তাহার পর স্নান করিয়া আগে সেখানে যথারীতি পূজা করিয়া অন্য কাজ করিত। অবশ্য পূজার মন্ত্রের মধ্যে ছিল—একটী স্তোত্রমালা হইতে বিবিধ স্তোত্রের আবৃত্তি।

একদিন সে ঐ রকম ভাবে পূজায় বসিয়া মৃদুস্বরে একটি প্রার্থনা সঙ্গীত গাহিতেছে, এমন সময় কিশোরীমোহন সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সে একমনে গান করিতেছে, আর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু শান্তি দেখিয়া ফেলিলে যদি সে অপ্রতিভ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তাহার অলক্ষিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু হৃদয় এক অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল; মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—"দয়াময়! সবই তোমার ইচ্ছা। দেখ প্রভু, আমার শান্তির যেন নামের সার্থকতা দেখতে পাই। এই পবিত্র কুসুম কোরকটি যেন তোমারই পূজার যোগ্য হয়।"

এই বয়সেই সে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির প্রধান প্রধান আখ্যায়িকা গুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া বিনয় তাহাকে মাইকেল, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ইংরাজি পড়াইত। একদিন মধ্যাহ্নে খাওয়ার পরে কিশোরীমোহন বাবু শান্তিকে একখানি ভাল বই আনিয়া পড়িতে বলিলেন। সে 'মেঘনাদ বধ' আনিয়া পড়িতে বসিল এবং কোন্ জায়গা পড়িবে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—"তোর যে খানটা ভাল লাগে সেই খানেই পড়"। শান্তি ৪র্থ সর্গ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পড়িয়া সে যেন শোকাকুলা জানকীর দুঃখ-কাহিনী বর্ণনায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার সুন্দর গণ্ডযুগল আরক্তিম হইয়া উঠিল দেখিয়া পিতা অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বুদ্ধ, চৈতন্য ও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের উপদেশামৃত শুনাইয়া সমস্তদিন অতিবাহিত করিলেন। পিতা পুত্রীতে এই রকম ভাবেই প্রায়

অধিকাংশ দিন কাটিত। তিনি নিজের জন্য, বিশেষতঃ বাড়ীর মেয়েরা যাহাতে পড়িতে পায় সে জন্য বাঙ্গলা সংবাদ পত্রও রাখিয়াছিলেন।

পল্লীগ্রামের অধিকাংশ ছেলে মেয়ে অপরিণত বয়সে অনেক বাজে কথা শিখিয়া থাকে, সেজন্য অকালপক্কতা দোষ সেখানে সমধিক দেখা যায়। এই দোষ যাহাতে তাঁহার বাড়ীতে সংক্রমিত না হইতে পারে তাহার প্রতি কিশোরীমোহন বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। এমন কোন প্রসঙ্গই শান্তির সম্মুখে উত্থাপিত হইত না, যাহা তাঁহার শুনিবার অযোগ্য।

তিনি নিজে উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু বেশীদিন চাকুরীর চিন্তা করেন নাই। যে কয় বৎসর তাঁহার পিতা কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষ জীবিত ছিলেন সেই কয়বৎসর নিকটবর্ত্তী সহরের একটী উচ্চ ইংরাজি স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র। তাহার পর পিতার মৃত্যু হইলে লোকাভাবে যখন সংসার অচল হইয়া উঠিল, তখন অগত্যা চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। অল্প আয়ের কিছু জমিদারী এবং প্রায় দুইশত বিঘা চাষের জমি, এখানে বাগান পুষ্করিণী ইত্যাদি যথেষ্টই ছিল। মোটের উপর তাহার দ্বারা তাঁহার সংসারের যাবতীয় খরচ বেশ ভালরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া কিছু উদ্বৃত্তও থাকিত। এত সম্পত্তিতে মাত্র কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত তাহার কারণও যথেষ্ট ছিল ;—বার মাসে তের পার্ব্বণ, পূজা-পদ্ধতি সবই তিনি জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন করিতেন, আবার সেই সকল উপলক্ষ্য করিয়া মুক্ত হস্তে দান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এইটাকেই তিনি পূজার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে, তাহা না হইলে যেন সব অঙ্গ হী'ন হইল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার প্রাঙ্গণ-পূর্ণ দরিদ্রের ভোজন উৎসবে যখন তিনি মত্ত হইয়া যাইতেন, তখন আর কোন প্রকার ভেদাভেদ বিচার থাকিত না। সেই অপার্থিব মহোৎসবে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। চতুর্দ্দিকে কেবল—"দীয়তাং ভুজ্যতাং" আর জয়ধ্বনিতে পল্লীর আকাশ-পাতাল মুখরিত হইয়া উঠিত। ইহাই ছিল তাঁহার

প্রধান অপরাধ, ইহারই জন্য ক্রমে তিনি তাঁহার ভদ্র প্রতিবেশীদিগের অসন্তোষভাজন হইয়া উঠিতেছিলেন। তাহাছাড়া ইতর সাধারণের ভিতর তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্টই হইয়া উঠিতেছিল, আর বিনয় তাঁহার এই পথের সাথী হইয়া ভদ্রমহোদয়গণের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িয়াছিল।

বিনয় একজন গরীবের সন্তান হইলেও তাহার হৃদয় নিতান্ত হীন ছিল না, এবং অনেক কুলীন ভদ্র অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ ছিল। সম্প্রতি তাহার সংসারে হিতাকাঙ্ক্ষী আপনার জন বলিতে একমাত্র কিশোরীমোহন বাবুই ছিলেন। অপর পক্ষে অধিকাংশই তাঁহার আপনার ছিল। কারণ, যেখানে বিপদের করাল ছায়া দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিত, যেখানে বেদনার মর্ম্মান্তিক বিলাপে জড় প্রকৃতি কাঁপিয়া উঠিত, বিনয় সেইখানেই নিজেকে দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে নিয়োজিত করিত। সে বিশেষ উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায় নাই, কিন্তু যে স্বভাব সুলভ একটা উদারনীতি তাহার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই বলে সংসারের সকল রকম বৈচিত্র্য ও দুর্নীতির পীড়নকে সে অনায়াসে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত।

তাহার পিতা মাতা তাহাকে নিঃসহায় ভাবেই তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীর খানির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসাইয়া রাখিয়া কোন্ মহাযাত্রার আয়োজনে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা সে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে পারে নাই, কিন্তু তখন হইতেই যেরূপ ভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে— শুধু শূন্যে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত বোঝা বহিয়া আনিয়াছিল। তাহার স্মৃতি সে ভুলিতে পারে না। কখন কখন সেই জন্যই তাহার গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইয়া চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

পিতৃ-মাতৃ হীন নিরাশ্রয় বালক যখন এইরূপ ভাবে পথের ধারে বসিয়া আকুল ক্রন্দনে পশুপক্ষীকেও চঞ্চল করিতেছিল, সেই সময় তাহার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যান। বিনয়ের পিতার যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তিনি গ্রহণ করিলেন। সম্পত্তির আয় হইতে একটী মাত্র

ছেলের ভরণপোষণ চলিয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে এ হিসাব তিনি আগে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর মনে করিয়াছিলেন লাভের মধ্যে বিনা পয়সায় একটা লোক সকল সময় তাঁহার আজ্ঞাধীনে থাকিবে, যশঃ সৌরভও ছড়াইয়া পড়িবে এটাও বড় কম নয়। যাহা হউক কিছুদিন পরে নিজের পুত্রদিগের সহিত তাহারও একটা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কারণ ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে মূর্খ করিয়া রাখিলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইবে, তাহাও বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু 'আজকালকার দিনে একজন অচেনা পথের পথিকের জন্য নগদ পয়সা খরচ কেবল দান-বীরেরাই করিতে পারেন'—এটা গৃহিণীর নিতান্ত প্রতিপাদ্য হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই বিনয়ের জন্য তাঁহাদের কিরূপ খরচ হইতেছে এ বিষয় লইয়া প্রায় অন্দোলনের সৃষ্টি হইত। একবার বাৎসরিক পরীক্ষায় সে আশানুরূপ ফল করিতে না পারায় তাঁহাদের আক্ষেপের আর সীমা থাকিল না। এই সর্ব্বতোমুখী অনটনের দিনে এতগুলি টাকা বাজে খরচে—কেবল জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল দেখিয়া গৃহিণী কর্ত্তাকে বলিলেন,—"তোমার মতন বোকা আর সংসারে দুটী নেই! একটা কোথাকার কে পথের ভিখারীকে ধরে এনে তুমি কিনা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলে! এ কি কখন হয়েছে, না হয়? অনর্থক সম্বৎসরের মাহিনেটা বইএর দাম গুলো জলে ফেলে দিলে বইত নয়? ওকে যদি স্কুলে না দিতে তবে ত আর একজন চাকর রাখ্‌তে হ'ত না! ধন্য বুদ্ধি তোমার—কি করে যে সংসার চালাবে জানি না। আমার দুলাল স্কুলে যাবে তার সঙ্গে ওকেও যেতে হবে! কেন বাপু এত সাধ কেন? দুট পেটে খেতে পায় এই খুব আবার লেখাপড়ায় কাজ কি!" কর্ত্তা একটু অপ্রতিভ হইয়া সভয়ে বলিলেন,—"তা ত বুঝ্‌ছি—কিন্তু—লোকে যে দুষ্‌বে? ওর কিছু জমি জমাও রয়েছে, একেবারে যদি মূর্খ করে রাখি তবে অন্যায় হবে না?"—"ওঃ ভারী ত আমার অন্যায়? কে ওর জমি জমার ঝঞ্ঝাট বয়, আর কোলের কাছে খেতে পরতেই বা দেয় কে?" বলিয়া গঞ্জনা করিতে করিতে গৃহিণী কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

বিনয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবার কারণ ছিল। প্রথমতঃ একটা লোক বেকার বসিয়া খাইবে, খাবার উপরন্তু লেখাপড়া শিখিবে এটা অন্ততঃ গৃহিণীর অসহ্য। কাজে কাজেই তাঁহাদের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ কোন না কোন ছলে তাহাকে কার্য্যে ব্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। কেবল যে কয়ঘণ্টা স্কুলে থাকিত তখন এবং রাত্রে ঘুমের সময়ই তাহার অবসর ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে পড়াশুনা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সারিতে হইত। বাকী সময় যখন সে বাড়ীতে থাকিত তখন প্রতিপালকের প্রয়োজনানুরূপ কার্য্যেই সময় ক্ষেপণ করিত। তাহার দৈনিক কার্য্যের মধ্যে ছিল ছোট ছেলেদের পড়া, তাহাদের সমস্ত আব্দার সহ্য করা, চাকরচাকরাণীদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা এবং হাটবাজার করা। তাহাছাড়া কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে ঔষধ পত্র আনা, ডাক্তার ডাকা ও রোগীর মোটামুটি বরাত সামলানর ভার তাহার উপরেই ছিল। কর্ত্তা কতকটা আলস্যের জন্য এবং কতকটা বা গৃহিণীর শাসন ভয়ে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের দাবিস্বরূপ বিনয়ের উপর এত কাজের ভার দিয়াছিলেন।

বিনয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যথাযথ ভাবে তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া অনেক সময় পাড়া প্রতিবেশীরও বিশেষ কার্য্যে সাহায্য করিত। কতবার সে পলকহীন ভাবে বসিয়া থাকিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিত, একটুও বিরক্তি বোধ করিত না। প্রথম প্রথম তাহার সমস্ত কার্য্যেই যেন একটা বাধ্য বাধকতা ছিল, আদেশের জুলুম ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই সকল পবিত্র কার্য্যের সফলতার দ্বারা সে বড় আনন্দ পাইত, এবং একটা অদৃশ্য প্রেরণার দ্বারা যন্ত্র চালিতের ন্যায় সে সমস্ত কর্ত্তব্যই অনায়াসে করিয়া যাইত। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে কর্ম্মের মেলায় মাতিয়া উঠিতে শিখিয়াছিল, স্বার্থ বিবর্জ্জিত সেবার আনন্দ পাইবার জন্য তাহার সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে শিখিয়াছিল। আবার এদিকে আশৈশব বোঝার ভারে এবং আঘাতের বেদনায় তাহার হৃদয় যেমন অনুভূতিবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, অন্যদিকে মঙ্গলময় বিধাতার বরে—শত শত অনাদর ও নিরাশার গভীর তমসবৃত

বন্ধুহীন প্রান্তরের মাঝে যে অমূল্য সম্পদ সে পাইয়াছিল—তাহা স্নেহ হাসি মুখে সব আঘাত সহ্য করিবার পালন শক্তি আর তাহারই পাশে সুকোমল উচ্চ হৃদয়। যাহার দ্বারা সে সমস্ত ব্যথতা প্রতিকূল ঘটনা বৈচিত্র্যের দারুণ উপহাসকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত।

এইরূপে কোন প্রকারে মধ্য ইংরাজি পরীক্ষায় পাশ করিয়া যখন সে বুঝিতে পারিল, আশ্রয়দাতা আর অগ্রসর হইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, তখন সে কাতর ভাবে ধরিয়া বসিল—"আমার যা কিছু সব আপনি নিয়ে আমার অন্ততঃ ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়ান।" কর্ত্তা হিসাব করিয়া দেখিলেন এতদিন তাহার সমস্ত খরচ চালাইয়াও যাহা মজুত হইয়াছে তাহার দ্বারা ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়ান নিতান্ত অসম্ভব নয়, তাহার সঙ্গে বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট আয়ও অন্যানা হইবে। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত বিনয়কে আর একটু কৃতজ্ঞতাপাশে বাধিয়া নিকটবর্ত্তী সহরের উচ্চইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বাড়ীতে খাইয়া ও প্রত্যহ ছয় সাত মাইল যাওয়া আশা করিয়া সে মনোযোগের সহিত পড়া শুনা করিতে লাগিল। ক্রমে বেশ সম্মানের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইল। এখন কলেজে পড়িবার জন্য সে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আশ্রয়-দাতার নিকট হইতে আর কিছু পাইবার আশা ছিল না; তাই সমস্ত কৃতজ্ঞতার বন্ধন ও দেনা পাওনার কথা ভুলিয়া গিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় দুই একটী গৃহ শিক্ষকের কার্য্য যোগাড় করিয়া সে কলেজে ভর্ত্তি হইল। কিন্তু দুরদৃষ্ট যখন মানুষকে পাইয়া বসে তখন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাও হঠাৎ ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর অমানিশার অন্ধকারে কোথায় লুকাইয়া যায়। বিনয়েরও তাহাই হইল—সে আর বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিল না। অত্যধিক পরিশ্রম ও আহার-নিদ্রার অনিয়মের জন্য ভয়ানক পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। তারপর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া অন্যান্য সঙ্গিগণ তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে জিম্মা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। মঙ্গলের জন্যই কিম্বা অমঙ্গলের জন্যই হউক সে এযাত্রা রক্ষা পাইল, কিন্তু দীর্ঘকাল হাসপাতালে পড়িয়া থাকায়

তাহার পড়ার সমস্ত সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল; কাজে কাজেই তাহাকে লেখা পড়ার উচ্চাশায় জলাঞ্জলি দিয়া জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

বিনয়ের পিতা কিশোরীমোহন বাবুর বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং এই দুই গ্রামের ব্যবধানও অতি অল্পমাত্রই ছিল। কিন্তু এতদিন কিশোরীমোহন বাবু তাহার খবর জানিতেন না। তাঁহার পুত্র নরেনের সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় ছিল, কারণ, তাহারা এক কলেজেই এতদিন পড়িয়াছিল। তার পর একটু সুস্থ হইয়া যখন সে চাকুরীর চেষ্টা করিতে ছিল তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে নরেনদের মেসে বেড়াইতে যাইত এবং আপনার দুঃখের কথাও অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেখানে বাহির হইয়া পড়িত। নরেনেরও তাহার প্রতি একটু সহানুভূতি ছিল, এমন কি যাহাতে বিনয়ের কোনরূপ একটা ব্যবস্থা হয় সে চেষ্টাও করিত। একবার পূজার পূর্ব্বে কিশোরী মোহন বাবু কলিকাতায় যাইয়া নরেনদের মেসে উঠিয়াছিলেন; সেই সময় বিনয়ের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। কিন্তু প্রথম আলাপেই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিনয়ের অন্তঃকরণ বেশ ভালরূপে দেখিয়া লইল—তিনি বুঝিলেন ভিতরে মূল্যবান জিনিষ আছে যত্ন করিলে কাজে লাগিতে পারে।

সেইদিন হইতেই তিনি বিনয়কে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার গ্রামে একটী মধ্য বাঙ্গলা স্কুল অনেকদিন হইতেই ছিল। তারপর যখন তিনি সহরের চাকুরী ছাড়িয়া গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় অনেক চেষ্টায় তাহাকে মধ্য ইংরাজি স্কুলে পরিণত করিয়া নিজেই অবৈতনিক প্রধান শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণব্যক্তির যত্নে স্কুলটী কর্তৃপক্ষীয় পরিদর্শকদিগের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই একটী বেশ ভাল স্কুলে পরিণত হইল। প্রধান শিক্ষককে মাহিনা দিতে হয় না সুতরাং সরকারী সাহায্যও ছাত্রদত্ত বেতন দ্বারা স্কুল বেশ চলিতে লাগিল।

এখন স্কুলটীর অবস্থা বেশ উন্নত। ছাত্র সংখ্যাও আশাতীত হইয়াছিল, কারণ সেখানে গরীবের ছেলে বিনা বেতনে বা অর্দ্ধ বেতনে

পড়িতে পাইত। অনেকে কিশোরীমোহন বাবুর বাড়ী হইতে বই শ্লেটের মূল্য এবং পূজার সময় কাপড় জামাটাও পাইত। কিন্তু সম্প্রতি কিশোরী মোহন বাবু চেষ্টা করিতেছিলেন যে, যদি একজন উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়, তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া নিজে সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করিবেন। তাই আজ বিনয়কে পাইয়া বড়ই সুখী হইলেন। বিনয়ও সমস্ত শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল, কারণ, এই রকমের একটা কাজ পাইলে তাহার কর্ম্ম-ক্ষেত্র অনেক দুর বিস্তৃত করিতে পারিবে তাহা সে বেশ জানিত, এবং সেটা তাহার আন্তরিক অভিপ্রায়ের মধ্যেও ছিল।

বিনয় বড় উৎসাহের সহিত স্কুলের কার্য্য গ্রহণ করিল। তাহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল কিশোরীমোহন বাবুর বাড়ীতে। কর্ত্তা গিন্নি দুইজনেই পুত্র স্নেহে তাহাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। সেও আপন পিতা মাতার ন্যায় তাঁহাদিগকে ভক্তি করিত এবং শান্তিকেও সেইরূপ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার পড়া শুনায় সাহায্য করিত। এখন হইতে শান্তির পড়াশুনা সম্বন্ধে কিশোরীমোহন বাবুর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি সেই অতিরিক্ত সময় অনেক লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। স্কুলের অবস্থা উন্নত ছিল সুতরাং বিনয়কে যথারিতি মাহিনা দিবার কথা হইয়াছিল; কিন্তু সে এখন এক কপর্দ্দকও বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া, সেই টাকায় একটী ছোট পুস্তকালয় এবং কিশোরী মোহনবাবুর যে 'দরিদ্রবান্ধব-হোমিওপ্যাথিক-ভাণ্ডার' ছিল তাহাকেই একটু অল্পকাল ভাবে খুলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি তাহাতে মত দিলেন না। কাজে কাজেই বিনয় তাহার বেতনের টাকা গরীবের ছেলেদের সাহায্যার্থে এবং মাসে মাসে কিছু করিয়া গ্রাম্য জীবনের পাঠোপযোগী পুস্তক আনাইয়া ব্যয় করিতে লাগিল। 'হোমিওপ্যাথিক ভাণ্ডার' কিশোরীমোহনবাবু, নিজের ব্যয়েই বড় করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য এতদিন পরে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের প্রথম প্রবেশ দ্বারে সে বড় আনন্দ ও শান্তি পাইল। (ক্রমশঃ)

কাশ্মীরে অমর নাথ।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলিয়া কাশ্মীরের ঘর-বাড়ী অধিকাংশই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কাষ্ঠের ফ্রেমের মধ্যে প্রস্তর, ইষ্টক অথবা মৃত্তিকা স্তরে স্তরে গ্রথিত। তুষারপাতে ভগ্ন হওয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত বাড়ীর ছাদগুলিই ঢালু করা হয়। বাড়ীগুলি চারিতল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই একটী করিয়া বোখারি বা fire place আছে। ইহা না থাকিলে শীতকালে বাঁচিয়া থাকা দুর্ঘট।

কাশ্মীরের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি প্রসিদ্ধ। এখানে প্রায় সকল প্রকার শস্য ও তরকারী জন্মে। এখানে কত প্রকার ও কত বর্ণের যে ফুল ফোটে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কি উপত্যকা মধ্যে, কি অত্যুচ্চ পর্ব্বতগাত্রে বিভিন্ন বর্ণের ফুলগুলি যেন আলো করিয়া আছে; কি বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ, যেন অমরাবতী বলিয়া ভ্রম হয়। তোড়া বাঁধিবার জন্য ভাবিতে হয় না, যথেচ্ছভাবে গোটা কতক ফুল তুলিয়া একত্র করিলেই সুন্দর তোড়া প্রস্তুত হয়। আবার কাশ্মীর কি সুন্দর সুন্দর ফলের জন্মস্থান। এক একটা ফলের বাগান দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, পেঁপে ও নারিকেল ব্যতীত বোধ হয় সর্ব্বপ্রকার ফলই এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যখন আপেল, পীচ, ন্যাসপাতি, আলুবোখরা প্রভৃতিতে রং ধরে তখন বাগানগুলি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভাধারণ করে।

এখানকার ফলফুল যেমন শ্রীসম্পন্ন অধিবাসীরাও তদ্রূপ। অধিকাংশই গৌরবর্ণ, দৃঢ়কায় এবং লম্বাকৃতি। ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকগণ অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী; জগতে কোথাও এত রূপ আছে বলিয়া আমার মনে হয়

না; ঠিক যেন কবি কল্পনায় অঙ্কিত মূর্ত্তি। কাশ্মীরবাসিগণ তিন ভাগে বিভক্ত,—হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যাই বেশী; তবে এখানে মুসলমানকে তত অস্পৃশ্য মনে করে না।

মুসলমান গোমাংস ভক্ষণ করে না বা করিতে পায় না, কারণ এখানে গোহত্যা নিষিদ্ধ। গোহত্যা ও নরহত্যার শাস্তি একরূপ। একগাছি লাঠির এক প্রান্তে পট্টখণ্ড মধ্যে অন্ন বাঁধিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া মুসলমান ভৃত্য লইয়া যাইলে হিন্দু প্রভু অনায়াসে তাহা গ্রহণ করেন। বহু হিন্দু গৃহে মুসলমান চাকর দেখিতে পাওয়া যায়। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই পরিচ্ছদ এক প্রকার। পুরুষগণ একটি কৌপীন পিরহান (এক প্রকার আলখাল্লা) ও পাগড়ী পরে। শীতকালে বাহিরে যাইবার সময় কখন কখন পাজামা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা কেবল মাত্র পিরহান পরে এবং মাথায় একখানি বড় রুমালের মত চাদর ঢাকা দেয়। কাশ্মীরীরা অত্যন্ত অপরিষ্কার, ইহাদের ঘর দ্বার এত নোংরা যে ইহাদের হাতে খাইতে ঘৃণা করে। ইহারা প্রকাশ্য স্থলে উলঙ্গ হইয়া স্নান করে; ফলে ইহাদের পিরহান কদাচ ধৌত হইয়া থাকে। এ জন্য ঐগুলি অত্যন্ত ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত। ইহারা দুই বেলাই ভাত খায়; শীত প্রধান দেশ হইলেও রুটির প্রচলন এখানে বড় নাই। মৎস্য ও অতিরিক্ত লবণ ও লঙ্কা মিশ্রিত এক প্রকার শাক ইহাদের নিত্য খাদ্য। অনেক প্রকার ব্যঞ্জন ইহাদের বড় খাইতে দেখা যায় না। এখানে কুক্কুট বিনা আপত্তিতে ভক্ষিত হয়। চা ইহারা বড় ভালবাসে এবং প্রত্যহ ২।৩ বার খায়। কাশ্মীরিগণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার খুব কম ছিল; এইজন্য রাজ্যের বড় বড় পদে শিক্ষিত পাঞ্জাবিগণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাহা হউক বর্ত্তমানে মহারাজের যত্নে আজকাল অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া শিক্ষাকার্য্যের অনেক বিস্তার হইতেছে। শ্রীনগরে একটি কলেজও স্থাপিত হইয়াছে।

কাশ্মীরবাসিগণ অনেক প্রকার শিল্প জানে। তন্মধ্যে ইহারা শাল নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু এখন শালের ব্যবসায় অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। ১৮৭৭ সালে এখানে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহাতে

অধিকাংশ জোলা মারা পড়ে; ইহাই উক্ত অবনতির কারণ। বিশেষতঃ ইহার ক্রেতাও এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন উটের লোম ও ছাগলের লোম মিলাইয়া পশ্মিনা নামক এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত করে তাহা অতি নরম ও চমৎকার। কিছু কাল পূর্ব্বে দিল্লীতে যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে কাশ্মীর রাজ্য হইতে একখানি শাল পাঠান হয় যাহার মূল্য ২২০০০৲। সমগ্র শ্রীনগর তাহাতে সুন্দর ভাবে অঙ্কিত ছিল। ইহারা জমাট কাগজের নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত করে; সেগুলি বড় মনোহর। এখানকার রেশমের কাপড়ও খুব বিখ্যাত এখানকার Silk Reeling Factory র ন্যায় বড় কারখানা পৃথিবীতে আর কোন স্থলেই নাই। ক্রোশ যুড়িয়া এই factory এবং ইহার সমস্তই Electricity দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। সহস্র সহস্র লোক এখানে কার্য্য করে।

কাশ্মীরে কয়েকটী স্থান আছে যথায় অতি অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যপার ঘটিয়া থাকে, অথচ যাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এখনও নির্নীত হয় নাই। ইহাদের ২।৩ টির উল্লেখ নিম্নে করিতেছিঃ—

(১) ক্ষীর ভবানী কুণ্ড—ইহা শ্রীনগর হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রত্যহ ১ মণ ক্ষীর এই কুণ্ডে ঢালিয়া দিয়া ৺ভবানীর পূজা হইয়া থাকে। যাত্রিগণও এখানে ক্ষীর দিয়া পূজা করে। এই কুণ্ডের জল আপনা আপনি কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন বা গোলাপী বর্ণ ধারণ করিতেছে। ইহা বড়ই বিস্ময়কর।

(২) জটাগঙ্গাকুণ্ড শ্রীনগরের দক্ষিণে ডেঁসু পরগণায় বলহাম গ্রামে ইহা অবস্থিত। বর্ষভর এই কুণ্ডে জল থাকে না; কিন্তু ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে অকস্মাৎ ইহা জলপূর্ণ হইয়া উঠে।

(৩) শ্রীনগরের দক্ষিণে মাচিহাশ পরগণায় একটি সুবৃহৎ সরোবর আছে। ইহার মধ্যে এক আধটী দ্বীপ আছে এবং তদুপরি গাছ পালা আছে। অধিক বাতাস উঠিলে এই দ্বীপ ভাসিয়া এদিক ওদিক চলিয়া যায়।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধিৎসা মিটাইবার উপাদান কাশ্মীরে যথেষ্ট

আছে ; কারণ প্রাচীন মন্দির ও মঠাদির ভগ্নাবশেষ বহুস্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইবার কাশ্মীরের রাজধানী—শ্রীনগরের একটু বিবরণ পাঠকের অবগতির জন্য দিতেছি। ইহা বিতস্তার দুই পার্শ্বে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ইহা ৩ মাইল এবং বিতস্তার প্রতি পার্শ্বে ১½ মাইল করিয়া বিস্তৃত। কিন্তু প্রাচীন কালে ইহা নদীর দক্ষিণ পাশে ছিল, কোন সময় হইতে ইহা বাম দিকেও বিস্তৃত হয় তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। রাজপ্রাসাদ ১১ শতাব্দীতে বামদিকে গঠিত হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৫২০০ ফিট। কিছুকাল পূর্ব্বে এই সহর অতি নোংরা ছিল ; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাশ্মীরিগণ অতি অপরিষ্কার। ইহারা প্রায় রাস্তাতেই মলত্যাগ করিত। বর্ত্তমানে এই কুপ্রথা রহিত করা হইয়াছে ; পরলোক-গত বাঙ্গালী ডাক্তার ৫, মিত্র দ্বারাই এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তিনি মহারাজার ডাক্তার ছিলেন এবং শ্রীনগরের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী এখনও এখানে বাস করিতেছেন। এখন সহরের লোক সংখ্যা লক্ষের অধিক ;—ইহার শতকরা ৯০ জন মুসলমান। ৮।১০ ঘর বাঙ্গালী এখানে আছেন, ইহার মধ্যে ২।৩ জন চাকরিব্যপদেশে আসিয়াছেন, বাকি সকলেই ব্যবসাদার। ইঁহাদের সকলের মধ্যেই বেশ সদ্ভাব বর্ত্তমান দেখিলাম।

এখানে উপস্থিত হইবার পরদিন শুনিলাম আলওয়ারের মহারাজা কাশ্মীররাজকে শ্রীমৎ অভেদানন্দজীর তীর্থদর্শন সুগম করিয়া দিবার জন্য তার দ্বারা অনুরোধ করিয়াছেন। ইহার ফলে তিনি সেবক সমভিব্যাহারে মহারাজার অতিথি স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন। বেলুড় মঠের এক ব্রহ্মচারী সেবা করিতে করিতে আসিয়াছিলেন এবং এখান হইতে আমিও সেবকত্ব লাভ করিলাম। অতএব আমরা তিনজন রাজ অতিথি স্বরূপে গণ্য হইলাম। আমাদের অমরনাথ যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত রাজসরকার হইতে ঠিক হইবে এই কথা মহারাজার Private Secretary Mr. Sarma স্বামিজীকে বলিয়া পাঠাইলেন। অতএব আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। স্বামিজীর রাজদর্শনের ইচ্ছা আছে জানিয়া Sarma

মহাশয় দিন ধার্য্য করিলেন এবং যথা সময়ে রাজবাটী হইতে একখানি Landau গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, আমরা সকলে তাহা চড়িয়া রাজদর্শন করিয়া আসিলাম। দেখিলাম মহারাজ খুব অমায়িক লোক। স্বামিজীর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি সন্ন্যাসিগণের বিলাতযাত্রার বিরোধী, কারণ তাহাতে যবনান্ন গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক তিনি এত অহিফেন সেবন করেন যে, না ঝিমাইয়া ৫ মিনিট কালও কথা কহিতে পারেন না; অধিকন্তু জরা বশতঃ ঝিমাইবার সময় মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে লালাস্রাব হইতে থাকে। রাজবাটীর যতটুকু দেখিয়াছিলাম তাহাতে বোধ হইয়াছিল যে, ইহা প্রকাণ্ড হইলেও শিল্পকলার কোন পারিপাট্য ইহাতে নাই।

কয়দিনে আমরা সহর ও সহরতলীর কতক কতক স্থান দেখিয়া লইলাম। শ্রীনগর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে শঙ্করাচার্য্য এবং সারিকা নামক পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতের প্রাচীন নাম গোপাদ্রি। এখন হিন্দুরা ইহাকে শঙ্করাচার্য্য এবং মুসলমানেরা তক্‌ৎ-ই-সুলেমান বলে। শ্রীনগর হইতে ইহা ১০০০ ফিট উচ্চ এবং ইহার শিখর দেশে একটি মন্দির মধ্যে এক সুবৃহৎ মহাদেব আছেন। বর্ত্তমান মন্দির অধিক দিনের নহে; প্রাচীন কালে যে মন্দির ছিল তাহার ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহা হইতে অনুমান হয় যে মন্দির অতি বৃহৎ ছিল। বুদ্ধদেবের স্ত্রী গোপার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় বোধ হয় সেটী বৌদ্ধ মন্দির ছিল। বলা বাহুল্য এক সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম খুব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সারিকা পর্ব্বতও উচ্চে শঙ্করাচার্য্যের সমান; ইহার উপরে একটি কেল্লা আছে। এই পাহাড় দ্বয়ের উপর হইতে শ্রীনগরের দৃশ্য বড় সুন্দর।

শ্রীনগরে বাটি ভাড়া পাওয়া বড় দুষ্কর; একপ্রকার পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। কিন্তু এখানে একটা সুবিধা এই যে বিতস্তার উপর অনেক নৌকা আছে যাহা বাস করিবার জন্য ভাড়া পাওয়া যায়। এই গুলিকে House-boat বলে এবং বাস্তবিকই ইহারা বড় আরামপ্রদ। ইহারা ছোট বড় নানা আকারের আছে। মাসিক

ভাড়া ৪০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু আগে ছোট গুলি (যাহাতে ৪।৫ জন বেশ থাকিতে পারে) ২০।২৫৲ টাকায় পাওয়া যাইত। বেশী ভাড়ার House-boat গুলিতে বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত আছে। মাঝিরা সপরিবারে এই নৌকা গুলিতে বাস করে। এখানকার ভাষায় ইহাদের "হাঁঝি" বলে। ইহারা স্ত্রী পুরুষে নৌকা বায়। এই নৌকাগুলির সহিত এক বা দুই খানি করিয়া ছোট নৌকা বাঁধা থাকে; ঐ গুলিকে শীকারা বলে। পাকশাক সমস্ত উহাতে হয় এবং উহা বেড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ৪ বা ৫ জন হাঁঝি থাকিলেই ইহা খুব শীঘ্র চলে। এখানে কোন নৌকার হাল নাই দাঁড়ই হালের কার্য্য করে। দাঁড় গুলি ঠিক খাড়ুর মত এবং আমাদের জেলে ডিঙ্গির মতন উহারা নৌকায় বাঁধা থাকে না। রৌদ্রের সময় মোটা কাপড় দিয়া শীকারা গুলি ছাইয়া দেয়। ভাল ভাল শীকারায় আবার বসিবার গদি থাকে। সহর প্রান্তে ব্রহ্মানন্দ নামে এক বাঙ্গালী সাধুর মঠ আছে; অনেক যাত্রী সেখানে আশ্রয় পায়। তিনি অনেক অসহায় যাত্রীকে নানা রূপে সাহায্য করিয়া থাকেন।

সহরতলীতে মোগল সম্রাটের কতকগুলি কীর্ত্তি আছে যাহা এখানে আসিলে দেখা উচিত, যথা:—শালিমার বাগ, নিশিমবাগ, এবং পরিমহল। শঙ্কর পর্ব্বতের নিম্ন দিয়া ডল হ্রদের ধারে ধারে ৯।১০ মাইল একটি রাস্তা গিয়াছে, উক্ত কীর্ত্তি গুলি এই রাস্তার পার্শ্বে পড়ে। ৩।৪৲ টাকা ভাড়ায় একখানি টঙ্গা এই সব গুলি দেখাইয়া আনে। বেলা ১০ টার সময় বাহির হইলে সন্ধ্যার মধ্যে সবগুলি দেখিয়া আসা যায়। ঐ স্থান গুলি শীকারা করিয়াও দেখিয়া আসা যায়। শীকারা টঙ্গা অপেক্ষা সস্তা এবং যাইবার পক্ষেও আরামদায়ক; তবে একটু সময় অধিক লাগে। রাজপ্রাসাদের নিকটে প্রায় ১ মাইল লম্বা একটি খাল বিতস্তাকে ডলের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। এই খাল দিয়া শীকারা বাইয়া ডলে পড়ে। আমরা শীকারা করিয়া গিয়াছিলাম। ডলের জলের সুখ্যাতি কাশ্মিরিগণের মুখে ধরে না; ইহারা বলে উহার জলে

ধোয়ার জন্যই কাশ্মীরি শাল এত উৎকৃষ্ট হয়। ইহার জল এত স্বচ্ছ যে হ্রদের তলা পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তবে, যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বোধ হয় হ্রদের কোন স্থান ৫।৬ হাতের বেশী গভীর হইবে না। ইহা লম্বে ৪ মাইল ও প্রস্থে ২½ মাইল এবং ইহার অধিকাংশ ভাগ লাল পদ্মের গাছে আবৃত। স্বচ্ছ তরঙ্গায়িত বিস্তৃত জলরাশির উপর লক্ষ লক্ষ পদ্ম ফুটিয়াছে! সে যে কি নয়নারাম দৃশ্য তাহা বুঝাইবার নহে। মনে হয় যেন এই খানেই কমলে কামিনীর আবির্ভাব হইয়াছিল। শীকারা করিয়া শালিমার বাগে পৌঁছিতে প্রায় ২ ঘণ্টা লাগে। ইহা সাজাহান কৃত। কোরাণে স্বর্গ যে রূপ সপ্ততলে বিভক্ত বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহার অনুকরণে ইহা গঠিত। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(৯নং)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

নিউইয়র্ক।

C/o মিস্ মেরি ফিলিপ্‌স্।

১৯নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা।

২৮শে মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই সঙ্গে আমি একশ ডলার্ অথবা ইংরাজী মুদ্রা হিসাবে ২০ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৭ পেন্স পাঠালাম। আশাকরি, এতে তোমাদের কাগজটা বার কর্‌বার কিঞ্চিৎ সাহায্য হবে, পরে ধীরে ধীরে আরও সাহায্য কর্‌তে পার্‌বো।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—পত্রপাঠ নিউইয়র্কে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তিস্বীকার করবে। এখন থেকে নিউইয়র্ক আমার প্রধান আস্তানে। অবশেষে আমি এদেশে কিছু করে যেতে সমর্থ হলাম।

বি।

(১০নং)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

আমেরিকা।

১লা জুলাই, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমাদের প্রেরিত মিশনরিদের বইখনাও রামনাদের রাজার ফটো পেলাম। আমি রাজা ও মহীশূরের দেওয়ান উভয়কেই পত্র লিখেছি। রমাবাইএর দলের লোকদের সঙ্গে ডাঃ জেন্‌সের বাদ-প্রতিবাদ থেকে বেশ বোধ হয়, মিশনরিদের পুস্তিকাখানা এখানে বহুদিন পূর্ব্বে পৌঁছেছে। ঐ পুস্তিকাখানাতে একটা অসত্য কথা আছে। আমি এদেশে খুব বড় হোটেলে কখনও থাইনি, আর কোনরূপ হোটেলেও খুব কমই গেছি। বাল্টিমোরে ছোট হোটেলওয়ালারা অজ্ঞ—তারা নিগ্রো ভেবে কোন কালা আদ্‌মিকে স্থান দেয় না—সেইজন্য ডাঃ ক্রম্যান্‌কে—আমি যাঁর অতিথি ছিলাম—ঐখানে একটা বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল—কারণ, তারা নিগ্রো ও বিদেশীদের মধ্যে প্রভেদ জানে। আলাসিঙ্গা, তোমায় বলছি শুন, তোমাদের নিজেদেরই নিজেদের সমর্থন করতে হবে। তোমরা কচি খোকার মত ব্যবহার কোরছো কেন? যদি কেউ তোমাদের ধর্ম্মকে আক্রমণ করে, তোমরা নিজেরাই উহার সমর্থন করতে এবং আক্রমণকারীকে মুখের মত জবাব দিতে পার না কেন? আমার সম্বন্ধে বলছি, তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। আমার এখানে শত্রুর চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী। আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র খ্রীষ্টিয়ান আর শিক্ষিতদের ভিতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই মিশনরিদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে। আবার মিশনরিরা কোন

বিষয়ের বিরুদ্ধে লাগ্‌লে, যেহেতু মিশনারিরা তার বিপক্ষ, সেই হেতুতেই শিক্ষিতেরা সেটী পছন্দ করে। এখন মিশনরিদের শক্তি এখানে অনেক কমেগেছে এবং দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে। যদি তারা হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ কর্‌লে তোমাদের কষ্ট হয়, তবে তোমরা অভিমানী ছেলের মত ঠোঁট ফুলিয়ে আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে কেন এস? তোমরা কি লিখ্‌তে পার না এবং তাদের ধর্ম্মের দোষ দেখিয়ে দিতে পার না? কাপুরুষতা ত আর ধর্ম্ম নয়।

এখানে ইতিমধ্যেই ভদ্র সমাজের ভিতর একদল লোক আমার ভাব নিয়েছে—আগামী বর্ষে আমি তাদের এমন ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ কোর্‌বো, যাতে তাদের দ্বারা একটা কাজ চলে যেতে পারে, তারপর আমি ভারতে চলে গেলে তারাই কাজ চালাবে। আমার এখানে এমন অনেক বন্ধু আছে, যারা আমার এখানে সাহায্য কর্‌বে এবং ভারতেও আমায় সাহায্য কর্‌বে। সুতরাং তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। তবে তোমরা যতদিন মিশনরিদের আক্রমণে কেবল চীৎকার কর্‌বে এবং কিছু না কর্‌তে পেরে লাফিয়ে বেড়াবে, ততদিন আমি তোমাদের দিকে চেয়ে হাস্‌বো। তোমরা ছেলেদের হাতের ছোট ছোট পুতুলের মত, তা ছাড়া তোমরা আর কি! 'হে স্বামিন্, মিশনারিরা আমাদের কামড়াচ্ছে—উঃ—জ্বলে মলুম—উঃ—উঃ'। স্বামী আর বুড়ো খোকাদের জন্য কি কর্‌তে পারে?

বৎস, আমি বুঝ্‌ছি, আমাকে গিয়ে তোমাদের মানুষ তৈরী কর্‌তে হবে। আমি জানি, ভারতে কেবল নারী ও নপুংসকের বাস, সুতরাং বিরক্ত ও অস্থির হয়ো না। আমাকে ভারতে কাজ করবার জন্য উপায়ের যোগাড় কর্‌তেই হবে। আমি কতকগুলো মস্তিষ্কহীন অপদার্থ লোকের হাতে গিয়ে পড়্‌ছি না।

তোমাদের অস্থির হবার দরকার নেই, তোমরা খুব অল্প হোক না কেন, যতটুকু পার করে যাও। আমাকে একলা আগা পাস্তলা সব করে যেতে হবে। কল্‌কেতার লোকেদের এত সঙ্কীর্ণভাব! আর তোমরা মন্দ্রাজিরা কুকুরের ডাকে মূর্চ্ছা যাও!! 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

'কাপুরুষেরা কখন এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না'। তোমাদের আমার জন্য ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন, তোমরা কেবল নিজেদের আত্মরক্ষা করে যাও, আমাকে দেখাও যে, তোমরা ঐটুকু করতে পার, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট হব আর কোন আহম্মক আমার সম্বন্ধে কি বলছে তাই নিয়ে আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। কোন আহম্মকের আমার সম্বন্ধে সমালোচনা শুনবার জন্য আমি বসে নেই। কচি ছেলে তোমরা, তোমরা জান কি যে, কেবল প্রবল ধৈর্য্য, মহান্ সাহস ও কঠোর চেষ্টার দ্বারাই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়ে থাকে। আমার আশঙ্কা হয়, কিডির অন্তরাত্মা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর যেমন ঘুরপাক খেয়ে থাকে, সেইরূপ ঘুরপাক খেয়ে তার ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। একটু কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কলম ধরুক না। মান্দ্রাজীরা স্বামী, স্বামী বলে না চেঁচিয়ে ঐ দুষ্টুদের বিরুদ্ধে কি এখন যুদ্ধঘোষণা করতে পারে না, যাতে তারা দয়ার জন্য 'ত্রাহি ত্রাহি' করে চীৎকার করতে থাকে। তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কেবল বড় বড় কাজ করতে পারে—কাপুরুষেরা কখন পারে না। হে অবিশ্বাসিগণ, তোমাদের এই একেবারে বল্লুম—জেনে রেখো যে, প্রভু আমার হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন। যত দিন আমি পবিত্র থাকবো এবং তাঁর দাস হয়ে থাকব, ততদিন কেউ আমার একটা কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না।

তোমাদের কাগজখানা বার করে ফেল। যে কোন রকমে হোক, আমি খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে থাকবো। তোমরা কাজ করে চল। এই জাতের জন্য কিছু কর—তা হলে তারা তোমায় সাহায্য করবে। আগে মিশনরিদের বিরুদ্ধে চাবুক ধরে—তাদের কশে লাগাও। তবে সমগ্র জাতটা তোমাদের দিকে হবে। সাহসী হও, সাহসী হও,—মানুষ একবারমাত্রই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোন মতে কাপুরুষ না হয়।

সদা প্রেমাবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

(১১)

ইংরাজীর অনুবাদ।

(ক্ষেতড়ির মহারাজকে লিখিত—

স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

আমেরিকা।

৯ই জুলাই, ১৮৯৫।

* * * আমার ভারতে ফেরা সম্বন্ধে কথাটা এই :—ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই। মহারাজ ত বেশ ভালই জানেন, আমার স্বভাবটা হচ্ছে, যে বিষয়ে লাগি, সেটাকে অধ্যাবসায়ের সহিত কামড়ে ধরে থাকি। আমি এ দেশে একটী বীজ পুঁতেছি, সেটী ইতিমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে —আশা করি, অতি শীঘ্রই ইহা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েক শত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি; আমি কতকগুলি সন্ন্যাসী কোরবো, তার পর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিরা আমার বিরুদ্ধে যতই লাগ্‌ছে, ততই তাদের দেশে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে। এই খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিরা টাকার জন্য এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য যা কিছু তাই সব করে থাকে। তবু তারা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি কলাকৌশল যতই খাটাক না কেন, তারা প্রতিদিনই বুঝ্‌ছে, আমাকে চেপে মেরে ফেলা তাদের পক্ষে একটু কঠিন কাজ। ইতিমধ্যে লণ্ডনে আমার কয়েকটী বন্ধু জুটেছে। আমি আগষ্টের শেষে সেখানে যাব মনে করছি—দেখি, ওদিকে পাদ্রিদের কিরূপ ঘাঁটাতে পারা যায়। যাই হক, আগামী শীতকাল কতকটা লণ্ডনে ও কতকটা নিউইয়র্কে কাটাতেই হবে—তার পরেই আমার ভারতে ফের্‌বার বাধা থাক্‌বে না। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে এই শীতটার পরে এখানকার কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে। প্রত্যেক কার্য্যকেই তিনটী অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে কোন ব্যক্তি তার সময়ের প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চিতই লোকে ভুল বুঝ্‌বে।

সুতরাং বাধা অত্যাচার আসুক, স্বাগত—কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হতে হবে এবং ভগবানে প্রবল বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই এসব উড়ে যাবে। * * * * ইতি

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

১৯ পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা—
নিউ ইয়র্ক।
৩০শে জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ঠিক করেছ। নাম আর 'ফটো' * ঠিকই হয়েছে। বাজে সমাজসংস্কার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না হলে সমাজসংস্কার হতে পারে না। কে তোমায় বল্লে, আমি সমাজ সংস্কার চাই? আমি তা চাইনা। ভগবানের নাম প্রচার কর কুসংস্কার ও সমাজের আবর্জ্জনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বোলো না। "সন্ন্যাসীর গীতি" + এইটীই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ। নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিশ্বাস হারিও না—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না, হে বৎস! যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বর

* স্বামীজির উৎসাহে মান্দ্রাজ হইতে এই সময়ে (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) ব্রহ্মবাদিন্ নামক পাক্ষিক (পরে মাসিক) ইংরাজী পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম এবং ফটো 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'কে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পত্র উঠিয়া গিয়াছে।

+ Song of the Sannyasin নামক স্বামিজী রচিত বিখ্যাত কবিতা ব্রহ্মবাদিন্ পত্রের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিশ্বাস—এই তিনটী জিনিষ থাক্‌বে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পার্‌বে না। আমি দিন দিন হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব কর্‌ছি। হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও।

সদা আশীর্ব্বাদক—
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক।
১৮৯৫

প্রিয় কিডি,

তোমাকে এক লাইন না লিখে একখানা গোটা চিঠি লিখ্‌ছি।

তুমি দিন দিন উন্নতি কর্‌ছ জেনে খুব সুখী হ'লাম। তুমি যে ভাব্‌ছ, আমি আর ভারতে ফির্‌বো না, এটা তুমি ভুল বুঝেছ। আমি শীঘ্র ভারতে ফির্‌বো। তবে কোন বিষয় আরম্ভ করে সেটাতে আমি অসিদ্ধকাম হয়ে ছেড়ে দেওয়া আমার অভ্যাস নয়। এখানে আমি একটা বীজ পুতেছি, উহা শীঘ্রই বৃক্ষে পরিণত হবে—হবেই হবে। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, যদি আমি তাড়াতাড়ি করে উহার প্রতি যত্ন নেওয়া বন্ধ করি, তবে তাতে উহার বাড়ের ক্ষতি হবে। তোমাদের কাগজটা বার করে ফেল। তোমাদের সঙ্গে আমার এখানকার লোকদের যোগাযোগ করে দিয়ে, আমি ভারতে যাচ্ছি আর কি।

বৎস, কাজ করে যাও—রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। আমি প্রভুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। সুতরাং শেষে সব ভালই দাঁড়াবে। চিরদিনের জন্য আমার ভালবাসা জানিবে।

তোমার
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

আমেরিকা
আগষ্ট, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি প্যারিসে উপস্থিত হব। সুতরাং কল্‌কেতা ও খেতড়িতে লিখে দিও যে, উপস্থিত যেন সেখান থেকে আমেরিকার ঠিকানায় না লেখে। তবে আগামী শীতেই আবার নিউ ইয়র্কে ফির্‌ছি। সুতরাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ থাকে, তবে নিউ ইয়র্কে ১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা ঠিকানায় উহা পাঠাবে। এ বছর আমি অনেক কাজ করেছি, আস্‌ছে বছর আরও বেশী কর্‌বার আশা করি। মিশনরিদের বিষয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামিও না। তারা যে চেঁচাবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কেনা চেঁচায়? গত দুই বৎসর মিশনরি ফণ্ডে মস্ত ফাঁক পড়েছে আর সেটা বাড়্‌তেই চলেছে। যাই হোক মিশনরিদের সম্পূর্ণ সিদ্ধি হক্ আমি ইচ্ছা করি। যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর উপর অনুরাগ থাক্‌বে আর সত্যের উপর বিশ্বাস থাক্‌বে, ততদিন হে বৎস, কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু এর মধ্যে একটা নষ্ট হয়ে গেলেও তা বড় বিপজ্জনক। তুমি বেশ বলেছো, আমার ভাবগুলি ভারত অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে অধিক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হ'তে চলেছে। আর প্রকৃতপক্ষে ভারত আমার জন্য যা করেছে, আমি ভারতের জন্য তার চেয়ে বেশী করেছি একটুকরা রুটি তার সঙ্গে ঝুড়িখানেক গোলআলু আমি সেখানে এই পেয়েছি। আমি সত্যে বিশ্বাসী আমি যেখানেই যাই না কেন, প্রভু আমার জন্য দলে দলে কর্ম্মী প্রেরণ করেন। আর তারা ভারতীয় শিষ্যগণের মতও নয়, তারা তাদের গুরুর জন্য জীবন ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি কর্ত্তব্যে বিশ্বাসী নহি কর্ত্তব্য হচ্ছে সংসারীর পক্ষে অভিলাষ স্বরূপ উহা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। কর্ত্তব্য ত একটা বাজে

কথামাত্র। আমি মুক্ত আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে—এই শরীর কোথায় যায় বা না যায়, আমি তা কি গ্রাহ্য করি? তোমরা আমাকে বরাবর ঠিক ঠিক সাহায্য করে এসেছ—প্রভু তোমাদিগকে তার পুরস্কার দেবেন। আমি ভারত বা আমেরিকা থেকে প্রশংসা কখনও চাইও নি আর ঐরূপ ফাঁকা জিনিষ এখনও খুঁজছি না। আমার—ভগবানের সন্তান আমার—একটা সত্য শিক্ষা দেবার আছে। আর যিনি আমাকে ঐ সত্য দিয়েছেন, তিনিই ভূগর্ভ মধ্য হতেও আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহকর্ম্মী সব প্রেরণ করবেন। তোমরা হিন্দুরা কয়েক বৎসর ভিতরই দেখবে, প্রভু পাশ্চাত্য দেশে কি কাণ্ড করেন। তোমরা সেই প্রাচীন কালের য়াহুদী জাতির মত—জাবপাত্রশায়ী কুকুরের মত—তোমরা নিজেরাও খাবে না, অপরকেও খেতে দেবে না। তোমাদের ধর্ম্মভাব মোটেই নাই—তোমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন রান্নাঘর, তোমাদের শাস্ত্র হচ্ছে ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয়—দলে দলে তোমাদের নিজেদের মত রাশি রাশি অপত্যোৎপাদনে। তোমরা কয়েকটী ছেলে খুব সাহসী, কিন্তু কখনও কখনও আমার মনে হয়, তোমরাও বিশ্বাস হারাচ্ছ। বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে। তোমাদের মধ্যে—সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, সর্ব্বদা তার সঙ্গ করবে। বড় বড় ব্যাপার কখনও সহজে বিনা বাধায় হয়ে থাকে? সময়, ধৈর্য্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে তবে কাজ হয়। আমি তোমাদের এখন অনেক কথা বল্‌তে পারতাম, যাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌ত কিন্তু আমি তা বোলব না। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাহি, যা কিছুতেই কাঁপতে জানে না। দৃঢ় ভাবে লেগে থাকো প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সদা আশীর্ব্বাদক—

বিবেকানন্দ

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

প্যারিস।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই মাত্র তোমার ও জি, জির পত্র যুক্তরাজ্য. আমেরিকা ঘুরে আমার কাছে পৌছুল।

তোমরা যে মিশনরিদের আহাম্মকি বাজে কথাগুলো পড়ে সত্য সত্যই এতটা বিচলিত হয়েছে, তাতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কল্‌কেতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দু খাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের বোলো. তারা যেন আমার একটা রাঁধুনি ও তাকে রাখ্‌বার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কড়া কানাকড়ি সাহায্য কর্‌বার মুরোদ নেই—এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া—এতে আমার হাসিই আসে।

অপর দিকে, যদি মিশনরিরা বলে. আমি সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগরূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বোলো যে, তারা মস্ত মিথ্যাবাদী। মিশনরি হিউমকে লিখে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তিনি যেন পরিষ্কার করে লেখেন, তিনি আমার কি অসদাচরণ দেখে-ছিলেন। অথবা তিনি যদি অপর কারও কাছে তা শুনে থাকেন, তবে তাঁর নামই বা কি এবং তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন কি না। এইরূপ কর্‌লেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে আর তাদের দুষ্টামিপ্রসূত মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। ডাঃ জেন্‌স্‌ ঐ মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, যে কোন ব্যক্তি হক্‌ কারও কথায় আমি চোলবো না। আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি আর আমার জাতিবিশেষের উপর তীব্র অনুরাগ বা জাতিবিশেষের উপর তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি আমি সমগ্র জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না, আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করেছি—তোমরা এখন নিজেদের সামলাও।

কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে? আমি কি জাতি-বিশেষের ক্রীতদাস নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমরা আর বাজে আহাম্মকি বোকো না।

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি—আর যা কিছু টাকা পেয়েছি, সব কল্‌কেতা ও মান্দ্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত করবার পর তাদের আহাম্মকের মত হুকুমে আমাকে চল্‌তে হবে। তোমরা কি লজ্জিত হচ্ছ না? আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি? আমি কি তাদের প্রশংসার এতটুকু তোয়াক্কা রাখি, না, তাদের নিন্দার ভয় করি? বৎস, আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্য্যন্ত এখনও আমায় বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও। তা যদি না পার, চুপ করে থাক, কিন্তু তোমাদের আহাম্মকি দিয়ে তোমাদের মনোমত কাজ করাবার চেষ্টা কোরো না। আমার পিছনে আমি এমন একটা শক্তি দেখ্‌ছি, যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেক গুণে বড়। আমার কারও সাহায্যের দরকার নেই। আমি ত সরাজীবন অপরকে সাহায্য করে আস্‌ছি। আমাকে সাহায্য করছে, এমন লোক ত আমি এখনও দেখ্‌তে পাইনি। বাঙ্গালীরা তাদের দেশে যত লোক জন্মেছে, তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য কয়েকটা টাকা তুল্‌তে পারে না, এদিকে তারা ক্রমাগত বাজে বক্‌ছে আর যার জন্যে তারা কিছুই করেনি, বরং যে তাদের জন্য তার যথাসাধ্য করেছে, তারই উপর হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞই বটে!!! তোমরা কি বল্‌তে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু বলে থাক, সেই জাতিভেদকে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্য আমি জন্মেছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ্‌তে চাই নি। আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে (Politics) বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র (Politics) আর সব বাজে।

আমি কাল লণ্ডনে যাচ্ছি। বর্ত্তমানে আমার তথাকার ঠিকানা হবে C/o ই,টি, ষ্টার্ডি, হাইভিউ, কেভারস্থাস, রেডি, ইংলণ্ড।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার কোর্‌বো মনে কর্‌ছি। সুতরাং তোমাদের কাগজের জন্য তোমরা সম্পূর্ণ রূপে আমার উপর নির্ভর কর্‌লে চল্‌বে না। তোমরা ছাড়াও আমার অনেক জিনিষ দেখ্‌বার আছে।

ইতি—বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

রেডিং, ইংলণ্ড।

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫।

প্রিয়—,

** জীবনটা কতকগুলো যুদ্ধ ও ভুলভ্রান্তির সমষ্টিমাত্র। ** জীবনের রহস্য হচ্ছে—নানারূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ—ভোগ করা নহে। কিন্তু হায়, যে মুহূর্ত্তে আমরা যথার্থ শিক্ষালাভ কর্‌তে আরম্ভ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের ওপারে যাবার ডাক পড়ে। অনেকের পক্ষে আমাদের মৃত্যুর পরের অস্তিত্বের পক্ষে ইহা একটা প্রবল যুক্তি। ** সব স্থলেই কাজের উপর একটা ঝড় বয়ে যাওয়া খুব ভাল। তাতে হাওয়াটাকে পরিষ্কার ক'রে দেয় এবং আমাদিগকে সব জিনিষের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে থাকে। কাজ নূতন করে আরম্ভ হয়, কিন্তু তখন বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। **

আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে।

ইতি—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫।
রেডিং, ইংলণ্ড।

প্রিয়—,

* * পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। * * আমার ভালবাসা জানিবে।

ইতি
বিবেকানন্দ।

চারি আর্য্য-সত্য।

(শ্রীচারুচন্দ্র বসু)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অষ্টাঙ্গ মার্গই দুঃখ নিরোধের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

বৌদ্ধগ্রন্থে এই পন্থাকে পরম মঙ্গলকর মধ্যপথ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি, ইহাই অষ্টাঙ্গ মার্গ। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও সেই দুঃখ নিরোধের উপায়কে চারি আর্য্য সত্য বলে। উক্ত চারি আর্য্য সত্যের প্রকৃত উপলব্ধিকে সম্যক দৃষ্টি বলে। জগৎ দুঃখময়; জীবন, জন্ম, জরা ও মৃত্যু দ্বারা প্রপীড়িত, এই জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর মূলীভূত কারণ কি ও যোগ উপায় অবলম্বন করিলে এই জগৎব্যাপী দুঃখ কষ্টের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, যে জ্ঞান অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তের যথার্থ উপলব্ধি হয়, তাহাকেই সম্যক দৃষ্টি বলে। নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সঙ্কল্প ও অবিহিংসা সঙ্কল্প,

ইহাই হইল সম্যক সঙ্কল্প। মিথ্যাবাদ, পিশুনবাদ, পরুষবাদ ও সম্প্রলাপ বিরতই সম্যক বাক্। প্রাণী-হিংসা অদিন্নদান, অব্রহ্মচর্য্য—এই সকল হইতে বিরতই সম্যক কর্ম্মান্ত। অসদুপায় পরিত্যাগ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই সম্যক আজীব। নূতন পাপ জন্মিতে না দেওয়া, অকুশল ধর্ম্ম সমূলে সংহার, কুশল ধর্ম্ম পালন করা, উৎপন্ন পুণ্যের স্থিতির জন্য যে চেষ্টা তাহাই সম্যক ব্যয়াম। কাম জগতের প্রতি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, বেদনা সমূহের প্রতি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, চিত্ত জগতের প্রতি ইচ্ছা, ধর্ম্ম জগতের প্রতি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ইহাই সম্যক স্মৃতি। সবিতর্ক ধ্যান, অবিতর্ক ধ্যান নিষ্প্রীতিক ও অদুঃখাসুখ ধ্যানকে সম্যক সমাধি বলে। সবিতর্ক ধ্যানের সময় ভিতরে একটা বিচার চলিতে থাকে। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তি সকলের মধ্যে অসৎ বৃত্তি পরিত্যজ্য ও সৎবৃত্তি মঙ্গলদায়ক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার বিচার চলিতে থাকে তাহাকেই সবিতর্ক ধ্যান বলে। ক্রমে যখন চিত্তের সৎ ও অসৎবৃত্তি সমূহের বিরোধ উপশান্ত হয়, তখন অবিতর্ক ধ্যান উপস্থিত হয়। তখন প্রীতি ও অপ্রীতি এতদুভয়ের প্রতি উপেক্ষা জন্মে, তখন সাধক নিষ্প্রীতিক ধ্যান লাভ করে, ক্রমে অন্তর হইতে সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে, ধ্যানের যে অবস্থায় পুদ্গল উপস্থিত হয়, তাহাকে অদুঃখাসুখ ধ্যান বলে, অর্থাৎ সুখ নাই, দুঃখ নাই একটা চিরশান্তি এই সময়ে অন্তরে বিরাজ করে। ইহাই মধ্য পথ ইহার আদিতে কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ,ইহাই নির্ব্বাণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

গৌতম বুদ্ধ যেমন অষ্টাঙ্গ মার্গই নির্ব্বাণ লাভের মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মহর্ষি পতঞ্জলি সেইরূপ কৈবল্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ আটটী পন্থার উল্লেখ করিয়াছেন। উহাকেই অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। প্রথম পাঁচটী বহিরঙ্গ ও শেষ তিনটী অন্তরঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য্য হইতে নিবৃত্তি)। ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ইহাদের নাম নিয়ম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম বলে। পদ্মাসন, বীরাসন, প্রভৃতি স্থিরভাবে ও স্বচ্ছন্দে বসি-

বার প্রক্রিয়াকে আসন বলে। প্রাণ বায়ুর সংযমের নাম প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয় নিরোধকে প্রত্যাহার বলে। কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি চিত্তের একাগ্রতার নাম ধারণা। এই ধারণা যখন গাঢ় হয় ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরে যায় এবং চিত্তবৃত্তি একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে তাহাকে ধ্যান বলে। এই ধ্যান যখন পরিপক্ক হইয়া ধ্যেয়াকারে পরিণত ও চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধি দুই প্রকার সবীজ ও নির্ব্বীজ, উহাদের আর এক নাম হইতেছে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যে অবস্থায় চিত্তের অবলম্বন বিদ্যমান থাকে ও ধ্যেয় বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। উহা আবার চারি প্রকার,—সবিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার। ক্রমে এই সকলের যখন নিরোধ উপস্থিত হয় সেই অবস্থাকে নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। ইহাই কৈবল্য লাভের উপায়।

এক্ষণে দেখা যাউক নির্ব্বাণ কাহাকে বলে। গত বৎসর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার এক পত্রের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দুর মুক্তি ও বৌদ্ধের নির্ব্বাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, মুক্তি হইল শাশ্বত আনন্দের অবস্থা আর নির্ব্বাণ হইল Annihilation বা Extinction বা ধ্বংস। প্রথমটী Positive side of truth ও অপরটী Negative side of truth। এ প্রকার মতবাদ কিছু নূতন নহে। যতদিন বৌদ্ধ সাহিত্যের সম্যক্ প্রচার হয় নাই, বৌদ্ধ দর্শনের জ্ঞান সুগম হয় নাই ততদিন এ প্রকার মত প্রায়ই শুনা যাইত। সুখের বিষয় যতই দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে এ প্রকার ধারণা দূরে যাইতেছে। নির্ব্বাণ যদি Extinction বা Annihilation হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা হইতেছে, উহা কিসের Extinction? উত্তর আমরা বলিব উহা রাগ দ্বেষ ও মোহের annihilation উহা বাসনার বা তৃষ্ণার ক্ষয়, উহা অবিদ্যার ধ্বংস।

রত্নকূট সূত্রে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন—

রাগদ্বেষমোহক্ষয়াৎ পরিনির্ব্বাণম্।

রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ের নাম নির্ব্বাণ। রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় হইলেও জীবের আত্মাভিমান লুপ্ত হইয়া যায় অহংকার ও মমকার ধ্বংস হইলেই নির্ব্বাণ লাভ হয়।

বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে শান্তিদেব বলিয়াছেন :—

সর্ব্বত্যাগশ্চ নির্ব্বাণং নির্ব্বাণার্থিব মে মনঃ

সর্ব্বত্যাগের নাম নির্ব্বাণ—সংসারে সুখ দুঃখ, আত্মভিমান ইত্যাদি সমস্ত ত্যাগের নাম নির্ব্বাণ।

রত্নমেঘ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

'তৃষ্ণায়া বিপ্রহানেন নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে।'

তৃষ্ণার সম্যক নিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ। সংসারের সহিত নিজের সম্বন্ধ রাখিবার প্রবল ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই কর্ম্মের ক্ষয় ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলেই শূন্যতাকেই নির্ব্বাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। যে অবস্থায় সংস্কারের ধ্বংস, আমিত্বের অস্তিত্বও দূরে যায়, সেই অবস্থায় থাকে কি? তখন শূন্যতা মাত্র অবশিষ্ট থাকে এই শূন্যতাই নির্ব্বাণ। এই শূন্যতা পদার্থ অতি দুর্ব্বোধ ইহা ভাব পদার্থ নহে অভাবও নহে. ইহা ভাব ও অভাবের অতীত।

অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতি কা দেশনা চ কা

ইহা কোন অক্ষর বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন :—

অস্তি নাস্তি উভয় অনুভয় ইতি চতুষ্কোটি বিনিমুক্তং

শূন্যত্বম।

পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে নির্ব্বাণকে অমৃতের পথস্বরূপ, পরাশান্তি স্বরূপ, পরম সুখকর, নিত্য, শাশ্বত, অচ্যুতস্থান, পরমধাম, অনিমিত্ত ও বিমোক্ষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই যদি হইল নির্ব্বাণ, তাহা হইলে আমাদের দেখা আবশ্যক নির্ব্বাণ যে ধ্বংস এ প্রকার ধারণা কোথা হইতে আসিল? ইহার কারণ হইতেছে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার উপদেশের মধ্যে কোথাও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জীব বা

পুদ্গল পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি। পাঁচটী স্কন্ধ হইতেছে—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। প্রত্যেক জড় পদার্থ মাত্রেই নাম ও রূপের অধীন, এস্থলে রূপ বলিতে শরীর বুঝাইতেছে। সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, প্রীতি ও ভালবাসা প্রভৃতির নাম বেদনা, সংজ্ঞা অর্থে অনুভূতি, ইংরাজীতে যাহাকে perception বলে; অতীতকালে আমরা যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, আমাদের মনোমধ্যে সেই সকল পদার্থের জ্ঞান বা সেই সকল কার্য্যের যে স্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে উহাকেই সংস্কার বলে। এই সংস্কার হইতেই বিজ্ঞান বা পদার্থ সমূহের প্রকৃত জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়।

জীব বা পুদ্গল এই পাঁচটী স্কন্ধের সমষ্টি মাত্র, ইহা ব্যতীত আত্মা বলিয়া কোন নিত্য পদার্থ নাই। যাহাকে আত্মা বলা হয়, উহা ক্ষণিক ও দুঃখপদ বাচ্য; জীবের মৃত্যুর সহিত এই পাঁচটী স্কন্ধের বিনাশ হয়, তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। থাকে একমাত্র কর্ম্ম; মৃত্যুর সহিত স্কন্ধের লয় হইল বটে, কিন্তু কর্ম্মের ক্ষয় হইল না, সেই কর্ম্মের প্রভাবে আবার নূতন স্কন্ধের উৎপত্তি হইল, আবার জীবদেহ গঠিত হইল, এইরূপে জীব একজন্ম হইতে আর এক জন্মে, এক লোক হইতে অন্য লোকে বারম্বার পুনরাবর্ত্তণ করিয়া থাকে। এইরূপে পুদ্গল যখন ক্রমে ক্রমে বিশেষের পথে অগ্রসর হয়, জ্ঞান প্রভাবে ততই তাহার কর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, ক্রমেই তাহার জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকে. ক্রমে ক্রমে জীব এমন একটা স্থানে উপনিত হয়, যে স্থান হইতে একটা স্রোত নির্ব্বাণ-সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ মার্গে অগ্রসর হইলে জীব এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকে বৌদ্ধশাস্ত্রে স্রোতাপত্তি অবস্থা বলে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের নির্ব্বাণ লাভের আর সাত জন্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে, ক্রমে জীব যখন আরও উচ্চ অবস্থা লাভ করে তখন যে অবস্থায় উপনিত হয়, তাহাকে সকৃদাগামী অবস্থা বলে, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নির্ব্বাণ লাভের আর এক জন্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার পরের অবস্থার নাম অনাগামী অবস্থা; সে অবস্থায় উপনীত হইলে, যদিও তাহাকে পৃথিবীতে বা কামলোকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না বটে, কিন্তু ব্রহ্মলোকে তাহাকে আর একবার

মাত্র জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পরের অবস্থার নাম অর্হত্ব বা মুক্ত অবস্থা। যে জন্মে এই অবস্থা লাভ হয়, জীব সেই জন্মেই মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করে। এই নির্ব্বাণকে উপাধিশেষ নির্ব্বাণ বলে, দেহ থাকিতে থাকিতেই উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, বেদান্তে ইহাকেই জীবন্মুক্তি বলিয়া থাকে। গৌতম বুদ্ধ বোধিবৃক্ষমূলে এই নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে জন্ম মৃত্যুর শেষ হয়, স্কন্ধের লয় হয়, কর্ম্ম আর জীব দেহ গঠন করিতে পারে না, বাসনা বা তৃষ্ণা নির্ম্মূল হয় এবং অবিদ্যার নাশ হয়। এই অবস্থা লাভ করিয়াই গৌতম বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো, দুক্‌খা, জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গ্যা গহকূটং বিসাঙ্খিত,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা॥

"দেহরূপ গৃহনির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, তাঁহাকে না পাইয়া কতবার ভ্রমণ করিলাম, কতবারই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখকর। হে গৃহকারক! এইবার তোমাকে দেখিয়াছি আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, সংসারাবর্ত্তে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিব না, তোমার কাষ্ঠদণ্ড সকল ভগ্ন হইয়াছে। গৃহকূট (গৃহ চূড়া কর্ণিকা মণ্ডল) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণ গত (সংস্কার সমূহ হইতে মুক্ত) আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণার ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। দেহনাশের সহিত যে অবস্থায় জীব উপনীত হয় তাহাকে নিরুপাধি শেষ নির্ব্বাণ বলে, গৌতম বুদ্ধ কুশিনগরে এই অবস্থা লাভ করেন।

গৌতমবুদ্ধ আত্মার নিত্যত্ব বা পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে পুদ্গল কেবল মাত্র স্কন্ধের সমষ্টি। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে স্কন্ধের বিনাশের পর কি অবশিষ্ট থাকে, কেই বা নির্ব্বাণ লাভ করে? এই সংশয় কেবল যে আমাদের মনের মধ্যে উদয় হইতেছে তাহা নহে, বুদ্ধ শিষ্য মালুঙ্ক পুত্রের মনোমধ্যেও এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভগবান বুদ্ধ সমীপে উপনীত হইয়া

বলিতেছেন—"ভগবান্! দেহ ও আত্মা এক কি না, কিম্বা দেহ ও আত্মা পৃথক, দেহত্যাগের পর ভগবান কি অবস্থায় অবস্থান করিবেন, সে বিষয়ে কোন উপদেশ দান করেন নাই।" ভগবান উত্তর করিলেন, "মালুঙ্ক পুত্র, মনে কর তুমি কোন সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছ ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছ তোমার আত্মীয়গণ শূল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন তুমি কি বলিবে সে বিদ্ধবাণ মোচন করা এক্ষণে আবশ্যক নাই, আমি অগ্রে জানিব, জানিতে চাই যে ব্যক্তি আমাকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছে, সে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র, তাহার কোন্ জাতি বা কি কুল, সে দীর্ঘ কায় বা খর্ব্বাকৃতি ইত্যাদি। সেইরূপ হে মালুঙ্কপুত্র, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু তোমাকে আক্রমন করিয়াছে, বাসনা বা তৃষ্ণাজালে তুমি আবদ্ধ, এক্ষণে বৃথা বিতর্কাদি পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্মজরা ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাও, তোমার কি তাহাই করা উচিত নহে আমি তোমাকে চারি আর্য্যসত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ শিক্ষা দিয়াছি, তোমার কি উচিত নহে, অগ্রে সেই শিক্ষা অনুশীলন করা। সেই শিক্ষা অনুশীলন দ্বারা যখন প্রজ্ঞা বলে অবিদ্যা দূরে যাইবে, সম্যক্ সমাধি অবস্থায় উপনীত হইবে, তখন তোমার সর্ব্বসংশয় অপনীত হইবে, নির্ব্বাণ কি তাহা আপনি প্রতিভাত হইবে। এই বলিয়াই আর্য্য ঋষিগণ চরম তত্ত্বর বিচারস্থলে তর্কের প্রয়োগ করেন না। ভগবান বারম্বার বৃথা বিতর্কাদি পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছেন।

সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং, সিত্তাতে লহুমেস্সতি
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বানমেহসি

নৌকা যেমন জল পূর্ণ থাকিলে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারে না, অপরদিকে ডুবিবার ভয় থাকে, সেরূপ স্থলে নৌকা হইতে জল সিঞ্চন আবশ্যক হয়, সেইরূপ হে ভিক্ষু, তোমার দেহরূপ নৌকা হইতে বৃথাবিতর্কাদিরূপ জল সিঞ্চন কর, উহা লঘু হইবে। রাগ দ্বেষাদির বন্ধন ছেদন করিয়া তুমি শীঘ্র নির্ব্বাণ সাগরে উপনীত হইবে।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, পুদ্গল যখন পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি তাহাতে আর

কিছু নহে, তখন এই স্কন্ধের বিনাশ বা ধ্বংসের পর কি থাকে, ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে স্কন্ধরূপ অনিত্য বস্তু যখন দূরে যায় একমাত্র নিত্য বস্তু যে নির্ব্বাণ তাহাই বিদ্যমান থাকে, কারণ ইহা নিত্য, শাশ্বত, আনন্দ ও অনিমিত্ত, ইহা Annihilation, Extinction বা Negation নহে। ইহাকে নির্ব্বাণই বলুন বা শূণ্যতাই বলুন ইহা মানব চিন্তার সর্ব্বোচ্চ সোপান, দার্শনিক চিন্তা ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক প্রকার ধ্যান ধারনার উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে শূন্যতার ধ্যানই সাধন মার্গের উচ্চতম সোপান। এখানে কোন পার্থক্য বা ভেদাভেদ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, অস্তি নাই, নাস্তি নাই ইহা অস্তি নাস্তির সমন্বয়, এখানে উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই ইহা উৎপত্তি ও বিনাশের মিলন স্থান, এখানে ক্ষণিকত্ব ও নিত্যত্ব এই সকল আপাত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম পরস্পরের বিরোধ ত্যাগ করিয়া অবস্থিত আছে। ইহা বাক্য ও মনের অগোচর সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সেই কারণেই ঋষিগণ কেবল নেতি নেতি বলিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এই নেতি নেতি Negative; ইহা অস্তি নাস্তি, ভাব ও অভাবের মিলন; সেই জন্যই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন হে সুভতে! ইহা (এই নির্ব্বাণ বা শূন্যতা) গম্ভীর ইহা অপ্রমেয় ও অক্ষয়। ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন।

মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্স পারগূ।
সর্ব্বথ বিমুক্ত মানসো ন পুন জাতি জরং উপোহসি॥

হে ভিক্ষু, তোমার সম্মুখে মধ্যে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর এবং সর্ব্ব প্রকার বিমুক্ত চিত্ত হইলে তোমাকে জন্ম জরা ভোগ করিতে হইবে না।

"সুখের সন্ধানে।"

(শ্রীসাহাজি)

চাই সুখ, চাই না দুঃখ। ফুল খাইব, কিন্তু কাঁটা ফুটিবে না, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু জগতে সুখের গোলাপ দুঃখের কণ্টকে জড়িত। এমন কিছুই নাই এখানে, যাহা আমাদিগকে নিত্য সুখের অধিকারী করিতে পারে। সুতরাং মিথ্যা এই জগৎ, সত্য সেই জগদতীত ব্রহ্ম।

কিন্তু, জগৎ মিথ্যা, যাহার মনে এই ধারণা জন্মে, সে জগতের কোন কিছুকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারে না। অতএব, এমন যে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী, যাঁহার বক্ষে সন্তান সুধার আস্বাদ পায়, তাঁহারই গর্ভ হইয়া দাঁড়ায় তখন মহানরক। "ভবে যাওয়া আসা কি যন্ত্রণা" বলিয়া আমরা তখন পথে ঘাটে গান জুড়িয়া দেই, "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে ?"—সুতরাং জন্মানই তখন বিড়ম্বনা এবং না জন্মানই তখন পরম পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়ায়, মৃত্যু বড় দুঃখের! মৃত্যুতে আমার বলিতে যা কিছু, সব ছাড়িয়া যাইতে হয়। সুতরাং, এই আমার জ্ঞান, এই মায়াই যখন সকল অনর্থের মূল, তখন এই মায়ার ধ্বংস করা চাই। অতএব, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয়, সংসার, সমাজ--সকলই তখন মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। বনে যাওয়াই তখন কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ,—জীবন ব্যাপী এই কর্ম্ম-প্রবাহ। এককর্ম্ম অন্য কর্ম্মের সূচনা করে। এই জীবন পূর্ব্ব জন্মার্জিত কর্ম্মফলের অপরিহার্য্য পরিণাম, আবার ভবিষ্যৎ জীবনের অবশ্যম্ভাবী কারণ। সুতরাং এই কর্ম্মই যে হেতু, সকল অনর্থের মূল, সেই হেতু কর্ম্ম ত্যাগই হইয়া দাঁড়ায় তখন পরম ধর্ম্ম। এই জন্যই আমরা তখন মুক্তি চাই, সুখ চাই, আলোক চাই, চাই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর। আর দুঃখের একান্ত অভাবই

সুখ, অন্ধকারের একান্ত বিনাশই আলোক, বন্ধনের পরানিবৃত্তিই মুক্তি, জগতের অসদ্ভাব যেখানে, সেই খানেই ঈশ্বর, এইরূপ বুঝি; অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, বন্ধন ও মুক্তি, জগৎ ও ঈশ্বর,—এই সকলকে দ্বৈত বুদ্ধি বশতঃ পৃথক মনে করি, সুতরাং আমরা তখন এই প্রত্যক্ষ জগৎকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সেই দ্বন্দ্বাতীত মানসকল্প লোকের সন্ধানে উধাও হইয়া যাই। লীলাকে দূরে রাখিয়া নিত্যকেই বরণ করিয়া লই। *

কিন্তু এইরূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে আমরা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। অনুলোম বিচারের সমাপ্তি হওয়ায় তখন বিলোম বিচারের আরম্ভ হয়। আমাদের চিন্তার ধারা তখন নূতন পথে ধাবিত হয়। তখন মনে হয়, আলো চাই আঁধারকে এড়াইয়া গিয়া, সুখ চাই দুঃখকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, মুক্তি চাই বন্ধনকে টুটিয়া ফেলিয়া, কিন্তু, আঁধার নাই যেখানে, আলোরও সার্থকতা নাই সেখানে, বন্ধন বিনা মুক্তি নাই, "দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?" নিষ্কণ্টক গোলাপের অস্তিত্ব কুত্রাপি নাই। বিশ্বকে বাদ দিলে বিশ্বেশ্বরও নিরর্থক হইয়া পড়েন, ফলতঃ, তখন আমরা বুঝিতে পারি, মুক্তি, সুখ, আলোক প্রভৃতি শব্দের অর্থ, পূর্ব্বে যেমন বুঝিয়াছিলাম, বস্তুতঃ উহাদের প্রকৃত অর্থ ঐরূপ নাস্তিত্ব বোধক নহে। সংস্কৃত ভাষায় "শোকাপনোদ" শব্দে শুধু "দুঃখহারী" নহে, "সুখকারীও" বুঝিতে হয়। "শোকাপনোদ" শব্দের এই যে positive অর্থ, তখন আমরা তাহা বুঝিতে পারি এইরূপ জগতের যাহা কিছু সকলই তখন নূতন অর্থ লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সংসার মিথ্যা অতএব সন্ন্যাস লইয়া বনে যাও। কিন্তু সেই বন কি সংসারের বাহিরে? ফলতঃ "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ"—অতএব, সব ছাড়িয়া বনে যাও—এই শ্লোকাংশের অর্থ কিন্তু এরূপ নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শুধু স্ত্রী পুত্র নহে, এই বিশ্ব জগৎ আমার আত্মার

---

* এখানে কোন শাস্ত্র বা মত বিশেষের অবতারণা করা হইল না। এসকল সম্বন্ধে আমাদের সাধারণতঃ যে ধারণা তাহাই উল্লেখ করা হইল।

বিস্তৃতি অর্থাৎ আত্মীয়। সকলেই যখন আমার আপন, তখন এই অনন্ত আত্মীয়ের রাজ্যে সকলকে বাদ দিয়াই স্ত্রীপুত্রাদি কতিপয় ব্যক্তিমাত্রেকেই শুধু আত্মীয় ভাবি কি করিয়া? সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ ইহাই; সুতরাং সন্ন্যাস বলিয়া কিছুই নাই; সংসারের একান্ত অভাব নহে, পরন্তু সংসারের বিস্তৃতিই সন্ন্যাস।

এইরূপ, যিনি এই ক্ষুদ্র সংসারের কয়েক জন আত্মীয়কেই ভালবাসেন তিনি মায়াবদ্ধ। কিন্তু এই বিশ্বই যাহার সংসার, তিনিই প্রেমিক। অল্প কয়েকজনকে ভালবাসাই মায়া আর অনেককে ভালবাসাই প্রীতি; অতএব, প্রীতি মায়ারই বিস্তৃতি। কুশাসনে বা কাষ্ঠাসনে বসিলে "আসনে" বসা হয়। কিন্তু এই যে অনন্ত বিস্তৃত মৃত্তিকা আসন, ইহাতে বসিলে আর আসনে বসা হয় না। সেইরূপ মায়াও যখন বিশ্বময় ছাড়াইয়া পড়ে, তখন আর তাহাকে মায়া বলা হয় না।

কর্ম্মফলে মানবের জন্ম মৃত্যু হয়, সুতরাং কর্ম্মক্ষয়েই চরম সার্থকতা। কিন্তু সত্যই কি কর্ম্মের ক্ষয় হয়? আমার এই যে বর্ত্তমান জন্ম, হইতে পারে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল এবং আমার ভবিষ্যৎ জন্মের দ্যোতক। ফলতঃ কর্ম্মফলে জীবের জন্ম মৃত্যু হয়, এ কথা না হয় মানিলাম কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কর্ম্ম না করিলে যখন জন্ম হয় না, তখন কোন কর্ম্মের ফলে আমার সেই প্রথম জন্ম হইয়াছিল? সুতরাং বুঝিতে হইবে, আমার সেই প্রথম জন্ম কোনও কর্ম্মের ফল নহে। সেই জন্মও যাহার ফল, সেই কর্ম্মও তাহারই ফল, আমার সেই জন্ম ও কর্ম্ম, দুয়ের একই কারণ—ব্রহ্ম। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি", ব্রহ্ম যদি অনাদি অনন্ত হয়, কর্ম্ম এবং জন্ম মৃত্যুও তাহা হইলে অনাদি অনন্ত, সুতরাং কর্ম্মক্ষয় হওয়াও তাহা হইলে অসম্ভব, কিন্তু তাহা হইলে মুক্তি কি?—বস্তুতঃ মুক্তির অর্থই বিস্তৃতি, কাণ টানিলেই যেমন মাথা আইসে, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলও তেমনই ভুগিতে হয়। এই কর্ম্ম যখন অহং জ্ঞানের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে, তখন উহাই হয় কর্ম্ম অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম, ইহাই মানবের বদ্ধ অবস্থা। কিন্তু অবশেষে কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় যখন ফলের স্থান শূন্য হইয়া যায়, তখনই মানব মুক্তি পায়, একথার তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বই যখন সংসার হয়, কর্ম্মও তখন

বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহাই হয়, নৈষ্কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ সেবা। সিদ্ধাবস্থায় সাধকের কর্ম্ম থাকে না, এ কথার অর্থ এই যে, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র কর্ম্ম থাকে না, তাঁহার কর্ম্ম তখন চৈতন্যের মত বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে, বিশ্ববাসীর সকলের বোঝা আপনার ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া নিমাইও তাই একদিন দরদী নিতাইকে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আমায় ধর নিতাই,
আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল,
জীব উদ্ধার নাহি হল,
ঋণের দায়ে আমি
এখন বিকাইয়া যাই।"

সুতরাং এই যে নৈষ্কর্ম্ম, ইহার অর্থ কর্ম্ম না করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা নহে; বরং চৈতন্যের ন্যায় অনন্ত কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়াই যথার্থ নৈষ্কর্ম্ম। এই নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী যিনি, তিনিই মুক্ত। তিনি জন্ম মৃত্যুর অধীনে থাকিলেও তাঁহার সেই জন্ম মৃত্যু তখন আর ক্ষুদ্র সকাম কর্ম্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। জেলের কয়েদী জেলেও খাটিয়া খায়, খালাস পাইয়া বাহিরে আসিয়াও খাটিয়াই খায়; অথচ তাহার এই দুই খাটুনিতে কতই প্রভেদ! জেলের খাটুনি কতই দুঃখের, কিন্তু বাহিরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিও মুক্তির আনন্দে কত মধুর, কতই রঙ্গিন! ইহারই নাম মুক্তি। ফলতঃ জীব যখন আপনাকে সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবে, তখনই তাহার বদ্ধ অবস্থা; কিন্তু যখন তাহার নৈষ্কর্ম্মের বিজয় শঙ্খ বাজিয়া উঠে, সে সমগ্রেরই অংশ, সমগ্রের সহিত তাহারও অচ্ছেদ্য সংযোগ, জীবের যখন এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন সে জন্ম মৃত্যুর অধীন থাকিয়াই মুক্তির আনন্দে নাচিয়া উঠে। সুতরাং মুক্তিই অনন্তবন্ধন। রবীন্দ্রনাথও তাই গাহিয়াছেন,—

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।"

বস্তুতঃ, সুখ ও দুঃখ, ত্যাগ ও ভোগ, জন্ম ও মৃত্যু, বন্ধন ও মুক্তি এ সকল পৃথক বস্তু নয়, একই বস্তু অবস্থা বিশেষে একরূপ এবং অবস্থান্তর বিশেষে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়, একই বৃক্ষ, পূর্ব্বদিক হইতে দেখিলে একরূপ মনে হয় আবার পশ্চিম দিক হইতে দেখিলে অন্যরূপ মনে হয়। মিথ্যা বলিলে পাপ হয়, কিন্তু দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কেহ কোথাও লুক্কায়িত হইলে সেই দস্যু আসিয়া যদি ঐ লুক্কায়িত ব্যক্তির সন্ধান জানিতে চাহে, তবে সেরূপ স্থলে মিথ্যা বলিলে, সেই মিথ্যাই সত্য হইয়া দাঁড়ায়, আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, সতীত্ব রক্ষার্থে পতিব্রতার পক্ষে সেই মৃত্যুই হয় জীবন যে নারী বেশ্যারূপে নরকের দ্বার, সতীরূপে তিনিই পতির হ্লাদিনী শক্তিরূপে মহিমময়ী হন। যে মদন লঙ্কাদগ্ধ করিয়াছিল, সেই মদনই হরকোপানলে অনঙ্গ হইয়া কার্ত্তিকেয়ের আবাহন করতঃ স্বর্গ উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল; যে অর্থ নবাব খাঞ্জাখাঁর আত্মধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, সেই অর্থেই মহাত্মা পালিত আজ প্রাতঃ-স্মরণীয়। যে বিষয়ে যযাতি ভোগী হইয়াছিলেন, সেই বিষয়ে থাকিয়াই জনক রাজর্ষি হইয়াছিলেন। যে অভিমানে দুর্যোধনের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, সেই অভিমানেই ধ্রুবের সত্যলোকে অক্ষয় বাস হইয়াছিল, এমন যে সন্দেশ, তাহাও অধিক মাত্রায় ভোজন করিলে বিষের তুল্য পীড়াদায়ক হয়। এমন যে বিষ সুপ্রযুক্ত হইলে তাহাই আবার প্রাণরক্ষায় অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। ফলতঃ, কার্য্য ও চিন্তার অনুপাতে আমাদের সংস্কার দাঁড়াইয়া যায়, তাহারই ফলে, আমরা আমাদিগকে বদ্ধ মনে করি।" যখন অন্যরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তখনই আমরা আমাদিগকে মুক্ত মনে করি। জীব মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। জীবের জ্ঞান যখন অপক্ক থাকে, তখন সে একভাবে চিন্তা করে এবং তাহারই ফলে তাহার বক্তব্য বিষয় তাহার নিকটে মিথ্যা বলিয়া (জগৎরূপে) প্রতীত হয়, এবং তাহার জ্ঞান যখন পরিপক্ক হয়, তখন পূর্ব্ব সংস্কারের পরিবর্ত্তন হেতু সেই একই বিষয়, যাহাকে সে একদিন মিথ্যা বলিয়া, উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাই তখন তাহার নিকটে সত্য বলিয়া (ঈশ্বররূপে) অভিনন্দিত হয়। সেক্সপীয়রও তাই বলিয়াছেন, It is the thinking that makes a thing

good or bad, আমাদের শাস্ত্রকারগণেরও অভিমত তাহাই—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। জেলে যাওয়া অপমানের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজিকার এই স্বরাজ-সংগ্রামে তাহা কত লোকের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জেলে যাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাদের যে সংস্কার ছিল, আজ তাহার স্থান বিশেষে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাই, যাহা একদিন অপমানের বিষয় ছিল, তাহাই আজ প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ফলতঃ, মানবের দ্বৈতজ্ঞানই তাহার সর্ব্বদুঃখের কারণ। রাত্রি ও দিবস একই কারণের পরিণাম, উহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই, মূর্খেরা যেমন একথা বুঝে না, আমরাও সেইরূপ জন্মমৃত্যুকে একই অখণ্ড সত্যের দুইদিক বলিয়া না বুঝিয়া যতক্ষণ পৃথক্ মনে করি, ততক্ষণই আমাদের দুঃখ। সুতরাং ত্যাগে ও ভোগে, দুঃখে ও সুখে ইত্যাদি সর্ব্বাবস্থায় তুল্য আনন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে অদ্বৈতবুদ্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই অদ্বৈতবোধের কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে—প্রেমে। প্রেমেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়া যায়, অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হয়। বিষ্ঠা স্পর্শ করাও ঘৃণার বিষয়। কিন্তু সন্তানের মল মূত্র মাতার নিকটে চন্দনেরও অধিক বলিয়া মনে হয়। ইহার একমাত্র কারণ, মাতা সন্তানের প্রতি প্রেমময়ী। সুতরাং যে অখণ্ড আনন্দের ভিখারী আমরা, তাহা পাইতে হইলে আমাদিগকে প্রেমে মজিয়া অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। প্রহ্লাদ প্রণয়ীর জন্য অগ্নিকুণ্ডে, রসাতলে, সমুদ্রগর্ভে, হস্তি-পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি কোন অবস্থাতেই তাঁহার পূর্ণানন্দের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেব্যের জন্য সেবকের এই যে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন, ইহা প্রেমেরই ফল। এই প্রেম অন্তরে জাগিলে সমস্ত ভেদ ঘুচিয়া যায়, কর্ম্ম তখন সেবা হয়, "আমি" তখন "তুমি" হইয়া যায়। সুতরাং আমার আমিত্ব নাই যেখানে, সেখানে আমার বন্ধন মুক্তি, সুখ-দুঃখ, জন্মমৃত্যু, এসকল আসিবে কোথা হইতে? তখন "তুমি" যদি নরকে যাও, "আমার"ও তবে স্থান হইবে সেইখানে এবং "তোমার" সান্নিধ্যবশতঃ সেই স্থানই "আমার" স্বর্গ হইয়া উঠিবে। সুতরাং স্বর্গ ও নরক এই খণ্ডাতীত যে অখণ্ড-স্বর্গ, তখন কি আমার তাহাই পাওয়া

হইবে না ? এইরূপে, ঐকান্তিক প্রেমহেতু যখন অদ্বৈতজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই অদ্বৈতানন্দের অধিকারী হওয়া যায়। সুতরাং অখণ্ড আনন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে, সংসারের বাহিরে যাইতে হইবে না, জগদতীত তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে না, পাওয়া যাইবে তাহা এইখানেই—এই সুখ দুঃখময় মর্ত্ত্যলোকেই।

বিশালতা।

("নছরু")

জগতের দুঃখ-জ্বালা ব্যাধি যত আছে
আজি আমি দুই হাতে ঠেলে দিয়ে পিছে
অপার গৌরবে এক উত্তুঙ্গ শিখরে
অতুল বিভবে আমি আপন সম্পদে
দাঁড়া'য়েছি আসি'।
দিবানিশি—
পৃথিবীর নাটকের ঘরে—যত গ্লানি
যত কলুষতা—যত মলিনতা, র'য়েছে মলিন
করি'—কিছুই আমারে আজি পারেনি রাখিতে
ধরে। অপার আনন্দে আজ—অপার
বিস্ময়ে—সকলি উঠেছি আমি পদ-তলে পিশি'।
অপরূপ জ্যোতিঃ আজ হৃদয়-মাঝ
করিছে কিরণ তা'র সঘনে বিস্তার!
অনন্ত বারিধি সম ভীম গম্ভীরতা—বিরাজ
করিছে এক অতি বিশালতা,—সব
দৈন্য-দুঃখ-গ্লানি—সব সঙ্কীর্ণতা লাজে মরে
গেছে ;—অপরূপ কুতূহলে হৃদয়-প্রসূন সুগন্ধ

করিছে তা'র—সুষমা বিস্তার! দিকে দিকে
তাই ধীরে ধীরে ছড়া'য়ে পড়িছে এক স্নিগ্ধ মাদকতা!
কৈ কোথা?
অভাব—দৈন্য, কিছু নাহি আজি আর!
সবি আপনার
সম ভাতে নয়নে আমার।
কোল দিয়ে ধরি' বেড়ি' সবে—নিতে ইচ্ছা হয়
মম বুকের ভিতরে—সাগর-তরঙ্গ সম
হয় ইচ্ছা মোর! সবি চুরি' ভেঙ্গে যা'ক্
আমারি অন্তরে! আমাতে করুক সবে লীলা আলাপন!
আপনা মগন—
আমি সবে নিয়ে থাকি!

শ্রীহট্টের শিশু কবি।

(শ্রীসরোজকুমার সেন।)

প্রকৃত কবির লক্ষণ কি? শুধু শব্দের আড়ম্বর, ছন্দের ঝঙ্কার—অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য কবিতাকে প্রাণময়ী করিতে পারে না।—কবিতার ভাব-লক্ষণকে ফুটাইতে পারে না—ভাবের গভীরতাতেই কবিতার প্রাণের পরিচয়, সেই ভাব কোথা হইতে আসে? অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত শৈশব হইতেই কবিত্বের ধারা কবি-প্রাণে প্রবাহিত হইতে থাকে—অতি ধীরে, অতি গোপনে তারপর উহা যে কখন কবি-হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করিয়া অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া চলে, প্রবাহমানা স্রোতস্বিনীর মত তর তর বেগে, তাহা যিনি একমাত্র কবি তিনিই জানেন। অজানাকে, চির-রহস্যময়কে, অসীমকে আপন করিয়া

বুকের মাঝে মিলিয়া লওয়াতেই তাহার তৃপ্তি—প্রিয়তমকে বাঞ্ছিতকে পাইবার আশাতেই তাহার আনন্দ—তাই কবি বিহগের কাকলীতে, তটিনীর কলতানে অজানা অচেনা চির-বাঞ্ছিতের কলস্বর শুনিয়া দিবানিশি গানে বিভোর হইয়া থাকেন, প্রস্ফুটিত ফুলে প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আত্মহারা হন। বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আত্মসমাহিত ভাবে সত্য-সুন্দরের মাঝে আপনাকে লয় করা কবি জীবনের ঐকান্তিক কামনা,—একমাত্র সাধনা। প্রকৃতির প্রিয় দুলাল কবির সমস্তই স্বাভাবিক। তার প্রাণের গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

একজন শিশু-কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত। এই শিশু স্বভাব-কবি কিন্তু ফুল না ফুটিতেই অকালে ঝরিয়া গেল—সে পৃথিবীতে বেশী দিন থাকিতে পারিল না। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এত অল্প বয়সেই সে যেরূপ গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিত তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ কোন দিন তাহাকে কবিতা লিখিতে শিখায় নাই। নয় বৎসর বয়সে তার কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ। রবীন্দ্রনাথ জাপানে একটি বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়াছিলেন ....Poetic imagination is a shy bird. it builds its nest in seclution on away from the eyes of the multitude." অর্থাৎ কবিত্ব কল্পনা একটী লাজুক পাখীর মতন, উহা লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিতেই ভালবাসে। এই শিশুর সম্বন্ধে উক্ত কথাগুলি প্রযুজ্য সে লাজুক প্রকৃতির ছিল। সে কবিতা লিখিয়া কখনো কাহাকেও দেখাইত না। নির্জ্জন নদীতীরে তার কবিতা লিখিবার স্থান ছিল। কবিতা লিখিয়া সে সযত্নে লুকাইয়া রাখিত।

প্রাকিতিক সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা নামক গ্রামে এই শিশু কবির বাড়ী। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৩০শে কার্ত্তিক শিলং নগরে তাহার জন্ম হয়। তাহার নাম প্রশান্তকুমার দাস। প্রশান্ত কুমারের পিতা শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস মহাশয় সেই সময় শিলং সেক্রেটারিয়েটে কাজ করিতেন। ইহার কিছু দিন পরে শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস সুরমা উপত্যকার বিভাগীয় কমিশনারের পার্স’ন্যাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হইয়া শিল-

চরে চলিয়া আসেন। বরাক নদীর উপর শিলচর সহর অবস্থিত—এই নদীর তীরে নির্জ্জনে নিরালয়ে প্রশান্ত কবিতা লিখিত।

প্রথম হইতেই সত্যসুন্দরকে পাইবার আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। তার কয়েকটি কবিতায় সেইভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কবিতাগুলি প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, ভাষার ও ছন্দের আড়ম্বর নাই অথচ ভাবের ধারা ঝর্ ঝর্ ধারে চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

"ফাঁকি" নামক কবিতায় আমাদের শিশু-কবি বাঞ্ছিতকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

আমার, সকলি ব্যর্থ—
সকলি শক্ত,
কে মোরে দিতেছে ফাঁকি—
তোমারে কতই ডাকি
তুমি রও গো ঢাকি
কেবলি আড়ালে থাকি

আমার, বাঁধন শক্ত
হয় না মুক্ত
ওগো খুলে দাও,
খুলে দাও।

দয়াল বন্ধো
আমি যে অন্ধ
ওগো গুণের গন্ধ
দিয়া মন মাতাও
ওগো মন মাতাও!

বাজিবে বাজনা
বাজিবে সাহানা
ও কার রবে
মধুর বোলে;

তোমার পরাণ
মুগ্ধ তান;
এস গো মহান্
ডাকিব তোমারে কি বলে।

শিশু-কবির প্রাণের কি আকুল আবেগ, কি দুর্ণিবার পিপাসা! প্রতি ছত্রে ছত্রে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রসজ্ঞ ভাবুক মাত্রেই লক্ষ্য করিবেন বুঝিবেন।

তার "প্রার্থনা" কবিতাটী আরো সুন্দর ও মহান্ ভাবে পরিপূর্ণ—

বনের মাঝে কাঁটার গায়ে
　ফুটেছে কত ফুল—
　কাহার মহিমা,
ব্যক্ত করিয়া মুক্ত কণ্ঠে
　গাহে বুল্ বুল্।
কাহার সুষমা কাহার প্রতিমা
　বিশ্বে রাজে;
তোমার মূর্ত্তি মর্ত্ত্য জগতে
　মানব মাঝারে রাজে।

নিখিল বিশ্বে তোমার শিষ্যে
　পূজেগে তোমারে অনিবার-
তবুও তোমার চরণের ঘ্রাণ
　পাইনা একবার।
　পাপের সাগরে
নাহিক নৌকা নাহিক মাঝি
　আছি একা পড়ি!
তোলগো আমায় তীরের মাঝে
　আমার ক্ষুদ্র হস্ত ধরি!
ভাঙ্গিয়ে মোহ জাগায়ে জ্ঞান
　মুক্ত করগো আমারে—
ওগো,　আমি পাপের বন্দী পুণ্যের সন্ধি
　করিব পূজিব তোমারে।

আমি যে মূখ, আমার দুঃখ
ঘুচিবে কি নাথ ?
বাজিয়া উঠুক মহিমা তব
করি প্রণিপাত !

দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু সাধকের প্রার্থনা সার্থক হইল ! বিশ্ব নিয়ন্তা অচিরে পাপের সাগর হইতে তাহার ক্ষুদ্র হস্ত ধরিয়া তাহাকে আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। আর সে তাঁহার সহিত 'পুণ্যে'র সন্ধি স্থাপন করিয়া চির-বিশ্রাম লাভ করিল। ভাবের অভিব্যঞ্জনায়—অনুভূতির বিচিত্রতায় কবিতাটি যেরূপ সরস ও মধুর হইয়াছে, তাহাতে উহা শিশুর রচনা কি না এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু ভগবৎ প্রেরণায় যখন প্রাণ পরিপূর্ণ হয়, ভাব তখন আপনা হইতেই স্ফূর্তিলাভ করে—মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

১৩২০ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভা উপলক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতর্পণ করিয়া শিশু যে কবিতা রচনা করে তাহা অতীব মনোজ্ঞ; নিম্নে উক্ত কবিতার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম—

দয়ার সাগর সর্ব্বগুণাকর
কোথা তুমি আজ ;
করিতে শুশ্রূষা সকলের সেবা
ভুলি' নিজ কাজ।
দয়ার কথা মনেতে গাথা
যায়নি মানব ভুলে ;
তাইত বঙ্গে ভক্তেরা সবে
অযুত কণ্ঠ খুলে—
গাহে অবিরাম তব যশো গান
মাতায় সবার প্রাণ।"

ভাই বোনের প্রতি প্রশান্ত কুমারের অসীম স্নেহ—অগাধ ভালবাসা ছিল, তাহা নিম্ন লিখিত কবিতায় উজ্জ্বলতম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"ভাই বোনে দুটি ফুল ওগো দয়াময় !
আছে কত কৃতজ্ঞতা আছেগো প্রণয় ;
ফুটিয়া রয়েছি কাল যাইব ঝরিয়া—
একই বোঁটার ফুল যাব ছিন্ন হইয়া।"

আবার ভাই বোনের রাগ হইলে সে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে অভ্যস্ত ছিল—

"ময়না মনি, দুধের ফেনি
রাগ করেছে আজ,
রাগের ভরে চুলটি ধরে
খুলে' ফেলছে সাজ।
সাজ খুল্‌তে দেরী হ'ল,
ময়না মনি পাগল হ'ল !"

বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি অণুপরমাণুতে—ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক জিনিষে শিশু কবি "ঈশ্বরের মহিমার" অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা—তার হৃদয় এক অজানা পুলকে পুলকিত। তাই সে বলিতেছে—

"এমন রাজ্য তোমার ধরা,
যাহার বক্ষে আছি মোরা ;
এমন মাতা দিয়াছ তুমি
স্নেহে জীবন ভরা—
ওগো স্নেহে জীবন ভরা !"

আবার—কাহার দয়ায় নদনদী
বহে এমন নিরবধি,
হিরণ কিরণ ঝলসি ওঠে—
ঢেউয়ের শিরে শিরে।
(তারা) তোমার কথাই ব্যক্ত করে
যুক্ত অযুত করে।

ধন্য, ধন্য হে ভগবান্

এসব তোমার লীলা—

প্রভু, এসব তোমার লীলা !"

শুধু দেবতার এক নিষ্ঠ সাধক পূজারী'ই অন্তরতমের প্রতি এইরূপ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারেন

তার কবিতা গুলিতে শান্তরসের প্রভাবই অধিক লক্ষিত হয় কিন্তু এত অল্প বয়সেই সে হাস্য-রসের অবতারণা করিতে পটু ছিল—নিম্ন লিখিত কবিতাটী পড়িলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—

কান্তিহারা।

একযে ছিল দুষ্টছেলে সবাই ডাক্‌তো কান্তি,
লোক্‌কে করতো গালাগালি মনে নাইকো শান্তি ;
জলেতে সে নাব্‌লে পরে দেয় এক্‌শো ডুব—
একদিন তারে বেত মার্‌লে মজা হতো খুব !
গিরীনবাবু সঙ্গী তাহার সদাই করেন খেলা
বাড়ী আসেন খেলা সেরে যখন উঠে বেলা ;
নেমন্তন্ন খেতে গেলে খায় খুব ভাত—
রাস্তাতে সে যেতে যেতে হ'য়ে পড়ে কাত্ ;
একদিন পড়লো গাছে চড়ে কান্তি গিরীন হাবা,
পাড়ার লোক সব দেখ্‌তে আসে, কেঁদে বলে "ওমা বাবা।"

এই কবিতাটীতে শিশু-হৃদয়ের একটা গভীর বেদনা—গোপন অভিমান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহার মূলে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। তাহা এই :—"১৩২১ সনের গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রশান্তকুমার মাতার সহিত মাতুলালয় বানিয়াচোঙ্ যায়। একদিন বিকাল বেলা তাহার মামা কান্তি, সুরেন ও গিরীন বেড়াইতে বাহির হয় ; প্রশান্তও যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল ; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইল না ; ইহাতে তাহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল তাই সে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে উক্ত কবিতাটি লিখিল। প্রাণের গভীর বেদনা যে সময় সময় হাসির আকারে ফুটিয়া উঠে উক্ত কবিতা তাহার

নিদর্শন। এই কবিতায় পরকে ব্যঙ্গ করিবার ছলে সে যেন নিজের ভবিষ্যত বলিয়া দিল। উক্ত কবিতাটি লিখিবার দুই দিন পরে ২১শে জৈষ্ঠ তারিখে আমগাছ হইতে পড়িয়া তার হাত ভাঙ্গিয়া যায় এবং উক্ত ঘটনার ছয়দিন পরে ২৭শে জৈষ্ঠ তারিখে ধনুষ্টঙ্কার রোগে তার মৃত্যু হয়।

শিলচর হইতে মাতুলালয়ে আসিবার সময় প্রশান্তকুমার "বিদায়" নামক একটি কবিতা লিখিয়া ছাত্র ও শিক্ষকবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসে।

"ফুল ও ফলের বিবাদ" কবিতাটী অতি সুন্দর ও উপদেশ পূর্ণ—

একদিন বিবাদ বাধিল ফলে ফুলে
বহু দোষ দিল ফুল, সুরসাল ফলে।
ফুল কহে গন্ধ মম, নাহি গন্ধ তব—
গন্ধ নেয় ভালবাসে মোর নরে সব!
ফল গুলি কহে ভাই বড়াই না কর,
তুষ্ট হয়ে খেয়ে মোরে আছে যত নর;
তুমি ফুল, আমি ফল দুজনে সমান—
তবে কেন বৃথা ভাই কর এত মান।

প্রশান্তকুমারের জীবনের প্রধান ব্রত কি ছিল তাহা তার নিজের ভাষায়ই প্রকাশ পাইয়াছে—

"চাহি না নিজের সুখ
ঘুচাব পরের দুঃখ,
সাধিব আপনা দিয়ে—
পরের কল্যাণ।"

পীড়িতের মর্ম্মন্তুদ হাহাকারে তার কুসুমকোমল-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। দীন দরিদ্রকে দেখিয়া সে অশ্রুজল গোপন করিতে পারিত না। প্রায়ই সে অভাবগ্রস্ত ভিখারীদের জামা কাপড় ইত্যাদি প্রদান করিত। ১৩২০তে বাংলায় যখন বানিয়াচঙ্গ গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তখন সে উক্ত গ্রামবাসী-দিগকে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে। দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের বক্ষে ইহা

কতদূর মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচায়ক তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস সে সেই গ্রামেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাই সে মৃত্যুকালে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল আমি এই গ্রামের লোকেদের জন্য এত কষ্ট করিলাম আর এখানে আসিয়া আমার মৃত্যু হইল!

পিতামাতার প্রতি প্রশান্তকুমারের ভক্তি অচল অটল ছিল। সে তার পিতাকে এত ভালবাসিত যে, যদি কোন ভাল জিনিষ তাহাকে খাইতে দেওয়া হইত তবে সে উহা হইতে খানিকটা তাহার পিতার জন্য রাখিয়া, নিজে খাইত। মাতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রশান্ত যে কবিতা লিখিয়াছিল উহাই তাহার প্রগাঢ় পিতৃমাতৃভক্তির পরিচায়ক।

মা!

জীবনে কর্ত্তব্য সব,
সাধিয়া তনয় তব,
পারে যেন পুরাইতে
তব মন সাধ;
স্নেহময়ি, কর আশীর্ব্বাদ!"

"রাজত্ব সম্মানে"র চেয়ে "মনুষ্যত্ব"ই প্রশান্তকুমারের চির আকাঙ্ক্ষণীয়—

"অন্তরের এই আশা,
যদিও বা ক্ষুদ্র চাষা,
পাই যেন মনুষ্যত্ব
শ্রেষ্ঠ উপাদান।
চাহি না মাণিক মণি,
চাই নাকো হ'তে ধনী,
চাই না এ পৃথিবীর
রাজত্ব সম্মান।"

কবি বিশ্ব-হিতৈষী—বিশ্বকে ছাড়িয়া তার নিজের কোন অস্তিত্ব নাই। সমগ্র বিশ্বের সহিত তিনি নিজেকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। নিখিল-মানব সে তাহার আপনার। বিশাল বিশ্বে একমাত্র ভগবানের

সত্বা'কে উপলব্ধি করিয়া—প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের শিশু-কবি ললিত-মধুর-কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

"জীবন সংগ্রামে নিত্য,
বিজয়ী হউক চিত্ত,
নিরখিয়ে বিশ্ব-ভরা
এক ভগবান্ ;
প্রভু হে ! তুলিয়া ধর,
অধমে আশীষ কর,
(যেন) বিশ্বের হিতের তরে
দিতে পারি প্রাণ !"

শৈশবেই তার শিশু চিত্ত বিশ্ব হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

প্রশান্তের মৃত্যুর পর শিলচরের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "সুরমা"য় তার একটী নাতিদীর্ঘ জীবনী প্রকাশিত হয়। তারপর ময়মনসিংহের শিশু-পত্রিকা 'সন্তোষে' তার আর একটী ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয়। 'সন্তোষ' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—'প্রশান্তকুমারের মৃত্যুর কথা শুনিয়া চা বাগানের কুলীরা পর্য্যন্ত কাঁদিয়াছে। এতদূরে থাকিয়া আমরাও চক্ষের জলে ভিজিয়াছি। ভাই প্রশান্ত ! এ যাত্রা তোমার সাধ মিটাইতে পারিলে না। আকজ্ক্ষা রাখিয়া চলিয়া গেলে। তোমার যশঃসৌরভ দেশ পুলকিত করিতে পারিল না ! তুমি সুগন্ধিযুক্ত সুন্দর ফুলটী অকালেই ঝরিয়া পড়িলে। আমরা তোমার ন্যায় প্রীতিভাজন কনিষ্ঠ ভাইকে হারাইলাম ইহাই আমাদের চক্ষুজলের একমাত্র কারণ।

সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক "বাঙ্গালী" লিখিয়াছিলেন—এই বালক সহজ কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই দ্বাদশ বর্ষই তাহার সে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি বিকশিত হইয়াছিল তাহা অনুধাবন করিলে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। এহেন শিশু-কবির অকাল মৃত্যু শোচনীয়। এই স্বল্প বয়সে, স্বল্প বিদ্যায় সে সরল ও সহজ ভাবুকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ প্রশান্তকুমার শিশু হইলেও শ্রীহট্টবাসীর গৌরবস্থল। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে "শিশু-কবি" আখ্যা দিয়া তাহার

নামোল্লেখ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কবি সত্যের উপাসক—সুন্দরের সাধক। এই সত্য ও সুন্দরের অভিব্যক্তি প্রশান্তকুমারের জীবনে ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছিল। তুরীয়ের সাধনায়—অজানার সন্ধানে তার সমস্ত অন্তর-বাহির মগ্ন থাকিত। তার প্রবৃত্তি যদিও চঞ্চল ছিল তবুও তার চরিত্র মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইত। মনুষ্যত্ব ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান—মূল ভিত্তি। উহারই উপর সে তাহার জীবন গড়িয়া তুলিতেছিল কিন্তু তার সাধনা পূর্ণ হইতে না হইতেই সে অকালে চলিয়া গেল!

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

১। ব্রহ্মর্ষির উপদেশমালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে ব্রহ্মর্ষি অসীমানন্দ নামক জনৈক মহাত্মার সকল গৃহস্থের উপযোগী উপদেশ আছে এবং পরিশিষ্টে অনেকগুলি ভগবৎ সম্বন্ধীয় লেখকের রচিত গান নিবদ্ধ আছে।

২। [illegible]—শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত। মূল্য তিন আনা। সমাজ সম্বন্ধীয় বিদ্রূপাত্মক নানা কবিতা। রচয়িতা 'আধুনিক' লেখকদের তরফ হইতে বলিতেছেন, "আমার ছন্দ বন্দ নিয়ে মিছে দ্বন্দ্ব করো না। আমি যা বলি তাই ভাষা, আমি যা লিখি তাই খাসা।" উচ্চ জাতিদের তরফ হইতে বলিতেছেন, "যদি ভজ যীশু খ্রীষ্ট, (তখন) আমরা হইয়ে তুষ্ট, বসিতে আসন দিতে পেলে, ভাবি বড়ই শুভাদৃষ্ট, কিন্তু হিন্দু থাকিতে বড়ই ঘৃণা, ছুলেই জাতিটা মাল্লি।" "এখনকার এ ছোকরাগুলো আগেই বলে কেন হলো? কি এক রোগ হয়েছে এদের

তর্ক ছাড়া বুঝ্‌বে না।" "কোথাকার এক নরেন দত্ত, বুদ্ধি দেখ তার ম্লেচ্ছ দেশে যেয়ে কল্লে বেদের প্রচার।" "দেখ দেখি হিন্দুর কি আর, সমুদ্র পার হতে আছে, খৃষ্টানদের জাহাজে চড়ে, এতেও কি আর জাত বাঁচে?" ইত্যাদি, ইত্যাদি। পাঠক পাঠিকা এই পুস্তিকাখানি পড়িয়া যথার্থই আনন্দ পাইবেন। প্রকাশক—শ্রীবিজয়চন্দ্র ধর।

পোঃ বেড়াবুচিনা, টাঙ্গাইল।

সংবাদ ও মন্তব্য

১। শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ বিগত ১৯শে এপ্রিল স্বামী প্রভবানন্দ ও স্বামী রাঘবানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি Pacific হইয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে Atlantic হইয়া ফিরিতেছেন। স্বামী রাঘবানন্দ শ্রীমৎ স্বামী [illegible] পরিচালিত New York কেন্দ্রে থাকিবেন, স্বামী প্রভবানন্দ তাঁহার সহিত San Fanciscoতে যাইবেন।

২। বিগত ১লা এপ্রিল জয়নগর-মজিলপুর [illegible] কুটিরের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী ধর্ম্মানন্দ, রামেশ্বরানন্দ, বিজয়ানন্দ ও বাসুদেবানন্দ সেখানে গমন করেন। স্বামী ধর্ম্মানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ ও বিজয়ানন্দ বক্তৃতা করিলে স্থানীয় অপরাপর ভদ্রমহোদয়গণ ঐ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে মতামত প্রদান ও সাহায্যদানে স্বীকৃত হন।

৩। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ বহু সাধু সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী জয়রামবাটী গমন করিয়াছিলেন। বিগত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ঐ গ্রামে জগন্মাতা সারদাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠোপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার্চ্চনাদি ও

প্রায় সাত হাজার ভক্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হন। কলিকাতা হইতে বহুভক্ত ঐ উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। উহার নিকটস্থ গ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থান কামারপুকুরেও তিনি গমন করেন; তাহার পর তিনি বাঁকুড়ায় যাইয়া, বিগত পূর্ণিমার দিন (১৭ই বৈশাখ) তত্রস্থ মঠের শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়াছেন।

৪। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বেলিয়াটী গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী আমরা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। সেখানকার সেবকেরা ঔষধ পথ্য দান, শাস্ত্রালোচনা ও দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ঐ গ্রামে দুইটী বালিকা বিদ্যালয় তাঁহাদের যত্নে পরিচালিত হইতেছে এবং বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে নিকটস্থ কৃষক-বালকগণকে অধ্যয়ন করান ও শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। বহু মুসলমান বালকও এখানে অধ্যয়ন করে।

৫। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ৺ভুবনেশ্বর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

৬। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এক্ষণে কলিকাতা নগরীস্থ রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন।

৭। শীঘ্রই বোম্বাই অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটী কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। অদ্যাবধি ঐ অঞ্চলে মিশনের কোনও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ত্যাগ ও ভোগ।*

(শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী বি, এ)

দুইটী পাখী নীড় বেঁধেছে
একটী গাছে।
একটী থাকে নীচের ডালে,
অন্যটী ঠিক মাথায় আছে।
মাথার পাখী নীচে কভু
চায় না ফিরে,
শান্ত সদা চেয়ে আছে
আকাশ 'পরে;
খায়না সে ফল, গায় না গাথা,
ছুটে না সে হেথা হোথা,
অনন্ত তার মাথার 'পরে
ঘুমিয়ে আছে।
দুইটী পাখী নীড় বেঁধেছে
একটী গাছে।
নীচের পাখী ডালে ডালে
উড়ে বেড়ায়,
তিক্ত-মধুর কত না সে
আধার কুড়ায়;

* মুণ্ডকোপানিষৎ, ৩।১ মন্ত্র অবলম্বনে।

শান্তি সে তো পায়না কভু,
করে সদা আঁকু পাঁকু,
মাঝে মাঝে যেতে চায় সে
ওরি কাছে।
দুইটী পাখী নীড় বেঁধেছে
একটী গাছে।

হিন্দুত্বের ভিত্তি।

২। পথের বৈশিষ্ট্য

(শ্রীসত্যবালা দেবী)

আমাদের মন ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনার দ্বারা যে ছায়াবাজি দিনরাত চোখের সম্মুখে ঘুরাইতেছে ফিরাইতেছে তাহা ভূতগত সৃষ্টি। দূরবীক্ষণে চন্দ্র দেখিতেছি, নক্ষত্র দেখিতেছি, যুক্তি তর্কের সূক্ষ্মতায় পর্য্যবসিত জটিল গণিতের সমস্যা সমাধান প্রয়োগে সূর্য্যের ভার, শনৈশ্চরের দূরত্ব অবধারণ করিতেছি—সমস্তই এই মনের দ্বারা, কিন্তু, এই মনের উপর আমাদের কোনও প্রভাব নাই; ইহার কোথায় উৎপত্তি কিরূপ প্রকৃতি কতদিনে লয় সম্যক জানি না। সুতরাং আমাদের বিদ্যা আমাদের আবিষ্কার সমস্তই থাকিয়া থাকিয়া ভূতের ব্যাগার বলিয়া মনে হয়। যেন অবিশ্বাস আসে এই বিজ্ঞান, এই শিল্প বানিজ্য, রাজনীতি বর্ত্তমানের সুকঠোর জাগতিক বিধির কাছে দাসত্ব মাত্র। সে মানুষ যদি সত্য হয়, মৃত্যুতে যাহার লয় নাই, মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ যাহার উন্নতির চরম নহে, তবে, এই অবিশ্বাস ও দাসত্বের গ্লানিকে তুচ্ছতায় একেবারে ঢাকিয়া দেওয়া যায় কই?

এই পুস্তকখানিকে চক্ষের সম্মুখে ধরিলাম, দৃশ্যমান চর্ম্মচক্ষু একটা

জানাকে ভিতরে যাইতে দিন, সেখানে আরও এক প্রকারের জানা ছিল—এই জানার তাহার সহিত যেন কোলাকুলি হইল। উভয়ের এই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আর একটা জানা ঘটিয়া উঠিল। এমনি করিয়া জানার তিনটী স্তরের মধ্য দিয়া একটা কিছু দাঁড়াইয়া গেলে—আমি পুস্তকখানিকে দেখিলাম। ইংরাজিতে বলিতে হইলে বলিতাম—My eye received the image expressed on it, carried it in to my brain as percept. The name of which is conceived or sensed into word there. Then an understanding is formed —I see the book."

আমাদের অন্তর্জ্জগত একটী ভাণ্ডার বিশেষ, জগতের শিক্ষায় দিনে দিনে সেই ভাণ্ডার বস্তু রাজিতে আরও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বহির্জ্জগতের বস্তুর সহিত অন্তর্জ্জগতের বস্তুর সাক্ষাৎকার ঘটিয়া ঐ উপরোক্ত প্রণালীতে যে understanding দাঁড়ায় তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া থাকি। জগৎ ব্যাপারে তাহাই জ্ঞান বটে, কিন্তু, অধ্যাত্মজ্ঞানের এই প্রণালীর উপর সাক্ষাৎকার লাভ মিলিবে না। অধ্যাত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র। যিনি যোগসাধ্য তাঁহার কাছে চক্ষু কর্ণ বাক্য মন কেহই যায় না। এই জগৎ ব্যাপারের জ্ঞানযন্ত্র লইয়া আমরা তাঁহাকে জানিতেই পারি না। এমন কি, কি ভাবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। ইহাই উপনিষদে পাঠ করিয়াছি।

মনই সেই প্রশস্ত রাজপথ যাহার উপর দিয়া বস্তুরাজি বহির্জ্জগত হইতে অন্তর্জ্জগতে এবং অন্তর্জ্জগত হইতে বহির্জ্জগতে যাতায়াত করিতেছি। এই জন্যই আমাদের যত কিছু understanding সমস্তই আমরা বলি মনের দ্বারা ঘটে। মনই যেন ভূতগত সৃষ্টির আধার পীঠ। যে সৃষ্টি ঈশ্বরের আসন তাহা এই ভূতগত সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা, —"বুদ্ধি গ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্।"

সাধারণতঃ আমরা পশু বুদ্ধিতেই আবদ্ধ হইয়া আছি অর্থাৎ পশু মন মনের উপরের স্তরে উঠিতে জানে না; যাহা মূর্ত্তি বর্ণ স্বাদ গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবার নয় তাহা তাদের পক্ষে

না থাকারই সামিল, তেমনি আমাদেরও সাধারণতঃ জ্ঞান বস্তুর অধীন অর্থাৎ আমরা বস্তু তান্ত্রিক, যাহার বস্তুত্ব নাই তাহাকে আমরা বুঝিতে পারি না, অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকি।

মন এই বস্তু রাজিকে প্রকাশিত করিতে পারে মাত্র কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা আমরা বস্তুরাজিকে চালনা করিতে পারি, যেন বস্তুর প্রাণস্বরূপ কিছুকে বুদ্ধি ধরিবার চেষ্টা করে। অবাস্তব এমন কিছু আছে যাহার বেগে বস্তুরাজি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, বুদ্ধি তাহাকেই পাইবার চেষ্টা করে। তাহাকে পাইয়া তাহার বলেই বুদ্ধিবল বস্তুরাজিকে পরিচালিত করিতেছে। জড় জগতের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। সকল জগতের কর্ত্তা ঈশ্বরকে পাইবার যে পথ সে পথ "বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্"। আবার এই খানে সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথা স্মরণ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন যে ঈশ্বরকে পাইবার পথ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্, কিন্তু বুদ্ধিই সেই পথ নহে। অতীন্দ্রিয়ম্ অর্থে ইন্দ্রিয়ের অতীত; ইন্দ্রিয় মনেরই অধীন কতকগুলি যন্ত্র মাত্র সুতরাং মনের অতীত। আর আমার বুদ্ধির সাহায্যে আমি সেই পথকে পাইতে পারি তাই বলিয়া আমার বুদ্ধি সেই পথ হইয়া দাঁড়ায় না।

বুদ্ধি যে অবাস্তবের প্রভাবে বস্তুরাজি পরিচালিত করিতে পারে জড় জগতের উপর কর্তৃত্ব করে সেই অবাস্তব প্রত্যেক বস্তুরই অন্তর্নিহিত। আমরা তাহাকে শক্তি বলিতে পারি। বুদ্ধিবল প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে দেখিতে পায়। সে শক্তি আবার যে শক্তির নিয়মে চলে তাহাকেও দেখিতে পায়। এই রূপে সে শক্তিকে নাড়িয়া চাড়িয়া জগতকে পরিচালনা করিতে পারে। সে নিজে শক্তি নহে।

শক্তির ভাণ্ডারের চাবিকাটি ঈশ্বরের হাতে। জগতের অনন্ত শক্তি তাঁহারই আয়ত্তাধীন তাই তিনি অনন্ত শক্তিমান।

বুদ্ধি হইতে শক্তি শক্তি হইতে ঈশ্বর,—ইহাও একটা ক্রম বটে।

যাহা হউক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হইয়াছে যে UNDERSTANDING বা সাধ্যজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর লাভ কখনই হইতে পারে না। যে সভ্যতায় জ্ঞানের সোপানে ইহার উপরকার ধাপ নাই সে সভ্যতার

দ্বারা যাহাই মিলুক ঈশ্বর মিলিবে না। যে সভ্যতার লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ সে সভ্যতায় জ্ঞানের আলাদা মাপকাঠি আছে।

৩। আমাদের মাপকাঠি।

শিক্ষিত হইয়া সমাজে যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের জ্ঞান বস্তুতঃ কি? কতকগুলি উচ্চ চিন্তা মাত্র! সে গুলিকে তাঁহারা স্মৃতির মধ্যে রাখিয়াছেন, তর্কস্থলে প্রয়োজন হইলেই বাহির করিতে পারেন। আর এক শ্রেণীর জ্ঞানীও দেখিয়াছি তাহারা তর্কস্থলে আদৌ দাঁড়াইতে পারে না কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে এমন কি আছে যাহা শত শত তার্কিকের মধ্যে নাই। তার্কিকে যে সমস্ত বিষয় বুঝাইতে গিয়া বরং গোলমাল করিয়া দেয়, তাহারা অল্প কথায় অতি শান্ত ভাবে সে সমস্ত ধাঁধা পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে! এই সমস্ত জ্ঞানী শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানী নহে সাধনার দ্বারা জ্ঞানী। উচ্চ চিন্তাগুলিকে শিখিলে চলিবে না উহাদের দস্তুর মত সাধনা করিতে হইবে, কারণ, চিন্তা তো জ্ঞান নহে, ওগুলি জ্ঞানের আভাষ UNEXPRESSED অবস্থা। উহাদের ধরিয়া টানা টানি করিতে থাকিলে অবশেষে জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়

মাতাল বেহুঁষ হইয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, সে দেখিল গ্যাস পোষ্টগুলি পথের মাঝে মধ্যখানে সারি দিয়া পোঁতা, ব্যাচারী তাই সেগুলিকে পাস কাটাইয়া চলিতে যাইবে অমনি ঘাড় মুখ গুঁজড়িয়া খানার মধ্যে পতিত হইল। তাহার জ্ঞান ছিল না বলিয়াই সে ঐ রূপ দেখিল; নেশা ছুটিলে জ্ঞান আসায় তখন আর সে ঐ রূপ দেখিল না সেই গ্যাস পোষ্টকেই রাস্তার ঠিক স্থানে দেখিল এবং সোজা রাস্তা দিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। ছেলেবেলায় আমাকে খোঁড়া বলিলে আমি লাঠি হাতে তাহাকে মারিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতাম এখন সেরূপ করি না এখন আমার জ্ঞান হইয়াছে। এ সকল ক্ষেত্রে জ্ঞান একটা অবস্থা। উচ্চ চিন্তা দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান লাভ সম্ভব তাহা এইরূপ সাধারণ জীবন যাত্রা হইতে উন্নত একটা অবস্থা। কোনওরূপ কেতাবি ব্যাপার নহে।

এই জ্ঞানই আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির মাপ কাটি। জ্ঞানের দ্বারা আমরা ঈশ্বর কি? সে সন্ধান পাইয়া থাকি। যোগসাধ্য ঈশ্বরের সহিত

কাহার কতটা যোগ হইয়াছে তাহাও এই জ্ঞানের তারতম্যেই বোধগম্য হইয়া থাকে। ঠাকুর বলিতেন "মানুষ না মান—হুঁষ" অর্থাৎ যাহার মধ্যে যতটা হুঁষ জাগিয়াছে সেই ততটা মনুষ্য পদবাচ্য।

এই হুঁষ এবং ইহার বিপরীত বেহুঁশ অবস্থাটাই বা কি? কি যে তাহা আমাদের সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে পূজায় পর্ব্বে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করা হইয়াছে। আশাছিল তাহার অভ্যাসে জাতির প্রত্যেক ব্যষ্টিই মান—হুঁষ হইয়া উঠিবে। সময় এখনও যায় নাই, হয়ত —কে বলিতে পারে, কালে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যাহা হউক আমরা সকলেই জানি, এমন কোনও ঘটনা হইতে এই হুঁষ ও বেহুঁষ অবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

সুরথ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজশক্তি বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গ ও দুষ্টস্বভাব আত্মীয়গণের দ্বারা অন্তঃসার শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বাহিরেও কোলা বিধ্বংশকারী বহু ভূপালবর্গ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। তাহারা সুরথ অপেক্ষা অনেকাংশে হীন হইলেও তাহাদের হস্তে সুরথের পরাজয় ঘটিল। অনন্তর পরাজিত সুরথরাজ স্বপুরে আগমন করিয়া নিজ-দেশেরই অধিপতি হইয়া রহিলেন। কিন্তু তৎকালেও সেই প্রবল শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে। সেই আক্রান্ত অবস্থায় যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার অমাত্য ও আত্মীয়গণ সৈন্য ধনাগার প্রভৃতি হস্তগত করিয়া সেই বৈদেশিক আক্রমণ তাঁহাকে হৃতাধিকার করিবার সুযোগরূপে অবলম্বন করিতে চায় তখন তিনি আপনার বিপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ একটা অশ্বারোহণে পলায়ন পূর্ব্বক গহন বনে গমন করিলেন। রাজা সেই গহন বনমধ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধসমুনির আশ্রম দেখিলেন। মুনি কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া রাজা সুরথ সেই আশ্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করতঃ কিছুকাল অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে সেখানে রাজা সুরথ মায়া মূঢ়চিত্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমার পূর্ব্বপুরুষগণের পালিত, অসচ্চরিত্র সেই আমার ভৃত্যবর্গ

এক্ষণে সেই মৎপরিত্যক্ত পুরী ধর্ম্মের সহিত কি পালন করিতেছে? জানিনা, সদামদযুক্ত, আমার সেই প্রধান শূরহস্তী, শত্রুগণের বশ্য হইয়া এক্ষণে কি প্রকার ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে? প্রতিদিবস মৎপ্রদত্ত, প্রসাদ, ধন ও অন্নাদি দ্বারা আমার অনুগত ভৃত্যবর্গ, অদ্য নিশ্চয়ই অন্যরাজগণের উপসনা করিতেছে। অনিয়মিত রূপে সর্ব্বদা ব্যয়কারী সেই দুষ্ট অমাত্যগণ অতিদুঃখে সঞ্চিত আমার সেই ধনরাশি নিশ্চয়ই ক্ষয় করিতেছে। রাজা এই প্রকার ও অন্যান্য নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুরথরাজা, সেই মুনির আশ্রম নিকটে এক বৈশ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি এবং এখানে আসিবার কারণই বা কি? শোকযুক্তের ন্যায় তোমাকে কেন দুর্ম্মনা দেখিতেছি? রাজার এই প্রকার প্রণয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত বৈশ্য রাজাকে প্রত্যুত্তর করিল। বৈশ্য বলিল "আমি ধনীদিগের কুলে উৎপন্ন সমাধি নামা বৈশ্য। অসাধু পুত্র-দারা ও স্বজনবর্গ, ধনলোভে আমাকে দূর করিয়াছে। পুত্রদারা ও বন্ধুবর্গ আমার ধন সকল গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে এ স্থলে আমার পুত্র দারা ও বন্ধুবর্গের কোনও মঙ্গলামঙ্গল বার্ত্তা জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তাহাদের গৃহে মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে, আমার পুত্রগণ এক্ষণে সদাচারী কিংবা দুরাচারপরায়ন হইয়াছে এই সকল কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

এই প্রকারে পরস্পর পরিচয় হইলে উভয়েই বিস্মিত ভাবে কারণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন যে এই চিত্ত বৈলক্ষণ্যের কারণ কি? সেই দুর্বৃত্তগণের উপর, সেই প্রীতিশূন্য পুত্রাদির উপর মন নিষ্ঠুর হইতেছে না, ইহার কি প্রতিবিধান করা যায়? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উভয়ে মেধস্‌মুনির নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রশ্ন করিলেন—

আমি এবং এই বৈশ্য উভয়েই জ্ঞানী, রাজ্য ধনাদি বিষয় এবং বিষয় লুব্ধ আত্মীয়গণ সমস্তই যে দোষে পরিপূর্ণ তাহা বুঝিতেছি তথাপি

এইরূপে বিবেক অজ্ঞের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হইতেছে ইহার কারণ কি?

মুনি তখন সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন।

ঋষি কহিলেন—সমস্ত জন্তুরই বিষয়গোচর জ্ঞান আছে। হে মহাভাগ, বিষয় সমুদয় এবং বিষয় জ্ঞান সম্পাদক ইন্দ্রিয়গণও পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব। কোন কোন প্রাণী দিবসে দেখিতে পায় না, কেহ কেহ বা রাত্রিতে দেখিতে পায় না, আবার কেহ দিবারাত্র তুল্য দৃষ্টি। আপনি যে প্রকার জ্ঞানের কথা কহিতেছেন এ প্রকার জ্ঞানের অধিকারী কেবল মনুষ্য মাত্রই নয়, যেহেতু পশুপক্ষী এবং মৃগাদিও এ প্রকার জ্ঞানবান। বিষয় গোচর জ্ঞান যে প্রকার পশু পক্ষী প্রভৃতির আছে মনুষ্যেরও সেই প্রকার আছে এবং মনুষ্যগণেরও বিষয় গোচর যে জ্ঞান পশুপক্ষীদিগেরও তাহাই আছে। সুতরাং এ প্রকার জ্ঞান মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদিগের সমান। এ প্রকার জ্ঞান থাকিলেও পরস্পরে বিষয়ের কত বিভিন্নতা দেখুন; এই পক্ষিগণ ক্ষুধাতে পীড়িত তথাপি স্বকীয় শাবকগণের চঞ্চুতে ধান্যকণাদি প্রদান করিতে কতই আদরযুক্ত? আর হে মনুজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ নিজ সুতগণের প্রতি অভিলাষী হইয়া তাহাদিগের ভরণপোষণ করিতেছে। আবার মানুষে প্রত্যুপকারের লোভেই যে এইরূপ করিতেছে তাহাও কি দেখিতে পাইতেছ না? উপকারাদির প্রত্যাশা না থাকিলেও মহামায়ার সংসার স্থিতিকারী প্রভাবে সর্ব্ব প্রাণী বাসনারূপ আবর্ত্তময় মোহগর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। সেই জন্য এই বিষয়ে বিস্ময় করা উচিত নহে।

রাজা এবং বৈশ্য উভয়েরই আপনাপন মধ্যে দুইটী বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব অনুভব করিতেছিলেন ও তাহাদেরই একটীকে জ্ঞান ও অপরটীকে অজ্ঞান বোধে কোন্‌টীকে প্রাধান্য দিয়া এই দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি সাধন করা যায় সেই বিষয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুনি তাহাদিগকে দেখাইলেন, যে দুইটী ভাব তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব করিতেছে দুইটীই মহামায়ার প্রভাব অর্থাৎ অজ্ঞান। জ্ঞান তাহাই যাহা ঐ দুই যুগপৎ ভাবেরই সাক্ষী। তাঁহার কথা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি—

১। এক প্রকার হুঁযের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণী

আপনাদের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতেছে, দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে।

২। এক প্রকার হুঁষের বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই দয়া মায়া মমতা প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে।

৩। এক প্রকার হুঁষের বশবর্ত্তী হইয়া অমন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের যে খেলা চলিতেছে তাহা জানিতে পারি; সেই হুঁষই প্রকৃতপক্ষে হুঁষ। তাহার মধ্যেই জ্ঞানের স্থান থাকিতে পারে। ইহার উপরে আরও কথা আছে। মেধস্ মুনি আরও বলিলেন—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা
বলাদকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

সেই ভগবতী মহামায়াই জ্ঞানিগণের চিত্ত সকল আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করিতেছেন। এইরূপে অজ্ঞানই যাহার স্বরূপ তাহাই আমরা জ্ঞানরূপে অবলম্বন করিয়া এই জীবনের উপর দাঁড়াইয়া আছি আর চিরকাল তাহাই থাকিতে হইবে। কারণ সেই দেবী এই স-চরাচর জগৎ সৃজন করিয়াছেন।

এই প্রকারে এই সমস্ত বিষয় ঠিক যে ভাবে আমরা বিজ্ঞান বুঝি রাজনীতি বুঝি সে ভাবে বুঝা যায় না। এসকল কেবল অনুভূতির গভীর স্তরের গূঢ় সঙ্কেত বলিতে পারা যায়, ইহার অধিক অপর কোনও নামেই অভিহিত করা যায় না।

তারপর এইবারে শেষ কথা,—মনের অধীন যে জ্ঞান সে অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় তাহা নহে। কথা এই যে মনের মধ্যে আর একটী মানুষের অস্তিত্ব দেখিতেছি তাঁহার জ্ঞানের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে সেই মানুষ যদি আমরা হই তবে তাঁহার সেই স্বতন্ত্রক্ষেত্রে আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

নং ১৮

(ইংরাজীর অনুবাদ)

C/o ই, টি,ষ্টার্ডি,
হাইভিউ, কেভারসাম,
রেডিং, ইংলণ্ড।
২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ব্রহ্মবাদিনের দুটী সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ করে চল। কাগজের কভারটা একটু ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার কর্‌বার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও। মিঃ ষ্টার্ডি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখ্‌বেন। আমি তোমাকে কয়েকখানা কাগজও পাঠাচ্ছি—তার মধ্যে দুখানা যথাক্রমে ধর্ম্মমহাসভা ও মিশনরিগণ সম্বন্ধে। কাগজখানা ইংলিশ চার্চ্চের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র—আমার অনুমান—সম্পাদকপত্নী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন—কারণ, তাঁর বৈঠকখানায় আমি শীঘ্র বক্তৃতা দিব। সম্পাদকের নাম মিঃ হাউইস—তিনি ইংলিশ চার্চ্চের একজন বিখ্যাত পুরোহিত।

ইতিমধ্যেই এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে আর ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাগজের মন্তব্য পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে, লোকে উহা কেমন ভালভাবে নিয়েছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম। আগামী মঙ্গলবার থেকে আমি লণ্ডনে গিয়ে তথায় ৮০, ওক্‌লিষ্ট্রীট, বেল্‌সী, লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম ঠিকানায় একমাস থাক্‌বো। তারপর আমি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী গ্রীষ্মে এখানে

আস্‌বো। এপর্য্যন্ত দেখ্‌ছো, ইংলণ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতে মিঃ ষ্টার্ডি—আমার এক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা যিনি শীঘ্রই এখানে আস্‌ছেন—তাঁর সঙ্গে মিলে ক্লাসগুলি চালাবেন। সাহস অবলম্বন কর ও কাজ করে যাও। ধৈর্য্য ও দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়া—ইহাই একমাত্র উপায়। আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে তোমাদের যে টাকা পাঠিয়েছি, তা সম্ভবতঃ নিরাপদে পৌঁছেচে। উহার প্রাপ্তিস্বীকার আমেরিকায় কর্‌বে, কারণ, এই পত্র তোমাদের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি আমেরিকায় ফির্‌বো। তোমাদের অবশ্য আমার ১৯নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা—এই ঠিকানাটা স্মরণ আছে। তোমরা অবশ্য কেভারসাম ইত্যাদি ঠিকানায় মিঃ ষ্টার্ডিকে পত্র লিখ্‌বে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহার কর্‌বে। মান্দ্রাজের সঙ্গে পত্র ব্যবহারের প্রতিনিধি হবে তুমি, কল্‌কেতায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আমেরিকায় মিস মেরি ফিলিপ্‌স্‌ ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক,—এইরূপ চল্‌তে থাকুক। এখন কাগজটার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। এটা যাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়, তার চেষ্টা কর। মিঃ ষ্টার্ডি সময়ে সময়ে উহাতে লিখ্‌বেন—আমিও লিখ্‌বো। এখন আমি আর টাকা পাঠাতে পার্‌বো না—ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিয়ে পয়সা পাওয়া যায় না—সুতরাং আমাকে এখানে সব টাকা খরচ করতে হয়েছিল, এক পয়সাও লাভ হয় নি। ক্রমে ক্রমে এখানে এমন বন্ধু পাব, যারা সাময়িক পত্র প্রভৃতির জন্য টাকা খরচ কর্‌বে। কাজ করে চল—ধৈর্য্য, পবিত্রতা, সাহস ও দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়া—এই কটী বিষয় মনে রেখো। আমার সঙ্গে লণ্ডনে কে, মেননের কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এখন কাগজ-খানাকে দাঁড় করাবার জন্য সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি অকপট ও পবিত্র থাক্‌বে ততদিন পর্য্যন্ত কখনও অকৃতকার্য্য হবে না—মা তোমায় ত্যাগ করবেন না, তোমার উপর তাঁর সর্ব্বপ্রকার শুভাশীষ বর্ষিত হবে।

ইতি

তোমার বিবেকানন্দ।

নং ১৯

(ইংরাজীর অনুবাদ)

লণ্ডন।

৮ই নবেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

'ব্রহ্মবাদিন্' সম্বন্ধে আমি গোটা কতক মন্তব্য দিতে চাই। আমি ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছি যে, আমেরিকায় উহার অনেকগুলি গ্রাহক হয়েছে! ইংলণ্ডেও কতকগুলি গ্রাহক যোগাড় করে দেবো। ইংলণ্ডে আমার কার্য্য বাস্তবিক খুব চমৎকার হয়েছে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ইংরাজেরা খবরের কাগজে বেশী বকে না, কিন্তু তারা নীরবে কাজ করে। নিশ্চিত বল্‌ছি, আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে অনেক বেশী কাজ হবে। সভাস্থলে দলে দলে লোক আস্‌তে থাকে, কিন্তু এত লোকের ত আমার জায়গা নেই। সুতরাং বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলাও আর আর সকলেই মেজের উপর আসনপীড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা কর্‌তে বলি যে,তারা যেন ভারতের আকাশ তলে শাখাপ্রশাখা সমন্বিত বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে আর তারা এই ভাবটা পছন্দ করে। অবশ্য আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে যেতে হবে—এরা ভারি দুঃখিত। কেউ কেউ ভাব্‌ছে, আমি যদি এত শীঘ্র চলে যাই, আমার এখানকার কাজের কিছু ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি লোকের উপর বা কোন জিনিষের উপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভুর উপরই আমার নির্ভর এবং তিনি আমার ভিতর দিয়ে কাজ কর্‌ছেন।

ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ, উহার লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে—একটু যাতে স্বচ্ছ, প্রসাদগুণসম্পন্ন ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ান হয়েছে, পরের সংখ্যাটায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যাটায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকেই খুসী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত তোমাদের নিজে-

দের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাক আর এখন যেরূপ বাধাই আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে। আরও কতকগুলো বিজ্ঞাপন জোগাড়ের চেষ্টা কর—বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে। আমি 'ভক্তি' সম্বন্ধে খুব একটা বড় লেখা তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, কিন্তু এটী মনে রেখো যে, বাঙ্গালীরা যেমন বলে, 'আমার মরবার পর্য্যন্ত সময় নেই'। দিবারাত্র কাজ—কাজ—কাজ—নিজের রুটির যোগাড় করতে হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহায্য করতে হচ্ছে—আমাকে একলাই এই সব করতে হচ্ছে, আর তার দরুন শত্রুমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল খাচ্চি!!! যাই হক্, তোমরা ত শিশুমাত্র—আমাকে সব সহ্য করতে হবে।

আমি কল্‌কেতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি—তাকে লণ্ডনে রেখে যাব। আমেরিকার জন্য আমার আর একজনের আবশ্যক। তোমরা কি মান্দ্রাজ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পারো না? অবশ্য তার আসবার খরচপত্র সব আমি দেবো। তার ইংরাজী ও সংস্কৃত দুই ভাল জানা চাই—ইংরাজীটা সংস্কৃতের চেয়ে আরও ভাল জানা দরকার। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া দরকার—মাগী প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না যায়। আবার তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই। তোমার কি সংস্কৃত ঐলনসই গোছ জানা আছে? জি, জি কিছু কিছু জানে। এরূপ কাজে আমি আমার নিজজন চাই। গুরুভক্তিই সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশঙ্কা হয়, তুমি তোমার কাগজ ফেলে আসতে পারবে না; জি, জি, কি আসতে পারে? আমি দুজন লোককে এই দুই কেন্দ্রে রেখে যেতে চাই, তার পর আমি ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের অবসর দেবার জন্য নূতন নূতন লোক পাঠাবো। বাস্তবিক আমি ক্রমাগত কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এতদিনে রক্ত বমি করে মরে যেত। কে, মেনন পূর্ব্বের মতই বিশ্বস্ত ও অনুগত আছেন। তিনি প্রায়ই এসে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। আমাকে ৫/০. মিস

মেরি ফিলিপস্, ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক ঠিকানায় পত্র লিখো। আমি আগামী সপ্তাহে আমেরিকায় যাচ্ছি এবং আগামী গ্রীষ্মে এখানে আবার ফির্‌বো। ইতিমধ্যে কাকেও এখানে পাঠাতে পার্‌বে কি না ভাবো। আমি দীর্ঘকালবিশ্রামের জন্য ভারতে যেতে চাই। কিডি, ডাক্তার, সেক্রেটারি সাহেব, বালাজি এবং বাকি সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। সদা আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। ইতি

তোমার—বিবেকানন্দ।

পুঃ—'ব্রহ্মবাদিনে' বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উচিত।

(একটী ভক্ত বৈরাগী shuffled off his mortal coil—এরূপ ভাবের ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগী মৃত্যুর সঙ্গে এরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্যোদ্দীপক।)

নং ২০

(ইংরাজীর অনুবাদ)

লণ্ডন,

২১শে নবেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয়,

আমি ব্রিটানিকা জাহাজে চড়ে আগামী ২৭শে বুধবার আমেরিকা রওনা হচ্ছি। এখানে এ পর্য্যন্ত যতটা কাজ হয়েছে, তা আমার বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। এবং আগামী গ্রীষ্মে আরও সুন্দর কাজ হবে নিশ্চিত। * * ভালবাসাদি জানিবে। ইতি

তোমার—বিবেকানন্দ

নং ২১

আমেরিকা,

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে।

(জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে লিখিত)

* * * আমাদের বন্ধুটী বৈদান্তিক প্রাণ, আকাশ ও কল্পতত্ত্ব গুণে মোহিত হলেন—তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা ব্যতীত জগৎসম্বন্ধে

অন্য কোন মতবাদ পোষণ করতে পারেন না। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতবিৎ সঠিকভাবে পরীক্ষা যোগে প্রমাণ করতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন গাণিতিক পরীক্ষা দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

যদি বাস্তবিক এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিবিজ্ঞান দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রেত্যভাবতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঐক্য দেখ্‌ছি; উহাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি। * উহার প্রথম অধ্যায়ে হবে সৃষ্টি বিজ্ঞান—তাতে বেদান্তমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখান হবে। নিম্নলিখিত চিত্রের দিকে দেখ্‌লে এর কতকটা আভাস পাওয়া যাবে।

ব্রহ্ম = নিরপেক্ষপূর্ণ সত্তা

মহৎ বা ঈশ্বর আদ্যা সৃষ্টিশক্তি

প্রাণ ও আকাশ = শক্তি ও জড়

প্রেত্যভাবতত্ত্ব অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে কিরূপ গতি হয়, তা কেবল অদ্বৈতবাদের দিক্ থেকে দেখান হবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন,—মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে পরে চন্দ্রলোকে ও তথা হইতে বিদ্যুল্লোকে যান, সেথান থেকে একজন পুরুষ এসে তাঁকে

* স্বামীজি ঠিক এই ভাবের কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে এই সময়ের পরবর্ত্তী অনেক বক্তৃতায় এই তত্ত্বগুলির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায় (অদ্বৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হন)।

এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার যাওয়া আসা নাই আর এই যে সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ—এ গুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপত্তি মাত্র। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন বা অতি স্থূল স্তর হচ্চে আদিত্যলোক অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—এখানে প্রাণ জড়শক্তিরূপে ও আকাশ স্থূলভূত রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক উহা আদিত্যলোককে ঘেরে আছে। ইহা আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নহে, ইহা দেবগণের আবাসভূমি—অর্থাৎ এখানে প্রাণ আধ্যাত্মিক বা সূক্ষ্মশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ইহারও উপর বিদ্যুল্লোক—এখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বল্লেই হয় আর তাড়িৎ বা বিদ্যুৎজিনিষটাও সেই রকম—উহা জড় বিশেষ বা শক্তি বিশেষ, বলা বড় কঠিন। তারপর ব্রহ্মলোক—সেখানে প্রাণও নাই, আকাশও নাই—সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আত্মাশক্তিতে সম্মিলিত হয়েছে। ইহাকেই পুরুষ বলে বোধ হয়—ইনি সমষ্টি আত্মাস্বরূপ, কিন্তু ইনিও সেই সর্ব্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন—কারণ, এখানেও বহুত্ব রয়েছে। এইখান থেকেই জীব শেষে তার চরম লক্ষ্যস্বরূপ একত্বলাভ করে। অদ্বৈতবাদমতে জীবের আসা যাওয়া নেই—এই দৃশ্যগুলি ক্রমান্বয়ে জীবের সাম্‌নে আবির্ভূত হতে থাকে আর এই যে বর্ত্তমান দৃশ্যজগৎ দেখা যাচ্ছে, তাও এইরূপেই সৃষ্ট হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই ক্রমেই হয়ে থাকে—তবে প্রলয় মানে পশ্চাদ্দেশে চলে যাওয়া আর সৃষ্টি মানে বেরিয়ে আসা।

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগৎমাত্র দেখতে পায়, তখন ঐ জগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয় আর তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, যদিও অন্যান্য যে সব জীব বদ্ধ রয়েছে, তাদের জন্য ঐ জগৎ থেকে যায়। এখন নামরূপ হচ্ছে জগতের উপাদান। সমুদ্রের একটা তরঙ্গকে তরঙ্গ ততক্ষণ বলি, কেবল যতক্ষণ উহা নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তরঙ্গের বিরাম হলে উহা যে সমুদ্র

সেই সমুদ্রই হয় আর সেই নাম ও রূপ তখনই চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেছে বল্‌তে হবে। সুতরাং যে জলটা নামরূপের দ্বারা তরঙ্গাকারে পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়া তরঙ্গের নামরূপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই আর শুধু নামরূপকে কখনও তরঙ্গ বলা যেতে পারে না। উহারা জলে পরিণত হলেই সেই নামরূপের ধ্বংস একেবারে হয়ে যায়। তবে অন্যান্য তরঙ্গগুলির অন্যান্য নামরূপ থাকে বটে। এই নামরূপকেই বলে মায়া আর জলই এখানে ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত। তরঙ্গ বরাবরই জল ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু আবার তরঙ্গ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তার নামরূপ থাকে। আবার এই নামরূপও এক মুহূর্ত্তের জন্যও তরঙ্গ থেকে পৃথকভাবে থাক্‌তে পারে না, যদিও জ্ঞানস্বরূপে সেই তরঙ্গটী চিরকালই নামরূপ থেকে পৃথক থাক্‌তে পারে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গ থেকে নামরূপকে কখনই পৃথক করা যেতে পারে না, সেই হেতু তারা যে 'আছে' তা বলা যেতে পারে না। কিন্তু তারা একেবারে যে 'কিছুই নয়' তাও নয় ইহাকেই বলে মায়া।

আমি এই সমস্ত ভাবগুলি সাবধানে বিস্তার কর্‌তে চাই, তবে যা বল্লুম, তাতে নিশ্চিত এক আঁচড়ে বুঝে নেবে, আমি ঠিক পথ ধরেছি। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির তত্ত্ব আরও ভাল করে দেখাতে গেলে শারীর-বিধান শাস্ত্র আরও বেশ করে আলোচনা কর্‌তে হবে। উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধ আলোচনা কর্‌তে হবে। তবে আমি এখন গাঁজা খুরি ছেড়ে দিয়ে এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোক দেখ্‌তে পাচ্ছি

* * * *

ইতি বিবেকানন্দ

নং ২২।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

নিউইয়র্ক

২২৮নং, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা।

২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইসঙ্গে 'ভক্তিযোগে'র কপি কতকটা পূর্ব্ব থেকেই পাঠালাম—

সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম সম্বন্ধেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সাঙ্কেতিক লিখনবিৎ নিযুক্ত করেছে, আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, সে সেই সব টুকে নেয়। সুতরাং এখন তুমি কাগজে ছাপাইবার জন্য যথেষ্ট জিনিষ পাবে। এগিয়ে চল। ষ্টার্ডি পরে আরও লিখ্‌বে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বার করবে মনে কর্‌ছে—সেই জন্য ব্রহ্মবাদিনের জন্য আমি বেশী কিছু কর্‌তে পারিনি। তোমার কাগজটার উপর পৃষ্ঠায় একটা পরিষ্কার কভার দিচ্ছ না কেন বল দেখি? এখন কাগজটার উপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর—কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক—আমি এটা দেখ্‌তে চাই—এবিষয়ে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। ধৈর্য্য ধরে থাক এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাক। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা কড়ির লেন দেন বিষয় সম্পূর্ণ খাঁটি হও। তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না। ওসব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ কোর্‌বো জেনো। প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠান হবে। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস, সাধুতা ও নিষ্ঠা থাক্‌বে ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। আগামী মেলে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখ্‌বে।

বৈদিক সূক্তগুলি অনুবাদের সময়—ভাষ্যকাররা উহার কি অর্থ করেছেন, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো। পাশ্চাত্যবিদ্‌দের দিকে একদম দেখো না। উহারা ওর কিছুই বোঝে না। শুধু ভাষাতত্ত্ববিদেরা ধর্ম্ম ও দর্শন বুঝ্‌তে পারে না।

ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যতটা প্রবন্ধাকারে লেখা হয়েছে, সেগুলি অনেকটা প্রণালীবদ্ধ আকারে আছে, কিন্তু ক্লাসে যে সব বলা হয়েছে, সেগুলো অমনি এলোপাতাড়ি বলা হয়েছে—সুতরাং সেগুলো একটু দেখে শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলোর উপর বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নির্ভীক হও—তা হলেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। "ভক্তিযোগ"টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর উহা গ্রন্থাকারে ছাপিও—ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে উহা খুব বিক্রী হবে। ষ্টার্ডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মনে রেখো,

থিওজফিষ্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার এবং ধৈর্য্য না হারাও, তবে আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বল্‌তে পারি, আমরা এখনও খুব বড় বড় কাজ কর্‌তে পার্‌ব। হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড় কাজ হবে। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুমি মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড় আর আমার ভয় হয়, তোমার থিওজফিষ্টদের হাতে পড়বার প্রলোভন আসে। এইটী মনে রেখো, গুরুভক্ত জগৎ জয় কর্‌বে। ইহাই ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষ্য। আমি জি, জি,র চিঠি পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি। বিশ্বাসেই মানুষকে সিংহ বিক্রমশালী করে। তুমি সর্ব্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ কর্‌তে হয়। কখনও কখনও দিনে ২।৩টা বক্তৃতা কর্‌তে হয়। তারপর সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটিয়ে রুটির যোগাড় কর্‌তে হয়। আমার চেয়ে নরম ধাতের লোক হলে এইতেই তার মৃত্যু হোতো। মিঃ কৃষ্ণমেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে—সে লিখ্‌বে, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে এখনও কিছু লেখে নি। ইংলণ্ডে সে দুরবস্থায় পড়েছে। আমি তাকে ৮ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছি—এর বেশী আর আমার কর্‌বার ক্ষমতা ছিল না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, সে দেশে ফির্‌ছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাক, সত্যনিষ্ঠ, সাধু ব্যবহারসম্পন্ন ও পবিত্র হও—আর নিজেদের ভিতর বিবাদ করো না। ঈর্ষাই আমাদের জাতির অভিশাপস্বরূপ।

মেল যাচ্ছে—তাড়াতাড়ি করে চিঠিখানা শেষ কর্‌তে হচ্ছে। আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে ভালবাসা জানাবে।

ইতি
বিবেকানন্দ।

পুনঃ—পূর্ব্বে যে ভাষ্যের অনুবাদের কথা বলেছি, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—বহ্মবাদিনে প্রথম সংখ্যায় ঋগ্বেদসংহিতার "আনীদবাতং" এর অনুবাদ করা হয়েছে—"তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না লইয়া জীবনধারণ

করিতে লাগিলেন।” এখন প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করা হয়েছে আর “অবাত” শব্দের আক্ষরিক অর্থ “অস্পন্দভাবে” অর্থাৎ প্রাণের তখন কোন প্রকার কম্পন ছিল না। ইহাতে কল্পপ্রারম্ভে প্রাণের অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী জাগতিক শক্তির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ভাষ্যকারগণের ভাষ্য আলোচনা কর। আমাদের ঋষিগণের জ্ঞানানুসারে ব্যাখ্যা কর—আহম্মক ইউরোপীয়গণের মতে নয়। ফিরিঙ্গিরা কি জানে?

ইতি

বিবেকানন্দ।

আনন্দের অভিব্যক্তি।

(ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য)

মানব জীবনের লক্ষ্য আনন্দ লাভ করা। ধন রত্ন হইতে আনন্দ হয় তাই লোকে উহা চায় নচেৎ স্বর্ণ বা রৌপ্য খণ্ড মানবের নিকট মৃত্তিকা খণ্ড অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হইত না। সুন্দর গল্পটী পড়িলে আনন্দ হয় তাই লোকে উহা পড়ে নচেৎ একটী পক্ষীর সম্মুখে পুস্তক খুলিয়া ধরিলে উহা যেরূপ তাহার নিকট নিষ্প্রয়োজন হয় মানবেরও কি তদ্রূপ হইত না? জগতের লোকে সংসারে আবদ্ধ হয় কেন? তাহারা উহাতে অনেক আনন্দ পায় বলিয়া নহে কি? সংসারে আনন্দ না থাকিলে কেহ তাহাতে লিপ্ত হইত না। সংসার শুষ্ক বোধ হইত। যদি আনন্দ না হইয়া দুঃখ হইত তবে তুমি কি তোমার স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া বহু ধন উপার্জ্জনের নানাবিধ চেষ্টা করিতে? গ্রীষ্মে লোকের কষ্ট হয় তাই না লোকে আনন্দের জন্য শীতল পার্ব্বত্য স্থান সমূহে গমন করে। উত্তম আহার বিহার, উত্তম বেশভূষা আনন্দ দান করে বলিয়া মানবের এত প্রিয় হয়।

সারা জগতে অনাদিকাল হইতে আনন্দের পূজা চলিয়া আসিতেছে। সকল দেশের সকল জাতির মানবই আনন্দলাভের জন্য লালায়িত। নানাভাবে নানাপ্রকারে লোকে আনন্দের সেবা করিতেছে। আনন্দ পাইবার জন্য কত ধৈর্য্যের সহিত সাধনা করিতেছে।

সাধুর সৎকর্ম্মে আনন্দ—তাই তিনি তাহা করেন, পাপীর পাপ কার্য্যে আনন্দ—তাই সে তাহা করে। আনন্দ না হইলে কেহ কিছু করিত না। সুন্দর পুষ্প-বৃক্ষ সকল মানবহস্তের সেবা পাইত না। লোকে বিদ্যা শিক্ষা করে কেন? নাম-যশের জন্য প্রাণপণ করে কেন? চাকুরি ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু লোকে করে তাহা উপায়, তাহা হইতে টাকা লাভ করা তাহার লক্ষ্য, কারণ টাকা হইতে আনন্দ লাভ হয়।

আনন্দহীন জীবন যেমন স্ফূর্ত্তিহীন, আনন্দহীন জগৎও তেমনই প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমির মত। যাঁহার জীবন যে পরিমাণে আনন্দপূর্ণ আমরা তাঁহাকে সেই পরিমাণ সুখী বলি। সুখ কর্ম্ম হইতে লাভ হয়। আনন্দ ফসল। কর্ম্ম বৃক্ষ। উত্তম ফসল লাভ করিতে হইলে বৃক্ষকে যত্ন করিতে হয়। সুখের আশাই মানবকে সকল কর্ম্মে নিয়োজিত করে। অভিমন্যুর মত কত মানব ব্যূহে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে বহির্গমনের পথ হারাইয়া ফেলে। সুখের জন্য একটী বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া মানব তাহার দাসত্ব বরণ করে। তাহা হইতে মনকে সরাইয়া লইবার ক্ষমতা আর মানবের থাকে না। আনন্দের আশায় অনবরত আনন্দেরই জন্য খাটিতে খাটিতে ক্রমে এইরূপ সংস্কার হইয়া পড়ে যে আর তাহা পরিত্যাগ করিতে মানবের সামর্থ্যে কুলায় না। এই সুখের আশা মানবকে স্বার্থান্ধ করে ও তীব্রভাবে পরিচালনা করিতে করিতে বার বার দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে।

আনন্দ লাভ করিবার জন্য মানব অনেক সময় এমন কতকগুলি হীন উপায় অবলম্বন করে যাহাতে আশু আনন্দ লাভ হইলেও পরিণামে দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়। কারণ, কর্ম্মফল অত্যন্ত বলবান। আনন্দ মানব মাত্রকেই উপার্জ্জন করিতে হয়। অদৃষ্ট যে মানবকে সময় সময় আনন্দ প্রদান করে উহা তাহার কোন না কোন অজ্ঞাত সময়ের অর্জ্জিত।

কেহ নিজ পুরুষকার দ্বারা আনন্দ অর্জ্জন করিতে ব্যস্ত, কেহ বা বিধিদত্ত অবস্থাতেই সন্তুষ্ট তাহাতেই তার আনন্দ। উভয়ই ঠিক—কারণ উভয়ই একই বস্তুরই দুই দিক মাত্র, তবে কেবল পুরুষকার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রদানকারী কর্ম্ম সকল করা অত্যন্ত কঠিন ও অতি তীক্ষ্ণ বিচারশীলতা সাপেক্ষ নচেৎ পথ ভ্রষ্ট হইয়া দুঃখ প্রাপ্তির অত্যন্ত সম্ভাবনা। কতটুকু কর্ম্ম নিত্য আনন্দ প্রদান করিবে ও কোনটুকুই বা আপাতমধুর হইয়া একটী আনন্দ লাভের পরিবর্ত্তে অসংখ্য দুঃখের কারণ হইবে তাহা সকল সময়ে ঠিক করিয়া উঠা পণ্ডিতগণেরও দুঃসাধ্য।

আনন্দ লাভের জন্য দিবায় ও রাত্রে মানব উন্মত্তপ্রায় হইয়া কত বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করে তাহা অতীব বিস্ময়কর। আনন্দের জ্ঞান ও বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রকার। জগতের প্রত্যেক মানবের নিজ নিজ মন মত আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকে। সত্ব, রজঃ ও তমোপ্রধান ব্যক্তির আনন্দের অভিরুচিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহা তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আনন্দ প্রদান করে সেই বস্তু বা কর্ম্ম সত্বগুণ প্রধান ব্যক্তির বিরক্তিভাজন। আবার যাহা রজোগুণ প্রধান ব্যক্তির আনন্দবর্দ্ধক তাহা তমোগুণ বিশিষ্ট মানবের অপ্রীতিকর। তমোগুণ প্রধান ব্যক্তির মন্দিরাদিবাস যেরূপ কষ্টকর সত্বগুণ প্রধান মানবের দাস দাসী রাজ্য সম্পদও তেমনই অপ্রিয়। একই বস্তু বা কর্ম্ম বিভিন্ন অবস্থায় মানবের নিকট বিভিন্ন প্রকারে প্রতীয়মান হয়। বাল্যে যে সকল বস্তু বা কর্ম্ম হইতে মানব আনন্দ প্রাপ্ত হয় বার্দ্ধক্যে আর সে সকল হইতে আনন্দ পায় না। গ্রীষ্ম ঋতুতে যাহা অপ্রিয়, শীত ঋতুতে তাহাই পরম আদরনীয় হইয়া উঠে।

বিভিন্ন স্থানে একই আনন্দ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে। গুরুকে দেখিলে শিষ্যের যে আনন্দ, পুত্রকে দেখিলে মাতার যে আনন্দ, স্বামীকে দেখিলে স্ত্রীর যে আনন্দ ও সখাকে দেখিলে সখার যে আনন্দ তাহা যথাক্রমে ভক্তি স্নেহ প্রেম ও ভালবাসা নামে অভিহিত হইতেছে। নানা আধারে নানা ভাবে এই আনন্দের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই; বিড়াল আদর পাইলে ঘড় ঘড় শব্দে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। পক্ষিগণ রজনী

প্রভাতে আনন্দে কলরব করিয়া উঠে। উষ্ট্রের কাঁটা ঘাস খাইতে এতই আনন্দ যে মুখ কাটিয়া রক্ত নির্গমনের প্রতি তার লক্ষ্যই থাকে না।

যাহা আনন্দ লাভের পথে অন্তরায় তাহাকে দূরীভূত করিবার জন্য মানব কত প্রকার কৌশল ও উপায় অবলম্বন করে। যে কোন প্রকারে বহু আনন্দ লাভ করিতে মানব মাত্রেই ব্যস্ত। যাহার যে কাজে আনন্দ হয় জগতের লোকে ভাল না বলিলেও সে তাহা করিবেই। কিছুতেই উহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহাই মানবের স্বভাব। যে কাজে আনন্দ হয় না মানব সে রূপ কার্য্য করিতে কিছুতেই প্রবৃত্ত হইবে না। যদি কখনও বাধ্য হইয়া সেরূপ কাজ করিতে হয় তখন প্রাণে স্ফূর্ত্তি থাকে না, অথচ যে কাজে আনন্দ হয় তাহা করিতে মানবের কত উৎসাহ, মুখে কত হাসি তখন তাহার ফুটিয়া উঠে।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। প্রত্যেক আনন্দের শেষ আছে, উচ্ছেদ আছে, নচেৎ আনন্দ আর এত আনন্দকর থাকিত না। উহা মানব জীবনে একঘেয়ে হইয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে দুঃখ আসিয়া আনন্দকে আমাদের নিকট মধুরতর করিয়া দিয়া যায়।

আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত আনন্দকে কাল্পনিক বস্তু স্থির করেন, তাঁহারা বলেন আনন্দ বা নিরানন্দ তুলনাতেই হইয়া থাকে। কোন কিছুই আনন্দ বা নিরানন্দকর নহে। মানবের মনই উহাকে ঐ প্রকার চিন্তা করে। বৃক্ষতলবাসী দরিদ্র ব্যক্তি কুটীরবাসী গৃহস্থকে সুখী মনে করে আবার কুটীরবাসী গৃহস্থ, অট্টালিকাবাসী ধনীকেই আনন্দিত মনে করেন।

এ-যুক্তি এক প্রকারে যথার্থ হইলেও আনন্দকে আমরা মানসিক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। মানব মন সর্ব্বদা কোন অধিকতর আনন্দ উপভোগের জন্য তৎপর। কোন সম্পত্তি বা ধন রত্ন মানবকে পূর্ণ আনন্দ দিতে পারে না। একগুণ ধন সম্পত্তি বিশিষ্ট মানব দ্বিগুণ ও দ্বিগুণ ধন সম্পত্তি বিশিষ্ট মানব চতুর্গুণ ধন

সম্পত্তি লাভের জন্য ব্যাকুল। মানবের সুখের লালসা কিছুতেই মিটে না। যদিও এমন একটা সময় তাহার আসে যখন সংসারের কোন বস্তুই আর তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না।

মানব যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটী অধিকতর আনন্দকর বস্তুকে ধরিতে না পারে ততক্ষণ কোন বস্তু ত্যাগ করিতে পারে না এবং যাহারা একই বস্তুতে আসক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় বুঝিতে হইবে তাহারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন বিষয় প্রাপ্ত হয় নাই।

আমেরিকার ক্রোরপতিদের ছেলে মেয়েদের প্রাণ যখন নূতন আনন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল হইল, উত্তম আহার বিহার, উত্তম পরিচ্ছদ, জগতের শ্রেষ্ঠ ভোগ, মহামূল্য মণিরত্ন ও দ্রুতগামী যানে যখন আর তাহাদের আনন্দ হইতে ছিল না, দুর্ল্লভ বিলাসিতা যখন তাহাদের নিকট অতি পুরাতন ও অরুচিকর হইয়া পড়িয়াছিল, যখন তাহারা আনন্দ লাভের জন্য বস্তুন্তরের অনুসন্ধান করিতেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ তখন তাহাদিগকে ব্রহ্মানন্দের সন্ধান বলিয়া দিলেন। ধরাতলের সমস্ত ভোগ তাহাদের পূর্ণ হইয়াছিল তাই তাহারা ঠিক ঠিক উহা ধরিতে পারিল ও পরমানন্দ লাভ করিল।

মানব মাত্রেরই ভিতর আনন্দ পাইবার তীব্র ব্যাকুলতা স্বভাবতঃই রহিয়াছে। তাই মানব আনন্দ লাভের জন্য প্রত্যেক বস্তুই "নেতি নেতি" করিয়া খুঁজিতেছে। একটী বস্তুতে আনন্দ পাইবে স্থির মনে করিয়া ধরিতেছে, কিছুকাল তাহা উপভোগের পর বিফল মনোরথ হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর একটীর প্রতি ধাবিত হইতেছে। মানবের এই আনন্দানুসন্ধিৎসার মধ্যে আমরা একটী ক্রম বা স্তর দেখিতে পাই, তাহা বহির্জগত হইতে অন্তর্জগতের সন্ধান।

মানব ভোগ্যবস্তু পাইলে তাহার ভোগের সময় একাগ্রমন হয়। তখনই প্রাণে আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। বিক্ষিপ্ত মন কোন আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। যে বস্তু মনকে যে পরিমাণে একাগ্র করিতে সক্ষম আমরা সেই বস্তুকে সেই পরিমাণ আনন্দজনক বলি। ধ্যানের সময় মন অধিক একাগ্র হয় তাই সেই সময় অধিক আনন্দ অনুভূত

হয়। এবং ব্রহ্মানন্দ অনুভূতির কালে মন সম্পূর্ণ একাগ্র হয় তাই সেই সময়কার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

আনন্দ মানবের অন্তরেই রহিয়াছে উহা বাহিরের বিষয় হইতে আসে না। বিষয় সকল উহা পাইতে আমাদিগকে সাহায্য করে মাত্র। লোহিত পুষ্প, শ্বেত বস্ত্র বা নীল পক্ষী দেখিলে যে আনন্দ হয় তাহা একই প্রকার। কখনও বিষয়ের পার্থক্যে আনন্দের পার্থক্য হয় না।

জীব-হৃদয়-স্থিত আনন্দ যে কোন কারণেই হউক যখন উদ্বুদ্ধ হয় মানব তখন আনন্দ অনুভব করে। বিষয় সাপেক্ষ যে আনন্দ তাহা ক্ষণস্থায়ী কারণ বিষয় নাশের সহিত ঐ উদ্দীপনও লোপ হইয়া যায়।

যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা পাত্রে জল থাকিলেও তাহা কখনই পরিমাণে নদীর জলের সমান হইতে পারে না তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইতে যে আনন্দ লাভ হয় তাহা জীব হৃদয়স্থিত সম্পূর্ণ আনন্দের সমান হইতে পারে না। এবং ঐ পাত্র-স্থিত জল দেখিয়া আমরা যেমন নদীর অস্তিত্ব ব্যতীত তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিছুই স্থির করিতে পারি না, তদ্রূপ বিষয়ানন্দ দ্বারা আমরা হৃদয়ের আনন্দের অস্তিত্ব ব্যতীত তাহার স্বরূপ বা পরিমাণ কিছুই স্থির করিতে পারি না। কিন্তু ইহা বেশ সহজেই বুঝিতে পারি যে, যেরূপ নদীতে নাবিলে পাত্রস্থিত জল অপেক্ষা অধিক জল প্রাপ্ত হইব তদ্রূপ নশ্বর বিষয়াদির অপেক্ষা না করিয়া আনন্দ স্বরূপকে হৃদয়ে প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিব। এই আনন্দ স্বরূপই ব্রহ্ম, God বা আল্লা। তাই ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে জাগতিক বিষয় সকল পরিত্যাগ করিতে হয় ও তিনিই 'যথার্থ' আনন্দিত হন যিনি ঈশ্বরকে লাভ করেন।

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

(ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচৈতন্য)

"এই পরিণাম!
এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়!
এই নারী—এরও এই পরিণাম!
নশ্বর সংসারে
তবে, হায়! প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে করি শবে আলিঙ্গন?
দারুন বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি!
ওই উমা—ও'ও ছায়া!
মিথ্যা,—মিথ্যা,—মিথ্যা এ সকলি।"

মণিরত্নমালায় আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন :—"কোবাস্তি ঘোরোনরকঃ স্বদেহস্তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি।" এই দেহই ঘোর নরক, আর বৈরাগ্যই স্বর্গ। এ কথা সত্য কি না, স্থিরভাবে একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যে স্থান বিষ্ঠা মূত্রাদি হেয় পদার্থে ও অন্ধকারে পরিপূর্ণ ইহাই সাধারণতঃ নরকের ধারণা, আর ইহার বিপরীত ধারণাই স্বর্গ। আমাদের এই দেহ-যন্ত্রে তৈয়ারি হইতেছে বিষ্ঠা, মূত্র, কৃমি, কীট, কফ, বায়ু। এতো গেল সুস্থাবস্থার কথা। ঐ যন্ত্রটী আবার যখন বিকল হন, কত জ্বালা-যন্ত্রণা রোগ ভোগ করিতে হয়, কত ডাক্তার-কবিরাজের শরণাগত হইতে হয়, আবার হরির লুট, শিরনি প্রভৃতি দিয়া দেবতার কাছে মানত করিতে হয়—উহাকে সুস্থ ও আরো কিছু কাল মর্ত্ত্যে রাখিয়া ভোগসুখ করিবার জন্য। কিন্তু

"ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জ্জয়ন্তী রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহে।
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভগ্নঘটাদিবাম্ভো লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্॥"

"জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় সামনে তর্জ্জন করিতেছে। রোগ সকল শত্রুর ন্যায় দেহকে পীড়া দিতেছে। ভগ্নঘট হইতে ধীরে ধীরে জল যেমন ক্ষরণ হয়, আয়ুঃ সেইরূপ দিন দিন ক্ষয় হইতেছে। কি আশ্চর্য্য, লোকে তথাপি অহিতাচরণ করিতেছে।" ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি একমাত্র ভোগের জন্যই জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয়, সে কি সাক্ষাৎ নরক ভোগ নহে? এই ভাবে আজীবন নরক ভোগ করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা করাই তো আমাদের শ্রেয়ঃ। "What good is it to live long, when we advance so little?"

পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ দেহাত্মবাদীরা কি বলেন? হয়ত বলিবেন, তা কেন? দেশে শিল্প সাহিত্য, বিদ্যা বিজ্ঞান, কল কব্জা, ব্যবসা বাণিজ্যের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা কর। জিজ্ঞাসা করি, কেন করিব? কি উদ্দেশ্য লইয়া করিব? যদি দেহ যন্ত্রটাকে অধিক হইতে অধিকতর সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়া ঐ সকল পার্থিব উন্নতির জন্য মন-প্রাণ নিয়োগ করি, তাহা হইলে সেই একই কথা কে দাঁড়াইল,—সেই নরক ভোগ। তফাৎ কেবল সেটা আবরণহীন উলঙ্গ, আর এটা কাপড় চোপড মুড়িয়া আতর গোলাপ ছড়াইয়া তার স্ব স্বরূপ থেকে ঢাকিয়া রাখা মাত্র।

কিন্তু ঢাকিলে কি হইবে? দেহের স্বধর্ম্ম যাইবে কোথায়? বিষ্ঠা, মূত্র, কফ, বায়ু, কৃমি, কীট, রোগ, শোক, জ্বালা, এ এগুলি তো ফুটিয়া বাহির হইবেই, তুমি যতই কাপড় চাপা দাও এগুলির হস্ত হইতে তুমি কি নিস্তার পাইবে? পার্থিব উন্নতি দ্বারা কি জন্ম মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবে? জগতে বিজ্ঞানের উন্নতি পূর্ব্বাপেক্ষা তো অনেক অধিক হইয়াছে, "তবে কেন রোগ, শোক, জরা

দুঃখের আগার ধরা?

মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম?"

তবে উপায় কি? শিল্প-সাহিত্য, বিদ্যা-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য,

কল-কব্জার উন্নতির জন্য কিছুই কি করিব না? নিশ্চেষ্ট ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া বিদেশীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ও পদলেহন করিয়া জীবন কাটাইয়া দিব অথবা আত্মহত্যা করিব? যদি আত্মহত্যা করিলেই আর দেহধারণ করিতে না হইত, এই যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বরং ভোগের দিকে শ্যেন দৃষ্টি রাখিয়া জীবন যাপন করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করাই অধিক শ্রেয়ঃ হইত। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে, আবার নূতন দেহ-কলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!"

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরানি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

যতদিন না দেহ থেকে আত্মাকে কৌশল করিয়া ধৈর্য্যের সহিত পৃথক করা যায়, ততদিন জন্মমৃত্যুরূপ ভীষণ জাঁতায় নিষ্পিষ্ট হইয়া সকলকেই রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, ভোগ করিতেই হইবে—তুমি দেহাত্মবাদী বা আত্মবাদী যে বাদীই হও। তাই ভারতীয় বৈরাগ্যবাদী উপনিষদ্ মুখে উপদেশ দিয়াছেন—

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥"

"অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জাতৃণ হইতে যেরূপ মধ্যের ডগটি বাহির করেন, সেইরূপ ধৈর্য্যসহকারে সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক কবিবেন, এবং তাঁহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন।"

আপত্তি উঠিতে পারে, সকলেই যদি বৈরাগ্যাশ্রয় করে, তাহা হইলে পার্থিব উন্নতি হইবে কি করিয়া? এ দেশটা যে উচ্ছন্ন যাইবে, আর জাতিটার লোপ অবশ্যম্ভাবী হইবে? বৈরাগ্যবাদী তোমরা,

তোমাদেরও তো দেহধারণ করিতে হয় এবং তাহার রক্ষার জন্য আমাদেরই মতন চেষ্টা ও আবশ্যকীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে দেখা যায়। শারীরিক ব্যাধি তোমাদেরও তো ছাড়ে না, তবে আর উভয়পক্ষের প্রভেদ কি? হাঁ, প্রভেদ আছে। মেরু ও সর্ষপে যে প্রভেদ, ত্যাগে ও ভোগে সেই প্রভেদ। দেহ একই জিনিষে তৈয়ারি হইলেও এ প্রভেদ ভাব বা উদ্দেশ্য লইয়া। একজনের উদ্দেশ্য কৌশলক্রমে দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করিয়া শেষে সর্প নির্মোকবৎ দেহটাকে ফেলিয়া দিয়া জন্মমৃত্যু রোগ শোকের হাত হইতে চিরকালের নিমিত্ত নিষ্কৃতি পাওয়া, অপরের উদ্দেশ্য দেহসুখের মাত্রা বাড়াইয়া নিজের অহঙ্কার জাহির করা। একজন ভগবৎ পাদপদ্ম-রস পান করিয়া তৃপ্ত, অপরে বাহ্য বিষয় রসের আশায় ছুটাছুটি করিয়া অতৃপ্ত। কারণ কামনার কখনও পূরণ হয় না। একজন সত্যের জন্য মৃত্যুকে সদা আলিঙ্গনে প্রস্তুত, অপরে মৃত্যুভয়ে ভীত, ত্রস্ত। একের প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি নিশ্বাসে নিশ্বাসে নিঃস্বার্থপরতা, পবিত্রতা, প্রেম, ভক্তি, বর্ধিত হইতেছে, আর অপরের মন ভোগলোলুপ হওয়ায়, দেহেতে আবদ্ধ থাকায় তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নীচতা, স্বার্থপরতা [illegible] হিংসায় জগৎ শান্তিহীন। মল মূত্র কফ বায়ু কৃমী কীটে পরিপূর্ণ নরকসদৃশ এই দেহ যদি নিঃস্বার্থপরতা, পবিত্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস এই সব অমৃত ফল প্রসব করে তবেই উহার [illegible] সার্থকতা আছে। নচেৎ ইহার মূল্য কি? স্বর্গের এই সব [illegible] ফল প্রসব করে বলিয়াই বৈরাগ্যবাদী মুমুক্ষুগণ দেহের যত্ন করিয়া থাকেন এবং যে পরিমাণে ইহা অমৃত প্রসব করে ইহার মূল্যও সেই [illegible] প্রমাণ। মনে রাখিও, দেহ সুখের জন্য নহে, মুক্তি বা ভগবান লাভের জন্যই দেহ ধারণ।

বৈরাগ্য প্রচার করিলে পার্থিব উন্নতি হইবে না, দেশটা উচ্ছন্ন যাইবে ও জাতিটা লোপ পাইবে, এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ। তাহাই যদি হইত, জিজ্ঞাসা করি, ইতিহাস যে যুগের সময় নিরূপণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম সেই সত্য ত্রেতা দ্বাপর আর কলি এই

চারি যুগেই, ভারত তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ বাহিরের নানা অত্যাচার-অবিচার ঝঞ্ঝাবাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়াও এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে কেন? এখনও জগৎ তাহাকে ধর্ম্মগুরুর আসন ছাড়িয়া দিতেছে কেন? যে অন্যায়, অত্যাচার পীড়ন হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াও জীবিত আছে, মরে নাই, সে অন্যায়-অত্যাচার প্রলোভনাদি যদি অন্য জাতির উপর পতিত হইত, কোথায় থাকিত তাহাদের অস্তিত্ব? বৃদ্ধ ভারত যে এখনও জীবিত থাকিয়া সমগ্র জগতে সসম্মানে ধর্ম্মগুরুর আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহাতেই কি প্রমাণ হইতেছে না বৈরাগ্য প্রচারে দেশ উচ্ছন্ন ও জাতি লোপ হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। "এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীক বাহিনার বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। এখন তাহারা কোথায়? তাহাদের এখন চিহ্নমাত্রও নাই। গ্রীসদেশের গৌরবরবি আজ অস্তমিত! এমন সময় ছিল, যখন রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা জগতের বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরেই উড্ডীয়মান ছিল। আজ সেই Capitoline গিরি ভগ্নস্তূপ মাত্রে পর্য্যবসিত; সেখানে সীজারগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেন, সেখানে আজ উর্ণনাভ তন্তু রচনা করিতেছে। অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে আবার পড়িয়াছে; মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তারপূর্ব্বক স্বল্পকালমাত্র পরপীড়া কুলষিত জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় বিলীন হইয়াছে।

"এইরূপেই এই সকল জাতি মনুষ্যসমাজে আপনাদের চিহ্ন এককালে অঙ্কিত করিয়া এখন তিরোহিত হইয়াছে। তোমরা কিন্তু এখনও জীবিত, আর আজ যদি মনু এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে আসিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইবেন না; কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িলাম বলিয়া মনে করিবেন না। সহস্র সহস্রবর্ষ ব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধান সকল এখানে এখনও বর্ত্তমান; সনাতনকল্প, শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই সকল আচার এখানে এখনও বর্ত্তমান। যতই দিন যাইতেছে, যতই দুঃখ-

দুর্ব্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে এই একমাত্র ফল হইতেছে যে, সেগুলি আরও দৃঢ়, আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। ঐ সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়? কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মূল প্রস্রবণই বা কোথায়, ইহা যদি জানিতে চাও, তবে বিশ্বাস কর, তাহা ধর্ম্ম।"

যখনই ভারতের জাতীয় জীবনের মূল প্রস্রবণে আবর্জ্জনা আসিয়া জড় হয়, যখনই এই ভারত ভোগমুখী হয় তখনই শ্রীভগবান বা তাঁহার প্রেরিত কোনও মহাপুরুষ আসিয়া উহার আবর্জ্জনা সরাইয়া উহাকে ত্যাগমুখী করিয়া দেন ভারতকে মৃতের পথ হইতে টানিয়া আনিয়া অমৃতের পথে লইয়া যান, জগতে নিজের জীবনাদর্শ রাখিয়া, দেখাইয়া দেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মনাশুঃ। সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্য বিদ্যা, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বানিজ্য প্রভৃতিরও উন্নতি হইয়া থাকে, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। তবে, ইহার অবাধ উচ্ছৃঙ্খল গতি সংযম-রশ্মি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্রীবুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী, হৃদয়বান, বৈরাগ্যবান ব্যক্তি জগতে অতি দুর্লভ। তাঁহার পদাঙ্কানুসারী লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ বৈরাগ্যধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া নিজেরা তো অমৃতের আস্বাদন করিয়াছেন অধিকন্তু সমস্ত দেশকে শিল্প-কলা সাহিত্য বিজ্ঞান ব্যবসা বাণিজ্য ধনে এত ধনী করিয়া গিয়াছেন যে আজ হাজার বৎসর পরেও উহা জগতের বিস্ময়-সম্ভ্রম-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তবে আর তোমাদের এ আশঙ্কা কেন, দেশে বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে পার্থিব উন্নতির আর আশা নাই? অধিকারিভেদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই পথই কল্যাণকর। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিচারপূর্ব্বক ভোগ করিয়া শেষে তাহাকেও ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ নিবৃত্তিই জীবনের চরমাদর্শ।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পারিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

"যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া আসে, হে ভারত, তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুরাত্মাদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি মায়াদ্বারা জন্ম গ্রহণ করি।" যে শক্তি ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, যে জগৎ পরিচালন-শক্তি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে আবির্ভূত হইয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে উপনিষদের সার গীতা অর্থাৎ ত্যাগামৃত বর্ষণ করিয়াছিল, পুনশ্চ যে শক্তি শ্রীবুদ্ধ দেবকে রাজ্য সুখ-ভোগ করিতে না দিয়া তাঁহাকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জীবন্ত ঘন মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া ভারতের তথা সমগ্র জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল, হে পাশ্চাত্য চাক্-চিক্যে-ভ্রান্তচিত্ত দেহাত্মবাদী নাস্তিকগণ, পুনশ্চ সেই একই শক্তি অল্পদিন হইল তোমাদেরই লীলাস্থল কলিকাতার অনতিদূরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহে পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া তোমাদের অসার যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। "প্রাঙ্ রাঘবো যশ্চ পুনশ্চ কেশবঃ স এব জাতস্ত্বিহ রামকৃষ্ণঃ।" মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি? আপনি আচরণ করিয়া তিনি জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, "মুক্তি বা ভগবান্ লাভই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য।" ত্যাগ ও সেবার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে যুগচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, হে নাস্তিক দেহবাদী, তোমার কি সাধ্য এই যুগচক্রের গতি রোধ কর! অন্ধ, দেখিতে পাইতেছ না, এ চক্রের বেগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে! যদি কল্যাণ চাও, ভোগের পথ ছাড়িয়া ত্যাগের গৌরব-মুকুট মাথায় পর, ধন্য হও, যুগচক্রের অনুবর্ত্তন কর।

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

আর, হে "দ্রাঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী," সত্যসন্ধিৎসু অমৃতকামী যুবকগণ, ভাঙ্গিয়া ফেল তোমার ভোগভিক্ষা পাত্র; প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কর। ঐ দেখ, পাশ্চাত্য জগৎ ভোগবিষ পানে অস্থির হৃদয়ে পথভ্রষ্ট হইয়া শান্তিহারা। তুমি ভোগকে পদদলিত করিয়া তোমার ত্যাগের জাতীয় পতাকা তাহাদের সমক্ষে তুলিয়া ধর, তাহারা প্রকৃত পথের সন্ধান পাইয়া শান্তি লাভ করুক্। শ্রীভগবানের মঙ্গলাশীষ তোমার মস্তকে

বৰ্দ্ধিত হইবে, তোমার জন্ম সার্থক, তোমার মাতৃভূমি গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত হইবে। পারিবে কি ?

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।"

নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা

যাত্রীর বিবরণ

যাবার-পথের কথা

বঙ্কিম-কল্পনার কমনীয়-সৃষ্টি শ্রীমান নবকুমার জীবনে সৰ্ব্বপ্রথম সমুদ্র দেখিয়া, বাড়ী ফিরিবার পথে সহযাত্রীর প্রশ্নোত্তরে প্রাণের আবেগে কয়েকটী সহজ সরল স্বাভাবিক কথা কহিয়াছিলেন—'আহা !! —কি দেখিলাম,—জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না !'

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবার-ভুক্ত—সাধু গৃহস্থ, ব্রহ্মচারিণী গৃহিণী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বালক বালিকা—আমরা সকলেই পুণ্যপীঠ, ধৰ্ম্মক্ষেত্র জয়রামবাটীতে মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠোৎসব দেখিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরে বলাবলি করিতেছি—আহা, কি দেখিলাম—এমনটি ত' আর কখনও দেখি নাই, আমাদের মত ক্ষুদ্রজীবনে এরূপ সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ অভাবনীয়—সারা-জীবনে এক-আধবারই মেলে। ধন্য আমরা,—জন্মজন্মান্তরের কি সুকৃতিই না জানি ছিল, যাহার ফলে এরূপ দেব-দৃশ্য চৰ্ম্মচক্ষে দেখা যায়। জন্ম সার্থক, আমরা কৃতার্থ।

নবকুমার সত্যকার হইলে তাহাকে বলিতাম—শিষ্যের শ্রেষ্ঠতীর্থ গুরুস্থানে, ভক্তের সেই ভাব-শ্রীক্ষেত্রে—নির্জনে নিরালায় বাঙ্গলার

প্রচ্ছদপল্লীপটে অন্যূন একশত ব্রতধারীর মধুচক্রকে কেন্দ্র করিয়া কোন্ এক অপূর্ব্ব ফলকের সাহায্যে ভাব ভক্তি প্রীতির রং বাড়াইয়া—একখানি বিস্তৃত বিশাল, নিখুঁত ছবি মা আঁকিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া যে অনির্ব্বচনীয় অমূল্য অভিজ্ঞতায় হৃদয়-মন ভরপুর করিয়া আনিয়াছি তাহার তুলনায়—বীচিবিক্ষোভিত বিশাল, দিগন্তবিস্তৃত, অকুলপাথার, লবণাম্বুরাশি বারিধিবুকে ভেলায় চড়িয়া যে বিশালতা, ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির ভাব—গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা, হিংসা-দ্বেষে পরিপূর্ণ মানুষের পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বুক ভরিয়া তুলে—উহা অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য।

'যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশেরই এক মানুষ' আমরা সঙ্গে পাইয়াছিলাম। পরমারাধ্য আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ স্বয়ং তরণীর হাল ধরিয়া কর্ণধাররূপে সেই জনস্রোতের মাঝে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধরে ছিল তাঁহার দীপ্ত হাসি, সমগ্র মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শ্রী, চক্ষুদ্বয়ে মাতৃসুলভ কৃপা-করুণা-মমতার কনককিরণ, বাহুদ্বয়ে বরাভয়, আশীর্ব্বাদ, সান্ত্বনা ও আশ্রয়। মাতৃমন্দিরের কল্পনা, পত্তন, নির্ম্মাণ, পরিসমাপ্তি, তত্ত্বাবধান ও রক্ষণ—সমস্তই তাঁহার। তাই বিশেষ করিয়া ইহা তাঁহার বড় আদরের—প্রাণের সামগ্রী।

আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া একজন সহৃদয় পরম পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ সত্যই কহিয়াছেন—আপনি ধন্য! শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের জন্যই, যেমন একদিন লীলারসময় হরির অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, আজ আপনার প্রসাদেও তেমনিই—আমাদের পুণ্যপীঠ শ্রীশ্রীজয়রামবাটীও বিখ্যাত হইল। শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহাভিষিক্ত ও কৃপাসিক্ত আপনি ভিন্ন,—আর কাহার সাধ্য যে এমন অদ্ভুত কার্য্য করে?—সাধু উক্তি।

* * * *

বাঙ্গলার গ্রাম—বিশেষ করিয়া পশ্চিম-বাঙ্গলার,—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, হুক্-ওয়ার্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার আধিব্যাধির আগার—সেই শ্মশানে মৃত্যুরূপী রুদ্র 'রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি' জনে জনে বিতরণ করিতেছেন—একথা আজ অতি পুরাতন। ভারতে পূর্ব্বে

নগর ছিল না, এমন নহে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার স্বরূপ যাহা, তুমি যাহা, আমি যাহা, আমরা যাহা, আমাদের বাপ দাদা যাহা—তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক,—'পরশ্রীকাতর, কুসংস্কারপরায়ণ, বুনো, বোকা, অশিক্ষিত,* শ্রাদ্ধের বৃষকাঠসদৃশ কতকগুলি মানুষের' আবাসস্থল ঐ পল্লীতেই মিলিবে। হউক উহা পতিত, পদদলিত ও পরিত্যক্ত। আজ তাই 'ক্ষুদ্র' পল্লার কথাই বিস্তৃতভাবে কহিব। আপনারা মার্জ্জনা করিবেন।

নামেই মালুম হইবে—'London of the East'—আমার নহে। উহা পশ্চিমের মেকী সংস্করণ, কৃত্রিমতা ও নকলের তাণ্ডবলীলা পুরদমে এদেশে চালাইবার ফন্দী—সভ্যতার নামে আমার যাহা ভাল, আমার যাহা জীবনপ্রাণময়, যাহা বিশিষ্ট জাতীয়-ধারা—তাহাকে কলের জাঁতায় চাপাইয়া গলা টিপিয়া পিসিয়া মারিয়া ফেলিবার একান্ত ক্রুর কাঙ্ক্ষা।

মায়ের জন্মস্থল জয়রামবাটী পল্লা আমার বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার নিজস্ব সৃষ্টি—ইহার উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম ২৬ মাইল পরিধির ভিতর পশ্চিমা সভ্যতার অগ্রদূত রেলগাড়ী এখনও যায় নাই। নগরবাসীর চক্ষে ঐরূপ দুর্গম (?) স্থান—[illegible] ও নিকটবর্ত্তী [illegible] প্রায় আট হাজার স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর ভক্ত, অভ্যাগত [illegible] ভিন্ন—কাশী, এলাহাবাদ, পাটনা, [illegible], মধুপুর, [illegible], শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বেলুড়, কলিকাতা, আর [illegible] হইতে স্থান হইতে প্রায় চারিশত সাধু ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ [illegible] সেই নির্জন নিস্তব্ধ ঘুমন্তপুরী যেন দেবকন্যার সোনার কাঠির [illegible] সহসা জাগিয়া উঠিল।

মাঠের পারে—দূরে—আমোদরের মৃদুকল্লোলের সহিত [illegible] ল্লীর নহবতের মধুর তান সকলের প্রাণ মাতাইল—মায়ের প্রসারিত বাহুযুগল অবিরত করুণাধারায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের অন্তর শান্ত, সুশীতল ও স্নিগ্ধ করিতেছিল; তাই মধ্যাহ্নে বৈশাখ প্রচণ্ড দিবাকরের সেই প্রখর জ্বালা জনসঙ্ঘ যেন বিস্মৃত হইলেন। চারিদিবস অহোরাত্রব্যাপী 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'—কীর্ত্তন, ভজন, যন্ত্রালাপ—লাঠিয়ালদিগের কুচ-

কাওয়াজ, নৈপুণ্য, হাতসাফাই, পরস্পরে রেষারেষি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ—স্বাধীন বাঙ্গলার, সমৃদ্ধ বাঙ্গলার বিস্মৃত অতীত-যুগের স্মারক চৌদ্দখানি ঢাক, কাড়া-নাকাড়া একসঙ্গে একতালে গম্ভীর নিনাদে বাজিয়া উঠিল,—যেন সেদিন রণচণ্ডী মা সিংহবাহিনীর সমরসজ্জা—নদ নদী বৃক্ষ লতা গুল্ম, সবই আনন্দের হিল্লোলে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল,—অনাহত-ধ্বনি হইল 'শুন শুন, মা এসেছে ঘরে, তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে'—পরক্ষণেই মিহিসুরে মুসলমান-বাদকেরা ব্যাগ্-পাইপে পোঁ ধরিয়া সকল প্রাণে আনন্দের এক ঝিলিক্ উঠাইলেন—সকাল দ্বিপ্রহর সন্ধ্যা—শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-ঘড়ি মন্দির মুখরিত করিতে লাগিল—পাকশালাগুলিতে সূপকার-দিগের বিরাট ভোগরন্ধনের উৎসাহ-উদ্যোগ—গ্রামের শিশু, বালকবালিকা, যুবকযুবতী, প্রৌঢ়প্রৌঢ়া সেই বিরাট জনসঙ্ঘে আপনাদের হারাইয়া ফেলিলেন—পরস্পর আলাপন, জল্পনা-কল্পনা, কথাবার্ত্তা, নাচন-কোঁদন, কর্ম্মীদলের নিঃশব্দ সেবা,—শৃঙ্খলা, শান্তি, মিলন—আকুল-বিহ্বল প্রাণে ভক্তের কোন কোন স্থানে নিশ্চেষ্ট-নিঃশব্দ দণ্ডায়মান ও নামামৃত পান—হাসি-ঠাট্টা-তামাসা—সঙ্ক্ষেপে ইহাই উৎসব-চিত্র।

কিন্তু এই বিরাট অনুষ্ঠান, অঘটন-ঘটন কাহার ইচ্ছায়, শক্তি-সামর্থ্যে সম্পন্ন হইতেছিল—ইহা কি সাধারণ মানুষের আয়োজন? যে শক্তি আলমোড়া হইতে কন্যাকুমারিকা, কামাখ্যা হইতে দ্বারকা—বিস্তৃতভারতের চতুর্দ্দিকে—বাহিরে, মগের মুল্লুকে, মলয়-উপদ্বীপে—আর সুদূর মার্কিণে, এককথায় জগত জুড়িয়া নব নব প্রতিষ্ঠান, নূতন নূতন মিলন-মঞ্চ দিন দিন গড়িয়া তুলিতেছে—ইহা সেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের—আর তথা তাঁহা হইতে অভিন্ন—শ্রীশ্রীমাতৃদেবীরই খেলা। ইহা সেই জগত-জননীরই বিভূতি—যিনি স্বয়ং বলিয়াছেন 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং'—যাঁহাকে বলা হইয়াছে 'ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্ত চ সর্ব্বদা'। শুনিয়াছি একদিন—অধুনা তাঁহারই অঙ্কগত, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত ৺ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রীশ্রীমা এরূপ কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন—"আমার এখনও শরীর আছে, তোমরাও আছ, এই বেলা

ঐস্থানে (জয়রামবাটীতে) একটা কিছু করিয়া লও।” আমরা এইমাত্র বলি—মা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হো'ক !

যাবার-পথে

২রা বৈশাখ, রবিবার, ১৩৩০—আমাদের যাত্রার দিন। সকালে সাড়ে আটটায় বি-এন রেলপথে আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। মস্ত দল—তৃতীয় শ্রেণীর একখানি সম্পূর্ণ কাম্‌রা আমরাই প্রায় ভরিয়া ফেলিলাম—৩৮খানি টিকিট ছিল আমাদের। রেলে সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনারা এতলোকে যাবেন কোথা ?' আমরা বলিলাম 'জয়রামবাটী—মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিতে।' আবার তিনি বলিলেন 'কিছুদিন আগে এই পথেই রামকৃষ্ণমিশনের অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ভুবনেশ্বরে আর একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন—না ?' ব'ল্লাম—'হাঁ—সেটী ঠাকুরের।' প্যাসেঞ্জার ট্রেণে অত লোক একসঙ্গে চেপে চলেছে—যাঁহারা কোন প্রশ্ন করিলেন না তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাবিয়া লইলেন—কিছু মেলা-মিছিল কোথাও আছে বুঝি। মাঝপথে একজন ফেরঙ্গ গার্ড টিকিট কাটিয়া আমাদের একজনকে প্রশ্ন করেন—"So *many* of you—are you going to attend any of your Congress meetings ?" উত্তরে 'No'মাত্র বলা হইয়াছিল। আমাকে এই প্রশ্ন করিলে আমি বলিতাম—"Yes, this time a *Religious Congress*" ।

'প্রেমিকে'র আন্দুল পথে পড়িল—প্রণাম করিলাম। রেলে খানিকটা চলিবার পর একঘেয়ে বোধ হইতে লাগিল। দুপুর বেলা—গরমহাওয়া বহিতেছিল। তাহাতেই অর্দ্ধেক স্ফূর্ত্তি মাটী হইল। মাঝে মাঝে নদনদী-গুলি যেন সেই একঘেয়ে ভাবটী দূর করিল। পথে অনেকগুলি নদনদী পার হইতে হইল। আমার নদী-মাতৃকা বাঙ্গলা—নানা দুর্গতি সত্ত্বেও অন্তরে তিনি সরসতার পূর্ণকুম্ভ সঞ্চিত রাখিয়াছেন। দ্বারকেশ্বরের উপর পুলটী বেশ বড়। বৈশাখে অধিকাংশ নদনদী শুষ্ক—বালু-ভরা। মেদিনীপুর অঞ্চলে একত্র অনেক শালবন দেখা গেল। পূর্ব্বে এই সব ঘনসন্নিবিষ্ট বনের ভিতর বাঘ-ভল্লুকের বাসা ছিল—পরে রেল বসাইবার

সময় অনেক বন কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু দুইচারিটা যা নমুনা দেখা গেল তাহা হইতেই বেশ বুঝিলাম যে বনগুলির শক্তি এককালে কম ছিল না। তাহারা বাস্তবিকই একদিন 'দিবাকে নিশি' করিত—বাহিরে দ্বিপ্রহরের পরিপূর্ণ দিবালোক, বনের ভিতর নিস্তব্ধ নিশীথ-রাতের ঘন-অন্ধকার —পাশাপাশি মানুষের চোখে চমক লাগাইত। এই অঞ্চল হইতে এক রাঙ্গামাটীর স্তরমালা আরম্ভ হইয়া মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। গাড়ী চলিতে লাগিল—আন্দাজ বেলা এগারটার সময় সুস্বাদু স্নিগ্ধখাদ্য—চিঁড়া, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি পেট ভরিয়া মিলিল।

খড়্গপুরে আমাদের কেহ কেহ পয়সা রাখিবার কয়েকটী রঙিন দড়ির থলি কিনিলেন—ষ্টেশনে একটী স্থানীয় হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। সেগুলি তাহারই স্বহস্তে তৈয়ারী সুচারুশিল্প বলিয়াই বোধ হইল। বেচা-কেনার খানিক পরে সেই স্ত্রীলোকটী ষ্টেশনেরই একটী গাছের শীতল-ছায়ায় শান্তভাবে বসিয়া আপনমনে লাভালাভ খতাইতে খতাইতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। হিসাবের গলদ বাহির হইয়াছে—ছয়টী থলিয়া তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছে, অথচ তাহার স্থলে মূল্য আছে পাঁচটীর। বাবুদের দল ভারী—গোলেমালে একটী থলিয়া বেশী চলিয়া গিয়াছে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া ষ্টেশনের কোম্পানীর নামাঙ্কিত একখানি ঠেলা খাবারের গাড়ীর মালিককে (দেশীয় বলিয়াই বোধ হয়) মধ্যস্থ মানিয়া আমাদের ভিতর যিনি মহাজন হইয়া জিনিষ খরিদ করিয়াছিলেন—শ্রীযুত কৃষ্ণবাবুকে করুণ অথচ স্থির স্বরে বলিল— 'বা—বু হাম্ ইমাণসে বোল্‌তা—এক্ থলিয়া যাস্তি গিয়া'—বলিয়া সমস্ত জমাখরচের কৈফিয়তের জেরটী মুখে মুখে টানিয়া সাফ বুঝাইয়া দিল। আমাদের ভিতর একজন তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় প্রথমে একটু অবিশ্বাসের কথা বলিলেন—কিন্তু দেখা গেল তাহার স্বর ক্রমশঃ দৃঢ় হইল। শেষে সে যাহা চাহিতেছিল, তাহাই দেওয়া হইল।

ব্যাপার মিটিল। বেচারা ধড়ে প্রাণ ফিরিয়া পাইয়া আবার সেই গাছতলায় বেশ করিয়া পা মেলাইয়া বসিল—আর একবার প্রাণের

আশা মিটাইয়া পুরাতন হিসাব নূতন করিয়া মনকে বুঝাইয়া দিল। জীবনের বেচা-কেনাতেও প্রত্যেকেরই এইরূপ সদাই আতঙ্ক—পাছে ঠকিতে হয়—পাছে হার হয়।

গাড়ী ক্রমে গড়বেতা ষ্টেশনে পৌঁছিল। ১০ মিনিট সেখানে থামিবার কথা। আচার্য্যদেব ও তাঁহার সহযাত্রীদিগকে পরিতোষ-পরিচর্য্যা ও সেবা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত মাল-মসলা, তোড়-জোড় সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শৈলানন্দ মহারাজ-পুরঃসর—কর্ম্মিবৃন্দ সকলেই সাগ্রহে বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত আশা-পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আনন্দধামের যাত্রীদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠিল। সেবায় অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা সংযম—সুচারু-পদ্ধতির একখানি সুন্দর ছবি কে যেন আমাদের সমক্ষে আঁকিয়া দিল। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে জানিতেন যে, ইঁহাদের অনেকেরই চা'র অভ্যাস। তাই সেই দারুণ গরমে প্রাণারাম মিছরির সরবৎ, তরমুজের সরবৎ ইত্যাদি স্নিগ্ধকর ঠাণ্ডাই পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে, চা'য়ের পিয়ালাগুলি আমাদের কামরার একধার হইতে অন্য ধারে ঘুরিতে লাগিল—গরম হইলেই বা—চা'যে স্নিগ্ধতা আনে, ইহা অভ্যস্ত ভিন্ন অপর কেহ হঠাৎ বুঝিবেন বলিয়া বোধ হয় না। সকলেই খুব পরিতুষ্ট হইলেন। প্রণাম কোলাকুলি প্রীতি-সম্ভাষণাদির পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। স্থানীয় ভক্তদিগের ও বিশেষ করিয়া ষ্টেশনের বাঙ্গালী বাবুদের সৌজন্য, শীলতা, বিনয়নম্র-ব্যবহার ও সর্ব্বোপরি সহায়তা, কখনও ভুলিবার নহে। তাঁহাদেরই চেষ্টায় গাড়ী প্রায় দীর্ঘ কুড়ি মিনিট কাল আমাদেরই জন্য দাঁড়াইল। তাহা ছাড়া, আমাদের অনেক লটবহর, বিছানা, পেট্‌রা, বাক্স ইত্যাদি থাকার দরুণ আমাদের অনুরোধে, তাঁহারা বিষ্ণুপুরে ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়ের নিকট তার করিলেন যেন গাড়ী সাধারণ নিয়ম বিচ্যুতি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের যাত্রীদের নামাইবার জন্য কিছু বেশীক্ষণ সেখানে থামে। স্থানীয় সেবাশ্রমের কর্ম্মিবৃন্দের সেদিনের সেবা-সাধনা সফল হইল। আমরা সকলে পরিতৃপ্ত-পরিতুষ্ট হইলাম।

গড়বেতা ষ্টেশনে একটী যাযাবর পরিবার দেখিলাম। জাতি-

তত্ত্ববিদেরা হয়ত এই ধাঁচের মানুষকে মোঙ্গলীয় শ্রেণীভুক্ত করিবেন। কিন্তু ইহাদের ভিতর ঠিক ঠিক জাতি কখন গড়িয়া উঠে নাই। মাথাগুলি তাহাদের বড় বড়—ঝাঁক্ড়া-ঝাঁক্ড়া চুলে ভরা—চিরুণীর ব্যবহার নিশ্চয়ই তাহারা করে না (সভ্য হইতে তাহাদের এখনও অনেক'দেরী)—রৌদ্র-বৃষ্টি-শৈত্যের সহিত সর্ব্বদা লড়াই করিয়া তাহাদের গায়ের চামড়া খুব পুরু-শক্ত-রঙ, তাহাদের লালচে। পরণে ঢিলা ঢিলা লম্বা লম্বা ময়লা পাজামা—পুরুষদের অধিকাংশ গা একেবারে খালি। মেয়েদের গা আবৃত—ঢিলা রঙিন জামায় বা কাপড়ে। সঙ্গে ছিল তাহাদের দুই তিনটী তাঁবু—বাসন-কোষণ—আর দুইটী বড় বড় মোরগ। হাঁড়িতে ভাত ফুটিতেছিল।

চলন্ত বেদের দল—ইহারা বাস্তুবিদ্যা একেবারেই জানে না—গৃহমেধী হইল না—বাহিরের আকর্ষণে গা ভাসাইল—মনস্থির করিয়া ঘরে বসিতে শিখিল না, কখন ঘরবাড়ী বাঁধিল না। একদিক দিয়া দেখিলে ইহাদেরও 'গৃহছাদ অনন্ত-আকাশ, শয়ন সুবিস্তৃত ঘাস'। ঐ অল্প সময়ের ভিতরই উহাদের ভিতর বিবাদ বাধিল। এক জনের বড় রাগ হইল, সে অভিমানভরে একেবারে রেলগাড়ীর এক কামরায় আসিয়া জমি লইল—মনের ভাব—আমি তোদের সঙ্গে আর থাক্‌ব' না—চল্লুম্। যেমন রাগিল শীঘ্র, শান্ত হইলও শীঘ্র—বাবা দাদা কিম্বা মোড়ল—কে বলিতে পারি না—পিঠ চাপড়াইয়া নামাইয়া লইয়া গেল। বেচারা একেবারে জল!

যাযাবরদিগের এই জীবন-ধারা আদিকাল হইতেই একভাবে চলিয়া আসিতেছে—তাহারা আপনাদের সেই সনাতন চাল-চলন (আমাদের পক্ষে নিতান্ত ন্যক্কার-জনক হইলেও) জিদের সহিত একভাবে ধরিয়া আছে। সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ও আশে পাশে ঘটনাচক্রে আসিয়া পড়িলেও নিজেদের ভাব ছাড়ে না। আমাদের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদে চলন্তগ্রামের কথা এক অধ্যাপক পেয়েছেন। সেথায় গ্রামকে গ্রামই যাযাবর—অবশ্য সেটা আর্য্য- সভ্যতার অরুণোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা বা প্রথমাবস্থা।

আন্দাজ বেলা প্রায় চারিটার সময় আমরা বুড়ী ছুঁইলাম—বিষ্ণুপুর পৌঁছিলাম। ১২৫ মাইল পাড়ি শেষ হইল।

বিষ্ণুপুরে

রেলের সহিত সম্পর্ক ঘুচিল। আমাদের সহিত বাঙ্গালী এম্‌বুলেন্স-কোরের মেসোপটেমিয়া-ফিরত তুর্কীর ভূতপূর্ব্ব বন্দী সজ্জয় শ্রীযুত ফণীভূষণ ঘোষ ছিলেন। শৃঙ্খলা-পদ্ধতির চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। স্বামী সচ্চিদানন্দজী আমাদের অফিসার-ইন-চার্জ, কাপ্তেন বা জমাদার সাহেব, যাহাই বলুন—পাশে তাঁহার উপযুক্ত লেফ্‌টেন্যাণ্ট বা সহকারী টেসিফোনের যুদ্ধ-ফেরত শ্রীযুত ফণীবাবু। ইঁহারা দুইজনে গাড়ীর ভিতর রহিলেন। 'Moving Luggage' বা 'চলন্ত মাল'—আমাদের সকলকে—আগে প্ল্যাটফরমের উপর নামাইয়া দিলেন। পরে এক এক করিয়া সমস্ত মাল মিনিট ৮।১০ ধরিয়া গাড়ী হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। কাজ শৃঙ্খলার সহিত শেষ হইল। রেল তাহার পর আপন পথে চলিয়া গেল।

বিষ্ণুপুর হইতে আগত সেবকবৃন্দ ও আমরা সকলে ঐগুলি হাতাহাতি করিয়া নামাইয়া একত্র স্তূপীকৃত করিলাম—বিরাট সে আকার। স্থানীয় সেবকেরা ষ্টেশনের নিকটেই গরুরগাড়ী কয়েকখানি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিবেদিতা-বিদ্যাপীঠের ও অন্যান্য মেয়েদের সকলকে তাহাতে চাপাইয়া দিয়া—আচার্য্য স্বয়ং একখানি টম্‌টম্‌ গাড়ীতে উঠিলেন। তাহার পর অন্য চারিখানি গাড়ীতে মাল-বোঝাইএর পালা সুরু হইল। ভাবনা নাই—কৌশলী লোক আছেন। কয়েকটী স্থানীয় মেয়ে-মজুরে ও আমরা মিলিয়া মাল তুলিয়া দিলাম। গোলকধাঁধার ভিতর কড়ি বা ঘুঁটী ঢুকাইয়া উদ্ধার করিবার জন্য যেমন খেলুড়ের মনে কতকটা আতঙ্ক ও চিন্তার ভাব থাকে, আমাদের ভিতর অনেকেই সেই মন লইয়া বিরাট মালের-ধাঁধার ভিতর আপনাপন কড়ি খুঁজিতে লাগিলেন। কাজ ত' সবই শৃঙ্খলার সহিত হইতেছিল—তবে হারাইবার ভয় কি? কিন্তু পোড়া মন ত' মানে না। গল্পের রাক্ষসীর প্রাণ অনেক সময় একটী ছোট মাছের পেটের ভিতর থাকে, আমাদের অবস্থাও তাই। যাঁহার চোখের সমক্ষে হঠাৎ নিজের জিনিষটী পুরাপুরি কিম্বা তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ গাড়ীর ভিতর হইতে উঁকি

দিল, তিনি তুষ্টি পাইলেন। আমার একটী ছোট বিছানা ছিল; সেটীর জন্য ভাবনা কিছুমাত্র হয় নাই। ভাবনা ছিল ষোল আনার উপর সতের আনা 'ব্যাঙের আধুলি' একটী ছোট হাত-সই সুটকেসের জন্য—আনকোরা, নূতন কিনিয়া সঙ্গে লইয়াছি—বড় সখের জিনিষ। অকস্মাৎ তাহার দেখা পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি শান্ত।

বাকি আমরা সকল গাড়ী লইলাম না। হাঁটিয়া গন্তব্য স্থান—ভক্তবীর ৺সুরেশ্বর সেন মহাশয়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। তখন বিকালবেলা,—রৌদ্রের তেজ কমিয়া গিয়াছে। পল্লীর খোলা, বিস্তৃত মাঠ—ফুর্‌ফুরে হাওয়া—যতদূর চোখ চলে কেবল শ্যামল তৃণভূমি, শস্যক্ষেত্র,—আর পল্লীর প্রহরীস্বরূপ লম্বা লম্বা বৃক্ষরাজি। সকলেই পরম আনন্দের সহিত হাঁটিলেন।

বিষ্ণুপুর খুব পুরাতন সহর। হিন্দু আমলে ইহার কি নামরূপ ছিল এবং কতদূর সমৃদ্ধি-প্রসিদ্ধি ছিল সঠিক জানি না। কেহ কেহ ইহাকে শৌর্য্য-বীর্য্য-সাহসিকতার লীলাস্থল 'মল্লভূমি' বলিয়া অনুমান করেন। মহাভারতের মল্ল, বৌদ্ধসাহিত্যের মল্ল প্রসিদ্ধ। পশ্চিম-রাঢ়ের এই মল্লেরা তাঁহাদেরই একটী শাখা হইলেও হইতে পারে। প্লিনির Mandie ও Malli, টলেমির Mandalai, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের 'মাল' দেশ—সবই এই বিষ্ণুপুর-মল্লভূমিকে বুঝাইতেছে—ইহাও তাঁহারা বলেন। যাহা হউক, শ্রীকান্যকুব্জাধিপতি মহারাজা হর্ষের পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের এই মল্লদের বিশেষ খ্যাতি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। হর্ষের একাধিপত্য বিনষ্ট হইবার পরই বিষ্ণুপুরের আদিমল্ল বা প্রথম রাজা রণচাতুর্য্য দেখাইয়া স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু পাঠান ও মোগল আমলে ইহা যে প্রতাপশালী হিন্দু-জায়গীরদারের শাসনেই ছিল সে বিষয় নিঃসন্দেহ। এখানে পথে বড় একটা মুসলমান চোখে পড়িল না। মধ্যযুগে মুসলমান উপরওয়ালা হইলেও হিন্দু আধিপত্যের ব্যত্যয় ঘটে নাই,—অব্যাহত ছিল। তাই হিন্দু-আবহাওয়া ও হিন্দু-স্মৃতি বিষ্ণুপুরের প্রতি ধূলিকণা, তড়াগ-পুষ্করিণী, নদ-নদী, গড়-নালায় ও বিশেষতঃ দেবদেবীর বহুসংখ্যক ছোট-বড় মন্দিরের শিল্প ভাস্কর্য্যে ও মন্দির-গাত্রে

খোদিত লেখমালায় পাওয়া যায়। রাস্তাগুলি বেশ পাকা-পোক্ত—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আমরা প্রায় ত্রিশজন পরস্পরে গল্পগুজব করিতে করিতে চলিতেছি। নানাবিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্থানীয় দ্রষ্টব্য বিষয় কি কি, আমাদের আসল-স্থানে যাইবার পথ কেমন, যান কি, সুরেশ্বর বাবুর বাড়ী কতক্ষণ পরে পৌঁছিব,—তথা হইতে কয় ঘটিকার সময় রওনা হইব—ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—আমরা ক্রমে ক্রমে স্থানীয় পুলিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ইত্যাদি পার হইলাম। দুইটী দল হইল। একদল মৃন্ময়ী দেবী, বাঙ্গালী-বীরের কীর্ত্তিধ্বজা দল-মাদল নামক বিখ্যাত বৃহৎ কামান, স্বচ্ছতোয়া সুবৃহৎ মনোলোভা লাল-বাঁধ নামক পুষ্করিণী, আত্মরক্ষার্থ গড়-পরিখা ইত্যাদির কঙ্কালগুলি দেখিবার জন্য স্থানীয় একজন ভদ্রলোকের নেতৃত্বে চলিলেন। আমাদের অফিসার-ইন-চার্জ যাঁহারা তাঁহারা বলিলেন—আমরা যেরূপ মন্থর পদক্ষেপে হেলিতে দুলিতে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিতেছি তাহার ফলে গিয়া দেখিব, আচার্য্যের গাড়ী বহুক্ষণ স্থানে পৌঁছিয়াছে, অতএব আমাদের শীঘ্র পৌঁছান দরকার,—নতুবা অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র তিনি পাইবেন না। সুতরাং দলমাদলাদি দর্শনলালসা পরিত্যাগ করিয়া আমরা ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সুরেশ্বর বাবুর আশ্রমে পৌঁছিলাম। অন্যান্য গাড়ীর যাত্রীরা ইতিপূর্ব্বে পৌঁছিয়াছেন।

গাঁয়ের বাড়ী যেরূপ সাধারণতঃ হইয়া থাকে, ইহাও সেই ঢাঁচে নির্ম্মিত। ঘরগুলি পরিষ্কার নিকোনো, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। মাটীর দেওয়াল, খড়ের ছাদ। বাড়ী বাহির ও ভিতর—দুই মহলে বিভক্ত বলিয়াই বোধ হইল। পশ্চিমাস্য সদর-দরজায় প্রবেশ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই একটী ছোট উঠান—তাহাতে কয়েকটী ফুলের গাছ। ডান দিকে দোতলা মাঠ-কোটা। ছোট সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উপরে যে ঘরে শ্রীশ্রীমা দেশে যাইবার-পথে বিশ্রাম করিতেন তাহা দর্শন করিলাম। এইঘরে জগজ্জননী ছিলেন, সুতরাং উহা পরম পবিত্র—ভক্তের চক্ষে উহার প্রতিধূলিকণা তীর্থরেণু। পরিবারস্থ কেহই সে

ঘর ব্যবহার করেন না—কার্য্যতঃ উহাই বাড়ীর ঠাকুরঘর। শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমার আলেখ্য দুই-একটী পুষ্পে সুশোভিত, ধূপধূনার গন্ধে গৃহ আমোদিত—মেজেটী পাকা, খুব পরিষ্কার। সেই ছোট ঘরখানিতে পাঁচটী জানালা, পাঁচটী কুলুঙ্গী। পছন্দসই—বড় চমৎকার। দেবদর্শনে সকলেই প্রীত হইলাম।

আচার্য্য বন্ধু-ভক্তশিষ্য পরিবৃত হইয়া প্রাঙ্গণে বিরাজিত। বাহিরে আমরা সকলে একাণে বৈঠকখানা ঘরখানির কেহ কেহ ভিতরে ও বাদবাকী অধিক সংখ্যক দাওয়ার উপরে ও বাটীর সাম্‌নের খোলা জায়গাটুকুতে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভক্তসমাগমে বাস্তুদেবতা জাগিয়া উঠিলেন—অত ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পাইয়া মা'ও বুঝি অলক্ষ্যে আনন্দের হাসি হাসিলেন। আমাদের ভিতর যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাতৃ-দেবীর সহিত এখানে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন—মায়ের আগমন-সংবাদ পৌঁছাইবামাত্র ভক্ত সুরেশ্বরবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। আমরা আসিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। জগজ্জননীকে আবাহন-অর্চ্চনা করিবার জন্য গৃহদ্বারে দুইটী মঙ্গলকলস বসিত—বাটীর সম্মুখভাগ আম্রশাখার লতা-বিতানে বেষ্টিত-সজ্জিত হইত,—প্রাঙ্গণে নহবত বসিত—ভিতরে পুরঙ্গনাগণ শঙ্খরোলে গগন মাতাইতেন—আর সর্ব্বোপরি, স্বয়ং গৃহস্বামী কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীকৃতবাসে সকলের সুখসাচ্ছন্দ্যবিধানে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন।

সে রজনীতে সুরেশ্বরবাবুর উপযুক্ত কনিষ্ঠভ্রাতা পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র-দিগের আদর-আপ্যায়ন, সহৃদয়-অভ্যর্থনা, বিনয়নম্র-ব্যবহারে অতীতের সেই অস্ফুটছবিই আমাদের চোখের সমক্ষে ভাসিতে লাগিল। তাঁহারা সে ধারা সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। সেবকগণ পরমসৌজন্যে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে বসিবার স্থান দিলেন, সরবৎ দিলেন,—আর আমাদের পরমপ্রিয় চা দিলেন। প্রাণ জুড়াইল, শ্রান্তি দূর হইল।

তখনও আঁধার হইবার কিছু বাকি ছিল। স্থানীয় একটী ছেলের সাহচর্য্যে আমরা তিনজন নিকটবর্ত্তী দুই-একটী মন্দিরাদি 'ঝাঁকি-দর্শন'

করিতে গেলাম। কারণ হাতে কিছু সময় ছিল। মিনিট দশ হাঁটিবার পর—সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত, পরিখামেখলা, শত্রুকবল হইতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, দুর্গবহুল, প্রাচীন সহর আরম্ভ হইল। সবই ভগ্নদশাগ্রস্ত—পরিত্যক্ত। পুরাতাত্ত্বিক ভিন্ন অপর কেহ সেখানে যাইলে গা ছম্-ছম্ করিবে। সঙ্গী বলিলেন, স্বাধীনযুগে অধুনা শুষ্ক এই খালগুলিতে সর্ব্বদা সশস্ত্র সৈন্যসহ কয়েকখানি নৌকা প্রস্তুত থাকিত, শুনা যায়। বিশ্বাস হইল।

বিষ্ণুপুরের রাণীর পুরাতন ভগ্ন-জীর্ণ বাটী দেখিলাম। তাহারপর কিছু-দূর অগ্রসর হইলে গোধূলির আঁধারে-আলোতে—অসুরদলনী, লক্ষ্মী-সরস্বতী কার্ত্তিক-গণেশ পরিবৃতা দশভূজা দুর্গা দেখা দিলেন। মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বৎসরে একবারমাত্র শারদীয় পূজাকালে হইয়া থাকে—নিত্যসেবার কোন ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গলা শ্মশান—ছেলেরা শক্তিহীন। ধূলা-ঝুল-বালিতে মায়ের ও দেওয়ালে-বসান ছেলে-মেয়েদের মুখমণ্ডল ও সমস্ত শরীর পরিপূর্ণ। বিগ্রহের পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটী সুড়ঙ্গ বিশেষ রহিয়াছে। দেখিবার ঔৎসুক্য হইল। সঙ্গী বিরত করিলেন—বলিলেন, আমাদের এখানকার সবার বিশ্বাস পিছনে যে যাইবে, তাহার মৃত্যু আশু-সন্নিকট। সম্বৎসরে একবার মাত্র পূজার সময় কুমার মহাশয়ের বিগ্রহ মার্জ্জনাদি করিতে উহার ভিতর যাইবার অনুমতি আছে। যাহা হউক, তাহার পর অপর দুই-একটী মন্দির (সঙ্গী বলিলেন, বিষ্ণুবিগ্রহ) বাহির হইতে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইলাম—তালাচাবি দেওয়া।

শেষে পাশাপাশি, মেশামেশি একত্র-নির্ম্মিত জোড়বাংগান নামক মন্দিরে লইয়া গেলেন। বিগ্রহের ঘরে তালা আঁটা। সেবায়েতদের তরফ হইতে বা রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হইতে—কে বলিবে? মন্দিরের উপরে উঠিবার সিঁড়ি ছিল। অগ্রসর হওয়া গেল। ঘন-অন্ধকার—পা ঘসিতে ঘসিতে দেওয়ালের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি সন্তর্পণে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সঙ্গে দিয়াকাটী থাকিলে খুবই সহায় হইত। যাহা হউক ঠেলা ঠেলি করিয়া উপরে উঠিয়া—মুগ্ধ হইলাম। মন্দিরের সেই উচ্চস্থানের উপর

রাজার সান্ধ্যবায়ুসেবনের উপযুক্ত একটী চত্বর নির্ম্মিত রহিয়াছে। মনোরম স্থান—ঝির্-ঝিরে হাওয়া বহিতে লাগিল। চারিদিকের খোলা দৃশ্য সমস্ত চোখের সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল সঙ্গে বাইনকিউলার থাকিলে বোধ হয় দলমাদল ঐ টঙ্ হইতে দেখা যাইত। দূরে এক জলপরিপূর্ণ হ্রদ দেখা গেল—সঙ্গী বলিলেন উহাই 'কিষ্ট' বাঁধ। কুতুব-মিনারে চড়িয়া দিল্লী দেখা বা মনুমেণ্টে চাপিয়া কলিকাতা দেখার মতই হইল।

যাহা হউক, প্রকারান্তরে বিষ্ণুপুরের সমস্ত দৃশ্য দেখিলাম, মনে এই সান্ত্বনামাত্র রহিল। অল্পসময়ের ভিতর যতদূর দেখা সম্ভব তাহার চূড়ান্ত হইল। সর্ব্বশেষে দুর্গের প্রধান ফটকের সমক্ষে একটী উঁচু টিপির উপর দলমাদলেরই যেন পুত্রস্থানীয়, একজোড়া ছোট কামানও পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল। আমরা শীঘ্রই ফিরতি-পথ লইলাম।

এককালে পুরাণ-উপপুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতাদি অমূল্যকাব্যগুলি আমাদের মতই বাঙ্গালা-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রক্তের সহিত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বাঙ্গলার নরনারীকে ঋষির আদর্শেই যে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার অকাট্য নিদর্শন বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে আজও ভূরি ভূরি মিলিবে। দেবস্থানগুলির অধিকাংশ ঘটনা বাঙ্গলার শিল্পী পাথরে,—ইষ্টকফলকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভাবসম্পদে ভরপূর ছিল, তাই তাঁহার রূপ-সাধনাও সফল হইয়াছে। আমরা তক্ষশিলা, বারাণসী, অমরাবতী, তাঞ্জোর, মথুরা, কাঞ্চী প্রভৃতি সকল স্থানে বিশেষ বিশেষ মন্দিরশিল্পের ধারা পাইয়াছি। ইহাদের ভিতর প্রত্যেকটী স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যময়। বিষ্ণুপুর মন্দিরশিল্পও তাই—উহা বাঙ্গালীর নিজস্ব শিল্প-সৌন্দর্য্যবোধ ও কবিত্ব-ভাবুকতার জাজ্বল্য প্রমাণ। বাঙ্গলার প্রাণের একটী দিক পাষাণে ধরা রহিয়াছে। রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তরফ হইতে ইস্তাহার প্রায় প্রত্যেক মন্দিরের সামনে লাগান রহিয়াছে। মর্ম্ম এই যে—কেহ যেন অমূল্য পুরাতত্ত্বে পরিপূর্ণ মন্দিরের পছন্দসই কোন অংশ পকেটস্থ না করেন—ধরা পড়িলে দণ্ডের ব্যবস্থা সঙ্গে

সঙ্গ হইবে। শুনিতে পাই দেবদেবীর মূর্ত্তি-অঙ্কিত হিন্দুমন্দিরের ইষ্টকাদি লইয়া অনেক মুসলমান গম্বুজ, মিণার, মসজেদ, দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। সে সময় এরূপ কড়া আইন থাকিলে হয়ত বা অনেক পুরাতন হিন্দুকীর্ত্তির বাস্তব-প্রমাণ আজিও বজায় থাকিত, সন্দেহ নাই।

মন্দিরশিল্পাদি ভিন্ন অপর এক ক্ষেত্রেও বিষ্ণুপুর বিখ্যাত। আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সে তাহার যন্ত্র ও সুর-সাধনা সমানে চালাইয়া আসিয়াছে। 'গৌড়ার বাণী'র একটী বিশেষ ঢোল, ধারা, ঠাট, ঢঙ, চাল—বিষ্ণুপুরে মিলে। বড় বড় ওস্তাদ পূর্ব্বে এবং এখনও এখানে জন্মেছেন। আমাদের ভিতর 'গোপালের ব্যাগার' বলিয়া যে কথাটী প্রচলিত তাহারও উদ্ভব নাকি এইখানেই। গল্পে বলে, বিষ্ণুপুরের এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন, তিনি নাকি নিজে মারোপট করিয়া প্রজাদের প্রত্যেককে প্রত্যহ শ্রীগোপালের নাম জপ করাইতেন। এই বিষ্ণুপুরেরই 'মদনমোহন' কালচক্রে স্থানচ্যুত হইয়া অধুনা কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে অবস্থান করিতেছেন।

সুরেশ্বর বাবুর বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। তাহার পর ঘণ্টা দুই আমরা কথাবার্ত্তা, গল্পগুজবে কাটাইলাম। ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতরে অতিথি-সৎকারের পুরাদস্তুর ব্যবস্থা চলিতেছে, রন্ধনাদি আরম্ভ ও প্রায় শেষ হইয়াছে। গৃহস্বামীরা বিনয়ে বলিলেন—'কিছু না—সামান্য ঝোলভাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি আপনাদের আবার কোয়ালপাড়ায় রওনা হ'তে হবে কি না।'

আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় [illegible] এক এক করিয়া সারি দিয়া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন অতএব বেশ বড়ই হইল—উঠানে কুলাইল না—একটা ঘরও লইতে হইল। বাড়ীর প্রাঙ্গণ আজ রাত্রে জম-জমাট হইয়া উঠিল—হাসির 'গব্‌রা'—আনন্দের তুফান,—প্রসাদ বিতরণ পুরাদমে চলিতে লাগিল। পাড়ার আশ-পাশ হইতে মা ও মেয়ে, পিতা-পুত্র, স্বামী স্ত্রী দলে দলে আসিতে লাগিলেন—আচার্য্যকে একটীবার দেখিবার তাঁহাদের কি সাগ্রহ-উৎকণ্ঠা! বাড়ীর ছোট ছেলে-মেয়েরা বিস্ফারিত, স্তিমিত নেত্রে সেই বিরাট-পংক্তির একধার

হইতে অপরধার কেবল দেখিতে লাগিল, কেহ কেহ মা'র কোলে ঘুমাইয়া-ছিল, জাগিয়া বুঝি ভাবিল—আচ্ছা, এত মানুষ কোথা থেকে এল ? এরা কা'রা ?—কে বলিবে,—কা'রা এরা ?

পদের পর পদ আসিতে লাগিল—শেষ আর হয় না। সুন্দর-সুগন্ধ কামিনী চালের ভাত, সুক্ত, শাক, ভাজা, চর্চ্চড়ী, চমৎকার কলাইএর ডাল, মাছভাজা, মাছের কালিয়া, টক, দধি, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হরেক রকমের মিষ্টান্ন ইত্যাদি। গৃহস্বামীর ভাষায় 'ঝোলভাত খাওয়া'—শেষ হইল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর যাবার জোগাড় হইতে লাগিল। আমাদের জন্য ২৪ খানি গরুর গাড়ী প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আচার্য্যকে সাচ্ছন্দ্যে লইয়া যাইবার জন্য বাঁকুড়ার সাধুবৃন্দ একখানি ফোর্ডমার্কা 'হাওয়াগাড়ী' বিষ্ণুপুরে হাজির করিয়াছিলেন। স্থির হইল, আচার্য্য রাত্রিটা সেইখানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতে ঐ দ্রুতযান-যোগে আমাদের এই পথের পরবর্ত্তী বিশ্রামাগার—কোয়ালপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণমঠে আমাদের আগেই সোমবার সকালে পৌঁছিবেন। কারণ গরুর গাড়ীর গজগতি কলেরগাড়ীর সহিত কোনকালেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, ইহা সকলেই জানিতেন। যাহা হউক, মালপত্র সব বোঝাই হইলে আমরা সেনজা মহাশয়দিগের নিকট বিদায় লইয়া একে একে গাড়ীতে উঠিলাম। প্রথমে তিনখানি গাড়ী মালঠাসা করিয়া এক একজন যাত্রী সহ, প্রস্তুত করা হইল। বাকি প্রত্যেক গাড়ীতেই কিছু কিছু মাল দেওয়া হইল—গড়ে দুইজন করিয়াই লোক চাপিল। কোন কোন গাড়ীতে তিনজনও ছিলেন। বাঁকুড়ার সাধুভক্তদের আচার্য্যকে লইয়া যাইবার জন্য হাওয়াগাড়ীর সুন্দর বন্দোবস্তে আমরা সকলেই মনে মনে বিশেষ খুসী হইলাম। গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে তাঁহার কষ্ট হওয়ারই কথা।

শ্রীসুব্রহ্মণ্য।

"সংসার"।

(১)

(শ্রীমতী নীহারিকা দেবী)

কে তুমি আমার ?

করুণে পুরাণ প্রশ্ন জাগিছে আবার

কে তুমি আমার ?—

তুমি অধরের হাসি অফুরন্ত সুখরাশি

অথবা উছল অশ্রু রুদ্ধ বেদনার ?—

কি তুমি আমার !

তুমি কি কণ্ঠের ভাষা

অন্তরের ভালবাসা

আশা কি নিরাশা কিম্বা ভরসা অপার !

কে তুমি আমার বঁধু জানিতে বাসনা,

জন্ম কি মরণ তুমি— স্বর্গ কি মরত ভূমি,—

মহা শোক কিম্বা তুমি অনন্ত সান্ত্বনা।

তুমি কি আমার বঁধু হৃদয়ের হার !

হেম মণিময় ভূষা, তুমি কি আমার উষা

—জ্যোতির্ম্ময়ী ? কিম্বা নিশা চির অন্ধকার ?

তুমি কি আমার বঁধু নয়নের তারা,

তুমি মন কিম্বা প্রাণ তুমি বুদ্ধি কিম্বা জ্ঞান

ধমনীতে বহমান্ শোণিতের ধারা ?

তুমি কি আমার বঁধু

আঁধারের আলো !

চির পিপাসার বারি,

বুঝিতে যে নাহি পারি,

বাস কি না বাস তুমি এ দাসীরে ভালো।

কে তুমি আমার কহ আছ কিম্বা নাই

সম্বন্ধ তোমার সনে, এত স্নেহ কি কারণে

টানিতেছ তুমি মোর ভগিনী কি ভাই ?

অথবা মমতামাখা মায়ের অঞ্চল,

অচ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধ হৃদয়ের চিরানন্দ

নন্দন কি তুমি মোর প্রণয় বৎসল ?

কিম্বা পথপ্রদর্শক গুরু তুমি মম ?

হে চির কল্যাণকামি, তুমি প্রভু, তুমি স্বামী

হে আমার চির প্রিয় ! চির প্রিয়তম।

কে তুমি আমার বঁধু চির সহৃদয়

সুখে দুখে নিয়ে ভাগ

ঘুচাতে মনের দাগ

চিরাগ্রহে আছ চির সচেষ্ট সদয়।

—অনামা কি তুমি ? কিম্বা ধর কোন নাম ?

তুমি কি শাশ্বত শান্তি ? অথবা শুধুই ভ্রান্তি ?

অশরীরী ? কিম্বা অতি সুরূপ সুঠাম ?

তুমি কি ইষ্টের সম শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ

কিম্বা চির প্রার্থনীয় ? তুমিই আমার প্রিয়

একাধারে পূজা পূজ্য, পূজক প্রসাদ।

কে তুমি আমার

কর প্রশ্নের নির্ণয়

রহিও না সুনীরবে

কে তুমি আমার ভবে

সার সর্ব্বস্ব ধন ? কিম্বা কেহ নয় ?

কাশ্মীরে অমরনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

ইহা নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর—ফল-বৃক্ষে পূর্ণ এবং ইহার সর্ব্বত্র ঘন শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত; পুষ্প বৃক্ষগুলি বিচিত্রবর্ণ অগণিত পুষ্পগুচ্ছ মস্তকে ধারণ করিয়া সমস্ত বাগানটীকে যেন স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে; বাগানের মধ্য দিয়া কৃত্রিম জল প্রণালী রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অসংখ্য ফোয়ারা বিরাজ করিতেছে। বাগানের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যে খানে একটু শৃঙ্খলার অভাব লক্ষিত হয়। নিশিমবাগ আকবর কৃত; ইহা শালিমার বাগ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট, এবং ৩।৪ স্তবকে বিভক্ত। তদ্ভিঃ বৃক্ষাদির বিন্যাস সম্বন্ধে ইহা প্রায় পূর্ব্বোক্ত বাগানের অনুরূপ। পরীমহল,—সাজাহান পুত্র দারাসেকো নির্ম্মিত। ইহা এক সময় পরীমহলই ছিল, কিন্তু এখন ইহার ভগ্নাবস্থা। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি যে, শালিমার রবিবারে দর্শন করা উচিত; কারণ ঐ দিন সমস্ত ফোয়ারা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় নরনারীগণ এখানে আসিয়া নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তখন সৌন্দর্য্যের এক মহামেলা বসিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে পথের কথা বলিয়াছি তাহার পার্শ্বে এক পর্ব্বতের ধারে চশমাশাহী নামে একটী সুন্দর ঝরণা আছে; উহার জল নাকি অগ্নিমান্দ্যের পরম ঔষধ। উহার উপর এক সুন্দর হর্ম্ম্য শোভা পাইতেছে। জলের পূর্ব্বাংশে ভাসমান শস্য-ক্ষেত্র সকল বিরাজ করিতেছে। ঐ গুলি নৌকায় বাঁধিয়া যেথানে সেখানে টানিয়া লইয়া যাওয়া যায়। এইসব ক্ষেত্রে বিলাতি বেগুণ, তরমুজ ও অন্য দু একটী আনাজ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

শ্রীনগর সহর মধ্যে বিতস্তার উপর ৭টী পোল আছে; পোলকে এখানে "কদল" বলে। এ গুলি পাথর ও পাইল (দেবদারু) কাঠে নির্ম্মিত। নৌকা চলাচলের জন্য ঐ গুলির মধ্য দিয়া ফাঁক আছে। শ্রীনগরের মধ্য দিয়া (বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়) নৌকা করিয়া বিতস্তায় বেড়ান এক কদর্য্য ব্যাপার; কারণ ঐ সময় স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা উলঙ্গ হইয়া নদীতে স্নান করে; তীরের দিকে চাহিবার জো থাকে না। ঐই লজ্জাস্কর প্রথা কেন যে এখানে প্রচলিত তাহা বুঝিলাম না। পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে এই প্রথা আছে বটে, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। বিতস্তার যে অংশ সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা তাহা অত্যন্ত অপরিস্কার এবং উভয় তীরের নিকটস্থ জল অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। ইহার কারণ এই যে আমাদের দেশে নদীর ধারে যেমন মাঝে মাঝে ভাঙ্গন ঘটে এখানে সেরূপ না হওয়াতে তটের উপরেই ঘর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বাড়ীর যাবতীয় আবর্জ্জনা এই নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সহর মধ্যে পয়ঃ প্রণালীর সুব্যবস্থা না থাকাতে এই কদাকার রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। এখানকার বিশালকায় চিনার বৃক্ষ গুলি দেখিবার জিনিষ। গ্রীষ্মের সময় ইহার ছায়ায় বসিয়া অনেকে আনন্দ উপভোগ করে! ইহা এদেশের বৃক্ষ নহে। মোগলগণ পারস্য হইতে ইহা এখানে আনেন।

দেখিতে দেখিতে ৩০শে জুলাই (সপ্তমী তিথি) আসিয়া পড়িল। রাত্রে মহারাজের লোকজন আসিয়া যাত্রার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি স্বামিজীকে দিয়া যাইলেন। অতঃপর স্থির হইল যে পরদিন আমি দুইখানি টঙ্গায় ঐ সমস্ত দ্রব্য, আমাদের বিছানা পত্রাদি, ২টি তাঁবু এবং একখানি ডাণ্ডি বোঝাই করিয়া মটন যাত্রা করিব এবং ঐ দিন পাণ্ডার বাড়ী থাকিয়া প্রভাতে সরকারী আফিস হইতে আবশ্যক মত কুলী ও ঘোড়া লইয়া প্রথম পড়াও (চটী) যাইব; আর স্বামিজী এবং ব্রহ্মচারী ১লা আগষ্ট মোটরে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবেন। যথা বন্দোবস্ত আমি অষ্টমীর দিন মাল পত্রাদি লইয়া বেলা ১০ টার পর মটন যাত্রা করি।

অমরনাথ শ্রীনগরের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত; এখন আমাদের ক্রমশঃ ঐ মুখেই যাইতে হইবে। শ্রীনগর হইতে খানাবল ৩৫ মাইল এবং তথা হইতে মটন ৫ মাইল। খানাবল অবধি বিতস্তার ধারে ধারে পথ; তাহার পর নদী অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই জন্য খানাবল অবধি নৌকায় যাওয়া যায় নৌকায় যাওয়া খুব সস্তা ও আরাম জনক, কিন্তু অনেক সময় লাগে—প্রায় দুই দিন; কারণ উজান বাহিয়া যাইতে হয়। টঙ্গায় ৪।৫ ঘণ্টায় পৌছায়। পথে আসিতে আসিতে পদ্মপুর নামক স্থান (বর্ত্তমান নাম পামপুর) পড়ে। পদ্ম নামে এক রাজা ইহার নির্ম্মাতা। এখন কেবল ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপ সমূহে ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতেছে। এই খানেই কেশর বা জাফ্রাণের জন্ম। যখন কেশর ফুটতে থাকে তখন চারিদিক সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠে। বহুলোক সেই সময় কেশর ক্ষেত্রের শোভা দেখিতে আসে। কাশ্মিরী হিন্দুগণ কেশরের টিপ পরে এবং এই টিপ দ্বারাই উহাদিগকে মুসলমান হইতে চিনিয়া লওয়া যায়। ভাল কেশরের দাম এখানেই ২৲।২॥০ টাকা—ভরি। খানাবল হইতে একটু অগ্রসর হইলে অনন্তনাগ নামক একটী উৎস। উহা একটী বিস্তৃত কুণ্ড মধ্যে অবস্থিত এবং উহার জল খুব পরিষ্কার। ইহার অদূরে ক্ষীরভবানীর সহিত সংযুক্ত একটী উৎস মন্দির মধ্যে রহিয়াছে; ব্রাহ্মণগণ এখানে বসিয়া চণ্ডী পাঠ করিতেছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মটনে পৌছিলাম এবং পাণ্ডাঠাকুরের বাটী মাল পত্র রাখিয়া রাজসরকারের আফিস, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ ডিপার্ট-মেণ্টে গেলাম। এই আফিস পাণ্ডার বাটী হইতে প্রায় পোয়াটাক দূরে একটী মাঠের মধ্যে বসিয়াছে। এই আফিস যাত্রিগণকে ঘোড়া, কুলী, ঝাঁপান প্রভৃতির সরবরাহ করিয়া থাকে। যাত্রিগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই আফিস তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অমর নাথ অবধি যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি এই ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে থাকে। রুগ্ন যাত্রীকে ইহারা ঔষধ দেয়, অশক্ত যাত্রীকে ঘোড়ায় বা কাণ্ডিতে (এক প্রকার ঝাঁকা বিশেষ) করিয়া মটনে পাঠাইয়া দেয় এবং সাধুগণকে আবশ্যকীয় আহার্য্য বিতরণ করে। আমি

আফিসের কর্ত্তার সহিত দেখা করিতেই তিনি বলিলেন অভেদানন্দজীর যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সরবরাহ করিবার আদেশ তিনি ইতিপূর্ব্বেই Revenue Department হইতে পাইয়াছেন। অতএব আমাকে আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। আমি জানাইলাম যে আমাদের ৪টী বোঝা বহিবার ঘোড়া, ২টী চড়িবার ঘোড়া, ৮ জন কুলী এবং একটী পাচক ব্রাহ্মণ আবশ্যক। তিনি বলিলেন পরদিন সকাল বেলা সব প্রস্তুত থাকিবে। এই স্থির করিয়া আমি পাণ্ডার বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম ও আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

যাত্রার সময় কখন কখন বৃষ্টি ও তৎসহ বরফপাত হয়। এইরূপ ঘটিলে যাত্রীদের আর কষ্টের অবধি থাকে না। পথ অত্যন্ত পিছিল হয়, বস্ত্রাদি ভিজিয়া যায় এবং দারুণ শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। সন্ন্যাসী এবং গরীব যাত্রী অনেকেই মারা পড়ে। আমাদের যাত্রার পূর্ব্ব দুই এক দিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে ছিল এবং একটু আধটু বৃষ্টিও পড়িতেছিল; শ্রীনগর হইতে বাহির হইবার দিন সমস্তক্ষণই আকাশ মেঘাবৃত ছিল এবং টিপ টিপ বৃষ্টিও পড়িতেছিল। এই দেখিয়া প্রাণে বড় ভয় হইয়াছিল এবং এক এক বার মনে হইয়াছিল আর অমরনাথ দর্শনে গিয়া কাজ নাই। কারণ সকলেই বলিতে লাগিল এবারও বোধ হয় পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় দুর্যোগ হইবে। কিন্তু অমরনাথের অশেষ কৃপায় মটন হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত আমরা পথে বৃষ্টি পাই নাই বলিলেই হয়।

মটনের নাম মার্ত্তণ্ড, মচ্ছিভবন বা ভবন। ইহা একটী হিন্দু-প্রধান গণ্ডগ্রাম এবং এখানেই অমরনাথের পাণ্ডাগণের বাস। খাদ্য দ্রব্যাদি অনেক প্রকার এখানে মেলে। এখানে একটী অতি সুন্দর চশ্‌মা (উৎস) আছে। উহার জল ক্রমান্বয়ে একটী ছোট কুণ্ড ও তন্নিকটস্থ একটী বড় কুণ্ডকে পূর্ণ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কুণ্ডদ্বয় কাল প্রস্তর দ্বারা তলদেশ পর্য্যন্ত বাঁধান। আকবর বাদশা নাকি ইহাদের বাঁধাইয়া দেন। জল অতিশয় নির্ম্মল, এবং উহার এক গুণ এই যে উহা শীত কালে গরম এবং গ্রীষ্ম কালে শীতল থাকে। বড় কুণ্ডটী অন্যূন ৮ হাত গভীর এবং অসংখ্য মৎস্য উহাতে খেলা করিতেছে; কিছু খাবার

দিলে দলে দলে আসিয়া কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। স্থানীয় লোকেরা এই কুণ্ডকে অতি পবিত্র মনে করে এবং ইহাতে পিতৃপুরুষের পিণ্ডাদি দান করে। ছোট কুণ্ডটীর এক ধারে সূর্য্যমন্দির। এই খানে কয়েকটী বড় বড় চিনার গাছ আছে; অনেক যাত্রী ইহাদের তলে আশ্রয় লয়। গ্রামের অপর প্রান্তে প্রায় শত ফিট উচ্চ এক ভূমিখণ্ডের উপর কাল প্রস্তর নির্ম্মিত এক বৃহৎ ভগ্ন মন্দির আছে। ইহাই নাকি প্রাচীন সূর্য্য-মন্দির; এক প্রবাদ এইরূপ যে এই খানে সূর্য্যদেবের জন্ম হয়, আর ঐ কারণেই এই গ্রামের নাম মার্ত্তণ্ড বা মটন হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইহাকে প্রাচীন ভাস্কর্য্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে গণ্য করিয়া থাকেন। ইহা মুসলমান আগমণের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত। (ক্রমশঃ)

সংসার।

(শ্রীঅজিতকুমার সরকার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনয় কলিকাতা চলিয়া যাইবার পর একদিন অপরাহ্নে বিনোদ ভট্টাচার্য্যের বৈঠকখানায় এক সভা বসিল। এই সভার প্রধান সভ্য হইলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পার্শ্বচর মাধব গাঙ্গুলি, রাখাল চক্রবর্ত্তী, বঙ্কুবিহারী সরকার এবং কিশোরীমোহন বাবুর জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভাই রসিকলাল ঘোষ প্রভৃতি। রসিকলাল প্রথমেই সভার উদ্বোধন কল্লে বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য দাদা! আপনি যদি এর প্রতিকার না করেন তবে আর মান মর্য্যাদাও থাকে না—জাতিধর্ম্মও থাকে না। ছিছি! এত ম্লেচ্ছগিরি কি কায়েত বামুনের সমাজে কখন হয়েছে না হতে পারে? সেদিন সন্ধ্যায়—" বাধাদিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"তাইত বল্‌ছি ভায়া! বলি এত অন্যায়, শাস্ত্র বহির্ভূত নীতি কি আর ভদ্র সমাজে চলে? যাঁরা হলেন সমাজের মুখ্যপাত্র তাঁদের অবস্থাই যদি

এই রকম হয়ে' দাঁড়ায় তবে যে একেবারেই সর্ব্বনাশ! নারায়ণ! হরি হে তোমারই ইচ্ছে!" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীরব হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাধব গাঙ্গুলি বলিলেন,—"আচ্ছা এর প্রতিকার কি হতে পারে না বলছেন? আগে মনে করেছিলাম নাপিত বামুন বন্ধ করে' আর বাড়ীর ঝি চাকর-গুলকে ছাড়িয়ে দিয়ে জব্দ করা যাবে; কিন্তু ছোট লোকজন তার যেমন বাধ্য হয়ে উঠেছে তাতে ওদিকে তেমন সুবিধা হবে বলে বোধ হয় না। ক্ষৌরি কর্ম্মে ত নাপিতের বড় আবশ্যক হয় না; তার পর ওরকম অনাচারী লোকের পুরোহিতেরই বা তেমন আবশ্যক কি?" রাখাল চক্রবর্ত্তী।—"আরে রেখে দাও তোমার বাধ্য! ও বেটাদের আবার কথা! যেখানে এক মুঠো খেতে পাবে কুকুরের মতন সেইখানেই দৌড়ে যাবে। ঐ দেখ্‌লে না নিমকহারাম কুঞ্জটার কাণ্ড! এতদিন ভট্টাচার্য্য দাদার বাড়ীতে খেয়ে মানুষ হয়ে, শেষে কিনা আবার কিশোরী ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে বুক্‌নি করতে আরম্ভ করলে। শুন্‌লাম দাতাকর্ণ নাকি একদিন তাকে চারটীখানি চাল আর আটগণ্ডা পয়সা দিয়েছিলেন"। ভট্টাচার্য্য—"দেখ্‌লে ভায়া কেমন মাহাত্ম্য! আমার এত বাকী বকেয়া, খাওয়া পরা সব ভস্মের তলে গেল আর ঐ আটগণ্ডা পয়সার দামই হল বেশী। কাল হে, ঘোর কলিকাল! ভয় নাই, এত অনাচার-অবিচার থাক্‌বে না। ভগবান স্বমুখে বলেছেন,—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম-ধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্॥" অর্থাৎ কিনা—(হে) ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃজন করি। এ কথা কি কখন মিথ্যা হয়? অধর্ম্মের বড় বাড়াবাড়ি! নতুবা কাল্‌কের ছেলেসব দুপাতা ইংরাজি পড়ে কি মালিক হতে যায়, না শূদ্রের এত বুদ্ধি হয়?" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু হতাশ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন।

তারণ মুখোপাধ্যায় একজন কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অনেকটা আধুনিক ধরণের, সংস্কৃতেও জ্ঞান আছে, তাহা ছাড়া শাস্ত্রালোচনা ও আধুনিক সমস্যার নানা ভাবের ধারণাও তাঁহার বেশ ছিল। এই সভায় তিনিও

উপস্থিত ছিলেন। বিনোদ ভট্টাচার্য্যের সুযুক্তিপূর্ণ তর্কের প্রতিবাদ করিতে পারে এমন আর সেখানে কেহ ছিলেন না,—ছিলেন একমাত্র তারণ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলিলেন—"কেন শূদ্রেরা এমন কি করেছে যেটাকে বৃদ্ধি বলা যেতে পারে? দোষ কি আমাদের নাই? আমাদেরও ত বাড়াবাড়ি কম দেখি না? আমাদের গুণ নাই, শক্তি নাই অথচ শূন্য পাত্রের গম্ভীর ধ্বনি বেশ আছে। আমাদের মধ্যে শুকদেব, কপিল বা গৌতম ত কাহাকেও দেখি না, কেবল দুর্ব্বাসার ক্রোধানলের রশ্মি-ছটাই অবশিষ্ট আছে। ঋষিত্ব ব্রাহ্মণত্ব নাই, কিন্তু তার উত্তরাধিকারিত্বের—দাবী যোলআনা আছে। সংযম সন্তোষের বদলে লোভের প্রচণ্ড প্রতিমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়েছে। লোকে মান্‌বে কেন? মানকি আর যেচে হয়?"

রাখাল চক্র—"এ কিরকম কথাটা হল"। আমরা না হয় মুনি ঋষিই নই তাই বলেকি ছোট লোকে মাথায় লাথি মার্‌বে নাকি? তোমার যা খুসি তাই কর্ত্তে পার, আমাদের এসব সহ্য হয় না।"

মাধব—"বলি ভায়ার আজকাল ঘোষ বাড়ীতে বেশ পশার জমেছে নাকি? তা ভাল! বামুনের ছেলে কোনরকমে—" "হাঁ কোনরকমে দিন গুজ্‌রান ত চাই। আপনাদের পরনিন্দায় পরচর্চ্চায় দিনটা যায়—আর আমার না হয় ঘোষবাড়ীতে পশার জমিয়েই যায়! তাতে এমন ক্ষতিই বা কি?" "নারায়ণ! হরি হে তুমি যা কর।" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"বৃথা দ্বন্দ্বে কাজ কি তারণ ভায়া! কিশোরী ঘোষ ছোটলোকের সঙ্গে কারবারই করুক আর ম্লেচ্ছগিরিই করুক তাতে আমদের বিশেষ কিছু যাবে আস্‌বে না। তবে একটা কথা কি জান—ব্রাহ্মণ চিরদিনই সনাতন হিন্দু সমাজকে রক্ষা ক'রে এসেছে। সমাজে কোন রকম অনাচার ঢুক্‌লে তাহাদিগকেই যে সব লক্ষ্য কর্‌তে হবে। চিরদিনই তাই হ'য়ে এসেছে। আজ না হয় বিদেশী রাজার আমলে ব্রাহ্মণ শূদ্র খিঁচুড়ি। তা যেখানে আমাদের হাত না চল্‌চে সেখানকার কথা যাক্‌গে। তাই বলেকি সমাজের মধ্যে যথেচ্চাচার চল্‌বে ও আমরা চুপ ক'রে থাকব? যে শূদ্র ব্রাহ্মণের পদসেবা কর্‌তে পেলে কৃতার্থ

হ'ত তারা কিনা আজ সমান আসনে বস্‌তে চায়, মুখের সাম্‌নে লম্বা লম্বা কথা বলে। আবার শাস্ত্র আওড়ায়। এসবকি আর সওয়া যায় তারণ! তুমি না হয় স্কুলে পণ্ডিতি করছ, কিশোরী ঘোষ স্কুলের সেক্রেটারী—তাই খাতির করবে। আমরা কেন তাকে গ্রাহ্য করব? বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গর্ব্বিতভাবে পার্শ্বচরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উহা দেখিয়া রাখাল চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন,—"নিশ্চয়ই একশো বার! আমরা কেন তাকে গ্রাহ্য করব? এর বিহিত করতেই হবে। এখনও বামুন শুদ্দুর পৃথক আছে, এখনও বামুন শালগ্রাম শিলার মাথায় ফুল তুলসী দিচ্ছে, একি হলেই হল! দশের লাঠি একের বোঝা! কি করতে পারে কিশোরী ঘোষ? বড়লোক আছে বিদ্বান আছে আপনার ঘরে আছে—আমাদের তাতে কি? এই কাল মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তখন দেখা যাবে ডোম চাঁড়াল কাজে লাগে না আমরা কাজে লাগি!" বঙ্কুবিহারী সরকার একটু গম্ভীরভাবে হাসিয়া বলিলেন,—"উনি কি বলেছেন তা শুনেছেন কি? বলেন যে—সমাজে যদি আমায় না থাকৃতে হয়, আমার মেয়ের যদি বিয়ে না হয়, এমন কি পৈতৃক ভিটে বিক্রী করে যদি দেশান্তরী হতে হয়—তা হলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ ভণ্ডদের দলে আমি কখনও মিশ্‌বনা।" সঙ্গে সঙ্গে মাধব গাঙ্গুলি বলিলেন,—"তা না পেয়ে বাঘে কাঁকড়া খায়। সমাজ ত ওঁকে নেবার জন্য কেঁদে মর্‌ছে। আর কিশোরী ঘোষের সমাজেরই বা দরকার কি? ও ত এক রকম বেম্মজ্ঞানী। দেখ না এত বড় মেয়েটা এখন পর্য্যন্ত একটু লজ্জা সরম নেই—মাষ্টারের কাছে লেখাপড়া কর্‌ছে, গান বাজনা কর্‌ছে—বিবাহের কোন নাম চিন্তেই নাই। বাপের ব্যবহার হল ছোটলোক নিয়ে—ছেলেমেয়েও তাই হল! তা ওদের সমাজ ত পৃথক আছেই, তার জন্যে আর ভাবনা কি!" ভট্টচার্য্য—"তা আমাদের সঙ্গে মিশ্‌তেই বা বল্‌ছে কে? কিশোরী ঘোষের সঙ্গে না মিশ্‌লে যে আমাদের দিন যাবে না এমন ত কিছু কথা নয়। তবে তারণ ভায়ার কথা স্বতন্ত্র। কি বল ভায়া?" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার তারণ মুখোপাধ্যায়ের দিকে

এবং পরক্ষণেই আবার পারিষদদিগের প্রতি বিদ্রূপসূচক কটাক্ষপাত করিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন—নিশ্চয়ই আমার কথা স্বতন্ত্র। আপনারা সকলে মিলে যদি একজন ভদ্রলোককে অকারণ উৎপীড়িত কর্‌তে ইচ্ছে করেন, সেই সঙ্গে কি আমিও যোগ দিব ভেবেছেন? কখনই না।"

আপনারা মনে রাখ্‌বেন ভগবান আইন করে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কাকেও শক্তির অধিকার দান করে যান নি। শক্তি সকলকেই অর্জ্জন করে নিতে হয়। যদি বিশ্বাস করেন—সহজেই বুঝ্‌তে পারবেন যে, এই শতাব্দীতে সেই কথা প্রমাণ করবার জন্যেই শূদ্রের মধ্যে লোক-শিক্ষকের আবির্ভাব হচ্ছে। যদি গীতা ভাগবতই মানেন তবে "সম্ভবামি যুগেযুগে" কথাটা মনে করুন। তাতে কেবল সাধু আর দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠাতাদের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র বলে কোন কথা নাই। তাঁর কাছে ব্রাহ্মণও যেমন শূদ্রও তেমনি কোন ভেদ নাই। আপনারা চান শূদ্র চিরদিনই আমাদের পায়ের নীচে পড়ে থাক তাই কি কেও থাকে? আপনারা যেমন নিজের স্বার্থ বজায় রাখ্‌তে চান তারাও ত তেমনি চায়? আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে বিদেশের রাজা আমাদের এই গোঁড়ামির হাত থেকে কতক পরিমাণে বাঁচিয়েছে। আমরা দেশের নীচ জাতিরা নীচ জাতিদের মনুষ্যত্বকেও চেপে মারতে চাই—তাই সকল বিষয়েই তাদের অনধিকারত্ব প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত। বল্‌তে গেলে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবেই তাদের সে দৃষ্টি খুল্‌তে আরম্ভ হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত সমাজেরই তাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই। এত বড় দেশটা কেবল জাতিবিশেষ নিয়ে নয়, এর মধ্যে ছোট বড় উচ্চ নীচ সবই আছে। সুতরাং যদি মঙ্গল চান, উন্নতি চান, সকলের জন্যই চাইতে হবে। নতুবা একটা অঙ্গ যদি পঙ্গু হয়ে নীচে পড়ে থাকে অন্য অঙ্গের উত্থান অসম্ভব। সেই অবশ অঙ্গের ভারে উত্থিত অঙ্গও যে অধোগামী হবে একথা নিশ্চিত।"

(ক্রমশঃ)

কথা-প্রসঙ্গ

কোনও পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে কুল-বধূগণের গৃহ চরিত্রাদর্শ কিরূপ ছিল।" ইহার উত্তরস্বরূপ আমরা গোভিল গৃহ্য সূত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধরিলেই উহা যথেষ্ট স্পষ্টকৃত হইবে।

ইমমশ্মান মারোহাশ্মমেব ত্বং স্থিরা ভব।

দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ॥ (২।২।৪)॥

"হে বধু! এই শিলাখণ্ডের উপর আরোহণ কর। এই শিলার ন্যায় তুমি পতিগৃহে দৃঢ় এবং অবিচলিতভাবে বাস কর।"

ইষে বিষ্ণু স্ত্বা নয়তু। উর্জ্জে বিষ্ণু স্ত্বা নয়তু। ব্রতায় বিষ্ণু স্ত্বা নয়তু। মায়ো ভবায় বিষ্ণু স্ত্বা নয়তু। পশুভ্যো বিষ্ণু স্ত্বা নয়তু। রায়পোষায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। সপ্তেভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণু স্ত্বা নয়তু। (২।২।১০)

"হে বধু! বিষ্ণু তোমাকে বহু অন্ন লাভের জন্য (পতিগৃহে) আনয়ন করুন; বিষ্ণু তোমাকে বলবৃদ্ধির নিমিত্ত আনয়ন করুন; বিষ্ণু তোমাকে ব্রতের নিমিত্ত আনয়ন করুন; বিষ্ণু তোমাকে সৌখ্যের নিমিত্ত আনয়ন করুন; (গৃহপালিত) পশু সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত আনয়ন করুন; সম্পত্তি পোষণের জন্য আনয়ন করুন; সপ্তঋত্বিগ্‌বিশিষ্ট যজ্ঞের নিমিত্ত আনয়ন করুন।"

সখা সপ্তপদী ভব, সখ্যং তে গমেয়ম্।

সখ্যং তে মা যোষাঃ সখ্যং তে মা যোষ্ট্যাঃ॥ (ঐ)

"হে বধু, তুমি আমার চির সহচারিণী হও, আমি যেন তোমার সখ্য উপভোগ করিতে পারি; অপর স্ত্রীগণও যেন তোমার সখ্য উপভোগ করেন কিন্তু কলহপ্রিয়া নারীরা যেন তোমার সৌখ্য লাভ না করে।"

অঘোর চক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি
শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।
বীরসূর্জ্জী বসুর্দেব কামাঃ
স্যোণা শন্নো ভব দ্বিপদে মাং চতুষ্পদে॥ (ঐ)

"হে কন্যে! তুমি মন্দেক্ষণা ও পতিঘাতিনী হইও না। পশুদের মঙ্গলকারিণী হও, সুমনা, জ্যোতির্ম্ময়ী ও বীরপ্রসূ হও; পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত বলিকার্য্যের অনকূলা ও সুখদায়িনী হও; দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদিগের কল্যাণকারিণী হও।"

সংম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সংম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্যাং ভব।
ননান্দরি সংম্রাজ্ঞী ভব সংম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ (ঐ)

"তুমি শ্বশুরের চিত্তহারিণী হও; শাশুড়ীর চিত্তহারিণী হও; ননদের চিত্তহারিণী হও; দেবর ও পরিজন সকলের চিত্তহারিণী হও।"

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু
মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব
বৃহস্পতি নিযনক্তু মহ্যম্। (ঐ)

"বৃহস্পতি আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিযুক্ত করুন। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুসরণ করুক। তুমি একমনা হইয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তিনি তোমাকে আমার প্রতি নিযুক্ত রাখুন।

ইহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরিহ রন্তিরিহ রমস্ব।
ময়ি ধৃতির্ময়ি স্বধৃতির্ময়ি রমো ময়ি রমস্ব॥ (ঐ)

"তোমার এখানে (গৃহে) মতি স্থির হউক। তুমি এখানে আনন্দে বিরাজ কর। আমাতে তোমার মতি স্থির হউক। (আত্মীয়গণের) সহিত মিলিত হও। আমাতে আসক্ত হও ও আনন্দে আমার সহিত বাস কর।"

এক্ষণে বিষ্ণু-সংহিতা হইতে স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করা হইতেছে:—

"পতির সম-ব্রতাচরণ, শ্বশ্রু, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা;

গৃহোপকরণ পরিষ্কৃত ও সজ্জিত রাখা; অমুক্তহস্ততা অর্থাৎ মিতব্যয়িতা ধনপাত্র গোপন রাখা; পতিবশীকরণাদিতে অপ্রবৃত্তি; মঙ্গলাচার তৎপরতা; ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে বেশ-বিন্যাসে মনযোগ না দেওয়া; পরগৃহে গমন না করা, দ্বারদেশে ও গবাক্ষে অবস্থান না করা; অস্বতন্ত্রতা অর্থাৎ পতির অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য না করা; ভর্ত্তার মৃত্যুতে ব্রহ্মচর্য্য বা অনুগমন। ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী সাধ্বী স্ত্রী অপুত্রক হইলেও সনকাদি আবাল্য ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।"

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

১। গীতার আভাস।—শ্রীহরিপ্রসাদ বসু, এম্ এ, বি এল, প্রণীত; মূল্য বার আনা। এই পুস্তকখানি তিনটী প্রবন্ধে পরিসমাপ্ত। ইহার প্রথম প্রবন্ধটীই "গীতার আভাস," যাহাতে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের বিষয়গুলি ধারাবাহিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখান হইয়াছে। অপর দুইটী প্রবন্ধ সাধারণ ধর্ম্মালোচনা মূলক হইলেও উহা গীতার সহিত একার্থ প্রতিপাদক বলিয়া উহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহাদের পক্ষে শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিকগণের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধযুক্ত বিশেষ কোনও ভাবের দ্বারা সমগ্র শাস্ত্র সমন্বয়কারী ভাষ্য অধ্যয়ণ করা এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহারা যদি এই নিত্যপাঠ্য সার্ব্বভৌম-ধর্ম্ম গীতার এই সহজ সরল আভাস বা উপক্রমণিকা অধ্যয়ন করিয়া লন তাহা হইলে সংক্ষেপে গীতার যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইবেন। ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রাপ্তিস্থান, ১নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

২। HINDUISM and UNTOUCHABILITY এবং THE SUPPRESSED CLASSES of INDIA.-শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী কৃত এই দুইখানি ইংরাজী গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে নীচ

জাতির দুরবস্থা ও উচ্চ সম্প্রদায়ের দুষ্টমার্গের অবৈধতা, আলোচিত ও অশাস্ত্রীয় পরপর প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেলিয়াটী পোঃ, ঢাকা।

৩। সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।—শ্রীমদ্ যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী বিরচিত, মূল্য বার আনা। পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রথম কাণ্ডে যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে রাজযোগের দার্শনিক তত্ত্ব মুসলমান ও খৃষ্টান সাধকগণের উপলব্ধির সহিত তুলনা করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সশক্তিক শ্রীভগবানের স্বরূপ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তত্ত্বমসি, সোঽহং প্রভৃতি মহাবাক্য এবং অপরাপর অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য উদ্ধারের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। যাহারা বেদান্তের অন্তরঙ্গ সাধনকাণ্ড বঙ্গভাষায় হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

ইহার সহিত লেখক একখানি শ্রীগুরুর ধ্যানচিত্র আমাদিগকে উপঢৌকন দিয়াছেন। ইহার চতুঃপার্শ্বে শ্রীগুরুর ধ্যান ও স্তোত্র সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু উহাতে যে হং ক্ষং মন্ত্রযুক্ত আজ্ঞাপত্র আছে তাহা রক্তবর্ণ করা হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন, "আজ্ঞামণ্ডপে বিদ্যুৎপুঞ্জনিভে শুভ্র হংক্ষ বর্ণান্বিতে দ্বিদল পদ্মে"। এবং সহস্রদল পদ্মও রক্তবর্ণ ও মধ্যে অষ্টদল পদ্ম পীত করা হইয়াছে কিন্তু শাস্ত্র এ সম্বন্ধেও বলিতেছেন, "কর্পূরাভে নানাবর্ণোজ্জ্বল দলবিভূষিতে নানাবর্ণ-বর্ণসমুদয়োজ্জ্বলে সহস্রারে"। যাহা হউক তত্রাচ আমরা আশা করি প্রতি সাধক এই গুরুমূর্ত্তি স্বগৃহে স্থাপনা করিয়া ধন্য হইবেন। প্রাপ্তিস্থান শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রকুমার সন্ন্যাল; উকিল, বেনারস।

৪। ব্রহ্মর্ষির উপদেশমালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি।—দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। বোম্বাই, সেণ্টাক্রুজ নামক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র হইয়াছে।

২। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ এক্ষণে দারজিলিংএ অবস্থান করিতেছেন।

৩। বিগত ২৩শে বৈশাখ, সাঁত্রাগাছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্তসাংখ্যতীর্থ, বেদান্ত-বারিধি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অপরাপর সাধুসজ্জনের সহিত উপস্থিত হইয়া উক্ত সভার বিশেষরূপ শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

৪। বিগত ২৩শে বৈশাখ চন্দননগর, ভাকুণ্ডা-সাহায্য-ভাণ্ডারের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে স্বামী বাসুদেবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ ও সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৫। বিগত ২৭শে মে বালিয়াটী, ঢাকা, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে স্বামী বাসুদেবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা অর্চ্চনা ও আরত্রিকাদি সম্পাদন করেন। প্রায় ১৭০০ দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের দরিদ্র বালকদের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্যও ঐ দিবস সম্পন্ন হয়। গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্রোমহোদয়গণ ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বক্তৃতা করেন। উৎসবের পূর্ব্বের তিন দিন ধরিয়া ভাগবৎ, উপনিষদ, লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ভজনাদি হয়।

৬। বিগত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার বন্দবিল-দরিদ্র-নারায়ণ-সেবাসমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিত্যপূজা ও তদানুষঙ্গিক দরিদ্র-নারায়ণ সেবাদি সম্পন্ন হয়। স্বামী বিজয়ানন্দ সেখানে থাকিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন।
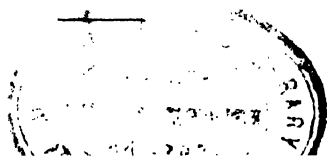
"গোপালের মা।"

(শ্রীসাহাজি)

গোপালের লাগি মন্দিরে ঘুরি,
ঘরের গোপালে চিনিনি
জীবন্ত গোপাল দুয়ারে আমার,
ফিরিয়া তাহারে চাহিনি।
পাথরের গড়া গোপালের তরে
সোণার বাঁশরী গড়েছি
ঘরের গোপালে, অবুঝ আমিরে,
অনাদরে ফেলে রেখেছি
বৃথাই তুলেছি পূজার প্রসূন,
বৃথাই ঘসেছি চন্দন
গোপালে আমার মন্দিরে খুঁজা,—
বৃথা সে শুধুই বন্দন
মুচিবউ যেথা কুটীরে পড়িয়া,
নিভেছে প্রাণের বাতিটী।
বুকে কাঁদে তার মলে ভরা শিশু,—
শ্মশানে ফুলের হাসিটী।
সেই ত আমার যশোদা গোপাল,
সেই ত আমার মন্দির।
পাষাণ মন্দিরে গোপালে খুঁজেছি,
চিত্ত ছিল কি অস্থির?

খেলাঘরে হায়! খেলার পুতুলে,
মিটে কি প্রাণের ক্ষুধা গো ?
মায়ের ক্ষুধা কি মিটে জননীর
চুমিয়া "মোমের খোকা" গো ?

নিদ্রিত বন্দী।

(মায়ামুগ্ধ জীব)

"স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবদ্ধঃ"

ঊর্দ্ধে মুক্তির আলোকরাজ্য, নিম্নে অমর আত্মা শৃঙ্খলিত। ঊর্দ্ধে শাশ্বতী শান্তি, নিম্নে জ্বালাময়ী অশান্তি। ঊর্দ্ধে মুক্তির শঙ্খ নিনাদিত, নিম্নে ভ্রান্ত মানব কামনা শয্যায় নিদ্রিত।

কবে এ কাল নিদ্রার অবসান হইবে, কবে বন্দীর অবশ ধমনী মুক্তির আনন্দে নাচিয়া উঠিবে? কে জানে সে শুভ মুহূর্ত্ত কবে আসিবে?

কত যুগ যুগান্ত চলিয়া গেল, তবু এ অসার বক্ষ স্পন্দিত হইল না। রক্ত স্রোত রুদ্ধ, ধমনী নীরব, একি জীবিত? না মৃত? অথবা গভীর সমাধি মগ্ন।

কাল রঙ্গালয়ে কত অভাবনীয় অভিনয় হইয়া গেল; দেখিতে দেখিতে কত দেবমন্দির, রক্ত লোলুপ ঘাতকের নৈশ প্রমোদালয়ে পরিণত হইল, দেখিতে দেখিতে গগনভেদী শুভ্র সৌধাবলী বসুধা বক্ষে বিলীন হইল, মঙ্গল প্রদীপ দেখিতে দেখিতে নিবিয়া গেল, আশার বিহঙ্গ ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে আবার পড়িয়া গেল, আহা! আবার ঐ হোমের ইন্ধন চিতানলে গ্রাস করিল।

কত মন্ত্র-গুরু আসিলেন, শ্রুতিমূলে কত উদ্বোধন মন্ত্র ধ্বনিত

হইল, কিন্তু কৈ? গতিশীল প্রাণ বিরাট দেহের কোন অজ্ঞাত রক্তবিন্দুতে লুক্কায়িত, সেত নীরব হইয়াই রহিল!

কেন এমন হইল? নিত্য মুক্ত স্বভাববান কোন ঐন্দ্রজালিকের মোহন মন্ত্রে আপনার স্বাধীনতার বলিদান দিল? জাগ বিক্রমকেশরী ভৈরব গর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত কর, গর্ব্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী মস্তক অবনত করুক।

ধারণাতীত অন্তরব্যোম্ আজ সীমাবদ্ধ, সিন্ধু বিন্দুতে পরিণত, হে বিস্মৃত! অমোঘ স্মৃতি বলে নিগড় ভাঙ্গিয়া উত্থিত হও—

"মা ভৈষ্টঃ বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ"

—হে বিদ্বন্ ভয় করিও না, তোমার বিনাশ নাই, তুমি অজেয়।

তুমি চেতন কি অচেতন? নিদ্রিত কি সমাধিমগ্ন? বন্দী না নিস্পৃহ নির্ব্বিকল্প?

কত যুগ চলিয়া গেল, বালিকা উষার মঞ্জীর ধ্বনি আর ত হইল না? বিনোদিনী উষা আর ত গগনের দ্বার উন্মোচন করিল না? কৈ সে প্রাণময়ী উষা আর ত সুপ্তির আবরণ তুলিয়া ধরিল না?

চক্ষু উন্মীলন কর, জড়ত্বের পাষাণ তলে আর কত দিন নিদ্রিত রহিবে? হে বন্দিন! মুক্তের আবার বন্ধন কি? জড়ের কারাগারে মুক্তির প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত কর, প্রকৃতির ইন্দ্রজাল অপসৃত হউক।

একবার চাহিয়া দেখ,—কোন্ তমসা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে দাসত্বের শৃঙ্খল পদে লইয়া, নীরব রহিয়াছ, কোন্ মদিরা তোমাকে মুক্তির আনন্দ ভুলাইয়া দিল? হে স্বাধীন্! কোন্ অবসাদে এ অধীনতার পাশ বরণ করিয়া লইলে?

সত্য, মহাশক্তি অন্তরে তোমার নিদ্রিত; সত্য, ধ্রুবসত্য, মুক্তি তোমার করতলগত, বীর্য্যে তুমি অজেয়, গৌরবে তুমি অপূর্ব্ব; সত্য, ধ্রুবসত্য, জ্ঞানে তুমি আদর্শ! সত্য, তুমি অমৃত, জীবন তোমার নিত্য, সত্য, তুমি শাশ্বত, চেতনা তোমার চির অধিগত।

দেবতার আকাঙ্ক্ষিত ধন্য তোমার পূত অস্থি, ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম, ধন্য তোমার আত্মত্যাগ, ধন্য তোমার মুক্তি-মন্ত্র, ধন্য তুমি মহাপ্রাণ্।

উঠ, জাগ, বিজয় শঙ্খ নিনাদে মুক্তির বৈজয়ন্তী প্রোথিত কর, বালার্ক ভালিনী নবীনা উষার অমৃতের দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক।

সুপ্তি, সুপ্তি,—একি সংহারিনী সুপ্তি? একি অবসাদময়ী বিস্মৃতি? কণ্ঠ নীরব রহিল, প্রাণ জাগিল না, ম্লান গোধূলী আলোকে শ্রান্ত জীবন-রবি বুঝিবা পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল।

সম্মুখে অদৃষ্ট সিন্ধু বেলাভূমি বিধ্বস্ত করিল, ঊর্ম্মির বক্ষে ঊর্ম্মি আহত হইল, অত্যাচারীর অসংযত কোলাহলে অন্তর রাজ্য ভরিয়া গেল, তবুও ঘুম ঘোর ভাঙ্গিল না, আর কত দিন নীরব রহিবে? অদৃষ্ট সিন্ধু সৈকতে দাঁড়াইয়া আর কত দিন দিনান্তের প্রতীক্ষা করিবে?

এইত জীবনান্ত,—তামসী সন্ধ্যা মৃত্যুর যবনিকা কয়ে এইত সমাগত প্রায়?

তাই ডাকি,

—কতবার আসিয়াছ দেব! যমুনার কূলে কূলে নিশিথ নিকুঞ্জে, মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত মিলন-রাগ উথিত করিয়াছ, জাহ্নবীর তটে তটে আবেশ আকুল প্রাণে আয় আয় রবে কত কাঁদিয়াছ, পদস্পর্শে পার্থিব রজঃ মধুবৎ হইল, কত দীন হৃদয়ে কত তাপ-তপ্ত মরুবক্ষে ভক্তির অলকানন্দা বহিয়া গেল, স্পর্শে বনস্পতি মধুমান্ সাজিল, সে করুণামৃত আকাশে, জলে, অনলে, অনিলে অভিনব প্রেমস্পন্দন জাগাইয়া দিল।

আবার জীব দুঃখে করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল, আবার বোধিদ্রুম তলে রাজপুত্র মহাযোগী রূপে তুমি ধ্যানস্থ হইলে; কত গ্রীষ্ম, বর্ষা কত শীত, তাপ উপেক্ষা করিয়া সে মহা সাধনায় জীবহিতে হিমাদ্রিবৎ অটল হইয়া রহিলে।

আরবের উত্তপ্ত মরুবক্ষে অসীমের পদতলে তুমিই সসীমের গর্ব্বিত মস্তক অবনত করিয়াছিলে, আবার তুমিই বাঙ্গলার জড়বক্ষ করুণা পীযূষে সিক্ত করিলে।

কিন্তু দেব! বুঝি তোমার প্রেম সিন্ধুজলে এ উত্তপ্ত পাষাণবক্ষ সুশীতল হইবে না, বুঝি তোমার মদনমোহন রূপে এ মদন মোহিত হইল না।

বিঘূর্ণিত ধর্ম্ম চক্র করে আবার আসিয়াছ দেব! বুঝি বন্দীর মুক্তি শুধু তোমারই করায়ত্ত, বুঝি সে মুক্তির মন্ত্র শুধু তোমারই ভৈরব-শঙ্খে বিঘোষিত, বুঝি ধ্বংসেই মুক্তি, মরণেই জীবনের বীজ অঙ্কুরিত, বুঝি সংহারেই শান্তি তাই তুমি চক্রধারী।

আবার আসিয়াছ দেব!

আবার "যুক্তায়'কৃত নিশ্চয়" রবে দেহরথে আসিয়া দাঁড়াও, আবার প্রবৃত্তির নিবৃত্তির মহাসমরে শান্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী ব্যোম বক্ষ ভেদ করিয়া উত্থিত হউক।

আবার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" রবে মহামহিমান্বিত তুমি, রাজ-রাজেশ্বর তুমি, তোমাকেই অনন্ত বিশ্ব প্রণাম করুক!

পূর্ণত্বের পথ। *

(শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মোদ্যোগই কোন অভাবজাত এবং এই সচেতন কর্ম্মশীলতাই জীবন বা প্রাণ শক্তি নামে পরিচিত। কর্ম্মশীলতা সচেতন হইলেই আমরা তাহাকে প্রাণ বা জীবন বলি; কিন্তু বাষ্পীয় যান ও যন্ত্রের ন্যায় অচেতন হইলে আমরা উহাকে প্রাণ শক্তি বলিয়া গণ্য করি না। আর প্রত্যেক কর্ম্মশীলতাই কোন না কোন অভাব প্রণোদিত। কিসে আমাকে কর্ম্মশীল করিয়াছে?— কোন বস্তুলাভের বাসনা। কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ?—কারণ, তোমরা ভাবিয়াছ যে এখানে কোন প্রকার জ্ঞান বা সাহায্য লাভ করিবে। কিছু লাভ বা উপলব্ধি করিবার আশা না থাকিলে আমরা এক পদও অগ্রসর হই না। প্রত্যেক কর্ম্মোদ্যমের পূর্ব্বে চঞ্চলতা বর্ত্তমান থাকে এবং অভাব হইতেই এই চঞ্চলতার উদ্ভব। যতক্ষণ সেই চঞ্চলতা তোমার মধ্যে আছে

* শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ, বি, এ কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনূদিত।

ততক্ষণ তোমায় কর্ম্মশীল হইতেই হইবে, তুমি তোমার আন্তরিক অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেই।

কিন্তু বাস্তবিক কি মানুষের কোন অভাব আছে? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহান্ নরদেব এবং যীশুখৃষ্ট ও বুদ্ধের ন্যায় অবতারগণ অন্যরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের মানবসংজ্ঞা অতি অদ্ভুত। তাঁহারা বলেন, মানব জন্ম-মৃত্যু রহিত, অভাবশূন্য, আনন্দময়, স্বয়ম্ভু ও স্বয়ং প্রকাশ। এমন কি শিবের ত্রিশূলেরও তাহাকে বিনষ্ট করিবার শক্তি নাই—সে স্বভাবতঃ নিত্য ও অবিনশ্বর। ইহাই যদি মানবের সংজ্ঞা হয় তবে আমি কি? আমিও ত মানব নামে অভিহিত; কিন্তু আমি মাত্র সার্দ্ধত্রিহস্ত দীর্ঘ, আমি জন্মগ্রহণ করি, মৃত্যু মুখে পতিত হই, আমার বহু অভাব আছে! দীনতম শ্রমজীবী হইতে শ্রেষ্ঠ সম্রাট পর্য্যন্ত এমন একজনকেও কি দেখাইতে পার যে অভাবে পরিপূর্ণ নহে? মানুষ বাস্তবিকই অভাবগ্রস্ত জীব। যে মুহূর্ত্তে শিশু মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় সেই মুহূর্ত্তেই সে ক্রন্দন করে।—কেন? কারণ, সে অভাবগ্রস্ত। মানুষ জন্মে অভাবের মধ্যে, প্রাণ ধারণ করে অভাবের মধ্যে এবং অভাবেই সে মরে। অভাব হইতেই তাহার উদ্ভব, অভাবেই তাহার স্থিতি এবং অভাব হইতেই তাহার মৃত্যু।

তাহা হইলে ঐ দুই প্রকার মানবের মধ্যে কি সম্বন্ধ? কিরূপে একটী অপরটীর সমান হইতে পারে? কিরূপে একটী অন্যটীর সহিত একীভূত হইতে পারে? একটী সমস্ত অভাব-ভীতি ও জন্ম-মৃত্যুর অতীত, আর অপরটী সর্ব্বপ্রকার ভীতি ও বাসনা পরিপূর্ণ এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন। দৃষ্টতঃ দুই বিপরীত মেরুস্থিত এই দুই শ্রেণীর মানবের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকা কিরূপে সম্ভব? তথাপি কিন্তু উহাদের সম্বন্ধ আছে। এই যে জন্মমৃত্যুবিশিষ্ট মানব, এই শান্ত ও পরিচ্ছিন্ন মানবই তাহার অনন্ত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে। মানুষ সতত চঞ্চল, সর্ব্বদা স্থান হইতে স্থানান্তরে গতিশীল।—কেন? কারণ সে কখনও সন্তুষ্ট নহে, কারণ—কিছুই তাহাকে নিত্য সন্তোষ দিতে পারে না। আর সে যে তাহার সান্ত স্বভাবে সন্তুষ্ট নহে তাহাতেই

বুঝা যায় যে, উহা তাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। তাহার অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অদমনীয় ক্ষুধা থাকাতেই প্রমাণিত হয় যে সে স্বরূপতঃ অনন্ত এবং সেই জন্যই যাহা কিছু সান্ত তাহাতে সে সর্ব্বদা অপরিতৃপ্ত।•

যে কোন ব্যক্তির নিকট যাও, দেখিবে যে সে তাহার সসীম অবস্থায় অতৃপ্ত। তোমাদের মধ্যে একজনও প্রকৃতপক্ষে পরিতুষ্ট নও। তুমি হয়ত বলিতে পার যে, তুমি তোমার মাসিক একশত টাকায় তুষ্ট, কিন্তু উহা আলস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আলস্যকে সন্তোষ বলিয়া ভুল বুঝিও না। প্রকৃত সন্তোষ কি তাহা নচিকেতা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। যমরাজ তাঁহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য, বিশাল রাজ্য ও সুন্দরী রমণী দিতে চাহিলেন, কিন্তু নচিকেতা জানিতেন যে একমাত্র সত্যই তাঁহাকে সুখী করিবে—তিনি অন্য কিছুই কামনা করেন নাই; কিন্তু যদি কেহ তোমাকে একশতের পরিবর্ত্তে দুইশত টাকা দিতে চাহেন তবে কি তুমি তাহা গ্রহণ করিবে না? ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি সন্তুষ্ট নও। যদি তুমি আত্মবিশ্লেষণ কর তাহা হইলে দেখিবে যে তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। কখন তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ হইবে? যখন তুমি বলিতে পারিবে "আমি সকলের প্রভু, সমগ্র বিশ্ব আমার অধীন, আমার কোন অভাব নাই, আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছি, আমার কোন দায়িত্ব নাই।" যতক্ষণ না এই ভাব আসিবে ততক্ষণ তোমার উচ্চাভিলাষ তোমায় ত্যাগ করিবে না। তুমি সসীমতা হইতে মুক্ত হইতে চাও, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি বলিতে পার যে, তুমি সীমা হীন, মৃত্যুশূন্য ও অবিনশ্বর ততক্ষণ তুমি শান্ত হইতে পারিবে না।

ইহাকেই বলে মুক্তি বা মোক্ষ। অতএব এই ক্ষুদ্র মানব, সেই মহামানব সেই অনন্তপুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া বোধ হইলেও, যে পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র মানব সেই অনন্তপুরুষের সহিত একীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত সে কখনই স্থির ও শান্ত হইবে না; ইহাতেই বুঝা যায় যে, অনন্তত্বই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। যদি তুমি একটী মৎস্য লইয়া উহাকে

ভারত সম্রাট সাজাহানের ময়ূরসিংহাসনে বসাও এবং তাহাকে প্রণাম ও পূজা কর তাহা হইলে সে কি সুখী হইবে? তাহা নহে, বরং সে বলিবে "আমায় বরং একটী মলকুণ্ডে নিক্ষেপ কর তবু যেন জলের বাহিরে আমায় রাখিও না" কারণ, জলই (অপ) তাহার স্বাভাবিক আলয় তুমিও ঠিক ঐভাবেই তোমার নষ্ট স্বরূপের জন্য অস্থির।

এমন কেহই নাই যে চঞ্চল নহে। কিসের জন্য চঞ্চল?—তাহার নষ্টস্বভাব, তাহার অনন্ত স্বরূপ ফিরিয়া পাইবার জন্য। যে ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমান (সসীম) অবস্থায় অতৃপ্ত সেই ধন্য, যে তাহাতে পরিতৃপ্ত সেই মহা হতভাগ্য ঐরূপ পরিতৃপ্ত ব্যক্তি মনুষ্য নামের যোগ্য নহে—সে পশুতুল্য। তুমি একটী হস্তীকে সারাজীবন বদ্ধ রাখিতে পার, কিছু আহার পাইলেই সে নিশ্চিন্ত। যাহারা ঐরূপে পরিতৃপ্ত তাহারা পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? নীচ পশুর ন্যায় আমাদেরও আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন আছে; সুতরাং যদি আমরা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু না করিতে পারি তবে পশু হইতে আমাদের পার্থক্য কোথায়?

যেখানে অসন্তোষ সেইখানেই জানিবে মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। যে কোন মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিলে দেখিবে তিনি সতত কিরূপ কর্ম্মশীল ও চঞ্চল ছিলেন—সর্ব্বদা অধিকতর বস্তুলাভের জন্য সচেষ্ট। আর যে সকল আরামপ্রিয় লোকের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহারা কুলি হইবার জন্যই নির্দ্ধারিত। ইহারা ঠিক কলুর বলদের ন্যায়, সমস্তদিন ঘানির চারিদিকে ঘুরে, কখনও নির্দ্দিষ্ট পথরেখা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তি যখন বিদ্যালয়ে ছিল তখন তাহারা শিক্ষায় যত্নবান ছিল না—নিজ নিজ শ্রেণীর সর্ব্বনিম্নপ্রান্তে থাকিয়াই সন্তুষ্ট ছিল; আর উহাদের সহিত কতকগুলি ছিল শিক্ষার জন্য ব্যাকুল ও উচ্চাভিলাষী—তাহারাই এখন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, বর্ত্তমানে গণ্যমান্য বক্তি। মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ কর, দেখিবে তাঁহারা ব্যাকুল ও চঞ্চল ছিলেন বলিয়াই মহৎ হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রম-বিমুখ হইও না।

কখনও অল্পে সন্তুষ্ট থাকিও না। তুমি অসীম, তুমি পূর্ণ, এবং

যতক্ষণ না তুমি তোমার অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিবে ততক্ষণ ক্ষান্ত হইও না। মনে করিও না তোমার বুদ্ধিশক্তি সীমাবিশিষ্ট—সক্রেটীসের মস্তিষ্ক, নিউটনের ধীশক্তি তোমার ভিতরে বর্ত্তমান। কেবল ধূলি ও আবর্জ্জনায় তাহা তুমি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। ধৌত কর সেই ধূলিরাশি, জাগ্রত কর তোমার উচ্চাভিলাষ, উত্তেজিত কর তোমার কর্ম্মশক্তিকে, আর স্মরণ রাখিও যে অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে সুপ্ত আছে। তুমি সীমাবদ্ধ নও—কখনই না। যে সকল বরেণ্য সাধুপুরুষ জগদীশ্বর হইতে স্থান ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তাঁহাদের মতই তুমি সীমা হীন—অনন্ত।

আমাদের শাস্ত্রে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে কোন ব্যক্তিকে পাপী বলাই সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ। যখনই তুমি নিজেকে পাপী ও দুর্ব্বল মনে কর তখনই তুমি তোমার অনন্তস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া দেহ ও মনের সহিত তোমার একত্ব বা তাদাত্ম্য স্থাপন কর। দেহ ও মনের সহিত আত্মার এই একত্বজ্ঞানই, এই অধ্যাসই সকল দুঃখের মূল। যদি তোমার অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিতে চাও তবে তোমার শান্ত স্বভাবের সহিত সকল সংস্রব দূর কর, তোমার দেহ ও মন ভুলিয়া যাও। তোমার আত্মাকে দেহ ও মন হইতে বিচ্ছিন্ন কর। বস্তুতঃ তুমি সর্ব্বদাই উহা করিতেছ। তুমি কি সর্ব্বদা ভাব "আমি দীর্ঘ বা খর্ব্ব, আমি কৃষ্ণ বা গৌরবর্ণ, আমি ক্ষীণ বা স্থূল?" কেবল যখন কোন দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও তখন ঐসকল ভাব তোমার মনে উদিত হয়। স্বাস্থ্য কাহাকে বলে? যখন মানুষের স্মরণ থাকে না যে সে দেহবিশিষ্ট, তখনই সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। শীরঃপীড়া হইলেই তোমার স্মরণ হয় যে তোমার একটী মস্তক আছে। পায়ে যখন ব্যথা হয়, তখনই মনে হয় যে, তোমার পা আছে। তুমি চৈতন্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ। দেহবুদ্ধি তোমাতে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও তোমাকে উহা (দেহ) বিস্মৃত হইতেই হইবে। যখন তুমি কোন সুন্দর দৃশ্য বা সুমধুর সঙ্গীত উপভোগ কর, তখন তুমি দেহ ভুলিয়া যাও; অর্থাৎ সেই সময়ের জন্য তুমি দেহাতীত হও। ইহাই তোমার সত্যস্বরূপ এবং সেইজন্যই তুমি সে

সময় সুখী। যখন তুমি শান্ত স্থির চিন্তামগ্ন, তখন তুমি দেহ বিস্মৃত হও। আর যখন হঠাৎ কিছু আসিয়া তোমার সেই অবস্থারপ্রতিবন্ধক হয়, তখন তুমি উহাকে যাতনা বল।

চিন্তা আনন্দে লয় হয়। যখন তুমি চিন্তারত, যখন তোমার কোন দেহজ্ঞান থাকে না, তখন তুমি কোথায় অবস্থান কর? তখন তুমি দেহের বাহিরে, মনের বাহিরে বর্ত্তমান এবং উহাই আনন্দাবস্থা। আনন্দই তোমার প্রকৃতস্বরূপ, সেইজন্য তুমি আনন্দ ভালবাস। মানুষ সর্ব্বদা সুখের জন্য অস্থির—অস্থির, কারণ কোনও না কোনও দুঃখ তাহাকে কষ্ট দিতেছে। মানুষ অবিরত আনন্দ অন্বেষণ করিতেছে এবং সে কেবল তাহার নষ্ট আনন্দ পুনরায় লাভ করিবার জন্যই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ও দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়ায়। আনন্দের জন্য এই অন্বেষণ ও ভগবদন্বেষণ একই; কারণ ভগবান ও আনন্দ অভিন্ন ও একার্থবোধক। সেই জন্যই বলা হয় "মূর্খে বলে তাহার অন্তরে ভগবান্ নাই; কারণ ভগবান্ হইতেই সমস্ত সুখের উদ্ভব, যে কেহ সুখ অন্বেষণ করে সে তাঁহাকেই অন্বেষণ করে। আনন্দই আমাদের ভগবৎসংজ্ঞা। এমন কোন নাস্তিক নাই যে আনন্দ চায় না, সেই আনন্দই ভগবান। আনন্দ হইতেই নিখিল সৃষ্টির উদ্ভব, আনন্দেই উহার স্থিতি এবং আনন্দেই উহার বিলয়। ভগবান্ হইতে আমরা ও সমগ্রবিশ্ব উদ্ভূত; আমরা তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছি, আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব।" সুতরাং আনন্দ ও ভগবান্ একই। অতএব কেহই বলিতে পারে না যে সে নাস্তিক; কারণ প্রত্যেকেই আনন্দে বিশ্বাস করে, আর সেই আনন্দইত ভগবান্! বাস্তবিক প্রত্যেক মনুষ্যই সুখ খুঁজিতেছে। কোন্ সুখ তুমি চাও?—যে সুখের কদাপি বিরাম নাই। তুমি তৃপ্তি চাও সেইজন্য এই ক্ষণিক পার্থিব সুখ গ্রহণ করিতে চাও, কারণ উহা তোমাকে কিঞ্চিৎ তৃপ্তিদান করে; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখই তোমার আদর্শ।

যে আনন্দের বিরাম নাই তাহাই ভগবান নামে অভিহিত, আর যে সুখের অন্ত আছে তাহার নাম ইন্দ্রিয়সুখ। তোমার ক্ষণিক তৃপ্তি বিধানে সমর্থ এই সসীম সুখে তুমি ক্ষণকালের জন্য তুষ্ট হইতে পার,

কিন্তু অক্ষয় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই তোমার আদর্শ। উহা তোমাকে অনুভব করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দ্রুত আহার শেষ করিয়া কর্ম্মস্থানে ছুটিতেছে ও সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিতেছে সে আনন্দেরই অন্বেষণ করিতেছে। আর ঐ যে ব্যক্তি নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া মনঃসংযম করিতেছেন এবং তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিবার ও স্বীয় অন্তরে ভগবদ্দর্শনলাভের চেষ্টা করিতেছেন, উনিও সেই আনন্দের জন্যই ব্যাকুল।

এক্ষণে ঐ প্রণালী দুইটী বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে অর্থের জন্য ব্যগ্র কারণ উহা তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে আহার, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ প্রদান করিবে। অতএব সে অর্থ ও শক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করে। সে ভাবে যে শক্তির সাহায্যে সে প্রকৃতিকে তাহার সকল অভাব পূরণ করিবার জন্য বাধ্য করিবে। কিন্তু ঐ প্রণালী অতি অনিশ্চিত। সে অর্থলাভ করিতে পারে কিন্তু তদুৎপন্ন আহার বা স্বাচ্ছন্দ্য সে জীর্ণ বা উপভোগ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। আমি কলিকাতার এক লক্ষপতিকে জানিতাম। তিনি মাত্র বার্লি-জল পরিপাক করিতে পারিতেন। সুতরাং ভোগ হিসাবে তাঁহার হীনতম ভৃত্যের তুল্যও তিনি ভাগ্যবান ছিলেন না। তাহার পর অর্থ থাকিলেই বা ঐ ব্যক্তি কতকাল তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হইবে?—কেবল যতদিন তাহার দেহ থাকে। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীতে জীবনের ন্যায় অনিশ্চিৎ আর কিছুই নাই। দোলনার শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র সকলেরই নিকট যে কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যু আসিতে পারে। যখন আমরা আপনাদিগকে দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে মনে করি যে দেহ বা মনের সন্তোষ আমাদের প্রকৃত সন্তোষ, তখন আমরা বুঝিতে পারি সুখ কিরূপ ক্ষয়শীল।

প্রত্যেক ব্যক্তিই ষড়্বিধ বিকারের অধীন। গর্ভে শিশু ছিল, তাই শিশুর আবির্ভাব। যখন তাহার জন্ম হইয়াছে তখন অবশ্যই তাহার আকার বৃদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্ত্তন হইবে। সে ক্রমে বালক, যুবা ও বৃদ্ধ হইবে। তারপর?—ক্রমশঃ ক্ষয়। চক্ষুদ্বয় শক্তিহীন হইবে, কর্ণদ্বয় আর শুনিবে না, হস্তপদ নিষ্ক্রিয় ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইবে।

ইহাই প্রত্যেক প্রাণীর জীবনেতিহাস। যে জীব এরূপ দেহবদ্ধ, যাহার মন সংশয়পূর্ণ সে কিরূপে অনন্ত জীবন আশা করিতে পারে ?

তথাপি কেহই মরিতে চায় না। মানুষের নিকট মৃত্যুর ন্যায় ঘৃণ্য আর কিছুই নাই। অতএব এই বর্ত্তমান জীবনই যদি আমাদের একমাত্র জীবন হয়, তাহা হইলে মানুষ ত মৃত্যুর হস্ত হইতে কখনই নিস্তার পাইবে না, সুতরাং সে ত সুখী হইবার আশা করিতে পারে না! কিন্তু জীবনের সংজ্ঞা কি? জীবন অর্থে অস্তিত্ব বা সত্তা এবং মৃত্যু অর্থে অনস্তিত্ব বা অসত্তা বুঝায়। আমরা কিন্তু জানি যে অস্তিত্ব হইতে অনস্তিত্বের উদ্ভব অসম্ভব, যাহা সৎ তাহা অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং জীবন কখনও মৃত্যুরূপে বা মৃত্যু কখনও জীবনরূপে পরিবর্ত্তিত বা বিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব মানুষ যখন জীবন-বিশিষ্ট তখন সে মরিতে পারে না। কিন্তু যে জীবন কখনও মৃত্যু-রূপ বিকারপ্রাপ্ত হইবে না, সে জীবন মানুষ কোথায় পাইতে পারে? —সে জীবনের সন্ধানে তাহাকে দেহ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে এবং যদি সে দেহের অতীতে যাইতে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় হইতে পারে তবে সে অবশ্যই সমগ্রবিশ্বের অতীত হইবে, কারণ, তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর আকারেও সমগ্রবিশ্বের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। তোমার নয়নে সমস্ত রূপজগৎ, শ্রবণে সমস্ত শব্দজগৎ এবং রসনায় সমগ্র রসজগৎ অবস্থিত।

নিদ্রা ব্যাপারটী হইতে উহা সহজেই প্রমাণিত হয়। যতক্ষণ চক্ষুদ্বয় দর্শন করে ততক্ষণ তোমার নিকট রূপের অস্তিত্ব, যতক্ষণ নাসিকা অঘ্রাণ লয়, ততক্ষণ তোমার নিকট গন্ধের অস্তিত্ব, যতক্ষণ কর্ণদ্বয় শ্রবণ করে, ততক্ষণ শব্দের অস্তিত্ব; প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই এইরূপ। যখন তুমি তোমার চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত তখন তোমার জাগ্রতাবস্থা। তারপর একটী চিন্তাময়ী অবস্থা আছে, তখন তুমি মনোমধ্যে অবস্থিত। কিন্তু আরও একটী অবস্থা আছে—যখন তুমি ইন্দ্রিয়গণের বাহিরে ও মনোরাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাও সেই অবস্থার নামই সুষুপ্তি। তখন কোন বন্ধু তোমার

পার্শ্বে বসিয়া মধুর স্বরে সঙ্গীত করিলেও তুমি তাহা শুনিতে পাইবে না, কারণ তুমি তখন তোমার কর্ণে অবস্থিত নও। তুমি তোমার দেহে বর্ত্তমান বটে কিন্তু কর্ণ বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত তোমার সংযোগ নাই। তুমি কিন্তু সে সময় মন বা ইন্দ্রিয়গুলির অতীত হইলেও দেহের মধ্যেই অবস্থিত, কারণ তখন তোমায় সজোরে আঘাত করিলে তুমি জাগ্রত হও। এই জাগরণের অর্থ কি?—ইহার অর্থ, মনে বা ইন্দ্রিয়ে তোমার প্রত্যাবর্ত্তন। যখন তুমি নিদ্রিত ছিলে তোমার স্ত্রী তোমার পার্শ্বে ছিল, কিন্তু তুমি তাহা জানিতে পার নাই। তোমার চতুর্দ্দিকস্থ সমগ্র বস্তু ও নিখিল বিশ্বের সহিতও তোমার ঠিক ঐভাব হইয়াছিল। অতএব বিশ্বের অস্তিত্ব এই মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামে তোমার অবস্থিতির উপরই নির্ভর করিতেছে। যখন তুমি নিদ্রিতছিলে তখন কি তোমার নিকট কোন বিশ্বের বা তাহার স্মৃতির অস্তিত্ব ছিল? না। সুতরাং এই দেহ নিঃসন্দেহরূপে ক্ষণ-ভঙ্গুর হইলেও ইহাই সমগ্র বিশ্বের অবলম্বন। সেই জন্য বিশ্বাতীত হইতে হইলে আমাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয় অতিক্রম করিতে হইবে। তাহা হইলেই অনন্তজীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভাবেই তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মনকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তুমি যদি তাহা করিতে পার তবে তৎক্ষণাৎ অনন্ত-জীবন উপলব্ধি করিবে এবং বিশুদ্ধ কেবলানন্দের অধিকারী হইবে—ইহাই মোক্ষ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, একটী উপায় তোমাদিগকে বিপথে এবং অপরটী গন্তব্যস্থানে লইয়া যায়। অর্থোপার্জ্জনরূপ যে উপায়টী তোমরা অনুসরণ করিতেছে তাহা মিথ্যা, কারণ উহাতে তোমরা একমাত্র এই দেহ দেবতারই সেবা ও পূজা করিতেছ। এবং এই দেবতাকে পূজা কর বলিয়াই তোমরা তোমাদের স্ত্রী, উত্তম খাদ্য, সুন্দর দৃশ্য ও মধুর শব্দ প্রভৃতি ভালবাস। আর তোমরা কোন প্রভুর সেবা করিলে পারিশ্রমিক আশা করিয়া থাক। কিন্তু এই

দেহ দেবতার সেবা করিয়া কি পাও?—যাহা তোমরা অত্যন্ত ঘৃণা কর—সেই মৃত্যুতেই উহা তোমাদিগকে লইয়া যায়। বহুজন্ম ধরিয়া তোমরা এই দেবতার সেবা করিতেছ আর প্রত্যেকবার মৃত্যুরূপ পুরস্কার লাভ করিয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চয়ই ঠিক সেবা নহে। যদি প্রকৃত পুরস্কারের জন্য যথার্থ সেবা করিতে চাও তবে সত্য দেবতার সেবা কর। তাহা হইলে অনন্তজীবন পাইবে।

সেবার পথ অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নহে। অন্তর্গামী কর্ম্মশক্তি সমূহের অনুশীলন বা নিয়োগই অনন্তজীবন উপলব্ধি করিবার উপায়। তোমাকে তোমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে। তাহা না পারিলে তুমি নীচ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। প্রকৃত জীবন অন্তরে—বাহিরে নহে। কিন্তু তাহা লাভ করিতে হইলে তোমায় কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কত জন্ম তুমি এই দেহ দেবতার সেবা করিতেছ, হঠাৎ প্রকৃত দেবতার পূজা আরম্ভ করা সহজ নহে। নিজের মনজয় করা অপেক্ষা সমগ্র পৃথিবী জয় করা সহজ। সেই জন্যই অর্জ্জুনের ন্যায় মহা-যোদ্ধাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, তিনি বহুরাজ্য জয় করিলেও স্বীয় মন জয় করিতে অক্ষম।—কেন? অর্জ্জুন যে বীর ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে কখনও কার্য্য করেন নাই বলিয়া নিজেকে অক্ষম ভাবিয়াছিলেন। আমরাও এবিষয়ে অর্জ্জুনের তুল্য। কিন্তু এই জীবনে তোমার অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তোমাকে এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে—"নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

অতএব দেখিতেছ যে, সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ধনী ও ক্ষমতাশালী হইবার উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কিসের প্রয়োজন?—ইচ্ছা। যদি এই পথ অনুসরণ করিবার ইচ্ছা না থাকে তবে ইহা জানা বৃথা। কিরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহা তুমি জানিতে পার, কিন্তু যদি পাকশালায় গিয়া তাহা প্রস্তুত না কর তবে তোমার জ্ঞান নিষ্ফল। এই পথ অন্তর্বর্ত্তী—কেবলমাত্র সেই জ্ঞানদ্বারা তোমার কোন সাহায্য হইবে না। তোমার বিশেষ চেষ্টা দ্বারা সেই অন্তরে যাইতে হইবে। অতএব ধর্ম্ম জিনিষটী সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান মূলক (Practical)। তর্ক

বা বিচারের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার নির্দ্দিষ্ট পথটীর অনুসরণেচ্ছা জন্মিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাদের আবশ্যকতা থাকিতে পারে মাত্র। তুমি অজ্ঞতম হইতে পার, কিন্তু তথাপি যদি তোমার ভগবানের নিকট যাইবার প্রবল বাসনা থাকে তবে কোনরূপ বিদ্যা না থাকিলেও তুমি অন্তরে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পার। তখন মহাশিক্ষিত ব্যক্তিগণও আসিয়া তোমার পাদমূলে উপবেশন করিবেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সংশয় দূর করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার তীব্র বাসনা ছিল এবং তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এ বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করিতে সক্ষম হইতেন। 'কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ ও পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়' তাঁহার জীবনী এই ধারণাটীর জ্বলন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ। জ্ঞান সম্বন্ধে উহা খুবই হীন ধারণা। তোমার জীবনব্যাপী চেষ্টার পরও প্রকৃতপক্ষে তোমার কিছুই জ্ঞান হয় না। সক্রেটীস বিজ্ঞতম ব্যক্তি ছিলেন, কারণ তাঁহার জানা ছিল যে তিনি কিছুই জানিতেন না।

এরূপ মহাপুরুষ যে কেবল নিজে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন তাহা নহে, অপরকেও প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাল্যকালে ক্রমাগত এমন এক ব্যক্তির অন্বেষণ করিতেন যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিতে পারেন। তিনি বলিতেন, প্রত্যক্ষ না করিলে ভগবানের অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? যখনই তিনি কোন বড় সাধু বা ধর্ম্মোপদেষ্টার নাম শুনিতেন তখনই তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "ভগবান কি আছেন?" উত্তর হইত "হাঁ।" তৎপরে তিনি প্রশ্ন করিতেন "আপনি কি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" এবং "না" উত্তর পাইয়া সেস্থান ত্যাগ করিতেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিতে পারেন এমন কোন লোক তিনি কোথাও পান নাই, সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভগবান কাল্পনিক বস্তু। তৎপরে একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরের সেই ধর্ম্মগুরু, সেই নিরক্ষর মহাসাধুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন "আপনি কি ভগবানকে দেখিয়াছেন?" শ্রীরাম-

কৃষ্ণ দেব বলিলেন "হাঁ।" "আমায় দেখাইতে পারেন ?" ভগবান তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "পারি।" অবশেষে স্বামিজী তৃপ্ত হন এবং এই জন্যই তিনি তাঁহার সমস্ত পুস্তকে বারবার বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম অনুভূতির বস্তু। বাস্তবিক, ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধির বিষয়।

ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং উহা যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ। বহুজন্ম ধরিয়া মিথ্যা দেবতার সেবা করিয়া যে সকল সংস্কার রাশি সংগ্রহ করিয়াছ প্রথমে সেগুলিকে দমন করিতে হইবে—মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে জয় করিতে হইবে। যীশুখৃষ্টের মত এই দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রুশবিদ্ধ করিতে না পারিলে তোমার উন্নতির অর্থাৎ এই নির্জীব দেহ হইতে নিজেকে উন্নত করিবার আশা নাই। যদি আপনাকে উন্নত করিতে চাও তবে দেহ ক্রুশবিদ্ধ ও ইন্দ্রিয় জয় কর। ইহা প্রত্যেককেই করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ইহার উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাও ত ভগবানকে পূর্ণতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তুমি সৌন্দর্য্যের অনুরাগী কিন্তু ভগবানে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান তাহা তুমি কোথায় পাইবে ? তুমি বাগ্মিতা-প্রিয় কিন্তু যে ভগবান হইতে সমগ্র বেদের উদ্ভব তাঁহার অপেক্ষা বাগ্মী আর কে আছেন ? তুমি শক্তিকামী, কিন্তু ভগবানের ন্যায় শক্তিশালী কে ? মনুষ্য মাত্রেই এই গুলির কোনটী ভালবাসে এবং ভগবানে সমস্তগুলিই অসীম পরিমাণে বর্ত্তমান। তুমি হয়ত কোন সুন্দরী রমণীকে ভালবাস, তাহার রূপ ত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্য্য নিত্য। অতএব যদি অক্ষয় সৌন্দর্য্য অবিনশ্বর জীবন, অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানলাভ করিতে চাও, তবে ভগবানের নিকট চাও। তাঁহার নিকট যাইতে হইলে অর্থের কোন প্রয়োজন নাই—তোমায় কোন টিকিট কিনিতে হইবে না। তাঁহার নিকট গমন করিবার জন্য তোমার পদের, তাঁহাকে দর্শনের জন্য তোমার চক্ষুর এবং তাঁহার বাণী শ্রবণের জন্য তোমার কর্ণের কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি তোমার অন্তরে,—তথায় পৌঁছিতে হইলে তোমায় সকল দ্বাররুদ্ধ করিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে হইলে তোমার চক্ষু মুদ্রিত.

তাঁহার বাণী শুনিতে হইলে কর্ণরুদ্ধ এবং তাঁহার নিকট যাইতে হইলে বাহ্য কর্ম্মশীলতা ত্যাগ করিতে হইবে।

অতএব এই ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ অবলম্বনে স্বীয় অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগবানকে উপলব্ধি কর—তবেই তুমি প্রকৃত মানুষ হইবে। কিন্তু ইহার জন্য চাই তোমার প্রবল ও তীব্র বাসনা। যদি তুমি একবার ভগবানের সহিত তোমার সম্বন্ধ অনুভব করিতে পার, যদি উপলব্ধি করিতে পার যে তিনিই তোমার প্রকৃত পিতামাতা ও অকৃত্রিম বন্ধু ও সহচর, এবং যদি তাঁহার নিকট গমন করিতে পার, তাহা হইলে অনন্তপুরস্কার লাভ করিবে, তোমার যত্ন ও প্রতিপালনের জন্য তিনি এমন কি তোমার ভৃত্যস্বরূপ হইবেন। অতএব যদি বাতুল না হও তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই তাহাতে মনপ্রাণে অনুরাগী হইবে, কারণ কেবল তাঁহার নিকট হইতেই তুমি পূর্ণ আনন্দ ও পরাজ্ঞান লাভ করিবে।

স্বামী অভেদানন্দের সহিত কথোপকথন।

(গৌহাটী, জুন, ২২)

জনৈক ভদ্রলোক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা তুলিয়াছেন। স্বামিজী বলিলেন—"বর্ণাশ্রম নিয়ে এত মারামারি কেন বাপু? বর্ণাশ্রমের এখন অস্তিত্বই নেই। প্রথমতঃ দেখ শাস্ত্র বল্‌ছেন ব্রাহ্মণ হবে গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তাভ, বৈশ্য শ্যামবর্ণ আর শূদ্র কাল। তাই যদি হয় তো তোমাদের সারা জাতটাই তো শূদ্র, আর ব্রাহ্মণ হবে সব সাহেবরা। যারা ব্রাহ্মণত্বের বড়াই কচ্ছেন তারা ঐ হিসেব থেকে শূদ্র বই কি! তারপর গুণকর্ম্মের কথা, তা তো চোখের সাম্‌নে দেখতেই পাচ্ছ। শাস্ত্রে, যে ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছের

চাক্‌রী করবে, তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রয়েছে। গবর্ণমেণ্টের চাকর তোদের বামুণগুলোর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে প্রবেশ কর্ত্তে হয়।"

আমি। কায়স্থ পত্রিকায় অনেক আগে এ সম্বন্ধে একটি caricature বেরিয়েছিল। এক মাথা তার সঙ্গে দুটো ঠ্যাং, মাঝখানটা নেই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আর শূদ্র রয়েছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য নেই। তার আবার চোখ দুটো বুজা, তার মানে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব আর নেই, শুধু একটী টিকি নিয়ে 'ব্রাহ্মণ নামটী রেখেছে। পায়ে বিলিতি জুতো, মানে, শূদ্রেরা পশ্চিমি ভাবে ডুবে যাচ্ছে। ছবির নাম দিয়েছিল "বঙ্গের হিন্দু, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মানস পুত্র।"

স্বামিজী। হাঁ, ও রকম caricature মন্দ নয়। সমাজটাকে ওরকম করে তাদের ভ্রম দেখিয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশের আবার কথা কি? বাংলাদেশে আজকালকার বামুনরা কি তা History পড়ে দেখ্‌লেই ভুল সংশোধন হয়। বাংলাদেশে সব বৌদ্ধ হয়ে গিছিলো। আদিশূর হিন্দুমতে যজ্ঞ কর্ত্তে গিয়ে এদেশে বামুন খুঁজেই পেলেন না। তিনি যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, তারাই ধরে ধরে বৌদ্ধদের কয়েকজনকে বামুন বানিয়ে দিলে। আর রঘুনন্দন, বাংলার বাইরে যাও দেখ্‌বে রঘুনন্দনের নামগন্ধও নেই।

আমি। আমাদের সব জাতটা নাকি গরমের চোটে কালো হয়ে গেল!

স্বামিজী। কে বল্লে গো!—রক্তমিশ্রণ।

স্বামিজী। চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাল আমার বক্তৃতা শুন্‌তে গিছিলি?' গতকল্য বিকালে একটী মহিলা সভায় তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, সেই কথা উল্লেখ করিতেছেন।

আমি। না।

স্বা। কেন?

আ। মহিলা সভায় আমি যাব কেন?

স্বা। তোর তো বড় হীনবুদ্ধি! তোর এত স্ত্রীপুরুষভেদজ্ঞান যে আমার বক্তৃতা শুন্‌তেও গেলিনে?

আ। কেন ব্রহ্মচর্য্যের সময়টায় স্ত্রীলোক দর্শন পর্য্যন্তও নিষেধ রয়েছে না?

স্বা। নিষেধ রয়েছে যাদের মন নীচে, তাদের জন্যে। তোদের মন নীচু হবে কেন!

আমি বেগতিক দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, বলিলাম. 'এখানকার বাজার টাজার করা এসব দেখ্‌তে হয়েছিল।' আর কিছু বলিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কাল কি বল্লেন?'

স্বা—কি আর বল্‌বো! তাদের High life lead কর্ত্তে বলে দিলুম বল্লুম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা ইত্যাদি পড়্‌লেই High life কাকে বলে বুঝ্‌তে পার্‌বে। এত সহজ সরলভাবে, এমন সুন্দরভাবে আর কেউ ধর্ম্ম-জীবনের উপদেশ দিতে পারেন নি। এই সব বল্লুম।

আ। এখানকার ব্রাহ্মসমাজে একদিন বক্তৃতা দিতে সবাই বল্‌ছে। প্রফুল্ল বাবু রাস্তায় পেয়ে আপনার মত জান্‌তে বলে দিলেন।

স্বা। হ্যাঁ, আমি কেবল বক্তৃতাই দিব! আমায় কি তোরা Lecture machine করে ফেল্‌বি নাকি?

আ। তবে কি মানা করে দেব?

স্বা। হ্যাঁ, সেই ভাল।

আমি অন্য কাজে গিয়াছি, এমন সময় ডাকিলেন। গেলে পরে কাছে বসিতে বলিলেন। এইবারে ৺কামাখ্যাপীঠের কথা হইতেছে।

স্বা। কাম্যাখ্যার পাণ্ডারা বেশ। আমায় খুব আদর যত্ন কল্লে। মার দর্শন হল, কুমারী পূজো কল্লুম। কিন্তু তোদের যা সৌভাগ্য কুণ্ড। হরিবল! দুই তিন ফোঁটা জল, এত নোংরা যে আর কি বল্‌বো। মন্দিরে ঢুক্‌বো তো কি অন্ধকার, সিঁড়ি থেকে পড়্‌বার যোগাড়। পাণ্ডারা এত পয়সা পায়, অথচ দুপয়সা খরচ করে যে দুটো বাতি দেবে ওখানে, তা আর করবে না।

আ। শুনলুম ওখানে নাকি বক্তৃতা হল ?

স্বা। হ্যাঁ ওরা হাতেলেখা নোটীশজারি করে এক meeting করেছিল। সেখেনে ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিলুম। ওরা দেখলুম বামুণের মেয়েদেরই কেবল কুমারী বলে। তা ওদের খুব বলে দিয়ে এলুম ; শুধু বামুণের মেয়েই কুমারী হবে কেন ! সব জাতের অবিবাহিত মেয়েরাই কুমারী।—মার স্থানে সব মেয়েরাই কুমারী।

আ। আচ্ছা মহারাজ, বলি হয় কেন ?

স্বা। যারা মাংসাদি খায়, তারা শুধু লোভ চরিতার্থ না করে প্রসাদ স্বরূপে খাক, এই জন্যেই বলি।

আ। বলি ছাড়া কি দেবীপূজার অঙ্গহানি হয় না ?

স্বা। কিছু নয়। পূজোয় পাঁঠাবলির কোনও দরকার নেই।

আ। মাংসাদি খাওয়া কি উচিত ?

স্বা। প্রাণীহত্যার কথা যদি তুলতে যাও, তো শাকসবজি ওয় খেতে পার না। তারাও যে প্রাণী। আমিষ নিরামিষ এখন কাকে বলবে, আমেরিকায় পায়েসেও ডিম দেয়। ডিমকে তারা নিরামিষই গণ্য করে।

খালি পায়ে কামাখ্যা পাহাড়ে চড়াতে পায়ের তলাতে ব্যথা লাগিয়াছে তাহা দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন—"খালি পায়ে এই পঁচিশ বছর ধরে হাঁটা অভ্যেস নেই কিনা। ওদেশে (আমেরিকায়) থেকে থেকে ঐদেশী ভাব হয়ে গেছে। এখানে এসে অবধি আস্তে আস্তে সে সব ছাড়্‌তে চেষ্টা করছি। আর কিছুদিনের মধ্যেই সে সব ছেড়ে দিতে পারবো বোধ হয়।"

আ। আমেরিকায় আজকাল কেমন কাজ চলেছে ?

স্বা। বেশ হচ্ছে।

আ। আপনি কি আর যাবেন ?

স্বা। আর কি যেতে পারবো ! তবে আর যাবার দরকারও নেই। আমি রাস্তা সাফ করে দিয়ে এসেছি এবার যারা আছে তারাই কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। কত প্রফেসর কত কার সঙ্গে বিচার হলো তর্ক হলো, কেউ এঁটে উঠতে পারিনি।

জনৈক ভদ্রলোক। ওরা তো খুব ভোগী জাত।

স্বা। তাতে কি হয় গো, আজকাল অনেকে ত্যাগও করছে। ওদের জাতটা বেশ। তোমার দেশে সন্ন্যাসীকে একটি কলা ও একমুঠা চাল দিয়ে বিদেয় করে, কিন্তু ওরা তাদের যা সব ভাল ভাল costly জিনিষ আছে সেই সব এনে ধর্ম্মপ্রচারককে দেয়।

আ। Non-co-operation সম্বন্ধে কি মনে করেন?

স্বা। সে হবেই তো, হোক না। তবে Destructive ছেড়ে Constructive এর দিকে বেশী ঝোঁক দিতে হবে। আমাদের মিশনের process, purely Constructive; গান্ধীও আজকাল ঐদিকেই বেশী ঝোঁক দিচ্ছেন।

আ। আপনি শুনলুম আমেরিকার citizen হয়েছেন?

স্বা। সে আমি ইচ্ছে কল্লেই হতে পারতুম, কিন্তু হইনি। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ওসবে কাজ কি!

আ। ওদেশে যারা আপনাদের কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছে তারা কি ধ্যান ধারণা করে?

স্বা। নিশ্চয়! ঠিক হিন্দুদের মতো আসন করে বসে ধ্যান জপ সব কচ্ছে। তোদের লক্ষ্মীছাড়া জাত। গায়ে বল নেই, মনে জোর নেই যা খাবি তাতে substance এর নামও নেই; গাছের ডালপাতা জুটো এনে খুব মসলা দিলেই ভাবলি খুব উপাদেয় খাদ্য হলো। এত মসলা খেলে কি এ জাতের শরীর ভাল থাকে।

আ। কি করবে আমাদের জাতের যে পয়সা নেই।

স্বা। পয়সা না থাকলেই কি খুব মসলা খেতে হবে? গায়ে জোর, মনে বল না এলে পয়সা রোজগার করবি কেমন করে! মনে জোর থাকে তো যানা আমেরিকায়, Dentist হয়ে আয়, Optician হয়ে আয়। আমাদের জাত দাঁতের যত্ন জানে না, চোখের care নেয় না। ভালো একজন Dentist আমাদের দেশ খুঁজেও মেলে না।

তারপর সেবাশ্রমাদির কথা উঠিল। বলিলেন—"আশ্রম, সেবাশ্রম খুব হওয়া দরকার। ছেলেদের সৎপথে নিতে হবে। তোমরা খুব

উঠে পড়ে লাগ দিকি, তোমাদের আশ্রমটাকে বড় করে ফেল। ওরকম করেই আরম্ভ করতে হয়? আমরা কি করেছি, প্রথম প্রথম বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে বেড়িয়েছি। কাপড় নেই সবাই মিলে একখান ধুতি পরে কতদিন কাটিয়েছি। কোন দিন বা উপবাস করেও থাক্‌তে হতো।"

নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা

১

গো-যানে রজনী-যাপন

সেদিন ২রা বৈশাখ। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সর্ব্বপ্রথম আমরাই প্রস্তুত ছিলাম। গাড়ীগুলি সব ছোট ছোট—৫।৬ হাত লম্বা—হাত দেড়েক চওড়া। ছইএর ছাত—ভিতরে আরোহীর আরামের জন্য খড় বিছাইয়া গদি প্রস্তুত, তদুপরি একখানি চেটাই। ঐ ছোট গাড়ীতে জিনিষের অভাব হইল না—পেট্রোল ল্যাম্প, জুতাভরা দুইটী বাল্‌তি, ছোট ছোট কয়েকটী পুঁটুলি, শতমূলীর মোরব্বা, লাঠি, ছাতা ইত্যাদি—মালের খিচুড়ী। বড়ই ক্ষোভের বিষয়—আমার বাক্সটী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। ভিতরে ফণীবাবু ও আমি—উহারই ভিতর ফণীবাবু বিছানা বিছাইলেন।

আমাদের চালকের বয়স বছর ২৩।২৪—ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া বেচারার সমস্ত দেহের উপর রোগযন্ত্রণার একখানি কালছায়া পড়িয়াছে। নাম তাহার প্রমথ বা 'প-মা'। প্রথমে খানিকক্ষণ আমরা উভয়েই বসিয়া রহিলাম, আর মাঝে মাঝে পিছনে দেখিতে লাগিলাম, কয়খানি গাড়ী ছাড়িল,—কে কে তাহাতে চাপিলেন সম্ভব হইলে সে খবরও লইলাম। ফণীবাবু পল্লীর পথে এক প্যাকেট সিগারেট কিনিলেন। প-মা একটী বক্‌শিস্ পাইল। বাবুরা উঁচু ভদ্রজাত,—তাঁহারা কি আমার ছোঁয়া

'ধোঁয়া' খাবেন,—এই ভাবিয়া সে প্রথমে বলিয়াছিল 'আপ্‌নারা লিয়ে আসুন।' শেষে আশ্বাস পেয়ে তবে যায়। তাহার পর আমরা বলিলাম—তুই এগিয়ে চল্‌, আমাদের গাড়ী সবার আগে পৌছান চাই। সে বলিল—'তা হবেক মুশাই—ই গুলারা খুব জোয়ান আছে। আমি সব্বের এগুতে আপ্‌নাদের লি যাব'—বলিয়া ঘন ঘন বলদের ল্যাজ মলিতে লাগিল। তাহাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

ক্রমে আমরা বাসা ছাড়াইয়া পথে অনেকদূর অগ্রসর। দুইধারে গভীর বন—বেশ জমাট অন্ধকার। শৃগাল বা অপর কোন প্রাণীর ডাক শুনিলাম না। বনানী যেন নাক ডাকাইয়া গভীর ঘুমে নিমগ্ন, আমরা টিম্‌-টিম্‌ করিয়া তাহার বিশালবক্ষের এক পাশ দিয়া একটু পথ চুরি করিয়া চলিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দশী রাত্র—চাঁদের মুখ পর্য্যন্ত দেখা গেল না—ভাবিলাম পূর্ণিমা হইলে কি সুন্দরই না হইত! অন্ততঃ চব্বিশখানি গাড়ী পর পর পিছন পিছন সা'রবন্দী হইয়া চলিতেছে—জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোকে দেখিতে পাইতাম—আনন্দ আরও অধিক হইত। কিন্তু বেষ্টনীর সেই ভীষণ গভীর ভাবে আমরা কতকটা আচ্ছন্ন হইয়া ছইয়ের ভিতর মিশাইয়া রহিলাম—গাড়ীর পিলে-চম্‌কান ঝাঁকানি সত্ত্বেও চোখে কে যেন ঘুমের হাত বুলাইতে লাগিল। একবার পিছন-পানে তাকাইলাম—অতিদূরে গাড়ীর ক্ষীণ আলো চোখে দেখিলাম ও ঘুমন্ত ষাঁড়ের টুন্‌-টুনে ঘণ্টার ধ্বনি কাণে শুনিলাম মাত্র। এই পথে আগে নাকি ডাকাতদের অত্যাচার ও প্রতিপত্তি পূর্ণমাত্রায় ছিল। একাণে এক-আধখানা গাড়ী নিস্তার পাইত না। কিন্তু আমাদের দল ভারি—ভয় নাই।

আমি 'নিদ্রালু' হইলাম। ফণীবাবু 'তন্দ্রালু' হইলেন, প-মা ঢুলিল, ষাঁড় দু'টী ঝিমাইতে ঝিমাইতে চোখ বুজিয়া চলিতে লাগিল—ঘাড়ের জোয়ালই তাহাদের কোনপ্রকারে টানিয়া লইতেছিল। আর কে কার খবর রাখে? হাতে 'পাঁচন-বাড়ী' লইয়া, মাথায় গৈরিক পগ্‌গড় বাঁধিয়া সম্বিৎ-জী প্রথম হইতে শেষ গাড়ীখানি পর্য্যন্ত 'কর্ণেলের' মত 'রিভিউ' করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আর যে যে গাড়োয়ান বেফাঁস রকমে

গরুর বল্‌গা ফেলিয়া দিয়া মুখ-থুব্‌ড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের পিঠে খোঁচা দিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগাইতে লাগিলেন, কারণ মোটামুটী ঝিমাইতে ঝিমাইতে যে সকল গাড়োয়ানই যাইবে—তাহা সকলেই জানিতেন। আমাদের গাড়ীতে আসিবার জন্য তাঁহাকে, অনুরোধ করিলাম। মাঝে মাঝে তিনি আসিলেন—তখন তিনজনে বসিয়া গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মাঝে জলের প্রয়োজন হইল। পথের ধারে এক দীঘি ছিল। আমাদের গাড়ীতে সর্ব্বদা যে লণ্ঠনটী জ্বলিতেছিল সেটী হাতে লইয়া ফণীবাবু ও সম্বিৎ-জী চলিয়া গেলেন। প-মার জীবন-কথা লইয়া আমাদের আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার মাত্র দুইবৎসর বিবাহ হইয়াছে। ঘর বিষ্ণুপুরের নিকটেই। 'ম্যালোয়ারি'তে ভুগিয়া শরীর বিশেষ কাবু। বলিল দুইবৎসর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার ভীষণ মড়ক হয়—গত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর (বৃদ্ধেরা বলেন) সে'রূপ দুরবস্থা কখন হয় নাই। সরকার কুইনিন দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বলিল—বরাত যা'র যখন ভাঙ্গে তখন ঔষধে কি করিবে? বর্ষার সময়ে গাড়ী চালান চলে না। ঘরে থাকিয়া ধান-চাষাদি করিতে হয়। কিন্তু মোটের উপর ব্যাধির উপদ্রব বাদ দিলে, তাহার মনে শান্তি আছে। অতৃপ্ত বাসনায়, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ দণ্ডে দণ্ডে দগ্ধ হয় না। বলিল, ধান ভালই হইয়া থাকে।

তাহার পর বিষম বিপত্তি বাধিল। সম্বিৎ-জী নামিয়া গেছেন—তিনি আগাইয়া বা পিছনে কিছুই জানি না। আমাদের ঠিক পিছনে যে গাড়ীখানি ছিল, সে বরাবরই 'ঢিমে-তেতালা'য় চলিতেছিল। হঠাৎ কুক্ষণে তাহার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার দুর্বাসনা জাগিল। নাক-মুখ টিপিয়া ষাঁড়ের লেজ প্রাণপণে মলিয়া সেই গাড়োয়ান তাহার কলে দম দিল। আঁধারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে গাড়ী আসিয়া শান্ত আমরা—মন্থরগতি আমরা—আমাদের সহিত একেবারে বেমালুম্ ধাক্কা—সজোরে ঠোকাঠুকি—মধ্যরাত্রে ভীষণ Collision—মোক্ষম ঝাঁকানি। স্থান—জয়পুর। তাহার পর কলিকাতার রাজপথে ট্যাক্সি যেমন আমাদের মত হতভাগ্য পথিককে চাপা দিয়া পিছনে ধোঁয়া ছাড়িয়া

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া যায়,—আমাদের পরিচিত সেই নিত্যঘটনার পুনরাবৃত্তি হইল। যে বলদটীর উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চোট পড়িয়াছিল সে বেচারার ক্লান্ত-শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না। জোয়াল-লাগাম ইত্যাদির সকল বন্ধন কাটাইয়া ঝাড়া হাত-পা লইয়া সে সিধে সড়ক ধ'রে নিজের বাড়ীর পানে প্রাণপণে ছুট দিল। বলদ পলাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখ হ'তে ঘুমও পলাইল। আমরা ত্রিশঙ্কু হইলাম—আধা এক বলদের কাঁধে, আধা মাটীতে। প-মার ঢুলু-ঢুলু চক্ষু চড়কগাছ দেখিল। ফণীবাবু সটান দ্বিতীয় বলদ হইয়া মাটীর উপর দাঁড়াইলেন। প-মা ও আমি তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম—'গরু পালাল-রে-রে', 'গরু পালাল রে-রে', 'ওরে ধর্-রে,' 'ধর্-রে'।

তৎক্ষণাৎ আলো লইয়া সম্বিৎ-জী চন্দ্রেশ্বর নন্দজী ও লাঠীহাতে প-মা 'হারাণ মাণিকের' পিছু পিছু ছুটিলেন। ফণীবাবু ও আমি নির্ব্বাক হইয়া পথের উপর সঙ্গীহারা-জীবকে লইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম, অনিমেষ দৃষ্টি রহিল—পিছনে। এক এক করিয়া সকল গাড়ীই আগাইয়া চলিয়া গেল। আমরাই 'শুধু রইনু বাকি'। ডাক্তার শ্যামাপদবাবু 'জরুরী কেস্' বুঝিয়া আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন—'কব্জী-ঘড়ি' দেখিয়া বলিলেন—'রাত্ একটা'। সকল গাড়ীর যাত্রীরাই জিজ্ঞাসা করিলেন "কা'দের গরু পালাল—গাড়ীতে কে কে ছিল?" একই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার আসিল। আঁধারে পরস্পরে দেখাদেখির উপায় নাই। আমরা কোন উত্তর দিলাম না, একেবারে গম্ভীর—নিঃশব্দ হইয়া গেলাম। দুষ্ট মন বলিল —"ইহারা সব কেমন? বলদ খুঁজিবার জন্য সাহায্য করিতে ক'ই কেহত' আসে না। খালি জান্‌তে চায় কা'র কা'র এমন শনির দশা হ'ল।" আমরা চুপ্। আসলে কিন্তু তাঁহাদের মনের ভাব সে'রূপ মোটেই ছিল না বলিয়া এখন বোধ হয়। ভীষণ ঝড়ের পর কয়টা গাছ-গাছড়া নষ্ট হল—তাহাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তথ্য মানুষের কাছে এই—যে, সে ঝড়ের ফলে কোন্ ক্ষুদ্র কুঁড়ে-

ঘরের ভিতর কয়জন মানুষ বিপদের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল বা জখম হইল। এক্ষেত্রেও তাহাই। সমানধর্ম্মী প্রাণীদের ভিতরে এরূপ ভালবাসা ও বাঁধনের টান অবশ্যম্ভাবী। প্রমাণও হাতে হাতে মিলিল। আমাদের পিতামহস্থানীয় একজন, শেষে তাঁহাদের গাড়ীতে আমাকে তুলিয়া লইতে চাহিলেন। আমরা বলিলাম—"না, আপনারা বুড়োমানুষ। দুইজনত' আছেনই—বেশী লইলে কষ্ট হইবে। আমরা মাল লইয়া পরে আসিতেছি।" যাঁহার নামে চলিয়াছি পথে তিনিই যে আমাদের অমোঘ রক্ষা-কবচ।

জল্পনা-কল্পনা হইতে হইতে বলদ মিলিল—লণ্ঠনহাতে সম্বিৎ-জী, চন্দ্রেশ্বর-জী প-মা সকলেই ফিরিলেন। 'হারাণ মাণিক' ফিরিয়া পাইয়া প-মা আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তাহার পর কিছুক্ষণ তাহার গা চাপ-ড়াইয়া তাহার বেয়াদবীতে নিজের অভিমান জানাইল। শীঘ্র তোড়-জোড় সমাপ্ত করিয়া আমরা গাড়ী ছাড়িলাম। রুষ-অভিযানের পর মার্শ্যাল নে'র মত তখন আমাদের অবস্থা—'I am the rear guard of the Grand Army'। প-মার আরও দুইজন ভাই তাহাদের গাড়ী লইয়া আমাদের দলে ছিল। বড়দা' প-মাকে তাহার বেকুবির জন্য গালি দিলেন, আমরাও ছাড়িলাম না। প-মার কাণে বোধ হয় সে বকুনি পৌঁছায় নাই। কারণ সে 'আবার ফিরে পেয়েছি'র আনন্দেই ভরপূর।

তাহার পর হইতে সম্বিৎ-জী আমাদের সঙ্গ লইলেন। প-মা শেষে বলিল যে, এরূপ অবস্থায় গরুদের একটী মজার আচরণ আছে। তাহারা বনের ভিতর কখনও যায় না। সটান সিধে রাস্তা ধ'রে আবার ঘরেই ফিরে। আত্মরক্ষার সংস্কার যে প্রাণী-মাত্রেরই জন্মগত। ইহার পর ফণীবাবু খানিকটা ঘুমাইলেন। সম্বিৎ-জী শেষরাত্রটা ঘুমান। কাজেই সকলেরই পালা শেষ হইল। এ অঞ্চলে প্রায়ই দুই একটী করিয়া গ্রাম, তাহার পর এক মাঠ, আবার গ্রাম ও মাঠ—এই ক্রম। মাঝে মাঝে তড়াগ-পুষ্করিণী ফাঁড়ী সাঁকো বকুলতলা।

৩রা বৈশাখ, সোমবার। প্রভাতকাল। কোন্ গরু কাল পলাইয়া-

ছিল, সকলেই জানিতে আসিলেন ও দেখিলেন। পথে যে যা'র গাড়ী থানিক থানিক থামাইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া লইলেন। রজনী যেন মহাপ্রলয়—তখন জীব-জন্তু-জড় মহানিদ্রাগত। সমস্ত প্রকৃতি তমসাচ্ছন্ন—অসাড় নিস্পন্দ প্রাণহীন। মঙ্গলময়ী উষার পুণ্য-সমাগমের সহিত জীবনালোক ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সরসতা নবীনতা জীবন্ত-ভাব চোখের সমক্ষে ক্রমশঃ মূর্ত্তি লইয়া কুমুদের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। চারিধারে খোলা মাঠের শান্ত, সুশীতল, মৃদুমন্দ মলয়পবন—আনন্দের—সজীবতার হিন্দোল। ভোর হইতে না হইতেই দেখি, মাল-কোঁচা আঁটিয়া, হালহাতে কৃষক ক্ষেতের মাটী তৈয়ারী করিতেছে। এইবার সকল যাত্রীর যান একত্র সারবন্দী দেখিতে পাইয়া আনন্দ হইল।

রৌদ্র উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বেলা বাড়িতে লাগিল। সকালবেলা বেসুরো-বেতালা খানিকটা চীৎকার করা গেল। বাঁকুড়ার সাধুদের গাড়ীখানি ঠিক আমাদের পূর্ব্বে চলিতেছে। ঘড়ি দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, বেলা প্রায় নয়টা। আচার্য্যের 'হাওয়া-গাড়ী' আমাদের মন্থরগতিকে ধিক্কার দিতে দিতে কোয়ালপাড়ার মঠের দিকে উড়িয়া চলিয়া যাইবে—প্রতিক্ষণেই আমরা উহার প্রতীক্ষায় পিছন-পথপানে চাহিয়াছিলাম। এখনও আসিলেন না কেন? তবে তাঁহাদের কি হইল? মোটর কি বিগড়াইল? তাঁহাদের ভিতর কাহারও শরীর কি অসুস্থ হইল?—ইত্যাদি নানা চিন্তা।

বাহিরে খোলামাঠের তীক্ষ্ণ খর-রৌদ্র, আর সকলের মনের ভিতর ভাবনার জ্বালা। যতশীঘ্র একটা খবর পাওয়া যায় ততই ভাল। স্বামী চন্দ্রেশ্বর-জী পথে কোতুলপুর হইতে এক 'বাইসাইকেল' জোগাড় করিয়া খবর আনিবার ভার লইলেন—বিষ্ণুপুরের পথে চলিলেন। আমরা নানাগ্রাম পার হইলাম। সকল জায়গার নাম প-মাও করিতে পারিল না। স্বামী কেশবানন্দজী আমাদের জন্য একটী ক্রমানুযায়ী তালিকা দিয়াছেন। কত গ্রাম এই চব্বিশ মাইলে আছে সেটা দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে। প্রথমে—কৃষ্ণবাঁধ। তাহার পর বন আরম্ভ। সর্ব্বশুদ্ধ ঊনত্রিশখানি গ্রাম, যথা—গয়লাপুকুর, কামারপুকুর

ঠাকুরের নহে), তাঁতিপুকুর, মাচানতলা, জয়পুর, কুম্ভস্থল, বৈষ্ণব-বাগান, বগাজোল, রাজগ্রাম ও তাহার হাইস্কুল, নামছড়া, গেলে, সুকজোড়া, সাঁইতাড়া, মির্জ্জাপুর, রায়বাগ্নী, পাথরচটি, আশুদে, মালপুকুর, গোগ্ড়া, ভদ্রপুকুর, গাঁতি, শিরোমণিপুর, কোতুলপুর, জোল্ট্যা, মুইদাড়া, ময়রাপুকুর, সাহেবগঞ্জ, ডেওয়াপাড়া—শেষে কোয়াল-পাড়া।

প-মাকে যদি বলা যায় 'দুটোর ভিতর পৌছাব তো?' সে অমনি সরলভাবে বলে 'তা—হ'তে পারবেক।' তাহার পক্ষে দুই চারি ঘণ্টার পার্থক্য কিছুই নয়। সময়ের মূল্য বিশেষ আছে বলিয়া বোধ হইল না। পথ আর ফুরায় না। বেলা প্রায় এগারটায় কোয়ালপাড়ায় পৌছান গেল।

কোয়ালপাড়া—মঠে

দারুণ গরম। চব্বিশ মাইল 'ইতি' হইল। আচার্য্যকে অভিবাদন ও বরণ করিবার জন্য পশ্চিমদ্বারী আশ্রমবাটীর সমক্ষে মঙ্গলকলস স্থাপিত দেখিলাম—চূতমালা ঝুলিতেছে। ভিতরে নাতিদীর্ঘ একটী উঠান—উঠানে একটী মরাই। পশ্চিম ও দক্ষিণে সাধুদের থাকিবার ঘর। উত্তরে ঠাকুর ঘর। দক্ষিণধারের একতলার ঘরে তল্পীতল্পা সব নামাইয়া হাবড়া ষ্টেশনের উপরে যাত্রীদের মত সবাই গড়াগড়ি দিলাম। সে ঘরের ঢুকিবার দরজাটী বড়ই ছোট—আন্দাজ হাত দুই হইবে। লম্বা ও মোটাসোটা মানুষের বড়ই বেগতিক। অনেকেরই মাথা ঠুকিল। ঠাকুরপ্রণাম, সন্ন্যাসীদের প্রণামাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লইলাম। কেহ কেহ আশ্রম প্রাঙ্গণের কূয়াতে, কেহ বা বাহিরে পুষ্করিণী হইতে স্নান সারিয়া লইলেন। চা'ও মিলিল। অনেকে উহা ছাড়িয়া সরবৎ ধরিলেন। তাহার পর জল-খাবার।

আন্দাজ দুইটার সময় আমরা সকলে উঠানে একটী সামিয়ানা তলে পেট ভরিয়া অন্নপ্রসাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম। স্বামী কেশবা-নন্দজী বেশ সুচারু বন্দোবস্তই করিয়াছিলেন। আদর-আপ্যায়ন

যথেষ্ট মিলিল। তাঁহার সহ-কর্ম্মীদের সকলেই আমাদের খুব যত্ন করিলেন। কিন্তু মোটের উপর 'শিব-হীন দক্ষ-যজ্ঞ'ই আজ হইল।

খাওয়া-দাওয়ার পর এক ঘুম দেওয়া গেল। বিষ্ণুপুরের ডাকহরকরার মারফৎ বেলা তিনটার সময় আচার্য্যের সংবাদ আসিল। মোটর বিষ্ণুপুরেই বিগড়াইয়াছিল, কাজেই প্রাতে যাত্রা করা হয় নাই। সেদিন সন্ধ্যায় ছাড়িয়া মঙ্গলবার প্রাতে কোয়ালপাড়ায় পৌছিবেন। এখানে গাড়ী ও পাল্কীর বন্দোবস্ত থাকিবে—শীঘ্র যাহাতে শ্রীধামে যাত্রা করিতে পারেন। খবর পাইয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন। পরে জানা গেল, সেই হাওয়া গাড়ীকে স্ব-স্থানে পাঠাইবার জন্য বাঁকুড়ায় তার করিয়া কুলী আনাইয়া কার্য্য শেষ করিতে হইয়াছিল। গাড়ীর বরাত!

পূর্ব্বাহ্নে ২৪ জন গাড়োয়ান মজুরী লইবার জন্য একত্র আশ্রম প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। ৪।৫ জন করিয়া কয়েকটী দল তাহারা গড়িয়া লইল, মোড়লদের হাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০৲ টাকা দেওয়া হইল। শুনিলাম উহারা আরও কিছু বক্‌শিস চায়।

বৈকালে চা মিলিল। তাহার পর চারখানি গরুর গাড়ীতে মাল চাপাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বিকালবেলাটা খুবই চমৎকার, আরামপ্রদ ও স্নিগ্ধকর। বিদায় লইবার পূর্ব্বে স্বামী কেশবানন্দজীর দাওয়ায় বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। হাঁপানি, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নানা উপসর্গে তাঁহার শরীর খুবই খারাপ হইয়াছে দেখিলাম। তাঁহার আশ্রমে বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই তাঁত, কৃষিকর্ম্ম, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলিতেছে। 'যমুনা' ও 'সরস্বতী' নামাঙ্কিত দুইখানি তাঁতও দেখিলাম। আগে অনেকগুলিই চলিত। স্থানীয় ছাত্রদের তাঁত শিখাইবার বন্দোবস্ত খুবই চমৎকার ছিল। এইখানকারই ভূতপূর্ব্ব দুই জন কর্ম্মী মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে তাঁহাদের নিপুণ হস্তের সুচারু শিল্পকর্ম্ম দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। জীবন দিয়া নিঃশব্দে একাগ্রমনে গ্রামে কাজ করিয়া যে অমূল্য অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু বলিলেন। সেগুলি পুঁথির ছেঁদো কথা নহে, মানুষ হাতে-নাতে ঠেকিয়া-ঠকিয়া যাহা শিক্ষা করে—তাহারই

কথঞ্চিৎ। লোকলোচনের অন্তরালে—যেখানে করতালি নামযশ প্রশংসা অভিবাদন নাই—সেই পল্লীগ্রামে কাজ করা যে কিরূপ কষ্টকর বেশ বুঝা গেল। পল্লীবাসীর সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামী ও বিপক্ষাচরণের কথাও বলিলেন। শ্রীগুরুর নাম লইয়া, তাঁহারই ভাব ও উপদেশ ছড়াইবার জন্য —আর পল্লীবাসীকে তাহার পায়ের উপর দাঁড়াইবার, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় তাহাদের চোখের সমক্ষে দেখাইয়া দিবার জন্যই তাঁহাদের এই প্রতিষ্ঠান। বিকারগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য করিতে গিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসক অনেক অপমান—লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নীরবে সহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বুকের পাটা ও কলিজার জোর উহার ফলে বরং বাড়িয়াছে দেখিলাম। ম্যালেরিয়ার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ এখনও অব্যাহত। তথাপি তিনি বলিলেন—সবাই মিলে ভুগিতেছি বটে, কিন্তু আমরা নিরাশ নহি। আজ হউক কাল হউক—বাঙ্গলার পল্লী জাগিবেই—উঠিবেই। ভগবানের কৃপা কি ব্যর্থ হইবে? মনে মনে বলিলাম—'বাঢ়ম্'।

আশ্রমে নিরাশ্রয় বালকদিগকে আশ্রয়-আহার-শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আছে। যাহারা জন্মজন্মান্তরের বহু সুকৃতির ফলে ছেলেবেলা থেকে ঋষির আদর্শে গড়িয়া উঠিতেছে, সেরূপ কয়েকটী বালকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া আনন্দ হইল। সংসারে তাহাদের দেখিবার কেহ নাই,—থাকিলেও কেহ দায়িত্ব লইতে চান না। সন্ন্যাসী বুক পাতিয়া ফেলা-ছেলে কুড়াইয়া লইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা এখানে আসিলে নিকটস্থ 'জগদম্বা আশ্রমে' থাকিতেন—সেটী একটী পৃথক্ প্রতিষ্ঠান—নারীবিভাগ। সকলকে প্রণামাদির পর আমরা বিদায় লইলাম। শেষ পর্য্যন্ত যত ভক্ত এই পথ দিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুপুরে ও এখানে এইরূপ আদর যত্ন পাইয়াছেন।

'দেখ যাত্রী যায়, জয়গান গায়'

তখন গোধূলি। পল্লীপথে গল্পগুজব করিতে করিতে আমরা সকলে মিলিয়া চলিতেছি। খুব আনন্দ হইল, বড় ভাল লাগিল। চারিধারে

খোলা মাঠ—যেথায়ই চক্ষু যায়, কেবল প্রশস্ত-বিস্তৃতি—সবই উন্মুক্ত বাধাহীন নিঃসঙ্কোচ। পাঁচিলে-ঘেরা দেওয়ালে বেড়া-দেওয়া—পার্টিসনের দাপটে মানুষের অন্তরাত্মাকে চীনা মেয়েদের পায়ের মত বুটের ভিতর জমাটভাবে খঞ্জ, বদ্ধ করিয়া চাপিয়া রাখার চেষ্টা নাই। মাথার উপর অনন্ত আকাশ—একখানি নীল কম-ছবি, স্নিগ্ধ-সুচারু সে রূপের ছটা। নীচে সবুজ ক্ষেত্রে, সবুজ শস্যে, সবুজ গাছে, সবুজ পাতায়—কেবল সবুজেরই মেশামেশি। স্থানীয় একটা ভদ্রলোক আমাদের প্রায় গ্রামের শেষ-সীমানা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন—তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ হইলাম। তিনি বলিলেন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কাটে ভাল, কিন্তু বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির আক্রমণ আরম্ভ হয়। বর্ষায় সব কবিত্ব-ভাবুকতা-স্বাচ্ছন্দ্য ম্যালেরিয়ার চাপে মরিয়া যায়। কোয়াল-পাড়ায় আশ্রমের পূর্ব্বদিকে পাণা-ভরা পুকুরটী দেখিয়াই কতকটা বুঝা গেল। ঐরূপ পুকুর-খানা-ডোবাই 'এনোফিলিস্' মশার সূতিকাগার।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আঁধার ঘনীভূত হইতে আরম্ভ হইল। কলু-পুকুর, তাঁতি আহের খাল, যমুনা, দেশড়া—তাহার পর আমোদর নদ। অবশেষে পথের শেষ—জয়রামবাটী। আমরা আলো জ্বালাইয়া ফেলিলাম। অন্ধকার বৃদ্ধির সহিত পায়ের ক্ষিপ্রতা কমিতে লাগিল। অনভ্যস্ত স্থানে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইল। আমাদের ভিতর ঐ অঞ্চলেরই এক সাধুজী অগ্রগামী হইয়া পথ দেখাইতে লাগিলেন। আল, গর্ত্ত, খানা—যেখানে যাহা পড়িতেছিল—পূর্ব্ব হইতে দলের সকলকে সাবধান করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

এমনি-ধারা পায়ে-চলার পথ ধরিয়াই প্রাচীন ভারতের মানুষ তীর্থযাত্রা করিতে বাহির হইত। তাহারাও আমাদেরই মত ছোট-বড় মণ্ডলী রচিয়া চলিত। পালি-সাহিত্যে যে যাত্রীদের কথা আছে—যাঁহারা বাণিজ্যের পথ দিয়া পায়ে চলিয়া ভারতের পশ্চিম প্রান্ত ভরুকচ্ছ (ব্রোচ) হইতে পূর্ব্বে রাজগৃহ (রাজগীর) পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা করিতেন, তাঁহাদের স্মৃতিই অন্তরে জাগিল। অবশ্য, আমাদের মাত্র চারি পাঁচ মাইল পথ। যাঁহারা পূর্ব্বে দ্বারকা

বা পুরী পায়ে চলিয়া যাইতেন তাঁহাদের—আনন্দ, আগ্রহ, কষ্টসহিষ্ণুতা ভাব-ভক্তি কত অধিক ছিল তাহার কতকটা ছায়া পাওয়া গেল।

পথ ফুরাইল। আমরা আন্দাজ আটটার সময় অন্ধকারে আমোদর-তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তথা হইতে মাঠের পারে,—বনানীর ঘনতমিস্রার ভিতর হইতে যেন সৌদামিনী চমক দিল—শ্বেত শ্রীমন্দির দীপের আলোয় ঝলসিয়া উঠিল। এই পল্লীর 'ব্রজবুলি'তে বলিতে গেলে—'হা-ই উ-বাগে, লি-লি কর্‌ছে'। একজন গান ধরিলেন—'ঐ যে দেখা যায় আনন্দ-ধাম—ইত্যাদি'। মহামায়ার 'জয়' দিয়া ক্রমে দক্ষিণমুখো শ্রীধামে পৌঁছিলাম—৩রা বৈশাখের রাত্র। মন্দিরের নিকটেই একটী দাওয়া ও ঘর আমাদের জুটিল। আঁধারে আর কিছুই দেখা গেল না। মাল অন্যপথ দিয়া খানিক পরে পৌঁছিল।

আন্দাজ এগারটার সময় প্রসাদাদি পাইয়া আমরা ঘুমাইলাম। সব চুপ্‌চাপ্‌। সকালে জাগা যাবে।

শ্রীসুব্রহ্মণ্য।

"স্বপ্নময় জগৎ"

এই যে বিরাট বিশ্ব
সকলি স্বপনে গড়া
অসার অনিত্য সব
কিছু নাই স্বপ্ন ছাড়া
কেন তবে ভুলে যাও
হের এই বিদ্যমান
সদাকাল স্মর তুমি
নিত্য সত্য ভগবান॥

ত্যাগচৈতন্য
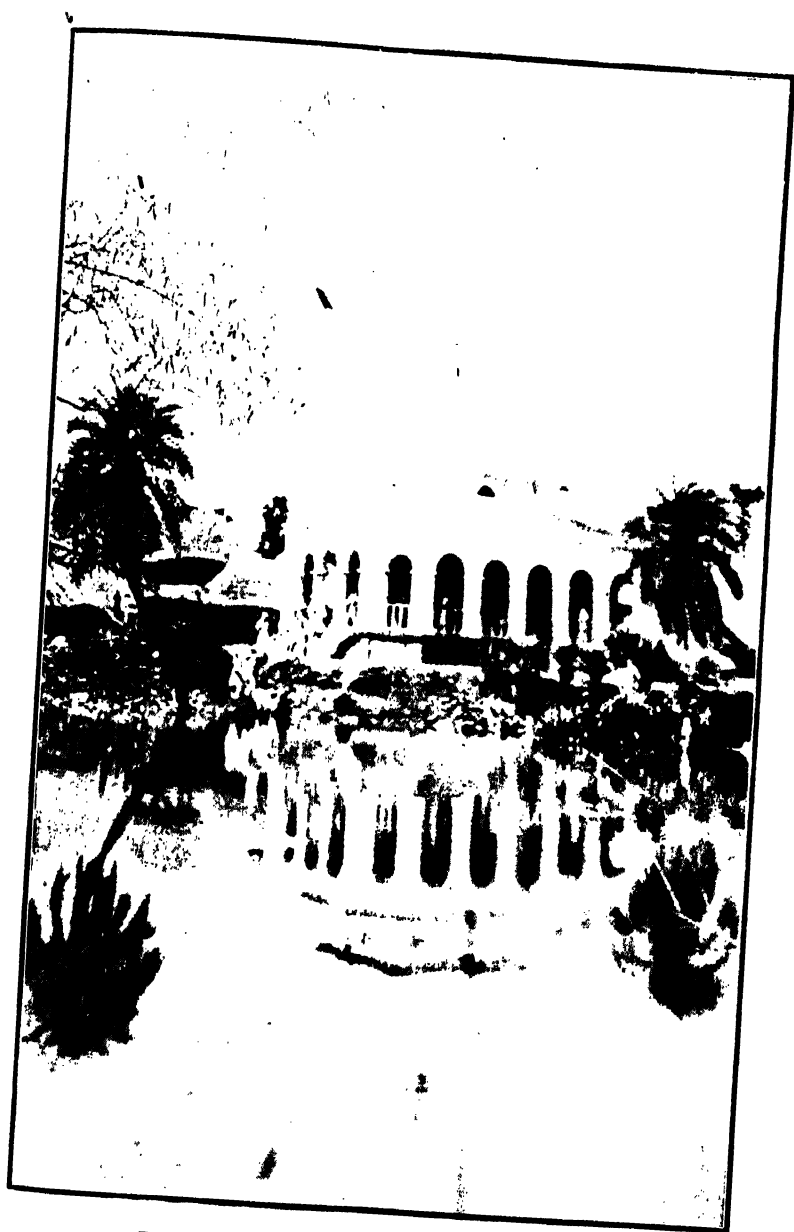
শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দির

—জয়রামবাটী—

কাশ্মীরে অমরনাথ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

ইতিপূর্ব্বে অনেক যাত্রী রওনা হইয়াছেন এবং আমি ও আর কাল বিলম্ব না করিয়া সমস্ত মাল লইয়া অগ্রসর হইলাম। আমি একটী ঘোড়ায় চড়িলাম এবং অপর ঘোড়াটীতে (যেটী ব্রহ্মচারীর জন্য লওয়া হইয়াছিল) পাচক চড়িলেন। বলিয়া রাখি পাহাড়ী ঘোড়া (টাট্টু) জোরে চলে না এই জন্য ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস না থাকিলেও ইহা অনায়াসে চড়িয়া যাওয়া যায়; তবে চড়াইও ওৎরাই করিবার সময় একটু হিসাব করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা না হইলে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভব, আর এক বিষয়েও সতর্কতা আবশ্যক; প্রাতে চড়িবার পূর্ব্বে ঘোড়া খাইয়া পেটটী বেশ মোটা করিয়া রাখে এবং তখন জিনের বাঁধন পেটে খুব আঁটিয়া থাকে, কিন্তু ক্রমাগত ২।৩ ঘণ্টা চলিতে চলিতে ভুক্ত আহার হজম হইয়া যাওয়ায় পেট একটু কমিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে পেটের বাঁধন আলগা হইয়া যায়। ঐ সময় সাবধান হইয়া না নামিলে জিনশুদ্ধ ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ, কারণ আমি ঐরূপ অবস্থায় দুই দিন পড়িয়া গিয়াছিলাম; ভাগ্যক্রমে কোন প্রকার আঘাত পাই নাই। আজকার রাস্তা একেবারে সমতল; দুই দিকে দূরে দূরে পাহাড় এবং মধ্যে সমতল হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া রাস্তা। লম্বোদরী বা লিডার নদী হইতে একটি কাটাখাল মটনের দিকে আসিয়াছে; ঐ খাল কখনও আমাদের পার্শ্বে পড়িতেছে আবার কখনও দূরে চলিয়া যাইতেছে। পথে গ্রাম্য বালক বালিকারা আপেল, আখরোট ও অন্যান্য ৩।৪ প্রকার ফল লইয়া যাত্রীদের নিকট ছুটিয়া আসিতেছে; সব ফলই খুব সস্তা, আপেল এখনও ভাল পাকে নাই, এইজন্য একটু টক। যে আপেল কলিকাতায় টাকায় ৪টা

তাহা এখানে পয়সায় ৪।৫ টা। অনেক যাত্রী আখরোট কেনে এবং তাহা চিবাইতে চিবাইতে পথ চলিতে থাকে। মটন হইতে মাইল খানেক আসিয়া পথপার্শ্বস্থ পর্ব্বতগাত্রে একটি গুহা আছে; উহা পর্ব্বতের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর আরও ৪ মাইল দূরে এক বহুমুখী মহাদেব আছেন। যাত্রিগণকে দেখিবার জন্য গ্রামস্থ লোকেরা স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া বসিয়া আছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমি প্রায় ১১টার সময় ১২ মাইল দূরে আয়েশমোকাম নামক পড়াওয়ে উপস্থিত হইলাম। "পড়াও" অর্থে রাত্রিবাসের ফাঁকা মাঠ; ইহা চটি নহে এবং এখানে থাকিবার জন্য কোন প্রকার চালা বা ঘর অথবা দোকান নাই। আসিয়াই দেখিলাম যাহারা অগ্রে যাত্রা করিয়াছিল তাহারা সকলে তাঁবু লাগাইয়া তাহার মধ্যে আরাম করিতেছে, ময়রার দোকান ও মুদিখানা বসিয়া গিয়াছে। ৬।৭ খানি মুদির দোকান ও তত সংখ্যা ময়রার দোকান যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলে। ইহারা সর্ব্বাগ্রে পড়াওয়ে আসিবার চেষ্টা করে,যাহাতে যাত্রীরা পৌঁছিয়াই খাবার পাইতে পারে। খাবারের মধ্যে পাওয়া যায়ঃ— মোটা পুরী, সামান্য তরকারী, আচার, হালুয়া, শুকনা মেঠাই ও পেঁড়া, বেগুণি, ফুলুরি, এবং দাল রুটি। খাবারের দাম যত পথ এগুন যায় তত বাড়িতে থাকে। দুপয়সার একখানি পুরী শেষে চার পয়সায় দাঁড়ায়। মুদির দোকানে কয়েক প্রকার মসলা, বাদাম, আখরোট, কিসমিস ও আলু পাওয়া যায়। আমাদের জিনিস পত্রাদি একস্থানে রাখিয়া স্বামিজীর জন্য পথে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি, ব্রহ্মচারী ও রাজসরকারের তরফ থেকে একজন পথপ্রদর্শক একখানি মোটর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া স্থান ঠিক করিয়া দিলে আমাদের তাঁবু লাগান হইল এবং আমরা বিছানা পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমাদের পাচককে মটনে যাইয়া তাঁহাকে আনিতে আদেশ করিলেন। অধিকন্তু এখানকার খালি মাঠের উপর বিছানা পাতিলে অনেক সময় বিছানা সেঁত সেঁতে হইয়া যায় এই জন্য তিনখানি চেটাই (একপ্রকার

মোটা মাদুর) আনিবার জন্যও বলিয়া দিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় পাণ্ডা মাদুর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা তাহার উপর বিছানা পাতিয়া নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আজ গোলমালে রান্না হওয়া অসুবিধা বলিয়া স্বামিজী ও ব্রহ্মচারী ব্যতীত অন্য সকলে ধর্ম্মার্থ আফিষে যাইয়া খাইয়া আসিলাম। আমাদের তাঁবু দুইটী সাধারণ তাঁবু অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। উহা দুইভাগে বিভক্ত ছিল, একটী গোসলখানা ও একটী শয়নঘর। একটী তাঁবুতে স্বামিজী ও ব্রহ্মচারী থাকিতেন এবং অপরটীতে পাণ্ডা, পথপ্রদর্শক, ও পাচক এবং আমি থাকিতাম। কুলীগণ আমাদের তাঁবু ছাড়িয়া কোনরূপে রাত্রিযাপন করিত। যে মাঠে তাঁবু পড়িয়াছিল তাহার একদিকে নদী এবং অপর দিকে একটী অনুন্নত পাহাড়। পাহাড়ের উপরে আয়েশ-মোকাম বা জনকমহল নামক একটী বৃহৎ বাটী। কিম্বদন্তী এইরূপ জনক রাজা ওখানে বাস করিতেন। ঐ পাহাড়ের উপরেই কয়েক ঘর লোকের বাস আছে।

পর দিন প্রভাতে সকলে পুনরায় অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বদিনে যে মাঠ সৈন্যগণের বিরাট শিবিররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল, আজ আবার তাহা মাঠে পরিণত হইল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই ছড়ি রওনা হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধুসন্ত অনেকেই এবং দোকান-দারগণ চলিয়া গিয়াছে। যাহাদের বোঝা অল্প তাহারা যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বাকী সকলে যাইবার যোগাড় করিতেছেন। অমর নাথের পথ অতি সঙ্কীর্ণ, আবার কোন কোন স্থানে দুই দিকেই পাহাড়। এই জন্য ভারবাহী ঘোড়া বাহির হইয়া পড়িলে তাহাদের অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় না; ফলে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে অনেক দেরী হইয়া যায়। পুনশ্চ দেরী হইলে থাকিবার স্থান মনোমত পাওয়া যায় না। এই হেতু সকলেই আগে বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টা করে। আমরা কোন দিনই আগে বাহির হইতে পারিতাম না; কারণ আমাদের বোঝাও বেশী ছিল আর স্বামিজীও প্রাতরাশ না গ্রহণ করিয়া বাহির হইতেন না। ফলে আমরা কোন দিনই থাকিবার ভাল যায়গা পাইতাম না।

এইবার আমরা ক্রমশঃ পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। দুইদিকেই দূরে দূরে পাহাড়, মধ্যদিয়া পথ; পথের এক পার্শ্বদিয়া লম্বোদরী নদী প্রবাহিতা। এখন হইতে তিনটী পড়াও আমরা এই নদীর ধারে ধারে যাইব। আজকার পথ অতি মনোরম; পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গল এত পরিষ্কার এবং বৃক্ষ-গুল্মাদিতে এমন সুন্দরভাবে প্রকৃতি-দেবী বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে এক এক সময় তাহাদিগকে বাগান বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। স্থানে স্থানে বনভূমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠারূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। উচ্চশির পাইন গাছগুলি স্তবকে স্তবকে ক্রমোন্নত পাহাড়ের গায়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আর পাদদেশে কল্লোলিনী লম্বোদরী দিগন্তবিশ্রুত তান তুলিয়া তরঙ্গ ছুটাইয়াছে। সেই দৃশ্যের সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্য মনকে স্তম্ভিত করিয়া স্বতঃই তাহাকে ধ্যানমুখী করিয়া তুলে। কাশ্মীর যে ভূস্বর্গ তাহার এই স্থানটী একটী নিদর্শন। এই বিচিত্র নিবিড় হরিদ্বর্ণ চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা বেলা আন্দাজ ১২ টার সময় পহেলগাঁও নামক পড়াওয়ে উপস্থিত হইলাম। পথে আসিতে আসিতে আয়েশ মোকাম হইতে ৫ মাইল দূরে গণেশপুরা নামক একটি খুব ছোট গ্রাম পাইয়া ছিলাম। যাহা হউক, আজ যে স্থানটীতে তাঁবু পড়িল সে স্থানটী যেন প্রকৃতি দেবীর লীলা স্থল। স্থানটীর উপর এবং নিম্নে উভয় দিকেই পথ বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে; নদীর গতিও তদ্রূপ। মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হয় যেন আর কোন দিকে পথ নাই। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত; নদীটা বোধ হয় যেন পর্ব্বতের সানুদেশ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইয়া কিয়দ্দূর গিয়াই কোন গুপ্ত গহ্বরে লুকাইত হইয়াছে, আবার পাইন বৃক্ষ-মণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চাতে অভ্রভেদী তুষার-কিরীট ভূধরগণ রবিকিরণ বিচিত্রবর্ণে প্রতিফলিত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে-ছিল। বাস্তবিক সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে যুগপৎ রোমাঞ্চ হইয়াছিল। স্বামিজীকে বলিলাম "মহারাজ, আপনি ত পৃথিবী পর্য্যাটন করিয়াছেন, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান

দেখিয়াছেন ; এখন তুলনায় কোন স্থান ভাল অনুগ্রহ করিয়া বলুন”। তাহাতে তিনি কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কয়েকটী সাহেব এখানকার ছায়াচিত্র (photograph) লইতেছিল দেখিলাম। দুইটী মেম একটী সাঁকোর উপর বসিয়া জল-রঙে (water colour) এই স্থানের চিত্র আঁকিতেছিলেন। স্বামিজীর নিকট Camera ছিল, তিনিও তিনখানি ছবি লইয়াছিলেন।

এই স্থানে আমাদের দুই রাত্রি বাস করিতে হইবে এই নিয়ম। আজ একাদশী পাকশাকের কোন হাঙ্গামা নাই। দোকান হইতে পুরী কিনিয়া খাইলাম। বৈকাল হইলে মেলার সমগ্র স্থানটুকু বেড়াইয়া দেখিলাম ; শুনিলাম অন্যূন ৫০০০ লোক সমবেত হইয়াছে। এত লোক নাকি কোনবার একত্রিত হয় নাই। বাঙ্গালী যাত্রী প্রায় ৩০ জন ছিল, তবে গৃহস্থ যাত্রীর মধ্যে পাঞ্জাবীই অধিক। অনেক নগ্ন-সাধু ফাঁকা মাঠের মধ্যেই রহিয়াছে দেখিলাম। দুরন্ত শীত তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ধুনির সামান্য একটু অগ্নিমাত্র তাঁহাদের সহায়। কিন্তু দেখিলাম ইঁহাদের অধিকাংশ বড় ক্রোধ-পরায়ণ ; সামান্য কারণেই ইঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দেখা যায়। আজ হইতে প্রত্যহ বৈকালে ছড়ির নিকট অমর কথা হইতে লাগিল। অমরকথা সংস্কৃত পদ্যে বাঁধা। একজন পাণ্ডা ইহা পড়ে ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেয় ; অনেক যাত্রী সমবেত হইয়া ইহা শ্রবণ করে এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে দক্ষিণা দান করে। অমরনাথ পর্য্যন্ত পথের নানা স্থানের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এই কথায় আছে। আমাদের পাণ্ডা রাত্রিতে আমাদের তাঁবুতে আসিয়াই অমরকথা শুনাইয়াছিলেন।

পরদিন প্রভাতে স্বামিজীর সহিত যে পথে আসিয়াছিলাম সেই দিকে বেড়াইতে গেলাম। এক মাইল যাইয়া নদীর অপর পারে অগস্ত্যকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে ; আজ তাহাতে স্নানবিধি এবং অনেক যাত্রী সেখানে স্নান করিতে গিয়াছেন শুনিলাম। আমরা কিন্তু তথায় যাই নাই। আমরা যেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম সেই স্থানটীই পহেল গাম। গ্রামে ১৫।১৬ ঘর মুসলমান আছে মাত্র। ইহাদের ঘরগুলি

বড় বড় চকোর কাঠ দ্বারা কোনরূপে নিম্মিত। ইহারা নিতান্ত গরিব বলিয়া বোধ হইল। এখানে একটী দোকান আছে। এখান হইতে আমরা একটু উপরে পাইন গাছের জঙ্গল মধ্যে গেলাম। যাইয়া দেখি বহু সাহেব মেম তাঁবু ফেলিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেছে। প্রায় ৬০।৭০টী তাঁবু রহিয়াছে। এখানে ২।৪ খানি মুদীর দোকান, মাংসের দোকান ও একখানি সাহেবের নানা বিলাতি জিনিষের দোকান আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন শান্তির রাজ্যে তাহারা বাস করিতেছে।

ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণের সৌন্দর্য্য প্রিয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কোন সুন্দর স্থান ইহাদের চক্ষু এড়ায় না। আশ্চর্য্য, কোন ভারতীয়কে এখানে থাকিতে দেখিলাম না। স্বামিজীর বড় ইচ্ছা হইয়াছিল তিনি এখানে থাকেন। কিন্তু পথ হইতে এসব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক শুনিলাম পহেল গ্রাম অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বিশেষতঃ কাসরোগীর পক্ষে। ভারতে যত পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যকর স্থান আছে তাহার মধ্যে ইহাই নাকি সর্ব্বপ্রধান! গ্রীষ্মের সময় সুদূর আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে অনেকে এখানে ৩।৪ মাস বাস করিয়া যান। সাহেবদের চেষ্টায় এই স্থান অবধি মোটর গাড়ীর পথ হইতেছে। যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে বোধ হয় আর এক বৎসরের মধ্যে পথ প্রস্তুত হইয়া যাইবে। ইহাতে ধনী অমর যাত্রীর অনেক সুবিধা হইবে। কারণ এক দিনেই শ্রীনগর হইতে এখানে আসা যাইবে অমরনাথের পথে পহেলগ্রামই শেষ গ্রাম; অতঃপর আর গ্রাম নাই। মাঝে মাঝে পর্ব্বতগাত্রে এক আধটী গুজরবাটি (গোমহিষাদিচারণকারীদিগের সামান্য চালাঘর) দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

পরদিন (৩রা আগষ্ট) প্রত্যুষে সকলে তাঁবু গুটাইয়া লইয়া ঘোড়ার উপর অন্যান্য মালের সহিত চাপাইয়া পরবর্ত্তী পড়াওয়ে চলিতে আরম্ভ করিল। কেহ পদব্রজে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ ঝাম্পানে, কেহ ডাণ্ডিতে কেহ বা পিট্টুতে। ইহার মধ্যে ডাণ্ডিতে সর্ব্বাপেক্ষা আরাম কিন্তু খরচ বেশী—৬৪।৬৫৲ টাকা লাগে। আরাম হিসাবে উহার নীচে ঝাঁপান,

তারপর ঘোড়া। ঝাঁপানে ৫০।৫৫ টাকা এবং ঘোড়ায় ১৫ টাকা লাগে। পিঠু বা কাণ্ডি একেবারে বিপদজনক; একজন কুলীতে পিঠে করিয়া লইয়া যায়; সে হোঁচট খাইলে বা পা পিছলাইলেই সর্ব্বনাশ। ইহাতে কৃশ এবং অথর্ব্ব লোকেরাই (সাধারণত স্ত্রীলোক) যাইয়া থাকে। যাহাহউক পূর্ব্ববারের ন্যায় তিন চতুর্থাংশেরও অধিক যাত্রী চলিয়া গেলে আমরা যাত্রা করিলাম। এই বিলম্বের জন্য আমাদের ভাগ্যে কোন দিন দুই বেলা অন্ন জুটিত না।

কথা-প্রসঙ্গে।

কথায় বলে "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" ভারতের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ব্যাসপ্রণীত জগতের সেই এক প্রাচীন ইতিহাসেই বর্ত্তমান। বাস্তব জীবনে ইহার অনুশীলন হারাইয়া ভারতের আজ এত অধোগতি। মহাভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েরই আদর্শ বর্ত্তমান। তন্মধ্যে যে সকল ক্ষত্রিয় বীরগণের অত্যদ্ভুত চরিত্র, যে চরিত্রের বিমল প্রভায় দেব চরিত্রও নিষ্প্রভ, যাহার প্রকাশ বাঙ্গালীর নাট্যের মধ্য দিয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা এ স্থলে আমরা করিতে ইচ্ছুক। ভারতের আদর্শ-ক্ষত্রিয় জগতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে আদর্শ যে জগতে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে তাহার সম্ভাবনা নাই, সে আদর্শ এক্ষণে আকাশ-কুসুম। মহাভারতের পুরুষ চরিত্রই যে কেবল উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, স্ত্রী-চরিত্র তুলনায় উজ্জ্বলতর। এক্ষণে আমরা বাঙ্গালীর নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" হইতে আরম্ভ করিব।

বিরাট নগরে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী আত্মগোপন করিয়াছেন। বিরাটনন্দিনী উত্তরার সহিত দ্রৌপদীর কথা প্রসঙ্গে, রাজকন্যা

বৃহন্নলার নপুংসকত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়া রমনীর নিজ স্বামীর প্রতি বিরাট অভিমান জাগিয়া উঠিল; ইঙ্গিতে তাহার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলেন,—

"নিজ পত্নী অপমান দাঁড়ায়ে যে দেখে;
ত্যজি অন্য জনে,
যাহার চরণে রমনী শরণ লয়,
তারে পরিহরি অন্য নারী যার সাধ—
নপুংসক সেই জন।
তীর্থ পর্য্যটনে,
রমনী দর্শনে পাসরে আপন জায়া,—
ব্যভিচারী তার হেন দশা।
অলস যে জন,
নিজ নারী না করে পোষণ,
পরবাসে কাঁদি বঞ্চে বামা,
ক্লীবত্ব তাহার ফল;—"

কথা প্রসঙ্গে, গিরীশবাবু দ্রৌপদীর মুখ দিয়া যাহা প্রকাশ করিলেন, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভারতী পুরুষের শতকরা নব্বুই জন হয় নপুংসক আর না হয় পর জন্মে তাঁহাদের গতি ক্লীবত্ব।

সামান্য দুঃখে বিচলিত দুর্ব্বল ভারতী, আজ নানা অপমান অবিচারের মধ্যেও কি প্রকারে ধর্ম্মকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে হয় যদি শিক্ষা করিতে চান তাহা হইলে দ্রৌপদী-চরিত্র অবধারণ করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। "পাঞ্চাল-নন্দিনী পাণ্ডব-গৃহিনী" ধর্ম্মের নিমিত্ত "সৈরিন্ধ্রী, সুদেষ্ণাদাসী!" "দুঃশাসন ধরিল কুন্তলে, দুর্য্যোধন উরু দেখাইয়া বলে, সূতপুত্র কীচক কুভাষে"—এত অপমান এবং স্বামীরা কেহই অক্ষম দুর্ব্বল নহে, তৎক্ষণাৎ ইহার সমুচিৎ শাস্তি বিধানে সমর্থ, "পতিগণে ভুবন বিজয়ী", "বীর বৃকোদর সুরাসুর ডরে যার ভুজদ্বয়" "যার রথের ঘর্ঘরে তিনপুর ডরে, সাগর বধির—গাণ্ডীব নির্ঘোষে যার"—কিন্তু ধর্ম্মকে উপেক্ষা কেহই করিতে পারেন না, কাজেই

ধৈর্য্যকেই তাঁহারা বরণ করিয়া লইলেন। এত অপমানেও দ্রৌপদী দেহত্যাগ করিতে পারিলেন না। কেননা ক্ষত্রিয়া রমনীর প্রতিহিংসা আগ্নেয় গিরির অভ্যন্তর অপেক্ষাও প্রচণ্ডা—তাহাই তাঁহাকে বলাইতে বাধ্য করিল "রহ প্রাণ, না মরিব বেণী না বাঁধিয়ে।"

তাহার পর প্রকাশ্যে রাজ সভায় কীচক যখন দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিল তখন বীর শ্রেষ্ঠ ভীমের মুখ হইতে "হোঃ-ওঃ" এই শব্দটী নির্গত হইল। কিন্তু সে দীর্ঘশ্বাস আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাস অপেক্ষাও ভীষণ। যুধিষ্ঠির ভীমের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে "নিজ কার্য্যে যাও হে বল্লভ" বলিয়া অন্যত্র অপসারিত করিলেন। তাহার পর যখন কীচক দ্রৌপদীকে বারবিলাসিনী বলিয়া অপমান করিল, তখন দ্রৌপদী ইঙ্গিতে ধর্ম্মরাজকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করিলেন,—

"বহ শোণিত প্রবাহ, বহ হৃদয়ে আমার,
ছিন্ন হৃদি উগার শোণিত ধারা,
ধরা বলের অধীনা,
ধর্ম্ম দুষ্টে ডরে,
সুবিচার রাজা নাহি করে!"

কিন্তু ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির তখনও কিঞ্চিণ্মাত্রও বিচলিত হইলেন না—কারণ ধর্ম্ম তাঁহার মণিকোঠার এক মাত্র পূজ্য-আদর্শ দেবতা। অত্যাচার, অবিচার, অপমানের কলুষ-বাতাস তাঁহার মানস সরোবরে একটীও হিল্লোল তুলিতে পারিল না, ধর্ম্মের হৃদ্‌পদ্মাসন একটুও টলিল না। তিনি ইঙ্গিতে দ্রৌপদীর কথার প্রত্যুত্তর দিলেন,—

"সৈরিন্ধ্রি, জানিও স্থির,
ধর্ম্ম কভু কারে নাহি ডরে,
কালে ধর্ম্ম ফল ফলে;
কাল পূর্ণ বিনা
অত্যাচার না পায় চরম সীমা;"

এই মহাবাক্য বর্ত্তমান ভারতবাসীর প্রণিধান যোগ্য। এই

সত্য অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারত-ভারতীর সত্য পথে চলা উচিত—"সত্যমেবজয়তে নানৃতম্।"

এ অবস্থায় পাঠক একবার অর্জ্জুনের হৃদয় অবগত হউন,—

"বার বার দ্রৌপদীর অপমান
সম্মুখে আমার!
বনবাস, পরবাস,
লুক্কায়িত ক্লীববেশে,
ভগবান! কি অধিক আর?
হৃদয়ে অনল যত,
শরানল প্রজ্জ্বলিত তত
করিব সমর স্থলে,
খাণ্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জন্মিল!"

কিন্তু ধর্ম্মকে তখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাই করযোড়ে প্রার্থনা করিলন,—

"ধৈর্য্য দেহ শ্রীমধুসূদন—
সখার মিনতি শুনহে পাণ্ডব-সখা।
দীননাথ! * *
হে মাধব—রাধিকা বল্লভ,
দুর্ল্লভ পদারবিন্দে রেখ এ অধীনে।"

অপর দিকে ভীম-হৃদয়ে ক্ষত্রিয় অপমানের প্রচণ্ড বহ্নিস্রোত কি প্রবল প্রবাহে প্রবাহিত তাহা একবার পাঠক-পাঠিকা নিম্নলিখিত বাক্যগুলি ধীরে ধীরে পরীক্ষা করিয়া অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারিবেন। আরও বুঝিবেন গিরীশ বাবুর মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানে কি অপূর্ব্ব অধিকার ছিল,—

"কোথা তৃপ্তি—কীচকের একমাত্র প্রাণ!
ছার সূতের নন্দন,
পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ!
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হতে।
ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে দুঃশাসন,—

বিদারি শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর!
দুর্য্যোধন! হুতাশন হুতাশন, জ্বলে,
ছার মুখে ধর্ম্মরাজে নিন্দিল পামর,
পদাঘাতে কিবা হবে প্রতিশোধ!
বধিব না—বধিব না তারে,
উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন,
শোভিত নয়ন,
ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চাহিবে যখন—
ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত;
গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহারে,
সে চরণ না হানিব বলে।
কভু না বধিব,
শৃগালে অর্পিব সেই ভার।
পড়ে মনে কীচকের ঘূর্ণিত নয়ন,
জীবিত থাকিতে নরনখে উপাড়িব;"

—পড়িয়া বোধ হয় ক্ষত্রিয়ের আদর্শ অপমানের প্রতিশোধ, পণ রক্ষা ও দুষ্টের শাসন—রাজ্যলোলুপতা নয়। রাজ্য বিস্তারের জন্য মিথ্যা বলিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত—অপমানের পরিবর্ত্তে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরত্বও তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ। তাই এত লাঞ্ছনা যন্ত্রণার মধ্যেও ভীমার্জ্জুন নীরব নিস্তব্ধ।

কিন্তু ক্ষত্রিয়া রমণীর অভিমান তদপেক্ষাও জ্বালাময়ী। কীচক কর্তৃক অপমানিত হইয়া দ্রৌপদী ভীমের নিকট গমন করিলেন ভীম তখন নিদ্রিত। দ্রৌপদী অভিমান বিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিদ্রিত, কি শুইয়াছ মহানিদ্রা কোলে—উঠ, উঠ, সূপকার"। ভীম, পাছে কেহ অন্য কিছু ভাবে বা পাছে গোপন বাসের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "গভীর রজনী, ডরি পাছে কেহ দেখে"। তখন দ্রৌপদী বিদ্রূপের অতি তীব্র হলাহল ভীমের প্রতি ঢালিয়া দিলেন,—

"কুলটায়—
পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ,
সুত পুত্র প্রহারিল পায়—
হেন কুলটায় নাহি স্পর্শে অপমান।"

তখন বরাভিমানী ভীমের বিশাল চিত্ত সমুদ্র কি ভীষণ তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়াছিল পাঠক পাঠিকা অনুমান করুন। কিন্তু সংযমী ভীম উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণা, অল্পদিন—রাজার নিষেধ!" কিন্তু সিংহিনী তাহাতে অধিকতর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—

"জানিতাম সহিবারে নারীর সৃজন—
সহ্যগুণ পুরুষে অধিক দেখি,
শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত—
ভার্য্যা ত্যজে রাজ্য যদি হয়,
অজ্ঞাত সময়, বণিতায় বলাৎকার!
ভার্য্যা হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে!
ভার্য্যা মাত্র পণের কারণ!
হীনপ্রাণা, নহি বীরাঙ্গনা,
কলঙ্কিনী দেহে কিবা কাজ।

অতঃপর ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ইঙ্গিতে ভুলায়ে, নিশাকালে আন নাট্যশালে, সেই মত ঘূর্ণিত নয়ন কামে, উপাড়িব নখে"। পরে নাট্যকার ভীমসেনের ক্রোধ কালীন মূর্ত্তি এবং সংযম এ উভয়ই উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই—

"ধৈর্য্য ধর অধীর অন্তর,
রোষ অগ্নি বাহিরিবে লোমকূপে—
মূর্চ্ছা যাবে লোকে;
স্ফীত শিরা ললাটে হেরিবে,
উগ্রমূর্ত্তি ক্ষুদ্র মৎস্য দেশে কে সহিবে!
নিশা আবরণে আবার ঢাকিবে ধরা,
নীরবে যামিনীর ঝিল্লিরবে

মিশাইবে রোষ পূর্ণ দীর্ঘশ্বাশ,
শিহরিবে ভুজঙ্গ গহ্বরে শুনি ;
শৃগালের নাদে আর্ত্তনাদ মিশাইবে তার,
না করিব রুধির পতন
সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র হবে ক্ষিতি,—
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর প্রাণ।

কিন্তু নাট্যাচার্য্য ক্ষত্রিয়দের অপর দিক দেখাইতে ভুলেন নাই। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার চিরদিনই জগতে সমান ভাবে আছে। যখন সেই অত্যাচার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় তখন ধর্ম্মস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান লীলায় মনুষ্য বিগ্রহ ধারণ করেন। বর্ত্তমানকালে অর্থশালী অভিজাতের অত্যাচার যেমন নির্ম্মমভাবে অর্থশূন্য দরিদ্রের হৃৎপিণ্ড কুরিয়া খাইতেছে, মহাভারতীয় যুগেও সেইরূপ নানা অস্ত্র শস্ত্রে বলশালী ক্ষত্রিয়কুল ঠিক একই ভাবে প্রজাপীড়নে তৎপর হইয়াছিল। এই নাটকের মধ্যে দ্রৌপদী-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে, শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া তৎকালীন অত্যাচারের বিভৎসচিত্র নাট্যকার বিবৃত করিয়াছেন,—

উন্মত্ত প্রভাবে দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়দল
নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে,—
দীন প্রজা বিকল বিগ্রহে,
কার শস্য দহে শরানলে,
কার গৃহ চূর রথ-সঞ্চালনে,
কষ্টার্জ্জিত ধন নিত্য দেয় রণব্যয়ে,
জায়া পুত্র অন্নবিনা মরে,
সন্তানে না পাঠাইলে রণে,
নৃপ কোপে সর্ব্বনাশ তার ;
বলাৎকার সুন্দরী দেখিলে,
প্রমাণ বুঝহ জয়দ্রথ-আচরণে।
হীনবল দীনস্বামী, পিতা কি করিবে ?
রক্ষক ভক্ষক—

নীরবে দারুণ জ্বালা সহে,
কারে নাহি কহে,
উষ্ণ শ্বাস সমীরণ বহে,
যে তাপে হৃদয় দহে মোর।

—শ্রীকৃষ্ণ এই উত্তাপে নিজেও দগ্ধ, কারণ "বন্ধ কারাগারে দীন পিতা জননী আমার"। দীন না হইলে দীনের ব্যথা বুঝা বড় কঠিন। তিনি "দীনের নন্দন, দীনক্ষীণ কোলে" বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। সেখানেও দেখিয়াছিলেন "দীন-হীনগণে দীন নন্দ, দীন মা যশোদা, দীন বাল্যসখা, দীন সহচরীগণ, দীন গোপাল বালক"। তাই দীনের বেদনা তিনি বুঝিয়াছিলেন—তাই অস্ত্রানলে দুরন্ত ক্ষত্রিয়কুলকে জ্বালাইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া গেলেন।

আমারাও বলি, History repeats itself; শ্রীভগবান পুনরায় বর্ত্তমান জগতের কলি কলুষ মথন করিয়া তাঁহার অমর প্রতিজ্ঞা সার্থক করুন।

সংসার।

(শ্রীঅজিতকুমার সরকার)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তারণ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিটা তাঁহাদের গায়ে কাঁটার ন্যায় বিঁধিল। তাই বাধা দিয়া মাধব গাঙ্গুলি বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ তারণ ভায়া ত ঘোষ বাড়ী যাওয়া-আসা করে' বেশ বক্তৃতা দিতে শিখেছ? বলি ভায়ারও বেম্মজ্ঞানী হবার ইচ্ছে আছে নাকি? দেখ্‌লেন ভট্‌চার্য্যদা ইংরেজি নবীশের সহবাসে কেমন মুখ ফুটেছে? আপনি যে আমাদের এখানকার এতবড় একটা 'ন্যায়রত্ন' পণ্ডিত—তা আপনার কাছে ত এত লম্বা লম্বা বক্তৃতা কোন দিনই শুন্‌তে পাইনা! এখন থেকে দেখছি কিশোরীর

কাছেই শাস্ত্রের বিধেনও নিতে যেতে হবে।” তারণ,—“আবার কিশোরী ঘোষকে জড়াচ্ছেন কেন? যা বল্‌তে হয় আমায় বলুন। তিনি ত কোন কথাই বলেন নাই!” মাধব—“ঐ তাহলেই হ’ল। বলি ভায়াত ঐ গুরুরই চেলা।” ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতক্ষণ নীরব হইয়া সব কথা শুনিতেছিলেন। উভয়েই চুপ করিলে তিনি হাই তুলিয়া, আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া বলিলেন—“আচ্ছা যদি ব্রাহ্মণ শূদ্র বলে কোন ভেদ শাস্ত্রানুমোদিত নয়—তবে “চাতুর্ব্বর্ণাং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ” কথাটার সৃষ্টি হল কোথা থেকে? ওটা কি ভগবানের শ্রীমুখেরই কথা নয়?” অন্যান্য সকলেই এই কথা শুনিয়া খুব উৎসাহের সহিত তারণ মুখোপাধ্যায়ের দিকে চাহিলেন, এবং কি প্রত্যুত্তর দেন শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিলেন। তারণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—“হাঁ। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন অবশ্যই গুণ এবং কর্ম্ম দেখিয়াই ব্যবস্থা হইয়াছিল। একথা স্বীকার করিলাম। কিন্তু গুণ ও কর্ম্মহীন হইয়া ভবিষ্যতেও সেই উত্তরাধিকারিত্বের ভোগ কোন্ আইন অনুসারে করতে চান? সে কথাও যাক্, আপনি বড় আছেন বড়ই থাকুন কেউ বাধা দিবে না কিন্তু ছোট যদি নিজের শক্তিতে বড় হতে পারে আপনার তাতে বাধা দিবার কি আছে বুঝলাম না। বিশ্বামিত্র কি ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণত্ব, ঋষিত্ব পান নাই? যে বেদব্যাস মহাভারতের রচয়িতা, বেদের বিভাগ কর্ত্তা তাঁহার জন্মের ইতিহাস কি? বাল্মীক কি ছিলেন? ছোট যদি আপনার শক্তিতে বড় হতে পারে, শূদ্র যদি শাস্ত্রদর্শী, গুণবান হতে পারে সেত আমাদেরই গৌরবের বিষয়?”

ভট্টাচার্য্য—“যা বলেছ ভায়া! গৌরবের বিষয় যাবার নয়? যারা চির দিনের দাস তারা আজ শাস্ত্র আওড়াবে সমাজ গঠন করবে আর আমরা বসে বসে দেখ্‌ব, এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি আছে? তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে দেখ্‌ছি। তুমিই কি জগন্নাথ মুখুর্য্যের ছেলে?” রাখাল।—“তাইত ভায়া পণ্ডিতি করে যে দেখছি নেহাৎ পণ্ডিত হয়ে পড়েছ? ছি ছি ছি! দেশটা হল কি ভট্টাচার্য্য

দা? শুনতে পাই আপনার পিতা আর তারণের পিতা দুই জনে কখন শূদ্রের পুষ্করিণীতে জল স্পর্শ করতেন না। দেখুন ত কি রকম নিষ্ঠা ছিল? আমরা ত সব খুইয়েছি! আর কি আচার ব্যবহার কিছু আছে একেবারে ম্লেচ্ছগিরি। তার উপর আবার শুনছি কি না সব একজাত।"

ভট্টাচার্য্য। "ওহে কলির শেষে সব একবর্ণ হবে, এ/ দেখ্‌ছি তারই লক্ষণ। ঘোর কলি! ঘোর কলি! নারায়ণ! নারায়ণ! হরি হে তোমারই ইচ্ছে।"

তারণ।—"তবে আর চিন্তার কারণ কি? যখন এক বর্ণ হইবে বিশ্বাস করেন তবে তা বন্ধ করবার জন্য আর বৃথা প্রয়াস কেন?"

মাধব।—"কি! তাই বলে জাত খোয়াব নাকি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এখনও ছত্রিশ জাত মজুত আছে। হবে বল্লেই কি হল? তোমার না বৌ না ছেলে, কাঁদ্‌তে না কাট্‌তে। বেম্মও হতে পার খৃষ্টানও হতে পার। আমাদের ঘরসংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, কুটুম কুটুম্বিতে আছে—সবদিক্ বজায় রাখ্‌তে হবে।"

তারণ। "আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না দাদা: চোখ ফুটে গিয়েছে। দেখ্‌ছ না চারদিক্ থেকে কেবল শূদ্রেরই আবির্ভাব। এই যে স্বামী বিবেকানন্দ জগৎ জুড়ে এত বড় যুগান্তরটা ঘটিয়ে দিয়ে গেলেন তিনিও কায়স্থের ছেলে। কত ব্রাহ্মণ তাঁর পায়ের ধূল পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছিল। বর্ত্তমানের মহাত্মা গান্ধীও তাই। জানাত আছে?" ভট্টাচার্য্য। "আর ও কথা তুল না তারণ। তিনি ত আবার ব্রাহ্মগিরির চরম দেখিয়ে গিয়েছেন। কি বল্‌ব দেশে আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই নইলে কি আর কায়স্থের ছেলে অতদূর করতে পারত হে? তিনি ত আবার ব্রাহ্মণের উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন শুনেছি।" তারণ। "না—চটা ছিলেন না। তবে—বৈদিক যুগের সেই জগৎ পূজ্য উদার ব্রাহ্মণ সমাজ কেবল আপনার বংশধরদিগের জন্যই সকল রকম সুখ-সুবিধা ভোগের ব্যবস্থা বেশ ভাল রকম করে যেতে পারেন নি। তাই কালক্রমে যখন দাবীর জোর কম হতে লাগ্‌ল, তখন আবার জাল ক্ষমতা পত্রের প্রণয়নও আবশ্যক হয়েছিল। ইহার ফলে এমন ব্যবস্থা হ'ল যে উত্তরাধিকারিগণ

বিনাশ্রমে নিশ্চিন্তে বসিয়া অন্নসংস্থান করতে পারবেন। ব্রাহ্মণ সমাজের যাঁহারা শূদ্রের অধিকার না-মঞ্জুর করেন তাঁহারা সেই জাল ক্ষমতা পত্রের সাহায্যে অন্যায় অধিকার ভোগ করিতেছেন,—স্বামিজী বিশ্বের দরবারে তাহাই প্রমাণ করেছেন সুতরাং সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তারা যে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুধু আপনি কেন? অনেক ভট্টাচার্য্যই অনেক কথা বলেন। তাতে কিছু যায় আসে না; কারণ চৈতন্য দেবকেও অনেকে অনেক কথা বলেছিল। মহাপারাবারের উত্তাল তরঙ্গ যখন চতুর্দ্দিক প্লাবিত করে, তখন বালির বাঁধ কোন কাজেই লাগে না। স্বার্থের জন্য চিৎকার করা আর প্রাণ দিয়ে লোকের হিত করা এর মধ্যে অনেক তফাৎ।”

ভট্টাচার্য্য। “দেখ তারণ! তুমি না জান শাস্ত্র, না জান লেখা পড়া; শুধু কটা মুখস্থ বুলি আওড়াইলেই কি হয়ে গেল? কিশোরীর কাছে শুনে শুনে ত তুমি এই সব ম্লেচ্ছ বুলি মুখস্থ করেছ? না, আর সহ্য হয় না, বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি। দেখ তুমি আর ব্রাহ্মণ সামাজভুক্ত নও। কোন ব্রাহ্মণ তোমার বাড়ীর সীমানা মাড়াবে না। আর......”
রাখাল, ও মাধব, এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন “এক জন প্রাণীও না।”

তারণ। “ক্ষতি নাই। তারণ মুখোপাধ্যায় সে ভয় রাখে না। আপনাদের যা খুসা তাই কর্‌তে পারেন। যতক্ষণ প্রাণ থাক্‌বে ততক্ষণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করব। আমি শাস্ত্র জানি না—আমি মূর্খ। সবই মেনে নিলাম, কিন্তু কিশোরী ঘোষ আর বিনয় সরকার আপনাদের কি অনিষ্ট করেছে যার জন্য তাঁদের উপর এরকম ভাবে লেগেছেন? আমি এখানে আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে আসিনি। ডেকেছিলেন তাই এসেছিলাম,—যা ভাল বুঝি তাই বল্‌লাম, আপনাদের যা ভাল লাগে তাই করুন। তাঁরা আমার কোন অনিষ্ট করেন নি, কেন তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্‌তে যাব বলুন ত? ছিঃ ছিঃ এই কি পুরুষের কাজ না ভদ্রলোকের কাজ? কোথায় সকলে মিলে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা কর্‌বেন—না কোথায় কাকে পতিত কর্‌ব, কে কোন্ পুকুরের জল খেয়েছে, কে ডোম চাঁড়ালের গা ঘেঁসে গিয়েছে, কে একজন বিপন্নকে উদ্ধার করেছে, এই নিয়ে

খুঁটিনাটি। আমি এসব পছন্দ করি না।” ভট্ট।—“কি! আমরা ষড়যন্ত্র কর্‌ছি? কিশোরী ঘোষ কিছুই করে নি? গ্রামের ছোটলোকের কাছে কি আমাদের আর মান আছে? সকলেই মনে করেছে কিশোরী ঘোষই গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা। আমার মুনিষ কুঞ্জটাকে সেদিন একটা কি বলেছি না বলেছি একেবারে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। ও কোথায় একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধমক দিবে,—না উল্টা তাকে নিজের ঘরে রাখ্‌লে। এতে কি আমার মাথাটা কাটা গেল না? এই করেই ক্ষান্ত হল না, আবার আমার কত নিন্দা করা হল। এটা কি ভাল কাজ? চিরদিন আমাদের নিয়ম চলে আস্‌ছে, মনিব যে খাদ ধান মুনিষকে দিবে সময়ে সে তার দেড়া সুদ শুদ্ধ কাটান দিয়ে নিজের পাওনা নিবে। উনি কিনা নিয়ম কর্‌লেন বিনা সুদে খাদ ধান। ছোটলোকগুলো মজা পেয়ে গেল, আর থাক্‌তে চাচ্ছে না! এসব কি ব্যবহার?” তারণ—“দেখুন অনর্থক ভদ্রলোকের অপবাদ দিবেন না। তিনি কোন খারাপ ব্যবহারের প্রশ্রয় দেননি। তবে তার কষ্ট দেখে একটু সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন এই পর্য্যন্ত। যখন কুঞ্জ সেখানে যায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। তার অবস্থা দেখে বাস্তবিকই আমার চোখে জল এসেছিল। হতভাগার একখানা আস্ত কাপড়ও নাই—আর পৌষমাসের শীত। তাই দেখে তিনি বল্‌লেন “কাল থেকে তুই আমার এখানে কাজ করিস। আর এই কাপড়খানা নিয়ে যা”—এই পর্য্যন্ত কথা। এতে কি অন্যায় দেখ্‌তে পেলেন আপনি? গরীবের দুঃখে সহানুভূতি দেখানই কি অন্যায়? তাদের এক মুঠো দেওয়া বা মিষ্টি কথা বলাই কি গর্হিত কাজ? জানি না আপনারা কাকে ভদ্র লোক আর কাকে ছোট লোক বলেন। এসব যদি শাস্ত্র বহির্ভূত কাজ বলেন, তবে এ যুগে আর একবার নূতন করে’ শাস্ত্র তৈরী করা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা সমস্ত দেশটাই মৃত্যুর দোরে পৌঁছিবে।

তারপর দেড়া সুদের কথা যে বল্‌ছেন,—সেটাতেই বা কি অন্যায় হয়েছে? সে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মাথায় করে’ কাদা মেখে চাষ করবে,—শেষে কিনা নিজে উপবাস করে’ আপনার গোলায় হাসিমুখে সবগুলি

তুলে দিয়ে যাবে এইটাই বেশ যুক্তিসঙ্গত ? চমৎকার ব্যবস্থা কিন্তু !” রসিক ঘোষ,—“দিবে না ? জমিটা কার ? রাজার খাজনা যোগায় কে ? সে যা পায় সেইটাই খুব লাভ।” তারণ।—“বেশত একবার হালের আগাটা ধরেই দেখনা লাভালাভের কথাটা বেশ বুঝ্‌তে পারবে। বলি জমি কি ভায়া নিজেই সৃষ্টি করেছ নাকি ? শুধু কয়টা টাকা খাজনা দিয়েই যদি তোমার এত অধিকার হয়, তবে সে পায়ের রক্ত মাথায় তুলে তাতে শস্য উৎপাদন করবে তার কি কোন অধিকারই নাই ? এক বৎসর তোমার মুনিষ কয়টাকে জবাব দিয়ে চুপ করে বসে দেখনা জমিতে কেমন সোণা ফলে ! অবশ্য সংসারে না খাট্‌লে দিন চলে না, কেও কাকেও বসিয়ে প্রতিপালন করে না। কিন্তু এটা অবশ্যই মনে রাখ্‌তে হবে যে, আমরা যেমন ওদের ভরসাস্থল, ওরাও তেমনি আমাদের ভরসাস্থল। ছোট লোক নইলে কারও সংসার চলে বল্‌তে পারেন ? তবে ওদের পেটে ক্ষিদে তাই না ডাকতেই দৌড়ে আসে, লাথি জুত খেয়েই পায়ের তলায় পড়ে থাকে,—আমরা মনে করি বড় লোক নইলে ওদের জীবনের কোন মূল্যই নেই।”

ভট্টা। “তার জন্য কে কি করতে পারে ? যার যেমন কর্ম্ম সে তেমনই ফল ভোগ করে। যে বড় লোক, উচ্চজাতি—সুখী, সেটা তার সুকৃতিলব্ধ। কর্ম্মফলেই মানুষ ছোট বড় হয় এই ত সংসারের নিয়ম। বলি তোমরা কি সে নিয়মটাও উল্টে দিতে চাও নাকি ? বেশ ত তোমাদের দলকর্ত্তাদের মন কি বিশ্বামিত্রের মত একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করে' দিবে ? আমাদের কাছে ছোট বড় উচ্চ নীচ ভেদাভেদ থাক্‌বেই—কেও বন্ধ করতে পারবে না। যতদিন এই সমাজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ততদিনই সমাজ—তার পরে একটা খিচুড়ির সৃষ্টি হবে। একেবারে আগাগোড়া বর্ণশঙ্কর।”

মাধব। “নিশ্চয়ই তাই। তাতে কি আর কোন সন্দেহ থাকৃতে পারে ? এইত শুন্‌ছি কে নাকি একজন ডাক্তার আজ কতদিন থেকে একটা আইন করবার চেষ্টায় আছে,—সবজাতের সঙ্গেই সব

জাতের বিয়ে চল্‌তে পারে। তারণ ভায়াও বোধ হয় ঐ দলেরই, বল্‌তে পার সেটার কি হল’?”

তারণ—“তার জন্য আর কোন চিন্তা করতে হবে না, সময়ে সবই হয়ে’ যাবে। যা সত্য, যা ন্যায় তাই থাকবে। অসত্যের রাজত্ব দশদিন। যাঁরা এসব করেন তাঁরা না বুঝে করেন না। অনেক চিন্তার পরই করেন। যাঁর ইচ্ছা হয় তিনি সেই মত কাজ করেন, যাঁর ইচ্ছা হয় না, করেন না—ফুরিয়ে গেল? কিন্তু যতই আন্দোলন করুন পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী কেও ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। যে স্মৃতি লইয়া আপনারা এত চীৎকার করেন, তাহার ভিত্তি কোথায়? দেশের প্রচলিত আচার-ব্যবহারের উপরেই কি স্মৃতির বিধান নির্ভর করে না? তখন দেশের অবস্থা যেমন ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন ছিল, তেমনি ‘স্মৃতি’ হয়েছিল, এখন একদিকে অবস্থার যেমন আকাশ পাতাল তফাৎ হয়েছে তেমনি বিধানেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক বৈকি! এটাত আর ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের যুগ নয়?”

ভট্টা—“তা স্মৃতি প্রণয়নের ভারটা কি ভায়া নিজেই নিচ্ছ নাকি?”

তারণ। “আমায় নিতে হবে কেন, যাঁর যোগ্যতা আছে তিনি আপন হতেই সে ভার নিচ্ছেন। যদি দেখ্‌বার ইচ্ছা থাকে একটু চোখ্‌ মেলে চাইলেই দেখ্‌তে পাবেন। আমাদের মনুষ্যত্বই বা কোথায় আর দেখ্‌বার শক্তিই বা কোথায়। আপনার প্রাণ বাঁচলেই যথেষ্ট। কাছেই দেখুন না, এই বঙ্কুবাবু, সে বৎসর যখন চাল নিতান্ত আক্রা হয়ে গেল, গ্রামের গরীব লোকগুল সমস্ত দিন খেটেখুটে দুই একআনা যা পায় তা দিয়ে চাল কিনে ছেলেপুলেকে যে খাওয়াবে তার কোন উপায় ছিল না; কারণ কে চাল বিক্রী করবে? এক কিশোরীমোহন বাবু, আপনি আর বঙ্কু। কিশোরীমোহন বাবুত যথাসাধ্য দান, অন্নসত্রেই কিছুদিন কাটাইলেন, আর বঙ্কু গোলায় চাবি বন্ধ করে বলে যে আমার বিক্রীর চাল নাই। কিন্তু এদিকে পাইকারদের দিয়ে চালান দিতে লাগ্‌ল এতেই ছুটী নাই, আবার এর বাড়ীতেই যারা সমস্ত দিন খাট্‌ত, সন্ধ্যায় তাদের কম সেরের ওজনে মোটা, পাথর মিশান চাল দেওয়া হত’।

বলুন ত এ সকল কেমন ব্যবহার? মানুষ কি এত পাষাণ্ড হতে পারে?"

বন্ধু। "দেখ তারণ পণ্ডিত! তুমি মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বে। তোমার কি হয়েছে যে এত লম্বা লম্বা কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছ? জান তুমি আমাদেরই চাকর। হলই বা কিশোরী ঘোষ স্কুলের সেক্রেটারী।—দেখুন ভট্টচার্য্য দা এত বাড়াবাড়ি আর সহ্য হয় না একটা বিহিত আপনি করুন।" মাধব গাঙ্গুলি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "তাইত হে তারণ ভায়া কি আজকাল সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি! তোমার যে খুব মুখ ফুটেছে!" "তা মুখ থাক্‌লেই ফুটে, আপনারাও ত কিছুতেই কম নন! যাক আপনাদের সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। অতএব অনর্থক ঝগড়ায় কাজ কি? আপনাদের যা খুসী তাই করুন আমি চল্লাম," বলিয়া তারণ মুখোপাধ্যায় সেস্থান হইতে উঠিয়া কিশোরীমোহনের বাড়ীর দিকে গেলেন। ন্যায়রত্ন বিনোদ বিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার এই ব্যবহারে ভিতরে ভিতরে রাগে ফুলিতেছিলেন, কিন্তু বাহিরে অতটা প্রকাশ পায় নাই। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর পরিষদ্‌দের বলিলেন—"দেখলে ওটার কাণ্ড-খানা। এর প্রতিকার করতেই হবে। এ সমস্তই কিশোরীর ষড়যন্ত্র· সে আমাদের পায়ের জুতর চেয়েও ছোট মনে করে। আচ্ছা দেখা যাবে!—কি রসিক! তোমার কি বল্‌বার আছে বলত একবার! শুনহে সবাই মন দিয়ে।"

রসিক ঘোষ বলিলেন,—"আমি আর কি বলব, জানেন ত সবই। দাদার কাণ্ডকারখানা যে বেশ ভাল বোধ হয় না। জাত ব'লে ত কোন একটা জিনিষ নেই। সেদিন মনিরুদ্দিন জোলা বাড়ী বসে খেয়ে গেল, যেন সে নিজের জাত এমনি ভাবে। মেয়েটা এত বড় হয়ে রয়েছে বিয়ের কোন নাম চিন্তে নাই—"। বাধাদিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন, সে যাক্ ও সবে আমাদের দরকার নাই, মেয়ের বিয়ে দেয় আর স্বয়ম্বরা করুক সে ও বুঝ্‌বে। এখন প্রায়শ্চিত্তের কথা কি হল বল।" "হাঁ। তাইত বল্‌ছিলাম—আমি সেদিন বল্লাম বিনয়বাবু যে অন্যায় কাজ করেছে তার একটা প্রায়শ্চিত্তের দরকার। কায়স্থের

ছেলে হয়ে ঐ মড়াটা ফেল্‌লে; আপনিও তাকে বেশ ঘরে নিলেন।" "তার উত্তরে কি বল্‌লে"—"বল্‌লে যে প্রায়শ্চিত্ত কিসের? খুব ভাল করেছে"। "তবে আর কি! আজ থেকে ওকে পতিত করা হল। কোন ব্রাহ্মণ যেন ওর বাড়ীতে পূজা করতে না যায়। বন্ধু (তামাদের জাতটার মত কি?" বন্ধু বলিল "মত আর কি ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই"।

ভট্টা। "তাহলেই হল। দেখ—যদি কোন লোক সম্বন্ধের জন্য আসে তাকে সব কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। (অপেক্ষাকৃত অনুচ্চস্বরে) ঐ কথাটা পর্য্যন্ত। তারপর শীগ্‌গীর স্কুলের ইনস্‌পেক্টর সাহেব আস্‌ছেন—তাঁকেও সব কথা বুঝিয়ে বল্‌তে হবে। এমন ভাবে স্কুল চল্‌বেনা। আমাদের শচে এবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। বি, এতে ওর সংস্কৃত ছিল, ছেলেটা বেশ চালাক। ওকেই যাতে ঢুকাতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। বিনয় মাষ্টারকে আর কিছুতেই রাখা যেতে পারে না। অনেক কারণেই—না।" সকলে বেশ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—"কিছুতেই না।" অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"তোমাদের আর কিছুই করতে হবেনা, যদি ইনস্‌পেক্টর কিছু জিজ্ঞাসা করেন—আমি যা শিখিয়েছি তাই বলবে। তারপর যা করতে হয় আমি করব। শচেকেও আস্‌তে লিখেছি। —হাঁ আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাশন কবে?" "আজ্ঞে—সেটা আপনিই ঠিক্ করে দেন, যেদিন ভাল হয়।" "আচ্ছা" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঁজি আনিয়া দিন স্থির করিলেন। তারপর বলিলেন—আগামী বৃহস্পতিবারেই দিন ভাল আছে ঐ দিনেই হোক। কিশোরী আর তারণকে বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ হবে? কেমন রাজী ত?" "আজ্ঞে সেকথা কি আর বল্‌তে? আপনি যা বল্‌চেন তার উপর আমাদের কি বল্‌বার আছে? "তবে আজ আমরা আসি, প্রণাম।" বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শুভেচ্ছা জানাইয়া ভিতরে গেলেন।

আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন।

(ব্রহ্মচারী ঈশান চৈতন্য)

নিজ নাভিকমলে কস্তুরী রহিয়াছে—মৃগ ইহা জানিতে পারে নাই, তাই কোথায় সেই সুগন্ধি বস্তুটী রহিয়াছে, সেই অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। মানুষের জীবন সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। জীবন প্রভাতের আরম্ভ হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষ কি যে এক অজানা বস্তুর সন্ধানে ছুটিয়াছে, সে বুঝিতে পারিতেছে না; কিন্তু ছুটিতেছে, দিন দিন কেবলই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিছুতেই স্থির নয়। শিশু বড় হইল, লেখা পড়া শিখিল, হয়ত মস্ত বড় একটা কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল, স্ত্রী আসিলেন, ছেলে হইল সংসার বাড়িল, কিন্তু তবুও শান্তি নাই, প্রাণ বলিতেছে 'ও হইল না আরও কিছু চাই'—তার পর বার্দ্ধক্য। যম এসে একদিন হয়ত বলিবেন "চল সময় হয়েছে"। তখন হয়ত বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন "তাইত, আমার ছেলেটী আর একটু বড় হউক"। কিন্তু তিনি তাহা শুনিবেন না। আবার কেহ হয়ত সংসারের অসারতা প্রাণে অনুভব করিয়া সংসার ছাড়িলেন; কঠোর তপস্যায় লাগিয়া গেলেন, ক্রমে তাঁহারও বার্দ্ধক্য আসিবে, তিনিও হয়ত বলিবেন "তাইত কিছুই হইল না"।

এই ভাবে প্রত্যেকেই এক অজানা বস্তুর জন্য চলিয়াছে। রাজা হউক, ধনী হউক অথবা পথের কাঙ্গালই হউক সকলেরই এক অবস্থা সকলেই যেন পথের কাঙ্গাল। কল্পের আরম্ভ হইতেই এই অবস্থা চলিয়াছে। আমরা মানুষ—প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামই আমাদের জীবন। প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে হইবে, সমস্ত অভাব দূরীভূত করিতে হইবে নতুবা নিস্তার নাই। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না কারণ তাহা হইলে প্রকৃতির কঠোর পেষণে চূর্ণ হইয়া যাইতে হইবে। আর এই অভাব দূরীকরণই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

যেখানে অভাব নাই সেখানেই শান্তি, যেখানে অভাব সেখানেই অশান্তি।

ইতিহাস যে সময়ের কথা স্পষ্ট বলিতে পারে না, সেই অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় মনীষিগণ উহার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন। বহির্জগতে তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া শান্তির অন্বেষণ করিয়াছিলেন; এবং আপন আপন প্রতিভা বলে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসরও হইয়াছিলেন তাঁহাদের লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে আমরা ইহার প্রমাণ পাই। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা কোন উত্তর পাইলেন না; প্রাণের প্রবল পিপাসা মিটাইবার জন্য পরে বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিতে ও অনুসন্ধান করিতে সেখানেই সফলকাম হইলেন। ভোগসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যজাতির সহিত প্রাচ্য মনীষিদের এই খানেই পার্থক্য আরম্ভ হইল। পাশ্চাত্যজাতি ইহ জগতেই সেই উদ্দিষ্টবস্তুর সন্ধান না পাইয়া আর অগ্রসর হইল না কিন্তু এদেশীয় মনীষিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইলেন। সেইজন্যই আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে এত পার্থক্য। পাশ্চাত্য ইহকাল সর্ব্বস্ব আর প্রাচ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরিত। তাহারা বলিলেন—

> ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
> ত্যাগনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ

ইহজগতের কোন বস্তুই সেই জিনিষের সন্ধান দিতে পারে না। তাঁহারা বলিলেন, সেই স্থানে, মন ও বাক্য যাইতে পারে না —"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। সেই স্থলের বর্ণনা করিতে গিয়া তাহারা নির্ভীক ভাবে বলিলেন "নতত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ"। যে খানে সূর্য্য কিরণ দেয়না, চন্দ্রতারাও নহে। বিদ্যুৎ যেখানে প্রকাশ পায় না, অগ্নির কথা আর কি? সেইখানে যাইতে পারিলেই শান্তি। তাহা এই জগতের বাহিরে সুতরাং আমাদিগকে উহার বাহিরে যাইতে হইবে। সেখানে আর কোনও অভাব অভিযোগ নাই আছে শুধু শান্তি। সুতরাং ইহা ছাড়া আমাদের আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে!

এই অবস্থা লাভই প্রত্যেকের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। জগৎ যাহার জন্য ছুটীয়াছে তাহা সেখানে আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে উহা যখন জগতের বাহিরে রহিয়াছে আর আমরা এই জগতের ভিতরে রহিয়াছি সুতরাং সেখানে যাওয়া কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? উত্তরে আমরা বলিব, উহা সম্ভবপর কিন্তু একটী জিনিষের দরকার। প্রথমে বিচার-বুদ্ধি বলে উহাকে বুঝিতে হইবে এবং তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে যে সত্যই এখানে শান্তি পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু তাহা হইতেছে কোথায়? কেহ হয়ত কত সাধে সোণার সংসার পাতিয়াছেন, উপযুক্ত ছেলে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছে, একদিন হয়ত হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইল। পিতা মাতার প্রাণে উহা খুব লাগিল আর তাঁহারা সংসার অসার বলিয়া মনপ্রাণে অনুভব করিলেন। কিন্তু হায়! কদিন যাইতে না যাইতেই সব ভুল হইয়া গেল, আবার নূতন করিয়া সব আরম্ভ হইল! উপনিষদোক্ত সেই কথাটীর মত আমরা যখনই সংসারের বিষফল আস্বাদ করিতেছি, তখনই বড় কষ্টে এক এক বার উপরের দিকে তাকাইতেছি কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহা ভুল হইয়া যাইতেছে। উহা হইলে কিরূপে চলিবে? যদি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি পদক্ষেপে উহা মনে থাকে ও সেই অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালিত হয় তবে সফল মনোরথ হওয়া যাইতে পারে। রাস্তা ত রহিয়াছেই কিন্তু ক্ষুরধার বলিয়া বিরত হইলে কেন চলিবে? যাঁহারা সেই রাজ্যে গিয়াছিলেন তাঁহারা বলিতেছেন "রাস্তা রহিয়াছে কিন্তু কে যাইতে চায়"? তবে কথা হইতেছে, যখন আমরা এই সংসার অসার বলিয়া প্রাণে অনুভব করিতে পারিতেছি তখন ইহা ছাড়া আর কিছুর জন্য অনুসন্ধান করিতে এত আপত্তি বা ভয় কেন? ইহকাল-সর্ব্বস্ব হওয়ার বিষময় ফল ত আমরা চোখের সম্মুখে কতই দেখিতেছি। সুতরাং দেখা যাক চেষ্টা করিয়া যদি কোন মীমাংসায় পৌছান যায়। ছেলে স্কুলে প্রথম যখন যায় মাষ্টার বলেন "ওহে তোমার এই এই জিনিষের প্রয়োজন সেই গুলি নিয়ে কাল এস"। আমাদের পক্ষেও ঠিক

তাই। শিক্ষাবতার শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই পথের সন্ধান পাইয়া আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, সেই পথে যাইতে হইলে ও সফল-কাম হইতে হইলে এই তিনটী জিনিষ চাই, প্রথমতঃ মনুষ্যত্ব, দ্বিতীয় মুমুক্ষুত্ব, তৃতীয় মহাপুরুষ সংশ্রয়। এই তিনটী জিনিষ লইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষাদাতা গুরুদেবের পদে স্থান লইতে হইবে। শ্রীশ্রীগীতাকার বলিতেছেন 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বারা তাহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা হইলে "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তখন সেই জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ দিবেন। অতএব যদি সত্যসত্যই সেই উদ্দিষ্ট বস্তুর জন্য আমাদের আগ্রহ হইয়া থাকে সত্যসত্যই যদি আমাদের সেখানে গিয়া ভব ভয় নিবারণের ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে অবিলম্বে শ্রীগুরুর পদে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। উপযুক্ত শিষ্য হওয়া দরকার, গুরুরও সেইরূপ উপযুক্ততা থাকা প্রয়োজন। যেমন পাত্রে ছিদ্র থাকিলে তাহাতে জল রাখা না রাখা সমান, সেইরূপ যদি শিষ্যের ধারণা শক্তি বা চরিত্রের কোন প্রকার দোষরূপ ছিদ্র থাকে তবে গুরুর উপদেশরূপ জল সেই ছিদ্রদিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে কোনই কাজ দিবে না। সুতরাং সব ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। ঠিক ঠিক উপযুক্ততা লাভ করিতে হইবে। এই উপযুক্ততা লাভের জন্য অনেক জিনিষের প্রয়োজন প্রথমতঃ বীর্য্যধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য। আজ কাল উহার এত অভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে ঠিকঠিক পবিত্র লোক সব সময় শতেকের মধ্যে একজনও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অথচ এই বীর্য্য-ধারণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ। বীর্য্যধারণ করিতে পারিলে মানুষ দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী হয় আর উহার অভাবে সে একটা পশুতে পরিণত হয়। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারই ফলে আমরা আজ লাথি খাইতেছি, কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি! আহা! দেশের এ অবস্থা কতদিনে ঘুচিবে! যাঁহারা 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' বলিয়া এত চীৎকার করিতেছেন ও তাহারদ্বারা সব অভাব অভিযোগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, আর দলে দলে ছেলে নিয়া হুলস্থুল ব্যাপার

করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা দেশের একমাত্র আশা ও ভরসার স্থল ও নিষ্কৃতির একমাত্র পন্থা এই ছেলেদের চরিত্র ও তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য ধারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন কি? বড় বড় সভা সমিতিতে যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহার একাংশ দিয়াও ছেলেদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও সেইভাবে মানুষের জীবন গঠনের যদি চেষ্টা হইত তবে এত দিনে দেশের অবস্থা কতকটা ফিরিত। আমরা ভারতবাসী, আমরা মূর্খ, অজ্ঞ, আমরা ব্রহ্মচর্য্যহীন পশু! আমাদের দ্বারা কি কখনও কিছু সম্ভব!

যাহা হউক আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করি। এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন উপায় নাই। যদি মুক্তিলাভ করিতে হয় তবে ইহা আমাদিগকে করিতেই হইবে! তবেই আমরা সফলকাম হইব। অতএব শিষ্যের ইহাই প্রথম ও অবশ্যপ্রয়োজন। তার পর 'সত্য'। প্রাণপণে সত্যবাদী হইতে হইবে "ইহাই কলির তপস্যা"। ভগবান সত্যস্বরূপ অতএব মিথ্যাবাদী হইলে সত্যস্বরূপের কাছে যাওয়া সম্ভবপর নহে। তার পর 'আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া'। গুরু যদি বলেন গঙ্গা হইতে কুমীর ধরিয়া আনিতে হইবে তবে সেই মুহূর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে উহা সম্ভবপর হউক আর না হউক। মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করিতে হইবে, কারণ ভগবানের রাজ্যে ভীরু কাপুরুষের স্থান নাই। ইহা ছাড়া সরলতা পবিত্রতা ইত্যাদি গুণ থাকা অবশ্যপ্রয়োজন। তবেই গুরু সমীপে যাওয়া সার্থক হইবে।

কেবল শিষ্যের দিক দেখিলে চলিবে না। গুরুরও কতদূর উপযুক্ততা আছে দেখিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় খানায় পড়িয়া মরিতে হইবে আমাদিগকে দেখিতে হইবে আমরা যাহার জন্য গুরু সমীপে যাইব সেই ধর্ম্ম বা প্রত্যক্ষানুভূতি বস্তুটী গুরু লাভ করিয়াছেন কি না। যে ধার্ম্মিক সেই ধর্ম্মদান করিতে পারে, অপরের তাহা সম্ভব নয়। ইহার উপায় স্বরূপ প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা ন্যায়সঙ্গত কি না কারণ যাহা ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা মিথ্যা। কারণ মিথ্যার দ্বারা সত্যকে

লাভ অসম্ভব। তার পর দেখিতে হইবে তাঁহার জীবন ও উপদেশ সম্পূর্ণরূপে পরের মঙ্গলের জন্য সমর্পিত হইতেছে কি না। যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবেন। স্বার্থের লেশও তাঁহাতে থাকিবে না। এই সব এবং অন্যান্য শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট গুণাবলীর দ্বারা যিনি অলঙ্কৃত তিনিই যথার্থ গুরু হওয়ার উপযুক্ত। কুলগুরু প্রথার অন্ধ অনুসরণ করিলে চলিবে না। শ্রীভগবানের কৃপায় আজ কাল গুরুর অভাব একটুও নাই। তাঁহারা জগৎকে কোলে টানিয়া লইতে চাহিতেছেন কিন্তু জগৎ তাঁহাদিগকে চাহিতেছে কই? অতএব এস ভাই, সমস্ত স্বার্থ, সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া সদ্‌ গুরুর পদে শরণ গ্রহণ করি। আর সময় নাই। আমাদিগকে বহু পথ যাইতে হইবে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, পথ সুদীর্ঘ। মহাপুরুষগণ চলিয়া গেলে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হওয়া বড় কঠিন। অনর্থক বসিয়া ভাবিলে কি হইবে? নদীর জল শুকাইয়া যাইবে, তবে হাঁটিয়া পার হইব, ইহা কি সহজ কথা? গুরুপদরূপ ভেলার সাহায্যে ভবপারে যাইতে হইবে; আর উপায় নাই। যুগগুরুর গম্ভীর আহ্বান আমাদের তমোনিদ্রা দূর করুক। "জাগ বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?"

তত্ত্বকথা।

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা নাহি যায়।
শত মুখে তবু তাঁর ব্যাখ্যা বাহিরায়॥
বাক্য মনাতীত ব্রহ্ম শুদ্ধ সনাতন।
বাক্যে মনে তবু তাঁরে ধরে কতজন॥
শুন ভ্রান্ত ক্ষান্ত হও, বৃথা আকিঞ্চন।
ধরিবারে চাহ যদি শুদ্ধ কর মন॥
ব্রহ্ম বস্তু নহে বটে মনের গোচর।
বিশুদ্ধ মনের কিন্তু নহে অগোচর॥

—বিজ্ঞানী।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

আর্ট ও সাহিত্য—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি, এ, কর্ত্তৃক বিরচিত। শিল্প ও সাহিত্যের ভিত্তি প্রকৃতি দেবী। সেই প্রকৃতিদেবীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বয়ং শ্রীভগবান। শ্রীভগবান সত্য-জ্ঞান-আনন্দ স্বরূপ। তাই শিল্প ও সাহিত্যের সাধ্য বস্তুও সত্য-জ্ঞান-আনন্দ। পাশ্চাত্য ইন্দ্রিয়-ভোগদ্যোতক শিক্ষা দীক্ষা বঙ্গীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকের উক্ত আদর্শ কলুষিত করিয়া তাহাদিগকে 'হেয়' ও 'প্রেয়ে'র দিকে টানিয়া আনিয়াছে। সর্ব্ব বিষয়ে হিন্দুর আদর্শ যে 'শ্রেয়ঃ'কে লাভ তাহা তাঁহারা ভুলিয়াছেন। এই কলুষ সর্পের দংশন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথও নিস্তার পান নাই, ইহা লেখক দেখাইয়াছেন। উহা অস্মদীয় সাহিত্যে উদ্গীরণ করিয়াছে প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা, মাতৃত্বে শ্রদ্ধাহীনতা, স্বাধীন প্রেমের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা। হিন্দু-সমাজ ব্রহ্মচর্য্যের অটুট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ ভিত্তি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপসারিত করায় প্রতীচ্য ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা আমাদের সমাজ শরীরে নানাবিধ ক্ষতের উৎপত্তি করিয়াছে। নবীন শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা এই গ্রন্থতীর্থে অবগাহন করিয়া পূতচিত্ত হইয়া বীণা-পানির উপাসনায় রত হইবেন আশা করি। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাণীদের অন্তরের কথা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। ছেলেপুলেদের জন্য পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় নানা প্রকারের গল্প। কিন্তু ইহাতে মনস্তত্ত্ব বিদদেরও অনেক বিষয় ভাবিবার আছে কোনও কোনও পাশ্চাত্য দার্শনিক যে বলিয়া থাকেন, পশুদের সহজাত জ্ঞান (Instinct) ছাড়া, বুদ্ধি (Reason) আদৌ নাই, এই গ্রন্থ পড়িলে ঐ প্রতীচ্য ভ্রম দূর হইতে পারে। পক্ষান্তরে আমাদের দার্শনিকেরা বলিতেছেন, বিশ্বমন ওতোপ্রতঃ ভাবে সকল দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান। এই পুস্তকখানি পশুর মধ্যেও যে বিচারশীল মনের অস্তিত্ব সম্ভব—এই সত্যের উদাহরণ স্বরূপ। গল্পগুলি পড়িলে বেশ বুঝা যায়

যে পশুহৃদয়ে মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ, সৌজন্য, সহানুভূতি, চরিত্রবল, মাতৃ-স্নেহ, করুণা, কৃতজ্ঞতা, বিপন্নের উদ্ধার ও দুষ্টের দমন, বিরহে আত্মহত্যা, অভিমান, প্রভুভক্তি, স্মৃতিশক্তি, বন্ধুর সহিত বিবাদ ও প্রীতি, কার্য্যকারণ বোধশক্তি, চাতুরী, একগুঁয়েমি, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, চিকিৎসাজ্ঞান এবং আরও উচ্চতর মানবীয় মনোবৃত্তি যথা ভগবদ্‌ভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ব্রতপালন, বৈরাগ্য ও প্রায়োপবেশন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। এই গল্পগুলি যদি সত্য হয় এবং কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে পাশ্চাত্য চিরন্তন-ক্রমবিকাশ বাদ পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় গুণকর্ম্মানুযায়ী ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ এই উভয়ই মানিতে হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাবু এই পুস্তকের প্রচারের দ্বারা মাতৃভাষাকে অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত "ঈশ্বর ও মানব", ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ" এবং "ঈশ্বর মঙ্গলময়" শীর্ষক তিন খানি পুস্তিকাও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সরিষা—কার্য্যবিবরণী ১৯২১।২২ পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহারা (ক) ৭।৮টী বালককে অবৈতনিক নৈশ-বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন, (খ) একটী অনাথ বালককে প্রতিপালন করিতেছেন, (গ) দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধ পথ্যাদি বিতরণ করেন, (ঘ) একটী বস্ত্রবয়ণ বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন, (ঙ) অবৈতনিক পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং (চ) ধর্ম্মালোচনার

একটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সংকার্য্যে সকলের সাহায্য প্রার্থনীয়।

২। রামকৃষ্ণমিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোমের ১৯২২ সালের কার্য্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বর্ষে ১০জন অবৈতনিক এবং ৪ জন বৈতনিক ছাত্রকে স্থান দেওয়া হয়। ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ এবং ডি, এন, ব্যানার্জ্জি ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেখিয়া থাকেন। এই ছাত্রাবাসের বিশেষত্ব ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, কর্ম্মপটু ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ করা। এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মান কল্পে এবং অধিক অবৈতনিক বিদ্যার্থীদের ভরণপোষণের জন্য যাঁহারা দান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা স্বামী নির্ব্বেদানন্দ, ৮এ বাঁকা রায়ের ষ্ট্রীট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৩। কোয়ালপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন শাখাকেন্দ্রের ১৯২২ সালের কার্য্য-বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেবা কার্য্যদ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করাই এই আশ্রমের সেবকগণের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (১) বয়নাদি শিল্প শিক্ষা বিভাগ (২) সাধারণ শিক্ষাবিভাগ (৩) কৃষিশিক্ষা বিভাগ ও (৪) চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালক বা যুবকগণ শিক্ষালাভান্তে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ দেশের ও দশের সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে উক্ত সেবাকার্য্যগুলি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম, সভাপতি-শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ নিরাশ্রয় বালকগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, দুঃস্থ রোগীগণের সেবা, ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা, অসহায় বিধবাগণের সাহায্য, দাতব্য-চিকিৎসালয় পরিচালন, প্রয়োজন হইলে মৃতের সংকার প্রভৃতি নানা সেবাকার্য্যের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণমঠের কতিপয় কর্ম্মীর দ্বারা উক্ত আশ্রম পরিচালিত হইতেছে। বালকগণ যাহাতে সাধারণ লৌকিক বিদ্যা, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সহিত স্বাবলম্বী ও স্বাধীনবৃত্ত হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে ছুতারের কাজ, বেতের কাজ,

নানা প্রকারের দরকারী জিনিষ প্রস্তুত ও তাঁতচালান শিক্ষা দেওয়া হয়। আশ্রমের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ, মুষ্টিভিক্ষা মাসিক ও এককালীন অর্থ সাহায্য এবং শিল্পবিভাগের কিঞ্চিৎ আয়ে কোন প্রকারে চলিতেছে। এই কার্য্য আরও সুচারুরূপে চালাইতে হইলে জনসাধারণের অধিক সহানুভূতির প্রয়োজন।

ভ্রম সংশোধন

জ্যৈষ্ঠের স্বামিজীর পত্রের ২৮৬ পৃঃ ১০ লাঃ "ফটো"র স্থলে "মটো" হইবে এবং উহার টিপ্পনীতেও তাহাই হইবে। এবং ২৮৮ পৃঃ ২২ লাঃ "ঝুড়ি খানেক গালাগালি" এইরূপ পাঠ হইবে।

আষাঢ়ের 'নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা' প্রবন্ধে ৩৫৪ পৃঃ ৯ লাঃ 'মানুষ' স্থলে 'লোক' ৩৫৭ পৃঃ ২৫ লাঃ 'দ্বারকেশ্বরের' স্থলে 'রূপ-নারায়ণের' ৩৬২ পৃঃ ১৫ লাঃ 'পশ্চিমরাঢ়ের' স্থলে 'দক্ষিণরাঢ়ের'—পাঠ হইবে।

আচার্য্য।

(স্বামী অসিতানন্দ)

হে আচার্য্য গুরুরূপী নিত্য ভগবান,
বিধাতার অপূর্ব্ববিকাশ মানবের হিত তরে;
সংসার দহন দগ্ধ ভ্রান্ত নরগণ
শ্রীচরণ করিয়া স্পর্শন মুক্ত হয় মোহ ডোরে;
অকূলে হারায়ে কূল হাহাকারে কাঁদে
তুমি তার ধরি হাত পথে আনি পথ দাও বলে।
অহেতুক করুণা আধার করুণার প্রত্যক্ষ মূরতি
নিত্য নিত্য তার সনে পথে চলি
তার সনে পড়ি ভূমে পুনঃ তারে তোলো—
পথশেষে মা'র কাছে এনে তারে, তবে তব ছুটি—
নিষ্কারণ একার্য্য তোমার, ক্ষমাময়
শুধু ক্ষমা করা জানো, নাহি জানো ধরা কভু ত্রুটি।
মহিমা তোমার কে পারে বুঝিতে প্রভু
কেবা তুমি, কেন তব মানব করুণা গলা প্রাণ?
নররূপী কিন্তু গুরু নর কভু নহ
নরাকারে দুর্ব্বল মানব তরে বিধাতার দান,
আশীর্ব্বাদ তুমি প্রভু তার, করি সার
তোমার চরণ ভবের বন্ধন মুক্ত হবে অনায়াসে।
তুমি যেন দুহাত প্রসারি আছ ছুঁয়ে

জীবে আর জীবের হৃদয়নিধি মহান মহেশে—
তাই প্রভু তব রূপ সেবা করে ধ্যানে।
অরূপের পায় সে আভাষ অচিন্ত্য যে ভগবান
অরূপের তুমি স্ফুটরূপ মহীতলে
তোমা চিন্তি হয় তাই মহানন্দে পরিপূর্ণ প্রাণ
তুমি যেন বিধাতার হাত হ'তে দিব্য জ্ঞান ল'য়ে
অবতীর্ণ মহীতলে—তাই তব প্রসন্নতা লভি
খ'সে পড়ে অজ্ঞানের দীর্ঘ আবরণ
যায় মোহ, সহসা উদিত হয় দিব্যজ্ঞান রবি।
যুগে যুগে হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পফলে
তাই তব পূজা হয় মানবের অন্তরে অন্তরে
দেবতারো সৃষ্টি যবে নাহিক তথায়
তুমি পাইয়াছ পূজা মনুষ্যের হৃদয় কন্দরে॥
কল্পনা অতীত সেই আদি যুগ হ'তে
এখনও নিত্য নিত্য তুমি রাজা হৃদয় রাজ্যের
হে শাশ্বত তব পূজা অতি পুরাতন
হে নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হতে অতি স্থূল সকল কার্য্যের।
মানুষ হেরিয়া ধন্য কত দেবরূপ
কিন্তু তত তুষ্টনয় যত তুষ্ট ও চরণ সেবি
হে আচার্য্য মানবের অতি সন্নিকটে
মূর্ত্তিমন্ত ব্রহ্মরূপ তুমি সার সব দেবদেবী,
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর
তুমি সেই পরব্রহ্ম চির সত্য নিত্য সনাতন
তোমার মহিমাপূর্ণ মানব অন্তর
প্রকাশের ভাষা মূক শুধু নত হয় মন।
তোমার চরণ মূলে তুমি ভক্তিদাতা
ইষ্ট সহ চির এক—গুরুইষ্ট সতত অভেদ
তুমি ধর ইষ্টমূর্ত্তি অভীষ্ট পুরাও

জীবন সার্থক কর ঘুচে যায় যত মন খেদ
গুরু ইষ্ট, গুরু সত্য, গুরু ভগবান
শ্রীগুরু শরণ নিলে মুক্ত ভক্ত প্রাণ ॥

কথা-প্রসঙ্গে।

(১)

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ কঠ, প্রথমবল্লী, ২০ মন্ত্র ॥

নচিকেতা যমের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মনুষ্য মরিলে পর কেহ কেহ বলেন, পরলোকগামী আত্মা আছে; আবার কেহ কেহ বলেন,— আত্মার পরলোক গমন নাই; এই যে সর্ব্বজন বিদিত সংশয়, আপনার উপদেশে এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর।"

মৃত্যু ছাড়া 'মৃত্যুর পর কি হইবে' এ প্রশ্নের সমাধান আর কে করিবে। নচিকেতার ন্যায় শ্রদ্ধায় যে মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যু তাহার নিকট অমৃতের সন্ধান বলিয়া দেন। অনাদি কাল ধরিয়া মানব এই সংশয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কারণ তাহার প্রকৃতি জীবনকে চাওয়া, জ্ঞানকে পাওয়া এবং আনন্দকে অনুভব করা। মৃত্যু তাহার নিকট যে অনস্তিত্ব, অজ্ঞান ও নিরানন্দ। কে এমন লোক আছে অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দকে চায় না? তাই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন হইয়াছে, "অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।"

* * * *

সত্যের অনুসন্ধান না পাইয়া কত জাতি ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞান

করিয়া কত কল্পনারই না সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন সভ্যজাতিদের মধ্যে মিশরীরা অন্যতম। হেরো ডোটাস (Herodotus) বলেন যে, আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি (Doctrine of Palingenesis) মিশরীরাই প্রথম অবিষ্কার করেন।* কিন্তু ম্যাসপেরো (Maspero), এ, আরম্যান (A. Erman) প্রভৃতি আধুনিক মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অন্যরূপ বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে, মিশরীরা মনে করিত যে আত্ম "দ্বিত" (Double) ; উহার কোনও ব্যক্তিত্ব নাই এবং উহা দেহের সহিত চির সম্বদ্ধ। মৃত্যুর পর দেহ যতদিন থাকিবে, আত্মাও ততদিন জীবিত থাকিবে। দেহের নাশের সহিত উহারও ধ্বংশ।

মৃত্যুর পর আত্মা স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু রাত্রিকালে নিজ শবদেহের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। দেহের কোনও অংশ নষ্ট হইলে, আত্মারও ঠিক সেই অংশ নষ্ট হইবে ; সেই জন্য মৃতদেহ রক্ষার জন্য মিশরীদের এত চেষ্টা ছিল। দেবতাদের বহু চেষ্টার পর মমি (Mummy) রক্ষা করিবার ঔষধের আবিষ্কার ও প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার অত্যদ্ভুত নিদর্শন পিরামিদের (Pyramid) সংগঠন। উদ্দেশ্য দেহকে চিরকালের জন্য রক্ষা করিয়া আত্মাকে অমর করিয়া রাখা।

কিন্তু মিশরীয় বিবৃতি পাঠে জানা যায় যে, আত্মা দেহ সংরক্ষণ কাল

* "That the soul after the dissolution of the body enters again and again into a creature that comes to life ; then, that the soul wanders through all the animals of the land and the sea and through all the birds, and finally after three thousand years returns to a human body." —আমাদের মনে হয় ভারতীয় সভ্যতার সহিত সংমিশ্রনের পর এইরূপ মতবাদ মিশরে উপস্থিত হয়। হিন্দুদের একটী বিশ্বাস যে অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবাত্মার মুক্তি হয়। কিন্তু মিশরীরা তাহাদের দেহাত্মবাদ অতিক্রম করিতে না পারায় তিন সহস্র বৎসর পর পুনরায় আত্মা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হয় এইরূপ গড়িয়া লইয়াছিল।

পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলেও, সদা ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, দুঃখিত, এবং মানবজীবন লাভের জন্য সদা লালায়িত।*

*   *   *   *

কালদে বা কালযবনেরাও (Chaldeans) কখনও দেহকে অতিক্রম করিয়া কোনও আত্মার কল্পনা করিতে পারে নাই। তবে তাহারা মিশরীদের মত ও সম্বন্ধে অত কল্পনাপ্রিয় ছিল না। তাহাদের "দ্বিত" (Double) আত্মা তাহাদের সমাধির চতুঃপার্শ্বেই নিবদ্ধ থাকিত। তবে তাহারা আশা করিত কোনও দিন হয়ত দেহ হইতে আত্মার মুক্তি হইতে পারে। মাত্র একস্থানে পাওয়া যায়, তাহাদের ইষ্টর দেবী (Ishtar) তাঁহার প্রণয়ী, আ (Ea) এবং দমকিনের পুত্র (Damkina)

* "Oh, my brother," exclaims the departed, "withhold not thyself from drinking and eating, from drunkenness, from love, from all enjoyment, from following thy desire by night and by day ; put not sorrow within thy heart, for, what are the years of man upon earth? The West is a land of sleep and of heavy shadows, a place wherein the inhabitants, when once installed, slumber on in their mummy forms, never more walking to see their brethren ; never more to recognise their fathers and mothers, with hearts forgetful of their wives and children. The living water, which earth giveth to all who dwell upon it, is for me stagnant and dead ; that water floweth to all who are on earth, while for me it is but liquid putrifaction, this water that is mine. Since I came into this funeral valley I know not where nor what I am. Give me to drink of running water........., let me be placed by the edge of the water with my face to the North, that the breeze may caress me and my heart be refreshed from its sorrow."—(As translated by Swami Vivekananda in his essay of Reincarnation from French, Maspero's Etudes Egyptiennes, Vol. I, pp, 181-190).

ডুমুজিকে (Dumuzi) অনেক চেষ্টার পর দেহ-সম্বন্ধ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

* * *

পরবর্ত্তী মিশরীয়দের মধ্যে যে জন্মান্তরবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা ভারতীয় চিন্তার প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। কার্ল হিকেল অনেক গবেষণার পর ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। * এবং এ্যাপুলিজাসের (Apulijus) মতে পিথাগোরাস (Pythagoras) ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুশিষ্ট হইয়া জন্মান্তরবাদ গ্রীসে প্রচার করেন। আলেকজেন্দ্রার ইহুদী এবং খৃষ্টের সমসাময়িক ফারিসিরাও (Pharisees) জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধ দার্শনিকদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। † কারণ খৃষ্টের বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ ইসেনী (Essene) এবং থেরাপিউটস্ (Therapeuts, সংস্কৃত স্থবির-পুত্র, পালি থেরাপুত্ত) সম্প্রদায় প্রথমে আলেকজেন্দ্রিয়ায় পরে সিরিয়ায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে ; সিরিয়ায় আসিয়া উহারা Essene নামে পরিচিত হয়। জন দি ব্যাপটিষ্ট (Jhon the Baptist) এই ইসেনী বৌদ্ধ ছিলেন।

* * *

কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে এ সকলই অনুমান। প্রতীচ্যে খৃষ্ট ও মহম্মদ ছাড়া আর কেহই নিজ যুক্তি প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তাঁহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যুক্তি চারিটী অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত,—১) জাগতিক কার্য্যকারণগত (Cosmological), (২) জাগতিক কৌশলগত (Teleo-

* "I am convinced, that the deeper we enter into the study of the Egyptian religion, the clearer it is shown that the doctrine of Metempsychosis was entirely foreign to the popular Egyptian religion ; and that even that which single mysteries possessed of it was not inherent to the Osiris teachings, but derived from Hindu sources." —Karl Heckel.

† "If you will receive it, this is Elias, which was for to come"—Math. xi, 14.

logical), (৩) মানবমনের মৌলিক ধারণাগত (Ontological*) এবং (৪) পাপপুণ্যবোধগত (Moral)। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "প্রত্যক্ষং অনিমিত্তং" (জৈমিনী সূঃ, ১-১-৪), এই সূত্রের উপর শবর স্বামী ভাষ্য করিতেছেন—"প্রত্যক্ষপূর্ব্বকত্বাৎ চানুমানোপমানার্থাপত্তীনামপ্যকরণত্বং" কারণ—অনুমান, উপমান এবং অর্থাপত্তি (Circum-tantial inference), যখন প্রত্যক্ষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তখন প্রত্যক্ষের অভাবে এ সকলও প্রমাণ হইতে পারে না। তবে প্রশ্ন করিতে পার—"বিদ্যমানস্যাপ্যনুপলম্ভনং ভবতি †—যাহা আছে তাহাও ত অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় না? উত্তরে শবর বলিতেছেন, "নৈতাবতা বিনা প্রমাণেন শশবিষাণং প্রতিপদ্যামহে"—সেই হেতু শশশৃঙ্গকে আমরা অনুমান করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

* * *

জগতের তপোক্ষেত্রের ভারতীয় ঋষিরাই সর্ব্বপ্রথম বলিয়াছেন, আমরা পরলোক তত্ত্ব জানি, আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তোমরাও এই পথের অনুসরণ কর, সত্যকে জানিতে পারিবে। তাঁহারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া, করুণাকণ্ঠে জগতকে বলিয়াছিলেন,—

"শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

(শ্বেতঃ, উপ. ২।৫)

হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ! দিব্যধাম সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

(শ্বেঃ উঃ ৩।৮)

* The form of this proof as given by Anselm is: "God is real, because God is that than which a greater cannot be conceived."—Lotze.

† "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥ (সাংখ্য কারিকা—৭)।

অজ্ঞানের পরপারে, সেই আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি। মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার, তাঁহাকে জানা ছাড়া আর কোন পথ নাই। তাই আর্য্য ঋষিরা নির্ভয়ে চিতার অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন,—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁম্ ক্রতো স্মর, কৃতংস্মর ক্রতো স্মর কৃতংস্মর॥ ১৭॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ১৮॥ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া,
ঈশোপনিষৎ॥

"অনন্তর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হউক। হে চিন্তাশীল মন! তুমি তোমার কৃত ও কর্ত্তব্য বিষয় স্মরণ কর। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব! তুমি আমাদের সকল কর্ম্মই জান; আমাদের অপকারী পাপ সমূহ বিদূরিত কর। আমরা তোমাকে বহু নমস্কার করিতেছি।"—এই আর্য্য ঋষির উক্তির সহিত মিশরীয় দ্বিত আত্মার খেদোক্তি তুলনায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একজন জড়দেহকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে না পারিয়া বিমর্ষ, অপরজন নিজকে চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মৃত্যুকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করিতেছেন। আর্য্য-খৃষ্টান, পাশ্চাত্য মিশরীয় ম্লেচ্ছ ভাবে নিজেদের ধর্ম্ম রঞ্জিত করিয়া Day of judgment নির্ণয় করিয়াছেন। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা কবরে নিদ্রা যাইবে তাহার পর পৃথিবী নষ্ট হইলে সকলেই বিচারের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে। কিন্তু সুখের বিষয় আর্য্য ইউরোপ পুনরায় ম্লেচ্ছ ভাব ত্যাগ করিয়া আর্য্য ধর্ম্মে পুনঃ প্রবেশ করিতেছে। তদ্দেশীয় বড় বড় দার্শনিকদিগের মতবাদ কিছু কিছু আলোচনা করিলে আমরা ঐ সত্যে উপনীত হই।* মুক্ষমূলর, ডয়সন্ (Paul Deussen) প্রভৃতি প্রাচ্য-শাস্ত্র তত্ত্ববিদগণের

* "It is true there is one analogy in nature which

কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইউরোপীয় মাধ্যমিক (Nihilist) হিউম, ক্যাণ্ট, ফিক্তে, লেসিং, সোপানহাওয়ার প্রভৃতি পূর্ব্বতন দার্শনিকেরা প্রতীচ্য দর্শনের প্রভাব হইতে নিস্তার পান নাই। তাহা ছাড়া, Spiritualist, Christian-Scientist, New-Thoughtist প্রভৃতি উদীচ্য নবীন সম্প্রদায় বেদান্ত দর্শনের আধুনিক সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

might be brought forth in refutation of the continuance. It is the well-known argument that everything that has a beginning in time must also perish at some period of time ; hence, that the claimed past existence of the soul necessarily implies its pre-existence. This is a fair conclusion, but, instead of being an objection to, it is rather an additional argument for its continuance. Indeed, one needs only to understand the full meaning of the Metaphysico-physiological axiom, that in reality nothing can be created or annihilated, to recognise that the soul must have existed prior to its becoming visible in a physical body."—I. H. Fichte.

"What sleep is for the individual, death is for the 'will'. It would not continue the same actions and sufferings throughout an eternity without true gain, if memory and individuality remained to it. It flings them off, and this is death, and through this sleep of death it reappears fitted out with another intellect as a new being ; a new day tempts to new shores. These constant new births, then, constitute the succession of the life-dreams of a will which in itself is destructible, until instructed and improved by so much and such various successive knowledge in a constantly new form, it abolishes and abrogates itself.—Schopenhaur.

"The metempsychosis is therefore the only system of this kind that philosopy can listen to."—Hume.

"Is this hypothesis so laughable merely because it is the oldest? Because the human understanding, before the sophistries of the schools had dissipated and

নব-সম্প্রদায় গঠন-কর্ত্তৃত্বের প্রলোভন বা সমাজভীতি ইঁহাদিগকে প্রকাশ্যে বৈদান্তিক বলিতে বিরত করিয়াছে এবং করিতেছে। আমরা আশা করিতে পারি আর্য্য ইউরোপ ও আমেরিকা শীঘ্রই ম্লেচ্ছ ভাব পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যদের আদিম বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

"আশা ও নিরাশা"

পূরব উজলি কনক কিরণে   তপন যখন উঠে
তখনি আমার হৃদয় মাঝারে   আশার আলোক ফুটে
মধ্যাহ্ন গগনে তপন কিরণে   যখন তাপিত ধরা
(ওগো) আমি ও তখন আশার কুহকে   যেন গো পাগল পারা
ক্রমে ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসে   নামেরে শীতল ছায়া
তার সাথে সাথে নিরাশে আমার   কাঁপিয়া উঠে গো হিয়া
আবার যখন তিমিরে আবরি   ডুবিয়া যায় গো রবি
একেবারে ডুবি নিরাশার কূপে   হেরি গো নিরাশা ছবি ॥

—ত্যাগচৈতন্য

debilitated it, lighted upon it at once?.........Why should not I come back as often as I am capable of acquiring fresh knowledge, fresh experience? Do I bring away so much from once that there is nothing to repay the trouble of coming back?—Lessing.

হিন্দুত্বের ভিত্তি

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

৪। ঈশ্বরমুখী ভাব।

বলশালী পাঠান বাদসা মামুদ গজনী অন্তিম মুহূর্ত্তে আজন্ম লুণ্ঠনলব্ধ ধনভাণ্ডার সম্মুখে রাখিয়া তাহা ছাড়িয়া যাইতেছি এই দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কৃপণ, তস্কর, বিষয়ী সকলের তাহারই অবস্থা হইয়া থাকে। পণ্ডিত হইয়া জ্ঞানী হইয়া জীবনের কর্ম্মের বোঝা পিছনে ফেলিয়া চলিয়া যাইবার ডাক আসিলে আমরাও কি তাহাই করিব? এই ভাবনা ভাবিতে গিয়াই আমরা আমাদের স্বতন্ত্র জ্ঞানক্ষেত্রের দ্বার দেখিতে পাইয়াছি। একে একে অনেকের অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হইয়াই আমাদের স্বতন্ত্র Culture গড়িয়া উঠিয়াছে। "তুলসী তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে তখন তুমিই একা কাঁদিয়াছ অপর সকলে হাসিয়াছে, যাইবার সময় এমন যাইয়ো যেন তুমি একা হাস আর সকলেই কাঁদে।"—ঐ যাওটাই আমাদের লক্ষ্য। কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি যেন হাসিতে হাসিতে যাইতে পারি। সে কোন স্থষ্টি, যেখানে লোক হাসিতে হাসিতে যায়, সে কোথায়?—সেই লোক আমাদের হিন্দুত্বের ভিত্তি। সেই লোকের রচনা হিন্দুত্বের প্রয়াস। তাহাই জীবনের লক্ষ্য, মরণের স্থান, হিন্দুর বারানসী।

এতদিন পর্য্যন্ত দুই উপায়ে মানুষকে সেখানে উন্নীত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—প্রথম, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, দ্বিতীয়, ঈশ্বর স্বরূপ অর্থাৎ মোক্ষপদের ব্যাখ্যা করিয়া।

যাহাই হোক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ ততটা অজ্ঞান থাকে,—সে ঠিক সাক্ষাৎভাবে স্বর্গে যাইতে বা মোক্ষ পাইতে উদ্যোগী হয় না,

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে উহার taste জন্মাইতে ও বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত, পরোক্ষ অনুভূতিতেই তাহার কাজ চলে। পরলোকের স্বর্গ পরলোকের মোক্ষের উদ্যোগে কর্ম্ম করিয়াই সে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ততখানি পর্য্যন্তই তাহার ধর্ম্ম সাধনা।

সাধারণ জীবনযাত্রা অর্থাৎ আচার প্রবর্ত্তিত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, যাহা হিন্দুত্বের নিম্নের স্তর,—লৌকিক ধর্ম্ম—তাহার সার্থকতা এই-খানেই। সকলই taste জন্মাইবার হেতু বা ব্যবস্থা। সেখানে থাকিতে কাঁদিতে কাঁদিতেই যাই কিন্তু প্রতিবার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক বাড়িতে থাকে—"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"। তারপর জ্ঞান ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম উপরের স্তর। সে ধর্ম্মে মরণকালে যমদূত চক্ষের সম্মুখে দেখিতে হয় না—দেখা দেয় বিষ্ণুদূত শিবদূত।

সে কোন সৃষ্টি যে সৃষ্টিতে বসিয়া মরিলে মরণ মরণ নহে, ইহ-লোক পরলোক আজ আর কাল। জীবন সুখের নহে দুঃখেরও নহে অবস্থার রূপান্তরেরও নহে পূর্ণতার। সে আনন্দসাগরের অগাধ অতলতা—শান্তিধাম ক্ষুদ্র লহরী নহে।

মর্ত্ত্যের মানুষ—সে কি চক্ষে দেখিয়াছি। দূর হইতে ক্ষণিকের আবছায়া দর্শন, সেই পূর্ণানন্দের উপদেশ,—অস্পষ্ট আভাষ মাত্র—মনের মধ্যে আনিতে পারি।

সেই সৃষ্টি আর্য্য ঋষি যাহাকে খুঁজিল, ঊৰ্দ্ধে ঊৰ্দ্ধে অনন্ত ঊৰ্দ্ধে, চন্দ্র সূর্য্যেকে ছাড়াইয়া নীহারিকামালার পরিবেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া—আর কল্পনাও যতদূর যায় না—ততদূর—তারও অতীতদূর পর্য্যন্ত।

ওগো! সেখানে সূর্য্য জ্বলে না, চন্দ্র নাই, তারকা নাই, বিদ্যুৎ নাই, আলোই নাই তবুও অন্ধকার নয়। সে দেশের আলোকের আভায় চন্দ্রসূর্য্য জ্বলিতেছে, নক্ষত্র প্রকাশিত হইতেছে, বিদ্যুৎ চিকুর হানিতেছে।

যাই—যাই—পশ্চাতে সকল পড়িয়া থাক—লজ্জা মান ভয় দেহ ধন জন পরিজন—পশ্চাতে পড়িয়া ছায়ার মত মিলাক—এ গতি রুদ্ধ হইবে না—যাই—যাই—দূরে—দূরে—করতলামলকের মত সে সৃষ্টি মুষ্টি

মধ্যে ধরিব। সহসা রহস্যময়ী যবনিকা চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল! ওঃ! সে যে আমার অন্তরলোক—আমার আত্মা, আমার অমরতা আমার পূর্ণতা আমার ঈশ্বরত্ব।

আর এই সৃষ্টি যেথা মৃত্তিকার কায়ে ধূলার সংসারে মরণের অধীন খেলাঘর পাতিয়াছি যে খেলাঘরে এখান হইতে সরাইয়া দিলে ওখানে গিয়া বসি আবার ওখান হইতে সরাইয়া দিলে সেখানে গিয়া বসি। রাজার ঐশ্বর্য্যই বল ভিক্ষুকের ছিন্ন কন্থাই বল সবই খেলার খেলানা—যতক্ষণ চোখ মেলিয়া আছি ততক্ষণের অধিকার। আমায় টানিয়া লইয়া যাইবে, মাটীর আমার এই দুই বাহু ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিবে—কি আঁকড়িয়া রাখিব, কাহার দ্বারা আঁকড়িয়া রাখিব? —এই যে সৃষ্টি, ইহা ভূতগত সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতে বসিয়া তুমি এরোপ্লেন আবিষ্কার কর, মেসিনগান দাগিয়া কোই একটা সহর উড়াইয়া বীরত্ব দেখাও, তোমার রচিত গবেষণা গ্রন্থে বৃহৎ পুস্তকাগার বোঝাই হইয়া যাক, তবুও, যতটুকু তোমার তুমি সে জোনাকির পুচ্ছজ্যোতিঃ! তোমার সম্মুখ নাই পশ্চাৎ নাই ভবিষ্যৎ নাই অতীত নাই কেবল তুচ্ছ বর্ত্তমান। তোমার বর্ত্তমানকে যতবড়ই দেখ অতীত মুছিয়া ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া কে তাহাকে একরোখা হইয়া একেবারে বরণ করিতে পারে বল? পার ত হিন্দুর জ্ঞানের স্ব-তন্ত্রকে ও আধ্যাত্মকে অস্বীকার করিও; নচেৎ স্বীকার করিতেই হইবে ভারতের পর্ণকুটীরে মুষ্টি আতপ তণ্ডুল ভোগে যে মহিমা রচিত হইয়াছে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যও তাহার কাছে বালুকার কণা মাত্র।

যে আমি হয়ত গিরিশিখরে কোথাও স্তব্ধ তুষ্ণীভূত বসিয়া জন্ম জন্মান্তর যুগ যুগান্তর লোক লোকান্তরের মধ্যে আপনাকে অনুভব করিতে থাকে সে বাঞ্ছনীয় কিংবা যে আমি পরিমিত কয়েকদিনের জন্য একটা পরিমিত পৃথিবীকে একটু উত্তেজিত করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া তাহারই অন্তর্লীন রহস্য সমুদ্রে গলিয়া মিলাইয়া যায়,—কেবল পড়িয়া থাকে স্মৃতি, সেই-ই বাঞ্ছনীয়—এক কথায় ত তাহার জবাব দিতে পারি না, ভাবিয়া দেখিতে হয়।

এই চক্ষের সম্মুখের ভূতগত পৃথিবী যে-আমি ইহাকে দেখিতেছি সেই আমারই আমিকে কালিকার মত স্থির নিশ্চয় বিশ্বাস করিতে পারি না, তবে ইহাকে বিশ্বাস করিব কোন সাহসে? এখানে বিশ্বাসের ব্যাপার কাহার সহিত আরম্ভ করিব? ইহার প্রত্যেক ব্যাপার অগণিত নিয়মের অধীন, প্রত্যেক ঘটনার কত শত প্রকার, ইহার আদি অন্ত কিছুইত দেখি না।

আমরা এই যে পৃথিবী দেখিতেছি—ভূতগত পৃথিবী, ইহার সৃষ্টি আসক্তির গর্ভে। মূলতঃ, ইহার অপর মাতা পিতা পুত্র কন্যা সম্পদ বিপদ কিছুই নাই। সমস্তই আসক্তির গর্ভে; সেই আসক্তির স্থান অন্তরে! অন্তরেই সৃষ্টির স্থান এই পৃথিবী তাহারই প্রতিচ্ছবি। বাহিরের জগতের মাতা পিতা কূল কিনারা কিছুই নাই জগতের মূলে যে শক্তি সমস্তই তাহার মধ্যে। জগতে আছে শক্তি রচিত বিভ্রম। তাকেই বলি মায়া।

যাহা চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি তাহাই জগৎ আর তাহার মধ্য দিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাই অন্তর। অন্তর বাহির ওতঃপ্রোত ভাবে এক বলিয়া বুঝ নহিলে কিছু বুঝিতে পারিবে না। বাহিরটা যেন অধম স্থান কেবল একটা স্রোতের গতি ভঙ্গীমাত্র সত্যের মিথ্যা সাজ—অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া সজ্জাটুকু অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, তারপর অন্তর সৃষ্টির উত্তম স্থান। সেখানে একটা অপরিবর্ত্তনীয় ভাব আছে—স্রোতটা যাহার ভঙ্গী সেই আছে।

তোমার অধম স্থান তোমার বাহির, তোমার প্রতিদিনের কর্ম্ম। সেই কর্ম্মকে ধরিয়া রাখিবার আধার কর্ম্মভূমি, ভোগের দেহ, ভোগের উপকরণ, ভোগ পদ্ধতি। সমস্তের হেতু তোমার উত্তম স্থানে তোমার অন্তরে যেখানে তোমার আসক্তি। আজ তোমার রাজ্যপাটে আসক্তি তুমি রাজা। আসক্তি পরিবর্ত্তিত হউক—কাল হয়ত তুমি সন্ন্যাসী—দরিদ্র শ্রমিক হওয়াও বিচিত্র নহে। অবস্থার ইতর বিশেষ যতই উচ্চ নীচ হউক সবই সঙ্গ। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সঙ্গমাত্রই মাত্রাস্পর্শ। আমাদের তারতম্যের গণনা রঙের ছোপ্। সে রঙের বর্ণপাত্র আসক্তি, শক্তির সেই নবনবোন্মেষ-শালিনী-লীলা।

তোমার উত্তম স্থানের উত্তম রহস্যময়ী আবরণ আরো উন্মোচন কর, এসো আরো অন্তর্লোকে—নবনবোন্মেষে শক্তির তারতম্য দেখিবে। সে যেন আলোক রশ্মি যতদূরে ততক্ষীণ যতকাছে তত তীব্র। দূরে কাছে,—কোথা, হইতে? সে ঐ উত্তম স্থানের—উত্তম রহস্যের মর্ম্মকথা। আসক্তির নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তর পর্য্যন্ত শক্তির চালনা প্রত্যক্ষ করি, যত নীচে তত ক্ষীণ যত উচ্চে তত তীব্র—যেন রঙ ফিকে হইতে ক্রমেই ঘোর—তাহাই দূর হইতে নিকট।

ঐ দূরে শক্তির উত্তম স্থানে যিনি আছেন যাঁহার হাতে শক্তির ভাণ্ডারের চাবিকাটী তিনি ঈশ্বর। তাঁহাকে মহত্ত্ব বলিয়া জান। শক্তির মধ্যে শক্তির মহত্ত্ব রূপী ঈশ্বর। মহত্ত্বই যোগসাধ্য। যোগ তাঁহারই সহিত করিতে হয়। তোমার ঈশ্বর লাভ তোমার মহত্ত্বের সহিত তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মিলনে। মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যম দূতরূপে আসে এই ধারণা যাহার স্মরণে, বুঝিতে হইবে জীবনের তরী সে উল্টাদিকে বাহিয়াছে—মহত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

হায়, ধন দৌলত, মান মর্য্যাদা আসল লক্ষ্য চাপা দিল তাই তখন মরিতে কান্না। তাই বিজেতা মামুদ গজনী বুক ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল,—পৃথিবী জয় ত করিলাম না—আপন গর্ব্বে মাৎসর্য্যে ধূলায় লুটাইলাম।

এই মহত্ত্বের লক্ষ্য ধরিয়াই জন্ম হইতে জন্মান্তরের পথে তোমার যাত্রা, বুকে তোমার বিস্মৃতির অব্যক্ত রাগিনী রোদন স্বরে চাপা কান্না কাঁদিতেছে, সম্মুখে অনন্ত পথ, সেই দুর্ভাবনা চিনিতে সময় দেয় না; লক্ষ্যে পৌঁছিলে সব বুঝিবে। আপনাকে চিনিবে জগৎকে চিনিবে।

নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা

২

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনে এককালে এমন দিন ছিল, যখন তাহার পেট ভরিয়া দুইবেলা অন্ন জুটিত, স্বজনপরিবৃত হইয়া শান্তিতে সুস্থশরীরে থাকিবার উপযুক্ত বাসস্থান মিলিত, আর পরণের মোটা কাপড় তাহার ঘরেই উৎপন্ন হইত—কারণ তাহারই নারী অবসর-সময়ে—

"চরকা আমার সোয়ামি-পুত
চরকা আমার নাতী
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী"—

বলিতে বলিতে চরকা চালাইতেন। সেদিন বাঙ্গালী 'নিজবাস ভূমে পরবাসী' হয় নাই, ম্যান্‌চেষ্টারের পায়ে মাথা বিকায় নাই, বিলাতী হাব-ভাব আদব-কায়দা পান-ভোজনের বাঁদরামী অভ্যাস করে নাই। তাহার অন্তরে ছিল সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য—আনন্দের অফুরন্ত উৎস। আর ছিল পাঁচজনে একজোট হইয়া মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিবার মত কলিজার জোর। তাই তাহার ছিল—সমাজ, পরিষৎ, আসর, আখড়া, পঞ্চায়েৎ—পাল পার্ব্বণ, পূজা উৎসব। সেসব এখন রূপকথায় দাঁড়াইয়াছে—ঠাকুরমা'র নাতী-ভুলান আজব-গল্পের সামিল হইয়াছে। পূর্ব্বের সে কথা দেখিতেছি কেহ এখন শুনিতে চান্ না, শুনাইলেও বিশ্বাস করেন না, বলেন—অলীক। কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, উহা কল্পনা একেবারেই নহে—আজিকার দিনের দারুণ দৈন্যের ন্যায় পূর্ব্বের সে সাচ্ছল্যও সমান ভাবে সত্য। সে দিন কোথায় গেল?—কেন গেল?

বাঙ্গালী তখন উৎসবের মূল্য বুঝিত। বুঝিত শারীরিক ব্যায়ামাদি,

শিল্পকলাবিস্তায় মস্তিষ্কের প্রসার এবং ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে মেলা-মিছিল-উৎসবও জাতীয় জীবনধারাকে পরিপুষ্ট, বর্দ্ধিত ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে কত উপযোগী। তাহার পূর্ব্বের জীবনযাত্রা পদ্ধতি আলোচনা করিলে বুঝা যাইত আনন্দ-উল্লাস-মাতন এবং গম্ভীর-নির্জন-সাধন দুই-ই একসঙ্গে দরকার।

পুরাণেতিহাসের সাহায্যে পতনের ধারা ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যেখানে যত অধঃপতন সেইখানেই তত অধিক ভগবৎ-করুণা-বর্ষণ। যেখানে রাবণ সেইখানেই রাজা রামচন্দ্র, যেখানে কংস সেইখানেই বাসুদেব-কৃষ্ণ, যেখানে হিরণ্যকশিপু সেইখানেই নৃসিংহাবতার, যেখানে পুরোহিততাড়িত ভাবহীন বাহ্যাড়ম্বরময় যজ্ঞধূমধূমায়িত আর্য্যসমাজ সেইখানেই শাক্যপুত্র গৌতম-বুদ্ধ, যেখানে জগাই-মাধাই সেইখানেই 'মেরেছ কলসীর কাণা, তা'ব'লে কি প্রেম দিব না' বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের পাপীকে নামদান ও প্রেমালিঙ্গন—আর সর্ব্বোপরি যেখানে ধর্ম্মহীন পরস্পর বিবদমান অধঃপতিত আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী, সেইখানেই সপার্শ্বদ শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবী।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট উৎসব হইয়া গেল—কে যেন অলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিল, পুরাতন বাঙ্গলার—প্রাচীন ভারতের উৎসবকে বাদ দিলে চলিবে না। উহাকে ধর্ম্ম-প্রাণ করিতে হইবে—মোক্ষ-মুক্তি ভাব-ভক্তির পথে মোড় ফিরাইয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বধারা বিনষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

জয়রামবাটীতে

সভ্য সহরের কাজ সব কলে চলে। সময়ের মূল্য সেখানে বড় বেশী; মানুষের জীবন-সমস্যা হরেক-রকমের। কোন এক উৎসব বা আমোদ-প্রমোদ, তাহা যতই বড় আকারে হউক না কেন, অল্প সময়ের ভিতর সারা—শেষ হইয়া যায়। দলে দলে মানুষ আসে, যোগ দেয়, চলিয়া যায়। কথা এক কাণ দিয়া শুনে, অপর কাণ দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

হৃদয়ে একটী ভাব বসিতে না বসিতে কর্ম্মকোলাহল ও বাহিরের অসংখ্য চাঞ্চল্য আসিয়া সব ধুইয়া-মুছিয়া সাফ করিয়া ফেলে।

পল্লীতে কিন্তু সেরূপটী হইবার উপায় নাই। সেখানে বৃহদাকারে কোন অনুষ্ঠান হইলে বেশ সময় থাকিতে আয়োজনের পর্ব্ব আরম্ভ হয়। একটী সাদা-সিধে কথার উল্লেখ মাত্রেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে কেন আমরা এ উৎসব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত—চমকিত হইয়াছি, কেনই বা আমরা উহাকে 'বিরাট' আখ্যা দিতেছি। মোটামুটী বলিতে গেলে কয়দিনে মিলাইয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় বার তেরহাজার লোক অন্নপ্রসাদ পাইয়াছিল। কাজেই এ পূজার বোধন যে মাস খানেক পূর্ব্বেই বসিবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাক্ষাৎভাবে যাঁহাদের উপর কর্ম্মের ভার পড়িয়াছিল তাঁহারা একপক্ষ পূর্ব্বেই কেহ কাশী কেহ ঢাকা, কেহ বেলুড়, কেহ কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীধামে পৌছান। মহাবলে মহোৎসাহে তাঁহাদের সাহচর্য্যে স্থানীয় সেবকবৃন্দ উদ্‌যোগ পর্ব্বে আত্মনিয়োগ করিলেন—বৃহৎ পাকশালা ও পংক্তিভোজনের ছাউনি-নির্ম্মাণ, চারিটী বৃহৎ গাছ খরিদ করিয়া কাটাইয়া উহা হইতে রাঁধিবার কাঠ প্রস্তুত করিয়া রাখা, ভিয়ান পাতিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত শেষ করিয়া রাখা,—দলে দলে মাতৃপূজায় ভক্তবৃন্দ আসিবেন, তাঁহাদের থাকিবার জন্য গ্রামের ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের বাহিরের ঘরগুলি ছাড়িয়া দিবার জন্য আবেদন-অনুমোদন করিয়া রাখা,—ইত্যাদি। তরীতরকারী বাদে উৎসবে ব্যবহার্য্য 'পাকামালের' বাজার কতক কলিকাতা, কতক ঘাঁটাল হইতে করা হইয়াছিল।

সেদিন ৪ঠা বৈশাখ, মঙ্গলবার

বৃহস্পতিবার উৎসব। মা তাঁহার কাজে আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য দূর দেশান্তরে ছেলে-মেয়েদের আহ্বান-লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিনের পর দিন তাঁহার প্রাঙ্গণে সন্তানেরা আসিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে যেন অলক্ষ্যে রব উঠিতে লাগিল—'মা, আমরা এসেছি।' আজ হইতে বিশেষভাবে এই 'আসার পালা' সুরু হইল। এক-জন কর্ম্মী বলিতেছিলেন—এইরূপে দিনের পর দিন আমাদের পল্লী-উৎসবে

কেহ গাড়ী কেহ বা পাল্কী হইতে আনন্দময় হাসিভরা মুখ লইয়া উৎসব-ভূমিতে নামিতে লাগিলেন—এ দৃশ্য আমি খুবই উপভোগ করিতেছিলাম, বড় ভাল লাগিল! সত্য কথা। সকলেই আমরা চার পাঁচদিন থাকিয়া আনন্দ করিব বলিয়াই গিয়াছি। পরম পূজনীয় মাতুল মহাশয় শ্রীযুত কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ও যে সকল সন্ন্যাসী কৰ্ম্মিবৃন্দ পূর্ব্ব হইতে ওখানে ছিলেন তাঁহারা সকলেই সাদরে আমাদের সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। চেনামুখগুলি দেখিয়া পরস্পরে খুবই আনন্দ হইল।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিল। ঘর-দোর মন্দিরাদি সকলের অবস্থিতি আলোয় বেশ ফুটিয়া উঠিল। আমাদের যেখানে স্থান হইয়াছিল উহা শ্রীমন্দিরের সমক্ষে, পূর্ব্বদিকে। তৎসংলগ্ন ধৰ্ম্মঠাকুরের ঘর—প্রত্যহ একটী ব্রাহ্মণ বালক পূজা করিয়া যান। শ্রীসারদেশ্বরী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ঠিক পাশেই। মন্দিরের সামনে উত্তর-দক্ষিণ ব্যাপিয়া একটা লম্বা পথ চলিয়া গিয়াছে। তাহারই দুইধারে গ্রামের খড়ে-ছাওয়া মাটীর বাড়ীগুলি ও তৎসংলগ্ন বৈঠকখানা শ্রেণী। গ্রামস্থ সকলেই আমাদের জন্য বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দিনের পর দিন যেমন ভক্তেরা আসিতে লাগিলেন সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া প্রয়োজন মত আমরা ঘরগুলি পাইতে লাগিলাম। নানাজনে নানাপথ দিয়া আসিয়াছিলেন—বিষ্ণুপুর, আরামবাগ, বদনগঞ্জ, রামজীবনপুর ইত্যাদি। সকল পথেই স্থানীয় ভক্তবৃন্দ দূরাগত ভ্রাতাদের যথেষ্ট সাহচর্য্য করেন।

মন্দির-বাটীর পশ্চিমধারের জমিতে পাকশালার জন্য একটী ও পংক্তিভোজনের জন্য তৎসংলগ্ন একটী বড় লম্বা ও একটী তদপেক্ষা ছোট ছাউনী প্রস্তুত হইয়াছিল। সেবকবৃন্দ অনেকে রাত্রে এস্থানে শয়নও করিতেন। ইহা ছাড়া শ্রীমন্দিরের বিস্তৃত বারাণ্ডা ও তাহার পিছনে স্থানীয় সাধুবৃন্দের পাকা আশ্রমবাটী ও পূর্ব্বধারে লম্বা রাস্তার উপর শ্রীশ্রীমার বসত-বাড়ী ত ছিলই।

গ্রামের এই অঞ্চলে ৪।৫টী পুকুর। পশ্চিমে ঘোষেদের পুকুর, মন্দিরের পাশে উত্তরে সামুই পুকুর, পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমার বাটীর পিছনে পুণ্য-পুকুর এবং আরও দক্ষিণে আগাইয়া গিয়া বাঁড়ুয্যেদের পুষ্করিণী।

উত্তরে একটী বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র—তাহার পরে আমোদর নদ। আবার মন্দিরের সমক্ষে একটী কূয়া—কাজেই জলাভাবের বিশেষ আশঙ্কা নাই।

জয়রামবাটীর উত্তরে দেশড়া, কোয়ালপাড়া, পূর্ব্বে তাজপুর, আনুড়, কামারপুকুর, আরামবাগ, দক্ষিণে জিবৃঠা, রামজীবনপুর, পশ্চিমে সিওড়, শিরোমণিপুর। যে মাটী জগন্মাতাকে ধারণ করিয়াছে উহা বড় সামান্য নহে। তাই সেখানে অতি দূরদেশ হইতে এই অজস্র ধারায় ভক্ত-সমাগম। আর সেই জন্যই সেই দেশের অনুষ্ঠান-কথা বিশদ করিয়া কহিবার, লিখিবার মাদৃশ অযোগ্যেরও এই সামান্য প্রয়াস।

এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশী। স্বাস্থ্যের অভাব বড়ই দারুণ—ব্যাধির তাড়না একান্ত মর্ম্মন্তুদ। তবে ভূমি অত্যধিক উর্ব্বরা বলিয়া ইহার উপর দারিদ্র্যদোষে অনাহারে মানুষকে তিল তিল দহিতে হয় না। ছোট এই গ্রামে প্রায় চারিশত লোকের বাস—তন্মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু জোতজমি আছে, মরাই-ভরা ধান আছে। প্রচুর শস্য হইয়া থাকে। জমি দুই প্রকার—মাঠের জমি ও কালাজমি। মাঠের জমিতে বিভিন্ন রকমের ধান হয়। মজার সব নাম। যথা—রাঙ্গীবোল্‌দেজ্‌, পাৎসাভোগ, ধূলে-কল্‌মা, হেমৎ ধান ইত্যাদি। কালা-জমিতে বর্ষার লেউলি, আউস, ঝাঁঝি ইত্যাদি ধান ছাড়া রবিশস্যও হয়। ইহা ছাড়া শাকশবজী ও অন্যান্য শস্য নানা প্রকার হইয়া থাকে। বিভিন্ন রকমের কলাই জন্মায়—যথা মাস, মুগ, মটর, মুসুর, টুমুর। গম, যব, সরিষা, হলুদ। গুলিউচ্ছে, কুমড়া (যাহার প্রচুর তরকারী হইয়াছিল), বেগুন, পিঙ্গে, পিঁয়াজ, রসুন, নানা প্রকার শাক, আখ, মূলা, খেঁড়ো, কাঁকুড়, গোল আলু ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় আম-কাঁঠাল-নারিকেলের গাছ ক্বচিৎ দেখা যায়। ঐসকল ফলের প্রয়োজন হইলে দূর হইতে আনাইতে হয়।

গ্রামের দেব-দেবীর ভিতর আছেন বাঙ্গলার বৌদ্ধযুগের স্মারক ধর্ম্ম ঠাকুর, যাত্রাসিদ্ধি, নারায়ণ ও মা সিংহবাহিনী। আমরা যে বৈঠক-খানাটীতে থাকিতাম সেইখানেই প্রতিবৎসর শ্যামা পূজা হইয়া থাকে—

প্রতিমা আসে। তাহা ছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে বাৎসরিক ৺জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যবস্থা তিনিই করিয়া গিয়াছেন। উপরন্তু অতঃপর জননী জগদ্ধাত্রীর শ্রীসারদা মূর্ত্তিতে চিরস্থায়ীভাবে নবমন্দিরে স্থাপনা হইল। এ দেবীকে লইয়া গ্রামের আবলবৃদ্ধবনিতা সকলে একদিন কত খেলাই না খেলিয়াছে—তাঁহার সহিত ঝগড়া-অভিমান করিয়াছে, আবার তাঁহারই আদর-যত্ন-স্নেহ, আশ্রয়-অভয় পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ইঁহারা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে আপনার জন হিসাবে পাইয়াছিলেন। কেহ 'মা', কেহ 'পিসিমা', কেহ 'দিদি', কেহ 'মাসিমা', কেহ 'দিদিমা' বলিয়া ডাকিতেন। মায়ায় আত্মগোপন করিয়া সকলকে ভুলাইয়া রাখিলেও ছাইচাপা অগ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রচণ্ড তেজ কোথায় যাইবে? স্বর্ণখণ্ডকে অজ্ঞানে পিতল ভাবিয়া লইলেও তাহার আসল মূল্য তাহাতেই থাকিয়া যায়,—চমক ভাঙ্গিলে মানুষ তাহা বুঝে। ঘুমের ঘোরে ঔষধ সেবন করিলেও তাহার কার্য্য হয়। মায়াজীবী মানুষ সংসারে ভুলিয়া থাকিলেও সে পরমবৈদ্যের কৃপাভেষজ ব্যর্থ হইবার নহে—অন্তিমে মুক্তিরূপ মহা-আরোগ্য লাভ তাহার অবশ্যম্ভাবী।

ভোরে সেদিন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। খালিগায়ে দাওয়ার উপরে বসিয়াছিলাম, একটু শীত বোধ হওয়ায় গায়ের চাদরখানি টানিয়া লইতে হইল। তাহার পর একে একে সকলে জাগিলে একজোট হইয়া আমোদরতীরে উপস্থিত হইলাম। পথের দুইধারে ছোট বড় অনেক ক্ষেত—তাহাতে নানাপ্রকার টাট্‌কা তরীতরকারী জন্মিয়াছে। সবুজ ক্ষেত্রে শ্বেত তিলফুলগুলির শোভা বড়ই মনোরম। গ্রামের মহিলারা আসিয়া তাঁহাদের নিত্যব্যবহারের জন্য শাক কুমড়াদি যাহা প্রয়োজন লইয়া যাইতেছেন। ঝির ঝির করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে লাগিল—প্রভাতের বালার্ক পল্লীর পূর্ব্বগগন সিন্দুররাগে রঞ্জিত করিয়া উদিত হইল। আমোদরের তীর সেই প্রফুল্ল সময়ে বড়ই মনোমদ—শ্বেত কনকচাঁপা ও রক্ত-কাঞ্চন পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত। প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সারিয়া লইয়া কেহ কেহ মন্দিরমুখী হইয়া তরুতলে জপরত হইলেন, কোন কোন যুবক ব্যায়ামের নিত্য-অভ্যাস ছাড়িতে না পারিয়া লজ্জা ছাড়িয়া বালুর

ঢিপির উপরেই মাল-কোঁচা আঁটিয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ বা উহারই ভিতর খানিকক্ষণ পাঠ করিয়া লইলেন। মনোহর গৌরী-ললিত তানে দূরে সহসা শ্রীমন্দিরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল; পথের পাশে ঝোপের ভিতর কাল-কোকিল সেই সুরে স্বর মিলাইয়া কুহু-কুহু কূজন করিতে লাগিল। দূর হইতে মন্দিরের অপূর্ব্ব শোভাসম্পদ সকলে উপভোগ করিতে লাগিলেন,—ঐ প্রসঙ্গে নানা গল্প-আলাপন চলিতে লাগিল। চূড়ার উপরে সোণার পাতে 'মা' লেখা একটী পতাকা রবিকরে ঝলসিয়া উঠিল। সকলেই উল্লসিত। এক দল প্রাতঃকৃত্যাদি কাজকর্ম্ম সারিয়া মাঠের মাঝে আলের উপর দিয়া শ্রীমন্দির-মুখে ফিরিতেছেন—পথে আর এক অসমাপ্ত-কর্ম্ম নূতন দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সাদরে 'সুপ্রভাত' বলা হইল। আমোদর মুখে ভক্তসঙ্ঘের এই যাতায়াতের প্রবাহ কয়দিনই অবিরাম চলিতে লাগিল। অপর পার হইতে আগত এই অঞ্চলের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমরা মন্দির সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ও মনোভাব জানিবার জন্য দুইচারিটী প্রশ্ন করিতাম। সকলেই বলিতেন 'বেশ হয়েছে বাপু—সে আর একবার ক'রে বল্‌তে।'

তাহার পর জননীর মন্দির-দ্বারে সকলে যাওয়া গেল। এখনও মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বাহিরের ঠাট্ সব প্রস্তুত। মন্দিরটী বেশ বড়ই হইয়াছে—সাদা ধপ-ধপে। সপ্তদ্বার, ছয় গবাক্ষ। ভিতরকার শয়নগৃহের দুইটী দরজা ধরিলে নবদ্বার। বৌদ্ধস্তূপ ও মুসলমান গম্বুজ—এই দুই রীতির সংমিশ্রণ। উপরের পতাকাটী যেন দূরাগত যাত্রীকে অনুক্ষণ ধ্রুবতারার ন্যায় লক্ষ্য স্থির করিয়া দিতেছে, আর পথ-শ্রান্তকে অভয় দিয়া বলিতেছে—তোর শ্রম সার্থক, পথের শেষে এসেছিস্, মায়ের মুখ দেখে প্রাণ জুড়া। চারিধারের বেড়া দেওয়া বিস্তৃত বারাণ্ডায় লাল সিমেণ্টের মেজে। ঠিক সাম্‌নে হিন্দুস্থানের মন্দিরের ন্যায় একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান আছে, ছোট ছেলেরা উহার লম্বা দড়িসহায়ে ক্ষণে ক্ষণে গুরুগম্ভীর ধ্বনি তুলিয়া আনন্দ করিতেছে। চারিধারের শুচি-শুভ্র দেওয়ালে সপার্ষদ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছায়াচিত্র স্থাপিত হইয়াছে, চিত্রগুলি সব জীবন্ত জ্বলন্ত মূর্ত্তি। ভিতরে কাল-পাথরের বেদীর উপর

দেবীর আসন—তৎসংলগ্ন শ্বেতপ্রস্তরের একটী নিম্ন-বেদিকা। ভিতরের দেওয়ালেও সশিষ্য যুগাবতারের আলেখ্য শোভা পাইতেছে। ভিতরে দীপ ঝুলাইবার জন্য গম্বুজকেন্দ্র হইতে একটী লৌহশলাকা লম্বমান রহিয়াছে। বাহিরের, আলো ও বায়ুচলাচলের জন্য কাচমুণ্ড কয়েকটী গবাক্ষ-গোলক (Skylight) মন্দিরগাত্রে উপরে ফুটান রহিযাছে। প্রাচীন ও নবীন দুই প্রথারই মিলন। নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া 'সেকেলে' বলিবার উপায় নাই। আবার প্রাচীন ধারা একেবারে বিনষ্ট—সম্পূর্ণ আধুনিক 'নবডৌল' ও বলিতে পারিবে না। ভিতরে মাথার উপর দৃষ্টিপাত করিলে গম্বুজগাত্রে একটী সুন্দর কমল চিত্রিত দেখা যায়। সাদার পাশে গম্বুজের বৃহৎ গোলপরিধি ব্যাপিয়া চমৎকার একটী লাল রেখা টানা আছে। সেই রেখায় মন্দির-শোভা আরও বাড়িয়াছে। ভিতরের মেজেটী লাল-কালো সিমেণ্টের।

পিছনের সিঁড়ি দিয়া উপরে ছাদে উঠিলাম। গোল গম্বুজটীর চারিপাশে একটী সুপ্রশস্ত বারাণ্ডা। সমস্ত গ্রামের নয়নাভিরাম একখানি দৃশ্যপট তথা হইতে দেখা যায়। ধরিত্রী গিয়া অতিদূরে যেথায় দিক্‌চক্রবালের সহিত মিলিয়াছে—যতদূর চক্ষু চলে—সমস্তই সুন্দর পরিস্ফুট। চারিধারে অসংখ্য বাঁশ, তাল ও তেঁতুলগাছের শ্রেণী। ম্যালেরিয়া-বর্জ্জিত গ্রীষ্মে পূর্ণিমার প্রশান্ত রাত্রের শুভ্র-কোমল-আলোকে মৃদুমন্দবায়ু সেবনের সহিত এখানে বসিয়া পরস্পরে ভগবৎপ্রসঙ্গ গল্প-আলাপন বড়ই প্রাণারাম হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্দির দৈর্ঘ্যে ৩৩ × ৬ফুট, প্রস্থে ১৯ × ৬ফুট। বাহির বারাণ্ডার পূর্ব্বদিকে ১০ফুট, পশ্চিমে ৯, উত্তরে ও দক্ষিণে ৮ফুট ৯ইঞ্চি করিয়া। গম্বুজসমেত সমস্ত মন্দিরটীর উচ্চতা প্রায় ৪৫ফুট। নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য কলিকাতা হইতে কয়েকজন কারিগর লইতে হইয়াছিল, স্থানীয় মজুরি অবশ্য ছিলই।

মঠের যে সকল শ্রদ্ধেয় কর্ম্মিবৃন্দ অশেষ প্রকারের বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া এই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ভার লইয়া এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া

আসিয়াছেন তাঁহাদের শ্রম সার্থক, উদ্যম অদম্য, কার্য্যকৌশল অতুল, তপস্যা প্রসংশনীয়।

শ্রীসুব্রহ্মণ্য।

তীর্থ দর্শনে।

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ শিকদার, এম, এ)

সে আজ অনেক দিনের কথা। সবে মাত্র বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে আসিয়াছি। সারা দুইটী বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ক্লান্তদেহে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। জননীর স্নেহশীতল কোমল হস্তস্পর্শে সত্যই যেন এতদিনের অবসাদ ও ক্লান্তি কোথায় নিমিষে চলিয়া গেল। পিতামাতা ও ছোট ভাই বোনদের ভালবাসার অমিয় প্রবাহে এতদিনের শুষ্কপ্রাণ এক অভিনব আনন্দে মাতিয়া উঠিল; দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করিয়া মনের সুখে উন্মুক্ত বিহঙ্গের মত কখনও বা সুবৃহৎ দীর্ঘিকাপার্শ্বস্থ চারুলতা বিতানমণ্ডিত কুঞ্জবনমাঝে বন্ধু-বান্ধবের সহবাসে অফুরন্ত গল্পের ফোয়ারায় মাতিয়া উঠিতাম। কখনও বা কল কল নাদিনী স্বচ্ছতোয়া "অমলার" নীরবতীরে, আবার কখনও বা বিকচকুসুমশোভিত পুষ্পোদ্যানে অনাবিল সুখ স্রোতে নিজকে ঢালিয়া দিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলাম।

কিন্তু চিরদিন কিছুই নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটে না; বৈচিত্র্যই এ জগতের প্রাণ। যেখানে আলো সেইখানেই অন্ধকার! নির্ম্মল চাঁদিমারাতে নিশারাণীর আনন্দোৎসবের মাঝেও ঝটিকার তাণ্ডবনৃত্য নিরানন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং মানবের ভাগ্যে কখন কি ঘটিবে তাহা সহজে বুঝিবার কাহারও সাধ্য নাই। মানবের ক্ষীণদৃষ্টির অন্তরালে বিশ্ববিধাতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও তাঁহার অলক্ষ্যহস্ত সকলের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

কাহাকে কোন পথ দিয়া মুক্তির অনন্ত সায়রে লইয়া যাইবেন তাহা মায়া-মুগ্ধ অন্ধমানব ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না। হয়ত জীবনের এক শুভ মুহূর্ত্তে শতজন্মের নীরব বীণা মধুর ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল; কেহ জানিত না, কেহ সুধাইত না, যে আপন মনে আপনা ভুলিয়া জগতের একপার্শ্বে দাড়াইয়া ছিল। সহসা কাহার পরিচিত বাণী শুনিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া জগতকে সে এক নূতন ভাবাবেশে দেখিতে লাগিল। তাই করুণাময়ের কৃপাকটাক্ষ কখন কাহার উপর কি ভাবে পতিত হইবে তাহা মানব মনের অগোচর!

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণেই সুবৃহৎ পুষ্করিণী। একদিন সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বেই সেই দীর্ঘিকাতীরে শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর ক্লান্তদেহখানি ঢালিয়া দিয়া বায়ু সেবন করিতেছিলাম। সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পের মধুময় গন্ধ অঙ্গে মাখিয়া পাগল বাতাস সস্নেহে দেহখানি স্পর্শ করিয়া শ্রান্তিদূর করিতেছিল; দিনমণি পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেই অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্তিমআলোকচ্ছটার শেষরশ্মির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টাদির সুমধুর রব জগতে সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিয়া গেল, চারিদিকে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা নিবিড় হইয়া আসিতেছিল, দূরে তরুতল হইতে ঝিল্লীধ্বনির সহিত বিহঙ্গকাকলী মিশিয়া ধরণী পুলকিত, এবং চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষণপরেই পূর্ব্বচক্রবাল রেখা ভেদ করিয়া হিমাংশু নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে মুক্তারাশি ছড়াইয়া—কর্ম্মক্লান্ত মানবের প্রাণে পীযূষধারা ঢালিয়া দিয়া স্বগৌরবে প্রকাশিত হইলেন। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যের মাঝে মন আজ এক অজ্ঞাত আবেশে ডুবিয়া গেল। এতদিনের রুদ্ধ চিন্তাপ্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। কখনও বা ভবিষ্যজীবনের সুখস্বপ্নে বিভোর হইতে লাগিলাম—কখনও বা দেশহিতৈষণার উচ্চাদর্শে হৃদয়ের অনন্ত ভাবরাশি রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবাধ চিন্তাপ্রবাহে নিজকে ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃতির বিচ্ছুরিত সুষমায় আত্মহারা হইয়া সুখকল্পনাজালে নিজকে হারাইতে লাগিলাম। সহসা এই তন্ময়তার মধ্যে অদূরে শুনিতে পাইলাম—সেই নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধুরকণ্ঠে কে যেন উদাস প্রাণে

একটী গান গাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। সঙ্গীতটী পরিচিত হইলেও যতই শুনিতে লাগিলাম ততই যেন হৃদয়তন্ত্রী এক নবভাবে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল —উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পথিক গাহিতেছিল—

"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবিগো তাই ॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল,
(এ যে) প্রবাহের বারি রোধিতে কি পারি
যাই যাই কোথা কূল কি নাই ॥

প্রাণের দ্বারে অজ্ঞাতসারে এক অজানা বেদনা আসিয়া ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। গানের শেষ চরণটী শুনিতে শুনিতে চক্ষে জল আসিল। জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত বাসনার অন্তরালে যে নির্ম্মল ভাবস্রোত এতদিন নীরব প্রবাহে ছুটিতেছিল, হঠাৎ জানিনা কেন আজ এই প্রকৃতির আনন্দোৎসবের মধ্যে আমার পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অপ্রতিহত বেগে বাহির হইয়া পড়িল। একটা শূন্যতা আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিল। এক অতৃপ্ত অভাব—যাহা শুধু সংসারের সুখৈশ্বর্য্যে মেটে না, পিতামাতার আবেগমধুর সোহাগে তৃপ্ত হয় না, প্রকৃতির চিত্তহারিনী সুষমায় ভরিয়া উঠে না—সেই এক অদম্য অভাব আসিয়া এ হেন আনন্দের মাঝে নিরানন্দের সৃষ্টি করিয়া দিল! মনে হইল সত্যই কি যেন কি হারাইয়াছি, বুঝি আপনা হারাইয়া এ বিজন পাথারে কাহার পিছনে অনন্ত ক্ষুধা মিটাইবার লালসায় ছুটিয়াছি,—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরামগতি নিয়ত এক প্রহেলিকাচ্ছন্ন মায়ারাজ্যে আসিয়া হৃদয়ের সমগ্র শক্তি দিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছি। যত যাই ততই যেন শান্তির ধ্বজা দূরে অতিদূরে সরিয়া যায়। এই অজ্ঞাত বন্ধুর প্রদেশে কে আমি প্রকৃতির কোলে নিত্য খেলাধূলা করিয়া বেড়াতেছি? কেনই বা আসিয়াছি কোথায়ই বা যাইতেছি? শৈশবে মাতৃক্রোড়ে প্রথম

ক্রন্দনের সঙ্গে অস্পষ্ট মা-মা ধ্বনিতে জগতে-আগমন বার্ত্তা জানাইয়াছি; কৈশোরের খেলাধূলার মাঝে বহির্জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া মধুময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়াছি। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন বাসনা হিল্লোলে ভবিষ্যজীবনাকাশে স্বর্গের নন্দনকানন সৃজন করিয়া আসিতেছি। কত বুকভরা আশা, কত উদ্যম লইয়া পিতামাতার অনন্তভালবাসার পুত্তলী আমি কঠোর বিপদসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কিন্তু অকস্মাৎ আজ কাহার অজানাস্পর্শে হৃদয়ের নীরব তন্ত্রী এক করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল। পথিক তখনও আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইতেছিল। মনে হইল যেন ঐ উদাস সঙ্গীত তাহারও প্রাণের একটী অব্যক্ত "অভাবের" ইঙ্গিত করিতেছিল। গানের আরও কয়েকটী পদ অস্পষ্টভাবে কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল—

"কে আছ চেতন করহে চেতন
কতদিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন
কে আছ চেতন ঘুমাইওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার
কর তমনাশ হও হে প্রকাশ
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ—চাই—"

গান শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করি—কে তুমি পথিক সুপ্ত প্রাণে জাগরণের সাড়া আনিয়া দিতেছ? তুমি কিগো সেই অনন্তের পথিক যে সুসুপ্ত আত্মহারা বিশ্ববাসীর কাণে কাণে অনৈসর্গিক সুরলহরী জাগাইয়া দিয়া অনন্তের অভিসারে মানবমন উধাও করিয়া দিয়া যায়, যার কৃপাকটাক্ষে ত্রিতাপদগ্ধ মানবপ্রাণ শান্তির অমিয়সাগরে অবগাহন করিয়া অখণ্ডআনন্দে ভরিয়া উঠে? গানের আবেগময়ী মূর্চ্ছনা প্রকৃতির নীরবতার মাঝে যেন একটী করুণ সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিল যে সে সুর আমার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া" প্রাণমন আকুল করিয়া দিয়া গেল। "তোমা

বিনে আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই”—চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ের কোণে একটী তীব্র বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন স্নেহময়ী প্রকৃতির বুকভরা স্নেহের মধ্যেও জীবনটা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। সহসা মেঘগর্জ্জনে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম পশ্চিম গগনে একখণ্ড কালমেঘ দেখা দিয়াছে। প্রবল বাতাসে মেঘখণ্ড চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দুই এক ফোটা করিয়া বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। ঝড়ের আশঙ্কা হওয়ায় গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতপদে বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি অধিক হওয়ায় আহারান্তে শুইয়া পড়িলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল এ গানত অনেকদিন শুনিয়াছি কিন্তু কভূত প্রাণে এমন করুণ সুর বাজিয়া উঠে নাই।

অল্পক্ষণ পরেই গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি কোন এক দূরদেশে ছুটিয়া চলিয়াছি; সঙ্গিহীন, নিঃসম্বল একাকী এক অনন্তবিস্তার প্রান্তরভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এদিকে সন্ধ্যার ঘনছায়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকের উপর নামিয়া আসিতেছিল। এই জনহীন প্রান্তরে আশ্রয়ের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সারাদিবসের পরিশ্রমে ক্লান্তদেহখানি আপনিই পৃথিবীর বক্ষে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম এবং মনে মনে ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলাম। ক্ষণপরেই যেন একটু তন্দ্রাবেশ হইল—শুনিতে পাইলাম কে যেন পরমাত্মীয়ের ন্যায় আমাকে আহ্বান করিতেছে। চক্ষু ফিরাইয়াই দেখিতে পাইলাম সন্মুখে তেজ প্রদীপ্ত সুদীর্ঘবপুঃ এক সন্ন্যাসী; তাঁহার দৃষ্টিতে যেন স্নেহ ও করুণা উপছিয়া পড়িতেছে। চিরপরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—“ভয় কি বৎস, জীবনে এরূপ কত পরীক্ষা আসিবে তজ্জন্য কাতর হইলে চলিবে না। কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাপন্ন হও, হৃদয়ের সমস্ত অবসাদ জীবনের সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে”। আর তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"॥

সহসা বিহগনিচয়ের কলকণ্ঠ নিশার অবসান বার্ত্তা জানাইয়া দিয়া গেল। সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জাগিয়া উঠিয়াও সেই মধুময় স্বপ্নের আবেশে তখনও যেন শুনিতে পাইলাম।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম প্রকৃতি বালারুণস্পর্শে আবার হাস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে রায় বাড়ীর নহবৎখানা হইতে সাহানার প্রভাতী রাগিনী কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। বাস্তবিকই মনে হইতে লাগিল যেন আজ রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের উপর হইতে এক কাল যবনিকা সরিয়া গেল। হাস্যমুখর প্রকৃতির কমনীয় রূপমাধুরী আবার আশার নবীনালোকে শূন্যপ্রাণ ভরিয়া দিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিরদিন কাহারও কখনও সমভাবে যায় না। এই দুর্ভেদ্য সংসারারণ্যে সুখদুঃখরূপ আলোক আঁধারের ভিতর দিয়া কখনও বা আশার উজ্জ্বলালোকে আত্মহারা হইয়া আবার কখনও বা নৈরাশ্য ও বিফলতার কঠোর কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানব অনাদিকাল হইতে সেই অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। কালস্রোত কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। হায় অন্ধমানব, তুমি জাননা আজ যাহাকে অতি আপনার ভাবিয়া অন্তর হইতে প্রিয়তম মনে করিয়া হৃদয়ের সমস্ত স্নেহমমতা দিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া আছ, কাল বা দুইদিন পরে বিধাতার নির্ম্মম আহ্বানে হয়ত তোমার সেই অতি আদরের ধন চিরদিনের জন্য তোমার স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া এক অজানা দেশে চলিয়া যাইবে। দেবতার দেওয়া জিনিষ দেবতাই কুড়াইয়া লইবেন। একদিন সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়াই শুনিতে পাইলাম বীরেনের কলেরা

হইয়াছে। বীরেন আমার ভাগিনেয়; বয়স ৫।৬ বৎসর মাত্র। বাড়ীতে সেই আমার একমাত্র আদরের বস্তু ছিল। তাহার বালসুলভ চপলতা ও হাসিমাখা কথাগুলি আমার হৃদয়ের ভালবাসা যেন কাড়িয়া লইয়াছিল। তাহাকে দেখিতে না পাইলে এবং তাহার সঙ্গে খেলিতে না পারিলে দিনটা বৃথা গেল বলিয়া মনে হইত। যাহা হউক তখনই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলাম। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আমাকে শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন—"সুবোধ বাবু, it is too late now". যাহা হউক চেষ্টার ক্রটী হইল না। রাত্রি ২॥০ ঘটিকার সময় বীরেন তার হতভাগিনী মায়ের কোল শূন্য করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেল।

বিধাতার এই তীব্র পরিহাসে হৃদয়াকাশে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব মুহূর্ত্তের তরে আবার নবীন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজনের আকুল আর্ত্তনাদে সমস্ত বাড়ীটা একটা বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। যে দিকে তাকাই সেই দিক হইতেই যেন পশুপক্ষী বৃক্ষলতা সমস্তই এক বিষাদ সঙ্গীত তুলিয়া জীবনের নশ্বরতা জগতকে জানাইতে লাগিল। আবার সেই গানটী মনে পড়িল।

"জানিনা কেবা এসেছি কোথায়
কেন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে
চারিদিকে গোল, ওঠে নানা রোল
কত আসে যায় হাসে কাঁদে গায়
এই আছে আর তখনই নাই"।

এই কুহেলিকাচ্ছন্ন মানব জীবনের সমস্যা কেহ নিরাকরণ করিয়া দিবে কি?

অনেক দিন হইতেই তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগাভাবে এবং লেখাপড়ায় নিতান্ত ব্যাপৃত থাকায় সে ইচ্ছা এতদিন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই এইবার তীর্থদর্শনের জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল; মনে হইল বুঝি বা পবিত্র তীর্থভূমি দর্শনে হৃদয়ের ব্যথা কথঞ্চিৎ প্রশমিত

হইবে। আমার বৃদ্ধা ঠাকুরমাও শেষ বয়সে একবার ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক শুভদিনে শুভক্ষণে আমরা চারিজন রওনা হইলাম। আজকাল্ রেলগাড়ী ও ষ্টীমারাদির সুবন্দোবস্ত হওয়ায় ৺পুরীধামে পৌঁছিতে আমাদের বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইল না। দূর হইতে সেই অভ্রভেদী মন্দিরচূড়া দর্শন করিয়া মন্দিরস্থিত দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। আমার জীবনে এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। সুতরাং এখানকার প্রত্যেকজিনিষই প্রাণে আনন্দের ঢেউ তুলিতে লাগিল। কতদিন নিঝুম নীরব পল্লীগৃহে বসিয়া কল্পনার তুলিকায় প্রেমবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাভূমি এই পুরীধামের পুণ্যছবি ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছি—সেই কল্পনা আজ মূর্ত্তিমতী হইয়া অতীতের গৌরবমণ্ডিত অক্ষয় কীর্ত্তি বুকে করিয়া কালের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া সম্মুখে বিদ্যমান! প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমাদিগকে আশ্রয়ের জন্য ভাবিতে হইল না। এক পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় লইলাম। স্নানান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন করিয়া বহুদিনের ঈপ্সিত ভক্তবৎসল সেই মন্দির দেবতাকে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক মনে করিলাম। ভক্তবৃন্দের শত কণ্ঠোচ্চারিত হরিধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কেহ বা ভক্তি বিহ্বল চিত্তে ভগবানের চরণ কমল চিন্তা করিতে করিতে নয়নাসারে ভাসিতেছিল। আবার কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া মন্দির মুখরিত করিতেছিল। আজ এই আনন্দ হিল্লোলের মাঝে আমারও হৃদয় খুলিয়া গেল। আমিও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিতে লাগিলাম—

> ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
> স্তমস্ত বিশ্বস্য পরং নিধানম।
> বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
> ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।
> বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
> প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমোনমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

কিছুকাল পরে মন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। তারপর বৈকালে সমুদ্র দর্শনে চলিলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এই প্রথম সমুদ্র দর্শন। যাহা দেখিলাম তাহা আমার দুর্ব্বল লেখনী বর্ণনা করিতে অসমর্থ। সম্মুখে অনন্তবিততনীলাম্বুরাশি, ঊর্দ্ধে সুনীল নভোমণ্ডল, পশ্চিম চক্রবাল রেখাপ্রান্তে অস্তাচলগামী দিনমণির আরক্তিম কিরণছটা প্রকৃতির সে বিরাট সৌন্দর্য্যকে কমনীয় ও মধুময় করিয়া তুলিতেছিল। সিকতাময় পুলিন প্রদেশে ফেন পুঞ্জবিরাজিত বারিধির তরঙ্গভঙ্গে যেন ক্ষণে ক্ষণে অবিচ্ছিন্ন শ্বেতশতদল মালিকা ফুটিয়া উঠিতেছিল। ঊর্ম্মিমালার উদ্দামনৃত্যের জলদগম্ভীর শব্দে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যুগপৎ এক নবভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। বহির্জগতের কোলাহল যেন সে বিরাট গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া আসিয়া হৃদয়কে মথিত করিতে সাহসী হয় না। ক্ষণিকের জন্য হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা ও ঐশ্বর্য্যাভিমান এই প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের মাঝে ডুবিয়া গেল। তন্ময় হইয়া সেই সুনীল বারিধির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল ইন্দ্রিয়াসক্ত বদ্ধ মানব আমরা—আমাদের এই অপার্থিব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবারও শক্তি নাই—! রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম।

রথযাত্রার সময় অত্যন্ত জনতা হয় বলিয়া আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দেখিয়াই চলিয়া আসিব এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। আমার বৃদ্ধ ঠাকুরমাও ইতিমধ্যে একটু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক ৺পুরীধামে ১০।১২ দিন বেশ আনন্দেই কাটাইলাম। যেদিন দেশাভি-মুখে রওনা হইব তাহার পূর্ব্বদিবস সমুদ্র দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পার্শ্বস্থ এক বাটীতে সুমিষ্ট সঙ্গীতালাপ শুনিতে পাইলাম। গানটী যতই শুনিতে লাগিলাম ততই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলাম জানিনা এ সঙ্গীতমূর্চ্ছনায় কি এক অজানা ভাব জাগাইয়া দিতেছিল।

কবিগুরু কালিদাসের ভাবপ্রসবিনী লেখনী হইতে যে বাণী উঠিয়াছিল তাহাই মনে পড়িতে লাগিল—

রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্যশব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনং অবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরানি জন্মান্তর সুহৃদানি ॥

বহির্ব্বাটীতে সঙ্গীত হইতেছিল, সদর দরজা বন্ধ ; কিন্তু ভিতরে যাইয়া সেই সঙ্গীত শ্রবণের জন্য মন বড়ই উচাটন হইয়া উঠিল। সৌভাগ্যক্রমে নবাগত এক ভদ্রলোকের আদেশে দরজা খুলিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে আমিও ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। কিন্তু সম্মুখে যাঁহাকে দেখিলাম তাহাতে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। যাঁহাকে একদিন সুদূর পল্লীগৃহে স্বপ্নের সুখময় আবেশে দেখিয়াছিলাম, যাঁহার স্নেহপ্রসারিত সুকোমল হস্তের সুশীতলস্পর্শে নিদ্রায় শ্রান্তির অপনোদন হইয়াছিল, যাঁহার জলদগম্ভীর আশ্বাসবাণীতে বন্ধুর সংসারারণ্যেও পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি, সেই তেজোমণ্ডিত সন্ন্যাসিপ্রবর আজ আমার সম্মুখে! কত জন্মজন্মান্তরের পরিচিত তাঁহার সেই করুণামাখা সস্নেহ দৃষ্টি, তাঁহার প্রীতিমধুর আদরসম্ভাষণ এতদিনের রুদ্ধভাব প্রবাহ এক সম্মোহন বলে খুলিয়া দিল ; আত্মহারা হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলাম। নয়নজলে ভক্তিপুলকহৃদয়ে তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম— আবার গান চলিতে লাগিল—তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম—

"মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হ'লে তাহে করিও বিশ্রাম
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইও পথ সে পান্থ নিবাসিজনে ॥"

তারপর কতদিন চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সমস্ত কাজের ভিতর কেবলই মনে হয় সার্থক আমার তীর্থ দর্শন। সে শুভমুহূর্ত্তে যাহা মিলিয়াছিল তাহাই চিরজীবনের পাথেয় হইয়া রহিয়াছে। কত ঝঞ্ঝা,

কত বিপদ চলিয়া গিয়াছে, কত সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে আশা নৈরাশ্যের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছি কিন্তু জীবনের সেই মৌনসন্ধিক্ষণে সেদিন তীর্থ দর্শনে যাঁহাকে পাইয়াছিলাম, যাঁহার অহৈতুকী কৃপা ও আশীষবাণী এত বিপদের মাঝেও নিত্যনব প্রেরণায় আমাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই, সেই সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠই এ জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন; হৃদয়াকাশে আজও সদাই ধ্বনিত হইতেছে,—

"কে এলে মম জীবনে
মম শুষ্কশীর্ণ হৃদয় তটিনী পুরিল বর্ষাপ্লাবনে॥
আমি কত সাধে সাধ বাঁধিয়া ছিনু সংসার বিষয়ে মাতিয়া
তুমি কি মোহনবলে, কাটিলে সে সবে, লইতে নিত্য ভবনে॥
আমি লুকাইয়া হৃদি নিভৃতে, কত আকাশ কুসুম রচিতে
ছিনু কতই যতনে কতই ব্যস্ত নিজেকে নিজে মোহিতে,
সহসা তোমার ঐ মৃদুপরশন হৃদে আনিল নব জাগরণ
আমি দেখিনু চাহিয়া অন্তরেতে তুমি, কি আর রাখিব গোপনে॥"

বাঁশীর সুরে।

(শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়)

বিশ্বের মাঝে
শ্রবণে বাজে
কিসের অজানা সুর।
যেন কে বাঁশী
বাজায় আসি
ফুকরিয়া সুমধুর॥
বাজে গো প্রাণে
ধ্যানে ও জ্ঞানে
আকুলিয়া হৃদি মোর
কাহারি কথা
কাহারি ব্যথা
কাহারি দুঃখ—ঘোর॥

নীরব নিশা
লাগায় দিশা
শুনায়ে মধুর—স্বর।
নিতই শুনি
কেন কি জানি
হইনু কি শ্রুতিধর?
জানায় এসে
কে ছদ্ম বেশে
দৈন্যতা কা'র—ধীরে।
বিশ্বের দ্বারে
মানব তরে
মধুর বাঁশীর—সুরে॥

আত্মার স্বরূপ কি ?

(ব্রহ্মচারী রমাচৈতন্য)

বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কোন ক্রিয়াদ্বারা আত্মার উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি, সংস্কার বা কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সম্পাদন সম্ভবপর হয় না, যাহাতে তাহার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হইতে পারে। সমস্ত উপনিষৎ, ও গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র একমাত্র তাদৃশ আত্মস্বরূপ প্রকাশেই পরিসমাপ্ত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মার কর্ত্তা, কর্ম্ম, ভোক্তা, পাপ পুণ্য যুক্ত শরীর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞজনের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ধারণানুসারে শাস্ত্রে কর্ম্ম বিধি সমূহ বিহিত হইয়াছে।

ক্রিয়া দ্বারা সাধারণতঃ চারি প্রকার ফল উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) উৎপত্তি, (২) বিকার, (৩) প্রাপ্তি, (৪) সংস্কার। ক্রিয়া অনুসারে কর্ম্মও চারিপ্রকার হইয়া থাকে—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য্য। যাহা পূর্ব্বে থাকে না, পরে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদ্য বলে। এক প্রকার বস্তুকে যে, অন্য প্রকার করা ; তাহাকে বিকার ও বিকারের আশ্রয়কে বিকার্য্য বলে। ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাকে প্রাপ্য বলে। কোন বস্তুতে নূতন গুণ সমুৎপাদনের নাম সংস্কার, এবং সংস্কার বিশিষ্টকে সংস্কার্য্য বলে। ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, সুতরাং উৎপাদ্য হইতে পারেন না। তিনি নির্ব্বিকার, সুতরাং তিনি বিকার্য্য নহেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী নিত্য প্রাপ্ত, সুতরাং প্রাপ্য হইতে পারেন না। তিনি নির্গুণ, সুতরাং তাঁহার গুণাধান বা দোষাপনয় দ্বারা সংস্কার হইতে পারে না ; অতএব তিনি সংস্কার্য্যও হইতে পারেন না। এই কারণেই আত্মা বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বা কর্ম্ম হইতে পারেন না।

বাস্তবিকই মানব যদি ক্ষুদ্র হইত, যদি সে কর্ম্ম ও শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন

হইত, যদি প্রাপ্ত অধিকারে ব্যবস্থিত হইয়া, তৎফল লাভে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। তাহা হইলে অধিকার, কর্ত্তব্য ও ক্রমোন্নতির স্থান থাকিত না। চৈতন্য সর্ব্বাত্মক বলিয়াই, মানবকে যে কোন ভাবে পরিসমাপ্ত করা যায় না। মানবের অপরিমেয়ত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্বই অধিকার প্রাপ্তির মূলে সর্ব্বদাই খেলা করিতেছে। "আমি" স্থূল নই বলিয়াই স্থূলাতীত ভাবের কামনা করি। মানবের এই আকুল পিপাসাই আত্মার সর্ব্বত্ব ও একত্বের প্রতিপাদক। ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। "শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতায় চল্লিশটী মাত্র অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম উনচল্লিশ অধ্যায়ে 'দর্শপৌর্ণমাস' যজ্ঞ হইতে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। অপর এক অধ্যায়ে অষ্টাদশ মাত্র ব্রহ্ম বিদ্যা প্রকাশক উপনিষৎ আরব্ধ হইয়াছে। ইহার প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, এই যে ধনধান্য পূর্ণ জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে, অকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মদ্বারা ইহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুবর্ণময় অলঙ্কারের ভিতরে বাহিরে যেরূপ সুবর্ণ ছাড়া আর কিছুই সত্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মছাড়া এই জাগতিক পদার্থের কোনও অস্তিত্ব নাই। আত্মা ও ব্রহ্ম এক। সুতরাং "সর্ব্বভূতে আত্ম দর্শন করিয়া এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিয়া মুমুক্ষ সাধক জাগতিক সর্ব্ব বিষয়ে অভিলাষ পরিত্যাগ করিবেন।" আমাদের বেদান্ত দর্শনও আত্মা বা ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণের বিচারে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক এ বিষয়টী যে সহজ নয়, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিষয়টী খুবই জটীল ও সমস্যাপূর্ণ। এ বিষয়ে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের বিচার দেখিলেও যেন মনে হয়, তিনিও এই বিষয়ে একটু ধৈর্য্যহীন হইয়া বলিতেছেনঃ—"তবে ব্রহ্ম কি দুই? পর এবং অপর (নির্গুণ ও সগুণ)? হয় হউক দুই।" (ব্রহ্মসূত্র ৪—৩—১৪) "ব্রহ্ম-এক" "শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দ প্রমাণকং।" (২—১—২৭)

"গুণ" শব্দকে আমাদের প্রচলিত attribute অর্থে গ্রহণ করিয়া 'সগুণ' ব্রহ্ম এবং 'নির্গুণ ব্রহ্ম' এই দ্বিবিধ পদ সম্বন্ধে বিচার করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাক্। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ন্যায়ের পদার্থ বিচার প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় ব্রহ্মও দ্রব্য পদার্থ।

তবে ব্রহ্ম নিরাকার ; সাকার (Extended) দ্রব্য পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মেতে বিভাজ্যত্ব (Divisibility) গুণ নাই। আত্মাই ব্রহ্ম, বা ব্রহ্মই আত্মা। আমাদের আত্মাও অভিভাজ্য, তথাপি আত্মা স্বপ্নকালে যুগপৎ নানাভাবে প্রকাশ হয়। সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিভাজ্যত্বের পরিবর্ত্তে যুগপৎ নানাভাবে প্রকাশের শক্তি বর্ত্তমান আছে। বেদান্ত মতে সেই শক্তিই মায়া নামে অবিহিত হয়। "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।" শ্বেতাশ্বতর ৪-১। আবার ন্যায়ে দ্রব্য পদার্থের (substance) সহিত গুণ (Attribute) এবং কর্ম্মের (Acts) সম্বন্ধের নাম, সমবায় সম্বন্ধ (Differant but not separable)। সমবায় সম্বন্ধ সাবয়ব (limited) ভৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধে যেরূপ, নিরবয়ব আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপই হইবে। যেমন পুষ্পাদি সাবয়ব দ্রব্যগুলি এবং সৌন্দর্য্য সৌগন্ধাদি তাহার গুণ ; ব্রহ্মও সেইরূপ গুণী, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি তাঁহার গুণ। গুণী হইতে গুণকে কখনও পৃথক করা যায় না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিজে "বস্তুতন্ত্র-জ্ঞান" এবং "পুরুষতন্ত্রজ্ঞান" বা কল্পনার ভেদ দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে—"শ্রুতি বলিতেছেন, 'হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি'।" এস্থলে পুরুষ বা মানুষেতে অগ্নি বুদ্ধি উপদেশ জনিত মানস ক্রিয়া কল্পনা মাত্র, বা পুরুষতন্ত্র। কিন্তু লোক প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নি বুদ্ধি উপদেশ জনিত মানস ক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র নয়। তবে কি ? তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বা বস্তুতন্ত্র। অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধিকেই জ্ঞান বলা যায়! মানুষেতে অগ্নিকল্পনার ন্যায় তাহাকে মানস ব্যাপার মাত্র বলা যায় না। সকল প্রকার প্রমাণ গম্য ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেই একথা সত্য যে তাহা 'বস্তুতন্ত্র,' উপদেশ জনিত, মানস ক্রিয়ামাত্র বা, পুরুষ-তন্ত্র নয়।" (ব্রহ্ম-সূত্র ১-১-৪ ।)

প্রকৃতপক্ষে গুণ গুণী বা ক্রিয়া ক্রিয়াবান্ উভয়ই পরস্পর অভিন্ন। তাহাদের পরস্পর ভেদ বা বিভাগ লৌকিক কল্পনা মাত্র, বস্তুতন্ত্র নয়। শঙ্কর নিজেও তাঁহার এ সূত্রভাষ্যে "গুণ-গুণিনোরভেদাৎ"—গুণ গুণীর অভেদে স্বতঃসিদ্ধ, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধাদি যুক্ত পঞ্চ ভূত সম্বন্ধে যেরূপ, অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় ব্রহ্ম

সম্বন্ধেও সেইরূপ। নিগুর্ণ পুষ্প বলিতে আমরা—যেমন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ রহিত পুষ্পকে বুঝিয়া থাকি, নিগুর্ণ ব্রহ্ম বলিলেও সেরূপ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি গুণ রহিত ব্রহ্মকেই আমাদের বুঝিতে হইবে। পঞ্চ গুণ রহিত পুষ্প যেমন পুষ্প নামের অযোগ্য ও অর্থ শূন্য, সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি রহিত ব্রহ্মও ব্রহ্মনামের অযোগ্য ও অর্থ শূন্য। যদি বলা যায় প্রচলিত অর্থে সত্তা চৈতন্যও কি গুণ নয়? নিগুর্ণ ব্রহ্ম বলিলে সত্তাদি এবং চৈতন্য রহিত ব্রহ্মই বা বুঝাইবে না কেন? আবার সেই পঞ্চগুণযুক্ত পুষ্প,—একথা যেরূপ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-যুক্ত বা সগুণ ব্রহ্ম—একথাও সেই রূপ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। ক্রমাগত এরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মের সগুণ-নিগুর্ণ ভেদ বিচার কেবল মানসিক কল্পনা মাত্র (Mental Abstraction); প্রকৃত পক্ষে তাহা বস্তু-তন্ত্র (Objective Reality) হইতে পারে না। একই আত্মার মধ্যে তাহার নিগুর্ণের ভেদ রেখা থাকা অসম্ভব। "গুণ-গুণি নোরভেদাৎ।"

আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, অথবা মন দ্বারা চিন্তা করি, তাহা বাহ্য হউক আর মানসিকই হউক, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই পুরুষতন্ত্র (Relativity of all knowledge)। বস্তু-তন্ত্র জ্ঞান (Dingansich) আমাদের ইন্দ্রিয় মনের অগোচর। যেমন কর্ণের স্বভাব শব্দ শুনা, ত্বকের স্বভাব স্পর্শানুভব করা, চক্ষুর স্বভাব রূপ দেখা, জিহ্বার স্বভাব—রসাস্বাদন করা, নাসিকার স্বভাব ঘ্রাণাস্বাদন করা—যাহার শ্রোত্র ত্বক চক্ষুরাদি নাই—যেমন ঈশ্বর—তাহার সম্বন্ধে শব্দস্পর্শ রূপাদি কেমন কে বলিবে। তিনি যাহা জানেন তাহাই পরমার্থিক সত্য, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। প্রাণি মাত্রেরই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা লব্ধজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু বস্তু এক। এই জন্যই বলা হয় চিনিতে কোন মিষ্টতা নাই, পচাতে কোন দুর্গন্ধ নাই, সঙ্গীতে কোন লালিত্য নাই, এসবই আমাদের জিহ্বা, নাসিকা ও কর্ণের মধ্যে। চিনি আছে, পচা আছে এবং সঙ্গীতও আছে, কিন্তু স্বতঃ তাহা কিরূপ আমরা জানি না। এই জন্যই বলা যায় বস্তু সকলের পরস্পর ভেদাভেদ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই

পুরুষ-তন্ত্র (Relative)। বেদান্ত মতে ইহারই নাম অবিদ্যা। বস্তুতন্ত্র জ্ঞান আমাদের এই মাত্র, যে বস্তু আছে, কিন্তু স্বতঃ সে বস্তু কিরূপ, তাহা আমাদের জানা নাই। We know that it is, but not what it is এই অর্থে সকল বস্তু সম্বন্ধেই সগুণ নিগু'ণ ভেদ সম্ভব, এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সম্ভব।

দর্শন, শ্রবণ,' কথন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে যতদূর অবগত হওয়া যায় বা উপলব্ধি করা যায়, তাহাই আমাদের নিকট সগুণ ব্রহ্ম। আর যাহা আমাদের করণের অগোচর তাহাই নিগু'ণ ব্রহ্ম—"নেতি নেতি স্বরূপ সর্ব্ব বিশেষ বর্জ্জিত।" শঙ্করও তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন—পরব্রহ্ম কি ? এবং অপর ব্রহ্ম কি ? যে স্থলে অবিদ্যাকৃত নাম রূপাদি বিশেষত্ব প্রতিষেধ পূর্ব্বক অস্থূলাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই পর বা নিগু'ণ। আর যে স্থলে উপাসনার উদ্দেশ্যে সেই ব্রহ্ম নাম রূপাদি বিশেষত্ব যুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন,—যথা মনোময়, প্রাণ শরীর, ভা-রূপ" ইত্যাদি, তাহাই অপর বা সগুণ ব্রহ্ম। এরূপ হইলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব শ্রুতি বাধিত হয়—তাহা নয়। নাম রূপাদি উপাধির যোগ্যতা অবিদ্যা জনিত। একথাতেই বিরোধ পরিহৃত হইতেছে। (সূ-ভা ৪-৩-১৪) শঙ্কর স্থানান্তরে অবিদ্যার এরূপ সংজ্ঞা করিতেছেন :—"সতাং পরিদৃশ্যমানকার্য্যানাং কারণানাং প্রত্যক্ষেনাগ্রহণং অবিদ্যা " (ব্রহ্ম সূত্র ২-২-১৫) যে সকল কারণ বর্ত্তমান, এবং যে সকল কারণের কার্য্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল কারণকে প্রত্যক্ষ রূপে উপলব্ধি না করার নাম অবিদ্যা।

সগুণ ও নিগু'ণ আত্মা।

গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এই দুই বিষয়েরই আমাদের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ। গ্রাহ্য বিষয় কোন বাহ্য বস্তুই হউক, অথবা বাসনা, কল্পনা, ক্রিয়া, স্মৃতি অথবা বিচার প্রভৃতি যে কোন মানসিক ব্যাপরই হউক, তাহাতে Object and Subject সম্বন্ধীয় সেই আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ ভেদ-জ্ঞানের কোন কারণ নাই। স্থির চিত্তে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখাযায় যে তাহারা নেতি নেতি স্বরূপ। উহা সর্ব্বপ্রকার বাহ্য বস্তু

হইতে এবং গ্রাহ্য বস্তু হইতেও পৃথক। সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে উহা পৃথক হইলেও সর্ব্বপ্রকার বস্তুদ্বারা সর্ব্বদাই অনুরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। "সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং"। গ্রাহকাত্মার এই অবস্থা বিশেষেরই নাম সগুণ (Relative) এবং তাহার স্বকীয় স্বচ্ছ এবং বর্ণরহিত অবস্থার নাম নির্গুণ (Absobute)। আত্মার এই দ্বিবিধ অবস্থাতেই, সেই গ্রাহকাত্মা এক—আমাদের বিচার দৃষ্টিতেই কেবল প্রার্থক্য দৃষ্টহয়। যে বৃহদারণ্যকে আত্মা "অস্থূলমনণু" "নেতি-নেতি"-স্বরূপ বা নির্ব্বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, আবার সেই বৃহদারণ্যকেই (২।৩।৬) আত্মার বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায়, মেষ লোমের পাণ্ডুর বর্ণের ন্যায়, ইন্দ্র গোপের ন্যায় লোহিত, অগ্নির শিখার ন্যায় অথবা পুণ্ডরীকের ন্যায় শুভ্র বলা হইয়াছে।" এই কথার উপর আবার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—"বস্ত্র যেমন হরিদ্রা দ্বারা রঞ্জিত হয়, চিত্তও সেইরূপ বস্ত্রাদি-বিষয় সংযোগে তত্তদ্বিষয়ক বাসনা দ্বারা রঞ্জিত হয়। এই কারণে জীবকেও বস্ত্রাদির ন্যায় রঞ্জিত বলা যায়। বাহ্য বিষয় অনুসারে অথবা চিত্ত-বৃত্তি অনুসারে কখনো কখনো এই রঞ্জনের ভাল মন্দ তারতম্য দৃষ্ট হয়। যেমন কাহারো কাহারো বাসনার রূপ জ্ঞান বিকাশের বৃদ্ধির অনুকূল।" *

সগুণ ও নির্গুণ আত্মার ধারণা।

আত্মতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় আত্মার সগুণ ও নির্গুণ কোন বস্তুতন্ত্র ভেদ নাই। আমাদের উপ-নিষদেও সগুণ নির্গুণ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। বিশ্বসম্বন্ধী (Immanent) এবং এই বিশ্বতীত (Transcendent) পরব্রহ্ম বা বিশ্বপুরুষ এক কিন্তু এই দুইরূপে বর্ণিত মাত্র। পরব্রহ্মে কোন প্রকারে ভেদ রেখা নাই। বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত ভেদ পুরুষতত্ত্ব কেবল বৈদিক ঋষির ধারণা মাত্র। এই বৈদিক ভিত্তির উপরেই নির্ভর করিয়া পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ আত্মার স্বগুণ ও নির্গুণ ভেদ

* মাণ্ডুক্য ১-১৭।

স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের নানার্থক "গুণ" শব্দ ব্যবহারের ফলেই আজকাল বিষয়টী অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সায়ণ সংসারকে "অজ্ঞান কার্য্য," বা অবিদ্যা জনিত বলিতেছেন, এবং তাহাকেই "মায়া", (ইহ মায়ায়াং) নামে অভিহিত করিতেছেন। সেই মায়া আবার তিন ভাগে বিভক্ত, সত্ব, রজঃ, এবং তমঃ স্বরূপ। কেহ কেহ আবার সেই মায়াকে সাংখ্য প্রকৃতি বা প্রধানের সহিত এক করিয়া প্রকৃতিকে সত্বাদি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই উপর ব্যখ্যা করিয়াছেন। সব দিক দেখিয়া বলিতে গেলে, একথাই বলিতে হয় যে, নানা কারণে পরবর্ত্তী দার্শনিক গণের স্বগুণ নিগুর্ণ ভেদ বৈদিক ঋষিদিগের বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বা-তীত ভেদের তুলনায় খুবই জটিল ও সমস্যাপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উপনিষদে স্বগুণ নিগুণ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। তথাপি উপনিষদেও ব্রহ্মস্বরূপের দুইটী দিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একদিক তাহার সবিশেষ বা পঞ্চভৌতিক উপাধি সম্বন্ধস্বরূপ এবং অন্য দিক্ তাহার নির্ব্বিশেষ বা পঞ্চভৌতিক সর্ব্বপ্রকারে উপাধী রহিত স্বরূপ। বৃহদারণ্যকেও ব্রহ্মের সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ স্বরূপ এই ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—"দ্বেবাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ, মর্ত্তঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ, সচ্চ ত্যচ্চ"—ব্রহ্মের দুইটী রূপ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য এবং অমর্ত্ত্য, চল এবং অচল, সৎ এবং অসৎ।" (২।৩।১) এ বিষয় শঙ্কর যেরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

"কার্য্যকরণাত্মক এই পঞ্চভূতই সত্যরূপে প্রতীয়মান। এই পঞ্চভূত জনিত উপাধি সকলের অপনয়ন দ্বারা নেতি-নেতি স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রায়। পঞ্চভূত জনিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হওয়াতে, ব্রহ্মের দুইটী রূপ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, মর্ত্ত এবং অমর্ত্ত। (ব্রহ্ম) একদিকে পঞ্চ-ভূত জনিত বাসনা সম্বন্ধ, অপর দিকে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান। এই কারণে (অর্থাৎ পঞ্চভৌতিক কার্য্য-

কারণ সম্বন্ধ হওয়াতে) ব্রহ্ম (একদিকে) সোপাখ্য বা শব্দাদি প্রত্যয়ের বিষয়, এবং ক্রিয়াকারকফলাত্মক সর্ব্বব্যবহারের আস্পদ হইতেছেন। (অপর দিকে) আবার পঞ্চভৌতিক উপাধিজনিত সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব দূরীকৃত হইলে, সেই ব্রহ্মই অব্যয়, অজর, অমৃত, অভয় এবং বাহ্য মনের অগোচর রূপে সম্যক্ জ্ঞানের বিষয় হইতেছেন। অদ্বৈতত্ব হেতু তাঁহাকেই 'নেতি-নেতি' রূপে নির্দ্দেশ করা যায়।"

"অতো আদেশো নেতি-নেতি"—এই শ্রুতি বচনের ভাষ্যে শঙ্কর আবার বলিতেছেন—এইরূপে পঞ্চভৌতিক সত্যবস্তুর স্বরূপ বর্ণনা শেষ করিয়া যাঁহাকে সেই সত্যেরও সত্য বলা যায়, সেই ব্রহ্মেরস্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সেই নির্দ্দেশ কি? নেতিনেতিই সেই নির্দ্দেশ। 'নেতি-নেতি' বাক্য দ্বারা সত্যের সত্য সেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ কিরূপে সম্ভব? সর্ব্বপ্রকার উপাধি বিশেষের পরিত্যাগ দ্বারা; কারণ ব্রহ্মের মধ্যে কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই। নাম, রূপ, কর্ম্ম পৃথক, জাতি, গুণ ইত্যাদি বিশেষত্ব দৃষ্টেই শব্দ প্রযুক্ত হয়। এ সকল বিশেষের মধ্যে কোন বিশেষই ব্রহ্মের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। গো সম্বন্ধে যেমন লোকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে 'এইটী গো' 'ইহা চলিতেছে, 'ইহা শুক্ল বর্ণ' 'ইহা শৃঙ্গ যুক্ত', ইত্যাদি ব্রহ্মের সম্বন্ধে 'ইদং তৎ,—'ইহাই সেই' এরূপ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য; তবে অধ্যারোপিত নামরূপ কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করাও সম্ভব, 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,' 'বিজ্ঞানঘন এবং ব্রহ্মাত্মা'—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা।"

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের উপনিষদে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে স্থানে স্থানে মনে হয় সর্ব্বচরাচর বিশ্বকেই ব্রহ্মের বিশেষ স্বরূপ বলা হইতেছে, এবং তাহারই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আশ্রয় এবং নিয়ন্তাকে পৃথকভাবে নির্ব্বিশেষ বা নেতি নেতি স্বরূপ ব্রহ্ম বলা হইতেছে।

অপর কঠোপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মার স্বরূপ এরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে :—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২॥১৮॥"

"বিপশ্চিৎ (আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ) ব্যক্তি (জানেন যে,) এই আত্মা জন্মে না, অথবা মরে না, (আত্মাও) কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই। এই হেতু এই আত্মা অজ (জন্মরহিত,) নিত্য, শাশ্বত (নির্ব্বিকার) ও পুরাণ অর্থাৎ চিরবর্ত্তমান। দেহ নিহত হইলেও সে নিহত হয় না।"

ইহা হইতে আবার এই মনে হয় যে, বিপশ্চিৎ অর্থ ধারনাশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ, এই জন্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বভাব বিলুপ্ত হয় না, অতএব আত্মা জন্মে না, উৎপন্ন হয় না অথবা মরে না। কেননা উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেই ছয় প্রকার বিকার থাকে। তন্মধ্যে, জন্ম ও মরণরূপ দুইটী মাত্র বিকারের প্রতিষেধেই অন্য সমস্ত বিকারেরও প্রতিষেধ হইতে পারে, এই কারণেই এখানে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" কথায় প্রথম জন্ম ও মরণরূপ আদি ও অন্ত বিকারদ্বয়ের প্রতিষেধ করা হইয়াছে।

বাস্তবিক উপনিষৎ অবলম্বনে বলিতে গেলে, এই আত্মা কোন কারণ হইতে সম্ভূত হন নাই ; এবং এই আত্মা হইতে অপর কোন পদার্থও জন্মে নাই। অতএব এই আত্মা নিজেই অজ, নিত্য, ও শাশ্বত ক্ষয় রহিত ; কেন না, যাহা শাশ্বত নহে, তাহা সর্ব্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও হইতেছে ; কিন্তু এই আত্মা শাশ্বত, অতএব পুরাণ, অর্থাৎ ইহা পূর্ব্বেও নূতনই ছিল, কারণ অবয়ব বৃদ্ধি দ্বারা যে সমস্ত বস্তু নিষ্পন্ন বা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই এখন "নূতন" বলিয়া ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে আত্মা তাহার ঠিক বিপরীত—পুরাণ অর্থাৎ বৃদ্ধি রহিত। যেহেতু আত্মা এইরূপ, অতএব যে কোন উপায়ে শরীরই বল, আর এই বিশ্বচরাচরই বল, নিহত হইলে এই আত্মা অকাশের ন্যায় নিহত বা হিংসার বিষয় হন না। যথা—

"জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।"— মহামুনি যাস্ক বলিতেছেন যে, উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেরই ছয়টী বিকার

আছে। সে ছয়টী বিকারের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা মহামুনির পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারেই কথিত হইয়াছে। (১) জন্ম (২) সত্তা (৩) বৃদ্ধি (৪) বিপরিণাম (৫) অপক্ষয় ও (৬) বিনাশ উৎপত্তিশীল সৎপদার্থ এমন কিছুই নাই। যাহা পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ বিকার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কিন্তু আত্মা সৎপদার্থ হইলেও উল্লিখিত বিকার সম্বন্ধরহিত, নির্ব্বিকার। তাই শ্রুতি আত্মার সম্বন্ধে প্রথম বিকার জন্ম ও শেষ বিকার বিনাশ, এই উভয় বিকারের প্রতিশেধ করিলেন। উদ্দেশ্য এই—আত্মার যখন জন্ম নাই, তখন জন্মাধীন—সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ও অপক্ষয়, এই বিকার চতুষ্টয়ও অসম্ভব। তাহার পর "ন ম্রিয়তে" কথায় বিনাশ নামক ষষ্ঠ বিকারও নিষিদ্ধ হইয়াছে। "অজো নিত্যঃ" ইত্যাদি কথায় পূর্ব্বে কথিত বিষয়ের উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র। উপনিষৎ অবলম্বনে আত্মা সম্বন্ধে এ একটা মোটামুটী ধারণা জন্মে। উপসংহারে, আত্মা সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করের আরও কয়েকটী মতামত প্রকাশ করিয়া উপস্থিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রুতি অবলম্বনে বেদান্ত দর্শন যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যেমন, ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, সেইরূপ ব্রহ্মই এই বিশ্বজগতের উপাদান, যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার তদ্রূপ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত।

শ্রীশঙ্কর "শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যের" ব্রহ্ম শব্দের উপর নিম্নলিখিত রূপ টীকা করিয়াছেন :—

"ব্রহ্ম বলা হয় কেন? 'বৃহতি' বিস্তৃত হয় (মৃত্তিকাদির ন্যায়), 'বৃংহয়তি' বিস্তৃত করে (কুম্ভকারের ঘটাদি নির্ম্মাণ কার্য্যের ন্যায়),— এই জন্যই 'পরং ব্রহ্ম' বলা হয়, এই ব্রহ্ম শব্দের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদানরূপ অর্থভেদ শ্রুতিই দেখাইতেছেন।" (১-৩)

শঙ্কর সূত্রভাষ্যেও বলিতেছেন—"প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে মৃত্তিকা যেমন ঘটের কারণ, অথবা সুবর্ণ যেমন স্বর্ণহারের কারণ,

"সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরও সেইরূপ জগতের উৎপত্তির কারণ। আবার মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক যেমন তাহার প্রসারিত মায়ার (ইন্দ্রজালের) স্থিতির কারণ, ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহা হইতে উৎপন্ন এই জগতের নিয়ন্তারূপে তাহার স্থিতির কারণ।" (২-১-১)

শঙ্করকে আবার অন্যত্র একথাও বলিতে দেখা যায় যে :—"রূপাদির অভাব হেতু ব্রহ্ম প্রত্যেকের অগোচর এবং অনুমাপক লিঙ্গাদির অভাব হেতু ব্রহ্ম অনুমানের অগোচর,—কেবল মাত্র শ্রুতিগম্য।" (২-১-৬)

ইহাতে মনে হয় তিনি মায়াদিকার্য্যের দৃষ্টেই সৃষ্টিরূপ কার্য্যের উপাদান কারণ, এবং নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করিতেছেন। ঈশ্বর এক এবং অবয়ব শূন্য। কোনরূপ অংশ বিভাগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এক ঈশ্বর কিরূপে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত উভয় প্রকার কারণ হইবেন, অথবা এক হইয়া তিনি কিরূপে সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধারভূত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান হইবেন। আবার নিরবয়ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাবয়ব ঘটাদির উৎপাদনভূত সাবয়ব মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত ব্যবহারেও আপত্তি হইতে পারে। ইহা স্বভাবতঃই হইবার কথা, সেরূপ আশঙ্কা করিয়াই শঙ্কর আবার সে মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন :—

"মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত ব্যবহারে আপত্তি হইতে পারে, যেহেতু মৃত্তিকাদি বস্তু সংসারে বিকারধর্ম্মী দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের কি ইহাই অভিপ্রায় যে ব্রহ্মও বিকার ধর্ম্মী। এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে,—তাহা নয়। সেই আত্মা 'ইহা নয়,' 'উহা নয়', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বিকার ভাব প্রতিসিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কূটস্থ স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে জানা যায়। আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্ম এক, অতএব তাহাকে পরিণাম ধর্ম্মী এবং পরিণাম ধর্ম্মরহিত বা কূটস্থ স্বীকার করা যায় না, কারণ তাহা একই বস্তুর যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ বিরুদ্ধ। তাহা নয়, 'কূটস্থ' বা সর্ব্বপ্রকার বিকার ধর্ম্মের অতীত এই বিশেষণের প্রয়োগ হেতু কূটস্থ ব্রহ্মের সম্বন্ধে যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ অনেক ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না।"

আত্মা ও অনাত্মার এই বিবিধ ভাবের বিরোধের আপত্তির যৎকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রে শঙ্কর বলিতেছেন :— "ব্রহ্ম এক। কিন্তু সেই একত্বস্বরূপ পরিত্যাগ না করিলে ব্রহ্মের মধ্যে এই অনেকাকারা সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? এবিষয়ে আমাদের মধ্যে বিবাদের কোন স্থান নাই, যেহেতু আমাদেরই মধ্যে দেখা যায়, স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা এক হইয়াও, তাহার একত্ব স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই অনেকাকারা সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাস্ত্রেও পাঠ করা যায়। 'তথায় রথ নাই রথদণ্ড নাই, পথ নাই, অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা রথ, রথদণ্ড, এবং পথ সৃষ্টি করে।' এই ব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অনেকাকারা সৃষ্টিও সেইরূপ হওয়াই সম্ভব।" (২-১-১৮)

আত্মা সম্বন্ধে শাস্ত্রানুসারে পরস্পর সকলের মত পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মার সগুণ নিগু'ণভেদ ন্যায়ানুসারে বিরোধ দোষ দুষ্ট হইতেছে না। এবং তাঁহার একত্বেরও কোন দোষ ঘটিতেছে না। এই দুইটী ভাব একই ব্রহ্মের দুইটী ভাগ মাত্র, এবং পরস্পর বিরুদ্ধ মত হইতেই এই দুই ভাবের তাৎপর্য্য—গ্রাহ্যের দিক্ ও গ্রাহকের দিক্—অথবা উপাদানের দিক্ এবং নিমিত্তের দিক্, যেমন ঘটাদির ভিতরের দিক্ ও বাহিরের দিক্। শঙ্করাচার্য্যও বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী বিদ্যার ভাষ্যে কূটস্থ ব্রহ্মের অদ্বৈতের সহিত অন্তর্যামী, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং কূটস্থ ব্রহ্ম—এই তিনটীর পরস্পর সামঞ্জস্য প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন যে, "অন্তর্যামী ঈশ্বরকে কেহ জানেন না, পৃথিব্যাদি ভূত সকলের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা (ক্ষেত্রজ্ঞ) যাহারা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে জানে না, এবং সেই অঘোর ব্রহ্ম যিনি দার্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব হেতু সকলের চেতনা ধাতু স্বরূপ।" এই বলিয়াই তিনি পরস্পর এই তিনটীর সাদৃশ্য এবং পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং তিনি আরও বলিতেছেন,—

"পৃথিবীদেবতার কার্য্য এবং কারণ স্বকর্ম্মজনিত।" পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জীব বিশেষ মাত্র, এবং অন্যান্য জীবগণের ন্যায় সকলেই স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের চির দাস। যিনি ঈশ্বর তিনিই

। শঙ্করের "জীবানন্দে"তে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বলিতেছেন—অন্তর্যামী বা ঈশ্বরের নিত্যমুক্তত্ব হেতু স্বকর্ম্মাভাব। পরার্থ কর্ত্তব্যতা স্বভাবত্বহেতু সেই পরের যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য এবং করণ তাহাও সেই অন্তর্যামীরই, কিন্তু অন্তর্যামী বা ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষী মাত্র। তাহার সান্নিধ্যরূপ সাধন দ্বারাই পৃথিব্যাদি দেবতা সকলের কার্য্য করণ, স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এইরূপ যে ঈশ্বর যাঁহাকে নারায়ণ বলা যায়, তিনিই পৃথিবী দেবতাকে নিয়োজিত করেন। তিনিই তোমার আমার এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা,—প্রত্যেকের স্ব স্ব ব্যবহারের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান্। আধার ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা যাইতেছে যে তিনি "দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বসকলের চেতনা-ধাতু-স্বরূপ।" আবার ব্রহ্মের স্বরূপ সৈন্ধব খণ্ডের ন্যায় প্রজ্ঞানঘন একরস।" "নিরুপাখ্য নির্ব্বিশেষে এবং এক। নেতি নেতি রূপেই তাঁহার উল্লেখ সম্ভব। সেই আত্মাই অবিদ্যাজনিত কাম্যকর্ম্ম বিশিষ্ট এবং কার্য্যকরণরূপ উপাধি যুক্ত হইলে সংসারী জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ) নামে অভিহিত হয়েন। নিত্য নিরতিশয় বা পূর্ণ জ্ঞানশক্তিরূপ উপাধি যুক্ত হইয়া সেই আত্মাই অন্তর্যামী ঈশ্বর বা নারায়ণ (সগুণ ব্রহ্ম) নামে অভিহিত হয়েন। আবার উপাধি রহিত হইয়া 'শুদ্ধ' এবং 'কেবল' বা দ্বৈতাতীত হওয়াতে সেই আত্মাই স্বীয় স্বভাব অনুসারে আধার বা পরব্রহ্ম (নিগুর্ণ) অভিহিত হইয়া থাকেন।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া সেই আত্মা বা ব্রহ্মের, পৃথক পৃথক মতানুসারে তিনটী দিক দেখা গেল, (১) ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব, (২) অন্তর্যামী, ঈশ্বর, নারায়ণ বা সগুণব্রহ্ম, এবং আধার ব্রহ্ম, পর ব্রহ্ম বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম। এবং ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মের মধ্যে কোন বস্তু-তন্ত্র বা পারমার্থিক ভেদ নাই। তবে যে সব পরস্পরের ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা কেবলমাত্র লোক কল্পনা-সাপেক্ষ এবং পুরুষতন্ত্র মাত্র। সর্ব্বপ্রকার ভেদই অধ্যারোপ বা একে অন্যের কল্পনা মাত্র।

সংসার।

(শ্রীঅজিত কুমার সরকার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় বারটা। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি তাহার উপর সন্ধ্যার সময় হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় চতুর্দ্দিক যেন গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে। নিম্নে রাজপথের আলোক কৃষ্ণা কাদম্বিনীর কোলে ক্ষণপ্রভার ন্যায় শোভা পাইতেছে। গাড়ী ঘোড়া লোক জনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া কোলাহলময়ী মহানগরী সেই অন্ধকার সমুদ্রের একটী সজ্জিত তরণীর ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে নিদ্রামগ্ন। স্থানে স্থানে মধ্যে মধ্যে নগর-রক্ষক প্রহরীর তন্দ্রা জড়িত কণ্ঠস্বর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমন সময় একটী যুবক খোলা ছাদের উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িল। আবার দেখিল,—নিম্নে অন্ধকারের মাঝে ক্ষুদ্র আলোক পুরী, মাথার উপর অন্ধকার ;—গাঢ় মসীময় সমস্ত চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া আছে। সীমা নাই, পরিমাণ নাই, কেমন পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। আবার দেখিল, কিন্তু সেই অসীম প্রাবৃটের সাগরে দৃষ্টি চলেনা। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলেও বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে। ভাবিল—কোনটা সত্য? আলোক না অন্ধকার? অন্ধকারের সবই অদৃশ্য, সবই অজ্ঞেয়, সবই রহস্যময়। আর আলোকের সবই উজ্জ্বল—পরিষ্কার, দৃষ্টির অন্তর্গত। অন্ধকার তাহাকে গোপনে লুকাইয়া রাখিতে চায়, আর আলোক তাহার সর্ব্বাবয়বে ফিরিয়া ফিরিয়া, তাহার প্রতি অণুপরমাণু দেখাইতে চায়। দেখানই তাহার স্বভাব—আর গোপন করাই অন্ধকারের স্বভাব।

ওই যে দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকারের সমস্ত কক্ষ—উহার মধ্যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে, কোন্ চিরন্তন অখণ্ডনীয় সত্য ঢাকা আছে তাহা কে জানে? কে জানে কোন উদ্যত বজ্রাগ্নি না প্রলয়ঙ্কর মহাশক্তি জগতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে, কিম্বা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে ব্যর্থ করিবার জন্য উপহাসের ছলে হাসিতেছে? আমরা ত কিছুই জানি না? যদি একটী সামান্য আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোথায় মিলাইয়া যাই তবে কেন এত আয়োজন? কিসের জন্য এই সখের খেলার বৃথা উদ্যম? কি আশায় কাহার জন্য এই ব্যাকুলতাময় ছুটাছুটি? ওই ত ক্ষুদ্র আলোক রশ্মি—উহার প্রভাব কতখানি? তাহার তুলনায় ওই অসীম অদৃষ্ট অন্ধকার কতবড়? এমনই মানুষের অদৃষ্ট—সবই অন্ধকার আর রহস্যময়? অদৃষ্ট! তবে আমি কি জানি? আমি যাহা জানিতে চাই ও যাহা বুঝিতে চাই, তাহার সবই যে অদৃষ্ট অন্ধকারে লুকাইয়া রহিয়াছে? কেমন করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইব?

এইত সেদিন একটী আলোড়িত তরঙ্গময় স্রোতে বুদ্ বুদ্ হইয়া ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। দিক্ নাই—রাস্তা নাই, ভাসিয়া ভাসিয়া,—আঘাতের পর আঘাতে আহত হইয়া স্রোতের তৃণে আশ্রয় পাইলাম। কিন্তু সেও ত ভাসমান! কেবল ভাসিয়াই চলিয়াছি। কোথায় চলিয়াছি? কাহার উদ্দেশ্যে চলিয়াছি? জানি না। কি ঐ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতদূর দৃষ্টি চলে না। কোথায় আমার ভাসা শেষ হইবে, কোথায় আমি কূল পাইব তাহা জানি না। এত চিন্তাকরি, এত খুঁজিয়া মরি, কিন্তু কিছুই পাই না। কেবল সেই চলা পথের দিকেই দৃষ্টি যায়—আর নূতন কিছুই পাই না। অদৃষ্ট! অন্ধকার! তুমিই সত্য। তুমি আমায় উপহাস করিলেও সহ্য করিতে হইবে, ভাসাইলেও আরও ভাসিতে হইবে, কাঁদাইলেও কাঁদিতে হইবে। আমার তোমাকে জানিবার—বুঝিবার অধিকার নাই। এক একবার ভাবি জানিবারই বা দরকার কি? আমি পথিক পথ চলিয়া যাইব, তাহা পরিষ্কার সুগম হউক আর কণ্টকময় হউক আমার কি? আবার সান্ত্বনা হারাইয়া ফেলি,—মনে হয় এমন করিয়া কতদিন চলিব? তখনই আবার বুঝিবার

আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, আশা মরীচিকা নয়ন মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে আবার ছুটি। দুস্তর মরুবক্ষে উঠিতে পড়িতে হাসিতে কাঁদিতে কেবল ছুটিয়াই মরি। শেষে আবার অন্ধকার, দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলি হৃদয় বলহীন হইয়া পড়ে। তখন দেখি কেবল—নিরাশা ব্যর্থতায় অতীতস্মৃতির ছিন্নভিন্ন দলগুলি ম্লান—পরিশুষ্ক হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। তখন সব কল্পনা যে স্বপ্নের মত মিথ্যা বলিয়া মনে হয়! কোথায় ছিলাম—কেমন করিয়া কোথায় আসিয়াছি! কত লাঞ্ছনা, কত নির্ম্মম তাড়না—আবার কত সোহাগস্পর্শী অভ্যর্থনা, আদর যত্ন! কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা? না—না সবই মিথ্যা! মরীচিকার ন্যায় অলীক। কেবল তৃষ্ণা আর ব্যাকুলতাই সার। সবই যদি মিথ্যা স্বপ্ন, তবে ঐ অন্ধকার—ঐ যে পুঞ্জে পুঞ্জে সজ্জিত তরঙ্গের পর তরঙ্গায়িত তমিস্রা জলধি উহাও মিথ্যা—স্বপ্ন না সত্য? হাঁ সত্য। এজগতে ঐ অন্ধকারই সত্য, অন্ধকারই স্থায়ী। আলোক কেবল ক্ষণিক উন্মাদনা—অন্ধকারকে বুঝিবার জন্য। হায়রে মানুষের জীবন!

শুনি বিধাতা সুখ দুঃখ মিশাইয়া মানুষের জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কোথায় সে সুখ? সুখ কেবল একদিনের জন্য দুঃখকে ভালরূপে বুঝিবার জন্য। অতএব দুঃখই সত্য তবে আর অদৃষ্টকে ভয় করি কেন? তাহার তীব্র উপহাসে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি কেন? আসুক না সে মৃত্যু আঁধার সঙ্গে লইয়া, থাকুক না সে ব্যর্থতার দণ্ড উদ্যত করিয়া—ভয় কি; কিন্তু তখনই আবার সব শিথিল হইয়া গাঢ় নির্ভরতা খুঁজিয়া পাই না সব আশ্রয় হারাইয়া যায়। মানুষ চিন্তা করে এক কার্য্যতঃ হয় আর এক। চায় এক—পায় আর। যাহা চায় তাহা পায় না, তাই দুঃখের সৃষ্টি হয়! আবার কখন যাহা চায় না, তাহাই আসিয়া দুঃসহ ভাবে জীবনটা পিষিয়া ফেলে। কেন এমন হয়? সংসারে সবাইত সুখ চায়। আবার সুখের উপকরণও সকলের একরকম নয়। কেও ধন চায়, কেও মান চায়, কেও বন্ধু চায়, কেও পুণ্য চায়, কেও বিবেক বৈরাগ্য চায়, কেও ভক্তি মুক্তি চায়; যাহার যাহাতে সুখ সে তাহাই চায়। কিন্তু কয়জনের আশা পূর্ণ হয়? কয়জন সুখী হয়? তবে কি চাওয়াই দুঃখ? তাহা

যদি হয় তবে কেন ইহার সৃষ্টি? কামনাই যদি দুঃখের মূল তবে কেন কামনার সৃষ্টি? সংসারকে পোড়াইয়া মারিতে কে ইহার সৃষ্টি করিল? সত্যই কি তবে পরম মঙ্গলময় বিধাতা বলিয়া কেহ আছেন? সত্যই কি মানুষ তাঁর কাছে নির্ভরতা খুঁজিয়া পায়? সত্যই কি মনে প্রাণে শরণ নিলে তিনি আশ্রয় দেন? আশ্রিত বৎসল দয়াময়! সত্যই কি তুমি আছ? তুমি যে শান্তিময়; তবে সেখানে এত জ্বালা কেন প্রভু! যে কামনাই মানুষের একমাত্র দুঃখের কারণ; তোমার রাজ্যে তার সৃষ্টি কেন? দুর্ব্বল জীবকে জ্বালাইতেই কি সেই অগ্নিবানের সৃষ্টি? তার চেয়ে একেবারে তোমার রুদ্রতেজে ভস্মীভূত করিয়া ফেল না কেন? না না! তাহা হইলে আর খেলা কি? তাহা হইলে তোমার বিচিত্রলীলা প্রকটিত হইবে কি লইয়া? কেও হাসিবে, কেও কাঁদিবে, কেও জ্বলিবে কেও জুড়াইবে তাহাই কি তোমার ইচ্ছা? তবে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কতক্ষণ ধরিয়া সে এইরূপে চিন্তা করিতেছে, কথা বলিতেছে জানেনা। যখন একটা দমকা বাতাসের আঘাতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিতে পাইল পিছনে কে দাঁড়াইয়া। অন্ধকারে চেনা যায় না, কিন্তু অবয়ব দেখিয়া মনে হয় আগন্তুক পরিচিত। যাহা হউক শীঘ্রই তাহার কৌতূহল মিটিয়া গেল আগন্তুকের সম্ভাষণে। সে বলিয়া উঠিল—"কি বিনয় বাবু! আমি মনে করতাম বুঝি জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহঙ্গকুল গান করে, মন্দ মন্দ মলয় হিল্লোল কানন বা উপবনে প্রস্ফুটিত কুসুম কুঞ্জ হইতে সৌরভ হরণ করে, ক্রমে মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলে তখনই কবিত্বের স্ফূরণ হয়। কিন্তু আপনার এ কবিত্ব যে দেখ্‌ছি—বাদলার দিনে অন্ধকার রাত্রেও ফোয়ারার মত বেরিয়ে পড়ছে!" বিনয় একটু অপদস্থ হইয়া বলিল,—"তা কবিত্ব থাকলেই বাদলার আঁধারেও বেরিয়ে পড়ে বৈ কি! নইলে 'আঁধার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল গেলরে দিন বয়ে, বাঁধন হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে' কোন সময়ে বেরিয়েছিল ভাই!" আগন্তুক নরেন্দ্রনাথ বলিল "পরাজয় মান্‌লাম। বাবা সঙ্গে সঙ্গেই নজীর! আপনি কেন বই লিখেন না

বিনয় বাবু? ভাব ভক্তির ত অভাব নাই দেখ্ছি। তবে শুনেছি নাকি একটু আধটু পূর্ব্বরাগ, পশ্চিমরাগ, বিরহ ইত্যাদি না হলে কবিত্ব বেশ জমাট বাঁধে না। তা—দিন কতক এমনি নির্জ্জনে বসে আকাশের দিকে বাতাসের দিকে, মেঘেরদিকে চাতকেরদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্লেই সব গজিয়ে উঠ্বে এখন। কি বলেন?" বিনয়।—"তা—যা হওয়া সম্ভব, আপনার তীক্ষ্ণ কল্পনা শক্তির সাহায্যে অনুমান করেই নিতে পারেন। আমায় আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার কি?" নরেন।—"আচ্ছা বাজে কথা যাক্। বলুনত এ রকম সময় এখানে বসে কি হচ্ছিল? আমার ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি ঘরে কেও নেই। ব্যাপার ঠিক্ বুঝতে না পেরে সোজাসুজি ছাদে চলে এলাম। এসে দেখি যে আপনি কবিত্ব আওড়াচ্ছেন। যে রকম ভাব এসেছিল,—তাতে আর কিছুক্ষণ আমি না এলেই ভাবের চোটে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতেন।" "না ভাই! তা নয়, শুয়ে যখন কিছুতেই ঘুম এলনা তখন মনে করলাম একটু বাহিরে যাই।" "হাঁ হাঁ ঐ রকমই হয়। প্রথম যখন ভাবের জোয়ার আসে, তখন ঘুম হয় না ক্ষিদে থাকে না—বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করে ইত্যাদি অনেক রকম লক্ষণই যে আছে। সবগুলো আমার মনে হচ্ছে না। এখন ভিতরে চলুন দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। আচ্ছা বিনয় বাবু। আপনারা ওসব টের পান না, নয়?" "তা যা বলেন" বলিয়া বিনয় নিঃশব্দে নরেনের অনুগমন করিল। ঘরের মধ্যে এক কোনে একটী টেবিলের উপর একটা হাতবাতি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছিল, নরেন সেটাকে একটু তেজ করিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অপর একখানি চৌকির উপর বিছানায় বিনয় অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিল।

এই ছোট ঘরখানিতে নরেন এবং তাহার আর একটী সহপাঠী থাকিত। দুইপাশে দুইখানি চৌকি পাতা ছিল, কিন্তু উল্লিখিত ছাত্রটী সম্প্রতি ছুটী লইয়া বাড়ী যাওয়ায় বিনয় সেখানে দুই একদিনের জন্য আশ্রয় পাইয়াছিল! বিছানায় শুইয়া নরেন প্রথমেই বলিল—"দেখুন বিনয় বাবু। আপনার অবস্থটা বেশ ভাল বোধ হচ্ছে না। আজ বাবার একখানা পত্র পেয়েছি, আপনি সে সময় ছিলেন, না বলে বলা হয়নি।

কিন্তু আমার মনে হয় আপনার কলিকাতা আসাটা একটু সন্দেহ জনক ভাবের। যদিও আপনাকে কিছু বলিনি তথাপি মনে মনে অনেক রকম জল্পনা কল্পনা কর্‌ছিলাম। সম্প্রতি আপনার অবস্থা দেখে বেশ বুঝতে পারলাম যে—" "অর্থাৎ আমি কোন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত। তার পর পুলিশে ওয়ারেণ্ট জারী হয়েছে আর আসামী ফেরার হইয়া সন্দেহ জনক ভাবে এখানে অবতীর্ণ! কেমন?" বলিয়া, বিনয় একটু মৃদু হাসিল। "তা যাই বুঝুন আপনি এখনও ঠিক্ করতে পারছেন না যে কি করবেন। একটু ধাঁধায় পড়েছেন! ভাবছেন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। ঐ যে আপনাদের ভাষায় একটা কি কথা আছে—পূর্ব্বরাগ না একটা কি বলে। —হাঁ তার থেকে এখন বৈরাগ্যের সূচনা মাত্র। বেশী জমাট বাঁধেনি। তার পরেই সব আঁধার! সংসার আঁধার; গৃহ শূন্য করে আত্মীয় স্বজনকে কাঁদিয়ে সিদ্ধার্থের মত বেরিয়ে পড়বেন আর কি! আপনার কি তপস্যা ক্ষেত্রটাও ঠিক করে ফেলেছেন? এখন থেকে ম্যাপ দেখে ঠিক করে রাখুন, বিশেষ বেগ পেতে হবে না নতুবা সিদ্ধার্থের মত পাহাড়ে জঙ্গলে স্থান খুঁজে বেড়াতে হবে।" "আমার জন্য আর কে কাঁদবে ভাই। আমিত সকলেরই পথের কাঁটা। আমার আবার সংসারই বা কোথায়—আর আত্মীয় স্বজনই বা কোথায়! স্নেহ মমতা করতে বলুন, আর কাঁদতে কাটতে বলুন আপনারাই ত সব!" "তাই যদি হয়, তবে আমাদেরই বা কাঁদাতে ইচ্ছে করেন কেন।" "না কাঁদাতে ইচ্ছা করি না সেই জন্যই আপনাদের সংস্রব থেকে গোড়াগুড়িই সরব মনে করছি।" "কি রকম? এ যে নূতন রকমের ভালবাসা দেখ্‌ছি। চির দিন জানি যে বিচ্ছেদ হলেই মানুষ কাঁদে। আপনি আবার চলে গিয়ে হাসাবেন কেমন করে?" "কেমন করে—তা বাড়ী গিয়ে চারদিকের অবস্থা দেখ্‌লেই বেশ বুঝতে পারবেন। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে,—আপনাদের সুখের সংসারে অশান্তি আন্‌বার এক মাত্র কারণই এই হতভাগ্য। দিন দিন পারিবারিক অশান্তি বাড়তে আরম্ভ হচ্ছে। আমি সরে পড়লেই বোধ হয় এর নিবৃত্তি হতে পারে।" "আবার নাও হতে পারে!" হয়ত বেশী রকম বাড়তেও পারে।

আচ্ছা—আপনার কর্ত্তব্যগুলি কার ঘাড়ে চাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন?” “চাপিয়ে আর কার ঘাড়ে দিব? এতদিন যে আমি ছিলাম না, তাতে স্কুল চল্‌ছিল না? আমার মত নগণ্য ব্যক্তি সংসারে শত সংখ্যাতীত যেখানে সেখানে পড়ে আছে। একজন রাজা গেলে যখন রাজসিংহাসনই খালি থাকে না—তখন এত স্কুল মাষ্টারী।” “ও আপনি আপনার কর্ত্তব্য এরই মধ্যে সীমা বদ্ধ ক’রে রেখেছেন! তাই যদি হয়, তবে এ কথাও বলা যেতে পারে,—আক্‌বরের পর আর দ্বিতীয় আক্‌বর সে সিংহাসনে বসেননি, ক্রমে ঔরংজেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তেমনি বিনয়বাবু যাওয়ার পর যে সেই প্রধান শিক্ষকের আসন দ্বিতীয় বিনয়বাবু অলঙ্কৃত করবেন তারই বা বিশ্বাস কি?” “না—তার আর বিশ্বাস কি? তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, আমি গেলে আমার চেয়ে অনেক গুণে যোগ্য ব্যক্তিই আস্‌বেন।” “আজ্ঞে—সে যোগ্য ব্যক্তিটী কে তা কি শুন্‌তে পাই না?” “আপত্তি নেই—তবে শুন্‌বারও যে কিছু আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না।” “আমার আবশ্যক ত আর আপনি বুঝেন না! তবে ভট্‌চার্য্যের ভাগ্‌নের জন্য সে পদ নয়—তা বলে রাখ্‌লাম।” “যদি তাই হয় তবে কি করবেন? তারা সকলে মিলে একদিক্; আপনি একা কি করতে পারেন? তারা ত পরামর্শ এঁটে রেখেছে—যদি এ ব্যবস্থা না হয়, তবে দেখি কেমন ক’রে স্কুল চলে!” কথাটা শুনিয়া নরেন উঠিয়া বসিল। তাহার চোখ দুটী যেন জ্বলিয়া উঠিল,—তারপর চৌকিতে একটা চাপড় মারিয়া বলিল,—“কখনই হতে পারে না। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার বাবার স্থাপন করা স্কুলে ভট্‌চার্য্যের ভাগ্‌নে আর তার চেলাগুলো কর্ত্তৃত্ব করবে! বাবা বেঁচে থাক্‌তে তা হতে পারে না।” “ক্ষতি কি নরেনবাবু? তিনিও শিক্ষিত লোক—বরং আমার চেয়ে যোগ্য। আসল কথা স্কুলটা চলা দরকার। গ্রামের পরস্পর যদি ঝগড়া মারামারি করে—তবে সে গ্রামের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আমি সরে পড়লেই যদি বিবাদ মিটে যায়, বেশত! অনেক কারণে সেটা ভাল বলেই আমার মনে হয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি যতটা ভেবেছি, আপনি অতটা ভাবেননি।” “রেখে দেন আপনার ভবিষ্যৎ, আমি সব বুঝি।

ওসব আপনাদের কবি আর ভাবুক মানুষগুলরই দস্তুর। সাত চড়ে মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। নইলে লড়াই না করিতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেন কেন? শুধু "প্রভু প্রভু" করলেই কি আর সংসার চলে বিনয় বাবু! Energy চাই। World এ কেও কখন পরের উপর ভরসা করে উন্নতি করতে পারেনি। তা ঈশ্বরই বলুন আর প্রভুই বলুন। ও কেউ কিছুই করতে পারে না। আপনি দেখান ত কোন্ লোকটা শুধু "প্রভু প্রভু" ক'রে উন্নতি করেছে? কেবল কৌপীন আর ভিক্ষা পাত্রই শেষ সম্বল দাঁড়ায়। তা যাই বলুন ভণ্ডামিতে আমার বিশ্বাস নেই। ক্লাইব যদি সিরাজদৌলার Forceএর বহর দেখে গীর্জ্জায় গিয়ে প্রভুকে ডাকতেন—তবে কোন জন্মেও এখানে কি ইংরাজ রাজত্ব হতে পারত? না Indiaয় বসে তারা এতটা সুখ লুটতে পারত? আর আপনি নিজেরই নজির দেখুন না,—ধর্ম্মের অবতার যুধিষ্ঠির মহারাজ "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" আর "প্রভু প্রভু" করে' সমস্ত জীবনটা ভাইগুলো এমন কি স্ত্রীকে পর্য্যন্ত বনে বনে ঘুরিয়ে মারলেন। অপমানের কথা আর বলে কাজ কি? শেষে ঐ প্রভুই আবার লড়াই বাধিয়ে একটা কিনারা করে দিলেন। ধর্ম্মরাজের পাল্লায় পড়ে এত বড় Bold General অর্জ্জুনের এমন অবস্থা হয়ে পড়েছিল যে, যুদ্ধের timeএ পর্য্যন্ত কেঁদেই অস্থির। আপনারও দেখছি ঐ রোগেই ধরেছে। আজকাল যেখানেই যান—চাই fight ওতে যদি জয়লাভ করতে পারেন তবেই মানুষ হতে পারবেন; নতুবা দুনিয়ার কেও গ্রাহ্য করবে না দাদা! আর যদি কেবল পাদোদক নিয়ে, fasting করে বসে থাকেন, কেবল লাঞ্ছনাই ভোগ করবেন।" "তা আর কি করবেন বলুন। সবাই ত আর যোদ্ধা হতে পারে না—লড়াইও করতে পারে না। আপনারা লড়াই করুন আমরা সেবা শুশ্রূষা করব এখন। তার জন্যেও ত লোকের দরকার হবে? শুনতে পাই—আর্য্য-জাতি ভারতে আসার পর ঐ রকম করেই শূদ্র-জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। আপনারা না হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই হলেন —আমরা শূদ্র হব। আর আপনার কথাতেই ত প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমি দুর্ব্বল, জয়ের কোন আশা নেই। সুতরাং অনর্থক বল-

ক্ষয়ের আবশ্যক কি?” “আচ্ছা সে কথা পরে হবে, এখন কবে ফিরে যাচ্ছেন বলুন। আমার ছুটী হতে আর মাত্র দুই তিন দিন আছে বোধ হয়। একসঙ্গেই যাওয়া যাবে, কেমন?” “না ভাই! আমি আপাততঃ একবার বেড়াতে যাব মনে করছি। তার জন্য ছুটীর দরখাস্তও দিয়ে এসেছি, আমায় রেহাই দেন।” “আচ্ছা দেখা যাবে” বলিয়া নরেন শুইয়া পড়িল। বিনয়ও বাতিটা একটু কম করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল কিন্তু ঘুম আর আসিল না। একটা দুশ্চিন্তার উত্তেজনায় তাহার মনটা ভারী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার অজ্ঞাতে তাহার সমস্ত শক্তিকে অবশ করিয়া একটা ভাবী অমঙ্গলের ছায়া সমস্ত হৃদয় এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে নিজের কর্ত্তব্যপথ হারাইয়া ফেলিতেছিল। কেবল বাতাসের বেগে ছিন্নভিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় এক একটা চিন্তা তরঙ্গ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সে অনেক কথাই ভাবিতেছে অথচ জানে না কি চিন্তা—কাহার চিন্তা? কেনই বা সে এত অভিভূত হইয়া পড়িতেছে? এক একবার মনে হইতেছে—কোন অন্যায় ত করি নাই; তবে কিসের আশঙ্কা? কেন তাহার হৃদয় এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে? আমি ত কোন স্বার্থ চাই না! নিজেকে বিলাইয়া দিতেই যাহার সঙ্কল্প তাহার এত ভয় কেন? স্বার্থ—আমার কি কোন স্বার্থ নাই? আমি কি কিছু চাই না? নিশ্চয়ই চাই—নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে। বিনা স্বার্থে কি ব্যাকুলতা আসে? এমন জ্বলন্ত অশান্তি বিনা স্বার্থে আসিতে পারে না। কি চাই আমি? কিসের জন্য এত জ্বালা?

কেবলই ভাবিতেছে—অদৃষ্টে কি আছে? আমি কেমন করিয়া জানিব সে অন্ধকারে কি দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে? যাহাকে বুঝিতে পারি না, ধরিতে পারি না,—যাহার কোন কূল-কিনারাই পাই না—অবোধ মন কেন তার পিছনে ছুটিয়া মরে? বেশত। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, আমার কি! অদৃষ্টত আমারই হাতের গড়া, তবে আবার বসিয়া বসিয়া নূতন দুরাদৃষ্টের সৃষ্টি করিতেছি কেন? কার কাছে যাব?

কে আমায় সান্ত্বনা দিতে পারবে? সত্যই কি মনে-প্রাণে শরণ নিতে পারলে তিনি আশ্রয় দেন? দয়াময়! সত্যই তুমি আছ? তবে আমার লক্ষ্য-শূন্য বাসনা কোন্ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে প্রভু! গরলের দিকে না অমৃতের দিকে? গরল! গরল! সেওত তোমারই সৃষ্টি! তবে ক্ষতি কি? তুমি যদি অমৃতে থাক; তবে গরলে থাক্‌বে না কেন? আমি যদি তোমার দাস বলে গরলই পান করি! মৃত্যু? বেশত ক্ষতি কি। কেন তুমি আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াও না? তবে যে পথেই যাই তুমি আছ ইহাই আমার নির্ভরতা। আমি মনে করি "ত্বয়া হৃষকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"।

তুমিই কর্ত্তা, তুমিই মালিক। আমি পাপ জানি না, পুণ্য জানি না যাহা আমায় আনন্দ দেয় আমি তাই করি। যেদিকে আমি প্রেরণা পাই সেই দিকেই যাই। বুঝিবার সাধ্য নাই। বুঝিলেও বেগ রোধ করিবার শক্তি নাই। তাই ভাসিয়াই চলিয়াছি। যদি আশ্রয় দিতে ইচ্ছা হয় দাও,—নয় চলিলাম। আশ্রয় কি দিবে? আমার ডাক কি তোমার কাণে যাবে? আমার স্বার্থের চীৎকার এই স্বার্থের কোলাহলেই মিসাইয়া যাইতেছে, অতদূর যাইবার শক্তি নাই। আমি মনে করি তোমায় ডাকিব, কিন্তু পারি কই? মনে করি তোমাকেই বিশ্বাস করিয়া আর সব ভুলিয়া যাইব কিন্তু পারি না। জানি না কেমন করিয়া ডাকিব! যদি তুমি অন্তর্যামী, ভয়হারী, তবে অন্তরের ব্যথা কেন বুঝিবে না? আমিত চিরঘৃণ্য—অধম! তবুও কি তোমার সৃষ্ট্য নই? অতীত বর্ত্তমান জীবনের প্রতি পলে পলে কতই প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু আশা মিটিল না, শান্তি আসিল না। প্রাণের ব্যাকুলতায় ভাল-মন্দ সবই প্রার্থনা করিয়াছি, পাইয়াছিও সব। আবার চাহিতেছি—আমায় শক্তি দাও, আমায় শান্তি দাও।

শুনিয়াছি, তুমি নাকি সমস্ত সুখের পরশমণি,—রাজাধিরাজ রাজৈশ্বর্য্য ফেলিয়া তোমার দিকে ছুটিয়া যায়, কত পুত্রহারা জননী, কত পতিহীনা নারী শোকের আগুণ নিভাইতে তোমার দিকে ছুটিয়া

যায়। শুনিয়াছি—কিন্তু কোথায় সে ধন? সত্য না কেবল অলীক কল্পনা? বোধ হয় সত্য। নতুবা যে সম্পদের গৌরবে পরিপূর্ণ সে কিসের পূর্ণতা খুঁজিয়া বেড়ায়? অবোধ শিশু মার জন্য কাঁদে, মার কোলেই তাহার অনন্ত সুখের স্থান; কিন্তু তবুও কখন কখন ধূলা খেলার মোহে সে কথা ভুলিয়া যায়। সে খেলা পাইয়া ক্ষণিক সুখ পায় বটে, কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা মিটে না; সে ক্ষুধা মিটে তখনই —যখন মা'র কোলে ফিরিয়া যাইয়া, মার বক্ষের অমৃত পান করে। আমিও সেই অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য খেলনার আয়োজন করি, তাই কি এই সারা জীবন ক্রন্দন?

আমি আমার 'আমিত্ব' বজায় রাখিবার সময় পাই কিন্তু তোমায় ডাকিতে সময় পাই না; তখন আমার দিন ফুরাইয়া যায়, কাজের ভিড় পড়িয়া যায়। যখন আমি বিপদের অকূল পাথারে ভাসিয়া বেড়াই—"তখন তুমি আশ্রয়তরী, বিপদতারণ। বলি—বাঁচিলাম প্রভু! এখন হইতে আর তোমায় ভুলিব না। কিন্তু কূলে উঠিয়াই ভুলিয়া যাই কেন? কাল তুমি আমায় বুকে করিয়া বুকজোড়া অশ্রু আপনার হাতে মুছাইয়া দিলে, আজ আবার তুমি পর হও কেন? কেন তোমায় ভুলিয়া যাই? কেন তোমায় বিশ্বাস করিতে পারিনা? কেন আমি "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া দুঃখের মধ্যে সুখ খুঁজিয়া লইতে পারি না?

(ক্রমশঃ)

"অনুসন্ধিৎসা"

(শ্রীমতী নীহারিকা দেবী)

[২]

কবে মোর তব সাথে
নব পরিচয়,—
কোন্ স্বর্ণোজ্জ্বল প্রাতে
কোন্ জ্যোৎস্নাময়ী রাতে
কোন্ কুসুমিত বনে
পরিমল ময় ?
কোন্ ঘন মেঘ ভারে
কোন্ অবিরাম ধারে
বারি বরিষণ মাঝে
বিজলীর প্রায় ?
কোন্ ক্লান্ত জীবনের
—রৌদ্রালস মধ্যাহ্নের
বিরলে শয়ন আগে তরুতল ছায় ?
প্রায়ান্ধ ধূসর কালো
সায়াহ্নের ম্লান আলো
বিস্মিত শীতল কোন্ গোধূলি গগনে
কোন্ কলনাদী কূলে,
কুজ্ঝটী-গুণ্ঠন তুলে,
নবোদিত রবি সম প্রভাত গগনে।
কোন্ সদ্যঃ শোকাতুর
চিত্ত অবসাদ দূর
—কারিণী সান্ত্বনা সম আভায় তোমার

কোন্ শুভ্র শতদলে
শিশিরাশ্রু ছলছলে
করেছিল নব ভানু কিরণ সঞ্চার।

কোন্ নীলাম্বর তলে
ছায়ালোক চেলাঞ্চলে
ও মূরতি এ নয়নে প্রথম উদয়?
কবে আমি দেখেছিনু প্রথম ও মুখ
কোন্ দীর্ঘ যাত্রামাঝে,
মুহূর্ত্ত পথিক সাজে
কোন্ মহোৎসবে মোর
ছিলে আগন্তুক?

কবে কোন্ খানে মোরে
দিয়েছিলে দেখা,
কোন্ জন্মান্তর পারে
কোন্ মহাম্বুধি ধারে
—বালুকা সৈকতে বঁধু তব পদরেখা।

আমারে দেখায়েছিলে পথের নিশানা,
কভু উদাসীর বেশে
মোরে দেখা দিতে এসে
চুপে কি ফিরিয়া গেছ
সুহৃদ্ অজানা?—

ফাল্গুনে লোহিত ফাগে
মধু মহোৎসব জাগে
যেমতি তেমতি কবে অন্তরে আমার
তব নব আঁখি পাত
ফুটায়ে তুলিল নাথ
—মন অরবিন্দ দলে আসন তোমার

কখন দেখেছি বলি নাহি পড়ে মনে
অন্তরের অন্তঃপুরে
বীণাটী তোমারি সুরে
কেমনে বাজিল তবে না জানি কেমনে।

সমালোচনা ও পুস্তক-পরিচয়।

গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য—নারায়ণহরি বিরচিত। "প্রকৃতি, নিখিল জগতের জননী। রমণী সেই প্রকৃতি জননীর মানুষী মূর্ত্তিমাত্র; সেই মা হইতে আমাদের উৎপত্তি ও পরিবর্দ্ধন। রমণীমাত্রই এক একটী মাতৃমূর্ত্তি।"—ইহাই যদি সত্য, তবে তাহার প্রতি সন্ন্যাসীর স্ত্রীভাব আনা সম্ভব কি? শঙ্করাচার্য্য "নারী জাতির উপর অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন"—সেটী সন্ন্যাসীর নিকট "নারী নরকস্য দ্বারম"। "শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শুধু ত্যাগ ধর্ম্মের ভিতর দিয়া পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই" "তাঁহাকেও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিতে হইয়াছিল"—তাহা হইলে ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ—এই বেদবাক্য কি মিথ্যা? অসংযমীর নিকট "গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য" উপযুক্ত বটে। অন্যত্র নহে।

সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ—প্রথম খণ্ড—শ্রীবেচারাম লাহিড়ী, বি, এল, প্রণীত। ইহাতে অনেক সাধু মহাত্মার জীবন চরিত আছে। পাঠক পুস্তক পাঠেই সৎসঙ্গ উপলব্ধি করিবেন।

GODWARD—বিশ্বামিত্র রচিত, মূল্য বার আনা। আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সরল উপনিষদ—শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র সম্পাদিত। ঈশোপনিষদ মনুষ্য সমাজের আদি জ্ঞানশাস্ত্র। এই ব্রহ্মবিদ্যাকে অদ্যাবধি কোনও

ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহার বহুল প্রচারের আবশ্যকতা ইহাই। প্রাচীন ভাষা বলিয়া স্থানে স্থানে বুঝা অতি কঠিন। সাধারণের নিকট আচায্য শঙ্করের ভাষা তদপেক্ষাও দুরূহ, তাই লেখক সরল ব্যাখ্যার দ্বারা ভাবকে সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন। মূল্য আট আনা।

বেদান্ত ভাস্কর—স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ বিরচিত—মূল্য এক টাকা মাত্র। বাংলা ভাষায় বেদান্ত-দর্শন আলোচিত হইয়াছে। বেদান্তের পরিভাষা, প্রতিপাদ্য এবং অপরাপর দর্শন সম্বন্ধে সরল ভাবে সাধারণের অধিগম্য করিয়া বিচারিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা না হইলেও বেদান্ত-বিচার চলে এই গ্রন্থ তাহার প্রমাণ।

ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মরূপ তাঁর বাণী বেদ।
ভাষা অথবা সংস্কৃত করে ভ্রমচ্ছেদ॥

(হিন্দী বিচার সাগর হইতে অনূদিত)

NOTES ON SMALL RURAL WATER FILTRATION PROJECTS—পল্লীগ্রামে সাধারণের জন্য কি উপায়ে সহজে জল ফিল্‌টার করিয়া লওয়া চলে তাহারই বিবৃতি। এই পুস্তক Hygienic Householder Filter Co., ৬০নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

গীতাবলী—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ঢাকা হইতে প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বেলুড় ও অপরাপর মঠে যে সকল গীত ভজনরূপে গৃহীত হইয়াছে, এই পুস্তক তাহারই সংগ্রহ। মূল্য ছয় আনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। বিগত ৫ই ও ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলমা রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৫ই তারিখে শ্রীকালী পাঠশালা নামক অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হয় এবং সেই উপলক্ষে মহিলা সম্মিলন হয়। পালংয়ের প্রসিদ্ধ দেশসেবিকা শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। ঐ দিনই অপরাহ্ণে

ঢাকামঠের শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দজী স্থানীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের একটী ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। রামকৃষ্ণোৎসবের অঙ্গ স্বরূপ এইরূপ প্রদর্শনী খোলা বোধ হয় এই প্রথম। ৬ই তারিখ পূর্ব্বাহ্ণে পূজা-পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হয়। মধ্যাহ্ণে ৭০০ ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে সেবা-সমিতির বার্ষিক সভা হয়। সমিতির বার্ষিক বিবরণী হইতে দেখা যায় যে সমিতি কয়েকটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটী দাতব্য ঔষধালয় পরিচালনা করিতেছে। বিবেকানন্দ-শিল্পভবন বয়ন বিদ্যালয় হইতে এ পর্য্যন্ত ২২টী ছাত্র বয়ন বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ পাঠশালা নামক অবৈতনিক বালক বিদ্যালয়টীর কাজ ঘরের অভাবে কয়মাস যাবৎ বন্ধ আছে। আলোচ্য বর্ষে সমিতি একটী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় খুলিয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত আদিত্য চন্দ্র সেন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বিনা ফিতে প্রত্যহ প্রাতে উপস্থিত রোগীদের দেখেন ও ব্যবস্থা করেন। এই সকল জনহিতকর কার্য্যের সাহায্য কল্পে এবং সমিতির গৃহ নির্ম্মাণ তহবিলে দেশের সহৃদয় ব্যক্তির অর্থদান করা একান্ত আবশ্যক। সমস্ত সাহায্য সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণসেবা-সমিতি, পোঃ কলমা (ঢাকা), এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

২। বরিশাল, গুঠিয়া রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের সম্পাদক শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন যে—ডাক্তার বি, সি, ব্যানার্জি অথবা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (আমাদের সেবাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব কলিকাতার প্রতিনিধি) গুঠিয়া রামকৃষ্ণসেবাশ্রমের মেম্বরপদ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সেবাশ্রমের সাহায্যকল্পে যিনি যাহা দান করিবেন, সেক্রেটারীর বরাবরে পাঠাইবেন, অথবা আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট দিবেন। তাঁহার নিকট অর্থ প্রদানের জন্য আশ্রমকর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৩। ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও ডিঃ, এনজিনিয়ার শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে, বিগত ১৮ই জুলাই, বুধবার শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ রাঁচীনগরে পদার্পণ করিয়া বহু নরনারীকে ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা কৃতার্থ করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ, বিজয়ানন্দ ও মনোজানন্দ তাঁহার অনুগমন করেন।

১৯শে ও ২০শে তারিখে তত্রস্থ টাউনহলের ময়দানে দুইটী সাধারণ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্রথম দিবসে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ঐ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। স্বামী বাসুদেবানন্দ ও বিজয়ানন্দ ঐ দিবস "যুগধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, পরদিবস প্রাতে মহাপুরুষজী ভক্তসমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী দেবী দর্শন করিতে যান। মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া স্তোত্রপাঠ কালী-কীর্ত্তন ও সাধারণ ভাবে ধর্ম্মালোচনা হয়। পরে বৈকালে টাউনহলের ময়দানে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয়। মহাপুরুষজী সাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে ধর্ম্মালোচনার জন্য একটী সপ্তাহিক অধিবেশন গঠন করেন এবং প্রতিমাসে বেলুড় মঠ হইতে কোনও সাধুকে আনয়ন করিয়া সদালোচনা করেন। ইহার পর তিনি সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান। পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ ও বিজয়ানন্দ "বেদান্ত" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দত্ত, সিভিল সার্জ্জন মহাশয় দুই দিবসই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২১শে প্রাতে মহাপুরুষজী পুনরায় বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

৪। বাংলায় জন্ম মৃত্যু—

জন্ম		মৃত্যু
	১৯২০	
১৩৫৯৯১৩		১৪৮১৬১২
	১৯২১	
১৩০১০০০		১৪০৩০৬০

জন্মের পর এক বৎসরের মধ্যে হাজার করা ১৯২০ সালে ২০৭ জন এবং ১৯২১ সালে ২০৬ জন শিশু মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সংখ্যা—১৯২০ সালে ১১৪৪৪২১ ও ১৯২১ সালে ১০৭০৩৬৮ জন।

(বিজলী হইতে সংগৃহীত)

৫। বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ-অনাথাশ্রমের কার্য্য-বিবরণী আমরা পূর্ব্বমাসে প্রকাশ করিয়াছি। সহৃদয় জনসাধারণ এই সৎকার্য্যে সাহায্য করিয়া বহু অনাথ বালকের প্রতিপালন করুন।
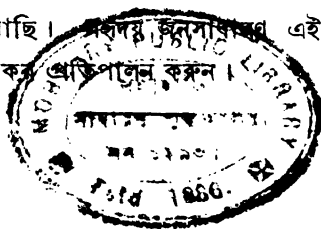
শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্।

(শ্রীবামদেব ভট্টাচার্য্য)

ওঁ-কার-জ্ঞান-বেদ্যো যঃ সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকঃ
ব্রহ্মাম্ভোধি-সমুদ্ভূত তরঙ্গো বেদ-বিগ্রহঃ।
ভেদ-দ্বন্দ্ব-গুণাতীতো মায়া-ধৃত-কলেবরঃ
চরণ-প্রণতায় মে বিদধাতু শিবং সদা ॥ ১ ॥

ন-লিন-নয়ন-নাথং চানুকম্পাধিবাসং
নিখিল-নর-শরণ্যং দীনবন্ধুং দয়ালুম্।
নিরবধি বিনতানাং দুঃখনাশে নিযুক্তং
ভব-জলনিধিপোতং নৌমি নিত্যমনন্তম ॥ ২ ॥

মোহ-মেঘ-সমাচ্ছন্ন মানসাকাশ-ভাস্করঃ
কল্মষ-তমসাবৃত রজন্যাশ্চন্দ্রমাশ্চ যঃ।
হরতি করুণা যস্য সকলং দুষ্কৃতং কৃতম্
অবিরত-কৃপারাশির্ব্বৈতোঽস্তু তস্য মে সদা ॥ ৩ ॥

ভ-বতি চ ভব-ভঙ্গো ভাবতো যস্য নিত্যং
ভব-বিধি-সুরসঙ্ঘাঃ যস্য বৈ মূর্ত্তি-ভেদাঃ।
ভুবন-ভবন-বীজং যত্র সর্ব্বং সমুপ্তং
ভবতু হি মম তস্মিন্ ভাবনং সর্ব্বদৈব ॥ ৪ ॥

গ-গণ সদৃশমীশং বাঙ্মনোবুদ্ধ্যগম্যম্
গিরিবর-হিমরাজঃ সন্নিভং ধৈর্য্য-বাসম্।
সকল-ভুবন-সংস্থং বারিনাথ-প্রশান্তং
ধৃত-নরহিত-কায়ং সন্ততং সংস্মরামি ॥ ৫ ॥

ব-হসি বপুষি বিশ্বং বিস্তরং বীর্য্যযোনিঃ
ধরসি বিমল-বেশং দীন-সন্তান-জন্যম্।

বিষম-বিষয়-বাণ-প্রোজ্ঝিতং ভক্তিপূতং
চরণ-শরণমেবং মানসং মে প্রযাতু ॥ ৬ ॥

তে-জোভিরস্পৃষ্টং দিগন্তমাপ্তং
ভাস্বদ্বিভাসা জগদন্তমাপ্তং
জ্যোতর্নিবাসং চরণান্তমাপ্তং
মুহুর্মনো ধ্যান-নিমগ্নমস্তু ॥ ৭ ॥

রা-শৌ কৃপাবারিনিধের্জলস্য
স্নাতো বিশুদ্ধো বিমলান্তরাত্মা।
পিবামি রূপামৃতমেব সম্যক্
ভক্ত্যঞ্জনভৃন্নয়নস্তু ঈশ ॥ ৮ ॥

ম-নুষ্য দেবেন্দ্র প্রসেব্যমানং
তাপত্রয়োন্মূলনমিষ্টমীড্যম্।
উদ্বেজিতঃ সন্ জনিমৃত্যুজালৈঃ
পাদারবিন্দং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

কৃ-তান্তক-ত্রাস-প্রণাশনাস্ত্রং
সমস্ত-লোকস্য পরায়ণং বৈ।
সংশ্রিত্য শান্তা হি ভবন্তু সর্ব্বে
কৃশানুবত্তাবদতর্প্যকামাঃ ॥ ১০ ॥

ষ্ণা-স্তং সুমিষ্টং হি নিরস্তপাপং
সন্দোহ-সন্দেহ-বিনাশমন্ত্রঃ।
ত্বন্নাম সত্যং সুমহদ্বরেণ্যং
বিরাজতাং নিত্যং মুখাম্বুজে মে ॥ ১১ ॥

য-স্যৈব কারুণ্যমজস্রধারম্
বিজ্ঞপ্তবদ্ধর্ম্ম-সমন্বয়ং বৈ।
যোষিদ্ধনানাং পরিবর্জ্জনঞ্চ
তমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণম্ ॥ ১২ ॥

মাতৃপূজা।

(স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ)

মার আগমনে বঙ্গভূমি আজ আনন্দমগ্না। একটী শ্রদ্ধা-বিমিশ্র নন্দহিল্লোল বাংলার পল্লী জনপদে, গৃহে, প্রান্তরে, বন-উপবনে খেলিয়া হাইতেছে। বাহিরের শোভা, সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও উৎসবের সহিত র প্রকৃতিও সাড়া দিয়াছে। বালভানুর রক্তিম লালিমা পূর্ব্বগগনের ত শুভ্র মেঘগুলিতে অপূর্ব্ব শিল্পির নিপুণ তুলিকায় নব নব সৌন্দর্য্যের ? করিতেছে, তাহার প্রতিবিম্ব দীর্ঘিকার নীলজলে মায়া কানন না করিয়াছে, শত শত সরোবরে সহস্র সহস্র শতদল বিকশিত, ংখ্য ভ্রমর গুঞ্জনে প্রভাতবায়ু গুঞ্জরিত, মাঠে মাঠে ধানভরা ক্ষেত ন মেঘের পাদমূল সতত চুম্বনরত। বন উপবনে আরও কত ভা, বিচিত্র কত পত্র পুষ্প, নির্ঝরের কত গান, বিহঙ্গের কত কলি, শিখির আপন ভোলা কত নৃত্য, সুনীল অম্বরে রবি শশীর াতি, ব্যোমের অনাহত ঘণ্টাধ্বনি, মলয়ানিলের অবিরাম চামর ন, পৃথ্বীর মধুময় গন্ধ, সাগরের তূর্য্য নিনাদ, প্রকৃতি অঙ্গ কত ব কত রূপে মার অভ্যর্থনা ও পূজা করিতেছে। বিপণি শ্রেণীতে দ্রব্য সম্ভার, রাজপথে বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদে বিভূষিত আবাল- বনিতা, যান-বাহনাদিতে যাত্রিগণের বিপুল উদ্যমে স্বাধিকার া, শুচি সম্পনা পুরনারীর আনন্দ পুলক হৃদয়ে মার পূজার আয়োজন, র্দর্য্য, পূরিত লালিমাজড়িত বালক বালিকার সরল সহজ আনন্দ লাহল, মধ্যে মধ্যে গগন পবন নিনাদকারী ঢক্কাধ্বনি—সারা বঙ্গ ? তার দীনদয়াময়ী মার আগমনে উৎসবরতা আনন্দমগ্না। মা সিয়াছেন বঙ্গের নিরন্ন শতছিদ্র কুটীরে; দুর্ভিক্ষ তাহাকে জরাজীর্ণ য়াছে, বন্যা আবাসভূমি ভাসাইয়াছে, ম্যালেরিয়া আনন্দভবনে

বিভিষিকা আনিয়াছে তবুও বাংলা এক হস্তে নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে অপর হস্তে তার বড় আদরের, প্রাণাধিকা মার সেবা ও পূজা করিতেছে। এমনি করিয়া বাংলা প্রতি বৎসর মাকে লইয়া তিনদিন আনন্দ করে তাহার পর আবার তাহার আনন্দ, গান, উৎসব থামে,—রাজরাজেশ্বরের বেশ ছাড়িয়া সে আবার তাহার চিরাচরিতরূপে বিশ্বের উৎসব ভবনে ভুক্তাবশেষ পাইবার জন্য সারমেয় বৃত্তি অবলম্বন করে। বঙ্গজননী, বিশ্বজননী রাজরাজেশ্বরী, তাঁহার সন্তান ধর্ম্ম, অন্ন, ও ঐশ্বর্য্যহীন —কি বিচিত্রতা, কি ভয়ঙ্কর অসামঞ্জস্য! স্মরণাতীত কাল হইতে বাংলা বরাভয়-দায়িনী মাকে "অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রু বিনাশিনি" "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি" মন্ত্রে তাঁহার অভয় পাদপদ্মে পূজা ও প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে। তাঁহারই প্রসাদে এককালে তাহার শোভা, সুখ, সম্পদ বিশ্ববিশ্রুত—আর আজ?—সেই কল্পতরু সদৃশ্য জগজ্জননীর পূজা করিয়া হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বরাভয়দায়িনীর নিকট বর ও অভয় প্রার্থনা করিয়াও সে এত লাঞ্ছিত, অনাশ্রিত, শক্তি, শ্রদ্ধা, অন্ন ও জ্ঞানহীন।—কেন?—কে ইহার মিমাংসা করিবে? পূর্ব্বে হিন্দু জড়ের মধ্যে চৈতন্যের মৃন্ময়ী আধারে চিরন্ময়ীর মাটি, ও প্রস্তরকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্ব হৃদয় বাসিনী নারায়ণীর উপাসনা করিত; আজ সে জড়েরই উপাসনা করে, বিশ্বব্যাপিনী মাকে বিশ্বের মধ্যে দর্শন করা দূরে থাক মৃন্ময়ী প্রতিমাতেই দর্শন পায় না, তাই তাহার পূজা আজ নিরর্থক বরং বিপরীত ফলপ্রদা।

হিন্দুর শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। সে ব্রহ্মকেই শক্তিরূপে উপাসন করে। তাহার দেবী চৈতন্য স্বরূপিনী, বিশ্বব্যাপিনী, জগতের যতরূপ তাঁরই রূপ তাঁরই অভিব্যক্তি। নিজ মায়ায় নিজকে আবরিত করিয়া লীলার আস্বাদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিশ্বরঙ্গমঞ্চে তিনিই বহুরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। তিনিই মানব মানবী; পশুপক্ষী নদনদী, চন্দ্রসূর্য্য, ক্ষুধাতৃষ্ণা, সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই। পুরা' বলেন—দেবী সর্ব্বভূতে বিরাজিতা হইলেও যাবতীয় স্ত্রী শরীরে তাঁহা' প্রকাশ সমধিক জীবন্ত। সেই মহাশক্তি, যাঁহাকে পূজা ও তুষ্টি

করিয়া হৃতরাজ্যদেবগণ স্বর্গরাজ্য বহুবার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কোটী কোটী হিন্দু প্রতিবৎসর তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াও আজ কেন এরূপ শক্তি ও গৌরব হীন? ভাবহীন হিন্দু ভাবের ঘরে চুরি করিয়া মুখে বিশ্বরূপিনী দেবীর স্তুতি করতঃ প্রকাশ্যে নিশিদিন তাঁহার অবমাননা করিয়া বিনাশের ক্রমনিম্নস্তরে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শক্তি উপাসক হিন্দুর গৃহে ব্রহ্মস্বরূপিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ রমণীগণের বেদনাপূর্ণ আর্ত্তনাদে আজ ভারতের গগন পবন নিনাদিত। যে হিন্দুরমণী দেবী বলিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে পূজিতা, যাহার অতীত উন্নতি জগতের ইতিহাসে এক গৌরবময়ী কাহিনী, যাহাদের স্বভাব-কোমল হৃদয়ের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ ও তপস্যা, বীরত্ব ও শিক্ষা আজও গাথারূপে ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে গীত হয়, সেই হিন্দুরমণী কয়েক শতাব্দীর অবহেলা ও অত্যাচারে, দুর্ব্বলতা ও কুশিক্ষায়, আজ পশু অপেক্ষাও অধম। তাহার ভীরুতা, নীচতা, ও শিক্ষাহীনতা আজ বিশ্ব বিশ্রুত। এই বিরাট বিশ্বের সেও যে একজনা, এখানে তাহারও যে কিছু করিবার আছে, কতশত বিজয়ী বীরের সমাধিপূত জীবন সংগ্রামে প্রমত্তা সিংহিনীর ন্যায় সেও যে স্বাধিকার চেষ্টায় তেজোদৃপ্ত হৃদয়ে দাঁড়াইতে পারে, তাহারও যে মস্তিষ্কে বুদ্ধি, হৃদয়ে আশা ও বাহুতে শক্তি আছে—হিন্দু রমণী তাহা জানে না; জানে—সে জন্ম জন্মান্তরের জন্য পুরুষের ক্রীতদাসী, তাহার ভোগ-সেবার যন্ত্রস্বরূপা, শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ রচনা সে যে মানবী, দেবীত্ব পদের ক্রমোন্নত পথ তাহার সম্মুখে যে সম্প্রসারিত, তাহার জন্ম, জীবন ও যৌবনের উদ্দেশ্য যে অতি মহান, ভগবানের অশেষ আশীর্ব্বাদ ও তাহার অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি জগৎ রহস্যের শ্রেষ্ঠতম রহস্য আবিষ্কারের জন্য যে সতত তাহাকে উন্মুখ করিতেছে, তাহা হিন্দু রমণী চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে এবং জন্মভূমিতে তাহার এমন কেহই হিতাকাঙ্ক্ষী নাই যে তাহার বধির কর্ণে এই মহতী বাণী ঘোষণা করিতে ও সর্ব্বজনঘৃণিত হীনাবস্থা হইতে তাহাকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবময় মঞ্চে পুনরায় উঠিবার জন্য সাহায্য করিতে

পারে। ভারতীয় রমণীর এই মহান অজ্ঞান প্রসূত শোচনীয় অধঃপতনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কে? নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়—'ভারতীয় পুরুষ।' ভারতীয় পুরুষ রমণীগণের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অনাবশ্যক-রূপে ভাবিত বা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করে না, অথচ অল্প বয়সে পরিণীতা করিয়া লজ্জাকর সংযমহীনা ও ইন্দ্রিয়ের কৃতদাসী করিয়া তুলে। বজ্রবন্ধনের আবেষ্টনী শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাদের স্বভাব বিকাশোন্মুখ বৃত্তিনিচয়কে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া ফেলে। ভারতীয় নারী জন্ম হইতে শিক্ষা পায় তাহার ধর্ম্ম অশাস্ত্রীয় স্ত্রী আচার সমূহের অনুষ্ঠান এবং কর্ম্ম—পাশবিক বৃত্তিপূর্ণ স্বামীর ভোগ যজ্ঞে আত্মাহুতি দান। আত্মশক্তি প্রকাশের সমস্ত মার্গরুদ্ধ করিয়া পুরুষ তাহাকে অবনতির ক্রমনিম্নস্তরে টানিয়া আনিয়াছে, অথচ হিন্দু শক্তি উপাসক, "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তবদেবী ভেদাঃ স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" এই মহামন্ত্রে সে দেবীর স্তব করিয়া থাকে। কপট হিন্দু লীলায়-বিগ্রহধারিনী জগজ্জননীর জীবন্ত মূর্ত্তি সকলকে নানারূপে লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিয়া তাহার এই দারিদ্র্য, দুর্ব্বলতা, স্বজাতি-বিচ্ছেদ, ধর্ম্মহীনতা ও পরাধীনতা ডাকিয়া আনিয়াছে। দেবীর বেদনা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের তপ্ত নিঃশ্বাসে হিন্দুর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছে। দেবীপূজা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলে তাহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যে এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না যাহা ভক্তের করতলগত না হয়, আবার উহার বিচ্যুতি ঘটিলে জগতের সমস্ত অনর্থ পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার অভিশাপ মানবের উপর বর্ষিত হয়। হিন্দু, তুমি দেবীভক্ত, বহুযুগ ধরিয়া নানারূপে তুমি তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছ, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে তোমার মহিমোজ্জ্বল গৌরব চূড়া একদিন অম্বরতল চুম্বন করিয়াছিল, আজ তোমার বুদ্ধিহীনতায় তাঁহারই অভিশাপে সে গৌরব চূড়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধরাপৃষ্ঠে অবলুণ্ঠিত হইতেছে।

এস হিন্দু, তোমার স্বভাব সিদ্ধ ব্রহ্ম দৃষ্টি সহায়ে একবার নারীকে অবলোকন কর। তাহার যৌবন-লাবণ্য পরিপূর্ণা, স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপরাশির দিকে আয়ত আঁখি তুলিয়া দেখ সেই—

'ঘনস্তনভরোন্নতাং গলিত চুলিকাং শ্যামলাং
ত্রিলোচন কুটুম্বিনীং ত্রিপুর'

সুন্দরী কে, কোটী শশিসূর্য্য প্রভাসম যাঁহার কান্তি, অসীম যাঁহার করুণা, অপার যাঁহার সন্তান বাৎসল্য, শুভাশীষ যাঁহার লৌহকবচ সদৃশ সন্তানকে সতত সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করে। হিন্দু. কলুষ নয়নে আর তাঁহার দিকে তাকাইও না, অশেষ লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়া আর তোমার বিনাশ টানিয়া আনিও না; তোমার জননী, সহোদরা ভার্য্যা, দুহিতা, নারায়ণী করুণায় তোমার গৃহে আবির্ভূতা; পবিত্রতা, সেবা, শিক্ষার অর্ঘ্য রচিয়া তাঁহাদের পূজা কর। দেখিবে, অচিরে এক অপূর্ব্ব পবিত্রতা, সংযম, ও নিষ্কামপ্রেমে তোমার হৃদয় মন ভরিয়া উঠিয়াছে, তুমি তখন বিশ্ববিজয়ী—ত্রৈলোক্যের সমস্ত পশুবল তোমার পদতলে তখন অবলুণ্ঠিত।

সেইদিন আগতপ্রায়, যখন হিন্দু তাহার চিরাচরিত, অধুনা-বিস্মৃত-প্রায় শক্তিপূজা যথাযথরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে। সেদিন পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তটে, পঞ্চবটী মূলে নিখিল মানবের কল্যাণকামী অনন্তভাবময়-বিগ্রহ জগদম্বার শিশু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে মহাশক্তি পূজার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভাব প্রবাহ তড়িত প্রবাহের ন্যায় অচিরেই সমস্ত ভারত শরীরে সঞ্চারিত হইবে। ভারত দেখিবে—জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ জগদম্বা, মহাপবিত্র হৃদয়া হইতে মহাপতিতা পর্য্যন্ত সকলই তিনি, তিনিই একরূপে মানবকে মুক্তিদান করিতেছেন অন্যরূপে বিশ্ববিমোহিনী মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক জীবকে বদ্ধ করিয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর মধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন; দেখিবে—স্ত্রী-পুরুষ, শিব-অশিব, শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ, সবই তিনি—ব্রহ্মজগৎ তাঁহারই মায়ার বিকাশ।

ভারতের মহাশক্তি বহুযুগ নিদ্রিতা। সেই মহানিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য শক্তিরূপাকালী ভাগবতী তনু শ্রীরামকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গে আবির্ভূতা হইয়া স্বীয় অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি মৃতপ্রায়া ভারতীয় নারী সমাজে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। ঐ শুন, অদূরে নববলে বলবতী ভারতীয়

নারীর অপূর্ব্ব হর্ষ কোলাহলপূর্ণ জয়ধ্বনি, ঐ দেখ, জগতের পশুবল ক্ষীণকায়া ভারতীয় রমণীর নগ্নপদতলে অবলুণ্ঠিত। সমগ্র জগৎ বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়নে দেখিতেছে—জন্মভূমির লৌহ নিগড় ছিন্ন করিতে ভারতের তথাকথিত অবলা জাতি ভীমারণ চণ্ডিবেশে সন্তানের পার্শ্বে আজ দণ্ডায়মানা। আজ, ভারতের পল্লী জনপদে, সভা সমিতিতে, বিচারালয়ে কারাগারে মহাকালী নৃত্য করিতেছেন। হিন্দুর শান্ত সুবিমল গৃহে অসংখ্য পবিত্র হৃদয়া কুমারী শৈলসুতা উমার ন্যায় আজ গভীর তপস্যায় নিমগ্না—সঙ্কল্প তাহারা জাগিবে, ভারতকে জাগাইবে। মাতৃগতপ্রাণ হিন্দু, তোমার শূন্য চণ্ডিমণ্ডপ পূর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ও মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক দশপ্রহরণধারিণী হেম কিরিটিনী যে মা তিনদিন তোমার ভক্তি অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তোমাকে ধন্য করেন, তিনি দুহিতা, জায়া ও জননী বেশে তোমার গৃহ আলো করিয়া আছেন। তুমি লজ্জা, সঙ্কোচ, বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, নিষ্কাম পবিত্র হৃদয়ে মন ও মুখ এক করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে চিরদিন তাঁহার সেবা করিতে থাক। তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার অশেষ মঙ্গল হইবে। তিনি সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্রে দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যকুল সংহার করিয়া তোমার হৃত স্বর্গরাজ্যে পুনরায় তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বহুযুগ পূর্বে দেবতাগণের আরাধনায় পুরিতুষ্টা জগজ্জননীর সত্যবাক্য এখনও ভারতের দিক্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ঃ—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদাতদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং ॥"

কথা-প্রসঙ্গে।

(২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহাভারতের ক্ষত্রিয় চরিত্র আলোচনার আমাদের দ্বিতীয় নাট্য শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্রের "পাণ্ডবগৌরব।" "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের" নায়িকা যেমন দ্রৌপদী, এ নাট্যে সেইরূপ সুভদ্রা। অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে প্রকাশ হইয়াছেন। ভারত যুদ্ধের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে ঠিক এই সন্ধিক্ষণে অবন্তী রাজ দণ্ডী দুর্ব্বাসা শাপগ্রস্ত কামরূপা উর্ব্বশীকে অশ্বিনীরূপে প্রাপ্ত হন। অষ্ট-বজ্রের মিলন ছাড়া উর্ব্বশীর এ পশুযোনি হইতে মুক্তি নাই। তাহার কাতর প্রার্থনায় শ্রীভগবান সেই অশ্বিনী চাহিয়া পাঠাইলেন। দণ্ডী কৃষ্ণ ভয়ে দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজগণের আশ্রয় চাহিলেন কিন্তু কেহই তাহতে সম্মত হইল না। দণ্ডী কামরূপা অশ্বিনীকে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জাহ্নবীতীরে উপস্থিত। ঠিক সেই সময় সুভদ্রাদেবী পুত্রবধূ উত্তরাকে লইয়া দ্বারকা হইতে জাহ্নবীতে অবগাহন করিয়া বিরাটে স্বামী সকাশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিদায় প্রসঙ্গে অন্তর্যামী নারায়ণ সুভদ্রাকে তাঁহার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

"শুন ভদ্রা সার ধর্ম্ম আশ্রিত পালন,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান।
যেবা দেয় অনাথে আশ্রয়,
চির দিন গাই তার জয়,
বাঁধা রহি তার দয়া গুণে।
অসহায় যেই জন আশ্রয় যাচিব
যত্নে তারে করিবে রক্ষণ।

ধন, প্রাণ, মান—
আশ্রিতের তরে দেবী দিতে বিসর্জ্জন,
কাতর না হও কভু ;
আশ্রিত পালন, ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।"

ভদ্রা এই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বুঝিলেন না কেন ভগবান তাঁহাকে বিদায় কালে মানবের এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম উপদেশ করিলেন। অষ্টবজ্র দেব ও মানবের করস্থ ; তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত না হইলে অষ্ট-বজ্রের মিলন ও উর্ব্বশীর মুক্তি অসম্ভব। এই বিরোধের মধ্য দিয়া আজ ভগবান পাণ্ডবকে অশ্রিত-রক্ষণ শিক্ষাদান ও গৌরবান্বিত করিবেন।

ভদ্রা জাহ্নবীতে অবগাহন করিতে আসিলে দণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল ও দেখিলেন দণ্ডী আত্মহত্যায় উদ্যোগী। কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন, "বিধি বিড়ম্বনে মোর কৃষ্ণ সহ বাদ।" উত্তরে সুভদ্রা বলিলেন "কৃষ্ণপদে মাগহ মার্জ্জনা, অপর করুণা, ক্ষমিবেন অপরাধ।" কিন্তু পরে যখন জানিলেন যে দণ্ডীর কোনও অপরাধ নাই, দণ্ডীর অশ্বিনী তাঁহার ভাই বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চান ; তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত্রিয়কুলরাণী মহা উত্তেজিত হইয়া দণ্ডীকে কৃষ্ণ-দেবী রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন। ধর্ম্মের আদর্শ চক্ষের সমক্ষে উজ্জ্বল রাখিবার জন্য তিনি ভাই কৃষ্ণ—ভগবান কৃষ্ণের সহিতও বিরোধে প্রস্তুত। কিন্তু শুনিলেন দেব-দানব-নরের কেহই দণ্ডীকে আশ্রয় দেয় নাই। তখন ভদ্রা বলিলেন,—

ত্যজ ভয়, মহাশয়, দানিব আশ্রয়—
আইস মোর সাথে তুরঙ্গিণী লয়ে।"

দণ্ডী ভাবিলেন এ রমণী বাতুল। তখন সুভদ্রা আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—

"শুন নৃপমণি, বীরাঙ্গণা বিপদ না জানে,
অহেতু যদ্যপি বাদী হন চক্রপাণি,
তাঁরে আমি তিল নাহি গণি,

আশ্রিত পালন ধর্ম্ম মম।
পাণ্ডব-ঘরণী,
যাদব নন্দিনী সুভদ্রা আমার নাম।

—পরিচয় পাইয়া দণ্ডী ভীত হইয়া বুঝিলেন, যাদবকরে অর্পণ করিবার নিমিত্ত ইহা ছলনা মাত্র। উত্তরে ভদ্রা বলিলেন,—

"অহেতু আশঙ্কা তুমি কেন কর চিতে
বীরাঙ্গণা হতে
হীন কার্য্য অসম্ভব চিরদিন।

* * *

গঙ্গাতীরে সত্য করি কহি মহীপাল,
পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন,
মজে যদি তোমার কারণ,
তথাপি গো রক্ষিব তোমারে।

তখন দণ্ডীর অন্য ভীতি উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এই করুণাময়ী আমার নিমিত্ত কেন স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের নিকট অপরাধিনী হইবেন। ভদ্রা তাঁহাকে পুনরায় বুঝাইলেন,—

"পাণ্ডবের রীতি তুমি নহ অবগত,
অসঙ্গত-বাণী নৃপ কহ সেই হেতু"।

কিন্তু দণ্ডীকে ইহা সত্বেও মৌনী দেখিয়া উত্তরা দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

মৌন কেন রহ মহীপাল ?
পাণ্ডব আশ্রয়ে তুমি কারে কর ভয় ?
জেন স্থির যদি কভু রবি-শশী খসে
সাগরে না রহে জল, অনল শীতল,
মেরু যদি নড়ে, বিশৃঙ্খল ব্রহ্মাণ্ড যদ্যপি
পাণ্ডব না আশ্রিতে ত্যজিবে।"

কিন্তু দণ্ডীর তাহাতে প্রত্যয় হইল না। কারণ বিশ্ব সংসারে সকলেই জানে পাণ্ডব কৃষ্ণ বলে বলী। তিনি বুঝিতে পারেন নাই,

ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ এক। আশ্রিত-পালন-ধর্ম্ম ত্যাগ যদি পাণ্ডব করেন তাহা হইলে তাঁহারা কৃষ্ণকেই ত্যাগ করিবেন, সুতরাং কৃষ্ণ বা ধর্ম্মহীন পাণ্ডব ছারেখারে যাইবে। শ্রীভগবান ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্যই নানা পরীক্ষা-প্রলোভনের সৃষ্টি করেন। এ ঘটনা তাঁহারই একটী উদাহরণ মাত্র। তাই সুভদ্রা তাঁহাকে আবার বুঝাইলেন,—

"কদাচিত তোমারে না ত্যজিব রাজন,
স্থির এ প্রতিজ্ঞা মোর।
বংশক্ষয় হয় যদি রণে
তিল মাত্র নাহি গণি মনে,
সত্য, কৃষ্ণ বলে-বলী পাণ্ডু পুত্রগণ,
কৃষ্ণ সখা পাণ্ডবের ধর্ম্মের পালনে!"

ধর্ম্মের পালন করেন বলিয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবসখা—এই সত্য অবগত হইয়া দণ্ডী সুভদ্রার অনুগমন করিলেন। কিন্তু হায়, আজ ক্ষত্রিয় চরিত্রে কি ব্যভিচারই না ঘটিয়াছে! আশ্রিতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাই বর্ত্তমান Politics বা রাজনীতি!

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র পাণ্ডবের ভরসা। ঠিক এই সময়ে সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধের প্রস্তাব ভীম সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। সত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ভীমের কিন্তু কেশাগ্র কম্পিত হইল না। তিনি অবিচলিত চিত্তে উত্তর দিলেন,—

"করিয়াছ কুলরীতি-মত গো কল্যাণি।"

কিন্তু অর্জ্জুন ভীমের নিকট এই বার্ত্তা শ্রবণে ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। ভীম তাহাকে বুঝাইলেন,—

চমৎকৃত হয়ো না ফাল্‌গুনী,

* * *

ধর্ম্ম নীতি কে শিখিবে ভবে,
ধর্ম্ম-আত্মা ধর্ম্মরাজে না করিলে সেবা।
প্রাণ বিসর্জ্জনে—আশ্রিত পালনে
উপদেশ কেবা দিবে।"

অর্জ্জুন নত মস্তকে উত্তর দিলেন, "কনিষ্ঠ তোমার দেব তব অনুগামী কিন্তু ভাবি বীর নিষ্কণ্টক হল দুর্য্যোধন!" কিন্তু ভীত ও চমৎকৃত অর্জ্জুনের নিকট এক্ষণে ধর্ম্ম-পালন ও তাহার ফল নির্ণয় জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরন্তু সত্যে প্রতিষ্ঠিত ভীমের নিকট ঐ প্রশ্ন অতি সরল। তিনি উত্তর দিলেন,—

"নিষ্কণ্টক দুর্য্যোধন?
কদাচ না ভেব মনে।
ধর্ম্ম যুদ্ধে অবশ্য লভিব জয়!
শ্রীহরি ধর্ম্মের সখা,
স্মরি তাঁরে জিনিব তাঁহারে।
কিন্তু যদি হয় পরাজয়,
কণ্টক শয্যায় তবু শোবে দুর্য্যোধন!
রাজসূয়ে বিভব হেরিয়ে—
ঈর্ষায় করিল দুষ্ট ছল অক্ষ ক্রীড়া।
শত গুণে পুনঃ মূঢ় জ্বলিবে ঈর্ষায়
শুনিবে যখন,
পাণ্ডব-আশ্রিত হেতু ত্যজেছে জীবন।"

অপর দিকে কুন্তীর মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত। তিনি ভীমকে বুঝাইতে লাগিলেন,—

"বৃকোদর,
এ বৃদ্ধ বয়সে ব্যথা দিওনা মায়েরে!
ইন্দ্র সম অরি দুর্য্যোধন,
উপস্থিত রণ,
হরি মাত্র পাণ্ডব সহায়;
রণে বনে, দুর্গমে সঙ্কটে,
পাইয়াছ পরিত্রাণ যাঁহার কৃপায়;
দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ,
দুর্ব্বাসা পারণে ত্রাতা শ্রীমধুসূদন,

পাণ্ডব-বান্ধব নাম !

তুচ্ছ দণ্ডী হেতু, কর দ্বন্দ্ব তাঁর সনে ?

ভীম । কিন্তু কৃষ্ণ-সখা কি কারণে পুত্রের তোমার

ভুলেছ কি মহাদেবী ?

তব ধর্ম্মবলে—ধর্ম্মরাজের জননী !

ব্রাহ্মণ নন্দন হেতু অর্পিলে নন্দনে,

ভয়ঙ্কর বক নিশাচর-মুখে ।

হতাশ কি হেতু মাতা ?

দয়াময় আশ্রিত-আশ্রয়,

রুষ্ট না হইবে কৃষ্ণ আশ্রিত পালনে ।”

ভীত যুধিষ্ঠিরও সংশয় চিত্তে বলিলেন,—

বিষম বৈষ্ণবীমায়া বুঝিতে না পারি,

শুধাই তোমায়,

কেবা কবে পাইয়াছে ত্রাণ,

শত্রু করি ভগবানে ।

ভীম । “শুনেছি শ্রীমুখে বার বার

হরি কভু অরি নহে কার,

মিত্রভাব, শত্রুভাব—তারণ—বারণ ।

* * *

“ব্রত তব ধর্ম্ম-উপাসনা ;

সেই ব্রতে পূর্ণাহুতি দেহ নরনাথ ।”

তবুও যুধিষ্ঠিরের সংশয় গেল না । ভীরু হৃদয়ের দুর্ব্বলতা আসিয়া তাঁহার যুক্তিকে আশ্রয় করিল। শ্রীভগবান বলিয়াছেন “সংশয়াত্মা বিনশ্যতি” সেই সংশয় আজ তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, আজ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নন, এমন কি কুযুক্তির মুখে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন,—

"আশ্রিত পালন কর্ত্তব্য নিশ্চয় জানি,
কিন্তু তা' হতে কর্ত্তব্য-কৃষ্ণ-চরণ-শরণ !
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত্যজি বিভীষণ,
রামে কৈল পূজা,
ত্যজি আপন জননী
ভরত পূজিল চিন্তামণি
পিতৃঘাতী শক্র সেবা করিল অঙ্গদ।"

কিন্তু সত্যপ্রাণ ভীমের যুক্তির নিকট কুযুক্তির মেঘ কাটিয়া সকলের হৃদয়ে সত্য সূর্য্য প্রকাশিত হইল। ভীম বলিলেন,—

"একমাত্র উপায় কেবল,
ভেদিতে বৈষ্ণবী মায়া—
শিখিয়াছে দাস দেব, তব উপদেশে—
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃসার,
তারপরে মায়ার নাহিক অধিকার !
রাজ-ধর্ম্ম, ক্ষত্র-ধর্ম্ম—আশ্রিত রক্ষণ,—
রণ আকিঞ্চন ক্ষত্রিয়ের !
পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইষ্টদেব গুরু—
আবাহন যে করে সমরে
প্রবোধিতে তারে, ক্ষত্র রীতি চিরদিন।
ভীরু করে গুরু বলি সমরে সম্মান !
পৃষ্ঠ দেয় রণে
মিথ্যা বোধ দিয়া নিজ মনে,
নাহি বুঝে 'ভয় নয় ধর্ম্ম আচরণ'।
কহিলে রাজন,
ধর্ম্ম হেতু তব বাক্য করিব হেলন,
নিবারণ কর যদি আশ্রিত রক্ষণ।

পাণ্ডবগণ যদি আজ কালকার ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিশ্চয়ই Alliance ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা

দণ্ডীকে শ্রীকৃষ্ণের করেই তৎক্ষণাৎ betray করিতেন। এবং সুভদ্রাকে নিশ্চয়ই অন্ততঃ ভারত যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত internmentএ থাকিতে হইত। আর হে বঙ্গীয় জননী! কুন্তীর মাতৃ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহাকে সামান্যা জ্ঞান করিও না। তিনি তাঁহার সন্তানগণকে কখনও সত্য হইতে বিরত করেন নাই; এই কুন্তী একদিন ব্রাহ্মণ পুত্রকে রক্ষার জন্য নিজ পুত্র ভীমকে স্বহস্তে রাক্ষস মুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হায়রে, চিরকালই কি বাঙ্গলার নরনারী theatreই দেখিবে! কবি হৃদয়ের মহাসত্যকে কি কখনই সে নিজ জীবনে উপলব্ধি করিবে না? উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র ত সম্মুখেই প্রসারিত—কে তাহারা আজ এই ধর্ম্ম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে?

এদিকে বলদেব পাণ্ডব-প্রাঙ্গণে আসিয়া সুভদ্রার সহিত দেখা করিলেন এবং ক্রোধ ও স্নেহ সহকারে নানাভাবে কৃষ্ণ-বিরোধ ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সুভদ্রা স্বধর্ম্মে অটল তখন তাঁহাকে বৈধব্য, পুত্রশোক ও বংশ নাশের ভীতি প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে সুভদ্রা উত্তর দিলেন,—

"ক্ষত্রিয় রমণী দেব, বৈধব্যে না ডরে,
সাজাইয়ে পুত্রে দেয় পাঠায়ে সমরে"

* * *

"যদবধি কণ্ঠে রবে প্রাণ
শুন বীর্য্যবান্, স্থান আমি দিব তারে।
হলে প্রয়োজন,
কাটি বেণী বিনাইব গুণ,
অশ্বরজ্জু করিব ধারণ পুনঃ;
নারী হয়ে ধরিব ধনুক।"

তার পর—

"করিবারে ধর্ম্ম সংস্থাপন,
দণ্ডিতে দুর্জ্জন, সাধুজন-ত্রাণ হেতু,
অবতীর্ণ তোমা দোঁহে।

তবে দেব কি হেতু ছলনা ?
ধর্ম্ম হেলা উপদেশ কিবা হেতু ?”

“স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন,—
বন্ধু মাত্র ধর্ম্ম এ সংসারে।
থাক ধর্ম্ম, হক সর্ব্বনাশ,
তিলমাত্র নাহি তাহে গণি !”

বলরাম নিরুত্তর হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অপর পক্ষে দুর্য্যোধন যখন শুনিলেন যুধিষ্ঠির দণ্ডীকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, তখন তিনি পাণ্ডবের বীরত্ব, আশ্রিত-রক্ষণ ও মৃত্যুতেও যশ-গৌরব স্মরণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। রাজ্য লইয়া তাঁহার ত পাণ্ডবের সহিত বিরোধ নয়,—গৌরব লইয়া। এক্ষণে তিনি নিজেও এই গৌরবের ভাগী হইবার আকাঙ্ক্ষায় অর্জ্জুনের নিমন্ত্রণে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল ক্ষত্রিয়কুল মহাবিক্রমে যাদব-সংগ্রামে যশ-লাভ চেষ্টায় পাণ্ডবের সাহচর্য্যে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ভীম দেখিলেন, প্রথমতঃ এ বিগ্রহে বহু প্রজা ক্ষয়, দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তব্যের খাতিরে সকলেই তাঁহার মতে মত দিয়াছেন কিন্তু অন্তরে সকলেরই সংশয়, এ ধর্ম্মযুদ্ধ আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তৃতীয়তঃ রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের সহকারী হইবেন ইহা অসহ্য। মাতা-কুন্তীকে নির্জ্জনে কর্ণের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া তিনি অভিমানে রূঢ় স্বরে বলিলেন,—

“ভাব কি জননী,
দানিয়াছি দণ্ডীরে অভয়,
সূত পুত্র বাহুবলে করিয়া নির্ভর ?
একে হৃদে জ্বলে গো আগুন,
গিয়াছিল আপনি অর্জ্জুন—
দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণ হেতু।
ধিক হেন অপমান, তুচ্ছ হয় প্রাণ,

দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু,
সেই কুরু রণে সাথী !”

তিনি স্থির করিলেন কৃষ্ণের সহিত তিনি দ্বৈরথ্য করিবেন। তিনিই যখন দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়াছেন তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সহিতই শ্রীকৃষ্ণের বিরোধ। তিনি গোপনে দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্বৈরথ্য ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু উর্ব্বশীর কাতর ক্রন্দনে ব্যাকুল ভগবান কপটতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—

“তুমি বলবান্,
বাহুবলে নাহিক সমান তব,
তাই চাও যুদ্ধ মম সনে !
বুঝেছি কৌশল !”

* * *

“সম-বল সহরণ ক্ষত্রিয় নিয়ম,
যেই জরাসন্ধ সহ রণে ভঙ্গ দিছি কতবার.
তৃণবৎ ছিঁড়িলে তাহারে !
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন,
কিন্তু তব চরণের ঘায়,
গিরি-শির চূর্ণ শত শত !
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায় ;
লব তুরঙ্গিনী এই প্রতিজ্ঞা আমার,
ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ।”

সরল উদার ভীমের বিশাল হৃদয় এ কপটতার ঝঞ্চায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—

“অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল !
তুমি লজ্জাহীন,
তোমারে কি লজ্জা দিব ?
সম তব মান অপমান,

নহে ক্ষত্র হয়ে কহ কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয় সদনে,
পরাজয় ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ !"

ভীম প্রস্থান করিলেন। এই দ্বৈরথ্য-যুদ্ধ প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের একটী পুরাতন প্রথা। ইংরাজীতে ইহাকে Duel বলে। Medieval ইউ-রোপেও ইহার কথঞ্চিৎ প্রচলন ছিল। অতীতের ক্ষত্রিয়েরা অনেক সময় ইহার দ্বারা জাতি ও প্রজা-ধ্বংস নিবারণ করিয়াও স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেন। এই যুদ্ধ-ব্রত পালন ব্যঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ভীরুর কর্ম্ম নহে, তাই আজ ইহা অচল archaic। এ প্রথার চল থাকিলে মনুষ্য হত্যা কল্পে Science এর উন্নতির পথও রুদ্ধ হইয়া থাকিত, তাই ইহা আজকাল কার রাজনীতিজ্ঞেরা উঠাইয়া দিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়েরা ভীষ্মকে নেতা করিলেন। তিনি যাদব ও কৌরব উভয় পক্ষের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষী—তাই আচার্য্য দ্রোণ, কুন্তী ও অর্জ্জুনের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিয়া বিদুরকে পাঠাইলেন। এদিকে উর্ব্বশী অর্জ্জুনের নিকট আত্মপ্রকাশ করায় অর্জ্জুন তাঁহাকে লইয়া দণ্ডীর নিকট হইতে সুভদ্রার করে অর্পণ করিলেন। প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ঈর্ষায় দণ্ডী অশ্বিনীকে শ্রীকৃষ্ণ করে অর্পণ করিতে চাহিলেন। অগত্যা অশ্বিনীকে অর্পণ করিবার জন্য ভীষ্ম সুভদ্রা ও ভীমকে আদেশ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে দণ্ডী সুভদ্রার আশ্রিত ছিল, এক্ষণে উর্ব্বশী আশ্রিতা, সুভদ্রার করেই উর্ব্বশীর মুক্তি নির্ভর করিতেছে। উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি নাট জ্বালাময়ী বানীতে বৃদ্ধ পিতামহের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন,—

"পিতামহ দেন হেন উপদেশ !
কব আমি অভিমন্যে,
পিতামহ হেতু চিতা করিতে প্রস্তুত
ইচ্ছা মৃত্যু যদি,—
তবু মৃত্যু নিকট উঁহার

সুভদ্রা পরশুরামের সহিত ব্যবহারে ভীষ্মের পুরাতন মহত্ত্ব ও বীর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া ভারতবংশের রীতি জ্ঞাপন করিলেন। ভীম ভীষ্মের

সংকল্পে সায় দিয়াও কটাক্ষ করিলেন,—"কবে ত্রিভুবন মিলি, 'ভয়ে অনেক বুঝায়ে, বৃদ্ধ গঙ্গার নন্দন, করিবারে অশ্বিনী অর্পণ, উপদেশ দিয়াছেন অবন্তী ঈশ্বরে'।" অতঃপর ভীষ্ম স্বকৃত হইয়া স্থির করিলেন, "জিনিয়া সমর—করিব অশ্বিনী দান কৃষ্ণের চরণে।"

ভীষ্মের এ সংকল্প কত মহৎ। ইহাই ভারত-ক্ষত্রিয়ের চির আদর্শ। ইহাই জগতের আদর্শ হউক। কঠোর পরিশ্রমে উপার্জ্জিত বস্তু স্বীয় ভোগের নিমিত্ত নয়—শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে উহা নিবেদিত হউক—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

হিন্দুত্বের ভিত্তি।

(শ্রীসত্যবালা দেবী)

৫। জড় চেতন।

শাস্ত্রজ্ঞান বিজৃম্ভিত-মনীষাগর্ব্ব হইতে নহে। সংসারের সর্ব্ব উপকরণ সংস্রবহীণ উলঙ্গ অন্তরাত্মার সংস্পর্শ হইতেই পাইবে,—যদি জাগ্রত হইয়া উঠ, উদ্যত হইয়া উঠ, আপনাকে মেলিয়া দাও সেখানে।

কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা ত অনেক করিলে, এখনও কেন তবে সেই নিঃসন্দিগ্ধ লিপ্ততায় আবদ্ধ সংসারের মানুষটীর মত 'হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়ানি' যায় না। যে গুলা জীবন্ত মুখচ্ছবি ছিল সে গুলা এখন অনির্দ্দিষ্ট ভাবের ঘূর্ণিবায়ু রচিয়া, থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে ঝণ্‌ঝনায়িত ঝঙ্কার তুলে! যে গুলা নিজের দেহে সুখে বিলাসে লালিত হইয়া অভ্যাস-রূপী শত্রু দাঁড়াইয়াছিল সেগুলা এখন পরের অন্তর্যুদ্ধক্ষত শুষ্কমুখ দেখিলে করুণার ছদ্মবেশে সাজিয়া সহসা কাছে আসিয়া পড়িয়া যেন নাড়া দিয়া যায়। প্রায়ই ত এমন হইতেছে, হৃদয় উচ্চ চিন্তার ভাবলোকে উধাও হইয়া যেন মেঘমালা মধ্যে চতুর্দ্দিকে আবছায়ায় ডুবিয়া কেমন একটা

আনন্দের আভায় অস্থির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমৃতস্পর্শ অনুভব করাইতেছে, সহসা বাণাহত পক্ষীর মত সে হৃদয় বাস্তবের ধূলিতলে লুটাইয়া পড়িল,—একি' ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া?—উঃ! সঙ্গে সঙ্গে কি বিপরীত বৃত্তি! হৃদ্‌পিণ্ডকে কে যেন মুচ্‌ড়িয়া মুচ্‌ড়িয়া ধরিতেছে? সাধনা তপস্যা সবই যেন খেলা! দৈনিক কার্য্যতালিকায় সেও যেন একটা বিষয়? না হয় তাহার সময় ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিতে থাকিলে, কিন্তু সর্ব্বশেষ যদি দেখ যে তুমি সেই তুমিই, তবে কোন্ নিশ্চিত লক্ষ্যের মধ্যে যাইতেছ? কষামাজায় ত কিছুই স্থির হয় না দেখিতেছি!

ওগো সাধক! এমনি করিয়া সাধনার স্বর্ণযুগে অনেকখানি বাজে খরচ হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে, সংশয় পুতনার বিষলিপ্ত স্তনের মত মধুর প্রলোভন মুখের কাছে ধরে, বলে—শুষ্ককণ্ঠ শীতল করিতে এখানে নিমেষের জন্যও আয়, যাদু আয়!

শাস্ত্রজ্ঞান মনীষার নিন্দা করিতেছি না।—এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের পরাজয়ের রণচাতুর্য্য শিখাইতেই বলিতেছি,—অন্তরাত্মার সংস্পর্শ হইতেই পাইবে। পাইবে আপনার চেতনাকে সেই আপন আত্মার দ্রষ্টারূপী নিগূঢ় স্বভাবটীকে। এই ল্যাংটাকে যতদিন না গুরু করিতেছ, জ্ঞানের ভরসা ছাড়িয়া দাও।

"যথার্থ দর্শনং জ্ঞানমিতি" যে বস্তু যাহা তাহাকে সেইরূপ জানা ও তাহা হইতে যথাযথ উপকার লওয়ার নাম জ্ঞান। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে একটা স্বপ্নবৎ গতি অর্থাৎ তাহার একটা বিশেষ চাওয়া থাকে, এখানে তাহাকে বলিতে পার সংস্কার; এই সংস্কার অন্ধ করিবেই। আত্মা চিরকাল সত্যার্থ জানিবার উপযুক্ত কিন্তু সংস্কার আপনার বাহিরের কাহাকেও জানিতে পারে না, তাহার সে ধর্ম্ম নহে। সংস্কারের অনুরাগে তুমি আপনার আবেগের রঙ্গে ও সমস্তের অন্তরগত বর্ণবৈশিষ্ট্যে একাকার করিয়া ফেলিবেই, এই নিয়মে সংসারে প্রতিপদে অভীষ্ট ইষ্টের স্থান অধিকার করে। মানুষ সত্যের নিশ্চিত লক্ষ্যকে দূরে রাখিয়া আপাতঃ মধুর মিথ্যাকে বরণ করিয়া সংসারের চাওয়ার চাওয়া তৃপ্ত করিতে করিতে অন্তরের চাওয়াকে হারাইয়া ফেলে। বিদ্যার কমল বনে পদ্মকে পঙ্ক

প্রোথিত করিয়া সে শম্বুকই তুলিবে যদি শম্বুক তাহার খাদ্য হয়। বিদ্যার সম্ভ্রমেই বিদ্যাকে দূরে রাখিবার পরামর্শ দিতেছি, যতদিন না বিদ্যার অন্তর্নিহিত সত্যার্থ গ্রহণে যোগ্যতা আসে।

হঠাৎ এমন কথা অনেক শিক্ষিত মনকে আঘাত দিতে পারে কিন্তু নিরুপায়,—মূর্খতাও শিক্ষার অধীন। না কসরৎ লইয়া কে কবে চোর বাটপাড়ও হইতে পারিয়াছে? আলস্য অবধি যে অভ্যাস সাপেক্ষ্য।

সাধক ব্যক্তিগত জীবনে তুমি যত বড়ই হইয়া থাক সে স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের বস্তু, সেখানে তাহা মণিরত্ন হইলেও সাধন জগতে তাহা যে আবর্জ্জনা নহে কে বলিবে? সে সকল যদি সংসারের চাওয়ার খাদ্য হয় তোমার সংস্কারই যদি তাহাদের পুঞ্জীভূত করিয়া থাকে সাধন ক্ষেত্রে তাহা হইতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হইয়া আসিবার শক্তি থাকে ত অগ্রসর হও। তোমার বুকে হাত দিয়া দেখ, হৃদয়ে তোমার কত গুণ! তাহার দিব্যস্বপ্নে মজিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে কত আশাই না পোষণ করিতেছ, তাহাকেও সঙ্গে লইতে পারিবে না। হৃদয়ের ধন পরিপূর্ণ হৃদয় খানাকেও পিছনে রাখিয়া আসিতে হইবে। ওই ল্যাংটা গুরুর চেলা না হইলে এ মঠে, এ দলে লয় না।

জগতের কোনও ফাটে পড়িয়া যদি এতটুকুও মরিবার ভাব থাকে সে মরা আগে তবে শেষ হইতে দাও। সকল মরার পর তারপর বাঁচিয়া উঠিয়া যে মরিয়া ভাব তাহার মধ্যেই আত্মার অমরত্বের স্বাদ! আত্মা নিরপেক্ষ সে কোনও কিছুকে লইয়াই ফুটিয়া উঠে না বরং সমস্তই যত তাহার ঘনিষ্ঠ স্পর্শ পায় তত প্রভূত বলশালী হইয়া উঠে। এই আত্মার সংস্পর্শে না আসিলে তুমি পাইবে না তোমার চেতনাকে। বিদ্যায় বৃহস্পতি হইয়াই ত তুমি মরিয়াছ। নীতিতে শুক্রাচার্য্য হইয়া উঠিলেও তুমি একটা জড় প্রতিমূর্ত্তি ওই শুক্রাচার্য্য হইয়াই ত তুমি মরিয়াছ। আর তোমার রূপগুণ সেও কেবল জড়েরই বোঝা। গুণ কাহাকেও বাঁধিবে না,—তোমারই হৃদয়ের অতৃপ্ত কুটীর মধ্যে তোমায় নিস্পিষ্ট করিয়া দিন রাত তোমাকেই পরবশ রাখিবে। রূপ কাহারও হৃদয়েই ফাটিয়া বসিবে না, তোমাকেই জড়ত্বের অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে সমাহিত করিতে থাকিবে।

আর জীবনের যে চরম লক্ষ্য মহত্ত্ব, চেতনাই তাহাকে স্পর্শিতে পারে। মহত্ত্ব মগ্ন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কৌপীন সম্বলে যে সাম্রাজ্য গঠিত করিলেন তাহা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। অসি বলে সমগ্র ভারত যদি জয় করিতেন তিনি তাহা—কতদিন থাকিত! মহত্ত্ব মগ্ন তন্তুবায় কবীর একটা সম্প্রদায়ের গুরু। সামান্য দোকানদার নানক একটা জাতির প্রতিষ্ঠাতা।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য", সে ওই বল সকল মরাকে কাটাইয়া বাঁচিয়া উঠার বল, জড়ত্বের মারিব্যাধি প্রতিহত করিবার চেতনা রূপ অটুট স্বাস্থ্য বল। যে বলে প্রত্যেক রক্তবহা স্নায়ু মাংস নহে লৌহ বিনির্ম্মিত হইয়া উঠে মস্তিষ্কের করোটী কঠোর অস্থিকে মর্ম্মরে পরিণত করিয়া আপনাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লয়। ত্যাগের মধ্যে এই বললাভের গূঢ় সঙ্কেত আছে তাই ত্যাগের উন্মাদনা জগতে সকলের বড় উন্মাদনা। ত্যাগ তিক্ত নহে ত্যাগ মধুর। যেখানে কষ্টকর মনে হয় সাধনা সেখানে কৃচ্ছ্রতায় দাঁড়াইয়াছে। ত্যাগের মধুস্বাদে জীবের অন্তর্য্যামী এত নিঃসন্দেহ যে কৃচ্ছ্রতাকেও মানুষ প্রাণ দিয়া সগৌরবে আঁকড়িয়া থাকে ছাড়িতে চাহে না ভাবে মরুভূমির উষ্ট্রবাহনের মত ও আমাকে পার করিবেই। হায়রে! উষ্ট্র ক্ষেপিয়া গিয়া স্বল্প প্রাণটুকু মরুভূমি মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া নিঃশেষ করিয়াই জীবনের অবসান করিতে পারে।

জড়ত্বকে পাশ কাটাইয়া চলাই ত্যাগ। সংস্কার পুঞ্জকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া জ্ঞানের প্রশস্ত ক্ষেত্রে জীবাত্মাকে আত্মসংস্পর্শ লাভ করানই ত্যাগ। ত্যাগের পাথেয় বৈরাগ্য। আসক্তি গর্ভে যেমন ভূতগত সৃষ্টি অর্থাৎ জড়ত্বের জন্ম, তেমনি বৈরাগ্যের গর্ভে ভূতগত সৃষ্টির লয়—জড়ত্বের অবসানে চেতনার বিকাশ। সাধককে এই সঙ্কেত জানিয়া রাখিতে হইবে। ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারাই সংস্কার খণ্ডিত হইতে থাকিবে। আত্মা যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে ততই সংসার সরিয়া গিয়া চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে সত্য। তখন ভাগবত জীবন আরম্ভ হইবে, এ জীবনের সমস্ত ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। কি যে হইবে তাহা স্রষ্টা পুরুষ দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, পূর্ব্বাহ্নে সে চিত্র আঁকিয়া দেওয়া অসম্ভব। কেবল জানিও যতদিন

না জীবনে এই সার্থকতা আসিতেছে ততদিন মনুষ্যত্বের পথে দাঁড়াও নাই, মহত্ব লাভ কর নাই তা যত বড়ই হইয়া থাক—আর, ভারতের বিশিষ্ট সভ্যতালাভের ধার দিয়াও যাইতেছ না।

অচেতন জড় মানুষ চেতনার সংস্পর্শে কেমনটী যে হইতে পারে সেই দূর লক্ষ্যের শেষ এখন হইতে কি বুঝিব তবে সাধকের জীবন সাধনা ও শত শত মহাপুরুষের সরল হৃদয়ের স্বীকারোক্তি হইতে তাহার একটা মোটামুটী ধারণা আসে। আমরা যেমন প্রাণের পরিধি ক্রমেই দূর বিস্তৃত করিতে থাকি দিনে দিনে অনেক কিছুর মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া আত্মচরিতার্থতা লাভ বাসনা করি। অনেক দিক হইতে অনেক জিনিষ না আসিয়া জুটিলে আমাদের প্রাণ বাঁচে না, আপনার মধ্যের মানবত্বের স্পৃহা চরিতার্থ হয় না। এই জোটাকে প্রতিহত, এই ছড়ানকে সঙ্কুচিত করিতে গেলে আমরা তথন বুঝিতে পারি প্রাণ কত কিছুর মধ্যে মরিয়াছে, আমার যে আমি সে কতদিককার বশ হইয়া জগতে বাস করিতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়া যে জিনিষ আমরা পরিচিত করি বস্তুতঃ তাহা একটা ব্যক্তিগত জিদ্ মাত্র। তাহার মূল ঐ সংস্কারের চাওয়া। সত্যকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একেবারেই বিভিন্ন বস্তু। তেমনি তাঁহারা, বোধ হয় সত্যদৃষ্টি দিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিতে পারেন বলিয়াই, প্রাণের পরিধিকে ঠিক বিপরীত দিকেই গতি বিশিষ্ট করিতে থাকেন। তাঁহারা জীবনকে এমন একটা অনুভবের মধ্যে সংযত ও সংহত করিয়া আনেন যেটা সমস্ত অনুভবের মূল—প্রাণকে পরিধির দিকে না ছড়াইয়া তাহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন আর তাহার ফলে তাঁহাদের প্রাণ কোনও পরিধির বশ না হইয়া এমন এক বিন্দুর বশ হয় যে বিন্দুটী সমস্ত মানুষের প্রাণের পরিধির কেন্দ্র।

মোটামুটী কথাটা এই—বোঝার তারতম্য। যাহা শিখিয়া রাখিয়াছি তাহা শিখিতে কয়দিনই বা লাগিল কিন্তু সেত' তোতা পাখীর মুখস্ত। সমগ্র জীবনেও বুঝিয়া উঠিতে পারিব কি না কে জানে? তার উপর—

"Like fingers towards the skies they cannot reach
　　Earth bound, heaven-amorous.
This is the soul of man, body and brain
Hungry for earth our heavenly flight detain."

নভঃ নির্দ্দেশী অঙ্গুলীর মত স্বর্গের জন্য তৃষিত হইলেও সে মর্ত্তেই বদ্ধ। ইহাই ত মানবাত্মা। স্নায়ু ও মস্তিষ্ক চিরদিনই মর্ত্তের জন্য ক্ষুধাতুর থাকিবে, স্বর্গযাত্রা স্থগিতই থাকিবে।

কবির এই উক্তি ত অস্বীকার যোগ্য নহে। আমার মানবত্বের সহিত জড়ত্বের যে অঙ্গাঙ্গীভাব, তাইত চেতনাকে চমকে চমকে আভাষে আভাষে পাইতেছি আবার মিলাইয়া যাইতেছে। চেতনা গঠিত সত্বার স্থির সৌদামিনীরূপ কই? সে বিজলীবরণ বালার পৃষ্ঠদ্যুতি এলায়িত ঘন কালকেশ জালের অন্তরাল দিয়াই চিরদিন দেখিলাম—এতদূর পথ অনুসরণ করিয়া তাহাকে ত ধরিতে—বাহুলীন করিতে পারিলাম না।

তা বলিয়া পাশ্চাত্যের কথাও সত্য নহে যে জড় ও চেতনের মধ্যে প্রাচীরের ব্যবধান। তাহাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, চেতন রহিত জড়ে কেমন করিয়া জীবনের সঞ্চার হইল, মাত্রস্পন্দনধর্ম্মী চেতন কীটাণু প্রভৃতিতে কেমন করিয়াই বা সুখ দুঃখ বোধ জন্মিল তাহার [illegible] সন্ধান পায় নাই বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না যে, জড়ে কীটে পশুতে মানবে অস্তিত্বের এক শৃঙ্খলে কোনওরূপে যোগ হইতে পারে না। তাহাদের দেশের আবহাওয়ায় মনের সংস্কার বশীভূত ধর্ম্মে কোনও সাধক কখনই অধ্যাত্ম রাজ্যে অপ্‌ তত্ত্বের উপর উঠিতে পারে নাই তাহাই বুঝি। বিদেশী শিখাইতে পারে না আর স্বদেশ শিখাইতে জানে না অতএব বিদ্যাটা আকাশ কুসুম তাহা নহে।

অমরের ধর্ম্ম—চেতন ধর্ম্ম, মর ধর্ম্ম জড় ধর্ম্মেরই যে পূর্ণতা নিহিত, তাহারই স্বাভাবিক সিদ্ধি এই বিরাট সত্য দিয়া প্রাচীন ভারত আপনাকে ধরিয়া এক করিয়া মহাভারত গড়িয়াছিল, বিশ্বকেও সে মহাবিশ্ব করিতে পারিত যদি দৈব প্রতিকূল না হইত। অন্তরের দৌর্ব্বল্যে ও বাহিরের আঘাতে তাহার প্রতিষ্ঠান ভিত্তি যদি না ধসিয়া পড়িত, তাহারই সভ্যতা

জগতের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হইত সন্দেহ নাই। দৈব প্রতিকূল বলিয়াই তাহা হইল না দৈব প্রতিকূল বলিয়াই ভারতবর্ষ এই হীনতার মধ্যে আপনার কর্ম্মক্ষয়ের জন্য নরক ভোগ করিতেছে। ভোগাবসানে তাহার পুরুষকার যে দিন এই নরক হইতে জাতিকে টানিয়া তুলিবে সেই দিন ভারত আবার বিধাতার অভিপ্রেত পক্ষে অগ্রসর হইবে।

কিন্তু বড় কথা থাক ছোট কথা লইয়াই বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছি ছোট কথাটীকেই পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিয়া তাহা শেষ করিতে হইবে। জড় ও চেতনের একত্ব অর্থে ইহা নহে যে জড় ও চেতন একই রূপ এবং গুণ বিশিষ্ট তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। জড় ও চেতনের একটা একতা অর্থাৎ সাধারণ সম্বন্ধ আছে তাহা আমাদের দেশের ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছেন ও তাহাই আমাদের মতে জড় ও চেতনের একত্ব।

সাধক যখন তাঁহার সমস্ত অনুভবকে এমন একটা অনুভবের মধ্যে সংযত করিয়া আনেন যাহা বিশ্বের প্রত্যেক অনুভবেরই মূল, তাঁহাদের প্রাণবৃত্তি যখন সর্ব্ব প্রাণীর প্রাণবৃত্তি পরিধির কেন্দ্রে আসিয়া স্থির হয় তখন তাঁহাদের সেই নিশ্চল অবস্থাটীর মধ্যে বিশ্বের সমস্ত চাঞ্চল্যের রূপ প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হন। জ্ঞান এবং চেতনা একই কথা। সাধক তখন যেন এমন এক অনন্ত প্রসারিত চেতনা পাইয়াছেন যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুরই চেতনা তাঁহার চেতনা তাঁহার চেতনার অন্তর্নিবিষ্ট।—এখানে বলিয়া রাখি, কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতা অবধি এই চেতনা সীমার বহির্ভাগে থাকে না।

আমার আরও স্পষ্ট কথা এই যে তর্ক-যুক্তি-স্মৃতি বর্ত্তমান আবহাওয়ায় যে গুলি শিক্ষিত মনের অলঙ্কার সে গুলি অনুভবকে অস্বীকার করিয়াই চলে। তাহার কারণ প্রত্যেক পদে অনুভবকে টানিয়া তুলিয়া যুক্তিকে সেই সঙ্গে অগ্রসর করিতে হইলে বিংশতি বর্ষ বয়সেই গোঁফ কামাইয়া চশমা পরিয়া বিশ্বতত্ত্বের পণ্ডিত সাজা চলে না। প্রকৃতির পাঠশালায় শিক্ষার্থী হইলে নিজের ইচ্ছামত বিদ্যারম্ভ ও শেষ চলে না। তিনি কবে যে কোন গ্রন্থ সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিবেন তাহার স্থিরতা নাই। তাহার উপর এই অব্যবস্থিত-মনা শিক্ষয়িত্রীর ছাত্রের প্রতি

আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য এত উচ্ছৃঙ্খল যে ছাত্রের ধৈর্য্য ধরা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

সম্ভবতঃ সেই জন্যই চেষ্টা সংস্কারকে লইয়া থাকিয়া যায়—সংস্কারের পর সংস্কার, এইরূপে খণ্ডতার দ্বারা খণ্ডিত হইতে থাকিয়া জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ ঘটিয়া উঠে না। মস্তিষ্ক যতই নস্যরাজি পরিপূর্ণ হউক হৃদয়ের ভিতর সে মানুষটী বরাবরই নিঃস্ব থাকিয়া যায় যে সমস্ত মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন ও অপরের সহিত আপনার অন্তরের চাওয়ার ধাক্কায় ক্রমাগতঃই বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

এবং আমার স্পষ্ট কথার শেষ এই যে নিঃস্ব নিঃসহায় বিক্ষিপ্ত মানুষটীকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া ভরাট ও সুস্থ ব্যক্তিত্বের উপর মনুষ্যত্বের আদর্শ খাড়া করিবার জন্যই ভারতের নিজস্ব সভ্যতা চেতন ধর্ম্মকে অবলম্বন কবিয়াছে। এই চেতনা একটা অতি বাস্তব কিছু নহে। কিংবা যদি সে অলৌকিক কিছুই হয়, আমাদের জড় লৌকিক সত্বার মধ্যেই তাহার বীজ নিহিত আছে। অনুশীলনের দ্বারা তাহা আমরা পরিপুষ্ট করিয়া লইতে পারি। চেতনা প্রাপ্তির জন্য লাফাইয়া স্বর্গে উঠিতে হইবে না। কবিত্বের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় স্বর্গ মর্ত্ত্য চিরকাল পাশাপাশিই থাকিবে, কেবল মর্ত্ত্য স্বর্গের রঙে রঙিয়া উঠিবে মাত্র।

সংস্কার লইয়া খেলা করিতেই হইবে কেবল তাহাদের লইয়া মজিয়া গেলে চলিবে না। হুঁষ রাখিয়া আপনার প্রভূত বলের আধার আত্মাটী আপন দখলে রাখা চাই। 'তাহার হাতে সব তুলিয়া দিই' এই বিবশ ভাবই আমাদের মারিয়া মৃত, জড়, অমৃতের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। জগৎ সংসার জড়, এখানে থাকা জড় লইয়াই থাকা, সমস্যা এই যে কেমন করিয়া আমরা জড় না হইয়া জড় লইয়া থাকিতে পারি। দেহ জড়, মনও ত জড়, ইহাদের কে কবে ছাড়িতেছি? ছাড়িতে বলিতেছিও না ইহাদের, কেবল—ইহাদের প্রভু করিতে হইবে চেতনাকে। ইহারা যাহার দ্বারা ধৃত হইয়া অবস্থান করে সেই ধর্ম্ম যেন চিরদিন চেতন থাকে, সে যেন জড় না হইয়া যায়—তাহা হইলে সমস্যার সমাধান হইল।

ইহাই ত অজপা। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নিঃশ্বাসে বাহির হইতেছে প্রশ্বাসে প্রলয়—লীন হইতেছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী সুষুম্নায় সে স্থির। কারণের মানস সরসে আত্মরূপী হংস ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাসিতেছে। মুখ একবার বামে আবার দক্ষিণে। সবই কি ঐ আত্মবিধৃত সত্ত্বার জড় ও চেতনের দুই স্তম্ভাভিমুখে দুলিয়া দুলিয়া হিন্দোল নয়?

সংসার।

(শ্রীঅজিত কুমার সরকার)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনে করিয়াছিলাম সংসারের জ্বালা জুড়াইতে উহার সংশ্রব ত্যাগ করিব। কিন্তু যাহাকে লইয়া জ্বালা সেত সঙ্গেই, তবে সংসারের দোষ কি? যে মন আমায় এখানে পোড়াইতেছে,—জগতের সকল স্থানেই ত সে পোড়াইবে? তবে আর কোথায় যাইব? যদি শান্তি বলিয়া কিছু থাকে এইখানে বসিয়াই পাইব। কই—পাইবার জন্য আমি কি চেষ্টা করিয়াছি? কোন সাধনাই ত এতদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও করি নাই? যাহার জন্য কত মনীষী কত শীতাতপ, কত ক্ষুধার জ্বালা, কত শোক দুঃখ পদদলিত করিয়া,—কত বিনিদ্র রজনী এক মনে-প্রাণে বসিয়া তপস্যা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহার জন্য আমি কি করিয়াছি? না—যেখানে ছিলাম সেইখানেই যাব। কর্ম্মত্যাগী ভীরুর শান্তি কোথায়? যাই থাক অদৃষ্টে, আমি কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ করিব না। ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে বিনয় অবসাদগ্রস্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কিন্তু একটু পরেই ঝি আসিয়া ডাক্ দিল—"বাবু! দরজা খুলুন বেলা হয়েছে।" তারপর উঠিয়া মুখ হাত ধুইতেই—ঠাকুর জলখাবার লইয়া আসিল। বিনয় জল খাইয়া তাহার দরকারী বই এবং

অন্যান্য জিনিষ কিনিতে দোকানে গেল। অনেক রকম বই দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল,—শান্তি একদিন তাহার কাছে 'দময়ন্তী' আর 'শকুন্তলা' বই দুইখানার খুব প্রশংসা করিয়াছিল। সে একটু ভাবিয়া সেই বই দুইখানা কিনিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে আর একখানা বইএর উপর তাহার নজর পড়িল। সেখানা নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র'—অনেকদিনের পড়া বই। যদিও পুরাতন তবুও খুলিয়া দেখিতে দেখিতে একটা স্থান আবার আজ বড় ভাল লাগিল। মনে হইল যেন এ জায়গাটা নূতন! অমর কবির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নূতন বৈকি। সে যে পুরাতন হইলেও চির নূতন! বুঝিবার মত হৃদয় থাকিলেই হইল,—শুধু পাণ্ডিত্য তাহা অনুভব করিতে পারে না। সে বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রখানা কিনিয়া লইল। এক এক খানা করিয়া অনেক বই লইয়াছিল কিন্তু যখন হিসাব করিয়া দেখিল অত সম্বল তার নাই—তখন একটু লজ্জিত হইয়া কতক বই ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। দোকানের কর্ম্মচারিটী একবার তাহার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল—"পয়সা নেই কিন্তু বই বাছবার সখ বেশ আছে।" একথার প্রতিধ্বনি অবশ্য বিনয়ের কাণে গেল, কিন্তু উপায় কি দোষ ত তাহারই!

তারপর বইএর বোঝা লইয়া যখন সে মেসে ফিরিল তখন দশটারও বেশী বেলা হইয়াছে। কলে আর জল ছিল না, কাজে কাজেই চৌবাচ্চার অবশিষ্ট জলটুকুতে কোন রকমে স্নান সারিয়া খাইতে বসিল। নূতন বাবু মেসে আসিয়াছেন, বিশেষতঃ বড় লোকের ছেলে দাদাবাবুর নিজের লোক। সুতরাং কিছু পুরস্কারের আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া ঝিঠাকুরুন বিনয়ের কাছে বসিয়া স্নেহভরে বলিল "হাঁগা বাবু! আপনার কি খাওয়ার চিন্তেও নাই? কত বেলা হল আমি ভাবছিনু যে কোথায় গেল! অমনি একটা বইএর মোট আপনি আন্‌লে, আমায় বল্‌লে ত আমি সঙ্গে যেতাম। আ-হা-হা অত ভারী মোটটা আন্‌তে মুখখানা শুকিয়ে গেছে। পোড়ারমুখো বামুনটাকে বল্‌লাম —বলি বাবুর জন্যে মাছের মাথাটা রেখে দে। তা রেখেছে কিনা

শুধুই কাঁটা। আমর মিন্‌সে! কেবল আপনাই চিনিস? হাঁগা বাবু! তোমার ঘর কোথা 'গা? দাদাবাবুর গাঁয়ে নাকি?" ঝির ব্যাকুলতা দেখিয়া বিনয়ের হাসি পাইতেছিল, কিন্তু তাহা কষ্টে চাপিয়া বলিল,—হাঁ, ঐ কাছেই আমার বাড়ী। দাদাবাবু আমার নিজের লোক।" "আহা দাদবাবু বড় ভাল লোক। উনার দৌলতেই আমাদের কোন কষ্ট নাই। তোমাকেও ত ঐ রকম দেখ্‌ছি বাবু। আর যত ছোঁড়াগুলোকে দেখ্‌তেছ, কেবল হাসি আর ঠাট্টা! আমি যেন আর মনিষ্যি নই!" ইত্যাদি প্রকার আদর অভ্যর্থনার মধ্যে বিনয়ের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শরীরটা একটু খারাপ হইয়াছিল এবং ঘুমও পাইতেছিল, কাজে কাজেই মুখ হাত ধুইয়াই শুইয়াই পড়িল। কিছুক্ষণ পরে ঝি একবার বোধ হয় পান লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তখন তাহার আর কথা বলিবার শক্তি ছিল না—তাই কি একটা অস্বাভাবিক উত্তর দেওয়ায় ঝি বলিতে বলিতে ফিরিয়া গেল যে,—"বাবুদের ঘুম কি পোষা নাকি গা? পড়ল আর এল!"

বিনয়ের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় তিনটা। নরেন এই মাত্র কলেজ হইতে আসিয়া একটু গুরুগম্ভীরস্বরে ঝি ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিতেছিল, তাহারই আওয়াজে সে জাগিয়া উঠিল, এবং দেখিল নরেনের হাতে একখানা চিঠি। সে বার বার সেখানা পড়িতেছে। "কার চিঠি নরেনবাবু?" বলিয়া বিনয় আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। নরেন বলিল,—"বাবা লিখেছেন। আপনারও একখানা চিঠি আছে এই নিন।" বলিয়া সে একখানা খামে মোড়া চিঠি বিনয়ের হাতে দিল। বিনয় দেখিল চিঠিখানা কিশোরমোহন বাবুর লেখা। নরেনদের মেসের ঠিকানায় তাহারই c/o দিয়া বিনয়কে লেখা হইয়াছে। চিঠিখানি খুলিয়া দেখিল তাহার ভিতরে দুইখানি চিঠি। একখানি কিশোরীমোহন বাবুর, আর একখানি একটা ছোট খামে মোড়া শান্তির চিঠি। প্রথম চিঠিখানি পড়িয়া দেখিল, তিনি লিখিয়াছেন,—"তুমি স্কুলের কয়েটী দরকারী জিনিষ আনিতে কলিকাতা যাইতেছ, এই কথা আমায় বলিয়াছিলে, কিন্তু যাওয়ার পর হেড্‌ পণ্ডিত মহাশয় আমাকে তোমার

ছুটীর দরখাস্ত দেখাইলেন। বলিতে কি তোমার এ ব্যবহারের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি গোপনে চলিয়া যাওয়াতে আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত। আশা করি শীঘ্র এখানে আসিবে। দুই চার দিনের মধ্যে স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টর মহোদয় আস্‌ছেন তোমার উপস্থিত থাকা নিতান্ত দরকার” ইত্যাদি।

এই চিঠিখানি বন্ধ করিয়া সে দ্বিতীয় খানি খুলিয়া পড়িল। সে লিখিয়াছিল, “বিনু দা! আপনি কলিকাতা যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করেন নি কেন? বোধ হয় কোন জিনিষ বরাত কর্‌ব সেই ভয়ে নয় কি? বাবার কাছে শুন্‌লাম—আপনি নাকি ভিতরে ভিতরে ছুটী নিয়েছেন, আর এখানে আস্‌বেন না। কেন? আপনার বোধ হয় এখানে খুব কষ্ট হয়, তাই? না আমরা কোন দোষ করেছি? যদি দোষই হয়ে থাকে, তার কি আর ক্ষমা নেই? আপনিই ত কতদিন বলেছেন ক্ষমা আর ধৈর্য্যই মানুষের প্রধান গুণ। তবে আপনি আবার এমন করলেন কেন? আমিও সকল সময়েই আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি সে সব কথা ভুলে যাবেন। আপনার যদি কোন বিষয়ে এখানে কষ্ট হয় সে কথা ত খুলে বলেন না। আপনি চলে যাওয়ায় ভাল লাগে না। আপনার কথা প্রায় সকল সময়ই মনে হয়। যদি বাবার অনুরোধ রাখেন, অন্ততঃ আর একবার এখানে আস্‌বেন। আস্‌বার সময় আমার জন্য সেই ছবিখানা আর দুই একখানা ভাল বই নিয়ে আস্‌বেন। ইতি। আপনার স্নেহের—শান্তি।

চিঠিখানা পড়িয়া বিনয়ের মনটা আরও নরম হইয়া গেল। সে আর রুদ্ধ বেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সমস্ত বুকটা কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সবেগে বাহির হইয়া গেল। ভাবিল,—মানুষ অপরের মনের কথা না বুঝিতে পারিয়া কি ভ্রমেই পড়ে। যাহাদের কাছে আমি জীবনের প্রথম আদর যত্ন পাইয়াছি, যাহাদের সুখ সুবিধার জন্য আমার সব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, বাহিরের ব্যবহার দ্বারা আজ সেখানে একটা কি প্রচণ্ড আঘাতই না দিতে বসেছি। আমার ভাল মন্দ যাহারা এত চিন্তা করিয়া থাকে, শুধু আমারই জন্য তাহাদিগকে

কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে, ভবিষ্যতে আরও কত হইবে! কিন্তু কেমন করিয়া একথা বুঝান যায়? মনে করিয়াছিলাম ও সংস্রব পরিত্যাগ করিব, কিন্তু তাহার ফল ত বেশ শান্তিপ্রদ হইল না? দুইখানি পত্রেই অভিমানের ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। না জানি তাঁহারা আমায় কি কৃতঘ্ন ভাবিতেছেন? না। সেইখানে থাকিয়াই এ সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া নরেনকে বলিল—নরেনবাবু! চলুন তবে কাল বাড়ী যাওয়া যাক্। আপনি কি দুই একদিন ছুটি নিতে পারেন না?" এই কথা শুনিয়া নরেন একটু উৎসুক ভাবে বলিল,— "এযে মহা সৌভাগ্য দেখ্ছি! সঙ্গে সঙ্গেই বৈরাগ্যের জোয়ার ভাটা পড়তে আরম্ভ হল! তা বেশ ছুটির জন্য কিছু যায় আসে না, তবে যদি প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারি। তারপর আমার এক বন্ধুর এই সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবার ইচ্ছা আছে। তার নিজের, আর একটী ছোট বোনের একবার পাড়াগাঁয়ে বেড়াবার ইচ্ছা হয়েছে। চলুন না দেখে আসি তাদের কি মত হয়? হেঁদোর পাশেই তাদের বাড়ি।" বলিয়া দুই জনেই প্রস্তুত হইল, এমন সময় ঠাকুর জল খাবার লইয়া হাজির। কাজে কাজেই জলযোগের পর দুইজনেই বাহির হইয়া পড়িল।

নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠস্থাপনা

২

৩রা বৈশাখ—মঙ্গলবার

সকালে আন্দাজ বেলা নয়টার সময় মুড়ি, গুড়, চা ইত্যাদি জলখাবার পাওয়া গেল। বন্দোবস্ত খুবই ভাল হইয়াছিল। তাহার পর কাজের পালা আরম্ভ। এক একজন সন্ন্যাসী নেতার অধীনে বিভিন্ন কয়েকটী পৃথক বিভাগ গঠিত হইল। যথা, পূজা বিভাগ, রন্ধন বিভাগ, ভাঁড়ার, পরিবেশন, কুটনাকোটা, জলতোলা, ইত্যাদি। সাধারণ তত্ত্বাবধায়কও

ছিলেন। এই পদ্ধতিতেই উৎসবের পরদিন পর্য্যন্ত কাজ চলিয়াছিল। গরমের দিন—জলের প্রয়োজন খুবই বেশী। 'ডাক বসাইয়া' বাল্‌তির সাহায্যে আজ কূয়া হইতে জল তোলা হইল।

মাতৃতীর্থে আজ দিনের বেলা প্রায় দুই শতের উপর ভক্ত অন্নপ্রসাদে পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া মন্দিরের পিছনে পশ্চিমধারে লম্বা ছাউনীতলায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন প্রায় সাড়ে বারটা। অতগুলি লোকের আয়োজন খুবই সকাল সকাল হইল বলিতে হইবে। ধীরে—গম্ভীরে—একতানে গগনধ্বনিত করিয়া দুইশত সন্তান পরব্রহ্মে অন্ন আহুতি দিলেন—'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ইত্যাদি।' তাহার পর 'সোম্‌' পড়িল—কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। অনেকগুলি পংক্তি একজায়গায় একত্রিত। সশব্দে তাহার পর ভোজন চলিতে লাগিল। আমাদের 'উপু-দা' বাড়ীর বড়কর্ত্তার মত সকলকে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন—যাহাতে সকলে পরিতৃপ্ত আহার করেন, অথচ প্রসাদ কেহ অতিরিক্ত লইয়া নষ্ট না করেন—সে সাবধান-বাণী বিশেষ জোরের সহিতই প্রকাশ করিলেন। চাঁচা-ছোলা সাফ্‌ বুলি। যাহাদের অল্পবয়স, দাদার সেই গুরুগম্ভীর রবে তাহাদের পেটের পিলেগুলি বোধহয় চমকাইয়া গেল। ভাত, ডাল, কুমড়ার সুস্বাদু ছক্কা, চর্চ্চড়ী, মাছের কালিয়া—ইত্যাদি আসিতে লাগিল। উপু-দা সাধুভক্তদের পঙ্গৎ-ভোজনের সময় বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকল প্রাণে পুলক সঞ্চার করিলেন। প্রত্যেক কলির পর সকলে সমস্বরে সোৎসাহে 'হাঁ' বলিয়া তাহাতে 'রসান' দিলেন—বিকট সে 'হাঁ'। বাল্য-কালের কথা মনে পড়িল। এক পাদরী অধ্যাপকের পাল্লায় পড়া গিয়াছিল। তিনি 'পবিত্র বাইবেল ক্লাস' লইবার পূর্ব্বে প্রত্যহ ভগবানের কাছে জোড়করে মুদ্রিতনয়নে একটী প্রার্থনা বলিতেন—'হে ভগবন্‌! আমরা অত্যন্ত পাপী, পাপেই আমাদের জন্ম, আমরা অতি নরাধম, ইত্যাদি।' তাঁহার প্রার্থনা কখন্‌ শেষ হইবে তাহারই অপেক্ষায় আমরা দুই শতেরও অধিক 'দুষ্ট' ছাত্র পূর্ব্ব হইতে গলা শানাইয়া বসিয়া থাকিতাম—শেষ হইবামাত্র সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতাম 'আ—মে—ন' (Amen)। ছেলেদের বেয়াদবীতে পাদরী চটিয়া লাল হইতেন। এক্ষেত্রে

অবশ্য রাগারাগি ছিল না। কেবল অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। উপু-দার শ্লোক-ভাণ্ডারে হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা, নানা ভাষার নানা সামগ্রী আছে। যেটী সকলের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দপ্রদ হইয়াছিল এবং যেটী বারম্বার শুনিয়াও আমাদের আশা মিটে নাই সেটী এই স্থানে দেওয়া গেল—

"দক্ষযজ্ঞ শূলপাণি যেমতি নাশিল,
একক স্বামীজী যথা চিকাগো মথিল,
একক ভীমসেন যথা কৌরব-সমরে,
একা পার্থ জয়ী হল কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে—
তাইত পাশব বলে ভয় নাহি হয়,
পরমেশ পদে যদি মতি-গতি রয়,
ইঙ্গিতে উড়াতে পারি বিচিত্র সংসার,
সে শক্তি রোধিতে পারে হেন সাধ্য কার?"

—একটী সজোর তুড়ির সহিত দাদা আবার বলিলেন—'ইঙ্গিতে উড়াতে পারি—'! লেখায় কণ্ঠস্বর ধরিয়া দিবার উপায় নাই, নতুবা দেওয়া যাইত। উপুদার সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি ও হাবভাব সহ ইহার আবৃত্তি স্বকর্ণে শুনিয়া উপভোগের বস্তু! শুনিয়াছি এ কবিতাটী দাদারই দেওয়া ভাব অবলম্বনে মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত।

এইরূপ সরস বাক্যপ্রসাদ বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন মনে পরম-আনন্দে সকলে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। ভোজনশেষে বার বার জয়ধ্বনি করিয়া সকলে পংক্তি ভাঙ্গিয়া উঠিলেন।

তাহার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম। দারুণ গরমে দুপুরবেলা বাহিরের কোন কাজকর্ম্ম করা চলে না। কিন্তু সূপকারদের ছাড়ান ছিল না—রন্ধনের জন্য অনেকক্ষণ জ্বলন্ত চুল্লীর নিকট বসিয়া ঝলসিতে হইয়াছিল।

বৈকালে আবার কর্ম্মপ্রবাহ ছুটিল। যিনি যে বিভাগে নাম লিখাইয়াছিলেন তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে চলিয়া গেলেন এবং পরম উৎসাহে কার্য্যে যোগদান করিলেন। 'মরদ্ কি বাৎ হাতী কি দাঁত'—সুতরাং একবার যেকথা দেওয়া হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত উহা পালনই কর্ত্তব্য। সকলেই আপনাপন নেতার আজ্ঞাবহ।

মন্দিরের সামনে উত্তর-দক্ষিণে যে লম্বা রাস্তা—তাহারই মাঝামাঝি পশ্চিমদ্বারী শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর বাটী। এই বাটী নির্ম্মাণের সময় যাঁহারা ব্যাধি-অনিয়ম-বাধা-বিপত্তি সব সহিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজন—যাহাকে আমরা হারাইয়াছি সেই—পূজনীয় ব্রহ্মচারী রূপচৈতন্যজী বা হেমেন্দ্র মহারাজকে মনে পড়িল। বাটীসংলগ্ন বাহিরের ঘরে বা শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মণ্ডপে আচার্য্যের আসন প্রস্তুত হইবে। বাড়ীর ভিতরে তিনখানি ঘর—একটী উঠান। বাটীর দরজায় ঢুকিয়া বামহাতেই শ্রীশ্রীমায়ের ঘর। পুণ্য—পবিত্র। বাটীর উঠান, মেজে, চাতাল—সমস্তই অধুনা সিমেণ্টে বাঁধান। কিন্তু তিনি চিরকাল বর্ষায় কাদাভরা উঠান লইয়া নীরবে সকল অসুবিধা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। আটাশ সালে ঐসকল বাঁধান হয়—তাহার পূর্ব্বেই তিনি অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং উহার কিছুকাল পরে স্বধাম প্রয়াণ করেন। কাজেই স্থূলদেহে এই বাড়ীর বর্ত্তমান সৌষ্ঠব তিনি দেখিয়া যান নাই। তাঁহার ঘরের দাওয়ার কুলুঙ্গীটীতে বোধ করি স্থানীয় কোন শিল্পীর গড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের একটী সাদামূর্ত্তি বসান রহিয়াছে। ভিতরে মাঠ-কোঠা, কাঠের উজ্জ্বল পালিশ করা তক্তার ছাদ। ছোট সিঁড়ি দিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিলাম, নানা প্রকার জিনিষপত্র সেখানে সুরক্ষিত। ঘরের উত্তর দেওয়ালের গায়ে বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের আলেখ্য স্থাপিত আছে। ঘরখানি যেমন সজ্জান থাকিত সেইরূপই রহিয়াছে। অসংখ্য ভক্ত সন্তান সেই পবিত্ররজে মাথা লুটাইয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছে। স্থান-মাহাত্ম্য অদ্ভুত—স্মৃতি সেখানে তাঁহাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। একে একে শ্রীশ্রীমায়ের অপরূপ জীবন কথা মনে হইতে লাগিল। তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা, সংযম, সরলতা, পবিত্রতা সর্ব্বোপরি তাঁহার আপামর সাধারণে অহেতুক করুণার কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে এক নিরাবিল আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ধন্য তাঁহারা যাহারা জীবদ্দশায় শ্রীশ্রীজগদম্বার করুণাঘন বিগ্রহ মায়ের দর্শন ও পদাশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

বৈকালে বৈঠকখানা ঘরের দেওয়াল, আলমারী-জানালা-দরজার গা, মেজে—সব ঝাড়া-পোঁছা হইয়া গেল। সকলের মা যিনি তাঁহার কাজে কর্ম্মীর অভাব নাই।

চা-আদি পান করিবার পর সকলে মিলিয়া নদীপারে আচার্য্যকে বরণ করিয়া আনিতে ছুটিলেন। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু বাকি। অতগুলি লোকের যিনি মাথার উপর, যিনি সকলের বল-বুদ্ধি-উৎসাহ, যাঁহার যুক্তি-পরামর্শ-আদেশে এই বিরাট অনুষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার আগমনে কর্ম্মী যাঁহারা—তাঁহারা সকলে বুকে জোর পাইলেন। ক্রমে আনন্দে উৎফুল্ল অগ্রগামীর দল দেখা দিলেন। 'স্বাগতম্' বলিয়া অভিনন্দন করা হইল—সকলেই উল্লসিত। সহাস্য আনন, কণ্ঠে অফুরন্ত কথাবার্ত্তা। যিনি যাঁহার আশায় অনুক্ষণ খোঁজ করিতেছিলেন, বিশেষ প্রতীক্ষায় ছিলেন—তিনি তাঁহাকে এই বড় দলে খুঁজিয়া বাহির করিয়া খুসী হইলেন। আচার্য্যের আসিয়া পৌঁছিতে ও তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বৈঠকখানা ঘরে আসন লইতে রাত্রি হইয়া গেল।

অতগুলি লোক থাকিলেও সন্ধ্যার সঙ্গে একটী গম্ভীর নিস্তব্ধ ভাব চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল। আঁধারের বুক চিরিয়া মন্দিরের পশ্চিমে সাধুদের আশ্রম বাটীর দোতালার ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারাতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিল, চারু-চামর মৃদু দুলিল। আরাত্রিক গান ও স্তবপাঠ হইল। অনেকগুলি কণ্ঠ একত্র একস্থানে বসিয়া ভাবের সহিত কীর্ত্তন-ভজন আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে কিয়ৎকাল বিশ্রামাদির পর আচার্য্য মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিলেন এবং নীচে রান্না ঘরের নিকট চাতালে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সব পরিদর্শনাদি করিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ভক্তও তথায় মিলিত হইলেন। আচার্য্য ঘরের ভিতরে মাদুরের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং অপর সকলে সম্মুখেই দাওয়াতে বসিয়াছেন। বাঁকুড়ার চিকিৎসা-পারদর্শী স্বামী মহেশ্বরানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের বড় আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী অসুস্থা শ্রীমতী রাধারাণীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শ্রীমতীর শরীর সম্বন্ধে সকল

পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর লইলেন। ২৮শে চৈত্র শ্রীমতী বাঁকুড়া হইতে এখানে আসিয়াছেন।

ভক্তেরা সকলে এক এক করিয়া আসিয়া নিঃশব্দে আচার্য্যকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি মাথায় হাত দিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। একজন আসিয়া এই সময়ে তাঁহাকে প্রসাদী মাল্য পরাইয়া বরণ করিয়া গেলেন। ধর্ম্ম ও কৃপাপ্রার্থীরা করজোড়ে তাঁহাদের প্রাণের আকাঙ্খা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের সেই শুভ-ইচ্ছায় তিনি সম্মতি দিলেন। বালক, যুবা, বৃদ্ধ যিনিই আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন কাহাকেও বিফল করিলেন না। কেহ ফিরিল না।

কথাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর হইতে আসিবার দিনে তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া কোয়ালপাড়ার পথে মধ্যরাত্রে যে বিভ্রাট বাধিয়াছিল সে কথা বলিলাম। সকলে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর পূজনীয় বিশ্বেশ্বরানন্দজীর সহিত এই কয়দিনের পূজাদি কি ক্রমে সম্পন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিল। স্থির হইল বুধবার ঋদ্ধি-সিদ্ধিদাতা শ্রীগণপতির পূজামাত্র সম্পন্ন হইবে এবং বৃহস্পতিবার আনুষঙ্গিক দেবদেবীসহ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র বিশেষ প্রতিষ্ঠাপূজা হইবে। ব্রতগ্রহণেচ্ছুগণের সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্য্যাদি সংস্কার তাহার পর।

ক্রমে ভোগের ঘণ্টা পড়িল। গত রাত্রের অপেক্ষা আজ ভক্ত সংখ্যায় পংক্তি সমধিক পরিপুষ্ট। যাঁহারা আজ নূতন আসিয়াছেন তাঁহাদের শুইবার বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে সারাদিবসের কর্ম্ম-কোলাহলের পর ক্লান্ত দেহ লইয়া কর্ম্মিবৃন্দ গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

বুধবার, ৫ই বৈশাখ

কাল রাত্রে দাওয়ায় দুই তিন জন শুইয়াছিলেন, আমাদের পাঁচজনকে ঘরের ভিতরেই থাকিতে হইল। মশার ভয়ে মশারী লইয়াছিলাম। সেগুলি খাটাইবার পর গরমের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইল। তাহা ছাড়া আমাদের সেই কালীঘরে জানালা বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। কোন প্রকারে পড়িয়া থাকিবার মত স্থান পাইয়াই সকলে সন্তুষ্ট। কষ্টস্বীকার ও অসুবিধাভোগের জন্য সকলেই প্রস্তুত। আজ সকালে

আর সেরূপ ঠাণ্ডা হাওয়া পাইলাম না। ক্রমে আবার আমোদর পথে গতায়াতের পালা সুরু হইল।

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আসিয়া পূর্ব্বদিনের মত মুড়ি-গুড়সহ চা জলপানাদি মিলিল। অতঃপর আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ লইয়া কর্ম্মীরা যাহাতে আগামী কল্যের মহাকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া যায় প্রাণপণে তাহার সকল বন্দোবস্ত সরঞ্জামাদি শেষ করিয়া রাখিবার জন্য একান্ত তৎপর হইলেন। আসল দিন ভালয় ভালয় কাটিয়া যাইলে হয়।

কোন ব্রত বা পূজা করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে সংযম সাহায্যে মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। আজ মাতৃ-মহোৎসবের পূর্ব্ব দিবস। মাতৃপূজার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার দিন। মাতৃ-অর্চ্চনার শুভ-সংকল্প করিবার দিন। ব্যষ্টিভাবে সমষ্টিভাবে আমাদের সকল অপারকতা তাঁহাকে জানাইবার দিন। আজ জগন্মাতার শ্রীচরণে আপনাপন অন্তরের জমাট জ্বালা জানাইবার দিন। আজ আমাদের যুগযুগসঞ্চিত ভ্রাতৃবিচ্ছেদরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দিবস। নিজের সকল দৈন্য, অক্ষমতা, কর্ম্মবিমুখতা দূর করিবার জন্য মাতৃপদে শক্তিভিক্ষার দিন। বাহিরের সকল চাঞ্চল্য দূরে ফেলিয়া আজ আত্মপরীক্ষায় রত হইবার দিন। মনকে অন্তরকে স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তাবহ্নিতে পুড়াইয়া খাঁটীসোণা করিবার দিন। আজ অস্পৃশ্য-পদদলিতদিগের দুঃখদৈন্যের সহিত হৃদয়ের সমবেদনা ও তাহার প্রতীকার বিধানের উপায় উদ্ভাবনের দিন—আর আজ সংযম উপাসনার সাহায্যে আত্মস্থ হইয়া আত্মচিন্তা করিবার দিন। ভিতর হইতে কে বলিল—রে মূঢ়, মায়ের স্মৃতিভরা এই পীঠস্থানে—তীর্থক্ষেত্রে বাজে জল্পনা ছাড়িয়া এই সকল চিন্তা মনে আন্। কারণ যাহার যেমন ভাবনা সিদ্ধিও তাহার তেমনি। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইলে—সমবেতভাবে কাতরে তাঁহাকে ডাকিলে শতাব্দীর মেঘান্ধকার নিমেষেই কাটিয়া যাইতে পারে।

কূয়ার ঠাণ্ডাজলে স্নান করিয়া দেখা গেল—আমোদরে অবগাহন-স্নানের তুল্য আরামপ্রদ নহে। কুটনাকোটা, জলতোলা ইত্যাদি গতকল্য-কার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদাকারে আজ হইল,—ভক্ত সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি

হইতে লাগিল। আজ আরামবাগ, বিষ্ণুপুর, কোয়ালপাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভক্তেরা দলে দলে আসিতে লাগিলেন। অন্নপ্রসাদাদি পাইবার পর সকলের খানিকক্ষণ বিশ্রাম হইল।

আজও আশ্রম গৃহেই নিত্যপূজা হইল। আচার্য্যের আদেশমত অদ্য স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী বোধন-পূজা আরম্ভ করিলেন। ইহাকে এক হিসাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্য্য বলা যাইতে পারে। ঘটস্থাপনা হইল—ষোড়শোপচারে শ্রীগণপতি ও পঞ্চদেবতার পূজা হইল।

নব-মন্দিরের বিগ্রহ—শ্রীশ্রীমায়ের সুবৃহৎ একখানি তৈলচিত্র আজই সময় থাকিতে থাকিতে বসান হইল। মৃগচর্ম্মাসীনা জপরতা মা—নানা বর্ণে রঞ্জিতা—বক্ষোপরি আলুলায়িত চাঁচর চিকুর—পরণে শুভ্র লালপাড় শাড়ী—সীমন্তে সিন্দুর রেখা—হস্তদ্বয়ে স্বর্ণ বলয়। সৌম্য শান্ত জীবন্ত রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি। প্রথম জীবনের আলেখ্য। শিল্পীর তূলিকা সার্থক। মাতৃমূর্ত্তি বসান হইলে শ্রীমন্দির অপূর্ব্ব শোভায় ভরিয়া উঠিল।

এই বৃহৎ আলেখ্যখানি যাঁহার সাধের জিনিষ ছিল, যিনি অন্তিম রোগ-শয্যায় শুইয়া মাথায় শিয়রে ইহাকে সযত্নে রাখিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে উহা দেখাইয়া তাঁহারই একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং যে একদিন উহাতে একটী ফুল ফেলিয়া পূজা করিয়াছিলেন—গর্ব্বের সহিত সে কথা বলিয়াছিলেন—(আজিও মাঝে মাঝে সে স্বর কাণে বাজিতেছে)—জননীর বড় স্নেহের সন্তান—আমাদের পরমপ্রিয় ৺ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আজ এ সময়ে বিশেষ করিয়া মনে পড়িল। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বলিবার কথা নহে। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয় ও মন্দিরের জন্য তিনি প্রাণ দিয়া বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

গতকল্য সন্ধ্যার পর একটী বড় মজার কথা কাণে পৌঁছিয়াছিল। আমাদের দাওয়ার ঠিক সমক্ষে রাস্তার পশ্চিমধারে একটী বৈঠকখানায় এইগ্রামের কয়েকটী লোক সারাদিনের কাজকর্ম্ম সারিয়া একত্র সকলে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। পরস্পরে মনখোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। একজন হঠাৎ অন্যকথার পিঠে বলিয়া উঠিলেন—'ই শ্লারা কত আসে রে—ক'লকেতার সারা সহরটাকেই

কি টেনে লিয়ে আসবেক্ ?' এই সময় অপর একজন বলিলেন,—'আরও এখনও দু'দিন ধরে আসা চল্‌বেক।' আমরা তখন অন্ধকারে দাওয়ার উপর বসিয়াছিলাম। কথাগুলি শুনিয়া আনন্দই হইল। সেদিন আমরা মাত্র জন পঞ্চাশ আসিয়াছিলাম। আজিকার সংখ্যা আরও বেশী —ইঁহারা কি ব'লেছেন কে জানে? অবশ্য এ ক্ষেত্রে 'শালা' শব্দ বড় মিঠে—আদরের বুলি—মানহানির মামলা করা চলে না!

বৈকালে আজ আমাদের দাওয়ায় একটী ছোটখাট সাহিত্য সম্মেলন গোছের হইল। ডাক্তার শ্যামাপদ বাবু 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত জনৈক অধ্যাপকের লিখিত শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর উপর একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া এই প্রসঙ্গে নানা আলোচনা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর আচার্য্যের নিকট যাইয়া খানিকটা বসা হইল—সারাদিনে কোথায় কি কি হইল এবং আগামী কল্যকার মহোৎসবে কি ভাবে কাজ হইবে তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। সে সময়টুকু বড় শান্তির।

আচার্য্যের নিদেশমত আজি সময় থাকিতে থাকিতে মহোৎসবের মহানন্দোপলক্ষে কামারপুকুরের দেব-পরিবারের জন্য * নববস্ত্রোপহারের সম্ভার লইয়া জনৈক সেবক তথায় ছুটিলেন। ঐ সঙ্গে জয়রামবাটীর মাতুল-পরিবারের † সকলকেও নববস্ত্রাদি দেওয়া হইল। সকলেই পরিতুষ্ট।

আরাত্রিকাদির পর আজ রাত্রে মন্দিরের বিস্তৃত দালানটী বেশ জম-জমাট হইয়াছিল। সারাদিন কর্ম্মযোগ সাধনের পর একটী সুবৃহৎ চক্র রচিয়া ভক্তি অর্জ্জনের জন্য প্রাণমন ঢালিয়া সেবকগণ ভজন আরম্ভ করিয়া দিলেন। নিস্তব্ধ যামিনী—বাহিরে চারিধারে ঘন-অন্ধকার। কেবল মন্দির-প্রাঙ্গণ নানা দীপের আলোয় ভাস্বরোজ্জ্বল। মনে হইল

* কামারপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থান। জয়রামবাটী হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধান। তথায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় এখনও সপরিবার বাস করিতেছেন।

† শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতৃপরিবার।

সংসার হইতে অতি দূরে ইন্দ্রের এই অমরা—এখানে শান্তসৌম্য মূর্ত্তি গৈরিকবস্ত্রাবৃত যুবা যোগিগণ সুর-সাধনায় আপনাদের ধ্যেয় ইষ্টবস্তুলাভে তন্ময়—বিভোর। গ্রামবাসী সকলেই সে দৃশ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ—ছোট ছেলেরা' দুষ্টামী গোলমাল ভুলিয়া নির্বাক-নিস্তব্ধ হইয়া মন্দিরের সারি সারি ধাপ-গুলির উপর চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। ভিতর হইতে ভাবের স্রোত আসিয়া অনুক্ষণ সকল শ্রোতার প্রাণমন স্পর্শ—পুলকিত করিতে লাগিল। অন্তরে অনুক্ষণ মাতৃচিন্তা চলিতে লাগিল। পাটনা হইতে আগত স্বামী-দ্বয়ের গলা বেশ মিলিয়াছিল—ভজন সুন্দর জমিল।—

"জাগো, ওগো দয়াময়ী জননী, তব মন্দির-দ্বারে আজি মিলিত যত সন্তান-গণ * *॥" "করে আশীষ তুলি পুণ্যপাণি, শুনাও সন্তানে অভয়বানী * *॥" "পুলক-উৎসবে হোক পরিপূরিত তব দীন ভবন।"

"আয়রে আয়, ও জগতবাসি,
তোরা দেখে যা একটী বার আসি,
আমার জননীর রূপরাশি পরাণ ভরে।—* * *॥"

'আবার আঁখর চলিল—'ওগো আমার জননীর রূপরাশি পরাণ ভরে।

এইরূপে একের পর আর ভজন চলিতে লাগিল। ভজনানন্দে গা ভাসাইয়া সকলে বিহ্বল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া ভজন সাঙ্গ করা হইল এবং পংক্তি বসাইবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। রাত্রে সকলে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদের সহিত পংক্তিভোজন শেষ করা গেল। আনন্দের উৎস উপু-দাও উপস্থিত ছিলেন।

আজ ভিড় বেশী হওয়াতে আমাদের দাওয়ার উপরে দুই-চারিজন অধিক ভক্তসমাগম হইল। ঘরের ভিতর গরমে বড় কেউ প্রবেশ করিতে চান না। তা ছাড়া তথায় 'ন স্থানং তিলধারণং।' দাওয়ার একপাশে জনৈক কৌতুকপ্রিয় স্বামীজী তাঁহার অপেক্ষাকৃত স্থূলশরীর কোনপ্রকারে রাখিবার একটু স্থান সংস্থান করিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার আসিবার পথের নিষ্ঠাবান সেবক আসিয়া একটু স্থানের জন্য কাতর মিনতি জানাইল। এ যেন লোকঠাসা রেলগাড়ীতে 'মশাই গো অনুগ্রহ ক'রে

একটু সরবেন—দাঁড়িয়ে যাব' বলিয়া ষ্টেশনে আরোহীর আক্রমণ! তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সাধুজী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"দ্যাখ বাপু, সন্ধ্যা হয়ে এলো। তা'র ভিতর কোথাও একটু স্থান জোগাড় ক'রে লও। নহিলে আর আধঘণ্টা পর আমি আর তোমায় চিন্‌তে পার্‌বো না। কিছু না পাও সাম্‌নে একখানা খালি গরুর গাড়ী আছে—আজ রাত্‌টা কোন প্রকারে উহারই ভিতর কাটাইয়া লও।" সেবক স্তম্ভিত। ভাবিলেন—এত সেবার পর এই সম্ভাষণ! ভীষণ দেবতা বটে! যেন কত অচেনা। 'দেখ বাপু, আর আধঘণ্টা পর আমি আর তোমায় চিন্‌তে পারবো না'—শুনিয়া উপস্থিত সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কাশ্মীরে অমরনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

আজ ১০ মাইল যাইতে হইবে; পথে অল্প অল্প চড়াই, কাজেই বিশেষ কষ্টকর নহে, তবে কেহই এই পথ একদমে চলিতে সক্ষম নহে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে হয় এবং তৃষ্ণার্ত্ত বোধ করিলে জলপান করিতে হয়। এখনও আমরা পাইন ও চিড় বা ফেলু বৃক্ষ সমাকীর্ণ শৈলমালার মধ্য দিয়া চলিতেছি। আহা, কি ঘন সবুজ ছবি! পড়াওয়ে পৌঁছাইতে প্রায় ১টা হইল; ইহার নাম চন্দনবাড়ী। যাত্রীরা যেখানে আস্তানা গাড়িল, সে স্থানটীর একদিকে লম্বোদরী নদী এবং অপর দিকে আর একটী নদী। এখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং পূর্ব্বদিন বৃষ্টি হওয়ার দরুণ পথ কর্দ্দমময়। এই জন্য মধ্যাহ্ন ভোজন সাঙ্গ করিয়াই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মধ্যে টিপির টিপির বৃষ্টি পড়িয়া অত্যন্ত শীত আনয়ন করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বামিজী লম্বোদরীর দিকে বেড়াইতে যাইবার জন্য ডাকিলেন। শীত হেতু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার

আজ্ঞা পালনার্থ বাহির হইলাম। নদীর নিকট গিয়া দেখি উহার এক-দিকে তুষারাচ্ছন্ন; তুষারের গভীরতা ৩০।৪০ ফুটের কম নহে। অনেক যাত্রী কৌতুহলবশতঃ উহার উপর কতকদূর বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। আমরাও একটু গেলাম; কিন্তু মেঘলা থাকায় বড় শীত করিতে লাগিল, আর স্বামিজীও বলিলেন "কাল ত ইহারই উপর দিয়া যাইতে হইবে, তবে আজ আর গিয়া কাজ নাই।" অতএব আমরা ফিরিলাম এবং ধর্ম্মার্থ-আফিসের পদস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁবুতে আসিলাম। পর দিবস এক ভীষণ চড়াই আছে শুনিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলাম; কি করিব উপায় নাই। অমরনাথকে স্মরণ করিতে করিতে আহার করিয়া শয়ন করিলাম।

পর দিন ১২ মাইল চলিতে হইবে, তাহার উপর ভীষণ চড়াই আছে এই হেতু একটু যেন হতাশ হইয়া চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই সেই যাত্রিগণের ভয়প্রদ পর্ব্বতটীর সানুদেশে উপস্থিত হইলাম। যাহারা অগ্রে আসিয়াছিল তাহারা প্রায় শিখরে উঠিয়াছে দেখা গেল। তাহাদের ঠিক যেন পিপীলিকাশ্রেণীর মত দেখাইতে লাগিল। সাহস বুকে বাঁধিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলাম; ঘোড়া ধীর পাদবিক্ষেপে লইয়া চলিল; অনবরত ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার পা পিছলাইয়া যায় কিন্তু বলিহারী পাহাড়ী ঘোড়া, এমন দৃঢ় এবং সঠিকভাবে পা ফেলিতে লাগিল যে, একবারও তাহার পা ফস্‌কায় নাই। পাঁচ মিনিট করিয়া যাইতেছি, এবং পাঁচ মিনিট থামিতেছি, কারণ একটানা উঠিবার যো নাই। স্থানে স্থানে দুইধারে পাহাড়ের মধ্য দিয়া পথ; তাহা এত সরু যে দুইটী ঘোড়া পাশাপাশি যাইতে পারে না। ঐরূপ স্থানে মাঝে মাঝে মোটবাহী ঘোড়ার মোট পাহাড়ের গায়ে ঠেকিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল এবং তাহা উঠাইয়া পুনরায় ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া চালাইতে অনেক দেরী হইতে লাগিল। এইরূপে চলিতে চলিতে যখন দুরারোহ পাহাড়টীর শীর্ষে উপস্থিত হইলাম তখন বিজয়ী সেনানীর ন্যায় একবার স্ফীতবক্ষে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলাম। কত উচ্চে উঠিয়াছি, দেখিয়া গা শিহরিয়া উঠিল! কোন কষ্ট না দিয়া ঘোড়া

আমাকে এত দূর উঠাইয়া আনিয়াছে বলিয়া তাহাকে আদর করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিলাম এবং কিছুক্ষণের জন্য ঘাস খাইতে ছাড়িয়া দিলাম। যাহারা পদব্রজে আসিতেছিল তাহাদের কি কষ্ট! ১২।১৪ হাত উঠে এবং ক্ষণেক বিশ্রাম করে; বিশ্রামের সময় শ্বাস টানার কি শব্দ; আর মুখে এই রব "বাবা অমর কি কঠোর" "প্রাণ গেল রে বাবা" ইত্যাদি।

এই চড়াইটীর নাম পিশুঘাটির চড়াই। অমরকথায় আছে যে দুর্দ্দান্ত উৎপাতপরায়ণ দৈত্যগণকে দেবতারা এই পর্ব্বতে পেষিত করিয়া মারিয়াছিলেন, এই জন্যই ইহার উক্ত নামকরণ হইয়াছে। সে যাহাই হউক, আমি ঘোড়াকে ছাড়িয়া দিয়া ঘাসের উপর বসিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম কেলু, পাইন প্রভৃতির রাজত্ব ছাড়াইয়া অনেক উপরে আসিয়াছি; আর কোনদিকে ক্রমগুল্মাদি শোভিত পাহাড় দৃষ্ট হইতেছে না। এখন পর্ব্বতগুলির বক্ষ শ্যামল তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত, আর তাহার মধ্যে মধ্যে বিবিধ বর্ণের বিচিত্র পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সব ফুলগুলিই ছোট ছোট, যেন এক একটি তারা, কিন্তু কি মনোরম বর্ণ! এত প্রকার বিভিন্ন বর্ণের সম্মিলন বোধ হয় জগতে কোথাও নাই—আর এত বিভিন্ন আকৃতির ফুলও কোথাও নাই। প্রকৃতিদেবী তাঁহার অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের এক এক খানি নূতন ছবি প্রতিদিন দেখাইতেছেন। মুগ্ধ হইয়া অনেক-ক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তার পর আবার ঘোড়ায় বল্গা লাগাইয়া চলিতে লাগিলাম। এত উচ্চে উঠিয়াছি কিন্তু নদী আমাদের পার্শ্ব ছাড়েন নাই। এখন আর তাঁহার অঙ্গ পূর্ণভাবে দেখা যায় না। অনেক স্থানেই এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত তুষারে আচ্ছন্ন; সেই কঠিন তুষারাবরণের মধ্য দিয়া লোকলোচনের অদৃশ্যভাবে বহিয়া যাইতেছেন। আমরা শনৈঃশনৈঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পাহাড়ে চড়িতেছি। ক্রমে এমন স্থানে আসিলাম যেখানে পর্ব্বতগুলির শিখরদেশ তুষারাচ্ছাদিত। এইরূপে চলিতে চলিতে লম্বোদরীর উৎপত্তি স্থানে উপনীত হইলাম। ইহা একটী ছোট হ্রদ, উহার চারিদিকে দ্যোতমান তুষার-কিরীটি-ভূধরগণ

অভ্রভেদ করিয়া স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান। হ্রদের জলও তুষার-ধবল। কি অনির্ব্বচনীয় নয়নাভিরাম দৃশ্য! বোধ হইল যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে রহিয়াছি। ধন্য হিমালয়, ধন্য তোমার শোভা সম্পদ! এমন স্থানে যদি ঋষি, মুনি, সিদ্ধগণ না থাকিবেন ত থাকিবেন কোথা? বুঝিলাম কেন কাশ্মীর ভূস্বর্গ-বাচ্য। বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে কিছুক্ষণের জন্য এই চমৎকার দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া তৃষ্ণা মিটিতেছিল না। হ্রদটীর নাম শেষনাগ, এবং উহা তীর্থ বলিয়া গণ্য; অনেকে উহাতে স্নান করিবার জন্য নামিয়া গেল। আমরা তীর হইতে প্রণাম করিয়া পড়াওয়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর আসিয়া ইচ্ছা হইল এইবার ঘোড়া হইতে নামিয়া হাঁটিয়া যাই, কারণ সেখানটা সমতল ছিল. কিন্তু যেমন নামিবার উদ্দেশ্যে একদিকের রেকাবের উপর ভর দিয়া আর একদিক হইতে পা উঠাইয়া লইয়াছি, অমনি (ঘোড়ার পেটের বাঁধন আল্‌গা হইয়া যাওয়ায়) জীনটা ঘুরিয়া গেল এবং আমি চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম। নিকটস্থ ২।৪ জন আমাকে তুলিতে আসিল, কিন্তু আমি তাহার পূর্ব্বেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মাথাটা একখানা পাথরের উপর পড়িয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পাগড়ী থাকায় কোন প্রকার আঘাত লাগিতে পারে নাই; অন্য কোন অঙ্গেও আঘাত লাগে নাই। যাহা হউক, এখান হইতে পড়াও পর্য্যন্ত আর ঘোড়ায় চাপি নাই। বেলা আন্দাজ দুইটার সময় গন্তব্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই পড়াওটীর নাম বায়ুব্যজন। এখানে বায়ু সদাই বেগে বহে বলিয়া ইহার এইরূপ নাম। বাস্তবিকই এইখানে বাতাসের জোর এত অধিক যে এক এক সময়ে মনে হইতে লাগিল বুঝি তাঁবু উড়াইয়া ফেলে। ইহার কারণ এই যে, এই অধিত্যকা-টীর সম্মুখ একেবারে খোলা, কোন পর্ব্বত আড়াল করিয়া নাই, এবং ঐজন্য বায়ু এখানে অবাধগতিতে বহিতে থাকে। আবার ঐ কারণে শীতের প্রকোপও এখানে অত্যধিক। বৃষ্টি বা বরফপাত দূরে থাকুক সামান্য একটু মেঘলা হইলেই হাড় কাঁপাইয়া দেয়। শীতের ভয়ে আজ আর আমি তাঁবুর বাহির হই নাই।

পরদিন প্রভাতে যথাপূর্ব্ব অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আর লম্বোদরী

আমাদের সঙ্গে চলিতেছেন না, কাল তাঁহাকে তাঁহার জনকের কাছে রাখিয়া আসিয়াছি। আজ মাত্র ৮ মাইল চলিতে হইবে। মাঝে মাঝে বরফের উপর দিয়া চলিতে হইতেছে। প্রায় অর্দ্ধেক পথ চড়াই করিয়া আসিয়া দেখা গেল এইবার আমাদের আর উঁচুতে উঠিতে হইবে না, বরং একটু নীচুতেই নামিতে হইবে। দূর হইতে পড়াও দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। চারিদিকেই বরফরাশি দেখিতে দেখিতে পড়াওয়ের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এই পড়াওয়ের নাম পঞ্চতরণী। ইহার নিকটে পাঁচ ধারায় বিভক্ত একটী নদী থাকাতে উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। একটী ধারা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, অপর গুলি খুব সরু। এই সকল পার হইয়া আমরা পঞ্চতরণীর বিস্তৃত উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। ইহার নিকটে কোন পাহাড় ছিল না। অনেক দূরে তুহিনরাশি মস্তকে ধারণ করিয়া নগরাজগণ তিন দিক ঘেরিয়া আছে। আর চতুর্থদিকে অমরনাথকে আড়াল করিয়া ভৈরবঘাটি নামক পর্ব্বত তাহার বিশাল বপু লইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। উহার উচ্চতা ১৮,০০০ ফিট, অথচ কোথাও বরফ ছিল না; বোধ হয় অত্যন্ত খাড়া হওয়ার দরুণ বরফ ইহার গাত্রে জমিতে পারে না। আমাদের তাঁবু খাটান হইলে জিনিষপত্রাদি গুছাইয়া রাখিয়া পঞ্চতরণিতে স্নান করিতে গেলাম; দেখিলাম অনেকে এখানে শ্রাদ্ধাদি করিতেছে। এখানে অবগাহন-স্নান চলে না; কারণ জল নিতান্ত অগভীর তাহার উপর আবার বরফ অপেক্ষা অধিক শীতল। গামছা ভিজাইয়া কোনরূপে স্নান সমাধা করিয়া মেলাটীর চারিদিক বেড়াইয়া লইলাম। পরে পুরী কিনিয়া খাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এখানে আসিয়া বহু লোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল। বৈকালে তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া বেড়াইলাম। পরে সন্ধ্যা হইবামাত্র তাঁবুতে আসিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম; কারণ পাণ্ডা বলিলেন, পরদিন রাত্রি ৩।৪ টার সময় অমরনাথ দর্শনে যাইতে হইবে। অমরনাথ দর্শনের উৎকণ্ঠা অনেকদিন হইতে প্রাণে জাগরিত থাকায় ঘুম ভাল হইল না; রাত্রি ১ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; উঠিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল কিরণে দিক্ সমূহ উদ্ভাসিত; আর

পর্ব্বত শিখরস্থ বরফরাশি কি অপূর্ব্ব শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মরি মরি কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! সে শোভার বর্ণনা অসম্ভব। অবাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। কবি Wordsworth এর ভাষায় বলিতে গেলে "I drank the spectacle"। অত্যন্ত শীত, অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিয়া এই সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করা হইল না। শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম; ঘুম আর আসিল না। শুইয়া শুইয়া কখন যাত্রা করিতে হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম রাত্রি ২টা হইতেই যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে বলিয়া রাখি, পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথে যাইবার ২টী পথ আছে। একটি ভৈরবঘাটির উপর দিয়া, আর একটী উহার পাশ দিয়া গিয়াছে। শ্রীনগর হইতে যে দুই গাছি ছড়ি আসিয়াছিল তাহার একগাছি ভৈরবঘাটীর উপর দিয়া চলিয়া গেল, আর একগাছি দ্বিতীয় পথে গেল। প্রথমোক্ত পথে যাহারা নিতান্ত শক্ত ও সামর্থ্যবিশিষ্ট তাহারাই গেল; কারণ এপথটী অতি কঠোর, খাড়াভাবে উঠিয়া গিয়াছে, আবার নামিয়াছেও খাড়াভাবে; বসিয়া, হামাগুড়ি দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া নামিতে হয়। শতকরা ৫ জন মাত্র এই দিক দিয়া যায় বলিয়া অনুমান হয়। এ পথে যান চলে না। আমরা দ্বিতীয় পথ দিয়া গিয়াছিলাম। এপথেও চড়াই-ওৎরাই আছে তবে বিশেষ নহে। গুহামুখ হইতে এখান পর্য্যন্ত ৫মাইল পথ। পাণ্ডা বলিলেন আজ কোন প্রকার যানারোহণে যাওয়া বিধি নয়; অবশ্য অসমর্থপক্ষে অন্য কথা। স্বামিজী ভিন্ন আমরা সকলে পদব্রজে চলিলাম। পরে দেখিলাম সকলেই পদব্রজে গিয়াছিল। রাত্রি ৪ টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় পথ আলোকিত থাকায় আর আলোকের আবশ্যকতা হয় নাই। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ জোরে পথ চলিতে লাগিলাম যাহাতে শীঘ্র দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারি। শেষের দেড়মাইল পথ একেবারে বরফাচ্ছন্ন; ইহার উপর দিয়া চলা বড় কষ্টকর, কারণ বালির উপর দিয়া চলিলে যেমন পা সরিয়া যায়, বরফের উপর দিয়াও ঠিক সেইরূপ ঘটে, ফলে অনেক সময়ে পড়িয়া যাইতে হয়। ধীরে ধীরে লাঠির ভরে চলিয়া অমর-

বাবার গুহার পাদদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা ৮টা কি কিছু বেশী হইবে। বহুযাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে, কেহ কেহ ফিরিতে আরম্ভও করিয়াছে। আমরা যেখানে উপস্থিত হইলাম তাহার সম্মুখেই একটী নদী প্রবাহিতা; তাহার উপরিভাগের প্রায় সর্ব্বত্র বরফে আচ্ছাদিত; কদাচিৎ কোন স্থান ভাঙ্গা আছে, সেই স্থানে জল দেখিতে পাওয়া যায়। উহার একদিকে গগনস্পর্শী ভৈরবঘাটি পর্ব্বত, অপরদিকে অমর-গুহা; নদী-তট হইতে গুহামুখ প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ হইবে।

বিশ্রামের জন্য নদী-তটে উপবেশন করিলাম। শুনিয়াছিলাম নদী-জলে স্নান করিয়া নগ্নগাত্রেই দেব-দর্শন বিধি। কিন্তু এই কার্য্য নিতান্ত দুষ্কর ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। কারণ নদী-জল বরফ অপেক্ষা শীতল; বরফকে পাঁচ মিনিট হাতে করিয়া রাখা যায়, কিন্তু নদী জল ১ মিনিটের অধিক রাখা যায় না; হাত জ্বালা করিতে থাকে। এরূপ সত্ত্বেও ৩।৪ জনকে কৌপীন পড়িয়া স্নান করিয়া অনাবৃত গাত্রে অমরনাথের পূজা করিতে দেখিয়াছিলাম। তাহাদের শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমি একটু বিশ্রাম করিয়া নদীতে হাত, পা মুখ প্রক্ষালন করিলাম এবং মাথা সামান্যভাবে ধুইয়া লইলাম। তৎপরে একখানি রেশমী চাদর পরিয়া এবং একখানি আলোয়ান মাত্র গায়ে জড়াইয়া পূজার্চ্চনাদির জন্য গুহা মধ্যে যাইলাম। গুহা নিতান্ত ছোট নহে; লম্বা চওড়া এবং উচ্চতায় প্রায় সমান; ৫।৬ শত লোক তাহার মধ্যে বেশ অবস্থান করিতে পারে। গুহার স্থানে স্থানে উপর হইতে টুপ টুপ করিয়া জল চুয়াইয়া পড়িতেছে, এবং এই জন্য একটু অসুবিধা বোধ হয়। গহ্বরে ঢুকিয়াই বামদিকের পর্ব্বতগাত্র এক প্রকার খড়ি-পাথরে গ্রথিত; উহা খনন করিলেই খড়ির ন্যায় এক প্রকার গুঁড়া বাহির হয়, ইহাই অমর বাবার বিভূতি। বহুযাত্রী উহা সংগ্রহ করিয়া গায়ে মাখিতেছে এবং বিতরণের জন্য লইয়া যাইতেছে। অমরনাথ পর্ব্বতের উচ্চতা ১৭০০০ ফিট।

আমি গুহামুখে উঠিবার সময় মনে করিয়াছিলাম নগ্নপদে বাবাকে দর্শন পূজন করিব; এই সংকল্পে কিছু দূর উঠিয়াছিলাম, কিন্তু

বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল ; একে শীতে পা আড়ষ্ট হইয়া যায় তাহার উপর সরু মুখ পাথরের টুকরাগুলা পায়ে ফুটিয়া অত্যন্ত কষ্ট দেয়। এই জন্য আবার ফিরিয়া আসিরা একযোড়া ঘাসের জুতা পরিয়া লইলাম। দেখিলাম সকলেই এই জুতা ব্যবহার করে। বলিয়া রাখি শ্রীনগর হইতে আসিবার সময় সকলেরই এই জুতা এক আধ জোড়া সংগ্রহ করিয়া আনা উচিত। পথেরও অনেক স্থানে ইহা পাওয়া যায়। উহার দাম জোড়া প্রতি ১ কি ২ পয়সা মাত্র। এই জুতার আর এক গুণ এই যে উহাতে পা হড়কাইয়া যায় না। তবে উহা সমস্ত দিন ব্যবহার করিলে এক দিনেই উহার আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

মুক্তি ও কর্ম্ম

(উদাসী)

মানুষ মাত্রেই শান্তি ও মুক্তি বা স্বাধীনতা পাইবার জন্য সমুৎসুক। প্রতি জীবাণু হইতে মানুষ পর্য্যন্ত আমরা যতই দেখি ততই দেখিতে পাই যে প্রত্যেকেই হয় শারীরিক, না হয় মানসিক, না হয় উভয়বিধ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল। স্বাধীনতার জন্যই একটী জীব আর একটীর প্রভাব সহ্য করিতে অক্ষম, স্বাধীনতার জন্যই একটী জাতি স্বীয় দাসত্বরূপ শৃঙ্খল গলায় পরিতে সর্ব্বদাই নারাজ—স্বাধীনতার জন্যই বীরহৃদয় বিপদসঙ্কুল সংগ্রামে আত্মবিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হয় না ও একমাত্র, অনন্ত স্বাধীনতা আস্বাদনের জন্যই শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের জগৎ সংসার ত্যাগ। চিন্তাশীল মানব জগতের ব্যাপারগুলি বিশেষরূপে প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারেন যে অতি সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই সাধ্যমত মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। দর্শনশাস্ত্রও বলে যে জগতে তিনটী শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। একটী

শক্তি আকর্ষণ করিতেছে—দ্বিতীয়টী বিকর্ষণ ও তৃতীয়টি উভয়েক সমভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ত্রিবিধ শক্তির সম্মিলনেই জগতের সৃষ্টি। এই তিন শক্তি যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন কোনরূপ সৃষ্টি হয়না। কিন্তু একবার ইহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য হইলেই অমনি সৃষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ হইল, অমনি একটী আর একটীর বশে রহিল না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিল, ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব। দর্শনকার এই চাঞ্চল্যের হেতু যাহা কিছু স্থির করুন না কেন তাহা আমাদের বিচার্য্য-স্থল নহে কিন্তু সৃষ্টির প্রথমেই যে অপরের অধীনতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য একটী চেষ্টা বর্ত্তমান, যে চেষ্টা আমরা বর্ত্তমানে প্রত্যেক বস্তুতে দেখিতেছি—সেইটী বুঝাইবার জন্যই এই দৃষ্টান্তের অবতারণা। বিজ্ঞানেও বলিতেছে যে Centripetal (আকর্ষণীশক্তি আর) Centri-fugal forceই (বিকর্ষণীশক্তি) জগতে ক্রিয়া করিতেছে। এই দুই মল্লের ধস্তাধস্তিতেই জগতের যাহা কিছু ব্যাপার। পুনশ্চ যেমন জড়জগতে এই স্বাধীনতার স্পৃহা বর্ত্তমান, অন্তর্জগতের দিকে লক্ষ্য করিলেও আমরা উহার যথেষ্ঠ নিদর্শন পাইয়া থাকি। ইহারই ফলে বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার, প্রাচীন Animism, Fetishism, Clan-god ও নানাপ্রকার কুসংস্কার পরিপূর্ণ ধর্ম্মমত হইতে অদ্বৈত মতের উৎপত্তি, নানাপ্রকার কুরীতি পূর্ণ সমাজ হইতে উন্নত সমাজের আবির্ভাব, প্রাচীন একমাত্র রাজতন্ত্র হইতে প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রের উদ্ভব, পরিশেষে সৃষ্টির তত্ত্ব জানিতে গিয়া জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য, মনই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে এইরূপ তত্ত্বের নিরূপণ।

জগতের নানাবিধ ঘটনা দেখিয়া মানুষের মনে স্বতঃই উদয় হয়, ইহা কেন হইল? ইহার কারণ কি? ছোট শিশু হইতে পরিণত বয়স্ক পর্য্যন্ত সকলেরই এই একই কথা "কেন, এর কারণ কি?" এই প্রশ্নটী একটু তলাইয়া বুঝিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই যে প্রশ্নকর্ত্তা আর নিজের জ্ঞানের সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নন। এমন কতকগুলি ঘটনা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় যে গুলির ব্যাখ্যা তিনি আর করিয়া উঠিতে পারেন না। অর্থাৎ তাহার বর্ত্তমান জ্ঞানভাণ্ডার উক্ত ঘটনা

গুলির একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। এই জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার যে সুপ্ত স্পৃহা সেই স্পৃহাটীকেই ঐ ঘটনাগুলি যেন জাগাইয়া দেয়। ও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে তাহার অভিব্যক্তি হয়--কেন? এর কারণ কি? এখন বেশ বুঝা গেল প্রশ্নকর্ত্তা পূর্ব্বের সীমাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ঘটনাগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞানের একটা আবরণ ছিল তাহা দূর করিতে ইচ্ছা করেন ইহাই স্বাধীনতার স্পৃহা। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে স্বাধীনতাস্পৃহা আমরা লক্ষ্য করিলাম তাহা কেবল অনন্ত স্বাধীনতার এক একটী পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ মাত্র। প্রকৃত স্বাধীনতা—প্রকৃত মুক্তি অন্তরের মধ্যেই অনুভব করা হয়। একজন সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হইতে পারেন, কেহ বা নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারেন, কেহ বা জগতে অতুলনীয় বীর্য্যবান ও যুদ্ধনিপুণ হইতে পারেন কিন্তু তিনি কি বাস্তবিকই স্বাধীন? সম্রাটের বহিঃশত্রু না থাকিতে পারে কিন্তু তিনি অন্তঃশত্রু ও স্বীয় প্রবৃত্তি ও শরীরের দাস, জ্ঞানীর নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে কিন্তু জগতে এমন বহুবিধ জিনিষ রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বীর পুরুষ অপরকে শস্ত্রাদির দ্বারা জয় করিতে পারেন কিন্তু ইন্দ্রিয়ের হস্তে হয়ত তিনি ক্রীড়া পুত্তলি। বাহ্য অবলম্বনের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না বলিয়া ঋষিরা বেদে বলিয়াছেন, "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্ত্বমিচ্ছন্"। নিজের মধ্যে যে অমৃতের ভাণ্ডার রহিয়াছে তাহাকে জানিলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে। সেই জন্যই দেবর্ষি নারদ ষড়ঙ্গ-বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, সঙ্গীত, শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হইয়াও প্রকৃত শান্তির, প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদনের জন্য ভগবান সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে গিয়াছিলেন।

এখন আমরা দেখিব এই প্রকৃত স্বাধীনতা কি? প্রকৃত স্বাধীনতা বাসনা ত্যাগ বা অনাসক্তি। এই দেহরূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে যদি আমরা সম্পূর্ণ অনাসক্ত হই বা ইহা 'আমার', 'আমি দেহ' এইরূপ বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে আমরা

যথার্থ স্বাধীন ও প্রকৃত শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারি। স্বার্থ বুদ্ধিই মানুষকে বদ্ধ করে নিঃস্বার্থ বুদ্ধি তাহাকে মুক্ত করে। এই অনাসক্ত ভাব আনাই, আমি আমার বুদ্ধি ত্যাগই, আমাদের প্রত্যেক সাধনমার্গের উদ্দেশ্য। ভক্ত নিজের ছোট 'আমি' কে বলি দিয়া 'বিরাট-আমি' যে ভগবান তাহাকে সেই স্থলে বসাইতেছেন, জ্ঞানী আমি দেহ নহি আমি মন নহি, আমি বদ্ধ নহি, ইত্যাকার বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে ব্রহ্ম স্বরূপে উপলব্ধি করেন, যোগী নিজ অন্তঃকরণকে বিশ্লেষণপূর্ব্বক সর্ব্ববৃত্তিহীন করিয়া পরম শান্তি সুখ অনুভব করেন, আর কর্ম্মী আমি আমার এইরূপ স্বার্থসুখ বলি দিয়া নিজকে বিরাট-আমিতে পরিণত করেন। 'মুক্ত হবো কবে, আমি যাবে যবে' বা 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল' এইরূপ ছোট ছোট কথার দ্বারা এই পরম সত্যকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। মৈত্র্যয়ন্যুপনিষদে আছে 'মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ—বন্ধায় বিষয়সঙ্গি—মোক্ষে নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্।

মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয় সম্পর্কে বন্ধন হয়—নির্ব্বিষয় হইলে মোক্ষ হয়। মন বন্ধনের কারণ কিরূপে? একটী সামান্য দৃষ্টান্ত লইলেই জিনিষটী বেশ বুঝা যাইবে। মনে করুন আমাকে একটী লোক কোন এক খানি পুস্তক উপহার দিল। আমি উহা লইলাম এবং ইহা আমার বলিয়া আমার পুস্তকাগারে রাখিলাম। কিছুদিন পরে ঐ পুস্তকখানি কীটদষ্ট হওয়ায় পাঠের অযোগ্য হইল ও সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে ভয়ানক দুঃখ আসিল। অপরের যদি ঐরূপ পুস্তক নষ্ট হইত তাহাতে আমার কোনরূপ কষ্ট হইত না। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, প্রথমতঃ ঐ পুস্তকটীতে 'ইহা আমার', 'আমার ইহাতে পূর্ণ সত্ত্ব আছে' এইরূপ 'বুদ্ধি' স্থাপন করিয়াছি দ্বিতীয় স্থলে করি নাই, সেই জন্য প্রথম জিনিষটী নষ্ট হওয়ায় আমার কষ্ট হইতেছে—অন্যের জিনিষ নষ্ট হওয়ায়—আমার মনে কোনরূপ কিছুই হইতেছেনা। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে এমন কি শরীর মন সম্বন্ধেও। এই, 'বুদ্ধি' বাধা

পাইলে দুঃখ ও ইহা বাধা না পাইলে সুখ। এখন প্রকৃত মুক্ত হইতে হইলে আমাদের এই শৃঙ্খলদ্বয়ের মূলীভূত কারণ যে আমিত্ব বুদ্ধি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে হইবে।

কর্ম্মী কি উপায়ে এই ভববন্ধন দূর করেন সেই সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করিব। পূর্ব্বে দেখিয়াছি কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী প্রভৃতির উদ্দেশ্য এক। তবে কর্ম্মী কি ভাবে অগ্রসর হইলে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে লাভ করিতে পারেন সে সম্বন্ধে যদিও পূর্ব্বে একটু আভাষে বলা হইয়াছে—এখানে বিশদভাবে আলোচনা করিলে বিষয়টী বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিব কর্ম্ম বলিতে কি বুঝি—কর্ম্ম শব্দের অর্থ যাহা কিছু করা যায়। এ কথা বলায় দৈহিক ও মানসিক ব্যাপার অর্থাৎ চিন্তা বিচার ধ্যান প্রভৃতি করা, সমস্তই কর্ম্ম পর্যায়ের মধ্যে পড়িল। "আমার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে বাহির করিবার জন্য উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে কোন মানসিক বা ভৌতিক আঘাত প্রদত্ত হয়"—তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্মই আমাদের চরিত্রের নিয়ামক। আমরা এখন যাহা তাহা অতীত কর্ম্মের ফলস্বরূপ। আমরা যাহা কিছু করি না কেন তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ চিত্তপটে অঙ্কিত হয়। ঐ দাগ গুলিকে আমরা সংস্কার আখ্যা প্রদান করি। ইহারা অতিসূক্ষ্মভাবে আমাদের অন্তঃকরণে থাকে এবং সময়ে সময়ে চিত্তের উপর ভাসিয়া উঠে। মনটী যেন একটা হ্রদ—যেমন হ্রদে কতকগুলি ধূলিকণা ফেলিলে কতকগুলি কম্পন হয় তারপর ধূলি কণাগুলি নীম্নে পতিত হয় আবার কোন উত্তেজক কারণের দ্বারা তাহারা পুনরায় জলের উপরেভাসিয়া উঠে সেইরূপ আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু দেখি তাহার সূক্ষ্মাংশ এই চিত্তের মধ্যে থাকিয়া যায় ও কোন উত্তেজক কারণের সংস্পর্শে উহারা পুনরায় আবির্ভূত হয়। এই সূক্ষ্ম সংস্কারের সমষ্টিই আমাদের চরিত্র। ক্রমবিকাশবাদীদের কেহ কেহ ঐ সম্বন্ধে ভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন মানুষ তাহার পিতামাতার নিকট হইতে যেমন শরীর ও সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসাবে পায় সেইরূপ মানসিক বৃত্তিগুলিও পাইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজিতে Law of

Heridity বলে। জিজ্ঞাসা করি বুদ্ধদেব যীশুখৃষ্ট, শঙ্কর প্রভৃতির মত ব্যক্তির পিতামাতাদিগের হৃদয়বত্তা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে এমন কিছু বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় কি, যাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে তাঁহারা তাঁহাদের পিতামাতাদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে উত্তরাধিকারিরূপে পাইয়াছেন। সহোদর যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলিবেন? ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সংস্কারবাদ অনেকটা নিরসন্দিগ্ধ। এই সংস্কারগুলি যেমন শুভ ও অশুভ হইবে চরিত্রও সেইরূপ সৎ ও অসৎ হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া শুভ সংস্কার উৎপাদন পূর্ব্বক আমাদের অশুভ সংস্কারকে নষ্ট করিতে হইবে, শেষে আমাদিগকে এই শুভসংস্কারকেও বিনাশ করিতে হইবে। যেমন পরমহংসদেব বলিতেন কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা শেষ হলে দুইটাই ফেলিয়া দিতে হয়; প্রকৃত শান্তি সুখ অনুভব করিতে হইলে আমাদের শুভ অশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে হইবে; শুভ আসিলে আমাদের মন যেরূপ অটল অচল থাকিবে অশুভ আসিলেও ঠিক সেইরূপ থাকিবে। এরূপ অবস্থা লাভ করিবার উপায় আসক্তি ত্যাগ।

কর্ম্মমাত্রেই সদসৎ মিশ্রিত। শুভকর্ম্ম হইলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ অশুভ আছেই আর অসৎ কর্ম্ম হইলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ সতের অংশ আছেই। কোন কর্ম্ম সর্ব্বাংশে শুভ বা সর্ব্বাংশে অশুভ নয়। যদি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করি তাহা হইলেও আমাদের নিষ্কৃতি নাই, শুভ কর্ম্মের ফল আমাদিগকে বদ্ধ করিবে। আরও এক কথা কর্ম্ম ত সকলেই করিতেছে তাহা হইলে কর্ম্মযোগের আবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, 'কর্ম্ম কর কিন্তু কর্ম্মের ফলে আসক্তি রাখিও না, আসক্তি রাখিলেই তোমাকে বদ্ধ করিবে—আসক্তি ত্যাগ করিলে—তোমার মনে বিষয় আর সংস্কাররূপে দাগ দিতে পারিবে না, তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্তই থাকিবে'। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্ম ত সকলেই করিতেছে কিন্তু কি ভাবে করিতেছে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। সাধারণতঃ আমরা দেখি একজন একটী সৎকাজ করিল—হয়ত তাহার পশ্চাতে নিজের কোন অভীষ্টসিদ্ধির

সঙ্কল্প, না হয় নাম যশের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। এরূপ অবস্থায় কর্ম্ম করা হয় সত্য, কিন্তু তাহা কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম নহে। কর্ম্মযোগী কোনরূপ ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবেন না ; কর্ম্মসিদ্ধ হউক বা অসিদ্ধ হউক তাহাতে তিনি অচল অটল স্থির। তাই গীতায় ভগবান বলিতেছেন "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে"। "সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান থাকিবে। এই সমতাকেই যোগ বলে"। কি করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং॥ "কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার। ফলেতে কখনও নহে কর্ম্মফলে তোমার আসক্তি না হউক এবং অকর্ম্মে তোমার অপ্রবৃত্তি না হউক। হে ধনঞ্জয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করিয়া, আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। এই সমতারদ্বারাই যোগ-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি শুভাশুভ ত্যাগ করে। অতএব যোগানুষ্ঠান কর কারণ কর্ম্মে কৌশলই যোগ। পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধনবিহীন হইয়া মঙ্গলজনক সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন"।

যিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন সেই আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনাসক্ত হইয়া করিলেই উদ্দেশ্য লাভ হইবে। কেহ হয়ত বলিবেন নিষ্কাম কর্ম্ম কি সম্ভব ? কারণ যখনই কোন কাজ করা যায় তখনই আমরা দেখি যে তাহার পূর্ব্বে কোনরূপ কামনা বর্ত্তমান ; কারণ কার্য্য করিতে হইলে, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, ইষ্টসাধনতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক—মোট কথা কার্য্যে শ্রেয়ঃ বুদ্ধি হইলে তবে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। এই যে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা ইহা ত কামনা ? তাহা হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম কি করিয়া হয়—উহা কেবল কথার কথা মাত্র ? পরের জন্য বা ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্মকে সকাম কর্ম্ম বলে না। যে কর্ম্মে নিজের

অহং বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় না ও যাহার ফলে আসক্তি হয়না তাহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। গীতায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে—

নিয়তং সঙ্গরহিতংরাগদেষতঃ কৃতম্।

অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥১৮।২৩

"যাহা অহঙ্কার শূন্য, রাগদ্বেষ বর্জ্জিত ও ফলাসক্তি রহিত হইয়া করা যায় তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম"। কর্ম্মে প্রবৃত্তি নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় তাহা অপরের জন্য বা ভগবৎপ্রীতির জন্য হউক। মানুষ বদ্ধ হয়, যখন সে তাহার ব্যষ্টি মন বা দেহের সুখের জন্য কিছু করে; কিন্তু যিনি নিজ দেহসুখ বা মানসিক সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া অপর ব্যক্তিকে ভগবানের মূর্ত্তি বা নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে বা এ প্রকার কোনরূপ ভাব না রাখিয়াও যদি একমাত্র কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করেন ও প্রতিক্ষণে নিজের অভিমান অহঙ্কার বা 'ইহাকে সাহায্য করিলে পরিণামে অন্যান্য বিষয়ে আমার যথেষ্ট সুবিধা হইবে', এইরূপ স্বার্থবুদ্ধিকে দূর করেন তাহা হইলে তাঁহারও কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া পরিগণিত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াই ধর্ম্মব্যাধ, রাজর্ষি জনক পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই কর্ম্ম তত্ত্ব বুঝা ভয়ানক কঠিন বলিয়া ভগবান কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম কি তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম বিকর্ম্ম ও তুষ্ণীভাবরূপ অর্থাৎ কোন কর্ম্ম না করা কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলে। অপর আর এক দিক দিয়া কর্ম্মকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিকরূপে ভাগ করা হইয়াছে। যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম এবং ইহার দ্বারাই আমাদের পরম শান্তিলাভ হইয়া থাকে। রাজস ও তামস কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ১৮।২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।

মোহদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥১৮।২৫।

ফলপ্রাপ্তি কামনায় ও অহঙ্কারের সহিত ও অতি কষ্টকর বোধে যাহা করা যায় তাহা রাজস কর্ম্ম। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

কর্ম্ম-কৌশল—স্বামী বিবেকানন্দের Work and its Secret নামক বক্তৃতার অনুবাদ, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা।

অনুরাগ—শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী। প্রকাশক গ্রন্থের প্রারম্ভে আপনার বিজ্ঞপ্তিতে লেখিকার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কবিকে উৎসাহ দান প্রবৃত্তি সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বতঃসিদ্ধ।

ইহা প্রথম উদ্যম, ভবিষ্যতে সমস্ত ত্রুটী সংশোধিত হইলে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে ছন্দরীতি ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। কবিতাগুলির মধ্যে প্রাণের চিহ্ন আছে কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্বশক্তি এখনও শৈশবাবস্থায়। যৌবনে মনোরম হইবে বলিয়াই ভরসা করিতেছি।

ন্যায়রত্নের নিয়তি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ২৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাস। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, মেহেরপুর, নদীয়া, ভূমিকা লিখিয়াছেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গ্রন্থকারকে প্রশংসা পত্র দিয়াছিলেন তাহাও উদ্ধৃত করা হইয়াছে কিন্তু সে পত্র গূঢ় ইঙ্গিতে ভরা। সমাজপতি মহাশয় সেই ইঙ্গিত দ্বারা লেখক মহাশয়কে কোনও-রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন কিনা তাহা বুঝিয়া দেখিবার বিষয়।

কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও উপন্যাস খানি অর্দ্ধাংশের অধিক পাঠ করিতে পারি নাই। "ন্যায়রত্নের নিয়তি প্রকৃত অহিংস অসহযোগেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত" প্রভৃতি বড় বড় কথা থাকিলে কি হয়? তালুকদার হইতে সামান্য কৃষকটী পর্য্যন্ত যে পণ্ডিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে দেখিলে পদ বন্দনা করে তাঁহার দেবচরিত্রা বিদুষী রূপবতী অসূর্য্যম্পশ্যা কন্যাকে নবাবের প্রতিনিধি কাজি সাহেব কেশাকর্ষণ করিয়া ঘর হইতে বাহির করিতেছেন ও তাঁহার আদেশে পাঠান সৈন্য বেত্রাঘাতে তাঁহার পৃষ্ঠ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, রক্তধারায় মৃত্তিকা সিক্ত হইতেছে। তারপর—

লেখকের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি—

"সিপাহীরা ছিন্নমূলা লতিকার ন্যায় ধরা লুণ্ঠিতা সুমতিকে উঠাইবার জন্য বিস্তর ঠেলাঠেলি করিল; কিন্তু ধরাশয্যা হইতে আর তাহাকে উঠাইতে পারিল না। সুমতির অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে, তাহার আর পদমাত্র চলিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু সেই ছাতুর দলের উদ্ভাবনী শক্তি তাহাদের পৈশাচিকতার অনুরূপ! তাহারা সুমতির হাতের হাত কড়িতে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি ধরিয়া ইষ্টকবদ্ধ কঠিন পথের উপর দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। সুমতির অর্দ্ধাঙ্গ—তাহার কটিদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত মাটীতে ছেঁচড়াইয়া যাইতেছে; ইষ্টকের সহিত ঘর্ষণে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতেছে; তাহার পরিধেয় বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। এইরূপ * * * তাহাকে টানিতে টানিতে যখন তাহারা কাছারীতে উপস্থিত হইল।"

এইরূপ বাড়াবাড়ি দেখিয়া আমাদের উপন্যাস পাঠের নেশা কাটাইয়া বইখানি বন্ধ করিতে হয়। উপন্যাস লেখকের হাতে সত্যের দায়ীত্ব বলিয়া একটা জিনিষ আছে। বীভৎস রসের অব তারণা করিয়া গল্প জমাইবার জন্য এক শ্রেণীর লেখনীজীবী স্ত্রীলোকের উপর অনেক প্রকার পাশবিকতার দৃশ্য বর্ণনা করে বটে, কিন্তু তাহারা সাহিত্যিক নহে, সত্যের দায়ীত্ব তাহাদের মস্তিষ্কে নাই।

যতদূর পড়িয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ এই যে—তখন বাঙ্গলায় মুসলমান শাসনের শেষাবস্থা, তারানাথ ন্যায়রত্ন হরিরামপুরের একজন যজন যাজন অধ্যাপণ নিরত ব্রাহ্মণ। মাতৃহীনা কন্যা সুমতিকে, অল্পবয়সে বিধবা হইবার পর, কাছে রাখিয়া বিদ্যা ধর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। এখন সে যোড়ষবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বিজয় দত্ত সেই পরগণাটা নবাব সরকার হইতে ইজারা লইয়া এই হরিরামপুরে আসিয়া সদরকাছারি স্থাপন করিলেন। মহাল বন্দোবস্ত লইতে তাঁহার বিস্তর টাকা খরচ হইয়াছিল সেই টাকাটা তিনি প্রজাদের কাছ হইতে আদায় করিতে চান তিনি ভাবিলেন ন্যায়রত্নের সাহায্য পাইলে কাজটা নির্ব্বিঘ্নে হইতে পারে তাই আপনার মেয়ে সত্যবালাকে লইয়া একদিন

ন্যায়রত্নের বাড়ী আলাপ করিতে আসিলেন। ন্যায়রত্ন তাঁহাকে কোনওরূপ উৎপীড়নে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না, ধর্ম্মভাব বজায় রাখিয়া প্রজাপালন করিতে উপদেশ দিলেন। বিজয় দত্ত তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া কাজিকে ঘুষ দিয়া হস্তগত করিয়া প্রজাদের পাকা ধান ক্রোক, গরু ধরিয়া আনিয়া খোঁয়াড়ে আটকাইয়া রাখা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিলেন।

সত্যবালার সহিত সুমতির খুব সখীভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। কখনও সত্যবালা ন্যায়রত্নের বাড়ী আসে, সুমতিও সত্যবালার বাড়ী প্রায়ই যায়। সত্যবালা সুমতিকে দামী আলোয়ানটা এটা ওটা প্রায়ই দিয়া থাকে।

প্রজারা বিজয় দত্তের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সামাজিক শাসন প্রয়োগ অর্থাৎ বয়কট করিল, খোঁড় ভাঙ্গিয়া নিজেদের গরু বাহির করিয়া লইয়া গেল, কারণ খোঁয়াড়ে পুরিয়া বিজয় দত্ত গরুগুলিকে জল পর্য্যন্ত খাইতে দেয় নাই, সেগুলি মরিবার মত হইয়াছিল। বিজয় দত্ত কাজির সাহায্যে নবাব সরকার হইতে সৈন্য আনাইলেন।

সত্যবালার চুল বাঁধিবার ফিতে কে লইয়া গেল, কিন্তু বাড়ার ঝি রমণী বলিল সে দেখিয়াছে সুমতি চুরি করিয়াছে। অগত্যা বিজয় দত্ত কাজীকে খবর দিলেন। তারপর সুমতির উপরে যেমন উদ্ধৃত করিয়াছি তেমনি শাস্তি আরম্ভ হইল। কাজি চুরির তদন্তে সসৈন্যে গিয়া ঘর খানাতল্লাসি করিয়া কিছু না পাইয়া ন্যায়রত্ন ও তাঁহার কন্যাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিলেন।

আমাদের লেখককে বক্তব্য এই যে যত বড় জিনিষই দেখাইতে চান, অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিলে সমস্তই বিপরীত ফল প্রসব করিবে।

ভরত—ভূমিকায় কথিত হইয়াছে এই গ্রন্থে অসামিশ্র ভক্তিতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভূমিকাকারের এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না। দেখিলাম ভক্তি বিশুদ্ধভাবে বিগলিত হইয়া সুশীতল গঙ্গাধারার ন্যায় উদ্বেলিত বেগে বহিয়া গিয়াছে। লেখা দেখিলে বুঝিতে বাকী থাকে না লেখিকা কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিয়াছেন, লেখা

পড়িলেও, পাঠক যদি নিবিষ্ট চিত্তে ভাবগ্রাহী হইয়া পাঠ করেন,—কাঁদিতে কাঁদিতেই পড়া শেষ করিতে হইবে। উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেশ হৃদয়ের তাপে গলিয়া গলিয়া ভাবের লহরে রামায়ণের ভরতচরিত্রকে বেড়িয়া উন্নত অদ্রি খণ্ডের চারিধারে ঘূর্ণ্যমান অগাধ জলের আবর্ত্ত রচনার মত সুগম্ভীর ধ্বনি করিতেছে।

কৈকেয়ীর ছলনায় রামকে বনে পাঠাইয়া দশরথ অনন্ত নিদ্রায়। শূন্য অযোধ্যা, কে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করে? যুধাজিত নগরে ভরতকে আনিতে দ্রুত দূত গিয়াছে,—এইখান হইতে আখ্যায়িকা আরম্ভ। কৈকেয়ী যে ভরতের ভরসায় রাজমাতা হইবার মোহে এই নৃশংস কর্ম্ম করিলেন সে ভরত মনে প্রাণে জানে—

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুনন্দন।
সর্ব্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম তন্ময়ং সর্ব্বমেব হি॥

তাহার অধিকার স্থাপনের জন্য রামকে বনে পাঠাইয়া রাজার মৃত্যুর কারণ হইয়া কৈকেয়ী পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। সে তাঁহার পদবন্দনা অগ্রে করিল না, রাজ্যের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না, দূতের সত্বর আহ্বানে অযোধ্যা আসিয়া তাঁহাকে যখন সম্মুখে দেখিল ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কঁহ সিয় রাম লখণ প্রিয় ভ্রাতা!" কৈকেয়ী কি উত্তর দেন কি বলিয়া বুঝান যে তাঁহার কল্যাণ চিন্তায় তিনি মন্থরার পরামর্শে কত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! তুলসীদাস ও বাল্মিকী হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপনার সুমধুর বর্ণনা ভঙ্গীতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া লেখিকা এই স্থানটী একটী দৃশ্যের মত বড় রোমাঞ্চকর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তারপর ভরত কৌশল্যার কাছে কাঁদিলেন, বশিষ্ঠের কাছে কাঁদিলেন, "হা রাম" বলিয়া অযোধ্যার পথে পথে কাঁদিয়া প্রজা পরিজন সামন্ত সকলকে লইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। চিত্রকূটে উভয় ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল। রাম বিস্তর বুঝাইলেন ভরতও বিস্তর কাঁদিলেন, রামের কথামত বশিষ্ঠও ভরতকে বুঝাইলেন অবশেষে ভরতকে ফিরিতে হইল, কিন্তু ভরত রামের পাদুকাযুগল চাহিয়া লইয়া তাহাই মাথায় করিয়া ফিরিলেন, ইচ্ছা অযোধ্যায় ফিরিবেন না নগরের

বাহিরে তাহাই সিংহাসনস্থ করিয়া রামের প্রতিনিধিরূপে রামের রাজ্য চতুর্দ্দশ বৎসরের মত পালন করিবেন মাত্র।

এই বিদায় দৃশ্য বর্ণনা করিতে লেখিকার সমস্ত হৃদয় যেন উজাড় হইয়া গিয়াছে। এইটুকু লিখিতেই তিনি বুঝি ভরত চরিত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাকি গ্রন্থটুকু আর ইহার পর উঁচু পর্দ্দায় চড়ে নাই, সুর যেন নামিয়া পড়িয়াছে।

আবার তারপর তিনি ভরতকে দেখাইয়াছেন,—চতুর্দ্দশ বৎসর পরে, রাম বনবাস হইতে যখন ফিরিতেছিলেন সেই সময়ে।

গ্রন্থের ভরত রঘুকুলের ভরত কৈকেয়ীসুত রামের অনুজ কিন্তু লেখিকার হৃদয়ের ভরত সে ভরত নহে। হৃদয়ের ভরত আধার পীঠের ভর্ত্তারূপী আমাদেরই খণ্ড চেতনা, আমাদের অহম্। রাম প্রাণারাম "একমাত্র হৃদয়গুহাবাসী চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান নিত্য সত্য শান্তিময়।"

রাক্ষসী মা প্রকৃতি এই রামের রাজ্যে 'আমায়' বসাইবে বলিয়া রামকে বনবাসে পাঠাইয়াছে, 'আমার' সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই ত ভরতের কান্না! লেখিকারও ইহাই কান্না, এই কান্না যে লেখিকার সর্ব্বস্ব! তাই ভরতের আলেখ্য তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছে। আপনার কান্না কাঁদিবার ছলেই তিনি ভরতের হইয়া কাঁদিতে পাঠককে কাঁদাইতে বসিয়াছেন! এই কান্নার বস্তু রামের পদমূলে পড়িয়া যখন ভরত কাঁদিতেছেন,—

তবুও রাম! যদি তুমি নিতান্ত না যাও, তবে কেহই আর ফিরিবে না। তোমার অভয় চরণ সেবা করিতে আমিও বনবাসী হইব

"নো চেৎ প্রায়োপবেশেন ত্যক্ষ্যামেতৎ কলেবরম্"

সেইখানে তাঁহার সমস্ত ভাব সমস্ত প্রতিভা সমস্ত হৃদয়রস নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িয়াছে। সেই দৃশ্য চিত্রিত করিতে তিনি দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। তাহার পর আর উঁচু পর্দ্দায় সুর চড়াইতে পারেন নাই।

যাহা হউক "ভরত" পাঠে আমরা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি এই স্বার্থ সংঘাত মৃত নির্ম্মম যুগেও বাংলার অন্তঃপুরে এমন অশ্রুমুখী মা আছেন, যদি তাঁহার সংস্পর্শে ঘরের পাষাণীরা পবিত্রা হয়

শ্রীশ্রীরামলীলা—মহর্ষি বেদব্যাসের অধ্যাত্মরামায়ণের প্রচার বাংলায় তত নাই। বক্ষ্যমান রামলীলা সেই ত্রুটী নিবারণ চেষ্টা, ধর্ত্তব্য হইতে পারে। মূল গ্রন্থের সংস্করণ বা অনুবাদ নহে, তাহা অবলম্বনে যথেষ্ট স্বাধীন কৃতিত্ব দর্শাইয়া সরল ছন্দেঃ সাধু ভাষায় কবিতাবৃত্তি। প্রাপ্ত খণ্ডখানি মাত্র আদিকাণ্ড লইয়া লিখিত। বোধ হয়, আশা করা যাইতে পারে ক্রমে ক্রমে সমগ্র মূলগ্রন্থ এইরূপে লিখিত হইবে।

ইহা যে সুনিপুণ লেখনী প্রসূত সে কথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার ভাব জ্ঞান কোনওটীরই দারিদ্র নাই। "জনক-নিগুর্ণ" "সগুণ" "আত্মা" "অবতার" শীর্ষক খণ্ড কবিতাগুলি চমৎকার। একটী বিষয়ের জন্য পুস্তকখানি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, সুরের একটু অভিনব উপাদেয়ত্ব আছে। সেটুকু বইটীকে এই শ্রেণীর অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে বিশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন—

প্রথম দর্শন শীর্ষক কবিতায়, সীতা নব দুর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপের প্রতি চাহিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। সখী বলিতেছেন :—
(১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

কি দেখিস্ মুগ্ধচিতে বিভোর নয়নে।
মোহিত বিহ্বল যেন অলস স্বপনে॥
আপনার মাঝে বিশ্ব নিমেষে হারায়ে।
চিন্ময়ী তন্ময়ী যেন আছিস্ চাহিয়ে॥
পরিমল সুধাভরা মধুর হাসিয়া।
না ফিরায়ে আঁখি সীতা সখীরে ডাকিয়া॥
কহেন দেখলো সখি কি মধুর রূপ!
হেরিলে হারাবি প্রেমে আপন স্বরূপ॥
অধোমুখ তুলে রাম আঁখি ফিরাইতে।
দেখেন কনক ছবি নয়ন আগেতে॥
হেরিতে পরাণ মাঝে আনন্দ ভরিল।
হিয়ার অঙ্কিত রূপ নয়নে ফুটিল॥

বর বধুর দৃষ্টি বিনিময়ের রূপকে আবৃত করিয়া অন্তরাত্মার দুইটী

নিবিড় অনুভূতির পরস্পর উপলব্ধি চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। আখ্যান-ভাগের ঘটনার সহিত কবিত্বের intuition বেশ পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে। এই অংশটীতেই আরো দুইটী স্থল এইরূপ সুন্দর লাগিল কিন্তু সেখানে ভাব ব্যক্ত হইলেও ভাষা প্রাঞ্জল হয় নাই বলিয়া উদ্ধৃত করিতে নিরস্ত হইলাম। অহল্যা উদ্ধার স্থানের কবিত্বও এইরূপ চমৎকার। আর কিছু উদ্ধৃত করিলাম না, করিলে অনেকটা করিতে হয়।

সংবাদ ও মন্তব্য

১। পাটনা জিলায় জলপ্লাবন হেতু বেলুড় মঠ হইতে সেবক পাঠান হইয়াছে। সেখানে দুইটী কেন্দ্র খুলিয়া সাহায্য দান করা হইতেছে।

২। গত ২১শে জুন (৬ই আষাঢ়) রাত্রি ১২ টার সময় আরাকান উপকূলে রামড়ী দ্বীপে যে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। একটী অসমান প্রণালী দ্বীপটীকে ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। দ্বীপটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। ছোট ছোট পাহাড়গুলি উপকূল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর অধিবাসীদের কুটীরগুলি ছবির ন্যায় শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে ছোট বড় নদীগুলি ঝিকি ঝিকি করিতেছে।

দ্বীপের অধিবাসী ঐ সব পাহাড়ের উপরে বাঁধ বাঁধিয়া চাষের জমি তৈয়ারী করে এবং বর্ষাকালের বৃষ্টি ধরিয়া রাখিয়া সময় মত তাহাতে চাষ করে। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা এখানে বর্ষা খুব বেশী হয়। ২১শে জুন সন্ধ্যা হইতে মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে থাকে তাহাতে রাত্রি ১২ টার সময় পাহাড়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ক্ষেতের জল সব নীচের দিকে দারুণ বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। এদিকে অষ্টমীর জোয়ারে নদীর জলও প্রবেশ করে এবং এই দুই জলস্রোতে এই বিষম বিভ্রাট ঘটায়।

প্লাবনে পাঁচটী লোকের ও ২০।২৫ টী পশুর প্রাণহানি হইয়াছে এবং প্রায় শতাধিক গৃহস্থের ঘরবাড়ী কাপড় চোপড় যথাসর্ব্বস্ব ভাসিয়া গিয়াছে।

৬ই জুলাই আমাদের প্রতিনিধি ওখানে যাইয়া যথাসাধ্য কার্য্য. আরম্ভ করেন। ৭ই ও ১৬ই জুলাই দুই তারিখে আন্দাজ ১৩।১৪ সের করিয়া চাউল প্রায় শতাধিক গৃহস্থকে বিতরণ করা হইয়াছে।

প্রতিনিধির বিবরণীতে প্রকাশ হতভাগ্য প্লাবন পীড়িত অধিবাসীর সঞ্চিত ধান্য পরিধেয় গৃহ গবাদি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে চারিমাস তাহাদিগকে সর্ব্বোতোভাবে সাহায্য করিতে পারিলে, তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবে।

এই বন্যা পীড়িত দেশবাসীর জন্য আপনাদিগের যথাসাধ্য কৃপা প্রার্থনা করা যাইতেছে।

আশাকরি এই নিরাশ্রয় হতাশ ভাইদের সতৃষ্ণ করুণ নয়ন আপনাদের যথাসাধ্য সহানুভূতি ও কৃপা লাভে বঞ্চিত হইবে না।

উপরোক্ত সাহায্যার্থে যে কোন প্রকার দান নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় পাঠাইলেই সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। (১) প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণমিশন, মঠ বেলুড় জিলা হাবড়া। অথবা (২) দি রামকৃষ্ণ মিশন বর্ম্মা ব্যাঙ্ক, রেঙ্গুন।

"বিজয়া"
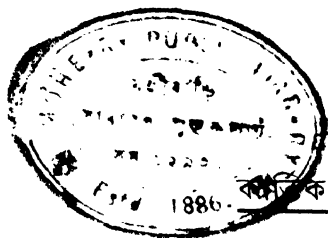
(ব্রহ্মচারী ত্যাগ চৈতন্য)

আজ বিজয়াদশমী, বিজয়ার বিজয়দুন্দুভি মহাঘোর রবে বাজিয়া উঠিয়াছে; সেই গুরু গম্ভীর শব্দ বজ্রনিনাদে ভারতের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া দশদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মা যে আজ কৈলাসে চলিয়াছেন, আচম্বিতে প্রকৃতি রাণীও তার সেই আনন্দে উপ্‌ছে পড়া ব্যক্ত হাসি টুকু গুপ্ত রাখিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশ আজ আর তেমন নির্ম্মল দেখাচ্ছে না। কই মৃদুমন্দ মারুত হিল্লোলে পরিপ্লুত হয়েও সে প্রাণের ভিতর একটা আনন্দের উন্মাদনা তাত এনে দিচ্ছে না, বিহগের কণ্ঠ নিঃসৃত প্রাণ মাতানো—সুমধুর স্বর গুলিতে প্রাণ ত আর নেচে উঠ্‌ছেনা, মায়ের বিদায়ের সঙ্গে আজ যে চারিদিক শূন্য, কোন সাড়াশব্দ শ্রুতিগোচর হচ্ছে না সবই নীরব, নিথর—তবে কি এ বিষাদের ছায়া! মহানন্দের হাট কি আজ চিরদিনের মত ভেঙ্গে গেল! প্রখর মার্ত্তণ্ড জ্যোতিঃ কি আজ আঁধার কালিমা জালে লিপ্ত হইল—! না তাত নয় এত বিষাদের ছায়া নয়, এত নিরাশার ছবি নয়, বিশ্ব মানবমন আজ আর প্রকৃতির বাহ্যিক রূপসৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতে চায় না আজ তারা মায়ের' চেতনা শক্তি প্রভাবে এক অজানিত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত বিজয়-রাজ্যের সংবাদ পেয়েছে। তাই তারা আনন্দে আত্মস্থ হইয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। সনাতন কাল হইতেই হিন্দুর বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র জলদ গম্ভীরস্বরে বলিয়া আসিতেছে, প্রকৃতির বাহ্যিক চাক্‌চিক্য শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইও না,—আত্মস্থ হও, আত্মবান্ হও,

আত্মশক্তি জাগ্রত কর, বহির্জগতে ভুলিও না, অন্তর্জগতের অনুসন্ধান কর। কথা এইরূপ হইলেও আমরা বলিব যতদিন সেই আত্মশক্তি জাগ্রত না হইতেছে ততদিন উপায়-স্বরূপ অবলম্বন-স্বরূপ সেই শক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপেরও কিছু প্রয়োজন আছে। তাই আজ শরত ঋতুর আগমনে প্রকৃতির প্রাণ খোলা হাসির সঙ্গে মায়ের সেই হাসি মাখা রূপটী মিশিয়ে দেখবার জন্যে মাতৃভক্ত আজ শরতে শারদাদেবীর অর্চ্চনায় নিরত। মায়ের ছেলে আজ চায় মায়ের সেই মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন জীবন লাভ করিয়া বীর্য্যবান্ তেজস্বী হইতে, আজ চায় নূতন শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া নব আনন্দে উৎফুল্ল কণ্ঠে প্রাণ মাতানো স্বরে একবার মা বলিয়া ডাকিতে, আজ চায় অকাতরে ভক্তি গদ্ গদ্ চিত্তে এই রিপু লাঞ্ছিত দেহ মন প্রাণ মায়ের পায়ে বলি স্বরূপে দান করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে। তাই আজ দশপ্রহরণী মহিষ-মর্দ্দিনী অভয়-দায়িনী দনুজ-দলনী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনায় নিরত। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী মহা আনন্দে কাটিয়া গেল আনন্দের ধারা যেন প্রকৃতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া উপছিয়া পড়িতেছিল মানবমন সে আনন্দের কথা কল্পনা করিতে অক্ষম কিন্তু উপভোগ করিতে সক্ষম। ভাষায় তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য শুধু বলা যাইতে পারে প্রাণভরা আনন্দ,—কি যে সে আনন্দ, -কেমন আনন্দ, তাহা অব্যক্ত,—ভাবুক বুঝিয়া লও, ভক্ত অনুভব কর, জ্ঞানী বিচার কর—সীমা পাইবে না! সেই অপরিসীম্ আনন্দ সাগর মাঝে তুমি আমি একটী ক্ষুদ্র কীট স্বরূপ। বাঙ্গলায় এমন আনন্দ স্রোত আর কখনও প্রবাহিত হয় না, এই আনন্দস্রোত পার কূল ছাপাইয়া এই বিশ্বমাঝে এক মহানন্দ প্লাবন উপস্থিত করে। এতে সকলকেই ভাসাইয়া তোলে—ধনী মানী দীন দুঃখী সকলের প্রাণে সেই একই আনন্দ উৎস বহিয়া যায়। তবেই এখন বুঝিতে হইবে যাঁহার দিবসত্রয়ের জন্য আগমনেই এই বিশ্বময় কি এক অনির্ব্বচনীয় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠে, বিদায় কালে তিনি কি আমাদিগকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া যাইতে পারেন! তাত কখনই নয় আমরা যে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য এই মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া থাকি। মা কি

আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন—অসম্ভব ! মা যে আমাদেরই আমরা মায়ের, আমাদের লক্ষ্য হল আত্মশক্তিকে জাগ্রত করা তাই আজ মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া সেই চিন্ময়ীকে মনোরাজ্যের হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়াছি। এত বিদায় নয়, এত বিসর্জ্জন নয়, তবে কিসের বিষাদ কিসের অশ্রু ? এ অশ্রু আমাদের আনন্দের অশ্রু, মা যে আজ আমাদের হৃদয় রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী রূপে হৃদয় সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন। তাই আজ মাতৃভক্ত মায়ের ছেলে হিংসা দ্বেষ বিরহিত চিত্তে আনন্দে জগতের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইতে চায়, তাই আজ তারা নির্ভয়ে মুখ তুলে বুক ফুলিয়ে সোৎসাহে উচ্চকণ্ঠে বলিতে চায় আমরা মায়ের ছেলে—বিশ্ববিজয়ী বীর ! মা আমাদের সম্রাজ্ঞী ! মা বলিতে তো কারও প্রাণে দ্বিধা আসিতে পারে না, মা ডাক যে প্রাণ ভরা ডাক, তাই আজ মায়ের ছেলে প্রেমের ছলে আবার জগতকে আহ্বান করে বলছে—এস বীর এস ভক্ত এস শৈব এস শাক্ত এস জৈন খৃষ্টীয়ান্ এস বৌদ্ধ মুসলমান আজ বিজয়ার দিন মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তি হৃদয় সিংহাসনে আরূঢ়। সোঁথয়া মহা আনন্দে নির্বৈর ভাবে সকলের প্রেমালিঙ্গনে নিবদ্ধ হই—আর মায়ের চরণ তলে নিজকে বলিস্বরূপ প্রদান করিয়া প্রার্থনা করি, "মা আমাদিগকে মনুষ্যত্ব দাও আমাদিগকে মানুষ কর"।

ঝরা ফুল।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়।

—ফুল ঝরে গেল
　　আঁখি সে মুদিল—
গহন বনমাঝে।

*　　*　　*

—আঁধার আসিল
　　আলোক ডুবিল—
নিরবতা শুধু রাজে॥

কথা প্রসঙ্গে

(২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা পূর্ব্বে নানাদেশীয় অতি প্রাচীন দেহাত্মবাদের কথার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যদিও ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথম আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে, তথাপি এদেশেও নানা ভাবে দেহাত্মবাদের প্রকাশ ঘটিয়াছিল, যথা (১) স্থূল দেহাত্মবাদ (২) সূক্ষ্ম দেহাত্মবাদ—(ক) ইন্দ্রিয়াত্মবাদ (খ) প্রাণাত্মবাদ (গ) মনাত্মবাদ এবং (৩) পুত্রাত্মবাদ।

*   *   *

স্থূল দেহাত্মবাদীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সংহিতা নামক গ্রন্থে তিনি স্বীয় মত সংগ্রহ করেন। মহাভারতের সমসাময়িক চার্ব্বাক ইহার অনুশীলন ও প্রচার করেন। ইহাঁরা বলেন, "আমি" বলিয়া যে জীবের বোধ হয় তাহাই আত্মা দেহ ছাড়া অপর কোনও অন্তর বা বাহ্য বস্তুতে আমাদের "আমি" জ্ঞান হয় না। আমি স্থূল, আমি গৌর, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি যাইতেছি, আমি জানি, আমি ইচ্ছা করি, আমি করি ইত্যাদি বোধের সহিত "আমি" জড়াইয়া রহিয়াছে। স্থূলত্ব, গৌরত্ব, মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, গমন, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ইত্যাদি যে গুণ তাহা "আমি" কে বাদ দিয়া চিন্তা করা যায় না। যেমন "লাল" কে ঘোড়া বা ফুল বা যে কোন বস্তুর সহিত এক করিয়া সামানাধিকরণ্যে চিন্তা করিতে হয়। লাল দৌড়াইতেছে বা গন্ধ দিতেছে ইহা অর্থশূন্য। অতএব গুণ—রক্তবর্ণকে গুণী ফুলের সহিত অভেদে চিন্তা করিতে হয়। সেইরূপ ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন বা স্থূলত্ব, গৌরত্ব আমির সহিত জড়াইয়া চিন্তা করিতে হয়। আর এই আমি বা আত্মা স্থূল দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আত্মার যে সকল গুণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্থূলত্ব গৌরত্ব ইত্যাদি

তাহা দেহ ছাড়া সম্ভব নহে—ইহা সকলের প্রত্যক্ষ। দেহরূপ আত্মার বিনাশেও ঐ সকল গুণের, বিনাশ। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এই চারি জাতীয় জড়ের দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হয়। আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই—কারণ উহা কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কারণ প্রত্যক্ষ ছাড়া অপর প্রমাণ ইঁহারা মানেন না। চারি ভূতে চৈতন্য শক্তি দেখা যায় না বটে কিন্তু চারিভূতের সংমিশ্রণে যে জীব দেহ নির্ম্মিত হয় তাহাতে উহা জন্মায়। যেমন ভাত ও গুড়ে মাদকতা না থাকিলেও উহার যথাযথ মিশ্রণে মাদকতা জন্মে; অথবা পান, খয়ের, চূণ, সুপারিতে লাল রং না থাকিলেও উহার মিশ্রণে লাল রং জন্মে। দেহ থাকিলেই মানুষের সকল গুণ প্রকাশ পায়। দেহ না থাকিলে উহার অভাব ঘটে। অতএব দেহই আত্মা। দেহের নাশে উহার চারি অংশ চারিভূতে মিশিয়া যায়।

* * *

মহাভারতকার নিম্নলিখিত রূপে বিবৃত করিয়াছেন,—

লোকায়ত নাস্তিকগণের মত এই যে সর্ব্বলোক সাক্ষিক দেহরূপ আত্মার ধ্বংস প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও যাহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া দেহ ভিন্ন আত্মার কল্পনা করেন তাঁহারা পরাজিত হন। আত্মার মৃত্যুই নাশ, আর দুঃখ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি অংশতঃ নাশ। গৃহের এক একটী অংশ নষ্ট হইলে ধীরে ধীরে যেমন সমগ্র গৃহটীর নাশ হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির নাশের সহিত দেহরই নাশ হইয়া থাকে। "লোকে যাহা নাই তাহা আছে" ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধ হয়। বন্দিগণ যেমন রাজাকে অজর অমর বলিয়া স্তুতি করে, সেইরূপ দেহরূপ আত্মাকে অজর অমর বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে—প্রকৃত পক্ষে আত্মা অজর অমর নহে। অনুমান ও শাস্ত্র প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া শাস্ত্র ও অনুমান প্রমাণ বৃথা। যেমন ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর সংযোগে বটবীজের মধ্যে পত্র, পুষ্প, ফল, ত্বক, রূপ, ও রস প্রভৃতি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে পরে অবিভূর্ত হয়, সেইরূপ মানব-রেত মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত,

শরীর, আকার ও গুণ, ভূত চতুষ্টয় সংযোগে সূক্ষ্ম অবস্থায় জন্মে পরে প্রকাশিত হয়—বিভিন্ন অবস্থায় জড় পদার্থের সংযোগে বিভিন্ন গুণ প্রসবিত হয়। গরু ঘাস জল খাইয়া যেমন দুগ্ধ উৎপাদন করে, ভাতের আমানি পচিয়া যেমন মদ শক্তি উৎপাদন করে, কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণে যেমন অগ্নি জন্মে, সেইরূপ জড় পদার্থ হইতে দেহের চৈতন্য গুণ জন্মে। চুম্বক যেরূপ লোহাকে আকর্ষণ করে চৈতন্য সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল চালনা করে। সূর্য্যকান্ত মণিতে যেমন সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া দগ্ধ করে, জীবের ভোগ প্রভৃতি সেইরূপ ইন্দ্রিয় ও বিষয় সঙ্ঘাতেই সিদ্ধ হয়।

ইহার বিরুদ্ধে মহাভারতকার যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার দুইটী আমরা এ স্থানে উদ্ধৃত করিব। (১) যদি দেহ চেতন হয় তবে মৃত দেহেও চেতনা থাকিত কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ—পক্ষান্তরে যাহা বর্ত্তমান থাকিলে দেহ থাকে এবং যাহার অবর্ত্তমানে দেহের নাশ হয়—তাহাই চৈতন্য—সুতরাং দেহাতিরিক্ত। (২) মৃত্যুর সহিত কর্ম্মের যদি নাশ হয় তাহা হইলে কৃত কর্ম্মের ফল সম্ভব নহে—পক্ষান্তরে, জন্ম হইতে জীব যে সুখ দুঃখ ভোগ করে তাহা অকৃত কর্ম্মের ফল স্বরূপ হয়।

* * *

বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, ৫৩ সূত্রে বেদব্যাস উক্ত মত সূত্রাকারে পূর্ব্বপক্ষরূপে নিবদ্ধ করিয়া পরসূত্রে খণ্ডন করিয়াছেন।

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৩ ॥

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন দেহাতিরিক্ত আত্মা বা চৈতন্য নাই। কারণ স্থূল শরীরের অভাবে ঐ আত্ম চৈতন্যের অভাব দৃষ্ট হয়।" এই পূর্ব্বপক্ষ আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি, কাজেকাজেই উহার আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা আমরা এখানে করিলাম না।

ব্যতিরেক স্তদ্ভাবাভবিত্বান্নতুপলব্ধিবৎ ॥ ৫৪ সূ ॥

"দেহের অতিরিক্ত আত্ম চৈতন্য আছে। কারণ চৈতন্যের অস্তিত্ব দেহকে অপেক্ষা করে না। দেহ থাকিলেই আত্ম চৈতন্য থাকিবে ইহা

প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয় না।” এক্ষণে আমরা এই সূত্রের শারীরক ভাষ্যের আলোচনা করিব। দেহ ও আত্মার অব্যতিরেক অর্থাৎ দেহই আত্মা—দেহের অতিরিক্ত আত্মা নাই এ কথা যুক্তি সিদ্ধ নহে। দেহ হইতে আত্মার ব্যতিরেক অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা অতিরিক্ত ইহাই যুক্তি ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কারণ দেহ বিদ্যমানেও তাহার চৈতন্য ধর্ম্মের অভাব দেখা যায়। আবার দেহ থাকা সত্ত্বেও চৈতন্যের অভাব দেখা যায়। যতকাল দেহ আছে ততদিন রূপ প্রভৃতি দেহ-ধর্ম্ম থাকে পৃথক কিন্তু চেষ্টা, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি দেহ থাকা সত্ত্বেও মৃত্যাবস্থায় থাকে না। তাহা ছাড়া একথা সঠিক বলিতে পার না যে ইচ্ছা জ্ঞানাদি মৃত্যুর পর নাশ হয়, অন্য দেহে সঞ্চারিত হয় না, এ সংশয় তোমাদের মধ্যেও আছে। আর দেহধর্ম্ম রূপাদি সকলের প্রত্যক্ষ কিন্তু ইচ্ছা, জ্ঞানাদি সকলের প্রত্যক্ষ নয়, কাজে কাজেই আমরা বলিতে পারি উহা দেহধর্ম্ম রূপাদির ন্যায় হইলে সকলের প্রত্যক্ষ হইত। আর দেখি চৈতন্যই দেহ বিষয় বা ভূতকে প্রকাশ করে, চৈতন্য না থাকিলে দেহও নাই, জগৎও নাই, অতএব ভূত ভৌতিক সমস্ত পদার্থই চৈতন্যের বিষয়। আলোক থাকিলে জগৎ দৃষ্ট হয়, অন্ধকারে দেখা যায় না অতএব জগৎ কি আলোর ধর্ম্ম? আর তোমরাও ত এই চৈতন্য সত্তাকে, যাহাকে বোধ করা যায়, যাহা ভূতের প্রকাশক, এইরূপ বলিতে গিয়া, ইহাকে অজ্ঞাতসারে দেহ বা ভূত হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিতেছ। আর দেহ ত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে—ছেলেবেলার দেহ এখন নাই, কালিকার দেহ আজ নাই, এই মুহূর্ত্তের দেহ পর মুহূর্ত্তে নাই—কাজে কাজেই দেহের আমিত্বরূপ যে বোধ তাহাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ছেলেবেলার “আমি” আর এখন নাই। কাজে কাজেই অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব। আমি দেখিয়াছিলাম, দেখিতেছি, দেখিব—এই যে আমিত্বের প্রত্যভিজ্ঞা বা সর্ব্বকালে একত্ব অনুভব ইহা কি প্রকারে সম্ভব? স্মৃতি জিনিষটীর স্থানই বা কোথায়? আর ইহার লৌকিক ফল এই যে, যে আত্মা পরিশ্রম করিল সে আত্মা ভোগ করিতে পারিল না, কারণ দেহরূপ আত্মার ত সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনই দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যক্ষই যখন একমাত্র

প্রমাণ তখন স্বপ্নকালে দেহ থাকে না কারণ উহা উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষ হয় না অথচ জ্ঞান ইচ্ছাদি থাকে, আবার সুষুপ্তিতে জ্ঞান ইচ্ছাদিও লুপ্ত হয় কিছুই প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয় না তখন কি থাকে আবার কোথা হইতেই বা সব ফিরিয়া আসে? অপরের নিকট আমার ইচ্ছা জ্ঞান দৃষ্ট হয় না অতএব উহা কি তাহাদের নিকট নাই, না ইহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়? বৃহস্পতিকেই বা আপ্ত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব কেন? মৃত্যুতেই যদি দুঃখের অবসান তবে সকল জীব আত্ম হত্যা করে না কেন? কিম্বা যখন আত্মহত্যা করে তখন দেহরূপ আত্মার প্রতি এত ঘৃণা আসে কেন? বিভিন্ন ভূত-সংঘাতে যদি বিভিন্ন দেহ উৎপত্তি হয় কাজেকাজেই তাহাদের প্রত্যক্ষ বা অনুভবও বিভিন্ন—এ কথা সত্য কি? আর জগৎ যদি স্ব স্বভাব দ্বারা উৎপন্ন, পাপ পুণ্য অদৃষ্ট বা ঈশ্বর নাই এ কথা যদি সত্য হয়—তাহা হইলে কার্য্যোৎপত্তির প্রতি দেশ-কাল-নিমিত্ত ও উপাদান-দ্রব্যাদির বিশিষ্ট নিয়ম দৃষ্ট হয় কেন? এবং কোন শরীর জন্ম হইতে সুখী বা দুঃখী দৃষ্ট হয় কেন?—ইহার কারণ অবস্থাচক্র, Chance না ঈশ্বর?

* * *

ইন্দ্রিয়াত্মবাদীরা বলিয়া থাকেন স্থূল দেহ ভৌতিক—উহাতে চেতনা সম্ভবে না। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ই আত্মা, উহাতেই চেতন সম্ভবে। আমরা যখন সর্ব্বদাই বলি আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি ইত্যাদি, তখন আমিত্ব ও দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি সামানাধিকারণ্যে ইন্দ্রিয়রূপ আত্মার সহিত অভেদ। যেমন নীল ঘট। নীলত্ব ও ঘটত্ব এই যে দুই ধর্ম্ম বা গুণ, ধর্ম্মী বা গুণী ঘটের সহিত একাকারে অবস্থিত। একের অভাবে অন্যের অভাব হয়। নীলত্ব ও ঘটত্ব যদি না থাকে তাহা হইলে নীল ঘটের অভাব হইবে। আবার যদি নীল-ঘট না থাকে তাহা হইলে নীলত্ব ও ঘটত্বের অভাব হইবে। সেই হেতু আমিত্ব, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি চেতনত্বের ব্যাপার ইন্দ্রিয়ের সহিত অভেদই ঘটিয়া থাকে অতএব উহাই আত্মচৈতন্য। ইন্দ্রিয় যে চেতন ইহা শুধু আমরা বলি না তোমাদের শ্রুতিও বলিয়া থাকে (ছান্দগ্য, ৫।১।৬-১২)। (এই বলিয়া ইহাঁরা একদেশী শ্রুতিও উদ্ধার

করিয়া থাকেন—যথা ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর বিবাদ)। আর ইন্দ্রিয়গণ বহু হইলেও ভোগরূপ এক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সকলে একমত হইয়া কার্য্য করে। যেমন সাংখ্যবাদীদের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ বিভিন্ন হইয়াও একমতি হইয়া জগদ্রচনা করে। কিন্তু আপত্তি এই যে ইন্দ্রিয়গুলি যখন বিভিন্ন ও বহু আত্মাও বিভিন্ন ও বহু। সাংখ্যের পুরুষই ত্রিগুণের নিয়ামক কিন্তু এই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক কে? ইন্দ্রিয়গণ ত পরস্পর স্বতন্ত্র। চক্ষু নিজের উপলব্ধি কর্ণকে বলিতে পারে না, কর্ণ নিজের উপলব্ধি ত্বক্‌কে বলিতে পারে না—কাজে কাজেই সকল ইন্দ্রিয়ের সমবায় করে কে? পরস্পরে জ্ঞাত হইয়া যদি কার্য্য করিত তাহা হইলে চক্ষু দেখিলে কর্ণও তাহা জানিতে পারিত। অপর দিকে যখন এক একটী ইন্দ্রিয়ের নাশ হয় তখন বলিতে হইবে আত্মার এক এক অংশের নাশ হইতেছে। কাজে কাজেই উহা সাবয়ব (limited) কাজেই নশ্বর। সুতরাং কৃত কর্ম্মের ফলভোগ অসম্ভব, এবং নূতন আত্মার জন্মের সহিত অকৃতকর্ম্মের ফলভোগ সম্ভব হয়। এ বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, এখানে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

* * *

মনাত্মবাদীরাও শ্রুতির একদেশী উদ্ধৃত বচনের দ্বারা বলিয়া থাকেন যে ইচ্ছা, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান ইত্যাদি ধর্ম্ম মনেতেই দৃষ্ট হয়। আর স্মৃতিও বলিতেছেন "মন এব মনুষ্যাণাং কারণ বন্ধমোক্ষয়োঃ।" ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে না—কারণ স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম সকল লোপ পায়। গুণের অভাবে গুণীরও অভাব দৃষ্ট হয়। অগ্নি আছে অথচ দাহিকা শক্তি নাই ইহা অসম্ভব। অতএব ইচ্ছা জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম হইতে পারে না। পরন্তু মনের সমবধানে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আপন আপন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেও যে পর্য্যন্ত তাহাতে মনোনিবেশ না করা যায় ততক্ষণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরা তাহাদের বিষয়ের উপলব্ধি করিতে পারে না। অঙ্ক কষিতেছি এমন সময় ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল—শব্দ কর্ণ পটাহে আঘাত করিল কিন্তু কান তাহা শুনিল না কেন? কারণ

মনঃসংযোগ করা হয় নাই। কিন্তু ইহাতেও আপত্তি এই যে মনেরও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে—এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে কোন সময়ের মন আমি? তাহার পর মন অণু, না মধ্যম বা দেহপরিমাণ? অনুপক্ষে গুণ উপপন্ন হয় না, কাজেকাজেই উহার সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্ম সকলও প্রত্যক্ষ হইবে না। উদ্যানের (Hydrogen) অণুকে আমরা দেখিতে পাই না বা তাহার ধর্ম্মও আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। বহু উদ্যান-অণু সংযোগ হইলে আমরা উদ্যান উপলব্ধি করি। তাহা হইলে কি বহু মন-জাতীয় অণু একত্রিত হইলে তাহার ইচ্ছা, জ্ঞানাদি ক্রিয়া আমাদের অনুভূত হয়? [কিন্তু, প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনের অণুত্ব বিপক্ষে যে যুক্তি দেন যে জীব বা মন অণু হইলে সকল শরীর ব্যাপী সুখ-দুঃখের অনুভব হইবে না, কিন্তু ইহার বিপরীত সূর্য্যতাপে সর্ব্ব শরীর ব্যাপী দুঃখ সকল লোকের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে—ইহা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ উহা দেহ ব্যাপী ত্বগেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ ঘটে বলিয়া ঐ অনুভব হয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন ত্বগেন্দ্রিয় যখন দেহ ব্যাপী তাহা হইলে পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে দেহ ব্যাপী যন্ত্রণার অনুভব না হইয়া কেবল পদে অনুভব হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে ত্বগেন্দ্রিয়ের যে অংশের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ঘটে সেই অংশেরই অনুভব ঘটে। সূর্য্যকিরণে দেহের বহু অংশের সহিত সম্বন্ধ ঘটে বলিয়া উহার বহুস্থানে অনুভব হয়। কলিকাতার গঙ্গায় স্নান করিলে কি গোমুখী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সকল গঙ্গাজলের অনুভব হয়? হাতী জলে অবগাহন করিয়া যতটা জলের অনুভব করে, পিপীলিকাও কি সেই পরিমাণ জলের অনুভব করে?] তাহার পর মন যদি মধ্যম পরিমাণ হয় অর্থাৎ দেহ পরিমাণ হয় তাহা হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের এক সময়েই জ্ঞান সম্ভব হইত। কিন্তু দেখা যায়—শিশুকে শৃগালে লইয়া যাইতে দেখিয়া মাতা তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। শিশুকে শৃগালের মুখ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া—মাতা সর্ব্বাঙ্গে বেদনার অনুভব করিলেন—দেখিলেন পদে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে, দেহ কাটিয়া গিয়াছে

কিন্তু এতক্ষণ তিনি এ সকল কিছুই অনুভব করেন নাই। আর মন দেহ পরিমাণই হউক আর অণুই হউক উহা যখন সাবয়ব (limited) তখন উহার নাশ নিশ্চিৎ আছে। কাজে কাজেই জীবের অকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ সিদ্ধ এবং কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ অসিদ্ধ হয়। তাহার পর সুষুপ্তিতে মন ও তাহার ধর্ম্ম সকলও বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব যদি বল সুষুপ্তিতে মন নাশ প্রাপ্ত হয় না, উহার কারণ অজ্ঞানে প্রবেশ করে এবং পুনরায় উহা হইতে পূর্ব্ব সংস্কারের সহিত নির্গত হয়। তাহা হইলে সেই অজ্ঞান রূপ সুষুপ্তিকেই আত্মা বল না কেন? আমরা ঘটকে ইহার উপাদান কারণ মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেই নাশ বলিয়া জানি। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মনোরূপ আত্মার ত নাশ প্রত্যহ দৃষ্ট হইতেছে এবং প্রত্যহ নব নব আত্মার সৃষ্টি হইতেছে?

*　　　　*　　　　*

প্রাণাত্মবাদী বলেন, সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়গণ যখন বিলয় প্রাপ্ত হয় তখন জাগ্রত থাকে কে? এ দেহকে ধারণ করে কে? প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রামণ বা নির্গত হইলে দেহ নষ্ট হইয়া যায়—ইন্দ্রিয় এবং মনও উহার সহিত নির্গত হয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে বিদ্যমান থাকাতে প্রাণকেই আত্মা বলিয়া আমরা জানি। প্রাণই নিজ শক্তি মনাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিয়া ইচ্ছা জ্ঞানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। এই প্রাণকেই শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভরূপে উপাসনা করা হইয়াছে। এই মুখ্যপ্রাণ অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সহিত সু ও কু গতি প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রুতি সিদ্ধ। নানা আখ্যানের মধ্য দিয়া ঋষিরা ইহা উপনিষদে প্রতিফলিত করিয়াছেন। উত্তরে আমরা বলি, তোমরা যাহা বলিলে উহা সকলই সত্য, কিন্তু প্রাণকে চৈতন্যস্বরূপ বলিতে পারি না। কারণ প্রাণে "আমিত্বের" বোধ নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে মনেন্দ্রিয়াদি যখন সুষুপ্তিতে বিলয় প্রাপ্ত হয় প্রাণ তখন জাগ্রত থাকিলেও আমিত্বের বোধ জীবের থাকে না। প্রাণই যদি চৈতন্য বা আমিত্বের বোধ রূপ হইত তাহা হইলে সুষুপ্তিতেও আমিত্বের জ্ঞান থাকিত। তাহার পর প্রাণ চঞ্চল।

দেহকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেনা। অন্নের দ্বারা দেহ পুষ্ট হয়, অন্নাভাবে প্রাণও দুর্ব্বল হয়। দেহের চঞ্চলতায় প্রাণও চঞ্চল হয়। অতএব অনুমান করিতে হয় প্রাণ সাবয়ব। যাহা সাবয়ব তাহা নশ্বর॥ হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিপ্রাণ যতদিনই থাকুক কিন্তু সাবয়বত্ব প্রযুক্ত তাহার নাশ আমরা কল্পনা করি।

* *

পুত্রাত্মবাদ দেহাত্মবাদ অপেক্ষাও স্থূল। পুত্র 'পুষ্ট হইলে আমি, পুষ্ট, পুত্র নষ্ট হইলে আমি নষ্ট'—এই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ বোধ হইতে পুত্রেই আমিত্ব বোধের বিষয়রূপে অবধারণ করিতে হয়। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' ইহা শ্রুতিতেও আছে। কিন্তু পুত্র আত্মা হইলে ব্রহ্মচারীর আত্মা নাই বুঝিতে হইবে। যতদিন পুত্র না হয় ততদিন গৃহস্থের আত্মা থাকে না এবং পুত্রের মৃত্যু হইলে পিতারও শ্রাদ্ধ করা উচিত ইহাই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়।

* * *

ভারত যে কতকালে নানা মতবাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যথার্থ সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে তাহা বলা বড় কঠিন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—"এই জগতের কারণ কি? আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কাহাতে জীবিত আছি, কাহাতে সম্প্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিতাই বা কে, সুখে দুঃখে আমরা কাহার দ্বারাই বা বর্ত্তমান—ব্রহ্মবিদেরা ব্যবস্থা করিয়া বলুন? ইহার কোনটী কারণ,—(১) কাল, (২) স্বভাব, (৩) নিয়তি (৪) যদৃচ্ছা, (৫) ভূত সকল (৬) প্রকৃতি, না (৭) পুরুষ, অথবা (৮) ইহাদের দুই বা বহুর সংযোগ। কিন্তু তাহাত হইতে পারে না কারণ ইহাদের আত্মভাব বা চৈতন্য নাই? পরন্তু পুরুষে চৈতন্য থাকিলেও সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া তাহাকেও ঈশ্বর বলিতে পারি কি?" (শ্বেত, ১ম, ১২)। এই আটটী কারণের নির্দ্দেশ দেখিয়াই পাঠক অনুমান করুন বৈদিক যুগেও ভারতভারতীর চিন্তাশক্তির কতদূর বিকাশ ঘটিয়াছিল এবং কত মতান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে, অতঃপর "কালাত্মাদি নিখিল কারণের অধিষ্ঠিতা এক দেব ও তাঁহার শক্তিকে ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছিলেন" (শ্বে, ১ম, ৩)।

বন্ধু।

(শ্রীবিমলচন্দ্র গাঙ্গুলী)

(গল্প)

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দুইবারের বারেও প্রমোশন না পাইয়া ভূপতি বাহিরে বাহিরে দিনকতক ঘুরিয়া প্রথম দিন সে যখন প্রায় মধ্যাহ্নের সময় ক্লাশে প্রবেশ করিল, তাহাকে লইয়া বেশ একটা ছোট রকমের হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল।

থার্ড মাষ্টার মঙ্গলময়-বাবু চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন। ভূপতির সতর্কিত পদক্ষেপ ও দীর্ঘ ছায়ায় সন্ত্রস্ত হইয়া হঠাৎ তিনি গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন ও বলিয়া ফেলিলেন যে কাল অম্বলের ব্যারাম বাড়ায় সারারাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। তারপর যখন দেখিলেন যে হেড্ মাষ্টার বা পদস্থ কোনও ব্যক্তি নহে,—প্রমোশনে ফেল ভূপতি, ছেলেরা তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে, তখন মাষ্টারির উপরি ঘুমটুকু ভাঙ্গায় যে কতটা রাগ হওয়া উচিত তাহাই দেখাইতে মনস্থ করিয়া—

থিয়েটারি ধরণে ভ্যাংচাইয়া বলিতে লাগিলেন "আসুন! আসুন! এই সব ছোট ছোট ছেলেদের ঠাকুর দা, না জেঠা মহাশয় কে আপনি তদন্তে এসেছেন বলুন ত ওরে! দে একটা টুল এনে বসতে দে!" ছেলেদের মধ্যে যাহারা চালাক, হাসিয়াছিল বলিয়া ভয়ে তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু একটা ফটফুটে ছোট ছেলে অকুতোভয়ে আপনার পাশটাতে ঠেলাঠেলি করিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভূপতিকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। ভূপতি অকূলে কূল পাইবার মত আনন্দে সে দিকে অগ্রসর হইতেছিল, মাষ্টার মশাই ধমক দিয়া বলিলেন—"দাঁড়াও," তারপর বুঝাইতে লাগিলেন যে তাঁহার কাছে একটী বিশেষ মন্ত্র আছে সে মন্ত্র বেত্রমুখে চর্ম্মদ্বারা

বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া সে স্থানের সমস্ত গোময় পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে! তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন "লাস্‌ট সিটে বোস।"

যে ছেলেটী ভূপতিকে জায়গা করিয়া ডাকিয়াছিল, মাষ্টার মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গার রাগটা পড়ে নাই, তাহারি উপর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এটা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। অল্পক্ষণ পরেই মাষ্টার মহাশয় পড়া লওয়া আরম্ভ করিলেন, আজিকার পড়াটা ঘুরাইয়া যত রকমে ধাঁধাঁ লাগাইয়া পারা যায় সেই ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

রুদ্ধশ্বাসে স্তম্ভিত হইয়া ভূপতি আড়চোখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—কি আশ্চর্য্য ছেলে! একটা প্রশ্নেও সে ঠকিল না। মাষ্টার মহাশয় যদি তাহার উত্তর ভুল বলেন সে বই খুলিয়া দেখাইয়া দেয় তাঁহার জিজ্ঞাসা করাটাই ভুল। এতবড় সর্ব্বশক্তিমান মাষ্টারটা প্রতিকূল, তার জন্য সে এতটুকুও জড়িত বা অভিভূত নহে।

ঘণ্টা কাটিয়া গেলে ছেলেটী আবার ভূপতিকে ডাকিল ও যেখানে বসিতে বলিয়াছিল বসাইল। আর কোনও মনোযোগ লইল না। ভূপতি মাঝখানে বসিয়া আছে মাত্র, সে যেমন প্রতিদিন সকলের সহিত কথা কয়, পড়া দেয়, তাহাই চলিতেছে।

শেষ ঘণ্টার প্রথম মুখে হঠাৎ সে আশ্চর্য্য হইয়া ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল—"কই ভাই তুমি ত কথা কইচ না?" উত্তরটা ভূপতি ঠিক দিতে পারিল না, আবার তাহার হইয়া যাহারা দিয়া দিল তাহাতে সমস্ত শরীরটা জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সমস্বরেই তাহার সমস্ত আবরু ও সম্ভ্রমকে কুটিকুটি করিয়া দিয়া বলিল—"ও যে পুরোনো পাপী ভাই।" আর একজন বলিল—"লজ্জা ভাঙ্গুক।" অপরজন বলিল—"দু দু বছর যে পড়ে আছে। ডবল নীচু ক্লাসের ছেলের সঙ্গে পড়তে হলে আমরা যে মরেই যেতুম। তুমি কি পার ভাই সেভন্‌থ্‌ ক্লাসের ছেলের সঙ্গে পড়তে পার?"

সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসের ছেলে তাহাদের সঙ্গে একপড়া পড়িতে পারিলে

পড়িতে কি আপত্তি হয় তাহা এ ছেলেটী কিছুতেই বুঝিতে পারিল না ! বুঝাইতে গিয়া সহপাঠিগণও বিব্রত হইয়া উঠিল। তাহারা যত বলে, নীচু ক্লাসের ছেলের সঙ্গে পড়া যায় না,—এ অপমান—সেও তত বলে, তাহারা যদি পারে—যাবে না কেন? অপমান কিসের, আমাকে তাহাদের মত নীচু পড়া পড়িতে হইবে, লোকসানের কথা বটে। তাহারা যত বুঝাইতে যায় পড়ায় আবার লাভ লোকসান কি, ক্লাসের উচুঁ নীচুই ত কথা। সেও তত জোর দিয়া বলিতে থাকে, পড়ার কমবেশী নিয়েই ত ক্লাশ, ছেলের আবার উঁচু নীচু কি? অবশেষে তর্কে আর মীমাংসা হইবার কোনও উপায় রহিল না, কলহ দাড়াইয়া গেল।

তাহারা ঠাট্টা করিতে লাগিল এও রাগ করিতে লাগিল, শেষ সীমায় উঠিলে সকলের সহিত আড়ি দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল যাহাকে লইয়া ব্যাপার, সেই নবাগত ভূপতি সতৃষ্ণনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে—তাহার মুখখানা যেন করুণায় গলিয়া গেল। ভূপতি আরো একটু তাহার দিকে সরিয়া আসিয়া বসিল।

যে ভূপতির স্কুলে যাওয়ায় মরিবার মতই ভয়, সে পরদিন পাছে সেই ছেলেটীর পাশের সিট দখল হইয়া যায় ভাবনাতে অনেক পূর্ব্বেই স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। থার্ড মাষ্টারের ঘণ্টায় পড়া না পারায়, লাঞ্ছনার জন্য না হউক, এই স্থানটী ছাড়িয়া গিয়া বসিতে হইল বলিয়া তাহার যেন বিমনা ভাব আসিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে বলিলেন এ বৎসর পাশ করিতে না পারিলে তাহাকে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। সেই অবকাশে কালিকার কোন্দলের জের তুলিয়া ছেলেরাও ছোট ছেলেটীর উপর প্রতিহিংসা তুলিতে ভুলিল না। বলিল, 'স্যার, শৈলি ওর সঙ্গে ভাব করেচে, আমরা কেউ কথাও কইনি, বুড়ো ধাড়ি পুরোনো পাপী।' স্যার সন্দিগ্ধ মুখে শৈলির মুখের দিকে চাহিয়াই ক্রোধে লাফাইয়া উঠিলেন—"হাসি! তামাসা পেয়েচ?" শৈল তাড়াতাড়ি বেঞ্চের ডেস্কে মুখ লুকাইল।

এই উপলক্ষে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত লাঞ্ছনাটুকু মনে রাখিয়া শৈল ছুটীর পর ভূপতিকে আপনার সঙ্গে যাইতে ডাকিল।

বাড়ী অন্যদিকে হইলেও ভূপতি এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না; তাহার সঙ্গ লইল। শৈল কিছুদূর নীরবে গিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের উপর দুই চক্ষু স্থাপিত করিয়া কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি পড়া পার না কেন, সত্য বল?"

ভূপতি নিরুত্তর।

"বাড়ীতে পড়াতে কেউ বসে না, পড়তে সময় দেয় না?"

ভূপতি এবারও নীরুত্তর রহিল।

"পড় না তবে—লেখা পড়ায় মন নেই তাই?"

ভূপতি কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

শৈল তাহাকে ধমক দিয়া থামাইয়া বলিল—"ছিঃ, চালাকি করো না। আমি তোমার সঙ্গে বাজে কথা কইতে তোমায় ডাকিনি। স্কুলে শিখতেই আসচি, শেখাটা কষ্টকর বোঝ ত লেখা পড়া ছেড়ে দাও। রাস্তায় ফেরিওয়ালা হও গে।"

অতর্কিতে এই কথায় ভূপতি যে শিহরিয়া উঠিল তাহা নহে, তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। শৈল পড়ায় অসাধারণ ভাল, স্বভাবে যেন স্বর্গ-শিশু। তাহার জন্য ইতিমধ্যে অনেকটা সহ্য করিয়াছে, সে কেহ না বলিলেও বুঝিয়াছে, কেহ না করাইলেও মনে মনে অনেক ভাল করিয়াই মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু সমস্তই সৌন্দর্য্য প্রিয়তার ভাবে। আপনি খারাপ হউক, বয়স ক্ষমতা বুদ্ধি এ তিনটায় শৈল অপেক্ষা অনেক বড়। তাহাকে টেঁকে করিয়া গড়ের মাঠ ঘুরাইয়া অনিতে পারে এ কথাটাও ততখানিই সে মনে মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল। আর সর্ব্বোপরি একটা বিষয়ে খুব নিঃসন্দিগ্ধ ছিল—শৈল ছোট অতএব দুর্ব্বল। ক্লাসের বাহিরে—ঘরের বাহিরে—রাস্তায় শৈলর মুরুব্বিয়ানা তাহার অসহ্য হইল। আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া চড়া কথা শুনাইয়া দিল। চড়া কথা জানে না কে? তার উপর এমন স্থলে ভূপতির এমন ব্যবহারকে কৃতঘ্নতা বলিলে অভিধানদ্রোহীতা ত

হয়ই না, শৈলও উষ্ণ হইয়া উঠিল। শৈলর উষ্ণতাও ভূপতিকে আরো অধিক বাজিল, যেন মর্ম্মান্তিক হইল, সে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বই খাতা সব কাড়িয়া লইয়া এলোপাতাড়ি ঘা কতক তাহাকে বসাইয়া দিয়া রাস্তার লোক জমিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সহসা কি এক অনিবার্য্য প্রবৃত্তির বশে ভূপতি যাহা করিয়া বসিল কোনও স্থলেই সে এতটা করিতে পারে না। শৈলও যাহা সহ্য করিল কোনও স্থলেই সে ইতিপূর্ব্বে তাহা সহ্য করে নাই। তারপর সে দিন, অবশিষ্ট সমস্ত দিনটা, উভয়েই তাহারা এই ঘটনাই পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াছিল, আর সমস্ত ঘটনা ইহার দ্বারা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

পর পর তিনদিন শৈল আর স্কুলে আসিল না। কয়দিন, এবার ভূপতির উপর মাষ্টার মহাশয়দিগের দৃষ্টি কঠোরভাবে নিবদ্ধ ছিল, পড়ার জন্য সে এমন লাঞ্ছিত হইতে লাগিল যে স্কুল পলাইলেই সে বাঁচে, তথাপি কিসের আশায় তাহা পারিল না। নিত্য আসিয়া এই লাঞ্ছনাই মাথা পাতিয়া লইতে লাগিল। চারদিনের দিন শৈল আসিয়া যে স্থানে সে প্রত্যহ বসিত, যেস্থানে ভূপতিকে আপনি ডাকিয়া পাশে বসাইয়াছিল সে স্থানে বসিল না। যোগেন বলিয়া এক গম্ভীর মূর্খ কর্কশ কণ্ঠ শিক্ষকদের বিশ্বাসের পাত্র ক্লাসের রাশভারি ছেলের পাশে বসিল। এই জীবনে ভূপতি প্রথম এক অভিজ্ঞতা অনুভব করিল। পরের উপর রাগার মত আপনার উপরও মানুষকে ক্রুদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু, আজ প্রত্যেক পড়া ভুলে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিলে কাঁদিয়া ফেলায় আশ্চর্য্য হইয়া মাষ্টার মহাশয় তাহাকে বসিতে বলিলেন।

সকলে বুঝিয়াছে থার্ড মাষ্টারের শাসনে শৈল ভূপতির সহিত অতঃপর আলাপ বন্ধ করিয়াছে। ভূপতি শৈলর চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিল সে যেন তাহাকে চিনিতেই পারে না, এই ভাবে দুই তিন দিন কাটিয়া টিফিনের ছুটীতে উভয়ে হঠাৎ একবার সকলের অসাক্ষাতে সমান সমান হইয়া পড়ায় শৈল বলিয়া, ফেলিল, "কি ভাই!" সেই স্বাভাবিক

কণ্ঠস্বরে আহত হইয়া ভূপতি পিছাইয়া গেল। একান্ত কি নীরবে ভাবিতে লাগিল। টিফিনের পর তাহাকে আর কেহ ক্লাসে দেখিতে পাইল না।

ছুটীর পর শৈল একাকী বাড়ী যাইতেছে দেখিল পথরোধ করিয়া ভূপতি; সে পলাইবার উপক্রম করিল, ভূপতি গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমার বই খাতা ফিরিয়ে দিচ্চি নাও।" শৈল বই খাতা হাত পাতিয়া লইল, পলাইল না। সে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, তাহার সহিত কথাও কহিল না। ভূপতি অবশেষে বলিল—রাস্তায় অমন দু এক ঘা মারতে পারি বলেই স্কুলে গরুর মত মার খেতে পারি, নৈলে মরে যেতাম বুঝেচ? শৈল একবারের জন্য—নিমেষের জন্য মাত্র ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, হাঁ জানি, সে তখনি বুঝে গায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলেচি, কুসঙ্গে মিশিলেই কুফল আছে। এবার ভূপতি বুঝিল সে তাহাকে ভয় করিবার পাত্র নয়। অতঃপর আর কোনও কথা হইল না তবুও ভূপতির সঙ্গে সঙ্গে শৈলর বাড়ী অবধি গেল।

পরদিন হইতে ভূপতি স্কুল কামাই করিতে লাগিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল মাষ্টারদের কড়াকড়িতে এইবার সে স্কুল ছাড়িয়াছে। ক্রমে সাতদিন অবধি সে কিংবা তাহার কোনও ছুটীর দরখাস্ত আসিল না দেখিয়া শিক্ষকরাও তাহাই স্থির করিলেন।

সেই দিন বাড়ীর পথে ভূপতির সহিত শৈলর দেখা হইয়া গেল —সে শুষ্কমুখে বলিল, "শৈল রাগ পড়িয়া থাকে ত বল স্কুলে কি হইতেছে?" হঠাৎ এমন সম্বোধন ও প্রশ্নে শৈল হাসিয়া ফেলিল। সাহস পাইয়া ভূপতি বলিল, "শৈল আমার পড়া নষ্ট করিও না। আমায় ক্ষমা কর। আমি এই কয়দিনই স্কুলের নাম করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হই কিন্তু পথে পথে ঘুরি, এই দেখ এই খাতা।" তাহার পড়া নষ্টর স্পষ্ট কারণটা শুনিতে কৌতূহলী হইয়া শৈল কোমল হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে সম্মত হইল। ভূপতিও পায়ে পায়ে তাহার পিছু লইল। ভূপতি বলিল, "শৈল তুমি যদি না রাগ কর", শৈল বলিল,—"রাগ করি নাই"। ভূপতি বলিল—"তুমি যদি সব

ভুলিয়া যাও", শৈল বলিল, "গিয়াছি"। এমনি সে অসংলগ্ন বকিতেছিল, অবশেষে শৈল সত্যই সে দিনকার কথা ভুলিয়া তাহাকে ধমকাইল।

ভূপতি আজ তাহার সম্মুখে অবনত সে বলিল—"শৈল আমি মানুষ হব।"

"পড়া শুনা করিবে?"

"হাঁ মন দিয়া পড়িব শুনিব।"

"যাহাতে ভাল লোকের প্রিয় পাত্র হইতে পার চেষ্টা করিবে?"

ভূপতি বলিল, "তোমার সব কথাই আমার শিরোধার্য্য।"

শৈল আনন্দিত হইল। তাহার হাতের মধ্যে আপনার ছোট হাতখানি দিয়া বলিল—"আমরা বন্ধু।" সে উৎফুল্ল হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। ভূপতি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল কিন্তু সেও মনের আনন্দে হাসিতেছিল।

পরদিন শৈল স্কুলে একটু তাড়াতাড়ি আসিয়া ভূপতিকে সন্ধান করিল। সে আজ অসিয়াছে। শৈল বলিল, "বন্ধু নির্জ্জনে এস।" সে দুই সেট্ খাতায় হোমটাস্ক করিয়া আনিয়াছিল এক সেট্ ভূপতিকে দিল—"বুঝিয়াছ ত ব্যাপার কি?" ভূপতি আনন্দে চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল।

শুষ্কমুখে শৈল বলিল, "ইহা জুয়াচুরি। কিন্তু তোমাকে প্রহার হইতে বাঁচাইবার অন্য উপায় ভাবিয়া পাইলাম না।" অর্দ্ধেক প্রহার সেই খাতার জোরে বাঁচিল। পাশ হইতে চুপি চুপি বলিয়া দিয়া কোলের উপর খাতা রাখিয়া লিখিয়া দেখাইয়া আর অর্দ্ধেক প্রহারও শৈল কতকটা বন্ধ রাখিল। এই ভাবেই কিছু দিন কাটিল। ক্রমে সকলে বুঝিল ভূপতিচরণ ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি করিতেছে।

আর একদিনও শৈল ভূপতিকে পড়িতে বলে নাই। সে বুঝিয়াছিল ভূপতির মধ্যে এমন কিছু আছে যে সে আপনার ত্রুটী বুঝিবে না, আপনার দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়াও দেখিবে না, বরং, সেগুলি সযত্নে পুষিয়া রাখিয়া দেওয়াই ইহার বুদ্ধিতে আত্ম সম্মান। পিতার নিকট সে স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনিত,—এই বয়সেই তাঁহার বক্তৃতার বাংলা

অনুবাদ গুলি বুঝিয়া বুঝিয়া পাঠ করিয়াছিল, বুঝিল এ সেই "মৃত-হিন্দুর" একজন। বিবেকানন্দের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত এই ক্ষুদ্র সংস্কারক Positive ideaর সাহায্যেই আপনার বন্ধুটীর বিশাল অসর্ম্বত্ব দূর করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। সমস্তদিন এখন হইতে ইহারা একত্রে থাকে অথচ কখনও একটী বাজে কথা নাই—কেবল পড়ার কথা—এই ক্ষুদ্র সামান্য তুচ্ছ আরম্ভের জীবনেই পরিণামের জন্য কতদূর পর্য্যন্ত উচ্চ আশা পোষণ করা যায় তাহারই কথা—দেশে বিদেশে কেমন করিয়া কে বড়লোক হইয়াছিল তাহারই কথা—কেবলি এই সব। শৈলর কাছ হইতে খাঁটী সহানুভূতিটুকু পায় বলিয়া ভূপতি তাহার সঙ্গ ছাড়িতে পারে না। শৈলর এতটুকু গুমর বা রূঢ়তা নাই আবার তাহার কথাগুলি বড় মিষ্ট তাহাই শুনিতে ভূপতির খুব ভাল লাগে। সঙ্গলাভের জন্য সে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই আলাপে যোগ দিত কিন্তু যে ভাবের কথা আপনি বুঝিতে ও কহিতে পারে যে ভাব আপনার অভ্যাস, তাহার অভাবেও ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই ক্লান্তি ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রায় চড়িলে তাহার বিপরীত জাতীয় প্রবৃত্তি একদিন গা ঝাড়া দিয়া এক হাস্য ঘটায় কিছুদিনের জন্য স্কুলটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

সে দিন ক্লাসে কি জন্য শিক্ষক ছিল না। ছেলেরা প্রথামত গোলমাল মারামারি করিতেছে। শৈল একান্তমনে অঙ্ক কষিতেছিল পাশ হইতে ভূপতি ছোঁ মারিয়া তাহার পেন্সিলটা কাড়িয়া লইয়া কোলের উপর একখানা খাতা ফেলিয়া দিলে সে চমকিয়া তাহার পানে চাহিয়াই কেমন একটা অতর্কিত ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, দেখিল বেচারার শরীরের সমস্তরোম খাড়া, মুখখানা কেমন এক অস্বাভাবিক কালিমায় অন্ধকার দেখিল, তাহার দুই রগ বহিয়া বড় বড় ঘামের ফোঁটা ঝরিতেছে। শৈল ফিরিয়া চাহিতেই সে মুখ নীচু করিয়া তাহার দুইটা উরু আপনার মুষ্টি মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল।—কি কচ্চ ভূপতি? সর্দ্দিতে গলা বসিয়া গেলে যেমন স্বর হয় তেমনি স্বরে ভূপতি বলিল—শৈল পড়, তোমার ডাকে চিঠি এয়েচে! শৈল খাতার লেখাটা চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল, পরিষ্কার পাতার মাঝখানে ভাঙ্গা ছন্দে বাঁকা হস্তাক্ষরে এক কবিতা

তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্থ শৈল আবার জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ বয়ে পেয়েচে, খাতায় টুকেচো কেন? ভূপতি তখনো তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, খাতাখানি মুঠার মধ্যে, উরু হইতে ভূপতির হাত ছাড়াইয়া শৈল ধীরে ধীরে গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া—বোধ হয় এই কৌতুকের মধ্যে আপাদমস্তক সঞ্চারিত রাগটাকে ডুবাইয়া শান্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে ভূপতি যদি তাহার মোটা মোটা পা সরু সরু হাত মেলিয়া ঝাঁকড়া চুল ছড়াইয়া আকাশে উড়ে দৃশ্যটা কেমন হয়? তারপর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সে ছুটীয়া গিয়া যোগেনের ঘাড়ের উপর পড়িল। গলা জড়াইয়া টানিয়া তাহাকে প্রায় মাটীতে ফেলিয়া দিবার যোগাড় করিল'—"কেরে? এই এই পাগলা"—"দেখ না যোগেন দা, ভূপতি নাকি উড়তে পারে!" যোগেন কবিতাটী পড়িয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। শৈল হাসিয়া তাহাকে ছোট একটা ধাক্কা দিলে, সে তাহাকেও ষ্টুপিড্ বলিয়া ধমক দিয়া উঠিল, রক্তচক্ষে ভূপতির দিকে তাকাইয়া বলিল—"রোস্ এর জন্যে রাসটিকেট্ হস্ কিনা দেখ।" তারপর জুতা খট্ খট্ করিতে করিতে ক্লাস ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্লাস শুদ্ধ ছেলে এখনি কোনও বিপৎপাতের অনুমানে সন্ত্রস্ত হইয়া যে যার স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। একটি কথাও কহিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। শৈলর চমক ভাঙিল, বুঝিল তাহাদের এই হঠাৎ অনুষ্ঠিত কাজের পরিণাম খুব খারাপও হইতে পারে। অপ্রতিভ হইয়া শুষ্কমুখে আপনার বালক বুদ্ধির উপর মর্ম্মান্তিক অনুযোগ ঢালিয়া বলিতে লাগিল—"তবে ভূপতি, শীঘ্র জানালা গলে বেরিয়ে উড়ে পড়, যোগেন সব কর্ব্বে তখন, ওড়ো, ভূপতি ওড়ো।" ভূপতি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া তুইচকে তাহার প্রতি অগ্নিবর্ষন করিতে লাগিল।

যোগেন ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কাল তোমার বিচার ভূপতি, স্কুলে পড়া বন্ধ হল দেখে নিয়ো।" শূন্য ঘরে বসিবার জন্য অপর শিক্ষক প্রেরিত হইলেন। যোগেন তাঁহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে

তিনি ও ক্লাস শুদ্ধ সকলের মতে একবাক্যে স্থির হইল ভূপতি নিশ্চয়ই স্কুল হইতে বিতাড়িত হইবে। শৈল আর সারাদিন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ভূপতির অধোবদন।

পরদিন ভূপতি ভয়ে স্কুলে আসিতে পারে নাই। শৈল যোগেনকে ধরিয়া বসিল, "যোগেন আমি ত তোমায় ওকালত নামা দিই নি তুমি কেন কেস কর্‌লে বল?" যোগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুমি তবে কি বল্‌তে এসেছিলে আমাকে?" সে বলিল, "আমি তোমায় আস্পায়ার খাড়া কর্ত্তে এসেছিলাম। সে আমার সহিত আকাশে উড়িয়া ডিগ্‌বাজি মারিয়া ক্লাশশুদ্ধ ছেলেকে একটা দুর্লভ সার্কাস দেখাইতে পারে কি না।" সকলে তাহার স্বরে ও অঙ্গভঙ্গিতে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল! তারপর শৈল ছল্ ছল্ চোখে বলিল— "দুইটা ঘুসি হাঁকড়াইলেই যাহা হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম তাহার জন্য লজ্জার মাথা খাইয়া গুরুজনের সমক্ষে—কেন তুমি আমাকে এই অপমানের মধ্যে ফেলিতেছ?" এবার যোগেন বুঝিল। ছেলেরা সভা করিয়া স্থির করিয়া লইল এ ব্যাপার উড়াইয়া দিতে হইবে।

দিন তিনেক পরে রবিবার মধ্যাহ্নে শৈল আরও দু তিন জন ক্লাসের ছেলে লইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভূপতির বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলে ভূপতি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পলাইবার উপক্রম করিল। শৈল তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলে, সেপ্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"বাড়ীতেও লাঞ্ছনা কর্ত্তে এলে শৈল!" শৈল হাসিতে লাগিল, বলিল, "কাজেই, যদি স্কুলে না যাও করি কি?" ভূপতি এবার সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল— "আমি আর স্কুলে যাব না।" শৈল অনুতপ্তস্বরে বলিল—"ভূপতি, আমা হতে তোমার আর একবার সাতদিন স্কুল কামাই হয়েছিল মনে পড়ে, এযে ফিরে সেই অপবাদেই পড়চি ভূপু!" ভূপতি তাহাকে নরম দেখিয়া কান্না ছাড়িয়া রাগ ধরিল, বলিল—"আসার মতলব তবে ঠাট্টা?" শৈল রঙ্গভরে বলিল—"না তোমার মত মহাবীরেই চিঠি লিখে ঠাট্টা করে!" তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, "শোন ভূপতি! তোমার মাথা কি সত্যই খারাপ হয়ে গেল নাকি? কি একটা কবিতা ভাল লেগেছিল, আমায়

ট্রুকে এনে দেখিয়েচো, তাতে এমন চোরের মত লুকোবার কি আছে ?”

ভূপতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল, “হেড্ মাষ্টার—নালিস—যোগেন কি তবে সেদিন—

তাহার কথায় সঙ্গী ছেলেরা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শৈল গম্ভীরভাবে বলিল—“তাই যদি হতে দোব ভূপতি, তবে তোমায় শুধু শুধু আমার বন্ধু করেচি !”

ছেলেদের গোলমালে বাড়ীর ভিতর হইতে ভূপতির বাবা কি কাকা কে একজন বাহিরে আসিলে শৈল তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—“ভূপতি তিনদিন স্কুলে যাচ্চে না, মাষ্টার মহাশয় আমাদের খোঁজে পাঠিয়েছেন।” এইরূপে তাহার স্কুলে আসিবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গীদের লইয়া ফিরিয়া চলিল।

*　　　　*　　　　*

ভূপতি সতর্ক হইয়া পরদিন স্কুলে গেল। ভাবিয়া রাখিয়াছিল গতিক মন্দ দেখিলে দৌড় দিবে ! সত্যই সমস্ত মিটিয়া গিয়াছিল ! যে শৈল এক নিমেষে এত বড় লজ্জার সৃষ্টি করিতে আবার ইচ্ছামত এমন ভাবে মিটাইয়া লইতে পারে, তাহাকে এবার হইতে সে ভয় করিতে শিখিল। এত বড় ভয় মাঝখানে থাকিলেও বন্ধুত্ব ভাঙ্গে নাই। শৈল চিরকাল সাহায্য করিয়া এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

গান।

ওগো ! তোমার আলো গভীর ঘন রাতে
আসে নেমে আমার নয়ন পাতে
নইলে কি গো অম্‌নি চলি
সবায় আমি পিছে ফেলি
কণ্টকবন পায়ে দলি
গহন বন পথে।

—উমাপদ মুখোপাধ্যায়।

কাশ্মীরে অমরনাথ।

(সমাপ্ত)

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

কি প্রকারে লিঙ্গ বরফ পাতের দ্বারা গঠিত হয় তাহা কেহ কখনও দেখিয়াছে কিনা জানা যায় না। কারণ শ্রাবণী পূর্ণিমার পূর্ব্বে কোন লোক জন এখানে আসে না। শুনা যায় কচিৎ কখন এক আধ জন সাধু আসিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের নিকট কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কারণ তাঁহারা কখন কিরূপে ফেরেন তাহা বুঝা যায় না, তাহা ব্যতীত ১৫ দিন এখানে বসিয়া না থাকিলে ক্ষয় বৃদ্ধিই বা বুঝা যাইবে কিরূপে। কিন্তু এক পক্ষ এখানে বাস. করা যোগজ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। দৈবাৎ বরফপাতে একদিনেই সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিতে পারে। যাহা হউক, প্রতিবারেই এই সময়ে যে মূর্ত্তি ঠিক এই আকারের হয় তাহা নহে; কোন কোন বার ইহাপেক্ষা অনেক বড় হইয়া থাকে।

ভীড়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বাবার সম্মুখীন হইলাম। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইলেন; তৎপরে তাঁহার আদেশ-মত তুষারময় গৌরীপট্টকে সভক্তি আলিঙ্গন করিলাম এবং যথাশক্তি পূজা দিলাম। এখানে এই বিধি। কেদারনাথেও বাবাকে এইরূপে আলিঙ্গন করিতে হয়। এখানে একটা প্রবাদ আছে যে পূজান্তে পায়রা দর্শন করিতে হয়; উহা না দেখিতে পাইলে কেহ কেহ বলেন যে পূজা সার্থক হইল না। এই উক্তিটা যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কতক লোকের বিশ্বাস যে এখানে ২টী পায়রা বাস করে। ইহা ত নিতান্ত অসত্য; কারণ অনেকে ২টীর অধিক পায়রা এক সময়ে দেখিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে পায়রা বাস করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাসই হয় না। কোন

পাখী এখানে থাকে না এবং তাহাদের খাইবারও কোন ফসল হয় না। কোন কোন লোকের মুখে শুনিলাম পাণ্ডারা গুপ্তভাবে ২।৪টী পায়রা আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। আমার এই কথায় কিন্তু খুব বিশ্বাস হয়। যাহাই হউক যখন পূজা সাঙ্গ করিয়া চারিদিকে বেড়াইয়া বেড়াইতেছি, সেই সময়ে স্বামিজী আমাকে উপর দিকে পায়রা দেখিতে বলিলেন; দেখিলাম একটী পায়রা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুহাটীর ভিতরের দিকে অত্যুচ্চস্থানে উড়িয়া বেড়াইতেছে। প্রবাদটী সত্য হউক মিথ্যা হউক পায়রা দর্শন ত ভাগ্যে ঘটিল। এইবার গুহা হইতে নামিয়া আসিয়া যেখানে আমাদের কাপড় চোপড় ছিল সেখানে আসিলাম এবং জামা জুতাদি পরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, তখন বেলা আন্দাজ ১০টা হইবে। বেলা ২টার মধ্যেই সকল যাত্রী এখান হইতে প্রাত্যাবর্ত্তন করে; সকলের শেষে পাণ্ডাগণ ও সরকারী সমস্ত লোক, পূজোপহার সমস্ত লইয়া বাবাকে এক বৎসরের জন্য জনহীন তুষার প্রদেশে রাখিয়া চলিয়া আসে। বলিয়া রাখি পূজাপ্রদত্ত দ্রব্যগুলি ৩ ভাগ করিয়া ১ ভাগ পাণ্ডাগণকে ১ ভাগ মুসলমান কুলীগণকে (যাহারা পথ প্রস্তুত করে) এবং অবশিষ্ট ভাগ মোহান্ত মহারাজকে দেওয়া হয়।

দ্বিপ্রহর অতীত হইলে আমরা পঞ্চতরণীতে ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় শেষের দিকের খানিকটা পথ ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া ছিলাম। কারণ, বন্দোবস্ত করা ছিল যে আমাদের পাচক যতদূর সম্ভব আসিয়া ঘোড়া লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। আসিয়াই বাজার হইতে পুরী তরকারী কিনিয়া খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। আজ কিন্তু আর পঞ্চতরণীর পূর্ব্বের মত হাল নাই; কতক যাত্রী অমরনাথ দর্শন করিয়া আসিয়া এখান হইতে রওনা হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত কতক দোকানদারও চলিয়া গিয়াছে। ফলতঃ আর সে জমাটি ভাবও নাই আর সে আনন্দ কোলাহলও নাই। এখন সব ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ফিরিবার সময় আর কোন বিধি নিষেধ নাই; যে যত শীঘ্র পারে মটনে ফিরিতে

চেষ্টা পাইয়া থাকে। কেহ দুই দিনে, কেহ তিন দিনে, কেহ বা চার দিনে ফিরিয়া থাকে। আমরা এবং অধিকাংশ যাত্রী ঐ দিন পঞ্চতরণীতেই ছিলাম। বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে চতুর্দ্দিকস্থ গিরিমালার আকাশচুম্বী শিখরগুলির কষিত রজত কান্তি নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলাম, এবং পরদিন হইতে আর এই রোমাঞ্চকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাইব না ভাবিয়া একটু কাতর হইলাম। সন্ধ্যা সমাগমে তাঁবুতে আসিয়া আহারাদি সারিয়া শয়ন করিলাম।

প্রাতে উঠিয়া দেখি আর একটীও তাঁবু খাড়া নাই; অনেক লোক চলিয়া যাইতেছে এবং বাকী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যথা সম্ভব ত্বরার সহিত আমাদের মাল গুলি গুছাইয়া গাছাইয়া ঘোড়া ও কুলির উপর বোঝাই দিয়া, উদ্দেশে একবার বাবা অমরলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম। ফিরিবার সময় অন্য পথে যাইতে হইবে; আসিবার সময় চন্দনবাড়ী হইতে ২দিনে পঞ্চতরণী আসিয়াছিলাম, যাইবার সময় এই পথে একদিনে যাইতে হইবে। আজ চলিতে চলিতে দেখিলাম কতক ব্যক্তি রুগ্ন বা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছে এবং অতি কষ্টে পথ অতিক্রম করিতেছে। তবু এই বৎসর অমরনাথের অশেষ করুণায় বারিপাত বা কোন দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটে নাই; তাহা হইলে ঐরূপ বিপন্নের সংখ্যা কত যে দেখিতে হইত তাহা বলা যায় না। ৫।৭ মাইল ধীরে ধীরে চড়াই করিয়া আমরা একটী সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। চির হিমানীময় পর্ব্বতমালা উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; উহার শুভ্রবর্ণ জলে বরফস্তূপ পর্ব্বত সকল হইতে খসিয়া পড়িয়া ভাসিতেছে। উহার চতুষ্পার্শ্ব এত খাড়াভাবে নামিয়া গিয়াছে যে জলের নিকটে নামা এক প্রকার অসম্ভব। শেষনাগ অপেক্ষা ইহা অনেক ছোট হইলেও ইহার সৌন্দর্য্য বড় কম নহে। বরফময় পথের উপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে ইহাকে অমৃততলাও বলিত, কিন্তু এখন ইহার নাম হত্যারাতলাও। তাহার কারণ এই যে, এক সময়ে কয়েকটী যাত্রী ইহার নিকট দিয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিল, দৈবাৎ সেই সময় উপর

হইতে বিশাল এক বরফস্তূপ নামিয়া আসিয়া তাহাদের উপর পড়ে এবং সকলকে লইয়া ঐ পুষ্করিণী মধ্যে সমাহিত করিয়া ফেলে। সেই অবধি উহার বর্ত্তমান নাম ঐরূপ হইয়াছে। এইবার এই স্থান হইতে এক ভীষণ. ওৎরাই করিতে হইবে। পথ এত নিম্নে চলিয়া গিয়াছে যে বোধ হয় যেন পাতালে নামিতে হইবে, বিশেষতঃ উহা এত খাড়াভাবে নামিয়াছে যে দেখিলেই প্রাণ আঁৎকাইয়া উঠে। উহার উপর আবার পথের মাটি এত কাঁকরময় যে পা চাপিয়া চাপিয়া না চলিলে প্রতি মুহূর্ত্তে হড়কাইয়া যাইবার সম্ভব। ঘাসের জুতা বা hob nail মারা জুতা না হইলে এখান দিয়া নামা অত্যন্ত বিপদ জনক। পথটীর নাম শ্বাসঘাটি; বাস্তবিক ইহা শ্বাসঘাটিই বটে। নামিতে নামিতে অন্তিমের শ্বাস উপস্থিত হয়। দুই এক যাত্রীর ট্রাঙ্ক, বিছানা প্রভৃতি ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গড়াইয়া গেল; সে এক বিষম তামাসা! ৭।৮ মিনিট ধরিয়া গড়াইতে গড়াইতে চলিল, তাহার পর সে গুলি কোথায় যে গিয়া পড়িল তাহা আর দৃষ্টি গোচর হইল না। এ পথে কোন যান চলে না; সকলেই পদব্রজে অতি সতর্কে লাঠির উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিল; কারণ একটু পা ফসকাইলে অবধারিত মৃত্যু। ঘণ্টাখানেক এইরূপ কষ্টকর অবরোহণের পর পর্ব্বতটীর পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। সকলেই এইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল; কেহ কেহ স্নানও করিয়া লইল। হালুইকরের দোকানগুলি আগে আসিয়া গরম গরম পুরী তৈয়ার করিতেছিল এবং অধিকাংশ লোকগুলিই তদ্দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া লইল কারণ চন্দনবাড়ী পৌঁছাইতে বৈকাল হইবে। বিশ্রাম ও আহারান্তে আবার পথ চলিতে লাগিলাম। পথ মাঝে মাঝে উঠিতেছে এবং মাঝে মাঝে নামিতেছে, তবে উৎরাই অধিক। চন্দন-বাড়ী কাছাকাছি আসিয়া আবার একটা খুব নিচু ওৎরাই পাওয়া গেল। অবশেষে বেলা প্রায় ৫টার সময় পড়াওয়ে উপস্থিত হইলাম। পাচক মহাশয় আজ দাল রুটির ব্যবস্থা করিলেন। আজ আর কোথাও বেড়ান হইল না, কারণ শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, তাহার উপর পূর্ব্বেকার দেখা স্থান। এই হেতু ২।৪ খানি রুটি উদরস্থ করিয়াই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

পরদিন ৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার প্রাতে চন্দনবাড়ী ত্যাগ করিয়া পহেল গ্রামে আসি। যাইবার সময় যেখানে তাঁবু পড়িয়াছিল, ফিরিবার সময় সেখানে না পড়িয়া মাইলটাক আগাইয়া আসিয়া একটী সমতল মাঠের উপর পড়িল। এই স্থানটীর নিকটেই পর্ব্বতোপরি পাইন জঙ্গলের মধ্যে সাহেবদের আস্তানা। আজ এক আধটী হালুইকরের দোকান বসিয়াছে মাত্র, কারণ কতক দোকান একেবারে পরবর্ত্তী পড়াওয়ে (আয়েশ মোকামে) গিয়া রাত্রিবাস করিবে। তবে কাঁচা বাজার এখানে যথেষ্ট আছে, সাহেবদের আস্তানার নিকট সব জিনিষই মেলে।

এই থান হইতে স্বামিজীর সঙ্গ আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ তিনি ত কাহারও চাকর নন, স্বেচ্ছামত ধীর কদমে যাইবেন। তিনি পরদিন আয়েশ মোকামে থাকিয়া তৎপর দিন মটন যাত্রা করিবেন এবং তথায় কিছুদিন বাস করিবেন। কিন্তু আমার তত সময় ছিল না। আমাকে পরদিনই মটনে আসিতে হইবে এবং তথায় রাত্রি যাপন করিয়া শ্রীনগর যাত্রা করিতে হইবে, স্বামিজীকে আমার ইচ্ছা জানাইলাম এবং তিনি তাহা অনুমোদন করিলেন। পরদিবস স্থির হইয়া থাকিল যে, আমি অতি প্রত্যুষেই এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব, কারণ আমাকে ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এখন আমিত যাইব, কিন্তু আমার বিছানা পত্রাদি লইয়া যায় কে। এই এক ভাবনা হইল। ধর্ম্মার্থ ডিপার্টমেণ্টের head clerkকে এই কথা জানাইতে, তিনি আমার মাল পৌঁছাইয়া দিবার ভার লইলেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। বৈকাল বেলা পহেল গাঁওয়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য এ জীবনের মত দেখিয়া লইলাম। বাস্তবিক সে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের বর্ণনা করা যায় না—; যাহার ভিতর একটু প্রাণের স্পন্দন আছে, সে ইহা দেখিলেই আত্মহারা হইবে সন্দেহ নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই আহার করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিবস খুব সকালে উঠিয়া আমার সমস্ত দ্রব্যগুলি বস্তাবন্দি করিয়া ধর্ম্মার্থ ডিপার্টমেণ্টে দিয়া আসিলাম এবং মহারাজের কাছে বিদায় লইয়া রওনা হইলাম। এত সকালে কোন দিনই বাহির হইতে পারি নাই, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উভয় পার্শ্বের মোহন

দৃশ্য সমূহ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। শিশিরস্নাত তরুলতাগুল্মাদি বালার্ক কিরণে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ বটে, কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! বোধ হইতে লাগিল যেন যত্ন রচিত বাগানের মধ্য দিয়া যাইতেছি। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চলিতে লাগিলাম; লক্ষ্য নাই কতদূর চলিতেছি আর শ্রান্তিও বোধ হইতেছে না। এইরূপে প্রায় ১৩ মাইল অতিক্রম করিয়া বেলা আন্দাজ ১ টার সময় আয়েশ মোকাম নামক পড়াওয়ে উপস্থিত হইলাম। নিজের এবং ঘোড়ার বিশ্রাম আহারের জন্য মাঠের মধ্যে একটী গাছতলায় নামিলাম। যাত্রার সময় এই বিশাল মাঠে জনকোলাহলে মুখরিত ছিল এবং এখানে তিলধারণের স্থান ছিল না; কিন্তু আজ নীরব, এক পাঞ্জাবী পরিবারবর্গ এবং আমি ব্যতীত আর জন মানব নাই। আমার ইচ্ছা ছিল এখানে স্নান করিয়া কিছু খাইয়া লইব; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখিলাম এখানে কোথাও দোকান পাট নাই, এবং কোন কিছু আহার্য্য পাইবার উপায়ও নাই। যাহা হউক, আমাকে অনাহারে থাকিতে হয় নাই; দৈব কৃপায় অচিন্ত্যনীয়ভাবে আহার মিলিয়া গেল। উক্ত পাঞ্জাবী পরিবারবর্গের একটী যুবকের সহিত অমরনাথে যাইবার সময় পথে একদিনের জন্য আলাপ হয়; যুবকটী গ্র্যাজুয়েট এক অতি সদালপী। তিনি আমাকে একক দেখিয়া তাঁহাদের কাছে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের সহিত খাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন; তাঁহার দাদামহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং আমি আর কোনও আপত্তি না করিয়া তাঁহাদের নিকট বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত আপেল, পূরী এবং তরকারী দ্বারা উদর পূরণ করিলাম। যাহারা কখনও বাড়ীর বাহির হন নাই, তাঁহাদের মনে হয় বাটির বাহিরে আর দয়া, মায়া, স্নেহ মমতা নাই। কিন্তু সে ধারণাটা যে কত ভুল তাহা ভ্রমণশীল মাত্রের জানা আছে। প্রবাসে যে কত অচিন্ত্য, অযাচিত স্নেহ ভালবাসা ও সহানুভূতি পাওয়া যায়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ট্রেনে ১ ঘণ্টার আলাপে কত ব্যক্তি জীবনের মত বন্ধু হইয়া যায়। যাহা হউক, আহার

করিয়া অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর আমি ইঁহাদের ছাড়িয়া চলিলাম; কারণ ইঁহারা এখানে অনেকক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যখন বাহির হইলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা হইবে, ছায়া কোথাও নাই; উপরকার প্রদেশের ঠাণ্ডা ভাবও নাই; পথঘাট সমস্তই রৌদ্রতপ্ত, তবে আমাদের দেশে রৌদ্রে বাহির হওয়া যেমন কষ্টকর এখানে সেরূপ নহে। রৌদ্র মাথায় করিয়া বাহির হইলাম। প্রায় তিনটার সময় ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মটনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এত সময় লাগিবার কারণ এই যে, ঘোড়াটীকে খাওয়াইবার ও বিশ্রাম করাইবার জন্য পথে ৩।৪ স্থানে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখানে আসিয়া পাণ্ডাদের বাড়ীতে উঠিলাম। আজ এখানে ভীড়ে ভীড়; বহুযাত্রীই নামিয়া আসিয়া এখানে সমবেত, বিশেষতঃ সাধুযাত্রিগুলি। চারিদিকই জন কোলাহলে মুখরিত। পাণ্ডাগণ আজ অত্যন্ত ব্যস্ত; কোন যাত্রীকে শ্রাদ্ধ করাইতেছে, কাহারও নিকট মিষ্ট কথায় স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিতেছে; আবার যে যাত্রী আজ থাকিবে, তাহার আদর অভ্যর্থনার যোগাড় করিতেছে। জীবনের মধ্যে এই দুই এক দিন তাহারা মহাব্যস্ত থাকে। কারণ এক বৎসরের আয় এই দুএক দিনে সঞ্চিত হইয়া থাকে। বাড়ীর মেয়েরাও খুব ব্যস্ত; যাত্রিগণের জন্য আহার প্রস্তুত করিতে হইতেছে। ইহারা যাত্রিগণকে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়ায়। বাস্তবিক, এক ৺কামাখ্যা ব্যতীত ভারতের অন্য কোন তীর্থে এইরূপ শান্ত ও যত্নশীল পুরোহিত দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ, ইহারা শোষক নহে। অধিক আদায় করিবার লোভে কখনও যজমানকে পীড়ন করে না পরন্তু তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করে। অন্ততঃ আমি ইঁহাদের নিকট যথেষ্ট যত্ন পাইয়াছি। শ্রীনগর হইতে বাহির হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত ক্ষৌর কার্য্য হয় নাই, এই জন্য এখানে আসিয়াই আগে উহা সমাধা করা গেল। তৎপরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ধর্ম্মার্থ আফিসে গিয়া ঘোড়াটী ফিরাইয়া দিলাম ও আমার বিছানা-পত্রাদি লইয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল আজই ইসলামাবাদে আসিয়া নৌকাযোগে শ্রীনগর যাত্রা করিব। কিন্তু পাণ্ডারা কষ্ট হইবে বলিয়া কিছুতেই আসিতে দিল না। অগত্যা আহারাদি করিয়া শয়ন

করিলাম। প্রত্যূষেই এখান হইতে যাত্রা করিব এই জন্য সন্ধ্যার সময় পুরোহিতের প্রাপ্য দিয়া রাখিলাম। এখানে বলিয়া রাখি আজকাল পাণ্ডাদিগের মধ্যে ইংরাজি লেখা পড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে; আমাদের পাণ্ডার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী Matriculation পাশ করিয়াছে। সে আমাদের সহিত অমরনাথ গিয়াছিল এবং তাহার সহিত ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারায় আমাদের অনেক সুবিধা হইত।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপনান্তর পাণ্ডা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া পদব্রজে ইসলামাবাদে যাত্রা করিলাম। একটী কুলী আমার বোঁচকা লইয়া সঙ্গে চলিল। ইসলামাবাদ এখান হইতে ৫ মাইল। একটী সুবৃহৎ মোট এই ৫ মাইল লইয়া যাইবার ভাড়া মাত্র ৬ আনা লাগিয়াছিল; এখানে কুলীভাড়া এত সস্তা। ইসলামাবাদে পৌছিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলাম। এস্থানটী বেশ; অনেক লোকের বাস; বাড়ীগুলি সব গায়ে গায়ে; দোকান পশারি অনেক; কার্পেট বুনিবার কারখানা বিস্তর। এখানকার কাঠের কাজ খুব ভাল। বেশী বিলম্ব না করিয়া শ্রীনগর যাইবার জন্য একখানি সুন্দর rubber-tyre টাঙ্গা ভাড়া করিলাম; ২৸৹ করিয়া এক এক অংশে পড়িল। অমরনাথের যাত্রী নামায় ভাড়া বাড়িয়াছে, নহিলে জন প্রতি অন্য সময়ে ১৷৷৹ টাকা পড়ে। যাহাই হউক আমাদের দেশে ৩৫ মাইল পথ এত সস্তায় যাওয়া যায় না। অধিকন্তু এখানকার ঘোড়াগুলির কি অসাধারণ দম; সাড়ে তিন ঘণ্টায় ৩৪ মাইল পথ আনিয়া ফেলিল। যখন শ্রীনগরে পৌছিলাম তখন বেলা আন্দাজ ২৷৷৹ টা। আসিয়াই Sharp কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা রসিকবাবুর গৃহে অতিথি হইলাম। তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না; তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে দিয়া তৎক্ষণাৎ গরম দুধ ও কিছু মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিয়া সময় মত অতিথিসৎকার করিলেন। এইরূপে সৎকৃত হইয়া পূর্ব্ব পরিচিত দু একটী ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিলাম ও বিদায়গ্রহণ করিয়া রাখিলাম, কারণ পরাহে রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিবার ইচ্ছা। তাহার পর মোটরলরি ঠিক করিবার উদ্যোগ

করিতে লাগিলাম; এক ব্যক্তি বলিলেন যে কাল সকালবেলা একখানি Postal Mail যাইবে; আমি তৎক্ষণাৎ Mail Service আফিষে যাইয়া একখানি seat ঠিক করিয়া ফেলিলাম। ভাড়া ১৪৲ স্থির হইল এবং তাহা ঐদিনই জমা দিতে হইল। সাধারণ লরিগুলি তৃতীয় দিনে রাওলপিণ্ডি উপস্থিত হয়, কিন্তু এই গাড়ী দ্বিতীয় দিনে যায়, কারণ এ গাড়ী হালকা এবং ইহার বোঝাও কম। ইহাতে মাত্র ২টী যাত্রী লইয়া থাকে। যাহা হউক, এই ঠিক করিয়া বাসায় আসিলাম এবং আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলাম।

শ্রীনগরের একটী বিশেষ জিনিষ আমার দেখিতে ভুল হইয়াছে। পাঠক, যদি আপনি কখন কাশ্মীর যান, তখন পাছে আমার ন্যায় আপনারও ভুল হয়, সেই জন্য ইহার উল্লেখ করিলাম। সেটী কিন্তু খৃষ্টের কবর। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অমরনাথ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমরা রাজপ্রাসাদে যাইয়া মহারাজ দর্শন করিয়াছিলাম। সেই সময়ে মহারাজের সংবাদপত্র পাঠকারী মহাশয় আমাদের বলিয়াছিলেন যে আপনারা ফিরিবার পূর্ব্বে অবশ্য অবশ্য যীশুর গোরস্থানটী দেখিয়া যাইবেন। আমি মনে করিয়াছিলাম যে এখন সময় নাই অমরনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া উহা দেখিব; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বিষয়টী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম কাজেই দেখা হয় নাই। অনেকেই এই কবরের খোঁজ রাখেন না; খৃষ্টানরা ত নয়ই। কারণ তাহা হইলে যীশুর Resurrection—যাহার উপর বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। এখানে একটা কথা জানাইয়া রাখি যে আজকাল অনেক খৃষ্টান নানা গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া যীশু মরেন নাই; কবরস্থ হইবার পর পুনর্জ্জীবিত হন, এবং তথা হইতে উঠিয়া প্রচ্ছন্নভাবে শিষ্যগণের নিকট থাকেন। এই সময়েই নাকি বিখ্যাত Sermon on the Mount—যাহা খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি—উপদেশ দেন। তাহার পর তিনি ভারতের দিকে চলিয়া আসেন। সম্ভবতঃ তিনি কাশ্মীরের দিকে আসেন এবং তথায় দেহ রক্ষা করেন। যাহাই হউক, এই গোরস্থানটী শ্রীনগরের এক প্রান্তে হরি পর্ব্বতের

পাদদেশে এক ভূগর্ভ মধ্যে অবস্থিত। দেখিলেই বুঝা যায় ইহা বহু প্রাচীন। ইহা কাষ্ঠের রেলিং দ্বারা সুরক্ষিত। মুসলমানগণ ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। স্থানীয় সকলে বলেন যে এখানে বসিয়া প্রার্থনা করিলে তাহা এখনও পূর্ণ হইয়া থাকে।

রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লণ লিখিয়াছেন, বহু পূর্ব্বকালে কাশ্মীর জলমগ্ন ছিল; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার প্রমাণ স্বরূপে বলেন যে ঐ প্রদেশে অনেক পাহাড় এইরূপ আছে, যাহা মাটি এবং নুড়ি দ্বারা নির্ম্মিত। জলপ্রবাহ বা নদীমধ্য ব্যতীত নুড়ির অবস্থান অসম্ভব। এই জন্য অনুমান হয়, যে ঐ সকল পর্ব্বত ভূগর্ভস্থ শক্তিদ্বারা উত্তোলিত নদী তলদেশ মাত্র আর কিছুই নহে।

কাশ্মীর হিন্দুরাজ্য, অতএব অনেকের বিশ্বাস এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই হিন্দু। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য ১৯২১ সালের আদম সুমারীর ফল নিম্নে দিলাম :—

হিন্দু	...	...	৬,৯২,৬৪১
শিখ	...	...	৩৯,৫০৭
জৈন	...	...	৫২৯
বৌদ্ধ	...	...	৩৭,৬৮৫
মুসলমান	...	...	১৫,৪৮,৫১৮
ইরাণী	...	...	৭
খৃষ্টান	...	...	১,৬৭৮
প্রচলিত ধর্ম্মহীন		...	১

কাশ্মীরের মোট লোকসংখ্যা ৩৩,২০,৫১৮

তবে, কাশ্মীরের অনেক মুসলমান যে হিন্দু ছিল, তাহা তাঁহারাই স্বীকার করিয়া থাকেন। মুসলমান বাদসাহগণ জোর করিয়া ইহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। এখনও অনেক মুসলমানের পূর্ব্বে "পণ্ডিত" এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুভাবাপন্ন।

যাহাহউক, পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম; এবং অবিলম্বে মেল মোটরে আসিয়া নিজস্থান গ্রহণ করিলাম। যখন বেলা সাড়ে ছয়টা তখন মোটর-খানি বড় সাধের কাশ্মীর হইতে হু হু শব্দে উড়াইয়া লইয়া চলিল এবং পরদিন দ্বিপ্রহরে রাওলপিণ্ডি আনিয়া ফেলিল।

অমরনাথ দর্শন করিতে যাইতে হইলে কি কি দ্রব্য আবশ্যক তাহা এই স্থানে বলিয়া রাখিলে বোধ হয় দর্শনেচ্ছুগণের অনেক উপকার হইতে পারে, এই জন্য এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে তাহার একটু বিবরণ দিলাম। প্রথমতঃ পোষাক সম্বন্ধে দুটী সুতির জামা, ১টি উলেন সোয়েটার, ১ফ্লানেল বা পট্টুর জামা, ২জোড়া গরম মোজা, এক জোড়া পটি, একটী পাগড়ী ও ৩৷৪ খানি কাপড় নিতান্ত আবশ্যক। পাগড়ীটী একখানি কাপড় দ্বারা করিলে চলিবে। কিন্তু যদি পথে বৃষ্টি হয় এই জন্য একটা অতিরিক্ত গরমকোট রাখিতে পারিলে ভাল হয়। বিছানা সম্বন্ধে ২খানি কম্বল, ১খানি বিছানার চাদর, ১খানি Oil cloth এবং একখানি কাশ্মিরী মোটা মাদুর আবশ্যক। এই মাদুর শ্রীনগরে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বারই যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মালগুলি বাঁধিয়া তাহার উপর oil cloth মুড়িয়া দিবে, তাহা না হইলে পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইবে। খাবার সম্বন্ধে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ১০ দিনের মত চাল, দাল, আটা, ঘি, তেল, নুন, চিনি, আলু মসলাদি, বড়ি, ও পাঁপর সংগ্রহ করিয়া লইবে। একটী ছাতা, একটী hill-stick (ইহা শ্রীনগরেই মেলে) ইহা নিতান্ত আবশ্যক। সাধারণ ফিতে বাঁধা চামড়ার জুতা হইলেই হইল; তবে উহাতে hob nail মারিয়া লইতে পারিলে মন্দ হয় না; শ্রীনগরে মুচিরা আট দশ আনা পাইলেই ঐরূপ করিয়া দেয়। একটী তাঁবু সঙ্গে লইতে হইবে; উহা শ্রীনগরে অনেক কোম্পানির নিকট বা ধর্ম্মার্থ ডিপার্টমেণ্টে ভাড়া পাওয়া যায়। ছোট ছোলদারি তাঁবুর ভাড়া ৮৲১০৲। কিন্তু ইহা পূর্ব্বাহ্নে পাণ্ডার সাহায্যে সংগ্রহ করা উচিত। তারপর, নিজে হাঁটিয়া গেলেও অন্ততঃ ১টী মালবাহী ঘোড়া আবশ্যক। এইগুলি হইলেই কোনরূপে অমরনাথ দর্শন করিয়া ফেরা যায়।

নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠস্থাপনা

অক্ষয়তৃতীয়ার মহোৎসবে

এই পরমপুণ্য শুভসুন্দর তিথিতে সত্যযুগের আরম্ভ। প্রলয়ের পর জগৎ রচনা—আমাদের প্রচলিত কল্পের প্রথম আরম্ভ দিবস। ইহাই পুরাণের বচন—আর সেইজন্য ইহাই পুরাণ-ধর্ম্মী ভারতবাসীর প্রাণের বিশ্বাস। এই তিথিতেই প্রতিষ্ঠোৎসব ধার্য্য হইয়াছে। অতি প্রত্যূষে সেবকমণ্ডলী শয্যাত্যাগ করিয়া আজিকার মঙ্গলপ্রভাতকে সহৃদয়ে সানন্দে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মাতৃমন্দিরে সহসা ললিত ভৈরবী রাগিণীতে ভজনের আরাব উত্থিত হইল—শান্ত সুমধুর সঙ্গীত। 'নিরমল উষাকালে' মাতৃঅর্চ্চনার উদ্বোধন। যোগ্যকালে যোগ্যকার্য্য। বেলুড়মঠ হইতে সেই সবেমাত্র একটী ছোট মণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই অন্যতম মাতৃপূজার প্রথম ঋত্বিকরূপে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন—যেন অলক্ষিতে কলকাটী সব প্রস্তুত ছিল।

তাহার পর আমোদর-নীরে সেই গতায়াতের পালা। সকলেই তাড়াতাড়ি সেখানে স্নানাদি সারিয়া কার্য্যে যোগদানমানসে সমুৎসুক। আজ তথায় দল বেশ বড় হইল। কাজকর্ম্ম সব সারিয়া কেহ কেহ তীরস্থ গাছতলায় বসিয়া খানিকক্ষণ আলাপ করিলেন। সেই সুন্দর সকালে সবই মধুময় বলিয়া বোধ হইল। বায়ু মধু-ভারাক্রান্ত হইয়া সৌগন্ধ ক্ষরণ করিতে লাগিল, আমোদরে স্নিগ্ধ শীতল মধুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল, আর সমস্ত বনস্পতি মধুময় প্রতিভাত হইল।

কিয়ৎকাল পরে সকলে মন্দিরে ফিরিলেন। কিন্তু জলযোগ করিয়া যে যার কাজে ব্যাপৃত। মন্দিরের দক্ষিণ দালানে স্তূপীকৃত তরিতরকারী

লইয়া অনেকে কুটিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যধারে ফুলভার হইতে পূজার যোগ্য নিখুঁত সুন্দর ফুটন্ত ফুল পরিষ্কার করিয়া বাছাই চলিতে লাগিল। তাহার পর পিছনের পুরাতন দ্বিতল আশ্রমবাটীর উপরকার ঘর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীমা ও শ্রীশ্যামার আলেখ্য আচার্য্য স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া শ্রীমন্দিরের বেদীর উপর স্থাপনা করিলেন।

নয়টা বাজিতেই উৎসব বেশ জমিতে আরম্ভ হইল। স্থানীয় এক সঙ্কীর্ত্তন দল আসিয়া উচ্চকণ্ঠে গান ধরিল "আয় রে আয় হরি বলে সবাই মিলে নাচি ভাই।" খোল-করতালের প্রখরধ্বনিতে তখন দশদিক মুখরিত। গায়কেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার গাহিলেন—একবারে তাঁহাদের আশা মিটিল না। তাহার পর এক অভিনব দৃশ্য—মহোৎসবে আনন্দের আর এক অপূর্ব্ব পর্ব্ব। একসঙ্গে চৌদ্দখানি ঢাক জমায়েৎ হইল। মন্দিরের সমক্ষে ঢাকীরা বিনা বিলম্বে একটী গোল চক্র রচিয়া যেন সমর ক্ষেত্রে নামিবার জন্য প্রস্তুত। সুশ্যাম তাহাদের শরীর, সুদৃঢ় তাহাদের মাংসপেশী, সমুন্নত তাহাদের বক্ষ—ম্যালেরিয়া সহিয়াও তাহারা বলিষ্ঠ, বীর্য্যশালী। সকল ঢাকগুলিই সুকোমল পাখীর পালকের আচ্ছাদনে ঢাকা—কঠোর-কঠিন বুকের উপর কান্ত-কোমল আবরণ। বাদ্যযন্ত্র তাহাদের নিকট জড়পদার্থের সমষ্টিমাত্র নহে—উহা জীবন্ত প্রাণময়। সেই জন্যই উহার এত সাজগোজ, আভরণ-অলঙ্কার। ক্রমে গম্ভীর গুরু গর্জ্জন আরম্ভ হইল,—হে বীর! অগ্রসর হও, জয় মা রণ-রঙ্গিনী বলিয়া শত্রু-কূল বিনষ্ট করিয়া বিপদে আত্মরক্ষা কর—এই বাণীই যেন মেঘমন্দ্র ঢাকগর্জ্জন হইতে প্রতিক্ষণ উত্থিত হইয়া দর্শকবৃন্দের প্রাণ মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে কাড়া-নাকাড়াও একজোটে তর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাই ক্ষণেকের জন্য সানাই শান্ত হইল—তাহার ক্ষীণশক্তি ইহাদের সঙ্গে সুর রাখিতে পারিতেছিল না। চারিদিক হইতে বাদ্যের সেই মহা-আহ্বানে গ্রামের লোকে ঘর ছাড়িয়া কাজ ফেলিয়া উপস্থিত। মা জাগ্রতা। ঢাকীদের ভিতর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পটু সে চক্রের মাঝে বীর সৈনিকের ন্যায় দাঁড়াইয়া বাজনার গতি ব্যাপ্তি বিস্তৃতি তাল ফাঁক সমস্ত দেখাইয়া দিতে লাগিল এবং বাকি সকলে একসঙ্গে একতালে

সেই আদর্শ অনুসরণ করিতেছিল। যাঁহারা কলিকাতার ইডেন-উদ্যানের বাঁধান ছাউনীতলায় গোরার 'ব্যাণ্ড্' শুনিয়া চমকিত হন তাঁহারা আজ দেশের এই সমর-বাদ্য শুনিয়া গর্ব্বিত স্তম্ভিত পুলকিত। সুন্দর মনোরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়া ও বাদ্য উপভোগ করিয়া সকলেই পরম পরিতুষ্ট। ডাক্তার দুর্গাবাবু আমাদের কাণে কাণে বলিলেন—ঠাকুর ও মা এসেছেন, to revive old India—প্রাচীন ভারতকে সঞ্জীবিত পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—অতি কথা সত্য।

এই সময়ে গ্রামের একটী ছোট শিশু বাজনা শুনিতে শুনিতে ও বিরাট-জনতা দেখিতে দেখিতে আনন্দে মা'র কোলে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। তা'র ছোট হাত দু'খানি ও পা দুটী যত জোরে পারিল ছুঁড়িতে লাগিল। তখনও তাহার কথা ফুটে নাই—আধ আধ বুলিতে প্রাণের পরম আহ্লাদ কেমন করিয়া ও কি যে বলিল—কে জানে ? তাহার পর হঠাৎ সে নিথর নিস্পন্দ। মুখে শব্দের আর লেশমাত্র নাই, কেবল চোখ দু'টী বিস্ময়ে বিস্ফারিত। সেই শিশুর মত আমরাও সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ;—কেমন করিয়া কি ভাবে জোটপাট হইয়া মহোৎসবের প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণ পরিপুষ্ট হইতেছিল—কে বুঝিবে ?

মন্দিরের ভিতর তখন প্রতিষ্ঠাপূজা পুরামাত্রায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নবদ্বার উন্মুক্ত। নানা দিক হইতে সমুৎসুক ভক্তবৃন্দ ও জননীরা জোড়করে ব্যাগ্রবদনে একটীবার 'দর্শনের তরে' প্রবাহাকারে ক্রমাগত আসিতে লাগিলেন। ক্ষৌমবস্ত্রবিভূষিতা মা,—পদযুগলে সদ্য প্রস্ফুটিত ভাবভক্তিবিমিশ্রিত অসংখ্য কমলদল। বায়ু ধূপ-ধূনার পুণ্যাদমে পরিপূর্ণ। শ্বেতপ্রস্তরের নিম্নবেদিকার উপর উত্তরাস্য আসনস্থ শুভ্রশির মাতৃপূজার ঋত্বিক্—স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পূজার সমস্ত উপকরণ সহ সহকারীদল। অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি—মন্ত্রোচ্চারণ চলিল। এদিকে শ্রীমন্দিরের সমক্ষে অত্যুচ্চ মঞ্চের উপরে নহবৎ-বাদকেরা সানাইয়ে সুর ধরিল।

যিনি একদিন সাস্ত হয়ে আমাদের দেখা দিয়েছিলেন—আজ তিনি

অনন্ত—বিরাট। পল্লীর নিভৃত পূজা-প্রান্তরে আট হাজার মাথা তাঁহার পাদপদ্মে লুণ্ঠিত অবনত হইল। আট হাজার কণ্ঠ মা বলিয়া ডাক দিল। কে জানে কোন্ সকালে কেমন ক'রে মা তুমি সকলকে আহ্বান করলে—কোন সুদূর সাগর পারে কোন্ অজানা দেশ থেকে তোমার দেবদূত এদের দলে দলে কাতারে কাতারে এখানে মিলিয়ে দিলে? জননী, আজ এই বিরাট মণ্ডলীর উপর তোমার কৃপা-করুণা দেখিয়া সন্তান মুগ্ধ স্তব্ধ বিস্ময়াপ্লুত। দেশ মাতৃকা তুমি—আমাদের কলুষভরা হৃদয় তোমার নির্ম্মল করস্পর্শে নিষ্কলঙ্ক কর। ব্যভিচারী আমাদের প্রাণ, চঞ্চল চিত্ত, অহংকারাচ্ছন্ন বুদ্ধি। অবোধ আমরা—কাতরে তোমারে কহিতেছি মা আমাদের ফেলিয়া দিলে চলিবে না। বারবার ভুল হইয়াছে, তোমার স্মৃতি বিস্মৃতি হইয়াছে, তথাপি কোলে তুলিয়া লইতে হইবে। মা আমাদের মানুষ কর—তোমার করিয়া লও। তোমার নিকটে আমাদের চাহিবার অনেক আছে, কারণ আমরা যে সর্ব্বগুণহীন। তাই আমাদের অভাব অনেক, ভিক্ষা অনেক। দাও মা, আমাদের বীর্য্য দাও, স্থৈর্য্য দাও, জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য দাও, সংযম দাও, তপস্যা দাও—আর দাও কার্য্যে একপ্রাণতা। শুনেছি, তোমার নাম কপাল-মোচন। তুমি আশীষ-করে আমাদের ললাটের সকল কুকর্ম্ম রেখা মুছিয়া ঘুচাইয়া দাও। আমরা বিশ্বের মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াই।

এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মন মুগ্ধ। চারিধারে কোলাহল, ভক্তের বিপুল জনতা। পদে পদে লোক ঠেলিয়া যাইতে হইতেছে। কি দেখিলাম ?—দেখিলাম মন্দিরের চত্তরের উপর উৎসব-মুখরতার মাঝে নিস্তব্ধ নীরবতা, কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে মোক্ষ-মুক্তিলাভেচ্ছুর শান্ত সৌম্য মুদ্রায় উপবেশন। সমস্ত বিস্তৃত উত্তর বারাণ্ডাটীতে স্তরে স্তরে শ্রেণীর পর শ্রেণী কৃপাপ্রার্থীরা দলে দলে প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন—কখন্ তাঁহাদের তরে রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইবে, জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় তিনি আঁখি খুলিয়া দিবেন; কখন্ ডাক আসিবে, জন্ম সার্থক করিয়া আহ্বান-বাণী ঝরিবে। চক্ষে তাঁহাদের আশার চাতক-চাহনি, বাক্যহারা মুখে উপনিষদ্ঋষির

সেই প্রাচীন বচনের অস্ফুটধ্বনি—হে আচার্য্য, হে ভগবন! 'উপৈম্যহং ভবন্তং'—তোমার দ্বারে বদ্ধাঞ্জলি আমরা উপস্থিত। তোমার ঐ অভয়-চরণে শরণ দাও, করুণা করিয়া তুমি আমাদের তোমার করিয়া লও, মায়ামোহের বন্ধন খুলিয়া দাও। দ্বাদশবর্ষের বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সেখানে দেখিলাম। ধন্য ইহারা—সার্থক ইহাদের জন্ম—আজ ইহারা মাতৃ-মণ্ডপে বরাভয়করা মায়ের দুয়ারে ব্রহ্মিষ্ঠ গুরুর কৃপালাভে কৃতার্থম্মন্য।

এদিকে অসংখ্য ভাবস্তব্ধ দর্শক ও ধ্যান-জপ-রত ভক্তপরিবেষ্টিত মন্দির মধ্যে মায়ের পূজা চলিতে লাগিল। আচার্য্য আসিয়া একমনে স্থিরনয়নে একটীর পর একটী সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত সমনুষ্ঠিত শুভকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। তদ্‌ভাবাপন্ন—তন্ময়। প্রথমে শ্রীগুরুপূজা। তাহার পর বাস্তুপুরুষের পূজা। আজ আর একবার শ্রীগণপতির পূজা হইল। তৎপরে ক্রমে ব্রহ্মা, ষোড়শোপচারে বিদ্যাদায়িনী বাণী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা, বসুধারাপ্রদান, ষোড়শো-পচারে প্রজাপতি ব্রহ্মা। এতগুলি আনুষঙ্গিক পূজার পর আজিকার আসল বিশেষ যাহা—শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমা'র অস্থি-স্নান ও ষোড়শো-পচারে বিশেষ পূজা। ইহাই প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান। তাহার পর হোমকুণ্ডে সমিধের উপর অগ্নিযোজনা হইল। তাহাতে বহুক্ষণ ধরিয়া হবিরাহুতি চলিল। আবার ধূপ-ধূনার ঘন জাল বিস্তারিত হইল। মন্দির মথিত করিয়া ক্রমাগত 'স্বাহা'রব উত্থিত হইতে লাগিল। ভিতরে ও বাহিরে চারিধারে জোড়করে অসংখ্য সন্তান দণ্ডায়মান—মা তাঁহাদের ভিতর প্রকট—জীবন্ত—জ্বলন্ত। ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণার সমক্ষে থরে থরে বিরাট ভোগরাগাদি একটীর পর অপর একটী সুবিন্যস্ত হইল। বিরাট অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন। ভোগ নিবেদন হইয়া গেল। ভোগারতি আরম্ভ হইল। বাহিরের বড় ঘণ্টাটী ঢং ঢং রব তুলিয়া তাল ধরিল। সতৃষ্ণনয়নে গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি পুটে সন্তানের দল দণ্ডায়মান। আরতি হইয়া গেলে পর জয়ধ্বনি করিয়া আরত্রিক গান ও স্তব পাঠ আরম্ভ হইল। তাহার পর বহু কণ্ঠ একত্রিত হইয়া ভজন আরম্ভ করিলেন।

এদিকে অজস্র তরিতরকারী কুটা চলিতে লাগিল। পাকশালে পঁচিশজন সূপকার কোমর বাঁধিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাদের যোগান দিবার জন্য বহু কর্ম্মী নিযুক্ত। রন্ধনশালা সংলগ্ন বহুজনসমাকীর্ণ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সহসা কিয়ংকালব্যাপী ঘণ্টাধ্বনি শুনা গেল। সেই আহ্বান সকল কর্ণের জন্য। কে কোথায় আছ এস—মা অন্নপূর্ণার অফুরন্ত ভাণ্ডার আজ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত—কে অভুক্ত, কে ক্ষুধিত—এস—মাতৃপ্রসাদ গ্রহণে ধন্য হও, জীবন সার্থক কর। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মীরা সুবৃহৎ ছাউনীর এক ধার হইতে অন্যধার পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর পংক্তির পর পংক্তি কুশাসনশ্রেণী সাজাইয়া দেওয়া হইল। পাতা, লবণ, জলভাণ্ডে জল পড়িল। প্রথম দলে এই গ্রামের কেবল ব্রাহ্মণেরা বসিলেন। কতকটা সামাজিক ভোজ। তখন আন্দাজ বেলা সাড়ে বারটা। জগদম্বার কৃপায় তাঁহার 'ভিখারী' ছেলেরাই বদান্য ধনকুবেরের ন্যায় অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। নানাবিধ ভাজা ডাল, কুমড়ার তরকারী, মাছের কালিয়া, চর্চ্চড়ী, অম্বল, দধি, বোঁদে, পায়েশ ইত্যাদি।

এক পংক্তি উঠিতেছে, নিমেষে স্থান পরিষ্কার হইতেছে—অপর এক দল বসিতেছে। বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এই অফুরন্ত প্রসাদ বিতরণের পালা চলিল। বহু দূরস্থিত গ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই বিরাট অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য বুঝিয়া মিথ্যা আত্মসম্মান ত্যাগ করিয়া মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। বিশেষভাবে নিমন্ত্রণের জন্য বৃথা অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই। এখানে আজ সকলের নিমন্ত্রণ। তাই দরিদ্র নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীসমাজের বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চকুলের পুরুষ ও স্ত্রী, বালক বালিকা সকলেই সমভাবে সমবেত। সাধুবৃন্দ উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান সমাদর, সেবা ও আপ্যায়ন করিলেন। এরূপ মহদাচরণ মহতেই সম্ভব। ভক্তিমতী মহিলাদিগের একটী সুন্দর আচরণ দেখা গেল। বিরাট পংক্তিভোজনের পর তাঁহারা প্রসাদ হিসাবে ভুক্ত অন্নের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট পাইলেন

পরম যত্নের সহিত আঁচলে বাঁধিয়া লইলেন—ভক্তের ভাবশ্রীক্ষেত্রে উচ্ছিষ্টের স্থান নাই। যেখানে সঙ্কীর্ত্তন নামগানাদি হইতেছিল শ্রীমন্দিরের সমক্ষে সেই স্থানের পবিত্ররজও সংগ্রহ করিলেন।

আপনভোলা কর্ম্মীর দল সারাদিবস নিজেরা অভুক্ত থাকিয়া ভক্তসেবায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সর্ব্বদাই তটস্থ। মুখে অনুক্ষণ আহ্বান বাণী, মায়ের জয়গান,—আঁখি অমিলন, দেহ শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন। গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর অনেকেই আপনার বংশমর্য্যাদা, কৌলিন্য, অর্থ-আভিজাত্যের সকল সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া দরিদ্রনারায়ণ-মণ্ডলীকে অন্ন-জল পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সুন্দর সে দৃশ্য। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে দরদর-ধারায় ঘর্ম্ম বহিতেছে—কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই—থাকিলে কাজ করা চলে না। অন্নশালায় এই প্রসাদ গ্রহনের প্রবাহ দুইচারি ঘণ্টার পর আজ নিরস্ত হয় নাই। রাত বারটা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। আজ বাঙ্গালা 'মায় ভুখা হুঁ'র দেশ—এখানে এইরূপ অন্নবিতরণ অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ দান আছে কি না জানি না। পরে কর্ম্মিবৃন্দের নিকট হইতে জানিলাম সেই দিনে অনুমান ৪০ মণ চাউল ও তদনুপাতে অন্যান্য জিনিস খরচ হইয়াছিল।

দারুণ গ্রীষ্মে জলের অত্যন্ত অধিক প্রয়োজন। সকাল, দ্বিপ্রহর, বৈকাল—তিনবেলাই 'ডাক বসাইয়া' কুয়া, ঘোষেদের পুকুর, সুদূর বাঁড়ুয্যে পুকুর হইতে জলতোলা হইতে লাগিল। শেষে যখন বাল্তিগুলির পরিবেশন-বিভাগে ডাক পড়িল তখন অগত্যা নিরুপায় হইয়া কতকগুলি বড় বড় মাটির কলস আমদানী হইল। বিশেষ ভারি। ক্ষীণ দুর্ব্বল যাঁহারা তাঁহাদের তখন বাধ্য হইয়া বিশ্রাম লইতে হইল এবং দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবকগণ তখন যেন সুবিধা পাইলেন ও অধিক ঔৎসুক্যের সহিত পরম আনন্দে কাজ আরম্ভ করিলেন। দ্বিপ্রহরের প্রখর তপনতাপে ছায়াবিহীন শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে পালা-ক্রমে যাহাদের স্থান পড়িয়াছিল তাঁহারা 'কাঠ-ফাটা' রৌদ্র কাহাকে বলে বেশ বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে কর্ম্মীদের মহোৎসাহের নিকট প্রখরোত্তাপ নিরুদ্যম হইয়া গেল। হৃদয় যখন ভাব-ভক্তি-প্রেমে ভরিয়া উঠে তখন

শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়। মাঝে ক্লান্তি খুব বেশী হইলে দেখা গেল পুকুর-পাড়ে একটী গাছের সুশীতল ছায়াতলে একখানি মাদুর বিছাইয়া জলবিভাগের যিনি নেতা তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বোঁদে, ঠাণ্ডা সরবতাদি দানে পরিতুষ্ট ও পাখার হাওয়ায় শ্রান্তি বিদূরিত করিতেছেন। দিল্‌ওয়ালা দরদী।

চারিধারেই কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। কাজ যত বেশী হইতেছিল তাহার তুলনায় বাহ্যিক হৈচৈ গোলমাল তত নাই। মুখ একপ্রকার বন্ধ, হাত-পায়ের নিঃশব্দ ব্যবহারই বেশী। একটী গল্প মনে পড়ে—সেতু-বন্ধনের সময় অমিতবলশালী তেজোদৃপ্ত বানরকুল তাহাদের সকল শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া যতদূর সম্ভব ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কাজে আপনাদের নিযুক্ত করিল। কিন্তু শক্তি অতি সামান্য বলিয়া বেচারী কাঠবিড়ালী চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল না। ভগবান তাহাকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন তাহারই প্রয়োগ অকুণ্ঠ অন্তরে সে করিল। অতি ক্ষুদ্র ছোট হইলেও শ্রীভগবানের দয়াদৃষ্টি সেইজন্যই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তাই তাঁহার আশীর্ব্বাদের ঋজুরেখা আজিও কাল তাহার পিঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহার সেই সযত্ন সেবা দয়াল-দেবতার চক্ষে উচ্চস্থান পাইল। আজিকার এই বিরাট উৎসব-যজ্ঞেও যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য তিনি তাহাই কায়মনোবাক্যে মায়ের কাজে নিয়োগ করিলেন।

আপনার আত্মাভিমান আত্মম্ভরিতা ঘুচাইয়া যোগ্যতম ব্যক্তির নিকট এই যে আত্মসমর্পণ—পাঁচজনে মিলিত হইয়া একজোটে সুচারু শৃঙ্খলা ও সুপদ্ধতির সহিত কর্ম্মপ্রচেষ্টা—ইহা দুর্ভাগা বাঙ্গালীর পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা। জাতি হিসাবে এ শিক্ষা আমাদের মহা প্রয়োজনীয়। কারণ দলাদলি ভেদাভেদ—ইহা বাঙ্গলার সনাতন ব্যাধি। শুধু বাঙ্গলায় বলি কেন, ইহারই জন্য এই সাধের ভারত আদিকাল হইতে অত্যাধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ভুগিয়া আসিতেছে। একতার স্বর্ণশৃঙ্খলে সংবদ্ধ সেই বিরাট উৎসব রত জনমণ্ডলীকে দেখিয়া বোধ হইল বাস্তবিকই ইহারা ঋগ্বেদের ঋষির মিলনমন্ত্র সার্থক করিয়াছেন।

এই কর্ম্মীরদলের ব্রত এক, উদ্দেশ্য এক, মন্ত্র এক, যজ্ঞ এক, দেবতা এক, মন এক, চিত্ত এক, সাধনা এক,—মাতৃপূজা, সুষ্ঠু সুচারু উপায়ে উহার সমাধান। ঋষি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'সংগচ্ছধ্বং' তোমরা মিলিত হও, 'সংবদধ্বং' একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, 'সংবো মনাংসি জানতাং' তোমাদের মন পরস্পর একমত হউক; 'সমানং মংএমভি মংত্রয়ে বঃ' আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত (দীক্ষিত) করিতেছি। 'সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্ত বো মনো যথা সুসহাসতি'—তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও। মাত্র কয়েকদিনের জন্য নহে—জীবনভোর এই একত্বের বাঁধনে বাঁধা থাকিতে হইবে;—হে নবীন ভারত! পারিবে কি? তোমাকে আজ সত্যব্রত সত্যসঙ্কল্প সত্যকাম হইয়া মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। জাতির জীবনমঞ্চে আত্মসম্মানের মহা আহ্বান আসিয়াছে। আজ এই একত্বের বাণী সফল করিয়া তোল। সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। উৎসবভূমিতে দারুণ ভিড় চারিধারে জনস্রোতের ঠাসাঠাসি—মেশামিশি। জনতার মধ্যে পূর্ব্বপরিচিত একজন চিররুগ্ন ক্ষীণদেহ ভক্তকে হঠাৎ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম—শরীর একান্ত দুর্ব্বল হইলেও মনের টানে তিনি এখানে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া আজ দ্বিপ্রহরেই একটী ছোট সঙ্গীতের আসর আমাদের কালীঘরেই বসিল। মহামায়ার মনোহারী ভজন। প্রায় দুই ঘণ্টা চলিল। বেশ জমিয়াছিল। এই চক্রকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

বৈকালে কেহ কেহ কিছু কিছু ছুটি লইয়া আমোদর তীরে নিত্য-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য হাঁফ ছাড়িতে উপস্থিত হইলেন। যাঁহাদের ইচ্ছা হইল তাঁহারা নদীতে দ্বিতীয়বার স্নান করিয়া শান্ত স্নিগ্ধ হইলেন। এদিকে অন্য কর্ম্মীর দল তাঁহাদের স্থান লইলেন। উৎসবক্ষেত্রে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রব সমভাবেই চলিতে লাগিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মন্দিরে ও আশে পাশে দুই

চারিটী চেরাগ সবেমাত্র প্রজ্জ্বলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মন্দিরের ঠিক সামনের ফারাক্‌টুকুতে প্রায় জন পনের লাঠিয়ালকে ঘেরিয়া অসংখ্য লোক তাহাদের হাতসাফাই উপভোগ করিতেছেন। আচার্য্যও দ্রষ্টা—মন্দিরের উপরের চত্বরে সমাসীন। খেলোয়াড়গণ খুব বলবান—বীর। প্রাচীন মল্লভূমির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া সকলেই পরিতুষ্ট। তাঁহাদের অনেকের মাথায় এক টুক্‌রা করিয়া লাল ন্যাক্‌ড়া, পরণে সামান্য লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত খানিকটা কাপড়, কাহারও কাহারও মাত্র লেংটী। খেলিবার পদ্ধতি বেশ চমৎকার। একজন কৌশলে সকল দ্রষ্টাকে বিষয়-বর্ণন করিল। যে দক্ষ ব্যক্তি খেলা দেখাইবে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া একজন বলিল—'ভাই, সেই খেলাটী দেখাবি—যাতে লাঠিটী পর্য্যন্ত দেখা যাবে না ?' অমনি বন্‌ বন্‌ করিয়া লাঠি ঘুরিতে লাগিল—ক্রমে প্রায় অদৃশ্য। সকলেই বারবার বাহবা দিলেন। বিরাট মণ্ডলী খেলা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। দক্ষলোকে বড় আসরেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আজ প্রথম নবমন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নূতন সাজে নূতন বেদীর উপর সমাসীনা মা— চতুর্দ্দিকে অনিমেষ নয়নে অসংখ্য সন্তানের দল দণ্ডায়মান। সকলে প্রাণ ভরিয়া মায়ের নবরূপ দেখিতে লাগিলেন। পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূরালোক মায়ের বদন মণ্ডলে প্রতিফলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন সজীব হইয়া উঠিলেন,—হাসিমাখা আনন্দময়ী মূর্ত্তি।

তাহার কিৎকাল পরে গত রাত্রের ন্যায় আজিও সকলে একসঙ্গে বসিয়া মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। 'মাকে কি দেখেছিস তোরা বল্‌ সত্যি ক'রে, মায়ের নব নব নবরূপে ভূবন মন হরে।' সঙ্গীত শুনিয়া পরিতৃপ্ত। শেষে আচার্য্যের দাওয়ার সমক্ষে সামিয়ানা তলে স্থানীয় দলের কীর্ত্তন শেষ হইলে তাঁহাকে আবার খানিকক্ষণ ব্রহ্মময়ীর নাম শুনাইয়া আমাদের গায়কেরা সেই দিনকার মত গীতবাদ্য সমাপন করিলেন।

স্বামী ভূমানন্দজী এই সময় আচার্য্যকে আজিকার একটী বড় মজার কথা বলিলেন। বহু দূর স্থান হইতে আগত একদল মেয়েছেলে

পংক্তি ভোজনে বসিয়াছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। খানিকটা খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে। হঠাৎ এক ভীষণ আতঙ্কের কলরব উঠিল। সকলে ভোজন অর্দ্ধসমাপ্ত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং যে যাহার পথ দেখিতে উদ্যত হইলেন। কে রটাইয়া দিয়াছে যে এই খাওয়ানর উছিলায় সাধুরা ছেলে চুরি করিয়া রাখিবার মতলব করিয়াছেন ;—তাই ছেলেধরার আতঙ্ক ! তাহাদের জোড় হাত করিয়া গুজব অমূলক বুঝাইয়া আবার বসাইতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

কাঙ্গাল গরীব মেয়েরা, শিওড়, দেশড়া, কোয়ালপাড়া, শ্যামবাজার, বদনগঞ্জ, কামারপুকুর, তাজপুর, আনুড়, সাতবেড়া, রামজীবনপুর, ঝরিয়া, বেলটে প্রভৃতি বহুদূর স্থান হইতে দলে দলে কাতারে কাতারে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত। কাঁকে দুই একটী করিয়া অনেকের ছেলে মেয়ে, পরণে শতছিদ্র জীর্ণবাস, রুক্ষকেশ, ক্ষীণদেহ। ইহাই আজিকার নিছক বঙ্গপল্লী। বাস্তবকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাত্রে দূরস্থানে আলোকহীন হইয়া তাহাদের পথে ফিরিয়া যাওয়া দুষ্কর। তাই লম্বা পথের দুই ধারে সারি সারি সকলে শুইয়া রহিলেন।

হঠাৎ ভিড়ের ভিতর সন্ধ্যার সময় একদল মাথায় পাগড়ী বাঁধা 'ব্যাগপাইপ'ওয়ালা আসিয়া দেখা দিল। তাহাদের বাজনার সুমিষ্ট মধুর স্বরে সকলেই তুষ্টি লাভ করিলেন। তাহারা মুসলমান। মহোৎসব হইবে খবর পাইয়া কোয়ালপাড়ার পথে আসিতেছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সেখানে বিশ্রাম করিয়া ঠিক সময়ে এখানে উপস্থিত হইতে পারে নাই—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

বিরাট অনুষ্ঠান রাত্রি বারটার পর শেষ হইল। সকলেই কর্ম্ম-ভারাক্রান্ত, কিন্তু প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল। আজ রাত্রে শুয়া এক মস্ত সমস্যা। যিনি যেখানে পারিলেন স্থান করিয়া লইলেন। যাহারা শেষ পর্য্যন্ত পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহারা এই দুপুর রাত্রে ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়া একেবারে নির্ব্বাক্। নিরুপায়—অগত্যা এদিকে-সেদিকে এক আধটুকু স্থান করিয়া সকলে রাত্রি কাটাইলেন।

প্রসবিনী।

(শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী)

১

মা'র বুকে ঐ শিশু যে হাসিছে
রে কবি তুই ছাখ্ তারে আজি
অপলোক চোখে চাহি? শোন্ ওরে শোন্
নিঝুম আলোয় কি সঙ্গীত উঠে বাজি?
বিশ্বের দুর্য্যোগ-বন্যা মরুভূমি মাঝে
সুউর্ব্বর মরুদ্যান নয় কিরে রাজে?

২

হের জননীর শান্ত সুরখান
আজো অকলুষ বিধাতা নির্ম্মান্?
সেথা হ'তে উঠিতেছে এ সৌরভ শ্বাস
মেলি আঁখি ছাখ্ হাসে পৃথ্বী-ভাসা হাস?
সবলে সে অঙ্গ দুলায়
হেলায় ভুলি বিশ্ব লোকের গ্রাস করা ঐ মায়া
মৃত্যুহারা উত্তালতায় বৈশাখীর সাঁজে
ঝড়ের বুকে নাচ্ছে যেন মুক্ত ধূলির কায়া।
ছড়াইয়া কাঁপাইয়া উজ্জ্বল চরণ
হস্তে হস্তে নিষ্পেষিয়া নিমেষে নিমেষে
উলঙ্গ প্রকৃতি মাঝে নাচিছে শৈশব
ভীতিহীন কুণ্ঠাহীন মাতন আবেশে!
বিশ্বের কুঞ্চিত প্রাণ হ'ল মূক থির
নিমেষেই টুটে বুঝি ধরণীর ধারণ প্রাচীর
বুঝি লয় হয়—ভ্রান্তিরে অভ্রান্তভাবি

তিমির উৎসব

দীন হেয় অসফল পূতি-পর্য্যসিত

আনন্দের ভ্রূকুটী ঘোষ।

৩

হের, সরল উন্নত অই শিশু দৃষ্টিটুকু

পাত্রে পাত্রে ধরণীর পূর্ণ বক্ষখানি

লইতেছে ভরি বারম্বার—করিতেছে পান

মর্ম্মগ্রাসি ক্ষুধা তার অতৃপ্ত পরাণ।

একি? তুই শুধু চাহিয়া বিভল

রে মূঢ়! উদ্দাম কবি প্রেমিক পাগল

রাখ্ রাখ্ রাখ্ ওরে সব অভিযোগ

নত কর্ আঁখি! বাসনার নিত্য নবরোগ

হবে নিরাময়? পাবিরে অভয়?

তরল প্রেমের নীর করেছিস্ পান

আকণ্ঠ ভরিয়া তোর ওদীর্ণ হৃদয়ে

যুগ যুগান্তর ধরি জনমে মরণে

কত ভাণ খেলা তুমি খেলেছ অঙ্গনে

এই বসুধার তলে!—মিটেছে কি সাধ?

শুধু না সুধীরে তুই জীর্ণ করে ফেলেচিস্

অন্তরের শিরা আর রক্ত শক্তি চয়ে?

এবে চেয়ে থাক্, শুধু থাক্

ইন্দ্রিয়ের দ্বার—সেও মুছে যাক্

দেখ্ চাহি

জমিয়া জমিয়া গাঢ় প্রণয়ের দীপ্

অভয়-আশ্বাসে আজ জননীর প্রাণ

কাঁদিয়া করিছে আজ দীর্ণেরে আহ্বান?

নিশ্চিন্ত করিতে সৃষ্টি—হৃদয়ের গান

হাঁকিতেছে ধীরে
প্লাবনের শতবেগে হৃদয়ের তীরে—
"ফিরে আয় বুকে আয়, রে শিশু চপল
কোলে মোর ঘুম
হৃদয়ে হৃদয় রাখি' সর্ব্বোত্তাপ হরি'
কণ্ঠে তোর দিই বাছা লক্ষ কোটী চুমা !"

৪

ওরে চঞ্চল ওরে উদাস—
মুছে যাক্ মুছে যাক্ সর্ব্ব ভীতি ত্রাশ ?
মার কোলে ছোট আশা ছোট সুখ দুখ নিয়ে
ছোট বুক একখানি হাসিছে যেমনি
ওরে ক্ষুব্ধ তুই গারে গান তেমনি অতল নিরুদ্বেগ
তেমনি নির্ভয়ে ভুলিয়া তেমনি ;
নাহি ভয়—
লুটাইয়া শতধারে হৃদয়ের রব
আনন্দ রাগিণী তোল জননীর জয় !
স্থির চেয়ে থাক্—
দুয়ারে সন্ধ্যার মত নিঃসঙ্গ উন্নত
অমনিই উলঙ্গ বিভোর
অমনিই এ ধরার নীলিমা আসনে
রহ ভাই পুলকে অঘোর ?

৫

দিবসের ব্যথারাগ লক্ষ মায়াজাল
কাজ নাই বহিবার বিষাদ জঞ্জাল
বিশ্ব ঝটিকার সাথে শুধু উদ্দাম-লড়াই
ব্যাকুল বাসনা ভরা রশ্মি-তমঃ মাঝে
অনন্ত মাদক তান পুচ্ছে বাঁধি নিয়া
আত্ম সুর কলুষিয়া নাহি নাহি কাজ ?

স্থির বুঝিয়াছি বৃথা সব বৃথা সব
　　মরুচ্ছ্বাস মাখা এই দীর্ণ কলরব ?
বাতাসে বাঁধিতে যেন মহা আয়োজন
পলে পলে হৃদয়েরে করি সঙ্গোপন
　　মিথ্যা এক হয়ে আছে প্রেমের স্থাপনা
　　তাহাতে জগৎ বাঁধা ?—নিয়ে আপনার
লক্ষশোক লক্ষগতি কোটী উন্মাদনা !
　　—দূর হোক্
অহং এর কারাগারে বাঁচিবার শোক ?

৬

　　সরল এসেছ ভবে
উলঙ্গ দেহটী নিয়ে মাতৃস্তন্য সুখে
　　　তেমনি চলিয়া যাও
সর্ব্বহরা মার বুকে ভুলিবার সুখে !
　　প্রকৃতির একপ্রান্তে উদ্দাম উদাস
　　বাঁধি নীড় রহস্যখে ! বিশ্বের বিকাশ
　　মায়া মরীচিকা ভূমে জ্বালার জীবনে
　　যেওনা যেওনা কভু উত্তুঙ্গ আসনে
　　　পতনের সদা যেথা ভয়
স্থির হও ? শান্ত হও বক্ষে দিয়া
　　আপনার মুক্ত দুটী হাত —
আঁখি মুদি খেল শুধু, খেলিতেই আসিয়াছ
　　নাহি ভয় নাই ভয় মরণ সংঘাত ?
　　নির্জ্জন স্বাধীন
অবিরাম প্রবাহিয়া যাও নিশিদিন ?
　　তারপরে, কেঁদে ছিলে যেই ভাবে
　　　জীবনের প্রসব উৎসবে

মাতৃস্তন্য পেয়ে যথা শান্ত হয়ে
হেসেছ নীরবে—

সেইরূপে—

মরণের পূর্ণরশ্মি পাতে স’রে যাবে যেই
অফুরান আনন্দের মাতৃস্তন্য দুটী।
কাঁদিবে নিমেষ মাত্র ঊর্দ্ধে লক্ষ্য ভরি
তারপরে চলে যাবে আর স্তন্যে ছুটি,
কিম্বা! সলিল কণিকা যথা পড়িয়া অনলে
তরঙ্গে তরঙ্গে মেশে অনন্তের গায়
তোমারো হৃদয় ধীরে বহিয়া আবার
সেই মত মিলাইবে বিশ্বমাতৃকায়।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

(ডাঃ অম্বিকাচরণ দত্ত, সিভিল সারজন)

বর্ত্তমানযুগে অনেকেরই মনে অদৃষ্ট এবং পুরুষকার সম্বন্ধে একটা বিষম সন্দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সার্থকতা কি এবং কিরূপেই বা ইহাদের একত্র সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে। অনেক আধুনিক শিক্ষিত যুবকদিগের মত এই যে, ভারতীয়েরা শুধু অদৃষ্ট মানিয়া বিনষ্ট হইয়া গেল, যদি তাহারা অদৃষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষকার আশ্রয় করিত তাহা হইলে তাহাদের এই অধঃপতন হইত না, কারণ নীতি-শাস্ত্র বলিয়াছেন—

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা। ইত্যাদি

যদিও তাঁহারা স্পষ্টতঃ বলেন না, তথাপি পরোক্ষ ভাবে তাঁহাদের বোধ হয় বিশ্বাস এবং যাহা তাঁহারা অনেক সময় প্রকাশ করিয়া থাকেন, 'ভারতবাসী শুধু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মারা গেল'। অবশ্য এখানে বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মের সঙ্গে অদৃষ্টবাদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সুতরাং এখন তাঁহাদের উচিত দৈব এবং ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিয়া শুধু পুরুষকার অবলম্বন করা, তাঁহারা দৈব এবং পুরুষকারের সামঞ্জস্য হইতে পারে কি না তাহা ভাবিতে মোটেই প্রস্তুত নহেন, উপরন্তু মনে করেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে যত শীঘ্র ঈশ্বরবাদটাকে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। এখন জিজ্ঞাস্য এই সত্য সত্যই কি ভারত অদৃষ্ট বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে? কিম্বা অলসতাকে, দুর্ব্বলতাকে, ভীরুতাকে অদৃষ্টের আবরণে আবৃত করিয়া আত্ম প্রবঞ্চনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। এই বিষয়টা বিশেষ প্রকারে চিন্তা করা আবশ্যক এবং অদৃষ্ট কি ও পুরুষকার কি তাহার বিশেষ বিশ্লেষণ বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী মনে করিয়া এই সামান্য প্রবন্ধের অবতারণা।

অনেক দিন পূর্ব্বে আমার মনেও এইরূপ একটা সন্দেহ ছিল যে অদৃষ্ট ও পুরুষকার এক সঙ্গে কিরূপে থাকিতে পারে অর্থাৎ অদৃষ্টে বিশ্বাস থাকিলে পুরুষকার থাকে না এবং পুরুষকার বিশ্বাস করিলে অদৃষ্ট থাকে না, কিন্তু একটু ভালরূপে এই দুইটী তত্ত্ব অনুধাবন করিলে এই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাধারণ লোকে যাহাই বিশ্বাস করুক, অদৃষ্টবাদের প্রকৃত তত্ত্ব ভগবানের বিশ্বনিয়ন্তৃত্ব। তিনিই জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অমোঘ শাসনে সৃষ্টি স্থিতি লয় সঙ্ঘটিত হইতেছে। তিনিই একমাত্র জীবের মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা, জীবের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সমস্তই সেই বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত,—জীব জানে না নিয়তিচক্রের আবর্ত্তনে কোথায় তাহাকে যাইতে হইবে কিন্তু অনন্ত কোটী গ্রহ নক্ষত্র এবং তারকা-স্তবক মণ্ডিত ভুবন মণ্ডলের যিনি একমাত্র অধীশ্বর, ব্রহ্মলোক হইতে স্তম্ব সম্বলিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার হস্তে আনন্দ কন্দুক, তাঁহার নিকট

কিছুই অবিদিত নাই। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "আমিই সমস্ত নিহত করিয়া রাখিয়াছি তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হও" "নিমিত্তমাত্রং ভব শব্যসাচিন্," অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবস্থিত রাজগণের ভবিষ্যৎ পূর্ব্বেই ভগবান নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, অর্জ্জুন শুধু নিমিত্ত মাত্র। সে নিমিত্তেরও তিনিই কর্ত্তা, কারণ পরে তিনি আর একস্থানে বলিয়াছেন "করিষ্যস্যবশোপিতৎ" অর্থাৎ 'তুমি' ইচ্ছা না করিলেও তোমাকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। মানুষের ইচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় না, ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে কৃত কর্ম্মের ফল কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহার কিছুই ঠিকানা নাই, সুতরাং ইচ্ছার উপরে যে একটা ইচ্ছা আছে তাহা নিশ্চিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই জগতে তিনি ভিন্ন আর কেহ কর্ত্তা নাই, যাহা কিছু সঙ্ঘটিত হইতেছে তাঁহারই অলঙ্ঘনীয় শাসনে হইতেছে এবং তাঁহার কৃপা দৃষ্টি ভিন্ন নিয়তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য উপায় নাই, এই বিশ্বনিয়ন্তৃত্বই অদৃষ্ট। মানুষ তাহা দেখিতে পায় না অথচ প্রতিনিয়ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে, অনাদি অনন্ত সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভগবানের বিশ্বনিয়ন্তৃত্বে বিশ্বাসই অদৃষ্টবাদ।

এখন বিরুদ্ধবাদিগণ প্রশ্ন করিতে পারেন ভগবানই যদি অনন্ত জগতের কর্ত্তা তবে জীবের পুরুষকার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? একথা একদিকে ঠিক, অর্থাৎ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান সমস্ত জগতের অধীশ্বর তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয় সঙ্ঘটিত তিনি সকল ধর্ম্মের এবং সকল কর্ম্মের নিয়ামক, যেমন সাধক গাহিয়াছেন—

> "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি,"
> "সদানন্দময়ীকালী, মহাকালের মনোমোহিনী
> তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও,
> আপনি দাও মা করতালি" ইত্যাদি

তাঁহার পক্ষে পুরুষকার বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই, কারণ তিনি দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আমি বলিয়া একটা

জিনিষ তাঁহার একেবারেই নাই, সুতরাং পুরুষকার কাহার আশ্রয়ে থাকিবে? বিশ্বাত্মার সহিত তাঁহার আত্মা একত্র সম্মিলিত, দৈহিক প্রয়োজন অথবা লোক শিক্ষার জন্য কোন কর্ম্ম করণেও তাঁহার আসক্তিও নাই, বন্ধনও নাই, লাভালাভ জয় পরাজয় কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না। তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর সেই বিশ্বরাজ রাজেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে। ইনিই প্রকৃত জ্ঞানী, ইনিই প্রকৃত অদৃষ্টবাদী—

দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেসু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয় ক্রোধ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

তিনি শোকদুঃখে মুহ্যমান হন না, আনন্দে অধীর নহেন, আসক্তি ভয়, ক্রোধ কিছুই তাঁহার নাই, তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া কলাপ আনন্দময়ের লীলানন্দরস পানের নিমিত্ত, এখানে বলাই বাহুল্য যে এইরূপ মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ।

এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার অদৃষ্টবাদী আছেন যাহারা মনে মনে ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব এবং বিশ্বনিয়ন্তৃত্ব বিশ্বাস করেন কিন্তু সে বিশ্বাস তাঁহাদের স্থায়ী হয় না, সে বিশ্বাসের উপরে তাঁহারা নির্ভর করিতে পারেন না; মোট কথা তাঁহাদের মনের অবস্থা প্রকৃত বিশ্বাস ও সন্দেহ ইহার মাঝামাঝি, কোন স্থানে। ইহাকে Intellectual Belief বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যদিও জানেন ভগবানের উপর সমস্ত ভবিষ্যত, মানবের সমস্ত নিয়তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তথাপি তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন না, বিপদে অধৈর্য্য হন, মৃত্যুর বিভীষিকা নিরন্তর তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। আবার হর্ষেও তাঁহারা অত্যন্ত অধীর ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন। রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ তাঁহাদের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইঁহাদের 'আমিত্ব' 'তুমিত্ব' বিসর্জ্জন দিবার একেবারেই অধিকার নাই, সুতরাং প্রবল পুরুষকার ভিন্ন ইঁহাদিগের গত্যন্তর নাই। যতক্ষণ আমিত্ব বর্ত্তমান, আমার দেহ, আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বাড়ী, ঘর, সম্পত্তি এককথায় ইন্দ্রিয় লিপ্সা ও ভোগ বিলাস বাসনা বর্ত্তমান ততক্ষণ আমাদের পুরুষকার অনিবার্য্য। ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস নাই এবং নিয়তির গতি কোন দিকে তাহাও আমাদের নিকট অবিদিত সুতরাং কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী

তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মানব ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এইখানেই পুরুষকার এবং এইখানেই অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সামঞ্জস্য আবশ্যক। পূজ্যপাদ মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন ঈশ্বর বিশ্বাসীর দুটী ভাব—একটি বিড়ালের ছানার ভাব, আর একটী বানরের ছানার ভাব। বিড়ালের ছানার সম্পূর্ণ নির্ভর তাহার মায়ের উপর, মা যেখানে ইচ্ছা মুখে করিয়া লইয়া যায় তাহাতে তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই, মনে কিছুমাত্র ভয় বা সন্দেহ নাই, বানরের ছানার স্বভাব তাহার বিপরীত, সে তাহার মাকে আপনিই আঁকড়াইয়া ধরে, তাহার মায়ের উপর বিশ্বাস আছে সত্য কিন্তু নিজেরও আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা আছে। এখানে বলাই বাহুল্য যে প্রথমোক্ত ভাবটী প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর এবং দ্বিতীয়টীর সন্দেহবাদীর অর্থাৎ অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়বাদীর। অদৃষ্টে কতকতটা বিশ্বাস আছে এবং আত্মরক্ষার্থ চেষ্টাও আছে।

(ক্রমশঃ)

শঙ্কর—দর্শন *

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী সাংখ্যতীর্থ, এম, এ,)

১। শঙ্কর মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ওঁ নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিংচ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দ যোগীন্দ্র মথাস্য শিষ্যম্॥
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদঞ্চ হস্তামলকঞ্চ শিষ্যং।
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যানস্মদ্ গুরূন সন্ততমানতোঽস্মি॥

---

* কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটীর অধিবেশন বিশেষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণোমালয়ং করুণালয়ং।
নমামি ভগবৎপাদং শঙ্করং লোকশঙ্করম্॥
শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং কেশবং বাদরায়ণং।
সূত্রভাষ্যকৃতৌবন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ॥

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অভিমত বাদ বুঝিতে হইলে তিনি কোথায় এবং কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে ধর্ম্মজগতের ও সমাজের অবস্থাই বা কিরূপ ছিল তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ ঐ সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে নবপ্রচারিত অথবা প্রাচীন ধর্ম্ম মতের নূতন প্রণালীতে প্রচারের উদ্দেশ্য অনেক সময় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। আমরা এ প্রবন্ধে আচার্য্যের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া শুধু তদানীন্তন সমাজ ও ধর্ম্মের অবস্থা সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করিয়া প্রকৃতের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।

প্রাচীন ভারতে এমন এক দিন ছিল যখন আচণ্ডাল জীবমাত্রের হৃদয়েই পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মে অনুরতি, ভগবানে অবিচলিত ভক্তি, কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপরতা, শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, বেদবাক্যে অভ্রান্ততাজ্ঞান ও আত্মার অনশ্বরত্বে অটল বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণ বেদকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া ঐহিক ও পারমার্থিক এই উভয়বিধ চিন্তায় দিন যাপন করিতেন। সুকৃতিশালী ভাগ্যবান নর ইহার মোক্ষফল লাভেও বঞ্চিত হইতেন না। নাস্তিকতা তখন শুধু কোষ কলেবরই অলঙ্কৃত করিত। কিন্তু হায়! কালের অমোঘ আবর্ত্তনে সে সুখসূর্য্য বিষাদ জলদে আবৃত হইল। ঘোর ঘন গর্জ্জনে প্রকৃতি আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হইল এবং নাস্তিকতারূপ অশনি সম্পাতে সাধুহৃদয় বিকম্পিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। সেই ভীষণ দুর্য্যোগের ফলে লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসে সংশয়ের রেখাপাত হইল এবং মানবমন হইতে ভগবদ্ভক্তি ক্ষরিত হইল। ধর্ম্মরাজ্য অধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল। বেদপ্রামাণ্যে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় হৃদয় সরসী সন্ধুক্ষিত হইল। ঐশ্বরকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত মনোবৃত্তি সহস্রধা বিভক্ত হইয়া নানাদিকে প্রধাবিত হইতে আরম্ভ

করিল। এই চিন্তাপ্রবাহই কালে বিবিধজাতীয় দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিল।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবনিবহের মঙ্গল কামনায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের শাশ্বত শান্তি বা অসীম আনন্দলাভের উদ্দেশ্যেই নিশ্বাসবৎ বেদ সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই বেদই লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের মূল। কখন কখন প্রকৃত অধিকারীর অভাবে বেদের পঠনপাঠন বিলুপ্ত হয়, ইহাকেই বেদের বিনাশ বা জ্ঞানের তিরোধান বলিয়া অভিহিত করা হয়। অজ্ঞানের আধিপত্য আরম্ভ হইলেই ধর্ম্মজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ইহার পুনঃ প্রকাশের জন্য ভগবান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়া অথবা মহর্ষিগণের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া লুপ্ত বেদার্থের পুনঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে নারায়ণ হইতে আগত বেদজ্ঞান যথার্থ ভাবে অবস্থিত ছিল। ত্রেতাযুগে ইহা বিকৃত হইতে আরম্ভ হয় এবং দ্বাপরে এই বিকৃতির পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহাই আমাদের পূর্ব্বকথিত বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত দর্শনসমূহের আবির্ভাব কাল।

জ্ঞানের ভাস্বর আলোক অজ্ঞানতিমিরে আবৃত হইলে ব্রহ্মা ও রুদ্র পুরসরঃ দেবগণ লোকৈককারণ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। পুরুষোত্তম ভগবান তাঁহাদের ইঙ্গিত ভাব অবগত হইয়া পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি উৎসন্ন বেদসমূহের পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তৎপর এই বেদক্রম অল্পায়ু ও মন্দবুদ্ধি লোকের সুখবোধের জন্য শত সহস্র শাখায় বিভক্ত হইল। স্কন্দ পুরাণে জ্ঞানতিরোধানের ঐতিহাসিক কথা নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত আছে :—

গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাৎ জ্ঞানেত্বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্র পুরঃসরাঃ
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্॥
তৈর্বিজ্ঞাপিত কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণ মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥

উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ং ।
চতুর্ধা ব্যভজৎত্তাংশ্চ চতুর্বিংশতিধাপুনঃ ।
শতধা চৈকধাচৈব তথৈবচ সহস্রধা ।
কৃষ্ণো দ্বাদশধীচৈব পুনস্তস্যার্থবিত্তয়ে
চকার ব্রহ্মসূত্রানি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা ॥

বেদের বিপরীতার্থ দূরীকরণমানসে তিনি বেদার্থ নির্ণায়ক ব্রহ্মসূত্রও প্রণয়ন করেন।

বেদ ধর্ম্ম ও ব্রহ্মকাণ্ডভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে যাগাদি কর্ম্ম ও উপাসনার বিষয় বিবৃত আছে। এবং ব্রহ্মকাণ্ডে পরতত্ব বা পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাদরায়ণ ব্যাস জ্ঞান ও উপাসনাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া মমুক্ষুদিগের নিমিত্ত বেদের উৎকৃষ্ট মীমাংসা নিবন্ধ প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং স্বশিষ্য মহামুনি জৈমিনি ঋষিকে কর্ম্মীদিগের জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া অন্য মীমাংসা নিবন্ধ প্রণয়নে প্রবর্ত্তিত করেন। কর্ম্ম ভোগ ও অপবর্গ উভয়েরই কারণ। এইজন্য কথিত হইয়াছে—

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্মবৈদিকং ।
পূর্ব্বং বন্ধায় বিজ্ঞেয়ং পরং মোক্ষায় কল্পতে ॥

লোকের এই কর্ম্মবৈগুণ্য নিবারণের জন্যই কর্ম্ম মীমাংসার প্রয়োজন। জৈমিনিকৃত কর্ম্ম রহস্যপূর্ণ মীমাংসা নিবন্ধ পূর্ব্ব মীমাংসা নামে এবং ব্যাসদেব প্রণীত তত্ত্বজ্ঞানরহস্য উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত নামে আখ্যাত। বেদান্তের বাচ্যার্থ উপনিষৎ হইলেও আজকাল বেদান্ত বলিতে আপনারা সকলেই ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা বুঝিয়া থাকেন। কোন কোন পুরাণে বেদান্তের নিন্দাবাদ থাকিলেও পুরাণান্তরে ইহার স্তুতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্ম পুরাণে আছে,—

"জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থ বিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌহি তৌ ॥"

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীভারতীতীর্থমুনি শঙ্করের সূচনার

অনুসরণ স্বীয় বৈয়াসিক ন্যায়মালায় বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয় ও পাদগত যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ রচণা করিয়াছেন, বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় নির্ণয়ের জন্য আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

শাস্ত্রং ব্রহ্মবিচারাখ্যমধ্যায়াঃ স্যু শ্চতুর্বিধাঃ।
সমন্বয়া বিরোধৌ দ্বৌ সাধনং চ ফলং তথা ॥

বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মবিচারাখ্য বেদান্ত দর্শন সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফলভেদে চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম সমন্বয়াধ্যায়ে সমুদায় বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্মতাৎপর্য্য নির্ণয়ে পর্য্যবসান; দ্বিতীয় অবিরোধাধ্যায়ে সম্ভাবিত বিরোধের পরিহার; তৃতীয় সাধনাধ্যায়ে বিদ্যাসাধননির্ণয় এবং চতুর্থ কলাধ্যায়ে বিদ্যাফলনির্ণয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার চারিটী করিয়া পাদ এবং পরিচ্ছেদ আছে সেই পাদগত পদার্থ নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে :—

"সমন্বয়ে স্পষ্টলিঙ্গমস্পষ্টত্বেহপ্যুপাস্যগম্।
জ্ঞেয়গং পদমাত্রং চ চিন্ত্যং পাদেষ্বনুক্রমাৎ ॥"

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত শ্রুতিবাক্য সমূহের; দ্বিতীয়ে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত উপাস্যবিষয় বাক্যজাতের; তৃতীয়ে উপাধিবিশিষ্ট জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও জীবের প্রতি প্রযুক্ত অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের; এবং চতুর্থে 'অব্যক্ত', 'অজা' প্রভৃতি সন্দিগ্ধ পদজাতের সমন্বয় করা হইয়াছে।

"দ্বিতীয়ে স্মৃতি তর্কাভ্যামবিরোধোঽন্যদুষ্টতা।
ভূতভোক্তৃ শ্রুতের্লিঙ্গ শ্রুতেরপ্যবিরুদ্ধতা ॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি স্মৃতি ও সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদিমতের দুষ্টত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদের প্রথম ভাগে পঞ্চমহাভূত শ্রুতি সমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার এবং উত্তরভাগে জীবশ্রুতি সমূহের বিরোধ পরিহার প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীর শ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে।

"তৃতীয়ে বিরতিস্তত্বং পদার্থ পরিশোধনম্।
গুণোপসংহৃতিজ্ঞান বহিরঙ্গাদি সাধনম্।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে জীবের পরলোক গমনাগমন বিচার করিয়া বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের প্রথমভাগে 'ত্বং' পদার্থ, ও চরমভাগে 'তৎ' পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে সগুণ বিদ্যার গুণোপসংহার ও নিগুর্ণ ব্রহ্মে অপুনরুক্তপদোপসংহার; চতুর্থপাদে নিগুর্ণজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধনভূত আশ্রম যজ্ঞাদি ও অন্তরঙ্গ সাধনভূত শম, দম, নিদিধ্যাসনাদি নিরূপিত হইয়াছে

চতুর্থে জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তের্গতিরুত্তরা।
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্রহ্মলোকাবিতি পদার্থ সংগ্রহঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে শ্রবণমননাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানদ্বারা নিগুর্ণ অথবা উপাসনা দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া পাপপুণ্য-বিনাশ লক্ষণ জীবন্মুক্তি অভিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে ম্রিয়মানের উৎক্রান্তি প্রকার ও তৃতীয়ে সগুণবিৎ মৃতের উত্তরায়ণ মার্গ কথিত হইয়াছে। চতুর্থের পূর্ব্বভাগে নিগুর্ণ ব্রহ্মবিদের বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্তি ও উত্তরভাগে সগুণ ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোক স্থিতি নিরূপিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পাদে আবার কতকগুলি করিয়া অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণে এক একটী স্বতন্ত্র বিষয় আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে ৩১ সূত্রে ১১ অধিকরণ; দ্বিতীয় পাদে ৩২ সূত্রে ৭ অধিকরণ; তৃতীয় পাদে ৪৩ সূত্রে ১৪ অধিকরণ এবং চতুর্থ পাদে ২৮ সূত্রে ৮টী অধিকরণ আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩৭ সূত্রে ১৩ অধিকরণ; দ্বিতীয় পাদে ৪৫ সূত্রে ৮ অধিকরণ; তৃতীয় পাদে ৫৩ সূত্রে ১৭ অধিকরণ; চতুর্থ পাদের ২২ সূত্রে ৯টী অধিকরণ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে ২৭ সূত্রে ৬ অধিকরণ, দ্বিতীয় পাদে ৪১ সূত্রে ৮ অধিকরণ, তৃতীয় পাদে ৬৬ সূত্রে ৩৬ অধিকরণ; চতুর্থ পাদে ৫২ সূত্রে ১৭ অধিকরণ আছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে ১৯ সূত্রে ১৪ অধিকরণ; দ্বিতীয় পাদে ২১ সূত্রে ১১ অধিকরণ; তৃতীয়পাদে ১৬ সূত্রে ৬ অধিকরণ এবং চতুর্থ পাদে ২২টী সূত্রে ৭টী অধিকরণ আছে। মোটের উপর সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের ৫৫৫টী সূত্র ও ১৯২টী অধিকরণ আছে *। এই সকল অধিকরণের সংখ্যা হইতেই বেদান্ত দর্শনের গুরুত্ব ও বিষয়বিভাগ নিরূপিত হয়। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে এস্থলে অধিকরণ সমূহের নামোল্লেখ করা হইল না। বাদরায়ণের সূত্রগুলি এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সারবৎ যে ভাষ্য ও টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সূত্রগুলি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুযায়ী ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সূত্রগুলির এই প্রকার সার্ব্বজনীন আলম্বন দেখিয়া ভগবান্ বাদরায়ণের রচনা নৈপুণ্যে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। ঈশ্বরাগত শ্রুতি জননীর ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রও সর্ব্বকালে, সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বমানব সমাজে সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। এই বেদান্তসূত্রের অন্য এক বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা শুধু হিন্দুধর্ম্ম জগতে সীমাবদ্ধ নহে কিন্তু সার্ব্বজনীন। এমন সম্প্রদায় নাই যাহা স্বমতের অনুকূলে ইহার ভাষ্য বা ব্যখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। সন্ন্যাসিদলে আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রামানুজাদি, শৈব সম্প্রদায়ে অবধূতাচার্য্য প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যা-গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি বর্ত্তমান কালেও কেহ কেহ ব্রহ্ম ও শক্তি পক্ষে ইহার ভাষ্য প্রণয়নে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ইঁহাদের পূর্ব্বেও ভগবান বোধায়ন, ভর্তৃপ্রপঞ্চ ভাস্কর ও দ্রমিড় প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কালবশে অথবা সম্প্রদায়ের উচ্ছেদবশতঃ এইগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

একসময়ে এই ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্র গুরু, শিষ্য ও আচার্য্য সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থ সর্ব্বজনবিদিত, অতএব

* রামানুজভাষ্যে বেদান্তের সূত্র সংখ্যা ৫৪৫ ও অধিকরণ সংখ্যা ১৬৬ দৃষ্ট হয়।

ইহার গুণব্যাখ্যান অনর্থক। এককথায় বলা যাইতে পারে যে বেদান্ত-দর্শন গৌরবসম্পদে জগতে অতুলনীয় এবং দর্শনরাজ্যে সর্ব্বদর্শন শিরোমণি।

ব্রহ্মসূত্রের এই প্রাধান্য বহুদিন লোকসমাজে স্থায়ী হইল না, অবৈদিক ধর্ম্মের ঘোর ঘনঘটায় ইহার ভাবের স্বরূপ কতক কালের জন্য আচ্ছাদিত হইল। কথায় আছে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" —চক্রের আবর্ত্তনের ন্যায় দুঃখের পর সুখ ও সুখের পর দুঃখ প্রাণিনিয়তই উপস্থিত হইতেছে। এই মহাবাক্যের সত্যতা শুধু বাহ্য জগতে নহে, অন্তর্জগতেও অনুভূত হয়। যখন মানসিক বৃত্তি সমূহ পাপ পঙ্কে অভিলিপ্ত হয়, যখন শম, দম, ক্ষমা, আর্জব, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি দেব বৃত্তি সমূহ কামক্রোধাদি আসুরবৃত্তি সমূহের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কোন এক অজ্ঞাতস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সময় ধর্ম্মজগতে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তখনই ভগবান্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে গীতোক্ত সেই—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থান-মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"—এই আশ্বাসবাণী অনুসারে সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য স্বয়ং আবির্ভূত হন অথবা মহর্ষিগণের মধ্যে স্বীয় শক্তি বিস্তার করিয়া বিপ্লুষ্ট ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাই গীতায় আছে ঃ—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পর, যখন বৌদ্ধধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমাজে অনাচার ও অত্যাচারের তাণ্ডব নৃত্য হইতে লাগিল তখনও এ মহাসত্য জ্বলন্ত অক্ষরে লোক লোচনের বিষয়বর্ত্তী হইয়াছিল।

এমন এক সময় আসিল যখন ভারতের ধর্ম্মগগন নিবিড় অধর্ম্মোর্ম্মির সমাচ্ছন্ন;—সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বৈনাশিকগণ বিপ্লুত;—শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কাপালিক আচারে বিধ্বস্ত,—শাস্ত্রীয় গ্রন্থনিচয় অধার্ম্মিক জন বিপ্লুষ্ট;—মুক্তিপ্রদ তীর্থনিবহ অসংস্কৃত, জনগণ অপরিজ্ঞাত,—বিভিন্ন অবৈদিক সম্প্রদায় স্ব স্ব মতস্থাপনে বদ্ধ পরিকর;—দুর্দ্ধর্ষ দস্যু কণ্টক পরিবৃত লম্পটকুলের ঘোর অত্যাচারে, নারীর সতীত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব

রক্ষা করা দুষ্কর হইয়াছিল, সেই ঘোর দুর্দ্দিনে,—সেই প্রলয়ের সন্ধিক্ষণে—অধর্ম্মরূপ অমানিশার পুঞ্জীকৃত তমোরাশি ভেদ করিয়া শঙ্কর মার্ত্তণ্ডের খর দীধিতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি দাক্ষিণাত্যের কেরল দেশান্তরবর্ত্তী কালটী গ্রামে, শিবগুরু নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও সতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রুতি ব্যাখারূপ সঞ্জীবন মন্ত্রে মৃতকল্প বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন ও ভারতের এক প্রান্ত হইতে সুদূর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতঃ সেই প্রাচীন আর্য্য গৌরব জগতে বিজয় দুন্দুভিনাদে বিঘোষিত করিয়াছিলেন। সেই বিজ্ঞানপ্রভ বালসূর্য্যের অভ্যুদয়ে ভারতগগনের তমোরাশি অপসৃত হইল,—দিব্য ঊষালোকে প্রবুদ্ধ হইয়া ভারতের নরনারীবৃন্দ পুনরায় বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত ও প্রবৃত্ত হইল। ভারতের যে পুণ্য তপোবন একদা ছন্দোগগণের সামগানে মুখরিত,—বহ্বৃচগণের মন্ত্র নিনাদে প্রতিধ্বনিত,—অধ্বর্য্যুগণের মন্ত্রব্যাখ্যায় শব্দিত ও ঋত্বিকগণের যজ্ঞীয় হোম ধূমে পবিত্রীকৃত হইত,—কাল প্রভাবে বৈনাশিকগণের ঘোর উৎপীড়নে সেই পূত তপোবন, মহা শশ্মানে পরিণত হইয়াছিল। জ্ঞানবীর শঙ্করের আবির্ভাবে সেই পুণ্য তপোবন পুনরায় পূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল:—কোথাও বা সংসার বিরাগী পরিব্রাজক পরমাত্মধ্যানে নিমগ্ন;—কোথাও যোগী স্তিমিত লোচনে যোগেশ্বরের ধ্যানে নিরত;—কোথাও বা দণ্ড মেখলাধারী ব্রহ্মচারী সমিৎ-কুশ-তোয় আহরণে ব্যাপৃত দৃষ্ট হইল।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

সাধন-শিক্ষা-সোপান—শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের শুভ ৭৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এই পুস্তকখানি তাঁহার শুভ জন্মতিথি ঝুলন দ্বাদশী হইতে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের শুভদিন পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে।

ম্যানেজার কাশী যোগাশ্রম, হাউজ কাটোয়া, বেনারস সিটি—এই ঠিকানায় ডাক ব্যয় জন্য এক আনার টিকিট পাঠাইলে বিনা মূল্যে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। কোটালীপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯২০ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত কার্য্য বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উদ্বোধনের পাঠকবর্গ জানেন এখান হইতে দশের হিতকর বহু কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে এখানে একটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী ব্যাকারণতীর্থ এই সংস্কৃত টোলের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এই সৎকার্য্যে সকলেরই সাহায্য দান কর্ত্তব্য।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টুডেণ্টস হোমের, ব্যাঙ্গালোর, মাইসোর, ১৯২২ হইতে ২৩ পর্য্যন্ত কার্য্যবিবরণী আমরা পাইলাম। এই ছাত্র নিবাসে এণ্ট্রান্স, বি, এ, বি, এস্ সি, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ছাত্রেরাই সৎশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত এন, বেঙ্কটেশ্বর আয়েঙ্গার ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

৩। আরা, পাটনা, সাহাবাদ ও দানাপুর জেলায় জল প্লাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে পাঁচটী কেন্দ্র খুলিয়া ৮৮ খানি গ্রামে, ১১২৬ জন দুঃস্থকে সাহায্য করা হইতেছে। যাঁহারা এই কার্য্যে অর্থ বস্ত্র সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্টের নিকট অথবা উদ্বোধন কার্য্যালয়ে সেক্রেটারীর নিকট অর্থাদি প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা। এক বৎসরের অধিক কাল হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কতিপয় সন্ন্যাসী ও

ব্রহ্মচারিকর্ত্তৃক সাঁওতাল পরগণার দেওঘর নামক স্থানে বালকগণের নিমিত্ত একটী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। চরিত্রবান ত্যাগী শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে বাস করিয়া কোমলমতি বালকগণ যাহাতে শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রণালীতে লৌকিক বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া যথার্থ মানুষ হইতে পারে এই বিদ্যালয় সেই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটীর মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে বালকগণ যেন লৌকিক শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রবান, কর্ম্মঠ, স্বাবলম্বী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং পর জীবনে যেন জীবন যুদ্ধের উপযুক্ত হয়।

দৈহিক, ব্যবহার মূলক, নৈতিক, ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা ব্যতীত এই বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত জ্ঞান মূলক বিষয় সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাথমিক বিজ্ঞান, অঙ্কন, সঙ্গীত, প্রভৃতি পাঠ, উদ্ভিদ্ ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান। এতদ্ব্যতীত মুখে মুখে গল্পচ্ছলে ধর্ম্মনীতি, পুরাণ, ইতিহাস ও মহৎ লোকদের জীবনী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এই ভাবে স্থির হইয়াছে যে, কোনও বালক ইচ্ছা করিলে ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে।

সাধারণত ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালকগণকে আশ্রমে লওয়া হয়। পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় ব্যতীত অপরাপর খরচের জন্য মাসিক ১৮৲ টাকা করিয়া প্রত্যেক ছেলেকে দিতে হয়।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিয়মাবলীর জন্য অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখুন।
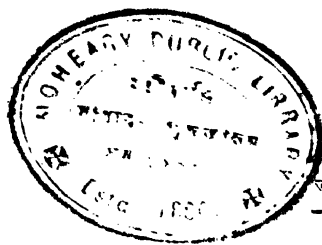
ব্রহ্মলীন স্বামী আত্মানন্দ

শুদ্ধ-আত্মা পবিত্র-জীবন স্বামী আত্মানন্দ আর এই অনিত্য পাঞ্চভৌতিক শরীরে নাই। বিগত ২৫শে আশ্বিন তারিখে তিনি শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। সাধু সমাজে তিনি বিশেষ খ্যাতনামা না হইলেও যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার জীবনের ত্যাগ, তপস্যা ও আধ্যাত্মিক গভীরতার সাক্ষ্য দিতে পারেন। তাঁহার নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ জীবন, ঐকান্তিক ধ্যাননিষ্ঠা, আত্ম-প্রত্যয়, গুরুভক্তি ও ইষ্টনিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়। তিনি ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা সর্বদাই করিতেন। প্রস্থানত্রয়ে (গীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রভাষ্য) তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং অপরের ভিতর ঐ ভাব সঞ্চারিত করিবার চেষ্টাও তাঁহার বিশেষ ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোরে তাঁহাকে প্রথম দর্শন লাভ করি। চামরাজপেটে একটী ভাড়াটে বাড়ীতে তিনি ভক্তগণকে লইয়া শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা করিতেছিলেন। সেই প্রথম দর্শন হইতেই তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সকল সময় তাঁহার পদপ্রান্তে বাস করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। তিনি বেলুড়ে, বাঙ্গালোরে, পুরীতে, ভুবনেশ্বরে, সম্বলপুরে, ঢাকায় ও শেষে কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দাদি মহাপুরুষগণের প্রতি তাঁহার আগাধ শ্রদ্ধা একটা শিক্ষার বিষয়। যে কোন ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার কাজ করিত, তাহাকে তিনি পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন "তোমরা কত সৌভাগ্যবান যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার অধিকার লাভ করিয়াছ। যে হাতে তোমরা ঠাকুরের কার্য্য করিতেছ সে হাত কি আমাদের পায়ে লাগাবে? ইহা কখনই হইতে পারে না।" শুকুল মহারাজ শশীমহারাজের নিজ হাতের

তৈয়ারী। একবার ভুবনেশ্বরে তাঁহার সহিত এক চাতুর্ম্মাস্য সঙ্গ ও সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তখনও সেখানে মঠ হয় নাই। প্রসন্নবাবুর বাড়ীতে একটী ঘরে আমরা উভয়ে থাকিতাম। সে সময় তিনি সর্ব্বদাই ধ্যান, জপ, সাধন, ভজন ও পাঠাদিতে তন্ময় হইয়া থাকিতেন এবং প্রত্যহ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ধ্যানেতে নির্ব্বাত-দীপ-শিখার ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া অবস্থান করিতেন। বাহ্যিক শরীরের ক্রিয়া কিছুই পরিলক্ষিত হইত না। একদিন একটী বৃহদাকার সর্প গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, আমার দৃষ্টি সর্পের উপর পড়িয়াছে। শুকুল মহারাজ কিন্তু তখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। যেখানে একাত্মদৃষ্টি সেখানে শত্রু-মিত্র ভাব নাই, হিংস্রের হিংস্রকত্বও থাকেনা। ভেদদৃষ্টি হইতেই হিংসার কাজ। আমি অতি মৃদুস্বরে বলিলাম, সাপ এসেছে। তখনও তাঁহার বহির্জ্জগতে দৃষ্টি আসে নাই, পুনরায় একটু বলাতে তিনি নেত্র- উন্মীলন করিলেন। সাপটী এদিক ওদিক ফিরিয়া জানালার মধ্য দিয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। তিনি আবার ধ্যানস্থ হইলেন। ঐ সময়ে তিনি অহর্নিশি ধ্যান করিতেন এবং এমন একটী আনন্দ রাজ্যে বিচরণ করিতেন যে দেখিলেই মনে হইত সর্ব্বপ্রকার এষণাবর্জ্জিত হইয়া সেই পরমানন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার চোখে মুখে ও ভাষায় তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি মহাষ্টমীর দিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীমাকে পায়েস নিবেদন করিতে করিতে বালকের ন্যায় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা, করেছ সন্ন্যাসী আর কি দিয়ে তোমার পূজা করি।" কিছুদিন ঐ প্রকার চলিবার পর তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িল। প্রত্যহ একটু একটু জ্বর হইত। তাহার পর তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইল। আমি পুরীতে শ্রীশ্রীমহারাজের (পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন ঐরূপ মহাপুরুষের সেবা ও সঙ্গলাভ করা মহা-সৌভাগ্য।

শুকুলমহারাজ নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত পূর্ণচন্দ্র, বিল্বমঙ্গল, কালাপাহাড়, নসীরাম, চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস ও রূপসনাতন

প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পড়িতে বলিতেন ও নিজে পড়িয়া শুনাইতেন এবং বলিতেন যে ধর্ম্মের এমন উচ্চ আদর্শ খুব কম পুস্তকেই পাওয়া যায়। তিনি একটী গান নিভৃতে গাহিতেন ও বিভোর হইয়া যাইতেন—

জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা, জয় গোবর্দ্ধন চেতন শিলা,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
চেতন যমুনা চেতন রেণু, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
খেলা খেলা খেলা মেলা, নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক ভেলা,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
(বিল্বমঙ্গলঠাকুর)

তিনি নিজে পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন ও ধ্রুপদ গানের সঙ্গে বাজাইতেন। তিনি সাধন ভজনের জন্য বড়ই উৎসাহ দিতেন। শেষ গত শ্রাবণমাসে দেখা হইলে বলিলেন, খেলা ধূলা ঢের হ'ল চল আবার একান্ত স্থানে গঙ্গাতীরে বসে যাই, গোলমাল লোকালয় ভাল লাগেনা। সেই সময়ে তিনি শ্রীস্বামিজীর "Inspired Talks" প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ ছেলেদের পড়াইতেন। সেই তাঁহার সঙ্গে স্থূল শরীরে শেষ দেখা। তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতি যে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহা মুছিবার নয়। আত্মজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষ চলিয়া যান কিন্তু তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, এই ত্রিতাপ-তাপিত সংসারে তাঁহাদের ভয় নাই। সাধু-সঙ্গ-জনিত পুণ্য তাঁহাদের সংসার সমুদ্র পার হইবার ভেলা।

আচার্য্য জগৎগুরু শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের তিনি একজন সন্ন্যাসী শিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণমঠের গৌরব ছিলেন। মালদহ জেলাতে শুকুল ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহাকে শুকুল মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করা হইত, তাহা হইতেই তৎপরে 'শুকুল মহারাজ' এই নামেই ভক্ত-মণ্ডলীতে পরিচিত। তাঁহার শরীর ত্যাগে যে আদর্শ জীবনের অভাব হইল তাহা আর সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি চলিয়া গেলেন,

তাঁহার জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং ধন্য হউন জগতকে পবিত্র করুন।

ভগবান বলিয়াছেন:—

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তেস্থিতাঃ॥"

(করুণানন্দ)

স্বামী আত্মানন্দের মহাসমাধি

কাশী হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজকে যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্বোধনে উদ্ধৃত করিলাম—

"পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ,

"আপনি আমার অসংখ্য সষ্টাঙ্গ জানিবেন। বোধ হয় এতক্ষণে কালিকানন্দের তার পাইয়াছেন। আমাদের পরম প্রিয়তম বহুকালের বন্ধু ও গুরুভ্রাতা শুকুল মহারাজ গত কল্য শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটের সময় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। অদ্য প্রাতে আমরা যথারীতি তাঁহার দেহ পুষ্পমাল্যাদিতে বিভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকায় জলসমাধি করিয়া আসিয়াছি।

"আমি আসিবার পর তিনি ৯।১০ দিন বেশ সুস্থ ছিলেন এবং আমার সঙ্গে পদব্রজে গিয়া একদিন গঙ্গাধর মহারাজকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আমার নিকট প্রায় বলিতেন, Working-Centreএ থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না, এখানে মন চঞ্চল হয়, কেবল মহাপুরুষ মহারাজের আদেশে রহিয়াছি। যদি তিনি অনুমতি করেন, তবে হরিদ্বার বা ঐরূপ কোন নিভৃত স্থানে গিয়া গঙ্গাতীরে পড়িয়া থাকি। তবে এখন একলা থাকিবার ক্ষমতা নাই। কেহ সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হয়, কারণ, জল তুলিয়া আনা প্রভৃতি কাজ

এক্ষণে আমার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বসিয়া বসিয়া রান্নাবান্না একরূপ করিয়া লইতে পারি।

"আমি আসিবার পরই তাঁহার একটী পুরাতন ট্রাঙ্ক আমার নিকট আনিয়া ও তাহার চাবি দিয়া বলিলেন, এটীর ভিতর ২ খানি গরম কাপড় আছে—আমি ইহা আর রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি না। তুমি ইহা লইয়া মঠাধ্যক্ষ মহাশয়কে পাঠাইয়া দাও তিনি যাহাকে দিবার হয় দিবেন। উহার ভিতর দেখিলাম, ২ খানি গরম কাপড় ছাড়া একটী ফ্লানেলের জামা আছে। আপনি বলেন ত ট্রাঙ্ক শুদ্ধ সুবিধামত যখন কেহ এখান হইতে যাইবে, তাহার সহিত পাঠাইতে পারি অথবা যদি লিখিয়া পাঠান, তবে যাহাকে দিতে বলিবেন, তাহাকে দিয়া দিতে পারি। অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে সত্বর যাহা হয় আদেশ করিবেন।

"প্রথমে ইঁহার সামান্য জ্বর হয়, এইরূপ কয়েকদিন চলে, তখন ভবানী বাবু চিকিৎসা করেন। ক্রমে অতিরিক্ত অর্থাৎ ১৫।২০ বার করিয়া দাস্ত হইতে থাকে। জ্বর বাড়িতেছে এবং একদম বিচ্ছেদ হইতেছে না দেখিয়া অমর বাবুকে দেখান হয় এবং তিনি Remittent type এর fever বলেন এবং তাঁহার চিকিৎসা হইতে থাকে। ক্রমে গত রবিবার একটু নিউমোনিয়ার ভাব দেখা দেয়। আমি ও কালিকানন্দ উভয়ে যাইয়া অমর বাবুকে পরদিন ডাকিয়া আনি। তাঁহাকে injection দেওয়া উচিৎ কি না পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া Broncho Pneumonia বলেন ও ঔষধেই উপকার হইবে বলেন। তিনি নিজের কাজ লইয়া সদা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহাকে খবর দিলেই তিনি বরাবর আসিয়াছেন ও যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়াছেন। ক্রমে শুকুল মহারাজ কাণে কম শুনিতে থাকেন, অনেক চীৎকার করিয়া বলিয়া ঔষধ পথ্যাদি খাওয়াইতে হইত। ছোটকানাই, প্রকাশ, সুরেন, কবালী প্রভৃতি অনেকেই সদাসর্ব্বদা থাকিয়া রাত্রি জাগিয়া প্রাণপণে সেবা করিয়াছে। শেষে দাস্ত বন্ধ হয় এবং ছানার জল, বেদানার রস, Horlick প্রভৃতি পথ্য চলে। গত পরশ্ব বৃহস্পতিবার হইতেই অতিরিক্ত prostration হয়। কাল প্রাতে অমরবাবু আসিয়া বলেন, অন্য সব

symptoms ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত prostration। তিনি Stimulant mixture দেন উহা ২।৩ দাগ খাওয়ান হইয়াছিল। তারপর বেলা ২টা ২॥•টা হইতে কথা বন্ধ হয়। ৪টা আন্দাজ হইতে ঘাম হইতে থাকে। ভবানীবাবু ও চৌধুরী আসিয়া শেষাবস্থা বলিয়া গেলেন। অমর বাবু যখন আসিলেন, তখন সকলে গঙ্গাধর মহারাজের আদেশে উচ্চৈঃস্বরে নাম শুনাইতেছেন।

যাহা হউক গঙ্গাধর মহারাজ আজ প্রাতে আবার আসিয়া মণিকর্ণিকা পর্য্যন্ত যান এবং এখনও আশ্রমে রহিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ও পরামর্শানুযায়ী শুকুল মহারাজের উদ্দেশে আগামী কোজাগরী পূর্ণিমার দিন একটী ভাণ্ডারা হইবার কথা হইতেছে।

শুকুল মহারাজ একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার অনেক দিন পূর্ব্বের একটী স্বপ্নের কথা বলেন—তাহাতে তিনি সমুদয় জগৎ আনন্দের উৎ রূপে অনুভব করিয়া পরে ঐ অবস্থার অবসানে নিজেকে মায়ের কোলে নৃত্যকারী শিশুরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, সমাধি যদি ঐরূপ কিছু অবস্থা হয়, তবে স্বপ্নে মাত্র উহা অনুভব করিয়াছি—জাগ্রতে কখনও অনুভব করি নাই। শুকুল মহারাজের প্রাণবায়ু শরীর ত্যাগ করিলে কিছুক্ষণ তথায় ভজন হয়। পরে অন্য স্থানে বসিয়া কালিকানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে সময়োপযোগী আত্মার অবিনাশিত্ব বিষয়ে উপনিষদাদি হইতে হইতে আলোচনা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শীপূজা

(আচার্য্য শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর লীলাপ্রসঙ্গ অবলম্বনে লিখিত)

(স্বামী অসিতানন্দ)

সার্দ্ধশত বর্ষ আগে একদিন বাংলার নিভৃত অঙ্গনে
সে অপূর্ব্ব প্রেমলীলা করেছিল নরদেব মিলি দেবী সনে
ইতিহাস জনশ্রুতি কিম্বা অতি অতীতের বিস্মৃত সময়
তুলনা করিতে নারে অভিনব বলি শুধু স্তব্ধ হয়ে রয়

কিন্তু ইহা হয়েছিল কামগন্ধহীন এই প্রেম উপাসনা
দুইটী কিশোর প্রাণ মহাযোগে মহাপ্রাণে হারাল আপনা॥
শান্তিপ্রদা পুণ্যগঙ্গাতীরে বিরাজিত মন্দির মায়ের
সুন্দরের প্রকাশে সুন্দর স্থান নাই সেখানে ভয়ের
ফুল সেথা ফুটে ফুটে সারা গন্ধ দিতে সদা আত্মহারা
বায়ু মৃদুমন্দ হয়ে বয় চিত্ত সেথা বিত্ত হতে ছাড়া
গান সেথা বাঁধিয়াছে বাসা সে যেন গো সব কর্ম্মনাশা
যেন কোন ধ্যানমগ্নলোকে টুটে গেছে যত কিছু আশা
সেইখানে সেই পুণ্যস্থানে তারিণীর মন্দির দুয়ারে
আবির্ভূত হয়েছে তারক জগতের পরিত্রাণ তরে
সঙ্গে তাঁর সর্ব্বশক্তিময়ী জননী যে করুণা মুরতি
হস্তে তাঁর বরাভয়ভরা দৃষ্টিপথে ঝরে পড়ে প্রীতি
তাঁরা যে গো মানুষের বেশে এসেছেন দুর্ব্বলের দেশে
দুর্ব্বলতা দিতে ঘুচাইয়া মুক্তিপথ দেখাতে নিমেষে॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে আজি অমানিশি-অন্ধকারে ঘিরিয়াছে দিশি
অন্ধকার অন্ধকার বুকে ঘনঘোরে গেছে যেন মিশি
গঙ্গানীর মন্দির কানন কিছু নাহি হেরিছে নয়ন
ঘনঘোর অন্ধকারে আজি মন যেন হেরিছে স্বপন
তারাদল হয়েছে উজ্জল বনমাঝে ডাকে শিবাকুল
পেচকের কর্কশ আহ্বান বৃক্ষে দোলে বাদুড় দোদুল
মন্দিরেতে শতদীপ জ্বলি অন্ধকারে করে পরিহাস
অন্ধকার নিস্ফল আক্রোশে বায়ুপথে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস
জননীর এল পূজাক্ষণ এই ঘন আঁধারে আলোকে
পুষ্পবাসে ধূপের দহনে ভরা তাই মন্দির পুলকে
মৃণ্ময়ীর মাঝারে চিন্ময়ী হেব চিত্ত নিখিলতারণ
অভয়ের মহাবার্ত্তা ঘোষে স্থির ধীর দুখানি নয়ন
মন্দিরের অঙ্গনের কোণে নিরালায় পুণ্য গেহ মাঝে
সুসজ্জিত পূজার সম্ভার থরে থরে দিকে দিকে রাজে

নাহি সেথা দেবীর প্রতিমা নাহি কোন ঘট মন্ত্রপূত
শুধু দুটী আলিম্পন পীঠে নরনারী নয়ন মুদ্রিত
তাঁরা দুয়ে ধ্যানপথ বাহি দূরে দূরে গেছে কত দূরে
মানবের চিন্তার সাহস নিরাকৃত করিবারে নারে
ধীরে ধীরে নরদেহে যেন ফিরে এলো চেতন মহিমা
আঁখি দুটী লভিল মেলন কণ্ঠ পেলে বাণীর ভঙ্গিমা
মন্ত্রপূত কুম্ভবারি দিয়া নারীদেহ অভিষেক করি
মধুকণ্ঠে কহিলেন নর নতমাথে হাত দুটী জুড়ি ॥—
"সর্ব্বশক্তি অধীশ্বরী বালা, হে জননি ত্রিপুরাসুন্দরি
সিদ্ধিদ্বার কর উন্মোচন এই দেহে কর আগমন
হে কল্যাণময়ি বিশ্বরূপা কর সর্ব্ব কল্যাণ সাধন ॥"
দেবী অঙ্গে মন্ত্রন্যাস করি পূজিলেন ষোড়শোপচারে
সমাধিস্থা মানবী শিবানী আত্মানন্দে লইলা তাঁহারে
সমাধিসাগরে ঢেউ উঠে মিলনের বাধা পড়ে খসে
আত্মানন্দে বিভোর দুজনা সম্মিলিত আত্মার হরষে ॥
কেটেগেল রজনীর দ্বিতীয় প্রহর হলো বাহ্য জ্ঞান
দেবতা যে জপমালা সাধনার ফল করে দিল দান
দেবীর চরণে পূর্ণযোগে আপনারে করি সমর্পণ
সাধনা করিয়া দিল শেষ ধীরে ধীরে ক'রে নিবেদন—
"অয়ি সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপা হে দেবি জননি
শরণ-দায়িনি ত্রিনয়নি শিববধূ অয়ি নারায়ণি
পাদপদ্মে প্রণাম তোমার বারম্বার কল্যাণরূপিনি ॥"
অপূর্ব্ব সে নারী পূজা হলো সমাপন গেল অন্ধকার
সহসা প্লাবিয়া দিল ধরণীর হিয়া আলো চন্দ্রিকার
বাজিয়া উঠিল বাঁশী মধুর স্বননে দিক পুলকিত
রামকৃষ্ণ সারদার অদ্ভুত মিলনে ধরা রোমাঞ্চিত
হে ভারত! চাহ যদি আপন কল্যাণ ছাড় নারীজ্ঞান
নারীপদে হের আজি ভগবান করে আত্মদান

নারীরে ভাবিতে হবে মাতা দিতে হবে তাঁহারে সম্মান
অন্য দৃষ্টি নিতে হবে ফিরে তবে তব আসিবে কল্যাণ
নাহলে উপায় নাহি আর অন্য চেষ্টা হইবে বিফল
মাতা ব'লে হেরিলে তাঁহারে আর নাহি রহিবে দুর্ব্বল
এই মহারহস্য গোপন প্রকাশিত ষোড়শী পূজায়
হের আর নাহিক রজনী আলো আসি ছেয়েছে ধরায়॥

কথা-প্রসঙ্গে

১। জীবন-সংগ্রাম (The Struggle for Existance)। প্রকৃতির নিয়মে প্রাণী-জগৎ তাহাদের পরিবেষ্টনীর অনুযায়ী যথাসাধ্য নিজেদের যোজিত করিয়া লইয়াছে। বহিঃ শত্রুর আক্রমণ, প্রাকৃতিক বিপৎপাত ও আবহাওয়া হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার উপযোগী দেহ ও আশ্রয়-নির্ম্মাণ-কৌশল তাহাদের আছে। অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণিগণও তাহাদের পরিবেষ্টনী এরূপ উপযোগী করিয়া লয় যে মনে হয় যেন কোনও সুদক্ষ কারিগর উহা কাটিয়া কুটিয়া গড়িয়া দিয়াছে। তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলিও যথাযোগ্য স্থানে অবস্থিত ও বর্দ্ধিত, যাহাতে জীবন যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে

* * * *

লোকের সাধারণ ধারণা যে, যথাযোগ্য ইন্দ্রিয় সম্পন্ন করিয়া জীব-সৃষ্টি, জগৎ কর্ত্তা জগতের আদিমকাল হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রাণী বিজ্ঞানের আলোচনার সহিত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন সংগ্রামের ফল স্বরূপ বর্ত্তমান প্রাণীসমূহের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং যাহারা এই জীবন-সংগ্রামে নিজেদের দেহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উহার অনুকূল করিয়া না লইতে পারিয়াছে তাহাদেরই এ জগৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে উধাও হইতে হইয়াছে। এই

লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন-সংগ্রামে অধিকাংশ জীবই কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট (Survival of the fittest), আর বাঁচিবার জন্য যে জীবের সম্ভবক্ত ভাব তাহা হইতে জাতি-সামান্য (Genus) এবং জাতি-বিশেষের (Species) সৃষ্টি হইয়াছে।

পৃথিবীতে যাহা ধরা উচিত তাহা অপেক্ষা জন্মায় অধিক। পৃথিবীতে জীবনী শক্তির প্রকাশ অধিক কিন্তু তদুপযোগী পর্য্যাপ্ত আহার, বাতাস ও বাস করিবার স্থান নাই। হাউয়ার্ড মুর (J. Howard Moore) তাঁহার Savage Survivals (বর্ব্বরতার অস্তিত্ব) নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে এক জোড়া চড়াই (House-sparrow), যদি তাহার একটী সন্তানও না মরে তাহা হইলে তাহারা কুড়ি বৎসরে সমস্ত ইণ্ডিয়ানা (State of Indiana) ছাইয়া ফেলিতে পারে। প্রতি ঋতুতে চিংড়ি মাছ (Lobster) ১০,০০০ হাজার করিয়া ডিম পাড়ে এবং ঝিণুক (Oyster) ২০,০০০,০০ লক্ষ করিয়া পাড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী-উঁইয়ের একটী গর্ত্তে বসিয়া ডিম পাড়া ছাড়া আর কোন কাজই থাকে না; সে প্রত্যহ ৮০,০০০ হাজার করিয়া ডিম পাড়ে এবং একজোড়া হাঘোরে পোকার (Gypsy moth) বংশ যদি নাশ না হয় তাহা হইলে ৮ বৎসরে তাহারা যুক্ত রাজ্যের (United States) সমস্ত গাছপালা খাইয়া ফেলিতে পারে। বান ও কুঁচে জাতীয় মাছ জীবনে একবার প্রসব করে, কিন্তু সেই একবারেই, বড় ছোট আকার অনুযায়ী, ৫ লক্ষ হইতে ২০,০০০০০ লক্ষ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। সমুদ্রে এক প্রকারের চ্যাপটা রকমের জীব আছে যাহাদের বংশ না নষ্ট হইলে অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র সিন্ধু জলেও তাহাদের সঙ্কুলান হইবে না। কড (Cod) মাছের প্রত্যেক ডিমটী হইতে যদি একটী করিয়া প্রাণী বাহির হয় তাহা হইলে একজোড়া কড তাহার সন্তানের দ্বারা ২৫ বৎসরে পৃথিবীর ন্যায়বৃহৎ স্তূপ সাজাইতে পারে।

* * *

ধরা বক্ষে অপর্য্যাপ্ত জীবনী শক্তির প্রকাশই জীবন-সংগ্রামের কারণ

এবং উহাই এই বিশাল পৃথিবীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। স্বর্গাদি লোকের কথা আমরা সঠিক অবগত নহি কিন্তু এই ভূলোকে জীবন ধারণ এক দুঃখপূর্ণ ভয়াবহ ব্যাপার। বিভিন্ন জাতি বিশেষ অসংখ্য বালুকণার ন্যায় জগত রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া বাঁচিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিতেছে। ভূলোকের প্রারম্ভ কাল হইতেই কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া এই হত্যা স্রোত প্রবাহিত।

* *

প্রাণীতত্ত্ববিদেরা মাত্র ১০,০০০,০০ লক্ষ জীবের সন্ধান ও নামকরন করিয়াছেন—বাঁকি জীব-জাতি মানবের নিকট অজ্ঞাত। এবং যাহা জানা গিয়াছে তাহা অপেক্ষা ২০ হইতে ১০০ গুণ অধিক জাতি বিশেষ (Specis) জীবন যুদ্ধে পরাভূত হইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে। যাহারা ধরায় এককালে বাঁচিয়াছিল, বিহার করিয়াছিল তাহাদের সমাধি আজ আমাদের পদক্ষেপের কঠিন মৃত্তিকা। ইহাদের কথা মানব জানেনা বা ভুলিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে ভূগর্ভে বা পর্ব্বত গাত্রে তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

শঙ্কর-দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(অধ্যাপক শ্রীমাধব দাস চক্রবর্ত্তী সাংখ্যতীর্থ, এম, এ)

শাস্ত্রের মর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত হইলে এবং ধর্ম্মজগতের প্রতি প্রণিধানসহকারে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, ধর্ম্ম ও সমাজশক্তিই আর্য্যজাতির প্রাণ ও বিরাট দেহ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই ইহার মেরুদণ্ড। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানে অচলাভক্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সমাজশক্তি অক্ষুন্ন থাকিলে প্রলয়কালের মরুদগণের সমবেত শক্তিও ইহাকে স্থান ভ্রষ্ট করিতে পারেনা। শাস্ত্রে আছে—

জ্ঞানের অগোচর নহে। আত্মা অহং জ্ঞানের আস্পদ বলিয়া নিতান্ত অবিষয় নহে। ফলিতার্থ এই যে অবিদ্যাকল্পিত অহং উপাধির বিলোপ সাধন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আত্মা অহং জ্ঞান পরিচ্ছেদ্য বা অহংজ্ঞানের বিষয়; সুতরাং তাহাতে দেহাদি বা দেহাদি ধর্ম্মের আরোপ যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ আত্মা প্রত্যক্ষও বটেন, কেননা—

জীবমাত্রেই আত্মাকে 'আমি' এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। অপিচ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ ব্যতীত অন্যত্র অধ্যাস হইবে না এমন নিয়ম নাই। আকাশ অরূপ প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাতে তল, মলিনতাদির আরোপ হইয়া থাকে। অধ্যাসের লক্ষণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে যাহাতে যাহার অধ্যাস তাহাতে তাহার গুণদোষ স্পৃষ্ট হয় না। সুতরাং আত্মাতে অনাত্মার বা অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও কেহই কাহারও গুণদোষে লিপ্ত হয় না। আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর অধ্যাস হইতেই প্রমাণ, প্রমেয়, লৌকিক, বৈদিকাদি ব্যবহার জ্ঞান জাত ও নির্বাহিত হইতেছে। এই অবিদ্যা অথবা আত্মানাত্মার অধ্যাস ব্যতীত ব্যবহারিক কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে আত্মা ও অনাত্মা পরস্পর পরস্পরে অধ্যাস হইয়াই এক বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করিতেছে। ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানিমনুষ্য ও অজ্ঞানী পশু উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়েই অধ্যাস পূর্ব্বক ব্যবহার করে। তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই শাস্ত্রের সীমা নির্দ্দিষ্ট বলিয়া উহারাও অধ্যাসের হাত হইতে নিস্তার পায় না। বাহ্যিক পুত্রকলত্রাদির ক্লেশাক্লেশ আপনাতে অধ্যস্ত করিয়া জীব আপনাকে ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট বলিয়া মনে করে। এই প্রকারে স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি দেহধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া সমুদায় ব্যবহার সিদ্ধি হয়। সকল অনর্থের মূলীভূত এই অবিদ্যার উচ্ছেদ ও অবিদ্যানাশক একাত্মবিজ্ঞান উৎপাদনের নিমিত্ত বেদান্তবিচার আবশ্যক। এই অধ্যাসই শঙ্কর দর্শনের মূল ভিত্তি, ইহা স্থাপিত না হইলে শঙ্করের মতবাদস্থাপিত হইতে পারেনা।

স্বকৃত ভূমিকায় অধ্যাসের এই সুদৃঢ় ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শঙ্কর যে মতবাদের স্থাপন করিয়াছেন তাহার নিষ্কর্ষ এই—

জীবসকল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিকও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই শান্তিবারির অনুসন্ধানে ব্যগ্র থাকে; কিন্তু দুঃখের পরপারগমনের প্রকৃষ্ট পন্থা অবগত না হইয়া, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত স্রক্, চন্দনবণিতাদি পার্থিব পদার্থই আনন্দদায়ক মনে করিয়া উহারই আস্বাদনে রত হয়। ফলে দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ত দূরের কথা অধিকতর দুঃখেরই কবলে পতিত হইতে হয়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার অসন্দিগ্ধজ্ঞানই ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। শাস্ত্রে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার ত্রিবিধমার্গ কথিত হইয়াছে,—

"শ্রোতব্যং শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যং চোপপত্তিভিঃ।
মত্বাচ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শন হেতবঃ॥"

গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ, মনোমধ্যে বিচার করিয়া তাহার যথার্থ্য নির্ণয় তৎপর ধারণাকৃত পদার্থের অনবরত চিন্তন, এই ত্রিবিধ উপায়ই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সহায়। ইহারাই ক্রমে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন নামে আখ্যাত। এখন আপত্তি হইতে পারে যে এ নিয়ম ত সর্ব্বত্র দেখা যায় না। অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন করে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যও শ্রবণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে দেখা যায় না পক্ষান্তরে বামদেব, শুক, কপিল প্রভৃতি ঋষি জন্ম হইতেই তত্ত্বজ্ঞানী। ইহার উত্তরে আচার্য্য বলেন যে এখানেও প্রোক্ত নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়না। প্রাগভবীয় দুরিত ও চিত্তের মালিন্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-ফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। তাহাতে কথিত নিয়মের অভাব ঘটেনা প্রতিবন্ধকের ক্ষয় হইলেই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। বামদেবাদি ঋষিগণের সম্বন্ধেও এই একই কারণ সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাক্তন শ্রবণ এজন্মে প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সুতরাং ইহজন্মে আর তাঁহাদিগের শ্রবণ মননাদির আবশ্যক হয় নাই।

স্বীয় ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হাওয়ার নামই তত্ত্বজ্ঞান। মরু-মরীচিকায় সলিলভ্রান্তিরন্যায় ব্রহ্মে দৃশ্য ভ্রান্তি হইয়া থাকে। ভূত-প্রপঞ্চ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। অহংজ্ঞান ও তদালম্বনদেহাদি,

সকলই অবিদ্যাপ্রসূত,—ইহারা সকলেই ব্রহ্মো-রজ্জু-সর্পের ন্যায় আরোপিত আত্মচৈতন্য অহমাকার মানসবৃত্তিতে আমি রূপে প্রতিফলিত হয়। এই অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তাহা তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্বিধ জ্ঞানের উদয়েই মোক্ষ হয়। এই মোক্ষ জীবত্বনাশ, জীবন্মুক্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তুরীয়প্রাপ্তি প্রভৃতি নানারূপে কথিত হয়। একই চৈতন্য সর্ব্বত্র অনুস্যূত। সেই অখণ্ড চৈতন্যই অনন্ত উপাধি ভেদে অনন্ত প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে. উপাধি অন্তর্হিত হইলেই বহুত্বভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়। মায়োপাহিত ব্রহ্ম উপাধিসংযোগে অহংরূপ দ্বয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে কথিত হইয়া থাকে। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য সমূহ মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে ভ্রান্তি জন্য অহংজ্ঞান দূরীভূত হইয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অন্তঃ ও বহিঃ উভয়বিধ প্রপঞ্চই অজ্ঞানের বিলাস। দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকে কথিত হইয়াছে:—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নামচেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্॥"

প্রপঞ্চজগত পাঁচরূপে আমাদের নয়ন সম্মুখে উপস্থিত হয়, যথা—(১) অস্তি অর্থাৎ আছে; (২) ভাতি অর্থাৎ প্রকাশপায়, (৩) প্রিয় অর্থাৎ আনন্দজনক, (৪) রূপ অর্থাৎ প্রকারাদি বিশিষ্ট; এবং (৫) নাম অর্থাৎ বিশিষ্ট বস্তু। কথিত পঞ্চরূপের প্রথম তিনটী ব্রহ্মের রূপ ও পরবর্ত্তী দুইটী অজ্ঞান বিকার জগতের রূপ। এই নাম ও রূপই মায়া এবং অস্তিভাতিপ্রিয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ইহাই সংক্ষেপে শঙ্কর মতের নিষ্কর্ষ। এবং তাহা "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই শ্লোকাদি দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে। সত্য সত্যই শঙ্করের বেদান্ত মতের আলোচনা করিলে আমরা এই তিনটী তথ্য অবগত হই। ইহা অপেক্ষা চতুর্থমত বেদান্তে স্থান নাই। (১) ব্রহ্মই একমাত্র শাশ্বত পদার্থ। (২) ভূত-প্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মে অধ্যাস্ত। (৩) জীব ব্রহ্মেরই স্বরূপ।

ধর্ম্মোপদেশকরূপে শঙ্করের স্থান আমরা পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়াছি,

সুতরাং এস্থলে আর তাহার পুনরুক্তি করিবনা। বুদ্ধদেব জ্ঞানমার্গের উপদেশ দিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম কলাপ একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভট্ট কুমারিল সেই কর্ম্মকাণ্ড পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা (?) করিয়াছিলেন কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞান যে ভক্তি ও কর্ম্ম সাপেক্ষ ইহা সপ্রমাণ করিয়া মার্গগত ধর্ম্ম বিদ্রোহ সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত করিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ও ভগবান বুদ্ধ উভয়েই জ্ঞানমার্গবাদী বলিয়া বাস্তবতন্ত্রবাদী দার্শনিকগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পদ্ম পুরাণেও কথিত হইয়াছে :—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবচ।
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
বেদার্থমতহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্ ইত্যাদি।

এ সকল বাক্য শুধু সম্প্রদায় বিরোধ সূচিত করে, ইহার মূলে কোনও সত্য নাই। শঙ্করাচার্য্য ও বুদ্ধের জ্ঞান-বাদের পার্থক্য ও উৎকর্ষাপকর্ষ আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

শঙ্করের মতবাদ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক মত সমূহের সহিত এরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত যে শঙ্করকে বুঝিতে হইলে ভারতের সমগ্র দর্শন মতবাদ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে আমরা সম্প্রতি এইস্থানেই ইহার উপসংহার করিলাম।

স্বামী প্রেমানন্দ

(স্বামী চণ্ডেশ্বরানন্দ)

পার্ব্বতী একদিন গিরিরাজকে বলিয়াছিলেন—"বাবা, তুমি সাধুসঙ্গ কর।" সাধারণতঃ আমরা বুঝি যিনি ঈশ্বরভক্ত, পবিত্রাত্মা ও কামকাঞ্চনত্যাগী তিনিই সাধু, তা তিনি গৃহেই থাকুন বা অরণ্যেই থাকুন— তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। পাহাড় পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন কোন সৌভাগ্যবান পথিক হঠাৎ যেরূপ কখন কখন মণিরত্ন প্রাপ্ত

হয়, তদ্রূপ এই সংসারারণ্যে অসংখ্য উপলখণ্ডের মধ্যে কোথাও দুই একটী বহুমূল্য রত্ন আবর্জ্জনার মধ্যে বা অন্ধকার গহ্বরে ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে, যে জহুরি সে উহা বাছিয়া লইয়া রাজরাজেশ্বর হইয়া যায়। সকলদেশেই সাধুরত্নের বিশেষ সমাদর। নরপতির রত্নময় কিরীট সাধুর চরণে অবলুণ্ঠিত হয়, দিগ্বিজয়ীর অসি সাধুর নিকট পরাভব স্বীকার করে, পরপীড়কের অত্যাচার, দাম্ভিকের দম্ভ, কাঞ্চনের মায়া ও কামিনীর কটাক্ষ সকলই সাধুব্যক্তির নিকট মন্ত্রপূত সর্পের ন্যায় হীনবল হইয়া যায়। কিন্তু কেন? জিজ্ঞাসা করি, এই সংসারচক্র, ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যপথে কি একটী সাধুর জন্য আটকাইয়া পড়ে? যদি তাহা না হয় তবে অনাবশ্যক এতটা করিবার প্রয়োজনীয়তা কি? বাস্তবিক, আধুনিক যুগে যখন মানুষ লাভ লোকসান না খতাইয়া এক পাও অগ্রসর হয় না, স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতাকেও অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, তখন একটী পরের ছেলের সে এতটা আনুগত্য স্বীকার করিবে কেন? মানুষ যখন নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়া তাহার যাহা কিছু আবশ্যক তৎসমস্তই স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া লয়, নিজবুদ্ধিবলে যখন সে বিদ্যুৎকে কিঙ্করী করিয়া আকাশে উড্ডীন হয়, জলমধ্যে বিচরণ করে, তিনমাসের পথ একদিনে গমন এবং পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সংবাদ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অবগত হয়, অরিকুলধ্বংসের নিমিত্ত বিজ্ঞানই যখন তাহার প্রধান সহায়, এই সমস্ত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যখন তাহার ভগবান নামক কোনও বস্তুরই আবশ্যক হয় না, তখন সে তাহার চক্ষে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট এক ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতে যাইবে কেন? যখন মানুষ মদনের রথে চড়িয়া দূরে সুদূরে উড়িয়া যায়, প্রিয়ার হাসি, চাঁদের কিরণ ও মলয় বাতাস যখন তাহার প্রাণে স্বর্গের অমৃত ধারা বর্ষণ করে তখন যদি কোন ব্যক্তি "বাপু, এসব মিথ্যা, মায়া দুঃখজনক" ইত্যাদি বলিয়া তাহার শ্রুতি-বিবরে অহরহঃ ঘ্যান ঘ্যান্ করিতে থাকে তখন কাহারই বা উহা সহ্য হয়? কিন্তু, যখন কালের ভ্রূকুটি কুটিলে মদনের রথ বিকল হয়, হাসি থামে, চাঁদ নেভে ও বাতাস বন্ধ হয় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অপরের অনিষ্টের

সহিত নিজেরও সর্ব্বনাশ টানিয়া আনে, যখন শত্রু গর্জ্জন করে, বন্ধু উপহাসের হাসি হাসিয়া সরিয়া পড়ে ও প্রবল ঝড়ে অকূলপাথারে জীবন-তরী ডুবু ডুবু হয়, যখন মানব জাগতিক সমস্তই নশ্বর বুঝিতে পারিয়া অবিনশ্বরকে ধরিতে যায়, কিন্তু প্রতিপদে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন বাহির হইতে কাহারও সাহায্যের আশায় সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং তখনই সাধুর দেহ-যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কোন অশরীরী-বাণী তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলে :—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
* * *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥"

এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া মৃতব্যক্তির হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চার হয়। তখন সে মৃত্যুর আবর্ত্ত মধ্যে ভাসমান, সেই তরণীকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতে থাকে—"ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি"—তুমিই আমাদিগের পিতা, আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিতেছ। শ্রীভগবানের যেরূপ সকলেই আপনার—ভগবদ্ভক্ত সাধু, মহাপুরুষগণেরও তদ্রূপ জগতের যাবতীয় নরনারী এমন কি পশুপক্ষী পর্য্যন্ত আপনার হইতেও আপনার। সেই জনই ঈশ্বর প্রেমিক যিশুখৃষ্ট অন্যের হিতার্থে স্বীয় জীবন বলিদান এবং বুদ্ধদেব সামান্য ছাগশিশুর জন্য স্বীয় মস্তক যূপকাষ্ঠে অর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সংসারারণ্যে পথিক যখন পথ হারাইয়া ফেলে সাধু তখন তাহার পথ নির্দ্দেশ করেন, পঙ্গু জীবন-যাত্রীকে কখন কখন তিনি স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যান, তাহা ছাড়া নিরাশ ব্যক্তিকে আশা- শোকাতুরকে সান্ত্বনা এবং সর্ব্বজনঘৃণ্যকে আলিঙ্গন দান ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম; "বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ" ইহাই সাধুর ধর্ম্ম। এইরূপ

ব্যক্তি যে কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন সেই দেশ তাঁহাকে 'আমার' বলিয়া নিজস্ব করিতে পারে না। কারণ,—

"আমার আত্মা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার পর।
বিশ্বভুবন আমারে মাগিলে
কোথায় আমার ঘর॥"

সুতরাং তিনি সকলের—তিনি সার্ব্বজনীন। এইরূপ একজন সাধু মহাপুরুষের কথা আমরা সভয়ে বলিতে অগ্রসর হইতেছি। সভয়ে? কেন না, শ্রীভগবানের মহিমা যেমন কিছুই বর্ণনা করিতে পারা যায় না, যতই বল ততই যেরূপ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বরং সময় সময় শিব গড়িতে বসিয়া নির্ম্মাতার অসামর্থ্যবশতঃ যেরূপ উহা বানর হইয়া পড়ে মহাপুরুষ জীবনী সম্বন্ধেও কিছু বলিতে যাওয়া তদ্রূপ বিপজ্জনক। সুতরাং বর্ণনীয় চরিত্রে যদি পাঠক মহত্ত্ব মাধুর্য্য, প্রেম ও করুণা প্রভৃতির নিদর্শন কিছুই না পান বা স্বল্পই পান তবে জানিবেন উহা লেখকেরই অক্ষমতা প্রযুক্ত; প্রবন্ধের নায়ক কিন্তু নিরুপম, চির-সুন্দর, গগনোপম উদার এবং সাগরোপম গভীর।

আঁটপুর, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম। বাংলার পল্লী যেরূপ হইয়া থাকে উহাও তদ্রূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হরিৎ ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয়, পল্লী মধ্যে সুগঠিত জীর্ণ দেবমন্দির, মৃত্তিকা নির্ম্মিত অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আবাসসমূহ এবং বিরল দুই একটী অট্টালিকা। গ্রামবাসিগণ ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সরল, সহানুভূতিসম্পন্ন ও ধর্ম্মভীরু। এই গ্রামে ধর্ম্মাত্মা ৺তারা প্রসাদ ঘোষ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার ঔরসে এবং পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দাসীর গর্ভে যথাক্রমে তুলসীরাম, বাবুরাম, শান্তিরাম নামক তিনটী পুত্র এবং কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবুরামই আমাদের স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ছিলেন।

তাঁহার সুগৌর অঙ্গকান্তি, আয়ত নয়নযুগল, আরক্তিম গণ্ডদেশ, সরলতাপূর্ণ মুখমণ্ডল এবং সর্ব্বোপরি হৃদয়গ্রাহী মধুর ব্যবহার তাঁহাকে সকলেরই প্রিয় করিয়াছিল। পল্লী বালকবালিকাগণের মধ্যে, পুণ্যভূমি আঁটপুরের ধূলি-ধূসরিত শ্যামল অঙ্কেই বাবুরামের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালাতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু, কৈশোরের প্রথমে তিনি কলিকাতানগরীতে আগমন করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, "কথামৃতের" প্রসিদ্ধ মাষ্টার মহাশয় তখন ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি প্রায় প্রতি শনি রবিবারেই তৎকালে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। দেখা যায়, ভক্তগণের স্বভাব অনেকটা গাঁজাখোরের মত গাঁজাখোর যেরূপ গাঁজায় টান দিয়াই উহা অন্য একব্যক্তিকে অর্পণ করে, না করিলে যেরূপ সে পরিতৃপ্তই হয় না, ভক্তগণও তদ্রূপ ভগবৎ সুধা পান করতঃ অপরেও যাহাতে উহার আস্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হয় তজ্জন্য যাহাকে সম্মুখে পান তাহাকেই ছলে বলে ও কৌশলে টানিয়া আনেন এবং তাহার সহিত ঐ সুধা পান করিয়া আনন্দিত হন। ঐরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট মাষ্টার মহাশয় বিদ্যালয়ে বালকগণের মধ্যে যাহাদিগকে উত্তম শুভসংস্কারসম্পন্ন বলিয়া মনে হইত তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিয়া অবসর মত দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। বালক বাবুরামও এইরূপে পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের নিকটেই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় জানিতে পারেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বা পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজও ঐ বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। অনেক সময়েই ইহা দেখা যায় কোন এক অজ্ঞেয় পূর্ব্ব সূত্রানুসারে ভবিষ্যতে যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হইবে, যাহার সহিত জীবনের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, বহুল পরিমাণে বিজড়িত থাকিবে, প্রথম সাক্ষাত হইতেই তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যেন একটা অত্যন্ত 'আপনার' ভাবের উদয় হয়। এক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটী বালক প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং অচিরেই উভয়েরমধ্যে বেশ সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

যতই দিন যাইতে লাগিল ততই উহা ক্রমে ঘনিষ্ঠ ও গভীরতর হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত রাখাল ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া অবসরমত তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছিলেন। এক দিবস তিনি তাঁহার কথা বলিয়া বন্ধুকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত বাবুরাম পরমহংস দেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত উন্মাদ পুরুষ, কটিতটে বসন কখন আছে মাত্র কখনও বা সম্পূর্ণ দিগম্বর মূর্ত্তি, বদনে মধুর হাস্যছটা, কথা বলিলে যে চতুর্দ্দিকে মধুবর্ষণ হয়, 'মা 'মা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব স্থির হইয়া কি একরূপ হইয়া যাইতেছেন, পূর্ব্বে না দেখিলেও মনে হইতেছে ইনি যেন কত পরিচিত, আপনার হইতেও আপনার, কতদিনের কত মধুর সম্বন্ধ যেন ইহার সহিত বিজড়িত। শুদ্ধ তাঁহার নহে, আমরা শুনিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন কালে অনেকেরই ঐরূপ মনে হইয়াছে তিনি যেন আপনার হইতেও আপনার এবং বিগত বহু জন্ম হইতে ইহাঁর সহিত তাঁহারা যেন কোন অবিচ্ছেদ্য প্রেম সূত্রে আবদ্ধ। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুর বালকদ্বয়কে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া নবাগত বালককে পুনরায় আসিতে বলিলেন, বালক বাবুরাম সমস্ত পথ এই অদ্ভুত পাগল পূজকের কথাই ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কয়েক দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার অনুভব হইল যেন ভিতর হইতে কে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং বালক শীঘ্রই অন্য এক দিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রাণী রাসমণীর উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবুরামের অসামান্য রূপগুণশালিনী ভগ্নী শ্রীমতী কৃষ্ণ-ভাবিনীর সহিত কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীযুক্ত বলরাম বাবু প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও অত্যন্ত সংসার-বিরাগী ছিলেন এবং বৈষয়িক কর্ম্ম সমূহ অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া দিবা রজনীর অধিকাংশ সময় পূজা, জপ, ধ্যান ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। তিনিও পরমহংসদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং কথিত আছে প্রথম দর্শন কালেই পরমহংসদেব তাঁহাকে স্বীয়

পার্শ্বদ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বলরাম বাবু প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের চরণ বন্দনা করিতেন এবং তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত আনন্দ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। তিনিও পূর্ব্বোক্ত গাঁজাখোরের স্বভাববিশিষ্ট থাকায় তাঁহার বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সহিত নিজ শ্বশ্রূমাতাকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয় পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবুরামের ভক্তিমতী জননীও তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দিতা হন এবং অচিরেই তাঁহার কৃপা পাত্রী হইয়া উঠেন। সুতরাং বালক বাবুরামের দক্ষিণেশ্বর গমনাগমনের পথ নিষ্কণ্টক হইল এবং এখন হইতে বালক ইচ্ছামত তথায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই বালক তাঁহারই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত, "ঈশ্বর-কোটী"-দিগের অন্যতম এবং তাঁহারই বিশেষ কর্ম্মের সহায়তার জন্য নরশরীর ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে 'ঈশ্বর-কোটী' কাহাকে বলা যায় তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। ঈশ্বরানুগ্রহে এবং স্বীয় অন্তরের তীব্র বিবেক, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা সহায়ে যে সমস্ত সাধক একেকালে বাসনা নির্মুক্ত হইয়া মায়া রাজ্যের পরপারে গমন করতঃ দর্শন করিতেন যে, আব্রহ্মস্তম্ব একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের নানারূপে অভিব্যক্তি মাত্র, স্বরূপতঃ তাহাদিগের কোন ভেদ নাই এবং ঐ বস্তু হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া তাঁহারা স্বয়ং নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব বিশিষ্ট, তাঁহাদিগের কোনরূপ বন্ধন নাই বা কখন ছিল না, বৈদিক যুগে এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষগণ 'ঋষি' নামে অভিহিত হইতেন। আবার ঐ সমস্ত ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ শক্তির অধিকারী তাঁহাদিগকে 'অধিকারি-পুরুষ' বলা হইত। পরবর্ত্তী যুগে সাংখ্যাচার্য্যগণ এই 'অধিকারি-পুরুষ' সকলকে 'প্রকৃতি-লীন' আখ্যা প্রদান করিয়া শক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' বা অবতার এবং 'ঈশ্বর-কোটী'। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'অবতার' ও 'ঈশ্বর কোটী'

পুরুষগণের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রসঙ্গে তাঁহার সরল ও সহজ গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন, "ঈশ্বর কোটীর আলাদা কথা—যেমন অনুলোম বিলোম। 'নেতি' 'নেতি' করে ছাদে পৌঁছে যখন দেখে ছাদও যে জিনিষে তৈরী ইট, চূন, সুরকি, সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈরী। তখন কখন ছাদে থাকতে পারে আবার উঠা নামাও করতে পারে।" অর্থাৎ সদসৎ বিচার সহায়ে ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি পূর্ব্বক দ্বন্দ্বাতীত হইয়া তাঁহারা দর্শন করেন যে ভালমন্দ উপায়-উদ্দেশ্য সবই তিনি। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহারা কখন সংসারে এবং কখন বা সমাধি যোগে পরব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অবস্থান করেন।

যাহা হউক পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বর গমনাগমনের ফলে শ্রীযুক্ত বাবুরাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রিয় হইতে প্রিয়তর এবং আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয়রূপে অনুভব করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে চিরতরে আত্মবিক্রয় করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থির জানিতেন এই বালক 'হোমা পাখীর' জাত, সংসারে কখন পতিত হইবে না। একটু চক্ষু ফুটিলেইচোঁ চাঁ মায়ের দিকে ছুটিবে। সুতরাং প্রথম হইতেই তিনি তাঁহাকে সেইভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 'যেনতেন প্রকারেন' জগজ্জননীর কৃপালাভ করিয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন করাই যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাতেই যে একমাত্র সুখ, শান্তি ও আনন্দ এবং সংসারে মানব যে মায়াজালে বদ্ধ হইয়া বারংবার জন্ম মৃত্যু ভোগ করতঃ অশেষ দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকে—ইত্যাদি বলিয়া তিনি বালকের নির্ম্মল মনে বিষয়বিতৃষ্ণা জাগাইয়া দিতেন। একদিন পরমহংসদেব শ্রীযুক্ত বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর বই কই? পড়াশুনা কর্‌বি না? বুঝি, দুদিক রাখতে চাস্?" বালক সহাস্যে উত্তর দিলেন—"আমি জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যেতে চাই।" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন "ওরে দুদিক রাখবি তা কি হয়? তা যদি চাস তবে চলে আয়।"

শ্রীযুক্ত বাবুরাম। আপনি নিয়ে আসুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তুই দুর্ব্বল,

তোর সাহস কম।” কিন্তু তিরস্কার করিলে কি হইবে? শরণাগত ভক্তের জন্য চিরকালই ভগবানের মাথা ব্যথা পড়িয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। ভক্ত বালক ‘আপনি নিয়ে আসুন’ বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন এবং ভগবানও ঐ ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ পূর্ব্বক উহার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিবস সুযোগ বুঝিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকের জননীকে বলিলেন “এই ছেলেটী তুমি আমাকে দাও।” পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীযুক্ত বাবুরামের পুণ্যবতী গর্ভধারিণী পরমহংসদেবকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার এই অসম্ভব প্রার্থনায় কিছু মাত্র দুঃখিতা না হইয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতমনে বলিয়াছিলেন “বাবা, আপানার কাছে বাবুরাম থাকবে ইহা ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা।” এই ঘটনার পর শ্রীযুক্ত বাবুরাম মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—‘ও আমার দরদি’ এই বলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতেন—

মনের কথা কই বো কি সই কহিতে মানা, দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না

মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা,

সে দু এক জনা; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে

কচ্চে রসের বেচাকেনা, (ভাবের মানুষ)

মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা

ও সে কয় না গো কথা, ভাবের মানুষ উজান পথে

করে আনা গোনা (মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা)।”

শ্রীযুক্ত বাবুরাম আকুমার অটুট ব্রহ্মচারী ছিলেন। পবিত্রতা সম্বন্ধে পরমহংসদেব তাঁহার উপর অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া বলিতেন “ওর হাড় পর্য্যন্ত শুদ্ধ’।

(ক্রমশঃ

মুক্তি ও কর্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(উদাসী)

ভবিষ্যতে অশুভ শক্তিক্ষয় প্রাণহিংসা ও আপনার সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া যাহা আরম্ভ করা যায় তাহা তামস কর্ম্ম। উক্ত উভয়বিধ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ সেই জন্য কর্ম্মযোগী সাত্ত্বিক কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গীতায় কর্ম্মীর তিন রকম ভেদ দেখান হইয়াছে—

মুক্ত সঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ১৮।২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু র্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৮।২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে। ১৮।২৮

যিনি কার্য্যের ফলে অনাসক্ত অহঙ্কারশূন্য ধৈর্য্য ও উৎসাহ সমন্বিত, সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে। যিনি অনুরাগবশতঃ কামনাশীল লোভী পরপীড়ক অশুচী (কার্য্যসিদ্ধিতে) আনন্দিত, ও (কার্য্যের অসিদ্ধিতে) দুঃখিত তিনি রাজস কর্ত্তা। যিনি (কোন কার্য্যে) মনোযোগী নন, প্রকৃতির অধীনে (মনে যাহা উঠে তাহা বিচার না করিয়া করেন) সদুপদেশেও নত হন না, পরবৃত্তি ছেদনকারী অলস শোকান্বিত, ও দীর্ঘসূত্রী তিনি তামস কর্ম্মী। একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্মীই মুক্তিলাভ করিবার যোগ্য, অপর সকলের সত্ত্বগুণ উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

কর্ম্ম করিতে হইলে তাহার একজন কর্ত্তা থাকার প্রয়োজন। কিন্তু কর্ত্তা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন না হইলে কার্য্যে ফললাভ করিতে

পারেন না। সেইজন্য দৃঢ় প্রবৃত্তি থাকার আবশ্যক। কর্ম্মে ইচ্ছা আছে অথচ প্রকৃত করণের অভাবে হয়ত আশানুযায়ী ফললাভ হয় না। সে জন্য যোগ্য করণও থাকা প্রয়োজন। কর্ত্তা উৎসাহী, যোগ্য করণেরও সমাধান হইল কিন্তু দৈব সহায় না থাকিলে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। সুতরাং দৈবের সহায়তাও কার্য্য সিদ্ধির জন্য একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ। [এ ক্ষেত্রে বলিয়া রাখি যে পূর্ব্বজন্মে যাহা করা যায় পরজন্মে তাহা সেইরূপ ধারণ করে] এই সমস্তগুলির যদি একত্রে সমাবেশ হয় তাহা হইলে কার্য্যটী সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি কি? নিষ্কাম কর্ম্মের প্ররোচক ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান। অর্থাৎ প্রথম কোন কর্ম্মকে মুক্তির পক্ষে সহায়ক জানিয়া তাহা করিবার যে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়—সদ্‌গুরুর আদেশ বলিয়া কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি, তৃতীয়—নিজের মন। এই শেষোক্ত কারণ অনুসারে সাধারণ লোকের পক্ষে কার্য্য করা অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল। কেবল মাত্র জীবন্মুক্ত বা যাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাঁহারাই স্ব স্ব মনে যাহা উঠে তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে পারেন।

কর্ম্ম নানাভাবে করা যাইতে পারে। কেহ বা জ্ঞানভাবে কেহ বা ভক্তিভাবে আবার কেহবা সর্ব্বদাই নিজ স্বার্থকে বলি দিতে হইবে—যাহা কিছু করিব নিজের স্বার্থসুখের জন্য করিব না,—এই ভাব অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে পারেন। জ্ঞানী দেখেন যে জগতের যাহা কিছু হইতেছে সবই সেই পরমেশ্বরের মহাশক্তি প্রকৃতির লীলা মাত্র। পুরুষ বা আত্মা কেবল সাক্ষী ও নির্ব্বিকার। তাঁহার সান্নিধ্য বা অধিষ্ঠানবশতঃ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-বিচিত্র-লীলাময়ী-প্রকৃতি ক্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন, কাহাকেও মোহসাগরে নিমগ্ন করিতেছেন আবার কাহাকেও বা স্বীয় মায়াজাল হইতে মুক্তি দিতেছেন। যেমন বিশ্বব্যাপারে তিনি এই ভাবটী অনুভব করেন তেমনি নিজের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক এই ভাবটী রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

তিনি দেখেন তিনি যাহা করিতেছেন সবই তাঁহার প্রকৃতি করিতেছে, আত্মা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত। আকাশ যেমন ধূলি প্রভৃতির দ্বারা কিছুতেই মলিন হয় না, পদ্মপত্র যেমন জলের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হয় না, আত্মা সেইরূপ 'এই প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ বিকৃত হন না— কর্ম্মী এই ভাবটী অবলম্বন করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন। গীতায়ও ভগবান বলিতেছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ৩।২৮

প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কর্ম্মের মূল। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে, আমিই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি। হে মহাবাহো! গুণ কর্ম্ম বিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ গুণরাশি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা রূপরসাদি কার্য্য সাধন করিয়া থাকে এবং আত্মা নিঃসঙ্গ এইরূপ জানিয়া তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়েন।

ভক্ত প্রেমের উপাসক। তিনি জগতের সৌন্দর্য্যে সেই বিশ্বপতির ছায়া দেখিয়া থাকেন। জগতকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং প্রত্যেক জীব সেই সর্ব্বমঙ্গলময় অশেষ কারুণিক প্রেমময় ভগবানের অংশ। অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেমন নির্গত হয় তাঁহা হইতে সেইরূপ সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি দেখেন যে তাঁহার প্রেমময় এই জীবজগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। তিনি যাহা কিছু করেন সবই সেই প্রেমময়ের উদ্দেশ্যেই সমর্পণ করেন। "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" যাহা কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা পূরণ কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর তাহা আমাতেই অর্পণ কর, গীতার এই বাণী তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের প্রত্যেক চিন্তার নিয়ামক। এইরূপ করিতে করিতে 'মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্' শেষে সেই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মী এই ভাব অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলেও

স্বীয় অভীষ্টলাভে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত আরও একটী পন্থা আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায়। ইহাতে ভগবান বা ব্রহ্ম কিছুই স্বীকার করিতে হইবে না—কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে যাহা কিছু করা হইতেছে তাহা কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে কি না? এইরূপ স্বার্থ বলি দিতে দিতে আমরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব। তবে এক্ষেত্রে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, আচ্ছা, নিষ্কাম কর্ম্মে যে মোক্ষলাভ হইতে পারে—তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায় যে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, কারণ আমরা যাহা কিছু কর্ম্ম করিয়া থাকি তাহা অজ্ঞানতাবশতঃই করি; আমাদের স্বরূপের জ্ঞান না থাকায় যাবতীয় ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে—স্বরূপের জ্ঞান হইলেই সমস্ত ভেদ-জ্ঞানের নাশ হইয়া যায়। তখন এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভূতি হয়—ও আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা, ইত্যাকার বুদ্ধি যাহা অপরোক্ষ জ্ঞানের পূর্ব্বে হইতেছিল তাহার তখন নাশ হয়। শাস্ত্রও বলিতেছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যঃ ইহ নানেব পশ্যতি ইত্যাদি।

তারপর কর্ম্ম করিতে যাইলেই, আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা, এই প্রকার বুদ্ধি ও কর্ম্ম করিবার জন্য নানাপ্রকার সংকারী কারণ থাকার প্রয়োজন এদিকে জ্ঞানে অকর্ত্তা অভোক্তা, প্রভৃতি বুদ্ধির অনুশীলন ও সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতভাব, তাহার নাশ করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। অতএব কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিরোধ বেশ দেখা যাইতেছে। কর্ম্মের স্বভাবই যে সে দ্বৈত ছাড়া থাকিতে পারে না। এদিকে দ্বৈতের লোপ না করিতে পারিলে মোক্ষ হইবে না। তাহা হইলে কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে মোক্ষ হইবে? আরও দেখ, অবিদ্যার নাশ হয় বিদ্যার দ্বারা। রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির নাশ হয় কখন?—যখন রজ্জুর জ্ঞান হয় অর্থাৎ ভ্রমের অধিষ্ঠানের জ্ঞান

হইলেই ভ্রম লয় পায়। সেইরূপ এই যে আমরা আমাদের স্বরূপের জ্ঞান না থাকায় অর্থাৎ আমি দেহ, আমি মন প্রভৃতিরূপ অজ্ঞান থাকায় ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকি এবং যখন স্বরূপের জ্ঞান হয় অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান হয় তখন আমার সমস্ত অজ্ঞানে বিলীন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আপন প্রভায় আপনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন ফট্‌কিরি জলে পড়িলে জলের মলিনতা দূর করে ও নিজেও গলিয়া যায়, সেইরূপ এই ব্রহ্মাকারাবৃত্তি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ 'অন্তঃকরণের বৃত্তি অবিদ্যাকে নাশ করিয়া আপনিও লয় পায়। কিন্তু কর্ম্ম যাহা অবিদ্যাপ্রসূত ও ভেদজ্ঞান মূলক সে কিরূপে ভেদজ্ঞান নিরাশ করিয়া অভেদজ্ঞান উৎপাদন করিবে? শ্রুতিও বলিতেছেন "ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মনা ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" পুনরায় তুমি বলিবে যে,জ্ঞান-কর্ম্ম উভয়ে এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইলেই মোক্ষ হয়। কেবল মাত্র কর্ম্মের দ্বারাই মোক্ষলাভ না হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানের সহিত একত্রে মোক্ষের কারণরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। শ্রুতিও বলিতেছেন "অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" কিন্তু ইহাও বলিতে পারা যায় না, কারণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধ পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি। আলোক ও অন্ধকার কখনও একত্রে থাকিতে পারে না, (তেজস্তিমিরয়োরিব বিরোধি জ্ঞানকর্ম্মণোঃ গীতায় ৩য় ১ম শ্লোক মধুসূদনটীকা) কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বলিয়া উহাদের একত্রে অনুষ্ঠান অসম্ভব। তবে পরম্পরারূপে কর্ম্ম জ্ঞানের সহায়ক এবং আমরাও স্বীকার করিতে পারি প্রথমতঃ আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিলে চিত্তের মলিনতা দূর হইবে, তারপর জ্ঞানানুশীলন করিবার যোগ্যতা আসিবে। যাহাদের প্রথমতঃ জ্ঞান নষ্ট করিবার যোগ্যতা দেখা যাইবে তাহাদের যে পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম করিয়া চিত্তের এরূপ শুদ্ধ অবস্থা হইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। শাস্ত্রও বলিতেছেন—

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব তু কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ১৮।৫০

অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়

তাহা শুন। জ্ঞানের যাহা পরম প্রকর্ষ তাহাও সংক্ষেপে শুন। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের পর জ্ঞানানুশীলন যে করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করিতেছেন। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান উক্ত সিদ্ধান্তকে আরও বিশেষভাবে পোষণ করিতেছেন 'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' কর্ম্ম কেবল নিম্নাধিকারীর জন্য। যাহারা জ্ঞানানুশীলনের অযোগ্য, তাঁহারা প্রথমে কর্ম্ম করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিবেন, তাহারপর জ্ঞানের অধিকারী হইবেন। অধিকন্তু কর্ম্মীর যে নিম্নাধিকারী তাহাও আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গীনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মানি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ৩।২৬

বিদ্বান অজ্ঞানী-কর্ম্মসঙ্গীদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবেন না। যুক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া তাহাদিগকে সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এখানে জ্ঞানী ও কর্ম্মসঙ্গি-অজ্ঞানী, এইরূপ ভেদ করায় কর্ম্মসঙ্গী যে নিম্নাধিকারী তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আবার গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান কর্ম্মকে নিম্নস্থান দিয়াছেন।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৬।৩

যে মুনি ব্যক্তি যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই কারণ আর যিনি যোগারূঢ় তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসংন্যাসই কারণ। পুনরায় তুমি যে বলিবে, জনক প্রভৃতি নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতে পার না কারণ গীতার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সিদ্ধি শব্দের অর্থ পরম-সিদ্ধি না করিয়া চিত্তশুদ্ধিরূপ অর্থ করিলে সুসঙ্গতি হয়। এখানে জনকের কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়াছিল, কারণ একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেহ কেহ এরূপ মতবাদও পোষণ করিয়া থাকেন যে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের দ্বারা মানুষ যে অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন নিষ্কাম কর্ম্মের

দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ মতবাদ যে সমীচীন নহে তাহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়।

এখন আমরা দেখিব উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে নিষ্কামকর্ম্মীর কি বলিবার আছে। কর্ম্মী বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বপক্ষী কর্ম্ম বলিতে কেবল আয়াস-সাধ্য ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম গুলিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু এতদ্ব্যতীত ধ্যান ধারণা প্রভৃতিকেও মানসিক কর্ম্মের মধ্যেও লওয়া যাইতে পারে। কর্ম্মকে আমরা ব্যাপক অর্থেই লইয়া থাকি। যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ম্ম। ধারণা ধ্যান প্রভৃতিতে মানসিক প্রযত্ন যথেষ্ট আছে। অভীষ্ট বস্তুতে চিত্তকে স্থির রাখিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণে মানসিক শ্রম করিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে যে মস্তিষ্কের বিশেষ চালনা হয় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। যাগযজ্ঞ প্রভৃতিতে হস্তপদাদির ক্রিয়া অধিকপরিমাণে বর্ত্তমান। ধারণা ধ্যান প্রভৃতিতে এরূপ বাহ্যক্রিয়া না হইলেও মস্তিষ্কের ক্রিয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব ধ্যানধারণাদিকে কর্ম্মপর্য্যায়ের মধ্যে গণনা করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। এই বাহ্য ও আন্তর কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। কারণ আসক্তি ত্যাগই মোক্ষ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কর্ম্ম ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত। নিত্য কর্ম্ম, যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি। নৈমিত্তিক, যেমন অগ্নি-হোত্র যাগ প্রভৃতি। প্রায়শ্চিত্ত যেমন চান্দ্রায়ণাদি। অন্যদিক দিয়াও কর্ম্মকে ইষ্ট পূর্ত্ত দত্ত এই ত্রিবিধ-রূপে বিভক্ত করা যায়। ইষ্ট—যেমন অগ্নিহোত্র তপঃ শৌচ প্রভৃতি। পূর্ত্ত, যেমন বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতি নির্ম্মাণ। দত্ত, যথা শরণাগতকে রক্ষণ, প্রাণীদিগকে হিংসা না করা, বেদীর বাহিরে দান প্রভৃতি। এই সমস্ত কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম উভয় ভাবেই করা যাইতে পারে। সকাম কর্ম্মের সহিত মুক্তির বিরোধ সকলেই বলিয়া থাকেন। নিষ্কামকর্ম্মকে সকলেই মুক্তির পক্ষে সহায়ক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিষ্কাম-কর্ম্ম মুক্তির পক্ষে কতটা সাহায্য করিয়া থাকে এই লইয়া শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন নিষ্কামকর্ম্মের পর জ্ঞানানুশীলন করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে কেবলমাত্র নিষ্কামকর্ম্মে মুক্তি হইতে পারে

না। 'যথা—অপরে মন্দাঃ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মানো ফলাভিসন্ধিরহিতেন তত্তদ্বর্ণাশ্রমোচিতেন বেদবিহিতেন কর্ম্মকলাপেন পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনি ইতি বর্ত্তন্তে সত্ত্বশুদ্ধ্যা শ্রবণমনন ধ্যানোৎপত্তিদ্বারেণ' (গীতা ১৩শ অধ্যায় ২৪ শ্লোকের মধুসূদন টীকা)। প্রায় সকলেই নিষ্কামকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের একত্রে ও একসময়ে অনুষ্ঠানে বহু আপত্তি করিয়া থাকেন। কেহ কেহ জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্রমসমুচ্চয় স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব-পক্ষীয়েরাও এইমত অবলম্বন করিয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাস্য, নিষ্কামকর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধ হইলে যখন জ্ঞানানুশীলন করিবে তখন সাধকের পক্ষে কিরূপ কর্ম্ম করা সম্ভবপর হয়? তখন কি তিনি কর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত কর্ম্মে সাধকের অকর্ত্তা অভোক্তা প্রভৃতি বুদ্ধির বিরোধ না হয় সেই সমস্ত কর্ম্ম করাই বিধেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে যাগ যজ্ঞ ও সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি কর্ম্মে মানুষের চিত্ত চঞ্চল হয় ও অহং কর্ত্তা এইরূপ বুদ্ধির নাশ হওয়া ত দূরের কথা বরং অধিকতর দৃঢ়ভাবে পুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ কর্ম্ম জ্ঞানপন্থী সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন। কিন্তু আমরা যদি একটু প্রণিধান করি তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারি যে কোন্ কর্ম্ম কাহার চিত্ত চঞ্চল করিবে ও কোনটী করিবে না, এ সম্বন্ধে একটী প্রকৃষ্ট নিয়ম করা যাইতে পারে না। সাধারণতঃ—দেখা যায় সামান্য কার্য্যে একজন এতদূর বিচলিত হন যে অপরে ভীষণ কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়াও একের চঞ্চলতা প্রকাশ করেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আসক্তি ত্যাগই মুক্তি। মুক্তি লক্ষ করা মানে লাভ করা অর্থ আমি ব্রাহ্মণ আমি ধনী আমি দেহ—ইত্যাদি মত বুদ্ধি ত্যাগ করা। এই বুদ্ধি যাইলেই আত্মা স্বয়ং প্রকাশ হইবেন এটা কিন্তু মুক্তির Negative side—অর্থাৎ "না" এর দিক। যেমন যবনিকার পশ্চাতে নর্ত্তকী প্রভৃতি রহিয়াছে যবনিকা থাকায় দর্শকেরা উহাদিগকে দেখিতে পায় না কিন্তু যবনিকা যেমন উপরে উঠিয়া যায় অমনি নর্ত্তকী প্রভৃতিকে দেখা যায়, সেইরূপ এই অজ্ঞানাবরণ যে কোন উপায়ে চলিয়া যাইলে

জ্ঞান স্বমহিমায় ফুটিয়া উঠেন। এই দুইটী ব্যাপার যুগপৎ হইয়া থাকে। এই আবরণ দূরে করা লইয়াই যত গণ্ডগোল। প্রকৃত আবরণটী বুঝিলেই আমাদের কলহ অনেক পরিমাণে চলিয়া যাইবে। আমি আমার বুদ্ধিই আবরণ। নিষ্কাম কর্ম্মী কর্ম্ম করেন কিন্তু সেই কর্ম্মগুলি করিবার সময় সর্ব্বদা নিজের অর্থাৎ আমি শরীর, আমি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বুদ্ধি দূর করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আমি শুদ্ধ বা অনাসক্ত-বা আমি ভগবানের দাস প্রভৃতি বুদ্ধি অবলম্বন করিলেই পরম শান্তির অধিকারী হইতে পারেন। আমি দেহ, আমি মন, আমার ইহা প্রভৃতি অভিমান ও বাসনাই মানুষকে বদ্ধ করে। উহার বিপরীত বুদ্ধি করিলেই মুক্তি লাভ হয়।

অহমেষাং পদার্থানামেতে চ মমজীবিতম্।
নাহমেভির্ব্বিনা কশ্চিন্ন ময়ৈতে বিনা কিল॥
ইত্যন্তনিশ্চয়ং কৃত্বা বিচার্য্য মনসা সহ।
নাহম্পদার্থস্য ন মে পদার্থ ইতি ভাবিতে॥
অন্তঃ শীতলয়া বুদ্ধ্যা কুর্ব্বত্যা লীলয়া ক্রিয়াম্।
সো নূনং বাসনাত্যাগো ধ্যেয়ো রাম স কীর্ত্তিতঃ॥
অহঙ্কারময়ীং ত্যক্ত্বা বাসনাং লীলয়ৈব যঃ।
তিষ্ঠতি ধ্যেয়সন্ত্যাগী জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥
(যোগবাশিষ্ট উপশম প্রকরণ, ১৬ সর্গ)

দ্বিতীয়তঃ—কর্ম্ম করিতে যাইলেই কর্ম্ম, কর্ত্তা, ও অন্যান্য সামগ্রী প্রভৃতির মধ্যে ভেদ থাকা প্রয়োজন এবং ভেদ বর্ত্তমান থাকিলে ঐক্যবুদ্ধি যাহা জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা আর উদয় হইতে পারে না—এরূপ বলা যায় না। কারণ নিষ্কামকর্ম্মীর ব্যবহার কালে কিঞ্চিৎ দ্বৈতবুদ্ধি থাকিলেও তাহার অদ্বৈতজ্ঞানের বিশেষ ক্ষতিকর হয় না। যোগবাশিষ্টে সপ্তদশ সর্গে এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে—

ভাবাদ্বৈতমুপাশ্রিত্য সত্তাদ্বৈতময়াত্মকঃ।
কর্ম্মাদ্বৈতমনাদৃত্য দ্বৈতাদ্বৈতময়ো ভব॥

তুমি সত্তাদ্বৈতময় হইলেও ব্যবহার কালে ভাবাদ্বৈত অবলম্বন করিবে এবং কর্ম্মাদ্বৈত অনাদর পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতময়—হইবে। টীকাকার

বলিতেছেন, 'ব্রহ্মবদেব ত্বং পরমার্থতঃ সত্তাদ্বৈতময়াত্মক এব সন, ব্যবহার কালেঽপি ভাবনয়া অদ্বৈতমেবোপাশ্রিত্য তৎ তৎ প্রাণিকর্ম্ম ফলদানে বৃদ্ধৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন কর্ম্ম বিষয়ে অদ্বৈতং সর্ব্বাথৈবানাবৃত্য ব্যবহরণ যথোচিত দ্বৈতাদ্বৈতময়ো ভব ইত্যর্থ। অদ্বৈতে কর্ম্মনামেব অসিদ্ধৈরৈক্যরূপেণ সর্ব্বত্র কথঞ্চিত দ্বৈতাচরণে জগদ্ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বাধ প্রসঙ্গাচ্চ তত্র দ্বৈতাশ্রয়ণমেবোচিতম্। কিন্তু অল্প পরিমাণে দ্বৈতভাবনা করিলেও জগৎকে সত্য বলিয়া ভাবিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তারপর বিদ্যার দ্বারা যে অবিদ্যার নাশ হয় বলা হইয়াছে সেই বিদ্যা বা অবিদ্যা কি! সৎস্বরূপ যে ভগবান তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা বিদ্যা আর তৎসম্বন্ধে যে অজ্ঞান তাহাই অবিদ্যা। প্রত্যেকের স্বরূপ যে ভগবান, আমি যে বদ্ধজীব নহি—এরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান ও শাস্ত্র সম্মত এবং আমি শরীর, আমি ধনী এরূপ জ্ঞানই অজ্ঞান। নিষ্কামকর্ম্মী যখন নিজ ব্যষ্টি-আমির স্থানে তাহার যথার্থ স্বরূপকে বসাইতেছেন বা নিজ ব্যষ্টি-আমি কে দূর করিতেছেন তখনই ত তিনি বিদ্যাকেই আশ্রয় করিতেছেন। এবং এই ভাবে যতই প্রতিষ্ঠিত হইবেন ততই তাঁহার অজ্ঞান তিরোহিত হইবে। পরিশেষে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মোহিনী অবিদ্যাও সমূলে নষ্ট হইবে।

কেহ হয়ত বলিবেন মানুষের মনের স্বাভাবিক গতি বহির্ম্মুখে। কর্ম্ম করিতে হইলে বাস্তবিক কি অকর্ত্তাবুদ্ধি আনা যায়? এই চঞ্চল মন নির্জ্জনে বসিয়াই সংযম করা যায় না বহির্ম্মুখী করিয়া কিরূপে তাহাকে সংযত করিবে আর অকর্ত্তা ভাবিবে? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই মানুষ ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট। যাহার হয়ত নির্জ্জনে বসিয়া মন স্থির হয় না তাহাকে কোন সৎকর্ম্মে বা অন্য কিছুতে নিযুক্ত করিলে অনেকটা মনসংযত হইয়া আসে। আরও কার্য্যক্ষেত্র আমাদের চরিত্রের পরীক্ষা ক্ষেত্র। আমি নির্জ্জনে বিচার করিলাম আমি ব্রহ্মস্বরূপ কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যদি ঐ ভাব না রাখিতে পারি তাহা হইলে আমার পক্ষে ঐ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূর পরাহত। তারপর মনসংযত করা ও অকর্ত্তা বা সমস্ত কার্য্য আমার প্রকৃতি করিতেছে এইরূপ ভাব লইয়া—ফলে অনাসক্ত হইয়া কার্য্য

করিতে করিতেই ক্রমশঃ ঐ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। প্রত্যেক সাধন পন্থার অভ্যাসই একমাত্র উপায়। উক্ত ভাব লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রদ্ধাসহকারে সাধন করিতে থাকিলে পরিশেষে ঐ ভাবে সিদ্ধ হওয়া যায়। প্রথম হয়ত বিসদৃশ্য ও কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু যত্নের সহিত অনুসরণ করিলে আর সে বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় তত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না। অধিকন্তু জ্ঞানী যখন সমাধিস্থ হইবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করেন তখন কি তাঁহার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়? ধ্যেয় বস্তুটীকে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন রাখিতে চেষ্টা করিলেই কিছু না কিছু কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি আসিবেই। যদি এরূপ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি তাঁহার মুক্তির পক্ষে প্রতি বন্ধক না হয় বা তাহার অকর্ত্তৃত্বভাবের বিরোধ না করে তাহা হইলে নিষ্কামভাবে কার্য্য করিতে যে টুকু কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি আসিতেছে তাহা ক্ষতিকর হইবে কেন? অধিকন্তু কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিকে বিরাট কর্ত্তৃত্বে লয় করিতে বা ভগবানের দাস বা অকর্ত্তৃত্ববুদ্ধি আনয়ন করিবার চেষ্টা করায় সাধকের কোন ক্ষতি হইতে পারিবে না। তাহার পর সিদ্ধের লক্ষণ সমূহ সাধনাবস্থার সাধন ইহা ভাষ্যকার ও শ্রীধর স্বামী স্ব স্ব গীতা ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "যথা সর্ব্বত্রৈব হি অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থ-লক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনানুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ (শাঙ্কর ভাষ্য) অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞান সাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি (শ্রীধর) সাধনাবস্থায় সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ সমূহ আরোপ করিয়া সাধন করিতে হয় জ্ঞানপন্থী যেমন ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণসমূহ সাধন করিবার সময় অবলম্বন করেন নিষ্কামকর্ম্মী ও ঠিক সেইভাবে সিদ্ধকর্ম্মী জনক, ধর্ম্মব্যাধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির পদানুসরণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞের নিকট সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মময়। সুখ দুঃখে তিনি স্থির ধীর অচল। তাঁহার নিকট এগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়। তিনি সাধনাবস্থায় সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া বিপদ, রোগ, শোক, ভয়, প্রভৃতি আসিলে ঐ সমস্তকে অনিত্য ভাবিয়া নিজকে নির্লিপ্ত ভাবিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং পরিণামে স্বীয় অভীষ্ট বস্তু লাভে সিদ্ধ মনোরথ হন। (ক্রমশঃ)

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(ডাঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত)

এখন প্রশ্ন এই অদৃষ্টবাদীর কিরূপে পুরুষকার থাকিতে পারে এবং দ্বৈতভাবের মধ্যে প্রবল পুরুষাকার কিরূপেই বা সম্ভবে ? মানবের স্বাধীনতা কোথায় ? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা গীতায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে যেরূপ সুন্দর এবং সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে সেরূপ আর কোথাও বর্ণিত হইয়াছে কিনা জানি না। কর্ম্মযোগই গীতার সাধনা এবং কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠানই গীতার প্রধান উপদেশ (২) একদিকে গীতায় শ্রীভগবান বার বার তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "আমি জগতের মূল এবং আদিকারণ আমা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি এবং আমাতেই লয়।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৭।৮
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু। ৭।৯
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্। ৭।১০
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক সাম যজুরেব চ। ৯।১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্। ৯।১৮

হে অর্জ্জুন আমিই জলে রস স্বরূপ, আমিই চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা। আমিই বেদের আরাধ্য প্রণব, আকাশে শব্দ, মনুষ্যের পুরুষকার

পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ অগ্নির তেজ, সর্ব্বভূতের প্রাণ, তপস্বীর সাধনা সর্ব্বভূতের বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীর তেজ, জগতের পিতা, মাতা, ধাতা এবং পিতামহ, পতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, সকল জীবের নিবাস, আশ্রয়স্থান ও সুহৃত এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয়। পুনরায় বলিয়াছেন—

অহং কৃৎস্নস্যজগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭।৬

মত্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রেমণিগণাইব ॥ ৭।৭

সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি, আমি ভিন্ন জগতের আর কিছুই নাই। সূত্রে যেরূপ মণি সকল গ্রথিত থাকে সেইরূপ এই বিশ্ব আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। এই সমস্ত উক্তি দ্বারা তিনি অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন আমি এবং আমার বলিয়া যে অভিমান করিতেছ প্রকৃত পক্ষে তাহার কোন ভিত্তি নাই। কারণ ঈশ্বর ভিন্ন জগতে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া পৃথক কিছু থাকিতে পারে না।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশের্জ্জুন তিষ্ঠতি

ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। ১৮।৬১

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ঘুরাইতেছেন ; ইহাদ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে মানবের স্বাধীনতা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী অথবা জালাবদ্ধমীন অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক নয়। পাখী খাঁচার মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে কিন্তু বাহিরে যাইবার উপায় নাই। মীন জালের মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইতে পারে কিন্তু জাল ছাড়িয়া তাহার যাওয়ার শক্তি নাই। জীবের স্বাধীনতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। যতদিন তাহার মায়া রজ্জু বিচ্ছিন্ন না হইতেছে ততদিন তাহাকে নিরন্তর সংসারে ঘুরিতে হইবে এবং যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাহার দ্বারা শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে এবং ভগবৎ কৃপার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এই বিশ্ব নিয়ন্তৃত্ব অর্জ্জুনের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য উপরোক্ত সমস্ত উপদেশ ব্যতীত ভগবান

তাহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছেন এবং আপনার স্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন। সেরূপ দর্শন করিলে মনের আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বশিল্পী রচিত ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান তাহার সমক্ষে চিত্রপটের ন্যায় প্রতিভাত হয়। হৃদয়েরবন্ধন খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিনদৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ড ২।২।৮

জীব তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কেবল একমাত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় "প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস"। হে জগতের নাথ তুমি প্রসন্ন হও. উপরোক্ত যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনকে দেখাইলেন তিনিই বিশ্বের নিয়ামক এবং জীবের শক্তি তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু ইহার পরক্ষণেই বলিতেছেন "মামনুস্মর যুদ্ধচ" আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। যুদ্ধ অপেক্ষা প্রবল পুরুষকার সাংসারিক ক্রিয়া কলাপের ভিতর আর নাই। যাহার প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর আশঙ্কা সেই মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া প্রবল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা পুরুষকারের অধিকতর নিদর্শন পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। অর্জ্জুনকে ভগবান সেই সেই পুরুষকার অবলম্বন করিতে বলিতেছেন এবং ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিতেছেন।

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২।৩

হে অর্জ্জুন তোমার ভীরুতা শোভা পায় না, ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্ব্বলতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হও। একদিকে আত্মসমর্পণ অন্য দিকে পুরুষকার; এই দুই প্রকারের উপদেশ স্থূল দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও তাহাদের সম্পূর্ণ সার্থকতা রহিয়াছে; কারণ মানব প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত; তত্বজ্ঞানীর যাহা করণীয়, সাধারণ জীবের তাহা করণীয় হইতে পারে না; তত্বজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম সন্ন্যাস দোষাবহ না হইলেও অর্জ্জুনের পক্ষে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়,

অর্জ্জুনের হৃদয়ে পরমার্থ জ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। যে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জনক রাজার ন্যায় মানব বলিতে পারে "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দুহ্যতি কিঞ্চন", সে বৈরাগ্য অর্জ্জুনের হয় নাই। রাজ্য লিপ্সা, ভোগ বিলাস বাসনা শোক মোহ সমস্তই রহিয়াছে, নাই কেবল সেই প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মস্পৃহা, ইহাদ্বারা কপট আচারী হওয়া সম্ভব কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস কিছুতেই সম্ভব হয় না, সুতরাং প্রবল পুরুষকারের একান্ত আবশ্যক তাই ভগবান বলিয়াছেন।

যদ্যহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্তাং নিযোক্ষতি॥ ১৮।৫৯

হে অর্জ্জুন, যদি তুমি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ার ইচ্ছা কর তাহা হইলে সে চেষ্টা তোমার বিফল হইবে কারণ তোমার প্রকৃতি তোমাকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিযুক্ত করাইবে। অর্জ্জুনের এইযুদ্ধ করিব না রূপ প্রতিজ্ঞা সাধারণ অজ্ঞান এবং আত্মম্ভরী লোকের প্রতিজ্ঞার ন্যায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনাবলীর প্রতি একেবারেই লক্ষ্য নাই অথচ প্রতিজ্ঞা করিলেন যুদ্ধ করিবনা। এখন ঘটনাটা এই দাঁড়ায় যে যদি অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে বিরত হন তাহা হইলে কুরুপক্ষীয়দিগের বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহারা যুদ্ধে বিরত না হইয়া বরং প্রবল পরাক্রমে পাণ্ডবদিগকে আক্রমন করিবে এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া লইয়া যাইবে ও সমস্ত পাণ্ডবদিগকে ধ্বংস করিবে। অর্জ্জুন বীর হৃদয় ও ক্ষত্রিয় কুমার, দেব মানব অনেকের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয় রক্ত তাঁহার ধমনীতে নিরন্তর প্রবাহিত, শুধু জ্ঞাতি নাশের আশঙ্কায় তিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভাবে যদি পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ সাধন হয় তবে কি তিনি, তাহা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিবেন? যে জ্ঞাতিশোক যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য আত্ম বিস্মৃত করিয়াছিল সেই জ্ঞাতিশোক এবং বিনাশ আশঙ্কাই পুনরায় জ্বলন্ত পুরুষকার উদ্দীপিত করিবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নি উদ্গীরণ করিবে; একদিকে যুদ্ধ করিয়া জ্ঞাতি এবং শত্রু বিনাশ অন্যদিকে যুদ্ধ না করিয়া জ্ঞাতি এবং পরমাত্মীয়দিগের সর্ব্বনাশ, এই

দুইটীর মধ্যে অর্জ্জুনকে প্রথমটী বাছিয়া লইতে হইবে, যুধিষ্ঠিরের বিনাশ তিনি প্রাণ থাকিতে স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন না, তাই ভগবান বলিতেছেন "প্রকৃতিস্তাং নিযোক্ষতি" অর্থাৎ প্রকৃতি তোমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেই করিবে। ভগবান অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছেন সমস্ত মানবের পক্ষে তাহাই প্রযুজ্য। যতক্ষণ আমিত্ব বর্ত্তমান ততক্ষণ কর্ম্ম অথবা পুরুষকার আবশ্যক এবং ইহার অভাব অমঙ্গলের হেতু। এখন এই কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে, তাই ভগবান বলিতেছেন, মানব! আমি তোমাকে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা দিয়াছি, তুমি সমস্ত শক্তি বলে সেই কর্ম্ম করিতে থাক, ফলের নিয়ন্তা আমি, জগতে সৃষ্টি স্থিতি লয় আমার হস্তে সুতরাং ফলে তোমার অধিকার নাই; "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

এখানে অধিকার শব্দটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কর্ম্মে যে টুকু স্বাধীনতা আছে ফলে তাহা নাই, তাই ভগবান অন্যত্র বলিয়াছেন "ফলে তোমার অধিকার নাই সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা না করাই ভাল, কারণ যদি ফল ইচ্ছানুরূপ হয় তবে আনন্দ হইতে পারে কিন্তু অন্যরূপ হইলে অত্যন্ত মনস্তাপের কারণ হইবে সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না, আমিই ফলের নিয়ামক, আমাতে সমস্ত ফল অর্পণ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হও ইহাই কর্ম্মযোগ এবং ইহাই পুরুষকার এবং ইহাই মানবের কর্ম্ম সাধনার প্রকৃষ্ট আদর্শ। এখানেই দৈব এবং পুরুষকারের সামঞ্জস্য ও সার্থকতা। কর্ম্মফল দৈবাধীন কিন্তু পুরুষকার সাপেক্ষ। যাহারা এইভাবে কর্ম্ম অভ্যাস করেন তাঁহাদের বিনাশ হয় না। এই তত্ত্ব নানাভাবে নানাস্থানে শ্রীভগবান উপদেশ দিয়াছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণং॥ ৯।২৭

মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতি জানে প্রিয়োঽসিমে॥ ১৮।৬৫

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মষ্যাবেশিত চেতসাং॥ ১২।৭

হে অর্জ্জুন, তুমি যে কিছু কর্ম্ম কর, যাগ, যজ্ঞ, তপ, দান আহার বিহার ইত্যাদি সমস্ত আমাতে অর্পণ কর অর্থাৎ আমার কার্য্য এইরূপ মনে করিয়া চল। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য বলিতেছি। আমাতে যাহারা মন নিবিষ্ট করে আমি তাহাদের দূরে থাকিতে পারি না। এই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি তাহাদের পরিত্রাণ করি। ভগবদ্‌বিশ্বাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা মধুর আশ্বাসবাণী আর কি হইতে পারে। ভগবান অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছেন সমস্ত মানবের পক্ষে তাহাই প্রযুজ্য। মানব শুনিতে পায় কিনা জানিনা কিন্তু প্রতি নিয়ত মানবের কর্ণে তাঁহার এই অশ্বাসবাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সমস্ত ধর্ম্মের এবং সমস্ত কর্ম্মের ইহাই ভিত্তি ভূমি।

এই ঈশ্বরবাদ ও পুরুষকারের এক সমাবেশই গীতার বিশেষত্ব এবং ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইহাই যুগধর্ম্ম। যাহারা বলেন পুরুষকারের সহিত ঈশ্বরবাদের আবশ্যকতা নাই। আমি তাহাদের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে চাহিনা। নাস্তিকতার সহিত যুদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অনেক কাল হইতে এই যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। দেবাসুর যুদ্ধ জগতে চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। এই বিচিত্রতাই জগৎ এবং ইহাই লীলানন্দময়ীর চিরাভ্যস্ত আনন্দ নৃত্য। প্রবন্ধের বাহুল্য ভয়ে এস্থানে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করা গেল না। তবে যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী তাঁহারা যে সংসারে দক্ষ যজ্ঞের অবতারণা করিতে বসিয়াছেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না এবং শিবহীন যজ্ঞে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল কখন সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস যাহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহারাই দেখিবেন এই শিবহীন যজ্ঞের ফলাফল কি ভয়ানক। ইহা দ্বারা সংসার কি ভয়ানক অশান্তির ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। ফেরুপালের ভীষণ চিৎকার রক্তপিপাসুর তাণ্ডবনৃত্য ও দিগন্তব্যাপী হাহাকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। কালের করাল ছায়া

যেন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। চারিদিকে ধ্বংসলীলা প্রকটিত। কর্ম্মবাদীর পক্ষে ঈশ্বরবাদ অপেক্ষা অধিক বলপ্রদ আর কিছু আছে কিনা জানিনা। বিশ্বরাজরাজেশ্বরীর সিংহাসন যাহার হৃদয় পদ্মে অধিষ্ঠিত মৃত্যুর বিভীষিকা, সংসারে নৈরাশ্য তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ নিরন্তর তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, মায়ের ভরাভয় করস্পর্শে তাহার সমস্ত বেদনা বিদূরিত হইয়া যায় সাধক আনন্দে অধীর হইয়া গাহিতে থাকে—

এসংসারে ডরাই কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি।

কি উন্মাদনা! কি নির্ভীকতা! মানব, একবার অভয়ার অভয় নামে নির্ভর করিয়া অভীঃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীর পদবিক্ষেপে সংসার সমরে অগ্রসর হও। এবং তুর্যোধনের ন্যায় সরলহৃদয়ে অবিকম্পিত চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাক—

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। প্রপন্ন গীতা।

সংসার।

(পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

(শ্রীঅজিতকুমার সরকার)

নরেন ও বিনয় পরের দিন কলিকাতা হইতে গ্রাম হরিপুরে ফিরিয়া আসিল। নরেনের সঙ্গে তাহার যে বন্ধুর আসিবার কথা ছিল, তাহার আসা হইল না; কারণ তাহাদের এবার সাঁওতাল পরগণার একটা জায়গায় চেঞ্জে যাইবার সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল। এবার চেঞ্জ এবং পল্লীগ্রামের খালি মাঠের হাওয়া খাইবার আশায় তাহারা দেওঘর মধুপুরের মায়াত্যাগ করিয়া মিহিজামে শালবনের ভিতর একটী বাড়ী

ভাড়া লইয়াছিল। এখানে অবশ্য পয়সা খরচ করিলেও কোন ভাল খাবার জিনিষ পাইবার উপায় নাই, সব জিনিষই অন্যস্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে; কিন্তু এসকল ছাড়াও যা আছে তাহাকে অমূল্য বলিলেও চলে। ইহার খোলা প্রান্তর আর শালবনের সম্পদ অন্যস্থানে কেহ রপ্তানি করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তাই এ জায়গাটী অনেকেরই চক্ষে বেশ ভাল বোধ হয়। যাহা হউক নরেনের সঙ্গে তাহার বন্ধু ইন্দুভূষণের বন্দোবস্ত হইয়া থাকিল যে, নরেন দিন কতক বাড়ীতে থাকিয়া মিহিজামে আসিবে এবং যদি সম্ভব হয় তাহাদিগকে নিজেদের গ্রামে একবার লইয়া যাইবে। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া নরেন দেখিল সবই যেন অন্য রকম। কিশোরীমোহন বাবুও কিছু বেশী মাত্রায় গম্ভীর, শান্তির মনও যেন স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। তার স্ফূর্ত্তি একটু কম্ হইয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়া সে যেন ইহারই মধ্যে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। নরেনের এসব বেশ ভাল লাগিল না। ছুটির দিন কয়টা যেন তাহার কাছে অশান্তিময় হইয়া উঠিল। মার মনও যেন দুশ্চিন্তায় প্রপীড়িত,—পাড়া প্রতিবেশী বিশেষতঃ নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতিগণ কেহ মন খুলিয়া কথা পর্য্যন্ত বলে না। নরেন এ সকলের কারণ ঠিক বুঝিতে না পারিলেও সে অনুমান করিল কিছু একটা কাণ্ড হইয়াছে। তাহাছাড়া বিনয়ের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহার গুরুত্বও এখন কিছু উপলব্ধি করিল। এবং এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার একটা কাল্পনিক মূর্ত্তি গড়িয়া সেও অনেক রকম চিন্তা করিতে লাগিল। অথচ সাহস করিয়া পিতাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

একদিন বৈকালে সে একাকী বেড়াইতে যাইবার সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া বাধা পাইল। পিছন হইতে ভট্টাচার্য্যের ভাগীনেয় তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আসুন, মামা আপনাকে একবার ডাক্‌ছেন।" বলা বাহুল্য নরেন এই দলের উপর অনেকদিন হইতেই চটা ছিল। তাহার পর দেশের অশিক্ষিত ও মন্দশিক্ষিত ইতর ভদ্রেরা ভট্টাচার্য্যের নামের পিছনে অমূলক 'ন্যায়রত্ন' জুড়িয়া দিয়া তাঁহাকে যে আসনে বসাইয়াছিল নরেন তাহা মোটেই সহ্য করিতে পারিত না। এবং

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পল্লবগ্রাহী বিদ্যার কথা সে অবগত থাকিলেও "নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" হইয়া তিনি যে জড় গাড়িয়া বসিয়াছিলেন তাহার উৎপাটন করা বড় সহজ ছিল না। বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার সমুদয়গুলি মিলিয়া কিশোরীমোহন বাবুও তাঁহার অনুগত আরও কয়েকটী ভদ্রসন্তানকে ম্লেচ্ছের দলভুক্ত করিবার জন্য যেরূপ প্রাণপণ যত্নের সহিত আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফল নিতান্ত আশাশূন্য হয় নাই। প্রথমতঃ আধুনিক শিক্ষিত যে কোন লোক যে তাহার পিতৃপুরুষের আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অনাচারী হইয়া থাকে এটাতে অধিকাংশ অশিক্ষিত বা অদ্ধশিক্ষিত পল্লীবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস। তাহার উপর কিশোরামোহন বাবুর জাতি নির্ব্বিশেষে অবাধ সম্মিলন এই ধারণাকে ক্রমে বদ্ধমূল করিয়া দিতেছিল। এদিকে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নজির দেখাইয়া একদেশ-দর্শিতামূলক বক্তৃতাদির প্রভাবও যথেষ্টই ছিল। এতদিন কিশোরীমোহন বাবুকে অনেক লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইত,—কেবল সাধারণ প্রজার প্রায় অধিকাংশ লোকই তাঁহার আন্তরিক সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি বেশ অনুরক্ত হওয়ায় প্রতিপক্ষের দল তেমন সুযোগ পাইতেছিল না। কিন্তু তাহারা যে হাল ছাড়িয়াও বসিয়া ছিল না, বিনয়ের নিকট হইতে নরেন এ কথার আভাষ পাইয়াছিল। এহেন ভট্টাচার্য্য বিনোদবিহারী ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক সে আহুত হইয়াছে শুনিয়া একবারে তাহার ভিতরটা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গোপন ষড়যন্ত্র সভার স্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার কৌতুহলটাও একটু মাথা তুলিয়া উঠিল। কাজেকাজেই সে ভট্টাচার্য্যের ভাগিনেয় শচীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন সেখানে সবান্ধবে বসিয়া গল্পগুজব কিম্বা কোন মৎলব লইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন। নরেন বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিতেই তিনি আশীর্ব্বাদের বাঁধা গৎটা একবার মনে মনে ঠিক করিতে লাগিলেন। দুই তিনটী গৎ মনে করিলেন, কিন্তু কোনটীই বেশ মনোমত হইল না। শেষে একটা মামুলি আশীর্ব্বাদই

ঠিক্ করিয়া রাখিলেন। এদিকে নরেন ভিতরে আসিয়াই, তাহার জ্ঞাতি খুল্লতাত ও অনুচরদের দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং সেই ঝোঁকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একটা অভিবাদন করিতেও ভুলিয়া গেল। শুধু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আপনি কি আমায় ডেকেছেন?" "কে?— নরু—হাঁ—না তা কবে আসা হল বাবাজী!" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে সরকারের দিকে চাহিলেন। সুচতুর অনুচর সরকার তাঁহার নীরব অভিপ্রায় মুখভঙ্গীতে অবগত হইয়া নরেনের দিকে চাহিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল,—"কি হে বাপু! তোমরা যে আজকাল লেখা পড়া শিখে ধরাটাকে সরার মতনই মনে কর দেখ্‌ছি? এখানে এলে অথচ ভট্টাচার্য্য দাদাকে একটা নমস্কারও করলে না! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা না হয় চুলোয় যাক্, ওসব আপদ বালাই না হয় তোমরা আজকাল মাননা; কিন্তু উনি যে তোমার বাপের চেয়েও বয়সে বড়—বলি সেটা ত জানা আছে?" মাধব গাঙ্গুলি এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন— "বুঝলে ভায়া! ইংরেজি কেতাবে ওসব নমস্কার টমস্কার নাই। ওরা যে কি একটা—তোমরা—দূর ছাই মুখেও আসেনা—হাঁ গুড্ মর্নিং না কি বলে। তা তাই বল্‌লেও ত কতকটা মান্য করা হ'ত! মনে কর এ সব কথা ভট্টাচার্য্যদাদার সাত পুরুষেও কখন শুনে নাই। ওঁরা কেবল শাস্তর নিয়ে পড়ে থাকেন।" বঙ্কু সরকার গাঙ্গুলির কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—"তা না হয় ইংরাজি বিদ্যাটা তোমার মতন বা তোমার বাবার মতন উনি জানেন না, কিন্তু তা হলেও এখনও এই বিনোদ ভট্টাচার্য্যই গাঁয়ের মাথা। ইনি আছেন বলে এখন ঠাকুর দেবতার মাথায় দুট বেলপাতা পড়ছে। এর পরে দেখ্‌ছি একেবারে সব ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে।" ভট্টাচার্য্যমহাশয় এতক্ষণ এই শ্লেষপূর্ণ মিষ্ট ভৎর্সনাগুলি মনের আবেগের সহিত শুনিতে ছিলেন, আর তাহা নরেনের হৃদয়ে কেমন বিদ্ধ হইতেছে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাহাই লক্ষ্য করিতে ছিলেন। এখন—"হাঁ হাঁ থাক্ বঙ্কু ভায়া! ওরা এখনও ছেলে মানুষত ততটা জ্ঞান হয় নাই। আজকাল কার ছেলে একটু

বেশী তেজী, তা হোক। নারায়ণ হরি হে তোমারই ইচ্ছে" বলিয়া হাঁই তুলিয়া—হাতে তুড়ি দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নরেনকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বঙ্কু সরকারের শ্লেষপূর্ণ মিষ্ট ভৎসনায় নরেনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিকই সে একটু অমর্য্যাদা দেখাইয়াছে মনে করিয়া নিজে নিজেই সামান্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; এবং হঠাৎ কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া ক্রোধে অপমানে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ভাবেই তাহাদের একপাশে বসিয়া পড়িল। তখনও একটা সুবিধামত জবাব, যাহা ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া না যায় এমন কিছু জুটিয়া উঠিতেছিল না। ইতি মধ্যেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার বলিলেন—"তোমাদের কলেজ কবে বন্ধ হল? নরেন তখন প্রকৃতিস্থ ছিলনা, কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেওয়া হইল না দেখিয়া সরকার বলিয়া উঠিলেন,—"আজকাল কার ছেলে সব লেখা পড়া শিখে হল কি ভট্টাচার্য্য দা? শুধু গাদা গাদা বই নিয়ে নাড়া চাড়া, অথচ কেমন করে গুরুজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে হয় তাও শিখে না। আবার 'হাম বড়া হ্যায়' ভাবও বড় কম নয়।" নরেন ভিতরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অভিবাদন না করার জন্য একটু লজ্জিতও হইয়াছিল। এবং সেই জন্যই সে একটু দমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন সরকারের কথায় আবার তাহার ক্রোধও অপমানাহত অন্তঃকরণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং অগ্রপশ্চাৎ না চিন্তা করিয়াই বলিল "কোন্ গুরুজনকে আজ কালকার ছেলে অপমান করেছে, না ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে আপনি দেখেছেন? দোষ কি কেবল আজকালকার ছেলেরই! আপনাদের কোন দোষ নেই? কি কি গুণের কাজ আপনারা সমস্ত দিনটা ধরে করে থাকেন তাত আমি খুঁজে পাইনা। আজ কালকার ছেলের অন্ততঃ হুজুগে মেতেও লোকের জন্যে—দেশের জন্যে একটা কাজ করতে পারে, তখন তারা নিজের হিতাহিতের কথা ভাবে না। কিন্তু আপনাদের দল দুনিয়ার কখন কারও ভাল ত করেনই না—আবার আপনা থেকে যদি কারও একটু সুখ সুবিধা হয় সেটাও সহ্য করতে পারেন না।

যেখানে প্রকৃত গুরুত্ব থাকে সেখানে আপনি সসম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে যায়, কাকেও অনুরোধ করতে হয় না। অত যে কি আর—”বলিতেই বাধা দিয়া সরকার বলিলেন, “অত চট্‌ছ কেন বাবাজি! তোমরা ইংরেজি পড়ে কি সকল সময় সাপের পাঁচপা দেখ নাকি!” মাধব গাঙ্গুলি বলিলেন,—“বোঝনা ভায়া! বেশী বিদ্যে হলেই ও রকম হয়। মাথা বিগড়ে যায় কিনা!” নরেন একেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর ক্রমাগতঃ এইরূপ শ্লেষপূর্ণ কটূক্তি সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, “হাঁ ঠিক কথা বিদ্যের জন্য মাথা বিগড়িয়ে যায়; কিন্তু আপনাদের মাথা যে কোন বিদ্যের জন্যে বিগড়িয়েছে তাত বুঝলাম না। আর এই বিদ্যে নিয়ে যে কোন মুখে গুরুত্ব উপলব্ধি করেন সে চিন্তার অতীত। গুরুত্বের মূলে যে মানুষের খাঁটি জীবনী শক্তি—যার নাম মনুষ্যত্ব তার চিহ্ন মাত্রও আপনাদের ভিতর দেখা যায় না। অথচ গুরুত্বের গর্ব্ব যথেষ্ট আছে। কখন কি ভেবে দেখেছেন কি নিয়ে এত গর্ব্ব করেন? আজ বুঝি আমাকে, আমার বাবাকে কটূক্তি শুনাবার জন্যেই আমায় ডেকেছিলেন ভট্টাচার্য্য জেঠা? কিন্তু মনে রাখবেন, মানুষকে অপমানিত করতে গেলে তার প্রতিঘাত আপনিই একদিন হৃদয়ে এসে লাগে, কেও তা বন্ধ করতে পারে না। আজ আমি দেশের সামনে চেঁচিয়ে বল্‌তে পারি সমস্ত হিন্দু সমাজের পতনের মূলে আপনাদের কর্তৃত্ব কাহিনী আগুণের অক্ষরে লেখা রয়েছে আর থাক্‌বে। সনাতন বনাম যথেচ্ছাচারী হিন্দু সমাজ আজ যে ধ্বংসের মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে তার যতই কেন না কারণ থাকুক মদগর্ব্বিত বিদ্যা আচারাভিনী কোপন কুটিল স্বভাব লোভী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মসীময় কলঙ্ক কেহ কালের বুক থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। আজ যে দেশে বিচার বৈষম্য নিয়ে জাগরণের সাড়া পড়েছে, সেটা আমাদের নূতন নহে। অনেক দিন আগেই যখন ভারতের ত্রিসীমানায় ম্লেচ্ছ কখন বসবাস করে নাই, তখন এই মায়েরই এক শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য সভ্য দেবোপাধি বিশিষ্ঠ বিদ্যাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচারে একই অপরাধে দণ্ডের যে ভীষণ বৈষম্য দেখিয়েছেন তা মানুষের প্রাণে সহ্য হয় না। এই দেশের খেয়ে পরে মানুষ

হয়ে এই দেশের কতকগুলি ইতর দুর্ব্বল লোকের উপর অত্যাচার ও অন্যায় প্রভাব অপ্রতিহত রাখবার জন্যে তাঁরা যে সকল মানব-নীতি বিগর্হিত উপায় অবলম্বন করেছেন তা চিরদিন ঢাকা থাকে না। যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে আপনারা আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তুলেন সেটা কি কারুর এক চেটিয়া ব্যবসায় মনে করেন? ধর্ম্ম এখানে এই হতভাগ্য সমাজে যে একটা, রীতিমত পয়সা উপার্জ্জনের ফাঁদ, লাভজনক ব্যবসায় তা প্রত্যেক তীর্থ স্থানে গেলেই মানুষ বেশ বুঝতে পারে। আজ আমাদের দেবতাও বোধ হয় পাথরেই নির্জীব মূর্ত্তি—তাই তাঁদের নিয়ে দস্যুর মত মহাজনী রাহাজানি চলেছে। কিন্তু কার দ্বারা জানেন ত? এই ধর্ম্ম ব্যবসায়ী সংস্কৃত শ্লোক বিক্রয়ের মুদী ব্রাহ্মণদের দ্বারাই। প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে আর দেরী নেই।” বলিয়া নরেন আরক্ত মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং কাহারও কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া একেবারে রাস্তা ধরিয়া বাড়ীরদিকে চলিয়া গেল। নরেনের বক্তৃতার অতর্কিত আক্রমণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাগৃহ একেবারে নির্ব্বাক হতভম্ব হইয়া উঠিল। দারুণ আঘাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল তাঁহার সেই বর্ষণোন্মুখ নিবিড় জলদোপম গম্ভীর মুখেরদিকে চাহিয়া কেহই প্রথমে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। বলাবাহুল্য তাঁহাদের অধিকাংশই নরেনের কথার মূল তথ্যগুলি বুঝিতে পারে নাই। তবে সে যে রাগতস্বরে একটা গালা গালিরই অভিনয় করিতেছে বুঝিয়া মনে মনে সকলেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এমনকি নরেন আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে হাতাহাতি হওয়াও বোধ হয় নিতান্ত অসম্ভব হইত না। কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইবার পর মাধব গাঙ্গুলি সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—“দেখলেন ভট্চাজ দা ছোঁড়াটার তেজ! বাপরে —যেন কোটে সাপের বাচ্চা!” বঙ্কুসরকার বলিলেন,—“তা হবে না কেন? বাপ ত ধাড়ি কোটে!” ভট্টাচার্য্য এতক্ষণে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—“ওঃ ধন্যরে কালু! সব সময়ের গুণ ভায়া! নইলে কালকের ছেলে একটা—শূদ্রের ঘরে জন্মে আমার সামনে উঁচু গলায় এতগুল কথা বলে গেল কোন্ সাহসে! অ্যাঁ এত বড় আস্পর্দ্ধা!

'আমাদের প্রায়শ্চিত্তের দিন আসছে!' যারা আমাদের পায়ের যোগ্য নয় তারা আজ আমাদের সাম্‌নে প্রায়শ্চিত্তের কথা বল্‌বে এত অনাচার কি আর ধর্ম্মে সয়?" বঙ্কুসরকার এতক্ষণে একটু সাহস পাইয়া বলিল,—"তা যাই হোক ভট্টাচার্জ দা! আমার ছেলেটা বড় হ'লে আমি ওকে ইংরাজি পড়াচ্ছি না। বাবা! তা হ'লে আমাকেই দেখ্‌ছি ওর কাছে সব শিখ্‌তে হবে!" ভট্টাচার্য্য মহাশয় তেমনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"আরে ও গুল কি আর ছেলে,—একেবারে অকাল কুষ্মাণ্ড। আর তা না হবেই বা কেন? শাস্ত্রে বলেছে 'শূদ্রস্য বার্ত্তা শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম্ম চ'। অর্থাৎ কিনা দ্বিজদিগের (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের) সেবা করাই শূদ্রের তপস্যা বল—বিদ্যা বল সবই। ওদের আর কিছুতেই অধিকার নাই। তা ওসকল আজকাল আর কে শুনে! বিশেষ করে বদ্যি আর কায়েত জাতটা আজকাল ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী হয়ে পাড়ছে। মনে হয় ওরাই যেন সমাজের মালীক। চারিদিকে কেবলই অনাচার নইলে কি আর অস্পৃশ্য জাতগুলও আজ এত মাথা তুল্‌তে পারে! ব্রাহ্মণের আর মান নাইরে ভাই! এযে ঘোর কলিকাল!" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হতাশ দৃষ্টিতে সকলের পানে চাহিতেই তাঁহার অনুচরেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কি দাদা! ব্রাহ্মণ এখনও কলির দেবতা। একি আর কোন কালে যাবার বটে? যেই যত আস্ফালন করুক সে দিন দুই তিন বই টিক্‌বে না। আমরা জানি দেবতার পূজায় আর ব্রাহ্মণের পূজায় তফাৎ নাই।" এবম্প্রকার প্রশংসা সূচক বাক্য শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ আত্মগরিমায় ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অমনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তা তোমরা বল্‌বে বৈকি সেত বল্‌বারই কথা! এই দেখনা ধর্ম্মাবতার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শিরও ব্রাহ্মণের পদতলে পড়েছিল তাতে তিনি নিজেকে কত সৌভাগ্যবান মনে করতেন। সে কথাও দূরে যাক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করে বলেছিলেন—প্রভু! আপনার চরণে আঘাত লাগে নাই ত? এর চেয়ে ব্রাহ্মণের গৌরব আর কি হ'তে পারে? আর তখনকার রাজাও ছিল তেমনি। সব কাজ শাস্ত্রের নিয়মে সম্পন্ন হওয়া চাই; অঙ্গহানি

হবার উপায় ছিল না। এইযে আজকাল আচণ্ডালে শাস্ত্র আওড়াচ্ছে হে, এদিন কি আর ছিল? হরি হরি! তখন যাঁর যা বৃত্তি তা ছাড়া আর কিছু করবার উপায় ছিল না। শাস্ত্রে বলেছে—,

"বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপ হোম পরশ্চ যঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম॥

অর্থাৎ কিনা যদি কোন শূদ্র জপ হোম প্রভৃতি, যাতে তাদের অধিকার নাই এমন কোন ধর্ম্ম কার্য্য করে তবে রাজা তাকে বধ করিবেন। এতে কোন পাপ নাই; কারণ জপ হোমানুষ্ঠানকারী শূদ্র সমস্ত রাজ্যকেই নাশ করে থাকে। কি রকম নাশ তা শুন। এই কায়স্থ জাতের কথাই ধরা যাক্। তোমরা কিছু মনে করোনা বন্ধু আমি শাস্ত্রের কথাই বলছি। কায়স্থকে চিরদিন আমরা শূদ্র বলে জানি। আজ না হয় তোমাদের ভিতর কতকগুল লোক ইংরেজী পড়ে আর দুই চারটা বড় চাকরী করে ক্ষত্রিয়ের দাবিদার হয়েছ। আবার তার মধ্যে থেকে কয়েকজন হয়ত সন্ন্যাসী ইত্যাদিও হয়ে একেবারে ধরাকে সরা মনে করছে। কিন্তু লোকে তা মান্‌বে কেন? ব্রাহ্মণ চিরদিনই ব্রাহ্মণ। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণও একটা সুকৃতিরফল। শাস্ত্রে বলেছে- "যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ। কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥ অর্থাৎ স্বর্গবাসী দেবগণও যাঁহার মুখে হবনীয় দ্রব্য সামগ্রী সদা ভোজন করিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ যাঁহার মুখে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ অধিকতর শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে আর কে আছে? ভগবান যাকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন, কয়জন ভ্রষ্ট বিধর্ম্মীর চীৎকারে কি কেও তাকে ছোট কর্‌তে পারে ভায়া?" গাঙ্গুলি মহাশয় মহা উৎসাহের সহিত বলিলেন "কখনই না—এ হতেই পারে না। কি বল বন্ধু ভায়া?" বন্ধু বাবুও সস্মিত বদনে বলিলেন "আপনারাই কলির দেবতা গো, ভাবনা কি!" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভিতরের জলন্তবহ্নি এতক্ষণে কিছু শান্ত হইয়া আসিতেছিল, কারণ মানুষ যখন আহত হইয়াও আঘাতকারীকে উপযুক্ত দংশনে জর্জ্জরিত করিতে না পায় তখন মনের আগুন মনেই চাপিয়া নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করে; অন্যথা

তাহার নিজের জ্বালাই সমধিক হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে আপনার অন্তর-পোষিত মতের সমর্থনকারী একটী ইতর জীবও যদি তাহার দৃষ্টিগোচর হয় তখন সে মনের খেদ মিটাইয়া সেইখানেই সান্ত্বনার বারি আহরণ করে। ফলে হৃদয় তাহা হইতেই আত্মশ্লাঘায় পূর্ণ করিয়া কতকটা শান্তি পাইতে চেষ্টা করে। নরেনের কৃত অপমান ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রাণে তীরের ন্যায় বিঁধিয়াছিল, ফলে তিনি প্রথমতঃ ক্রোধ, অভিমান, মর্য্যাদা-গর্ব্বের আত্যন্তিকতায় যেন জ্ঞান হারা হইয়াছিলেন, তাই 'মহা ঝটিকার পূর্ব্বে প্রশান্ত প্রকৃতির' ন্যায় গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর যখন প্রতিঘাত করিবার মত অবস্থা ফিরিয়া আসিল, তখন আঘাতকারী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। কাজেই এখন অনুচরদের নিকটেই নিজের সমস্ত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া কতকটা শান্ত হইয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে সেই উৎসাহেই আবার বলিলেন "ছোট জাত গুল মনে করে ব্রাহ্মণঠাকুর পূজার চাল কলা বেঁধে নিয়ে যান, সুতরাং তারা আমাদেরই দ্বারা প্রতিপালিত। আরে বাবা! তোরা আজ কাল এই চাল কলা পাওয়াটা যে চোখে দেখিস পূর্ব্বে একটা সম্রাজ্য পর্য্যন্ত দিয়েও লোকে ব্রাহ্মণকে লোভী বলা ত দূরের কথা বরং কৃতার্থ বোধ করিত। এই মূঢ় অর্ব্বাচীনরা বোঝে না যে, 'ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যেদিন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন সেইদিন হইতেই এখানকার সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্যে সকল জীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন। শুধু তাই নয় আবার -'সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতং।' অর্থাৎ জগতের সমস্ত ধনই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। সকল স্থানেই তার অধিকার অপ্রতিহত—ইহাই শাস্ত্রের বচন। কিন্তু সে সব ত দূরে যাক্, ব্রাহ্মণ আজকাল যেন শূদ্রের প্রত্যাশী হয়ে' জীবন ধারণ করে, এইটাই হল কতকগুল ধর্ম্মত্যাগী মূঢ়ের ইচ্ছে। ভয় নাই ভায়া! এত অনাচার থাক্‌বে না, তা হলে ধর্ম্ম নাই বল্‌তে হবে। একবার ছোঁড়াটার দেখা পেলে বল্‌বে, অরে!—যদি ব্রাহ্মণকে না মানিস তবে তোর চৌদ্দপুরুষের মুখে পিণ্ডী দিবে কেরে হতভাগা! তারা যে নরকেই পচবে!" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু

আত্মশ্লাঘার কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বন্ধুকে বলিলেন, "দেখ বন্ধু! তোমার ছেলের অন্নপ্রাশনের সব প্রস্তুত ত? কিন্তু সে মতলব হচ্ছেনা। নিমন্ত্রণ সকলকেই প্রথমে করতে হবে; তারপর কার্য্যক্ষেত্রে সব বিবেচনা করা যাবে। আজ তবে উঠি সন্ধ্যার সময় হয়ে এল" বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, অন্যান্য সকলেও যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। এবং রাস্তায় যাইতে, দেখিলেন কিশোরীমোহনবাবু ডুকড়ি মণ্ডলের বাড়ী হইতে বাহির হইতেছেন। প্রথমে তাঁহার পাশ কাটাইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু হঠাৎ সম্মুখে পড়ায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন ও কথা বলিবেন কিনা সেই বিষয়েই একটা কপটতাপূর্ণ এলো মেলো ভাবে মনের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি করিল। কিন্তু কিশোরমোহনবাবু তাঁহাদিগকে সে দায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়া প্রথমেই বলিলেন, "কি ভাই! কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব?" অন্য কেহ উত্তর না দিতেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাল সামলাইবার জন্য—"এই—হাঁ না" করিয়া নিজেদের অভিপ্রায়ের নিগূঢ় সারমর্ম্ম একটা সাঙ্কেতিক ভাষায় জ্ঞাপন করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা প্রশ্নে গলদটুকু ঢাকিবার জন্য বলিলেন "তা—তুমি বুঝি ডুকড়ির বাড়ী গিয়েছিলে নয়? হাঁরে ডুকড়ি তোর মা কেমন আছেরে?" "আজ্ঞে হুঁস নাই গো চক্কোবর্ত্তী মশায়! এ যাত্রা যদি আপনাদের আশীর্ব্বাদে আবার দানা পানি খায় তবে খুব ভাগ্যি।" বলিয়া ডুকড়ি যেন একেবারে মা হারা বালকের ন্যায় ছল ছল দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমবেদনার সুরে বলিলেন, "আহা তাইত রে তবেত বড় ভাবনার কথা! সে রকম টাকা কড়িও নাই যে ভাল ডাক্তার এনে দেখাবি। আচ্ছা—একবার রতনপুরের সনাতন কবরেজকে এনে দেখালিনা কেন? ওঁর বেশ হাতযশ আছে। তা কিশোরী ভায়া কি..........." ডুকড়ি আর বলিতে না দিয়া নিজেই বলিল, "আজ্ঞে ঘোষ মহাশয় আর হেড্ মাষ্টার যেরকম হেপাযত করে চিকিচ্ছে করাচ্ছেন, যদি পরমাই থাকে ত ওতেই বাঁচবে," বলিয়া ডুকড়ি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার ঘোষ মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া

থাকিল। কিশোরীমোহনবাবু ইহাতে একটু চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "হাঁ, আমিও ওকে বলেছিলাম যে, একবার একজন ভাল ডাক্তার এনে দেখা, তাতে না হয় আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।" "হাঁ তা করবে বৈকি তা করবে বৈকি।" বলিয়া তাঁহারা আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। কিশোরীমোহন বাবুও দুকড়িকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাড়ীতে গেলেন। কারণ খুব শীঘ্র কয়েকটী বিশেষ দরকারী জিনিষ তাঁহাকে দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

এদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুচরগণও নিজের রাস্তা ধরিয়া কিশোরী মোহন বাবুর দয়া দাক্ষিণ্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে গাঙ্গুলি মহাশয় আর সরকার মহাশয় তেমন জুড়াইতে পারিলেন না। কারণ উভয়ের গৃহিনীই তখন কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ রণচণ্ডীর সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রথমার কারণ কোনও সাংসারিক অনুপপত্তি, দ্বিতীয়ার মৃতা সপত্নী কন্যার নিতান্ত নীতিবিগর্হিত অন্যায় আচরণ। যদিও ইহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নহে কিন্তু তাঁহার প্রাণে অসহ্য হইয়াছিল, তাই কর্ত্তা গৃহে পদার্পণ করিতেই মঙ্গলগীতি আরম্ভ করিলেন।

অপূর্ণ

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র)

হেথা, হবে শেষ ?
আঁধারে অলক্ষ্য পথে, যুগে যুগে ভ্রমি মহাদেশ
যে অনন্ত যাত্রা পথ'পরে
সঁপি দিয়া আপনারে
অন্ধ মোহ বন্ধ হ'তে
ছুটে চলি জীবন মরণ মহারথে,—

স্বজনের ঘূর্ণপাকে
স্নদূরের তীরে ফেলি' বসুধা বিপাকে
অসীমে উধাও হওয়া, সিন্ধুমাঝে ডুবে যাওয়া পথ :—
আজি তার থেমে যাবে রথ ?
অনির্ব্বাণ অতীতের ধ্রুব জাগরণ
আজি কিরে অকস্মাৎ মোহতলে হারাবে চেতন ?—
ডুবে যাবে নিদ্রাঘেরা স্নিবিড় নিবৃপ্তি শয়নে
বরসিয়া আঁখিনীরে ব্যাকুল নয়নে ?
কাঙ্গাল মানস
লোলুপ চাহনিঘেরা মনহরা মহামায়ারস
ভ্রমি'তুমি করিবে কি পান ?—
মদির বধির প্রাণে লুটা'বিকি আঁখি করি মান ?
মৃত্যুমুখী জীবনের ক্ষণিকের বিলাস লীলায়
চিরন্তন সত্য খুঁজি' হায়—
বাসনা তিমিরে ঘেরা, দীপহারা রুদ্ধ কারাতলে
ঘুরে মরি ; ঘুরে শুধু মরি পলে পলে।
ওই দূরে, ওই ধ্রুবতারা জ্বলে !—
আঁধারের সিন্ধু তলে দীপ্তজ্যোতিঃ মুকুতা উজল !
ওরে মূঢ় মন
অনন্ত নিবৃতি তলে স্তব্ধ জাগরণ !—
কার মহা আহ্বানের বধির ইঙ্গিত
কোন্ মহা দেউলের মূর্চ্ছাহানা নীরব সঙ্গীত
অরূপের বক্ষপরে
আত্মরূপ ধরে !
অসীমের হে মহাপথিক—
নাই কি পথের তব ঠিক ?
তব যাত্রাপথ পরে ফুটে ওঠা বসুধা কুসুম
আঁখিতে বুলায় একি ঘুম ?

তবু তৃষ্ণাতুর অবসাদে রহিয়াছি ভোর!
এ নহে সে অনন্ত খর্পর!
সুপ্তিঝরা বিশ্রামের লীলানিকেতন
নহে চিরন্তন।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

১। আশ্রম—কাশিমবাজারাধিপতি স্থাপিত রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের মুখ পত্র স্বরূপ এই মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। "স্থির লক্ষ্য হইয়া, সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত না হইয়া, শান্তভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের আশ্রম জীবন এইরূপ একটী কর্ম্মশীল অথচ শান্ত, সহযোগশীল অথচ সংঘর্ষ বিহীন, স্বপ্রকাশ অথচ আত্মম্ভরিতাবিহীন হউক"—নিবেদকের এই প্রার্থনা শ্রীভগবান পূর্ণ করুন।

২। সত্যরক্ষা—সামাজিক উপন্যাস—শ্রীকৃত্তিবাস সাহা, বি, এ, প্রণীত। বই পড়িয়া বোধ হয় লেখক পয়সার জন্য লেখেন নাই। সদাদর্শ প্রচার করিবার জন্যই লিখিয়াছেন। লেখা নূতন তা "নবীন লেখক" নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা এই পুস্তকের বড় দোষ ইংরাজী শব্দের অতিমাত্রায় ব্যবহার। যাঁহারা ইংরাজী অনভিজ্ঞ তাঁহারা পুস্তকের অধিকাংশই, তর্জ্জমা মাঝে মাঝে দেওয়া সত্ত্বেও, বুঝিতে পারিবেন না।

৩। ভক্ত-বাণী—শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপাপ্রাপ্ত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথির লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহোদয়ের পত্রাবলী, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায় বর্ম্মণ ও শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্কলন করিয়াছেন। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই পুস্তকের লভ্যাংশের কতক লেখকের জীবিত কাল পর্য্যন্ত সেবায় ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সঙ্ঘের ভক্ত জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমার স্মৃতি মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হইবে।

৪। কবির স্বপ্ন—শ্রীরাধাচরণ দাস প্রণীত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

৫। Reflections on Woman—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে, অভিমত ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের লভ্যাংশ শ্রীশ্রীগৌরীমাতা প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্য কল্পে প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করিয়া ভক্তগণ আনন্দলাভ করিবেন, স্বদেশ হিতৈষী প্রেরণা পাইবেন এবং পণ্ডিতগণ বহু চিন্তার বিষয় খুঁজিয়া পাইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

সংবাদ ও মন্তব্য

১। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী শিক্ষা ও সারদা মন্দিরের কার্য্য বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী মহারাজ ইহার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রীভগবানের শুভাশীষ স্মরণ করিয়া আমরা বিদ্যালয়ের ১৯১৯ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসরের কার্য্যবিবরণী সহৃদয় দেশবাসী সমীপে উপস্থাপিত করিতেছি। এই পূতপুণ্য অনুষ্ঠানটী যে এত দিনে দেশের ও জাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এবং জাতীয় জীবনের মাঙ্গলিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মঙ্গলময় অন্যতমের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, এই সাফল্যের সূচনায় সর্ব্বসিদ্ধিদাতার চরণে প্রণত হইতেছি।

"গুরুগতপ্রাণা পরম বিদুষী সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার শ্রীগুরুর

পদপ্রান্তে আজীবন অপূর্ব্ব ত্যাগ ও তপস্যায় যে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের পূজার্হা হইয়াছেন এবং যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাধনাবলে তদ্ভাবভাবিতা হইয়া ভারতের সনাতন আদর্শানুযায়ী নারী-জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি বর্ত্তমান দেশকালানুযায়ী কি উপায় এবং পদ্ধতি অবলম্বনে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন—সেই শিক্ষা ও সাধনারই সিদ্ধির ফলস্বরূপ, ভারতের নারীজীবনের কল্যাণার্থ, এই বিদ্যামন্দিরের উদ্বোধন।

"সঙ্কল্পিত বিদ্যালয়ের কথা-প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ স্বামিজী একদিন সিষ্টার নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন—'তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহা আমি করিতে পারি না। কারণ, আমি তোমাকে ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত—আমি যতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ততটা অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে করি। অন্যান্য ধর্ম্মে এবং আমাদের ধর্ম্মে এইটুকুই প্রভেদ। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত; আমরাও তাহা করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, অপরেও সেইরূপ ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইতে পারে; তিনিও যতটা অনুপ্রাণিত আমিও ততটা অনুপ্রাণিত, আর তুমিও আমারই মত অনুপ্রাণিত; আবার তোমার পরে তোমার বালিকারা ও তাহাদের শিষ্যাগণও তদ্রূপ হইবে। সুতরাং তুমি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে সাহায্য করিব।'

"বিদ্যামন্দিরের শুভ সঙ্কল্পে জগৎপূজ্য স্বামিজীর এই আশীর্ব্বাদ পাঠকগণকে উপহার দিয়া তাঁহার আশ্বাসবাণী—

"'এই মুহূর্ত্তে শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অনুষ্ঠানটী ঠিক ঠিক ভাবে সঙ্কল্প করা হয়। কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দোষ হইলে উপায়-উপকরণ জুটিবেই জুটিবে।'

"—আজ বহু বৎসর পরে বিদ্যালয়ের সাফল্যের দিনে উহা স্মরণ করিয়া ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। এবং লোকহিত কামনায় নিষ্কাম তপস্যালব্ধ শক্তিতে শক্তিশালিনী বিদ্যা-

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রীর প্রতি আমাদের সমবেত হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

"স্ত্রীজাতির জীবন ও সামজিক অধিকার সম্বন্ধে সকল কথা রমণীগণের দ্বারাই নিরূপিত হওয়াই উচিত—কারণ, তাঁহাদিগের ন্যায্য অভাব ও আকাঙ্ক্ষা যথাযর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেকস্থলে নিঃস্বার্থ পুরুষগণেরও সামর্থ্যে কুলায় না। অতএব বৈদিকযুগে রমণীদিগকে পুরুষের ন্যায় যেরূপ সমভাবে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত, এখনও ঐরূপ করিয়া অন্য সকল বিষয়ে আমাদিগের নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। উহাতে সুশিক্ষিতা স্বার্থপরিশূন্যা মহিলামণ্ডলী, সীতা-সাবিত্রীপ্রমুখ ভারতের জাতীয় রমণী-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নারীজীবন নিয়মিত করিবার বর্ত্তমান যুগোপযোগী নিয়মাবলী নিরূপণপূর্ব্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।

"আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের এই নিয়োগই মুখ্যভাবে এই নারীশিক্ষামন্দিরের অবলম্বন। বর্ত্তমানে নারীজীবন সমস্যার দেশব্যাপী আন্দোলনের দিনে আমরা সমাজহিতকামী মনীষিবৃন্দের দৃষ্টি আচার্য্যের মীমাংসাটীর প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদিগকে আচার্য্যের এই মীমাংসা এবং উহার পরীক্ষাক্ষেত্র এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া উহাকে আরো পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

"'অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।' ঐ কথা অন্য প্রকারে এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে—'মানবের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনিশ্চ প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখন জ্ঞানী বা শক্তিমান হইতে পারিত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায় সকল তাহার অন্তরে কোন জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু যে সকল আবরণ তাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও শক্তিপ্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, সেই সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে।

ঐ আবরণ সমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত-সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তুলে। অতএব ঐ আবরণ সমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায়সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।'

"আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাদর্শ ভারতেরই সনাতন শিক্ষাদর্শ। ভারতের আচার্য্যকুল এই একই আদর্শের প্রচার যুগে যুগে করিয়া গিয়াছেন। আলোকের মত উহা চিরপুরাতন নিত্যনূতন। ভারতের শ্রেষ্ঠ যুগ সমূহের প্রকাশ এই শিক্ষাদর্শের অনুসরণেই হইয়াছে। আর অবনতি এই আলোকেরই অভাবে। বর্ত্তমান ভারত বহু বিরুদ্ধতার সংঘাত সহিয়া শিক্ষানামধেয় বহু নিরর্থক নিরাশ সাধনার গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়া আজ প্রাচীনের আহ্বানে নিষ্কৃতির পথে চলিয়াছে। ভারতের এই নবযুগের সূচনার প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্যতম এই বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী প্রকাশাবসরে আমরা সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টা এই শিক্ষাদর্শের আলোকেই অনুষ্ঠিত হইতে আহ্বান করিতেছি।

"এই আদর্শ সর্ব্বথা অবিকৃত রাখিয়া আমরা দেখিতে পাই, এই বিদ্যামন্দিরের পরিচালিকাগণ বর্ত্তমানযুগের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালী ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শের সহিত অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করিয়া নবভাবে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে অদৃষ্টপূর্ব্ব নবীন অনুরাগ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। ত্যাগ, তপস্যা, সংযম এবং পরহিতে জীবনোৎসর্গব্রত স্বয়ং অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহারা তাহাদিগকে বৈদিকযুগের ব্রহ্মচারিণীদিগের ন্যায় উন্নতচরিত্রা হইতে একদিকে যেমন শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে সেইরূপ সামাজিক মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম অটুট রাখিয়া যাহাতে তাহারা আবশ্যক হইলে আপনার ভার আপনি বহিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদ্রূপ কার্য্য ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মনিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন। বিদ্যালয়ের এই বিংশতী বর্ষব্যাপী শিক্ষার ফলে সহস্রেরও অধিকসংখ্যক বালিকাজীবন উচ্চাদর্শে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, পঞ্চশতাধিক অন্তঃপুরচারিণী

মহিলা এই মন্দিরে সমাগতা হইয়া প্রকৃত শিক্ষালাভে ধন্যা হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে অন্যত্র শিক্ষয়িত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া নিজ আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে এবং অপরকে তদনুরূপ শিক্ষাপ্রদানে সমর্থা হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ এই শিক্ষামন্দিরেই এবং বালী ও কুমিল্লাস্থ শাখাবিদ্যালয় দ্বয়ে ঐ পদ গ্রহণপূর্ব্বক পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই শিক্ষানুষ্ঠানের আদর্শে অন্যত্র বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা বহু স্থান হইতে আবেদনপত্রাদি পাইতেছি। তন্মধ্যে কলিকাতার সন্নিকট বালীগ্রামে ঐরূপ একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া উহা তত্রত্য বালিকাগণকে উক্ত আদর্শে শিক্ষাদান করিতেছে। এবং বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা সহরে ঐরূপ আর একটী শাখা বিদ্যালয় জনৈক বন্ধুর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি উহা উক্ত আদর্শানুরূপ শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

"যে বিদ্যামন্দির এইরূপে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের জীবন মহিমান্বিত করিতে এতকাল ধরিয়া সচেষ্ট রহিয়াছে, জটিল জীবিকাসমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যাহা অনেকগুলি দরিদ্রা কুলকামিনীর প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে—এবং আপনারও অপরের যথার্থ উন্নতিসাধনে ব্রতী করিয়া ঐ পথের সকল বাধাবিঘ্নকে কঠোর ধৈর্য্য ও সংযম সহায়ে জয় করিতে যাহা ছাত্রীগণকে সমর্থা করিয়াছে—তাহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতে আমরা অদ্য সকল নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। হে পাঠক, ৺ভগবতীর সাক্ষাৎ প্রতিমাস্বরূপ মাতা, ভগিনী, জায়া ও দুহিতা প্রভৃতি আত্মীয়া রমণীগণের নিকটে যে স্নেহ, আদর, প্রেম ও সেবা আজীবন লাভ করিয়াছ এবং করিতেছ, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে নারীজাতির উন্নতিসাধনে অগ্রসর হও। হে পাঠিকা, শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধান যদি তোমাকে ধনজন-সম্পদে ভূষিতা করিয়া থাকে, তবে দেশের, দশের এবং নিজ জাতির কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া এই কার্য্যের সহায়তায় তৎপর হও। উপযুক্ত ভবনে এই শিক্ষামন্দির স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। বাগবাজার, বসুপাড়া পল্লীতে ৫নং নিবেদিতা লেনে এই শিক্ষামন্দির চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত বাড়ী-নির্ম্মাণ কার্য্য আমরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু উপস্থিত অর্থাভাবে উক্ত বাড়ীর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র তৈয়ারী করিয়াই নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। হে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তোমাদিগের সহানুভূতি ও

বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়াই এই নূতন মন্দির-বাটী প্রশস্তায়তনে এবং বিপুল ব্যয়ভার সত্ত্বেও প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইয়াছি। দেশ কাল এবং পাত্রের উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া যাহা দান করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক দান; এবং অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদানের বিশেষ মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সাত্ত্বিকদানের শুভাবসর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমরা আজ তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান—যাহার যথাশক্তি প্রদানপূর্ব্বক অশেষ পুণ্যসঞ্চয়ে ধন্য হও, কৃতার্থ হও। জানিও এই শুভানুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে তোমরা যাহা প্রদান করিবে, তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া সামাজিক কল্যাণরূপে তোমরা অচিরে ফিরিয়া পাইবে। পরমকারুণিক শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা তিনি দাতা এবং গৃহীতা—আমাদিগের উভয়ের অন্তরে এই শিক্ষানুষ্ঠান সম্বন্ধে নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করুন।"

শিক্ষানুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে যাঁহার দেয় নিম্নঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে—

(১) প্রেসিডেন্ট—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় পোঃ হাবড়া জিলা।

(২) সেক্রেটারী—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন,
উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা।

২। "বীরবাণী" হইতে আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হইবে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাদিগকে স্বর্ণ রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হইবে।

যাঁহারা এই প্রতিযোগীতা যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বিশেষ বিবরণ শ্রীপরেশনাথ সেনের নিকট বিবেকানন্দ সোসাইটী ভবনে ৭৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, সন্ধ্যা ৬৷৷ হইতে ৭৷৷ টার মধ্যে অবগত হইবেন।

৩। উদ্বোধন গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকট নিবেদন এই যে, আগামী মাঘ হইতে উদ্বোধনের নববর্ষ আরম্ভ হইবে। তাঁহারা তৎপূর্ব্বেই উদ্বোধনের বার্ষিক মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। নচেৎ মাঘের উদ্বোধন তাঁহাদের নিকট আমাদিগকে ভি, পি, তে পাঠাইতে হইবে এবং তাঁহারা উহা ফেরৎ দিলে আমাদিগকে যথেষ্ট ক্ষতি-গ্রস্থ হইতে হয়।

মাতৃ পূজা

(স্বামী অসিতানন্দ)

'চল্ সবে চল্' মহাশূন্যে ধ্বনিছে আহ্বান আয় আয়
জীবনের মহারণে হেরে পরাজিত, শান্তির আশায়
ক্ষেপিতেছ ব্যর্থক্ষণগুলি, তরী খানি আনি কিনারায়
কাহার ভাসিয়া গেছে, হর্ষে ধরণীর সুখের মেলায়
কার গীতি গেছে থেমে, কার বীণা খানি গিয়াছে ছিঁড়িয়ে
আকাশের সুবিশাল বুকের উপরে পড়েছে ঘুমায়ে
সুর তার রনিয়া রনিয়া 'আয় তোরা আয়রে চলিয়া'
সুমধুর আবাহন আজ ডেকে যায় ফিরিয়া ফিরিয়া ॥
চলে দলে দলে আনন্দের আবাহনে উতলা সকলে
অবসর খোঁজা হলো যার শুভক্ষণে তাহারে লভিলে
কোথা থাকে তর্ক যুক্তি তার বারে বারে করিয়া বিচার
কেহ নাহি দেখে আর কভু একেবারে করি আপনার
তাহারে বরণ করি লয়, ঘুচে যায় সকল সংশয়
দিক্‌হারা বিশ্বাস সাগরে চিরতরে নিমজ্জিত রয় ॥
মা এসেছে ওরে বরাভয় দুই হস্তে আনিয়াছে ভোরে
দিশে হারা নাহি হব আর মোহাচ্ছন্ন জীবনের ঘোরে
দণ্ডদাত্রী জননী এ নহে, সুধু মাতা স্নেহ ধারা দিয়ে
সন্তানের সব ধূলি ম'লা চিরতরে ফেলেন ধুইয়ে
মন্দিরেতে প্রকাশ তাঁহার, জীবনের যত কিছু ভার
আয় ভাই দিয়ে আসি সবে, শ্রীচরণ কমলে তাঁহার।

তাই আজ সব ভুলে গিয়ে মহানন্দে আসিয়াছে সবে
জননীর শ্রীমন্দির দ্বারে আনন্দের বিশাল উৎসবে
হাজার হাজার জনগণ পরিপূর্ণ অঙ্গন মাঝার
উদ্‌গ্রীব আকুল হেরিবারে প্রীতিভরা মুখ খানি যার
দাও পথ ছাড়ি নয়ন সার্থক করি নেহারি জননী
ঘুচে যাক জনমের খেদ, ভোর হক মোহের রজনী।
এতদিন ক্ষুধাতুর প্রাণ যার আশে আছিল বসিয়া
সে এসেছে সে এসেছে আজি সব ক্ষুধা যাবেরে মিটিয়া।
ভাবময় ওই তনু তার মন্দিরের মাঝারে উদিত
তাই আজ এত ছুটাছুটি তাই আজ মিলেছে ক্ষুধিত
অবসন্ন জীবনের ভার দিব রাখি চরণ কমলে
নিশ্চিন্ত নির্ভয় হব মোরা মুক্ত হব কঠিন শৃঙ্খলে।
সুবিশাল মন্দির মায়ের সুগঠিত সমুন্নত শির
উড়িতেছে বিজয় নিশান মহাবার্ত্তা ঘোষিতে অধীর
আয় আয় কেরে অপরাধী সঙ্কুচিত কেরে পরাধীন
মহাশক্তি সাগরের তীরে বালবৃদ্ধ আয়রে প্রবীন
এখানে আসিলে ঘুচে ভয় এই স্থানে নাহিক সংশয়,
বন্ধনের নাহিক বেদনা নিত্য মুক্ত স্বাধীন হৃদয়।
মন্দিরের দুয়ারে কাষায় বসন পরি কে এ যতীশ্বর
করুণায় ঢল ঢল আঁখি নাহি তার শত্রু মিত্র পর
ঘর তার হয়ে গেছে ভাঙ্গা ঘর তাই নিখিল ভিতরে
আপনারে সবারে বিলাল পর তাই রহে তারে ঘিরে
কেহে তুমি সৃষ্টি ছাড়া রীতি! কেগো তুমি বিশ্বব্যাপী প্রাণ!
আপনার বিচিত্র গতিতে চলিতেছে আপনি মহান?
বাসুকীর মত নিশিদিন ধরেছিলে মার আজ্ঞা শিরে
হে অটল অচল বিশ্বাসী পশ্চাতে হেরনি কভু ফিরে
গুরুআজ্ঞা শুধু গেছ পালি নিশিদিন রামানুজ সম
বিচারের রুদ্ধ করি দ্বার হে আচার্য্য বিজ্ঞ বিজ্ঞতম।

সে অদ্ভুত সেবার-সাহস অভিনব ধরণীর মাঝে
জননীর আদরের ছেলে যোগ্যতম যোগ্যের সমাজে
জীবনের দীর্ঘ বর্ষগুলি একতিল কর নাই ক্ষয়
তিলে তিলে আপনা বিলান মানবের কভু সাধ্য নয়
করিয়াছ মন্দির রচনা জননীর হে শ্রেষ্ঠ তনয়
জননীর আবির্ভাব তাই রবে বল কেমনে সংশয়
হৃদয়ের অনুরাগ ফুলে পূজিয়াছ মায়ের চরণ
মাকি কভু থাকে আর ভুলে মা যে কভু নহেগো তেমন।
ওই তাঁর দিব্য আবির্ভাব ওই তার মৃদুমন্দ হাসি
ওই তাঁর আশীর্ব্বাদ আসে প্রতি শির যায়রে পরাশি
দীক্ষা দাও মায়ের সাধনে মাতৃ যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত
মার কার্য্যে সঁপিব জীবন চিত্ত করি পায়ে অবহিত।
শত শত আসে দলে দলে পড়ে লুটে চরণের তলে
'দাও স্থান দাও স্থান আজি ওঅভয় চরণ কমলে';
'নাহি ভয় নাহি ভয় ওরে মার নামে কে হলো পাগল
উঠ উঠ হে নব দীক্ষিত মার কোল তোদের সম্বল
কার কিবা আছে প্রয়োজন বর হস্ত করি প্রসারণ
দুই হস্তে দিবেন ভরিয়া আমি মাত্র নিমিত্ত কারণ;
মার নামে সবে অধিকারী মার নাম মঙ্গল সহায়
ভারতের স্মরণীয় দিনে সুরু হলো নবীন পর্য্যায়।'
সহসা উঠিল বাজি গম্ভীরে দামামা বাজিতেছে বাঁশী
মাতৃ পূজা ওই হলো সুরু ঢাল তায়ে কুসুমের রাশী
অন্ন দাও বস্ত্র দাও যার যাহা চাই দাও ভক্তি জ্ঞান
সুদিনের হলো সুপ্রভাত দুঃখ নিশা হলো অবসান॥

নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা

৩

উৎসবশেষে

আসল দিন কাটিয়া গিয়াছে—মায়ের দয়ায় অসম্ভব সম্ভব অলীক বাস্তব হইয়াছে। চিন্তা-উদ্বেগ যথেষ্টই থাকিবার কথা—কিন্তু তাঁহার কাজ তিনিই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন। এতদিন যাঁহার মনের উপর ভাবনার ভীষণ বোঝা চাপিয়াছিল, তিনি আজ পরম শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য পাইলেন। 'তুকুড়ি সাতের খেলা' হইয়া গেলে খেলুড়ে যেমন নিশ্চিন্তমনে ক্রীড়াবিশেষে রত থাকিতে পারেন—অতঃপর সেইভাবেই উৎসববের খেলা চলিতে লাগিল।

শুক্রবার ৭ই বৈশাখ। গতকল্যকার জের আজও কতকটা চলিল। অদ্য দিবারাত্রে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইলেন। বেলা আন্দাজ তিনটার সময় যখন পংক্তিভোজন পুরাদমে চলিতেছিল, তখন হঠাৎ ঈশানকোণে ঘনঘটা হইয়া একটী বড় গোছের ঝড় তুলিল। ক্রমে অবিরত ধারাপাত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দামিনী 'চমকিল'। অর্দ্ধেক-অসমাপ্ত অন্ন হাতে লইয়া খোলা জায়গা হইতে ছাউনীর ভিতর অনেককেই উঠিয়া যাইতে হইল—কর্ম্মীরা জলঝড়ে ভিজিয়াই পরিবেশন চালাইলেন। এই অসুবিধা ছাড়া মোটের উপর গতকল্যকার অত্যধিক পরিশ্রম ও গরমের পর অদ্যকার এই বারিপাত খুবই আনন্দ দিল ও বিশেষ শান্তি-সোয়াস্তির কারণ হইল। শুষ্কভূমি, নীরস তরু ও কর্ম্মীর ক্লান্তকায়া এই সেচনের ফলে সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

এ অঞ্চলের লোক যে বেশ 'খাইয়ে' তাহার একটী প্রমাণ আজ চক্ষের সমক্ষে পাওয়া গেল। একজন প্রায় পঞ্চাশবৎসরের প্রৌঢ় বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়াই নির্বিকারচিত্তে খাইতে লাগিলেন। বলিলেন —বাবু, আমাকে বহুদূরে যেতে হবেক শীঘ্র যা দিবার 'দি' যাও—এই

বলিয়া প্রচুর তরকারী ও অন্যান্য উপকরণাদিসহ একটী ছোট বাল্‌তির এক বাল্‌তি অন্নপ্রসাদ নিঃশেষ করিলেন—বড় ক্ষুধা তাঁহার। শেষে পরিতুষ্ট দেখিয়া আনন্দ হইল।

আজ সর্ব্বশুদ্ধ বাইশজন আচার্য্যের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইলেন। যাঁহাদের কাজকর্ম্মের বিশেষ তাড়া ছিল তাঁহারা অদ্যই গন্তব্যস্থানাভিমুখে রওনা হইলেন। আরামবাগ ও বিষ্ণুপুরের ভক্তেরা নিজ নিজ স্থানে যাত্রা করিলেন—কারণ দূরাগত ভ্রাতৃবৃন্দের তাঁহারাই আশ্রয়। সন্ধ্যার পর আরাত্রিক নিত্য ভজনাদি সমাপনান্তে ভক্তবৃন্দ একজোট হইয়া শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ঘনঘন করতালির সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্বরে নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। 'মা আছেন আর আমি আছি ভাব্‌না কি আছে আমার'—মরমের ভাষা প্রাণের ভাব— 'ভুলে থাকি তবু দেখি, ভুলেও না মা একটীবার, স্নেহের আধার মা যে আমার, আমি যে মা'র মা আমার'।

রাত্র বারটার পর এক বিপত্তি। আমাদের কলসীর জল ফুরাইয়া যাওয়াতে পাত্‌কো-তলায় কি কুক্ষণেই না জল ভরিতে গিয়াছিলাম! কপিকল সংলগ্ন একটী লোহার ডাণ্ডা বন্‌-বন্‌ করিয়া ঘুরিতে থাকে। তাহারই সহিত বেকায়দায় মাথাঠোকাঠুকি হইল। তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া ছিট্‌কাইয়া ধরাশায়ী হইতে হইল। ফাঁড়া অল্পের উপরই কাটিয়া গেল। ঐরূপ অবস্থায় চোখ পর্য্যন্ত ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার কথা। কিয়ৎক্ষণ পরে মাথায় হাত দিয়া 'খুনখারাপী রঙ' পাওয়া গেল। যাহা হউক পট্টি বাঁধিয়া কোনরূপে কালীঘরে গিয়া শয্যা লইলাম। এই কলে কয়দিনে অনেকেই জখম হইয়াছেন।

আজ রাত্র প্রায় তিনটার সময় নিস্তব্ধ নিভৃত মন্দিরে ব্রহ্মচর্য্যের হোমকুণ্ডে ও বিরজার প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞানলে আচার্য্যের কৃপায় আট জন ব্রহ্মচর্য্য ও এগার জন সন্ন্যাস লাভে জন্মসার্থক করিলেন। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। শ্রীস্বামিজী যাঁহাদের চাহিয়াছিলেন, ইঁহারা সেই 'অভীঃ'রই দল—'Purest freshest flowers at the altar of God!' আজ ইঁহারা মায়ের রাঙাচরণে শরণ লইলেন।

এই চির-অনুগত সন্তানদিগের জীবন-কমলই অত্র অনুষ্ঠিত শক্তিপূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—যোগ্য নিবেদন।

শনিবার ৮ই। প্রত্যুষে উঠিয়া আমোদরতীরে যাইবার সময় গুরু-গম্ভীর স্বরে ঐক্যতানে মন্দিরের ভিতর হইতে অবিরাম 'স্বাহা' 'স্বাহা'রব উচ্চারিত হইতেছে শুনা গেল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মহামন্ত্রের স্বর্গীয় ঝঙ্কার। দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী বাঙ্গলার যুবকবৃন্দ বিরজার যজ্ঞকুণ্ডে আপনাদের সর্ব্বস্ব আহুতি দিতেছেন—মান অভিমান, কামক্রোধ লোভাদি ষড়রিপু প্রভৃতি যাহা কিছু। সন্ন্যাস চূড়ান্ত আত্মাহুতি। তাঁহাদের শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি—অঙ্গে ভিখারীর গৈরিক বস্ত্র, কণ্ঠে সর্ব্বজীবে 'অভীঃ' বাণী মৈত্রীমন্ত্র। আচার্য্যের অনাবিল আশীর্ব্বাদের পূত ধারায় তাঁহারা সদ্যোস্নাত নবজাত তেজোদৃপ্ত দিব্যমানব।

আজও পূজা-অর্চ্চনায় কাটিল। দ্বিপ্রহরে ঘটে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীমাতার আবাহন ও পূজা হইল। সাতজনের দীক্ষালাভ। রাত্র ১১ টার পর কালীপূজা ও চারিজনের তন্ত্রোক্ত পূর্ণাভিষেক। ভক্তসংখ্যা ক্রমশঃ দুই শত হইতে কমিতে লাগিল।

পরদিন রবিবার বিশেষভাবে সংখ্যার হ্রাস অনুভূত হয়। ১০ই আচার্য্য ও তাঁহার সহিত অনেকে প্রতিষ্ঠাব্রত সাঙ্গ করিয়া তথা হইতে শ্রীধাম কামারপুকুরে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন। তাহার পর কোয়ালপাড়া মঠে তিন দিন, আবার বিষ্ণুপুরে দিন দুই যাপন করেন। শেষোক্ত দুই স্থানে অনেকেই তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হন। বহুদিন যাঁহারা আশাপথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের শুভকামনা সফল হইল। কোয়ালপাড়ায় কুড়ি জন ও বিষ্ণুপুরে দশজন দীক্ষালাভে ধন্য হন।

বাঁকুড়ার মঠে আচার্য্য

স্বামী মহেশ্বরানন্দজী প্রমুখ বাঁকুড়ার সাধুবৃন্দের আচার্য্যকে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে লইয়া যাইয়া দুই একটী মাঙ্গলিক কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া লইবার একান্ত ইচ্ছা সফল হইল। বহু ভক্তের সহিত তিনি তথায় যাইয়া

পাঁচদিন অতিবাহিত করিলেন। সেখানে ক্ষুদ্রাকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নব-নির্ম্মিত মন্দির গৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইল। সেবকদিগের ঐকান্তিক যত্ন ও পরম আগ্রহের কথা সকলেই বলিয়াছেন। আশ্রমের ফাঁকা বেষ্টনীর শান্ত শীতল বায়ু ও সুন্দর অবস্থিতির প্রশংসা আচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি। এখানেও সর্ব্বশুদ্ধ তেত্রিশ জনকে তিনি কৃপা করেন।

সর্ব্বশেষে ১৯শে বৈশাখ এখান হইতে যাত্রা করিয়া ২০শে বৃহস্পতিবার সকালে তিনি কলিকাতায় পৌছান।

প্রত্যাবর্ত্তন

আমরা কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই একটী নাতিদীর্ঘ দল গড়িয়া ৮ই বৈশাখ প্রাতঃকালেই জয়রামবাটী হইতে বিদায় লই। তথা হইতে কামারপুকুরে পৌছিলাম। সারাদিন সেথায় অবস্থান ও দর্শনাদি করিয়া এবারকার তীর্থ-পরিক্রমা সমাপ্ত করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম ও বাললীলার কেন্দ্রস্থল পুণ্যক্ষেত্র কামারপুকুর ভক্তমনের মথুরাধাম।

ঠাকুরের বাটী ও বৈঠকখানাগৃহ ভক্তসমাগমে মুখরিত হইয়া উঠিল। বেলা বারটা পর্য্যন্ত সেদিন অবিরাম নামগান ও সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল—'কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে'—'জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম। জয় কামারপুকুর, জয় জয় রঘুবীর চিন্ময় চেতন শালগ্রাম।'—'রামকৃষ্ণ চরণ-সরোজে মজ রে মন মধুপ মোর'—'ভবসাগরতারণ কারণ হে'—ইত্যাদি। ভাবভক্তিতে সকলেই ভরপূর। আমাদের পরম পূজ্যপাদ দাদামণির (শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায়) আদর-আপ্যায়নে সকলেই বিশেষ পরিতুষ্ট অনুগৃহীত হইলেন। চারিধারে হাসির 'গর্‌রা' ছুটিল।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে বামদিকেই বেষ্টিত ভূখণ্ড শ্রীশ্রীদেবের জন্ম-স্থান। ভক্তেরা সকলে সেই পবিত্র রজে মাথা লুটাইলেন। পুরাতন গৃহদেবতা ৺রঘুবীর, শীতলা মাতা ও শিবঠাকুর রহিয়াছেন। দর্শনে সকলেই পরমপ্রীত। এখানকার আকাশ বাতাস বৃক্ষলতাগুল্ম প্রান্তর তড়াগ, ঘরদোর ইত্যাদি সবই তাঁহার স্মৃতি স্মরণে আনিয়া দেয়। শ্রীঈশার জন্মস্থল দেখিয়া ভক্ত যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই মনে পড়ে—

'Hush! it's the Lord everywhere' চুপ্—চারিধারেই প্রভু রহিয়াছেন।

দাদামণি সেদিন আমাদের প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশজনকে শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রচুর অন্ন প্রসাদাদিতে পরিতৃপ্ত করিলেন। এখানকার অপূর্ব্ব কলাইয়ের ডাল, মিঠাই ও বোঁদের স্বাদ এখনও মুখে লাগিয়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাটী এবং কামারপুকুর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার কোন প্রয়োজন এখানে নাই। 'লীলাপ্রসঙ্গে' অনুসন্ধিৎসু পাঠক সকল জিনিষেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাইয়াছেন। তবে মাণিকরাজার বিস্তৃত আম্রকানন, ভূতিরখাল, হালদারপুকুর ইত্যাদি পুষ্করিণী, দেবমন্দির, জমিদার লাহাবাবুদের ভগ্ন রাসমঞ্চ ও জীর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকার অবশেষ ও সর্ব্বোপরি পল্লীপ্রকৃতির মনোরম রূপ দেখিয়া অন্তরে বেশ বুঝা গেল যে শ্রীভগবানের ইহাই উপযুক্ত আবির্ভাব-স্থান বটে। গ্রামের যে এককালে খুব সমৃদ্ধি ছিল তাহা আজিকার কঙ্কাল হইতে বেশ সুস্পষ্ট। এখানকার স্থানীয় অনেকে দুঃখ করিতে লাগিলেন—মশায়, জয়রামবাটীতে অমন একটী বড় মন্দির হ'লো, আমাদের এখানে আদিস্থানে কিছু হবে 'নি'?

বৈকালে কামারপুকুর ছাড়িয়া আরামবাগের পথ লইলাম। এই পথে উল্লেখযোগ্য অনেক জায়গা পড়ে। শৈলেশ্বরের শিবমন্দির, গড়-মান্দারণ, গাজীপীরের আস্তানা, মোগলমারীর যুদ্ধক্ষেত্র, উড়িয়া মরদান ফটক, গোঘাটগ্রামের জাগ্রত ধর্ম্মঠাকুর, রাণী অহল্যাবাঈ-নির্ম্মিত ৺কাশী যাইবার পাকারাস্তা ইত্যাদি। বাহুল্য ভয়ে এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ প্রদানে বিরত হইলাম। দীর্ঘ ১৩ মাইল হাঁটিতে হইল। সকলেই বিশেষ ক্লান্ত। অনেকেরই কিছু কিছু বোঝা ছিল। তন্মধ্যে একজনের একটী ট্রাঙ্ক থাকাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট হয়। পথে মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইতে হইল। কামারপুকুরেরই ঠিক পরবর্ত্তী গোঘাটগ্রামের থানার নিকট পৌছিলে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসে—থানার কর্ম্মচারী জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগকে তৃষ্ণার জল, পাণ, ধূম ইত্যাদি প্রদান করিয়া যথেষ্ট আরামের সুবিধা করিয়া দিলেন এবং বলিলেন বৃষ্টি পড়িলে

আমরা যেন ফিরিয়া তাঁহারই আস্তানায় উঠি। কিন্তু তাহা করিতে হয় নাই। দারুণ গ্রীষ্মে উৎসবক্ষেত্রে অতগুলি লোকের মধ্যে কাহাকেও বিসূচিকাদি রোগে ভুগিতে হয় নাই—ইহা শুনিয়া তাঁহারা খুবই বিস্মিত হইলেন। মা'ই সকল সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছেন।

পথে চলিতে চলিতে তারকেশ্বর হইতে দুই জন যুবক শ্রীমন্দির দর্শন-মানসে বরাবর পায়ে চলিয়া আসিতেছেন দেখিলাম। কিঞ্চিৎ দেরী হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত। ব্যগ্র উৎসুক যাত্রী।

যাহা হউক, আমরা ক্রমে রাত্রি আটটার সময় বালুভরা তারকেশ্বর পার হইয়া আরামবাগে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় তাঁহার সহৃদয়-ব্যবহার আদর যত্নে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া রাত্রে ১১টার সময় পাঁচখানি গরুর গাড়ী করিয়া দশজনে চাঁপাডাঙ্গার রেলষ্টেশন-পথে 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া যাত্রা করিলাম। ডাক্তার বাবু ও এখানকার উকীল শ্রীযুত মণীন্দ্র বসু—ইহারা বাস্তবিকই মায়ের দ্বারী। দিনের পর দিন গমন-প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধাভালবাসা দিয়া ইঁহারা সাধুভক্তদের সেবাস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন—এই পথের সকল যাত্রীর মুখেই ইঁহাদের সুখ্যাতি শুনিয়াছি।

খুব আরামে দুইজন করিয়া এক এক গাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া সকালে আটটার সময় আমরা চাঁপাডাঙ্গায় পৌঁছিলাম। পথে পূজ্যপাদ শ্রীপ্রেমানন্দ/মহারাজের জন্মস্থল আঁটপুর পড়িল। প্রণাম করিলাম। ৯ই বৈশাখ রবিবার বেলা ১টার সময় উৎসবযাত্রা শেষ করিয়া কলিকাতায় আসা গেল। হাওড়া তেলকল ষ্টেশনে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই মন উপরের এক ভাবরাজ্য হইতে সহসা নীচে নামিয়া আসিল—ইহা অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব হইল।

শেষকথা

কিন্তু যাঁহার স্মৃতিরক্ষার বিরাট উৎসব-উদ্যোগ সুসম্পন্ন হইয়া গেল তাঁহার জীবনের মূলতত্ত্ব কোথায়—সার্থকতা কোথা অর্থ কি উদ্দেশ্য কি ?

নবীন বাঙ্গলা! তুমি আজ একান্ত অধীর হইয়াছ। তোমার নারী-জীবনের আদর্শ ও সাফল্য কোথা তাহা নানাপ্রকার বিতণ্ডাজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ কেন? জীবন্ত আদর্শকে চোখ চাহিয়া দেখিবে না? মহামায়া সমগ্র ভারতের মাতৃশক্তির ভাবঘনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতারের লীলাপুষ্টির জন্য নবযুগে শ্রীসারদারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার আচণ্ডালে অকাতরে কৃপা বিতরণ করিয়া তিনি স্থূলদেহের চরমকার্য্য সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সিদ্ধমন্ত্র আজিও তোমার নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে সকালসন্ধ্যা সাধিত হইতেছে—সে শক্তি এখনও তোমার কল্যাণের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে। তোমার দেশ চিরকালই শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন পরিপুষ্টি ও সংসিদ্ধির জন্য বিশেষ বিখ্যাত—"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা। মৈথিলৈঃ প্রকটীকৃতাঃ॥ কচিৎ কচিন্ মহারাষ্ট্রে। গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা॥" গৌড়-বঙ্গই শক্তিপূজার আদিস্থান—মিথিলা মহারাষ্ট্র গুর্জ্জর সকলেই এখান হইতে ঐ ভাব পাইয়াছেন।

কালচক্রে পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। আজ আবার বঙ্গপল্লীর বক্ষের উপর নূতন শক্তিপীঠ স্থাপিত হইল। বামাচারের অন্ধযুগে তুমি নারীশক্তির যে পাশবিক অবমাননা করিয়া দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছিয়াছিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার যথাযথ কাল উপস্থিত। তোমার চক্ষের সমক্ষে জননীজীবন সহস্রদল কমলের ন্যায় দশদিক সৌরভে পরিপূর্ণ করিয়া বাঙ্গলার তপোবনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন উঁহার সার্থকতা যথাযথ বুঝিয়াছিলে কি? 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' পূর্ণ-ব্রহ্মচর্য্যের ভাবঘনমূর্ত্তি শ্রীসারদা। বাহিরে কোন আড়ম্বর বেশ বিভূতি নাই—সবই সহজ সরল। তাঁহাকে পূজা করার অর্থ পবিত্রতাকে পূজা করা।

সেই শ্রীরামকৃষ্ণময় জীবনের প্রাণস্পন্দন কোথায়? কঠোর তপঃনিষ্ঠায়, ঐকান্তিক ভগবদনুরাগে, অভূতপূর্ব্ব সংযমে, অসাধারণ মাত্রাজ্ঞানে, নিত্য নিয়মানুবর্ত্তিতায়, সর্ব্বকর্ম্মের সুশৃঙ্খলায়—আর সর্ব্বোপরি তিল তিল করিয়া প্রতি নিমেষে আত্মদানে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে

চিরদিন শয্যাত্যাগ, প্রাতঃস্নান, দেবপূজা, স্বহস্তে অন্নরন্ধন ও পরিজনে বিতরণ, উচ্চনীচ সকলের প্রতি সমকরুণা—ইত্যাদি ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। লোকলোচনের অন্তরালে, কোলাহলের বাহিরে অবস্থিত আপনার নিভৃত নির্জ্জন পল্লী চিরদিনই তাঁহার পরমপ্রিয় ছিল। একদিকে কোমল করুণামূর্ত্তিতে সহাস্যাননে ধরিত্রীর ন্যায় নীরবে সকল অসুবিধা সহ্য করিয়াছেন, শোকার্ত্তকে আশ্বাস নিরাশকে প্রবোধ দিয়াছেন—আবার প্রয়োজন হইলে শাসনের বজ্র-কঠোরতায়, অসত্যের প্রতি নির্ম্মমতায় সকল প্রাণে চমক আনিয়াছেন। আশ্রিত অসহায় শরণাগতকে চিরদিনের জন্য কোলে স্থান দিয়াছেন—তাই দীন দরিদ্র কৃপাভিখারীর চক্ষে মা স্নেহের আকর পরম করুণাময়ী। কিন্তু জগদ্ধাত্রী ও মহাকালী একই মায়ের দুইরূপ। জগজ্জননীজ্ঞানে অসংখ্য সন্তান তাঁহার পূজারত—তথাপি তিনি সেই নিরাড়ম্বরা চিরপরিচিতা মমতাময়ী মা—কৃত্রিমতার লেশমাত্রপরিশূন্য নিছক স্বভাব ছবি। পবিত্রতা ও সত্যের স্বাভাবিক তেজে নিত্য উদ্ভাসিতা। ভক্ত জানেন, ষোড়শীপূজার স্মরণীয় অমানিশাতে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের আপন জপমালা মায়ের সেই রাঙাচরণে সমর্পিত হইয়াছিল। সাধক তখন দিব্যদৃষ্টিতে তাঁহার ভিতর শ্রীশ্যামামূর্ত্তি সন্দর্শন করেন। তাঁহারই পাদপদ্মে শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ দিক্‌পাল সন্তানগণ আত্মবিক্রয় করিয়া আপনাপন জীবন ধন্যজ্ঞান করিলেন। এস্থলে সংক্ষেপতঃ সেই জীবনের মূলসূত্রের উল্লেখমাত্র করিয়াই আমাদিগকে বিদায় লইতে হইবে। বিশদভাবে বিশেষ বিশেষ ঘটনাব বিবৃত্তি করিয়া জীবন-কথা পূর্ণাঙ্গ করিবার আয়োজন ও শক্তি উভয়ই আমাদের নাই।

প্রতীচীর সংঘর্ষে যখন এক নূতন ভাববন্যায় আমাদের নারীচরিত্রের আদর্শ বিনষ্ট হইতে বসিয়াছিল ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই যুগপ্রয়োজনে শ্রীসারদাজীবনপদ্ম অতুল শোভাসম্পদে ভারতের তপোবনে ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হইল, সনাতন আদর্শের ভিত্তির উপরই অনাগত ভারতীজীবনসৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সংযমের উপরই এই সনাতন আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত। যে পল্লী এই নবীন মাতৃশক্তিকে বক্ষে

ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহারই উপর আজ স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হইল। হে নবীন বাঙ্গলা! তোমার মৃত্তিকা ধন্য। তুমি আজ অসীম সম্মানে সুশোভিত হইলে। মায়ের জীবন তোমার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়—গৌরবের সামগান। কত দূর দেশান্তর হইতে কত বিদেশী আসিয়া তোমার এই পীঠস্থানের পুণ্যরজে মাথা লুটাইয়া ধন্য হইবে। কিন্তু তোমাকে সে সম্মান হজম করিতে হইলে আপনার জীবনে মাতাজীর পরিপূর্ণ ত্যাগতপস্যা সংযমের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে—তোমার মাথার উপর আজ দায়িত্বের গুরুভার সমর্পিত হইল।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মেতিহাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেখা গিয়াছে যে কালাতিপাতে নূতন দেবদেবীর অর্চ্চনা-আরাধনা প্রবর্ত্তিত হইলে পুরাতনকে সরিয়া যাইতে হইয়াছে,—মানুষ নূতনকে পাইয়া অতীতস্মৃতি চিরদিনের মত ভুলিয়া গিয়াছে। বৈদিক যুগে ইন্দ্র-অগ্নি-সোম প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজাপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বরুণ-পর্জ্জন্য-ভগ ইত্যাদিকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে অন্তর্ধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু কালপরিবর্ত্তনে আমরা ভারতেতিহাসের এক অপূর্ব্ব সন্ধিস্থলে উপস্থিত। বর্ত্তমান শ্রীরামকৃষ্ণযুগে সঙ্কীর্ণতার বিন্দুমাত্র স্থান নাই। কাজেই শ্রীসারদাপূজাপ্রবর্ত্তনে প্রাচীনকে নবীন আলোকে আরও দৃঢ়ভাবে রক্ষা করাই হইল।

সেদিন দেখিলাম কোন ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাভিজ্ঞা জনৈক বিদুষী বঙ্গমহিলা ভারতের নারীজীবনের আদর্শ লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া একনিঃশ্বাসে প্রথমেই বলিয়া লইয়াছেন—সীতা সাবিত্রীর কথা ছাড়িয়া দাও। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সত্য বটে মানুষের জীবনে ভুলভ্রান্তি-বিচ্যুতি যথেষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু তাই বলিয়া জাতীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? ঐ আদর্শ যে যে জীবনে বাস্তব হইয়াছিল সেইগুলি চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বদা উপস্থাপিত রাখিয়া তাহার অনুসরণচেষ্টাতেই আমাদের ঠিক ঠিক উন্নতি ও কল্যাণ সংসাধিত হওয়া স্বাভাবিক। লক্ষ্যহীনের পথ চলা বাতুলতামাত্র। অবশ্য যুগপ্রয়োজনে কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী কিন্তু মূল

বিনষ্ট হইলেই বিপদ। বৈজ্ঞানিক যুগের নিছক যুক্তিবাদী সংশয়ী মানুষ অবতারতত্ত্ব অন্ধের কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেন, দেবলীলা বুঝেন না, ঈশ্বরাস্তিত্বে একান্ত আস্থাহীন। কিন্তু উন্নত চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। চারিত্রপূজা হইতে তিনি বিরত হইতে পারিবেন কি? শ্রীসারদাজীবনে অতীত আদর্শের সারবত্তা ও সত্যতা সপ্রমাণিত হইয়াছে—সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী দময়ন্তী আবার জলন্ত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীসারদাজীবনের তাৎপর্য্য সঠিক উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া মাদৃশ অযোগ্যজনের বিন্দুমাত্র স্পর্দ্ধা নাই। এতৎসম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। জননীর পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি আমাদিগকে তাঁহার জীবনের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য দিন বুদ্ধি দিন বল দিন হৃদয় দিন। আমরা জোড়করে সাধকের সহিত বলি—

"কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে॥

*　　*　　*

ত্বাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং।
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যং॥

*　　*　　*

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং।
পাদপদ্মং তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥"

শ্রীসুব্রহ্মণ্য।

সমাপ্ত।

কথা প্রসঙ্গে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইয়া উদ্বোধনের আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল। সারা বর্ষ ধরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কথিত আদর্শ সে বাংলার জনসাধারণের সমক্ষে অতি সরল সহজ ভাষায় ধরিয়া আসিয়াছে—উদ্দেশ্য দেশবাসী সেই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের অভয়াদর্শ কর্ম্ম-জীবনে সফল করিয়া নিজে সার্থক এবং জগৎকে ধন্য করিবে। বর্ষ শেষে সকলেই নিজের আর্থিক হিসাব মিলাইয়া দেখেন—পাঠক পাঠিকা নিজের মনের নিকট একবার হিসাব চাহিয়া খতাইয়া দেখিবেন কি ?—কত কথা শুনিলাম, কত লেখা পড়িলাম তাহার কতটুকু কার্য্যে পরিণত করিয়াছি ?—যে দেশের ফলে জলে মানুষ তাহার সেবায় কতটুকু আত্মনিয়োগ করিয়াছি, যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য স্বস্বরূপ প্রকাশের জন্য কতটুকু আত্মত্যাগ করিয়াছি ?—এ হিসাব তোমাকে লোকের কাছে দিতে হইবে না, খবরের কাগজে জাহির করিতে হইবে না এ হিসাব তোমাকে স্বীয় বিবেকের নিকট দিতে হইবে। সেখানে কেহ তোমাকে অপমান করিবে না, সাজাইয়া গুজাইয়া নিজের মহত্ত্ব খাড়া করিলে দুষ্ট লোকে চোর আখ্যা দিবে না—সেখানকার পরীক্ষক তুমি নিজেই, বিবেকের কষ্টি পাথরে তোমার কার্য্য তুমি নিজেই কষিয়া লইবে, যদি যথার্থ সোণা থাকে বিমল আত্মপ্রসাদ অন্তরে অন্তরে বোধে বোধ করিবে, আর যদি মেকি বাহির হয় তাহা হইলে উহা ফেলিয়া দিয়া যথার্থ খাঁটির সন্ধানে পুনরায় তোমার সকল উদ্যম সকল প্রচেষ্টার নিয়োগ কর।

* * * *

রূপ-মুগ্ধ অন্তর লইয়া নারী-জাতির কল্যাণ সাধন হয় না, বিলাস-বসন লইয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবা অসম্ভব, যশ-পসারের আশা লইয়া কখনও ধর্ম্মাচার্য্য হওয়া যায় না, কর্ত্তৃত্বাভিমানীর দেশ-নেতৃত্বে দেশবাসী

উত্তক্তই হইয়া থাকে। অশিক্ষিত সৈন্যদল লইয়া অতি বড় যোদ্ধাও পরাজিত হন, অসংযমী দেশবাসীর দ্বারা মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলেও মহাপ্রাণ মহাত্মারও ভগ্নোৎসাহ হইতে হয়। ছাতের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ছাতে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লম্ফ প্রদান করিয়া শক্তি ক্ষয় করা অপেক্ষা সিঁড়ি গড়িতে আরম্ভ করিয়া দেওয়াই উচিৎ।

* * * *

জাতীয় প্রাসাদের সোপানের অপর নাম শিক্ষা, দেশবাসীকে তুলিবার জন্য আমরা যত প্রকারে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিয়াছি—সেই শক্তি সামর্থ্য যদি আমরা তাহাদের সামান্য শিক্ষা কল্পে ব্যবহার করিতাম তাহা হইলে জাতীয় আদর্শ লাভের অর্দ্ধেকের উপর রাস্তা আমরা আগাইয়া থাকিতাম সন্দেহ নাই। কোন প্রকারে আমাদের সকল নরনারীকে যদি খপরের কাগজ পড়িতে, চিঠি লিখিতে ও হিসাব রাখিতে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে এই বিরাট জাতির দ্বারা যে কোনও মহৎ কার্য্য অতিসুচারু ও সুগম ভাবে যে কোনও মুহূর্ত্তে করাইয়া লইতে পারা যাইবে ইহাই আমাদের ধারণা।

* * *

নিঃস্বার্থ যাঁহারা তাঁহাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই। তবে লোকের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া তাঁহারা মঠ, মিশন, সমিতি, আশ্রম, সমাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া থাকেন—উদ্দেশ্য উহাকে অবলম্বন করিয়া জীবের সেবা হইবে। কিন্তু যখন কোনও সঙ্ঘের সেবকেরা অপর প্রতিষ্ঠানের প্রতি গোপনে শত্রুতা ও অভিসম্পাৎ করিতে থাকেন, নিজেদের মধ্যে কর্ত্তামী লইয়া বিবাদ বাধান, পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে থাকেন, দুনিয়া-দৌলত লাভের আকাঙ্ক্ষায় মহা ব্যস্ত হইয়া পড়েন, 'না করিলে নয় বলিয়া' নিজ কর্ত্তব্য কলের মত করিয়া যান—তখন সেই বেইমান পরহিত-কামীদের হয় অরণ্যে প্রবেশ করা উচিত না হয় স্বগৃহেই দানব্রতের অভ্যাস করার প্রয়োজন।

* * * *

সেবা যেখানে একটা মস্ত পাপের বোঝা—প্রাণ সেখান হইতে

উৎক্রামণ করেন, আচার্য্যগিরি যেখানে স্বসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও যশঃ-লাভের উপায়—ভগবান সেখানে যোগমায়া সমাবৃত হইয়া থাকেন, দেশ উদ্ধার ব্রত যেখানে কর্তৃত্ব লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা হইয়া দাঁড়ায়—স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে দশ হাজার বৎসরের দাসত্বের গাঢ় অন্ধকার সে দেশকে আরও ঢাকিয়া দেয়।

মানুষের যখন লাগে তখন কাঁদে। আবার ভীত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চোখের জলও মানুষ ফেলিতে সাহস করে না, তখন সে অন্তরে অন্তরে আর্ত্তনাদ করে। সে আর্ত্তনাদ যিনি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে অনুভব করেন, করুণায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, মহাশক্তিতে দেহ প্রাণ ভরিয়া উঠে, তখনই তিনি যথার্থ ধর্ম্মাচার্য্য, সমাজ-সেবক, দেশ-নায়ক হইতে পারেন, নচেৎ ওসকল কর্ম্ম ধৃষ্টতা, বাতুলতা, স্বার্থপরতা। হে আচার্য্য, সেবক, নায়ক, একবার বুকে হাত দিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি সারা জীবনে কয় ফোঁটা অশ্রুজল জীব দুঃখে বিগলিত হইয়া তোমার গণ্ডস্থলে আপনি আসিয়া দেখা দিয়াছে। তাহা যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিব তোমার আচার্য্যগিরি ধর্ম্মব্যবসায়, তোমার সমাজসেবা স্বার্থ সিদ্ধির কৌশল মাত্র, তোমার দেশনেতৃত্ব কর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। যুগে যুগে জীব দুঃখে কাঁদে সে 'ভাবের মানুষ' দুই একজনা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুদ্ধ আত্মবলী দিয়াছিলেন, খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন, চৈতন্য পাগল হইয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ কোটি কোটি প্রাণীর পাপ জ্বালায় নিজ পুতঃ অঙ্গ পলে পলে দহন করিয়াছিলেন। সে করুণার অশ্রু তরঙ্গে তরঙ্গে বহিয়া যায় চিত্ত হইতে চিত্তান্তরে, তাহার পুতঃ স্পর্শে চেতনা পায় কত জড় প্রাণ, তদ্‌ভাবভাবিত চিত্তে তাহারাও বিরাট বিপুল বিশ্বরূপের সেবায় নিযুক্ত হয়, আর অপর পক্ষের যাহারা 'লোহা, পাষাণ, বাঁশ, খড়' পরস্পর কৌতুক করিয়া বলে 'ইহাদের ঢঙ দেখ'।

অবতার বাদ

(শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

বেদান্তের বিশিষ্ট মত এই যে, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য বস্তু—অনাদি—অনন্ত—অখণ্ড—অব্যয় ও দেশকাল নিমিত্ততায় অপরিচ্ছিন্ন। তিনি নিজশক্তি মায়া সহায়ে যেন বহুধা পরিণত হইয়াছেন। অতএব বস্তুতঃ তিনি অপরিনামী হইলেও তিনিই আবার বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সত্ত্বান্তর স্বীকার করিলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় না। সুতরাং সেই এক পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বভাব এবং যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই প্রতি জীবে অনুপ্রবৃষ্ট হইয়াও অখণ্ড চিৎসত্তায় অভেদ্য ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চিৎ বা চৈতন্যসত্তা যদি এক ও অখণ্ডই হয়, তবে সেই সত্তায় আকীট ব্রহ্ম অখণ্ড ভাবেই অবস্থান করিতেছে; ভেদভাব কেবল মায়াশক্তি হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে।

একই মৃত্তিকায় বিভিন্নবীজ উপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রস প্রসব করিতেছে। বিভিন্ন বীজের পৃথকত্বই বিভিন্ন রস প্রসূতীর কারণ। সেইরূপ অনাদি কর্ম্মবশে, অখণ্ডব্রহ্মে অবস্থান করিয়াও, জীব ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছে; মায়াশক্তিই এই অনাদি কর্ম্ম পথের প্রবর্ত্তক। আপনার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বভাব অনুভব হওয়া মাত্র এই কর্ম্ম বা জগদিন্দ্রজাল ছিন্ন হয়। ইহাই বেদান্তের মুক্তিবাদ।

এইজন্য বেদান্তে মায়াশক্তিবশে উচ্চাবচ সৃষ্টি সমর্থন হয়। সৃষ্টির দিক্‌দিয়া দৃষ্টি করিলে এই উচ্চাবচ সৃষ্টি সমর্থন না করিয়া থাকা যায় না। আর ব্রহ্মের বা স্ব স্বরূপের দিক্ দিয়া দৃষ্টি করিলে সৃষ্টি ভাণই থাকে না—উচ্চাবচ সৃষ্টি থাকিবে কিরূপে ?

বেদান্তশাস্ত্র এইজন্য (১) পারমার্থিক এবং (২) ব্যবহারিক-রূপ দুইটী আপাত বিরোধী সত্তা অঙ্গীকার করেন। অর্থাৎ পারমার্থিকই জীবের যথার্থ সত্ত্বা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দত্বই জীবের স্বভাব। আর সেই

সত্তা দেহেন্দ্রেয়াদিতে অধ্যস্ত হইয়া—জীবের স্বস্বরূপ বিচ্যুতিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলই ব্যবহারিক সত্তা। এই দ্বিতীয় সত্তার স্বর্গ আছে নরক আছে। দেব মানব গন্ধর্ব্ব স্বর্গাদি লোক আছে তলাতলাদি সপ্তপাতাল আছে। যোগী ভোগী ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্য এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই ব্যবহারিক সত্তায় অবস্থিত। পুরাণাদি মুখে যে অবতার তত্ত্বের সমর্থন দৃষ্ট হয় তাহাও এই ব্যবহারিক সত্তায় সুতরাং বেদান্ত মতে উহাও মিথ্যা নহে।

শক্তির তারতম্যেই উচ্চাবচ সৃষ্টি; একথা যদি সত্য হয় তবে মুক্তিবলেই বা অবতারবাদ সমর্থিত হইবে না কেন? আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আমাকে কোন সময়ে আলমোড়া হইতে একখানা চিঠি লিখেন উহাই কালে "শিবস্তোত্র" রূপে ছাপা হইয়াছে। উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বামিজী "সর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরং" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। স্বামিজী আলমোড়া হইতে কলিকাতায় আসিলে অবতার তত্ত্বের বীজস্বরূপ ঐকথা লইয়া আমার সহিত তাঁহার বহুবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সকল কথার সারাংশ এইখানে লিপিবদ্ধ করিলে আমরা অবতারবাদ সম্বন্ধে স্বামিজীর মত বুঝিতে পারিব।

স্বামিজী বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মলোকের আধিকারিক পুরুষ বলিয়া যাঁহাদিগকে বর্ণিত হয় তাঁহাদিগকে অবতার বলিবার বাধা বেদান্ত শাস্ত্রেও নাই। বেদান্তমতে সগুণোপাসনায় চরমফললাভ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি।—কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকবাসী সকলের মুক্তি বেদান্ত সমর্থন করে। ব্রহ্মলোক যখন "অনাবৃত্তি" স্থল—তাহা হইতে যখন স্খলনের আর সম্ভাবনা নাই—তখন ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে উহাই Highest ideal (সর্ব্বোচ্চ আদর্শ)। ঐলোকের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান, আপ্তকাম—অনিমাদি ষড় ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন—ইহাও বেদান্তশাস্ত্র সমর্থন করে। অতএব দেশ কাল ভেদে সেই লোকের এক এক আধিকারিক পুরুষ ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য জন্ম গ্রহণ করেন—এবং অবতার বলিয়া কথিত হন—একথাই বা বেদান্তমত বিরোধী হইবে কেন?

আবার দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে

শ্রীকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তাঁহারই অংশ কলায় অন্য অবতার পুরুষ সকলের জন্ম। "এতে চাংশ কলাপুংষঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং," "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া" ইত্যাদি বচনে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারের উৎপত্তিস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণই গীতামুখে বলিয়াছেন "আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবিভূর্ত হই" "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ঐরূপে দশাবতারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট না হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন এবং তিনিই গীতামুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবিভূর্ত হইব। ইহা যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তবে সেই পরব্রহ্ম নারায়ণ যাঁহাকে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—তিনিই বা আবার এখন অন্যরূপে আবিভূর্ত না হইতে পারিবেন কেন? এইজন্য দশাবতার ভিন্ন অবতার নাই ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা পুরাণের মর্ম্ম অবগত নহেন। আমাদের ঠাকুরকেও এইরূপে সর্ব্ব ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করায় কোন দোষ দেখি না। কারণ তিনি নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন "যে রাম যে কৃষ্ণ হইয়াছিল সেই ইদানীং এই শরীরে।" স্বামিজী বলিয়াছিলেন, জীব বহুজন্মব্যাপী তপস্যার সাধন ফলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ পূর্ণ যুগের ভাবঘন সমষ্টি ঠাকুরের সমসমান হওয়াতো দূরের কথা—তাঁহার সামীপ্য লাভও তাঁহার কৃপা কটাক্ষ ভিন্ন তাহার জীবনে হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অবতাররূপী দেবমানব,যখন জগতে আবিভূর্ত হন তখন অনেক লোক তাঁহাদের দর্শনে স্পর্শনে উচ্চগতি বিনা সাধনায় লাভ করিয়া থাকে। ধর্ম্ম জগতে ইহা এক অদ্ভুত রহস্য—এখানে কোন যুক্তি তর্ক থাই পায় না।

স্বামিজীর উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া যুক্তিবাদী দার্শনিক হয়তো বলিবেন, বেদবেদান্ত শাস্ত্রতো পুরাণ প্রচলিত অবতারবাদ প্রত্যক্ষ সমর্থন করে না। ঐ বিষয়ে স্বামিজীর সঙ্গে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে আমার যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব। আমি সেদিন বলিয়াছিলাম "যিনি দেশকাল নিমিত্তের গণ্ডিতে শরীর ধরিয়া আসেন

তিনি পূর্ণ হইবেন কি করিয়া—পূর্ণ তো সর্ব্বব্যাপী নিরাধার।" উত্তরে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, যিনি দেশকাল নিমিত্ততার অতীত, তাঁহার সম্বন্ধে কোন রূপ যুক্তি তর্কের অবসর কোথায়? কারণ সকল যুক্তি তর্কই দেশকাল নিমিত্ততার ভিতরে। আর যিনি কার্য্য কারণের অতীত তিনি যদি আমরা যাকে কার্য্য কারণ বলি—তার মধ্য দিয়াই দেহ ধরিয়া আসেন তবে এবিষয়ে কোন অসংগতি দেখা যায় না—কারণ তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন। কখনো সর্ব্বপ্রিয়—লোকবিধারক সেতু, অচিন্ত্য অব্যয়—আবার কখনো মায়াশ্রয়ে সর্ব্বেশ্বর—সর্ব্বশক্তিমান, এই চৌদ্দপোয়া দেহে অবস্থান করিয়া আপনাকে আজন্ম স্বতন্ত্র ঈশ্বর জানিয়াও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ। ভাষ্যকার এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন "জাত ইব।" অত বড় বেদান্তবিদ্‌ও শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে সন্দিহান হন্ নাই।

আর এক কথা বেদান্ত মতে সচ্চিদানন্দ সত্তা তো অখণ্ড—জীবে জীবে এই অখণ্ডত্বের অনুভূতির অভাব—তাই ভিন্নত্ব বোধ। জন্ম হইতে যদি কাহারও এই অখণ্ড সত্তা অনুভব হয়—যেমন "বামদেব" ঋষির হইয়াছিল তাহা হইলে অবতারবাদ যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ চিন্ময় অখণ্ড চৈতন্যের দেহধারণরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইতে পারে না। যদিও বেদ বেদান্ত শাস্ত্রে অবতারবাদের তেমন স্পষ্ট উক্তি দৃষ্ট হয় না, তবু শতপথে মৎস্যাবতারের উল্লেখ আছে—দেবীসূক্তে অম্ভৃন্ ঋষির কন্যাতে দেবীর আবির্ভাব কথিত হইয়াছে। আর বেদের কত শাখা যে লুপ্ত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার সীমা নাই। তদুপরি বেদের উক্তি গুলি পুরাণাদিতে ঐ সাধারণ নিয়ম গুলিই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। এইজন্য শাস্ত্র বা যুক্তি মতে অবতারবাদ অসঙ্গত হয় না।

স্বামিজীর এই সিদ্ধান্ত গুলি যুক্তি ও শাস্ত্রবাদীর ভাবিবার বিষয়। তবে একথাও ঠিক্ যে অবতারবাদ সমর্থন করিতে যাইয়া অনেক স্থলে অনেক সম্প্রদায় যুক্তি বিরোধী বেদমন্ত্রাদি উল্লেখ করিয়া বুদ্ধিমানের নিকট হাস্যাস্পদ হন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "ত্বং হ কুমারো উত বা কুমারী" মন্ত্রদ্বারা কোন সম্প্রদায়কে অবতারবাদ সমর্থন করিতে দেখিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের "শুক্লরক্তস্তথাপীতঃ" শ্লোকের—বৈয়র্থ সম্পাদন দ্বারা ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমর্থন চেষ্টা বৈষ্ণব ভাষ্যে দর্শন করিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারগণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে আধুনিক সম্প্রদায় সকলেও ঐরূপ অলীক কল্পনা দৃষ্ট হয়—যাহা যুক্তিবাদী স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হন। স্বামিজীর মতে ঈশ্বরকে "স্বতন্ত্র" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে অবতারবাদ সামর্থনে আর কোন শাস্ত্র প্রমাণ উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন হয় না—সংযুক্তিই ঐবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

উক্ত প্রসঙ্গে স্বামিজী এক সময়ে আমাদিগকে আর একটী কথা নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন—"কয়েক শত বৎসর পরে হয়তো একবার ভগবানের অবতার হয়—আজকাল কিন্তু শুনে এলেম একমাত্র ঢাকা অঞ্চলেই পাঁচটী অবতারের অবির্ভাব হইয়াছে! উহার কারণ কি জানিস্—ভগবান্ যখন জীবের প্রতি করুণায় নরশরীর ধারণ ও অপূর্ব্ব লীলা বিলাস করিয়া অন্তর্হিত হন্ তখন অনেকে প্রতিষ্ঠা ও নাম যশাদির জন্য অবতার বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, যুগে যুগে ঐরূপ False Prophet আসিয়াছে। এবার ভগবান্ যে সত্য সত্যই রামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে তাঁর তিরোভাবের ২৫ বৎসর মধ্যেই তিনি প্রাচ্য পাশ্চত্য প্রদেশে অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। অথচ এবার নিরক্ষর ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার অবির্ভাব হইয়াছিল।"

৺কাশীতে অবস্থানকালে পূজনীয় তুরীয়ানন্দস্বামীর সঙ্গে আমার একদিন সান্ধ্যভ্রমণকালে অবতারবাদের কথাবার্ত্তা হয়—উহা প্রায় তিন বৎসরের পূর্ব্বের কথা। তিনি অবতারবাদ সম্বন্ধে একটী সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন—তাহা এই। বলিলেন, দেখ একটী অণু পরিমান্ বটবীজে এত বড় প্রকাণ্ড একটা বটগাছ থাকিতে পারে বা হইবে একথা হাজার যুক্তিতেও বুদ্ধিস্থ করা যায় না; কিন্তু এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে লাখো লাখো বীজ হয় ইহার ধারণা সহজ। চৌদ্দপোয়া মানব দেহে তেমনি পূর্ণ ভগবান্ থাকিতে পারেন—বা অবতীর্ণ হন্

একথা সহজবোধ্য নহে—প্রভু যাহাকে কৃপা করিয়া বুঝান্ সেই বুঝিতে পারে। কিন্তু এই বিরাট সৃষ্টি সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার মধ্যে বিশ্বাত্মা ভগবান্ অনুস্যূত হইয়া আছেন বা ইহার কারণরূপী কর্ত্তা হইয়া অবস্থান করেন ইহা সামান্য বুদ্ধি বালকও বুঝিতে পারে। সেইজন্য অবতারবাদ বেদান্তের ব্রহ্মবাদ অপেক্ষাও কঠিন বিষয়। তবে ভারতবর্ষের লোকেরা এটা অনেকটা বুঝিতে পারে—তাহার কারণ বহুপুরুষ হইতে হিন্দুরা এই অবতারবাদ শুনিয়া আসিতেছে—বিশ্বাস করিতেছে, যুক্তিবাদী এই অবতারবাদের মীমাংসা করিতে যাইয়া থাই পান না।"

অবতারবাদ সম্বন্ধে ঠাকুরের শ্রীমুখের কতকগুলি উক্তি শুনা যায়। তিনি বলিতেন "জ্যোতির্ম্ময় অপার ব্রহ্ম সাগরের তীরে কত শত জ্যোতির্ম্ময় বৃক্ষ আছে। তার এক একটী বৃক্ষে থলো থলো রাম থলো থলো কৃষ্ণ ফলে আছে—তার এক একজন এসে জগতে এত কাণ্ড করে গেছেন।" আবার বলিতেন "এক পুকুরে ডুব দিয়ে এক ঘাটে উঠে কৃষ্ণ হলেন। আবার ডুব দিয়ে ওঘাটে উঠে ক্রাইষ্ট হলেন।" কখন বলিতেন (নিজের শরীর দেখাইয়া) "এবার মা দেখাচ্ছেন এখানে পূর্ণ বিকাশ"—আবার কখন বলিতেন "যেই রাম সেই কৃষ্ণ—এবার সেই রামকৃষ্ণ"। এই সকল কথা আমরা ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্শ্বদগণের প্রমুখাৎ অবগত আছি। যিনি সাক্ষাৎ সত্য স্বরূপ ছিলেন—ভ্রমেও যাঁহার শ্রীমুখে সত্য বই মিথ্যা কথা বাহির হয় নাই তাঁহার অবতার তত্ত্ব বিষয়ক উক্তি সকল আমরা নিঃসন্দেহ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে অবতার বলিয়া অনেকের নিকটে বলিতেছেন শুনিয়া ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন ও আর কি বেশী বল্‌বে, আগে কত বিদ্বান সাধু ষড়দর্শনে সুপণ্ডিত এসে ও কথা বলে গেছে। আবার কখন কখন বলিতেন "এবার খুব গোপনে আসা জীবৎকালে অল্প লোকে টের পাবে" আবার কখন বলিতেন "অবতার তাঁর কর্ম্মচারী এবার সে খোদ এসেছে।"

স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীর তলায় যাইতে যাইতে হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। আর নিজ

দেহ দেখাইয়া উত্তর পশ্চিমাস্যে অবস্থান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, মা বল্ছেন এর বিষয় যে যত ভাব্‌বে—সে তত ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব শীগ্‌গির বুঝ্‌তে পারবে"—আর উত্তর-পশ্চিম কোণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আবার ওই দিকে আস্‌তে হবে—তখন জ্ঞানলাভ কর্‌তে কেউ বাকী থাক্‌বে না।"

ঠাকুরের অবতারত্বে কেহ বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, তাহাতে আমাদের কিছু ইষ্টাপত্তি নাই। তবে একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় যে যদি অবতারবাদ—পুরাণ শাস্ত্র যাহা বহুধা সমর্থন করে—সত্য হয় তবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার না বলিয়া থাকিবার উপায় নাই। শাস্ত্র যুক্তি ও শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর উক্তি ইহার প্রমাণ রূপে উপন্যস্ত হইতে পারে।

স্বামিজী শরীরে অবস্থান কালীন ঠাকুরের ভক্তগণকেও ঠাকুরের উপর বিশ্বাস সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতেন। এখানে একটী কথা স্মরণ হইতেছে। ইটালীর পূজনীয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এই গল্পটী আমাকে নিজমুখে বলিয়াছিলেন। যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভক্তগণের আনন্দের হাট বসিয়াছে, তখন একদিন স্বামিজী, দেবেন বাবু ও আর দুএকটী ভক্ত সন্ধ্যার পর পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতা যাইতেছিলেন। কার্ত্তিক মাস—আকাশ পরিষ্কার, মাথার উপর ছায়াপথ (Nebula) স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল। স্বামিজী দেবেন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওহে তোমরা যে মানুষকে ভগবান ভগবান বল্‌ছো, সেই ভগবান কি, কেমন শক্তি সম্পন্ন তা জানো কি? ঐ যে আকাশের গায়ে ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে, ও থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বেরুচ্ছে—আর মুহূর্ম্মুহূঃ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় পেয়ে যাচ্ছে। এই অচিন্ত্য অপার শক্তির আধারে—যাকে কেহই বুদ্ধিতে ধারণা কর্ত্তে পারে না, তাকেই শাস্ত্রে ভগবান বলছে। আর তোমরা কিনা এই চৌদ্দপোয়া দেহটা বিশেষে সেই ভগবৎসত্তা আরোপ কচ্ছ।" দেবেন বাবু আমায় বলেছিলেন যে নরেনের কথা শুনে তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এমন অসোয়াস্তি বোধ হইয়াছিল যে আহার

নিদ্রা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। চতুর্থ দিনে তিনি গিরীশ বাবুর বাড়ী যান। গিরীশ বাবু তাহার মলিন মুখ দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়া ব্যাপার জানিতে চাহেন। দেবেন বাবুর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া গিরীশ বাবু বলিলেন "এই কথার জন্য তুমি এত বিষণ্ণ হ'লে কেন। তুমি এখুনি নরেনকে বলে এসো যে, 'যে বিরাট শক্তি থেকে এই কোটি কোটি জগৎ বেরুচ্চে ও লয় পাচ্ছে, সেই পূর্ণ বিরাট শক্তিই মানব দেহে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ন্যায় সংসারতপ্ত জীবকে উদ্ধার করেন—মানুষের মত হয়ে না এলে—আমাদের মত সুখ দুঃখ না বুঝলে—আমরা কেহ কোন কালেই ভগবৎ সত্তা অনুভব কর্ত্তে পাত্তুম না—বিশ্বনিয়ন্তার ইহাই অপার করুণার নিদর্শন—এইরূপ করুণাময় মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন জগতে ধর্ম্মের বন্যা আসে পাষাণহৃদয় গলে যায়—ভক্তি মুক্তি সুগম হয়।" দেবেন বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, "গিরীশ বাবুর কথায় যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল—আমি উন্মত্তের ন্যায় ছুটে সিমলেয় স্বামিজীর কাছে উপস্থিত হলেম।" গিরীশ বাবুর সিদ্ধান্ত শুনে স্বামিজী অতিশয় আনন্দ অনুভব করে বলেছিলেন "সাধে কি ঠাকুর জি, সির পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস বলেন।" যাহা হউক গল্পের সারাংশ ইহাই যে, ভগবান "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্"। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম—স্থূল হইতেও স্থূল।

স্বামিজী ঠাকুরকে কখন কখন "কপালমোচন" বলিয়া তাঁহার শিষ্যগণের নিকট উল্লেখ করিতেন। ঐকথা প্রথমে আমরা তেমন বুঝিতে পারিতাম না। স্বামিজী বিভিন্ন সময়ে আমাকে ও স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলিয়াছেন যে, "ঠাকুরের ইচ্ছায় ও কৃপাদৃষ্টিতে জীবের জন্ম-জন্মান্তরের ভোগ অথবা তাহার কপালে অদৃষ্টে যাহা কিছু লেখা থাকে তাহা মুহূর্ত্তে খণ্ডিত হইয়া যাইত। আহা! তোরা তখন এলিনি? এখন আমি তোদের কি কর্ত্তে পারি?" আমি ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তাহাতে জিদ্ করিয়া বলিয়াছিলাম, "এখন আপনিই আমাদের কপাল-মোচন।" তাহা শুনিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন "আমার কি সে শক্তি আছেরে বাপ্? তবে

আমি তোদের আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—ঠাকুর তোদের কৃপা করুন—এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।" ঠাকুরের সম্বন্ধে স্বামিজীর ধারণা নিয়ে কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম—

"এবার পূর্ণ ঐশীশক্তি কেন যে রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাদের পরবর্ত্তী ভক্ত ও দার্শনিকগণ তাহার বিচার করিবেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বতোপূর্ণ মহাশক্তি আর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই; এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত সর্ব্বমত সামঞ্জস্যকর পথই আধুনিক ভারতের কল্যাণকর। এতদ্‌ভিন্ন অন্য অন্য মতের অভ্যুদয় হইতেছে বা হইবে, তাহা এদেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

শ্রীভগবান এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে নরশরীরে আগমন করিয়া প্রধানতঃ কিকি বিষয় আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বলিতেন, "প্রভু কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা ত্যাগীর আদর্শপুরুষরূপে অবস্থান করিয়া বুঝাইয়াছেন, 'ত্যাগ ধর্ম্মই ভারতের আদর্শ ধর্ম্ম'—যেখানে ত্যাগ নাই সেখানে ধর্ম্মের স্থান নাই। 'প্রেয়' পথে চলিলে ব্যক্তি ও স্বজাতি অধঃপাতে যাইবেই—এবং তদ্বিপরিত 'শ্রেয়োপথে' অথবা ত্যাগ পথে চলিলে ব্যক্তির ও জাতির ধ্বংস কথনই হইবার নয়। সেই জন্যই প্রভু কামকাঞ্চন বর্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি ধরিয়া এবার নরদেহে অবস্থান করিয়াছিলেন।" স্বামিজী বলিতেন, ঠাকুর "ত্যাগীর বাদ্‌শা ছিলেন।"

ইদানীন্তনকালে ভারতে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে—তাহাদের পশ্চাতে দুই একজন ত্যাগী মহাপুরুষ আছেন বলিয়াই যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য দেখা যাইতেছে। যেখানে ত্যাগ নাই ভোগ আছে—সেখানে না আছে ঐহিক, না আছে পারত্রিক উন্নতি। প্রভু এই অবতারে কায়মনোবাক্যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ইঙ্গিতে বলিয়াগিয়াছেন 'হে ভারত! তুমি ত্যাগধর্ম্ম বিস্মৃত হইও না পাশ্চাত্যের প্রেয়প্রলোভনের আদর্শে জীবন ও জাতিগঠনে চেষ্টা করিয়া প্রাচ্যভাব ধ্বংস করিও না। ত্যাগ ও তপস্যা সহায়ে যথার্থ মনুষ্যপদ-বাচ্য হও; ইহপরকালে তোমার সর্ব্বথা উন্নতি হইবে।'

সাধন বিষয়েও ঠাকুরের জীবনের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে "অনুরাগই ইহযুগে প্রধান সাধন—যে মত বা পথ ধরিয়াই তুমি অগ্রসর হওনা কেন।" ঠাকুরের জীবনে যে উদ্দাম অনুরাগের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহার কোটি ভাগের এক ভাগ পাইলে মানুষ ধন্য হইয়া যায়। তিনি শরীরপাতী অসামান্য অনুরাগ প্রদর্শন দ্বারা ভারতকে বুঝাইলেন 'হে ভারত! অগ্রে ঈশ্বরকে অনুরাগপথে সাক্ষাৎ করো তারপর—সাধন ভজন যে মতে যে পথে ইচ্ছা করিতে পারো। আরো বুঝাইলেন "সকল মত সকল পথেই ঈশ্বরে—পঁহুছিবার বিভিন্ন রাস্তা মাত্র—বাদ-বিসম্বাদের অবসর নাই—মত পথ লইয়া কেহ কখনো কাহার সঙ্গে বিবাদ করিও না। হিন্দু মুসলমান্ বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকলে নিজ নিজ আদর্শ পথে চলিয়া বুঝিয়া লও যে তোমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান বাদ-বিসম্বাদ করিয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা দিও না।"

ঠাকুরের জীবনাদর্শে বুঝা যায়, ইহযুগে মাতৃভাবে উপাসনা দ্বারাই প্রবল আদ্য রিপুর হস্তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—অন্য কোন সাধন সহায়ে প্রশমিত হইবার নহে। মাতৃভাবের এমন আদর্শ জগতের ইতিহাস পুরাণের কুত্রাপি আর দৃষ্ট হয় না। ঠাকুরের জীবন দেখিয়া তাই মনে হয় মাতৃভাবের উপাসনাই ইহযুগের প্রধান সাধন।

আর এক কথা, ঠাকুর যেন নিজ জীবন আমাদের সম্মুখে ধরিয়া বলিতেছেন, 'হে ভারত! তুমি ভাবের ঘরে চুরি করিয়া চালাকি দ্বারা কোন কায্য করিবার চেষ্টা করিও না—তাহা হইলে লক্ষ্যে পেঁছান দূরে থাকুক বিপদগ্রস্ত হইবে। আর যদি মন মুখ এক করিয়া কার্য্য করিয়া যাও তাহা হইলে সিদ্ধি তোমার করামলকবৎ অবস্থান করিবে।'

এক্ষণে আর একটী কথার আলোচনা করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কথাটী ইহাই, এই যুগাবতারের নামে ভারতে একটী বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে কি না? এ বিষয়ে লাহোরে অবস্থান কালে স্বামিজীর একটি উক্তি যাহা আমি আমার গুরুভাই স্বামী শুদ্ধানন্দের মুখে অবগত হইয়াছি তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। তদানীন্তন আর্য্যসমাজের নেতা লালা হংসরাজের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামিজীর নানা

প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এবং কথায় কথায় স্বামিজী তাঁহাকে বলেন, "দেখুন আমার হাতে এমন শক্তি আছে যাহা দ্বারা আমি জগতের এক তৃতীয়াংশ নরনারীকে এক পতাকার নীচে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারি। কিন্তু শক্তি থাকা সত্বেও তাহা আমার করিবার ইচ্ছা নাই কারণ তাহা হইলে আমার গুরুদেব প্রবর্ত্তিত "যত মত তত পথ" এই মহা সমন্বয় বাক্য খণ্ডিত হইয়া ভারতে একটী নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবে " ঠাকুরের নামে পাছে কালে কোন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে এই জন্য স্বামিজী বেলুড়মঠ নির্ম্মিত হবার পর ঠাকুরের বর্ত্তমান আসনে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া পূজা করিতে দেন নাই। তখন রেশমী রুমালে অঙ্কিত একটী ওঁকার টাঙাইয়া রাখা হইত এবং তাহারই পূজা হইত। পরে স্বামিজী একদিন রাত্রে কি একটী Vision দেখিয়া পরদিন নিজ হস্তে আসনে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া দেন তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সেই ছবিরই পূজা হইতেছে। এই ঘটনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, স্বামিজীও ভয় করিতেন পাছে সম্প্রদায়হীন ঠাকুরের নামে কালে আবার ভারতে একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠে কিন্তু একথা বলিতে হয় যে, আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ঠাকুরের ভক্তসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বুঝিতে পারিয়াছি ঠাকুরের মহাসমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িক ভাব এখনো পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছে। কিন্তু কে বলিবে, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের তিরোভাবের পরে ঐ উদার সমন্বয়ভাব ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিবে কি না, এবং কালে ঠাকুরের নামে ভারতে এক সম্প্রদায় বিশেষ গড়িয়া উঠিবে কিনা?—প্রকৃতির নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য! সময়ে মত পথাদি সঙ্কীর্ণ হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম; এরূপ না হইলে দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের পুনরবতরণের আবশ্যকতাও আর থাকে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, রাম ও কৃষ্ণাবতারে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল,—পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; শ্রীভগবান্ বুদ্ধাবতারের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে ও জ্ঞেয় জগতের সর্ব্বত্র যে তুমুল ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠন, শিল্পস্থাপত্য বিদ্যার বিকাশ, ও চৈত্য বিহরাদি স্থাপিত হইয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যাবতারে বঙ্গদেশ

প্লাবিত করিয়া যে উদ্বেল প্রেমের বন্যা উঠিয়াছিল তাহা সমগ্র ভারতবর্ষকে অল্পাধিক ভাসাইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতারে—যে মহাসমন্বয় বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে—যে জাগরণের বার্ত্তা দেশ দেশান্তরে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে এরূপ আর কোন সময়ে হয় নাই—একথা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এমন জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ম্মের সমন্বয় যাহা গীতামুখে শ্রীভগবান্ একদা অর্জ্জুনকে উপদেশ করেন—পরন্তু যাহা কালে এক মানব কর্তৃক কখনো অনুষ্ঠিত হয় নাই তাহা এই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় গীতা শাস্ত্রোক্তি সফলতা লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ গীতা শাস্ত্র কেন—ঘোর গহন তন্ত্রশাস্ত্র সাধন সমূহ ভগবান্ এই অবতারে স্বয়ং সাধনা করিয়া ইহাদেরও প্রত্যক্ষ সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদবেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, খ্রীষ্টিয়, মহম্মদীয় কোন সাধনাই এবার প্রভু নিজ শরীরে না করিয়া যান নাই। যদি ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান্ ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান বৌদ্ধাদি মতবাদিগণ কখনো এক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া ভাই ভাই বলিয়া একে অন্যকে আলিঙ্গন করিবার সুযোগ পায় তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মত দ্বারাই তাহা সুসিদ্ধ হইবে—নতুবা বুদ্ধিভেদী 'শুদ্ধি', ক্ষণিক উত্তেজনা মূলক 'স্বরাজ্যনীতি' বা সাধন হীন 'সভ্যগণ' দ্বারা পাশ্চত্য ছাঁচে গঠিত 'সভা-সমিতি' দ্বারা সহৃদয় মূলক একতা সংসাধিত কখনই হইবার নহে। এই জন্য আমরা ভারতের—জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রাদাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ী মতের আলোচনা করিতে এবং তাঁহার দিব্যাদর্শে জীবন গঠন করিতে আহ্বান করিতেছি। প্রভুর জীবন অনুধ্যান করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি—এইজন্য আমরা জগতের যাবতীয় নরনারীকে তাঁহার সুসমাচার প্রদান করিয়া তাঁহাদের জীবনকেও ধন্য ও সফল করিতে পরামর্শ প্রদান করিতেছি। যাঁহার কর্ণ আছে তিনি শ্রবণ করুন—যাঁহার হৃদয় আছে তিনিই এই যুগাবতারের বিষয় অনুভব করুন। ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পনমস্তু।

স্বামী প্রেমানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ)

আজন্ম ইন্দ্রিয়ের দাস ও সতত কাম-কাঞ্চনসেবী আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে অদ্যাবধি মানব নারীকে তাহার ভোগ্যবস্তু বলিয়াই দেখিয়া আসিতেছে। বিরল কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি ভগবৎ কৃপালাভের উহা প্রধান অন্তরায় বুঝিয়া নারীতে স্ত্রীবুদ্ধি ত্যাগকরতঃ যদি উহাতে মাতৃ বুদ্ধি বা ঐরূপ অন্য কোন কাম-গন্ধ-হীন ভাব আনিতে চেষ্টা করে তবে বিগত বহুজন্মের সংস্কার সমূহ প্রবল বাধারূপে তাহার পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে ঐরূপে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেয় না। বিরলে বিচারের সময় নারীতে মাতৃবুদ্ধির উদ্দীপন হইলেও বিষয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইতে না হইতে ঐ বুদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থানে পূর্ব্বভাব আসিয়াই উদিত হয়। হয়ত, কোন উচ্চসাধক, বহুবর্ষ যাবৎ কঠোর ধ্যান তপস্যার ফলে, কামিনীতে মাতৃবুদ্ধি অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারও মনের কোন ছিদ্র দিয়া সহসা উহাতে স্ত্রীবুদ্ধি উদিত হইয়া যত উচ্চ তিনি একদিন উঠিয়াছিলেন তত নিম্নে পুনরায় নামিয়া গিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্তও জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বিরল নহে। সুতরাং মানব, জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রাম করিয়া যাহার উপর হইতে এককালে ভোগবুদ্ধি অপসারিত করিতে পারে না পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের আজন্ম স্বাভাবিক ভাবে তাহাতে ঐ বুদ্ধি-রাহিত্য ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা শুনিয়াছি, "স্ত্রী শরীরের বিশেষ গোপনীয় অঙ্গ যাহার নাম মাত্রেই আমাদের মনে কুৎসিৎ ভোগের ভাবই উদিত হয় বা ঐরূপ উদিত হইবে নিশ্চিত জানিয়া আমাদের—ভিতর শিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারা 'অশ্লীল' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা

করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে করিতে তাহাতে ব্রহ্মযোনী ত্রিজগৎ প্রসবিনী আনন্দময়ী জগদম্বার উদ্দীপন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব কতদিন না সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।"* স্বামী প্রেমানন্দজীর ততদূর না হইলেও তিনি যে তদুপযুক্ত শিষ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরমহংসদেব তাঁহার ভক্তগণের কাহার কিরূপ ভাব তাহ সময় সময় নির্দ্দেশ করিতেন। শ্রীযুক্ত বাবুরাম সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "এর প্রকৃতি ভাব—দেখ্‌লাম দেবীমূর্ত্তি, গলার হার, সখী সঙ্গে।" অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ বালক ভক্ত বাবুরামকে ভাব নয়নে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন—উহার বহুবর্ষ পরে মঠের জনৈক নবীন সন্ন্যাসী সহজাবস্থায় তাঁহাকে ঐরূপে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তখন পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজা ও আরত্রিকাদি করিতেন। একদিবস তিনি ভাবে গর্ গর্ মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার প্রেমাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারতি করিতেছেন হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীটীর তাঁহার উপর দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি দেখিলেন—তাহাদিগের চিরপরিচিত বাবুরাম মহারাজ নাই, তাঁহার স্থানাধিকার করিয়া শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতা স্বয়ং শ্রীভগবানের আরতি করিতেছেন। ঐরূপ দর্শন করিয়া তরুণ সন্ন্যাসীর হৃদয় ভাবে ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি বলেন—"আমার তখন খুব ইচ্ছা হচ্ছিল এই সময় মার চরণ দুখানি গিয়া জড়াইয়া ধরি কিন্তু মঠের সকলে ও বাহিরের বহুভক্ত তথায় উপস্থিত থাকায় লজ্জায় উহা করিতে পারি নাই।"

বাবুরাম মহারাজ পরমহংসদেবের সহিত মিলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ও অনতিকাল পরে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বালক-ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। নাম সংকীর্ত্তন বা ভজনাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কিন্তু, বাবুরাম মহারাজের ঐরূপ বড় একটা হইত না। তাহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদিবস পরমহংসদেবকে গিয়া বলিলেন—"অন্যান্য সকলের মত আমারও ভাব হয় না কেন? উহা আপনাকে করিয়া দিতে

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ—উত্তরার্দ্ধ।

হইবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করিলেন "তাকি হয় রে? আমি বল্লে কি হয়?" কিন্তু বালক ছাড়িবার পাত্র নহেন, ঐ এক কথা "আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।" বাধ্য হইয়া তিনি একদিন শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বালকের অনুযোগ জানাইলে মা বলিলেন "ওর ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।" এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহ, যত্ন ও পরিচালনায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার কৃপা বাতাসে পাল তুলিয়া ভক্তের জীবন তরী বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে নাচিতে নাচিতে আনন্দভরে অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ সকলের ভাগ্যেই আসিয়া থাকে। তাঁহার জীবনেও তাহার অন্যথা হইল না। শ্রীভগবান একদিন আনন্দহাট ভাঙ্গিয়া নরলীলা ত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণও এককালে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উহার কয়েকমাস পরে ভগবদিচ্ছায় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকভক্তগণকে পুনরায় একত্র করিয়া বাবুরাম মহারাজের জন্মভূমি আঁটপুর গ্রামে লইয়া গেলেন। উহা ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস। হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য, ভগবান লাভের জন্য অদম্য উন্মাদনা এবং সংসার ত্যাগের জ্বালাময়ী পিপাসা লইয়া এই কয়েকটী বালক যেদিন প্রথম আঁটপুরে শুভ পদার্পণ করেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে একটী চিরস্মরণীয় দিন। কারণ ঐদিবস ঐস্থানে তাঁহারা যে প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আর কখন ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং বলিতে পারা যায় আঁটপুরের আকাশবাতাসই সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের উদ্বোধন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। তথায় সপ্তাহাধিক কাল ধ্যান, ভজন ও কীর্ত্তনাদিতে অতিবাহন পূর্ব্বক তাঁহারা নব প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই আর সংসারে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন না। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকভক্তগণের মধ্যে অনেককে স্বয়ং প্রব্রজ্যা দান করিলেও তাঁহাদিগের কাহারও তখনও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণকালীন আনুসঙ্গিক

নামকরণাদি হয় নাই। দলপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর মঠে প্রথম বিরজা হোম সম্পাদন পূর্ব্বক স্বয়ং 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়া (?) তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণকেও তাঁহাদিগের স্বভাবানুযায়ী বিভিন্ন নামে ভূষিত করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ সম্বন্ধে বলিতেন "ওর প্রকৃতি ভাব" এক্ষণে ঐ বাক্য স্মরণ করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজী শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের নাম রাখিলেন 'স্বামী প্রেমানন্দ'।

পূজ্যপাদ শশীমহারাজ বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তখন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজাদি করিতেন। কার্য্য ব্যপদেশে তিনি মান্দ্রাজ গমন করিলে ঐ ভার স্বামী প্রেমানন্দের উপর ন্যস্ত হইল। তিনি কিছুকাল সানন্দে ঠাকুরের সেবাদি ভার বহন পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বেলুড় মঠ স্থাপনার কিছু পূর্ব্বেই ঐ কার্য্য শেষ করতঃ পুনরায় মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। পরে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান যুগাবতারের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় বাণী ঘোষণা করিয়া 'বেলুড় মঠ' স্থাপন করিলে তাঁহার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের ন্যায় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নবাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষার জন্য স্বামিজী তখন মঠে নিয়ম করিয়াছিলেন যে কেহই দিবা নিদ্রা যাইতে পারিবে না। এক দিবস তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে সংবাদ দিল—"বাবুরাম মহারাজ ঘুমাচ্ছেন।" স্বামিজী তাঁহাকে আদেশ করিলেন—"যা, তাকে পা ধরে টেনে ফেলে দিগে।" শিষ্য আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ নিদ্রিত অবস্থায় স্বামী প্রেমানন্দের পা ধরিয়া টানিতে লাগিল। টানাটানিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বালককে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আরে, থাম্ থাম্ করিস্ কি?"—আর করিস কি? তখন তাঁহার নিষেধ কে মানে? বালক তাঁহাকে চৌকি হইতে ফেলিয়া দিয়া অবিলম্বে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ঐ দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের আরত্রিক শেষ হইলে স্বামী প্রেমানন্দ স্বামিজীর ঘরের সম্মুখবর্ত্তী বারান্দার উত্তর দ্বার

দিয়া ঐ স্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন স্বামিজী তথায় পায়চারী করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের ভাই বাবুরামকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাঁহার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে দরবিগলিত নেত্রে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"ভাই, ঠাকুর তোদের কত যত্ন করতেন, সর্ব্বদা বুকে করে রাখতেন। আর আমি তোদের উপর কি অন্যায় অত্যাচারই না করছি। ঠাকুর কি এরই জন্য তোদের ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন ?" এই বলিয়া স্বামিজী বালকের ন্যায় উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, স্বামী প্রেমানন্দ সেদিন বহু কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অন্য এক দিবস পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ পুষ্পপাত্র হস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিতে যাইতেছেন, এরূপ সময় স্বামিজীকে সম্মুখে পাইয়া তিনি ঐ সচন্দন পুষ্পদামে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলেন। মায়ারহিত মহাত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ পরস্পর সকলেই এইরূপ শুদ্ধ প্রেমসূত্রে আবদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বস্বরূপে লীন হইলে 'মঠ' এবং 'মিশন' সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য ভার স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপরেই পতিত হইল। ঐ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই ভারতের নানা স্থানে গমনাগমন ও অবস্থান করিতে হইত বলিয়া বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধান স্বামী প্রেমানন্দই সম্পাদন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবার ব্যবস্থা, তরুণ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণকে শিক্ষাদান এবং আগন্তুক ভক্তমণ্ডলীকে আদর অভ্যর্থনা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই এককালে তাঁহাকে করিতে হইত। তিনিও ঐ সমস্ত কর্ম্ম মহাপ্রেমের সহিত অনুষ্ঠান করিতেন। কারণ, প্রেম তাঁহার হৃদয়ের স্বভাব সিদ্ধ বস্তু ছিল। স্বামী প্রেমানন্দের অন্তঃকরণ প্রেমে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিল। এই প্রেমের বন্যায় বহু ভক্ত অভক্ত একদিন ভাসিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমে সকলকে এক করিতে, নীচকে উচ্চ, পাপীকে পুণ্যাত্মা, অভক্তকে ভক্ত এবং পরকে আপন করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সকলে যাহাকে বহিষ্কার করিয়াছে স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে শরণ দিয়াছেন এবং সমাজ যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে

তিনি তাহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ক একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে এখানে মন্দ হইবে না। কলিকাতাবাসী জনৈক ভদ্র সন্তান যৌবনের প্রারম্ভে প্রবৃত্তি স্রোত রুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া উহার প্রবল প্রবাহে পাপপথে বহুদূর ভাসিয়া গিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐ আকর্ষণ যুবককে একাধিক বার তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে আনয়ন করিয়াছিল। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ঐ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া ও তাঁহার প্রতি যথেষ্ঠ স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিতে থাকেন। যুবক দেখিলেন, এ ত বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! যাহার জন্য তাহার মাতা পিতা, ভাই বন্ধু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি যাহার জন্য আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে 'আপনার' ভাবিতেও লজ্জানুভব করেন, সেই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও এই সাধু যাঁহার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এত ভাল বাসেন ও স্নেহ করেন কি করিয়া? যাহার প্রেমে পড়িয়া সে কুলে কালি দিয়া অধঃপতনের নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিয়াছে সেও তাহাকে স্বার্থের জন্যই ভালবাসে, উহার ব্যাঘাত ঘটিলে অনায়াসে সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু এই পরম দয়াল পুরুষ তিনিত তাহার নিকট কিছুই চাহেন না বা কিছুরই অপেক্ষা করেন না বরং যাঁহার সে স্পর্শেরও অযোগ্য, তিনি তাহাকে এত স্নেহ ও করুণা করেন কেন? ইহাঁরই ভালবাসা দেখিতেছি ঠিক্ ঠিক্ অন্য সকলের উহা কথার কথা মাত্র। এইরূপে মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যুবকের অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে পবিত্র হইতে লাগিল এবং পরিশেষে উহাতে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিল। পাঠক জানিয়া আনন্দিত হইবেন উহার অনতিকাল পরেই ঐ ভাগ্যবান যুবক মহা-পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম কর্ম্মিরূপে প্রভূত লোক কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যদি অতি অশুদ্ধ জীবনও যাঁহার পূত সঙ্গলাভে এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, সরল

এবং নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া যে কতদূর উপকৃত হইতেন তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে ? (ক্রমশঃ)

হিন্দুত্বের ভিত্তি

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

৬। হিন্দুর ঈশ্বর পরায়ণতা।

বিধর্ম্মী God বলিতে যাহা বুঝে হিন্দু ঈশ্বর বলিতে তদপেক্ষা উন্নত কিছু বুঝিয়া থাকে, হিন্দুর ঈশ্বরের প্রতিকোপাসনা প্রতিমা পূজা—Idol Worship (পৌত্তিলিকতা) নহে,—এ জিনিষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং জগতে হিন্দুরই নিজস্ব। অবিবেকী Godheadএর পূজক—সাধারণতঃ যে সমস্ত ভাব ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাইয়াছে, হিন্দুত্বের ভগবদ্‌ভাবের তুলনায় তাহা অলীক অসার ছেলেখেলা মাত্র। Idol Worship (পৌত্তলিকতা) সম্ভ্রম ভীতি সমস্তের Emblem (প্রতিরূপ) স্বরূপেই Idolকে গ্রহণ করে আর তাহারই যে আত্মাকে সে কল্পনা করে তাহাই তাহার উপাস্য God. এই পূজায় পূজক নিজে পূজার বস্তুর কাছে কিছুই নহে, ববং পূজার উপকরণেও কিছু বাস্তবতা থাকিতে পারে তাহার তাহাও নাই। এই শ্রেণীর ঈশ্বর বা এই শ্রেণীর পূজা হিন্দুত্বের মধ্যে স্থান পায় নাই। হিন্দুর প্রতিমা পূজায় পূজকই সর্ব্বময়, প্রতিমা তাহার কাছে একটা স্মারক বস্তু, একটা নিদর্শন, আসল বস্তু তাহার পূজার বস্তুকে চিরদিনের মত ঐ পূজার ভাবে তন্ময়ত্ব লাভ অভ্যাস করিয়া আপনার মধ্যে লাভ করাই হিন্দুর প্রতিমাপূজার লক্ষ্য। প্রতিমাকে বিগ্রহ স্বরূপে সে আপনার হাতে নির্ম্মাণ করে আপনার কল্পনা দ্বারা তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তাহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মত—মানসিক অভিব্যক্তির কোনও একটা বিশেষ স্থানে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত—সম্মুখে স্থাপনা করে মাত্র।

অন্ধকার দুর্গম পথে বৃক্ষশিরে আকাশে বাতাসে জলে চারিদিকে, মৃত্যুর এ পারে ওপারে ভয় কল্পনা করিয়া ভরসার আগ্রহে ঈশ্বরের শরণাপন্নতা, প্রতিমূর্ত্তি লইয়া নৃত্য উৎসব গড়াগড়ি পশুহত্যা,—হিন্দুত্বের ভগবদ্‌ভাবের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। পূজায় পার্ব্বণে যদি কিছু থাকে, তাহার লক্ষ্যের বৈসাদৃশ্য অনুষ্ঠান গত সামান্য সাদৃশ্য হইতে কত চরম ও সুস্পষ্ট তাহা দ্রষ্টব্য।

হিন্দুর ঈশ্বরাস্তিত্বের অনুভূতি অপরাপর ধর্ম্মের মাপ কাঠিতে মাপিতে গেলে, স্থূলতঃ চারিদিকের সকল জাতির ঈশ্বর ধারণার অনুকরণের একটা শৃঙ্খলাহারা সন্নিবেশ, এবং সূক্ষ্মতঃ, অর্থাৎ intellectually বুঝিতে গেলে Mysticism—মানবের বোধাতীত গূঢ়ার্থের সন্দেহে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিবে।

যে ভিত্তির উপর হিন্দুত্বের এই হাজার মহল ইমারত খাড়া হইয়াছে তাহার গঠন প্রণালী যিনি হৃদয়ঙ্গম করিবেন ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরতত্ত্ব তাঁহার মধ্যে একটা মানব স্বভাবের অতলস্পর্শী শক্তির স্পৃহা জাগাইয়া দিবে! ঈশ্বর হিন্দুত্বের মধ্যে স্বার্থ সাধনের উপায় স্বরূপ নহে,—পরমার্থ। হিন্দু কল্পনায়ও স্বর্গ কল্পিত-সত্য; সে স্বর্গে দেবগণ ঈশ্বরেরই উচ্চাঙ্গের উপাসক। স্বর্গযাত্রী সেখানে গিয়া নিছাঁক ভোগসুখ পাইবে, কল্পনা এরূপ নহে। সে উচ্চসঙ্গ এবং উচ্চস্বভাব পাইবে, ভোগসুখ তাহারই পরিণাম। পূজা ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি দ্বারা যে মানসিক অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে—স্বর্গে সেই শ্রেণীরই অধিবাসী দেবযোনীর কথা প্রচার করিয়া পরকালে তাহাদিগের মধ্যে বাসের ভরসা দিয়া হিন্দুত্ব সাধারণ প্রকৃতির মানুষকে ইহলোকেই সেই পরলোকের উপযুক্ত গড়িয়া তুলিবার বৈজ্ঞানিক কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে বিচক্ষণতার সহিত দেখিলে তাহা বোধগম্য হয়।

যে ভারতবর্ষ এই হিন্দুত্বের বাসভূমি, তাহার প্রকৃত ইতিহাস এ কথার ব্যাখ্যা আরও স্পষ্টরূপে করিতে পারিত কিন্তু এমন এক সম্মোহন বিদ্যায় দেশবাসীকে অভিভূত করা এই ধর্ম্ম সংস্থাপকগণের উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে কৃতকার্য্য হইলে পৃথিবীর অনন্তকালব্যাপিনী

বৈচিত্র্যময়ী সভ্যতার হয়ত তাঁহারা চরমরূপ দিতে পারিতেন, তাই সে ইতিহাস যাঁহার মধ্যে তাঁহারা তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গিয়াছেন; তাহাকে বুঝিতে না পারিয়াই দর্শক হিন্দুত্বের ভিতরটা Mysticismএর কুজ্ঝটিকায় অন্ধকার দেখে।

এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে ভৌগলিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতের জাতীয় আখ্যায়িকার অতি সামান্য অংশটাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের দণ্ডায়মান হইবার সম্ভাবনা তাহার হিন্দু-আখ্যাধারী বিশাল জনসংখ্যার ভবিষ্যতের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

এই বিশাল জনসংখ্যা শত সহস্র সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্নবং প্রতীয়মান হইয়া—দুর্ব্বলতায় ভূতলশায়ী—কদাচার কুসংস্কারে পর্যুষিত হইয়াও, এখনও স্বভাবের মেরুমজ্জামধ্যে বিশ্বমানবের জীবন লক্ষ্য হইতে স্বতন্ত্র যে সঙ্কল্পকে পোষণ করিতেছে তাহার স্বরূপ যদিও তাহার কাছে পরিস্ফুট নহে তথাপি স্বভাবের মধ্যে এমন দৃঢ়সম্বদ্ধ যে প্রাণান্তেও যাইবার নয়।

এই সঙ্কল্পের অমরত্ব সম্বন্ধে যখন নিঃসন্দেহ হই তখন জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইবার কারণ দেখি না। বরং মনে হয় বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াই এই সম্প্রদায় দাঁড়াইতে এবং সংস্থাপকগণ যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মের বাঁধনে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে অযথা বিলম্ব করিতেছে।

ফলতঃ হিন্দুত্ব যেন এক মহাবলশালী জারক-বস্তু। মনুষ্য-জাতির পরস্পর স্বার্থ সংঘর্ষকে সভ্যতার প্রভাবে দ্রবীভূত করিয়া সম্পর্কে পরিণত করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বৈষম্যকে সহযোগিতার সাম্যে সার্থকতা দেওয়া এবং সংগ্রামকে যুক্তি ও শান্তির স্বাভাবিক পরিণামে নিয়ন্ত্রিত করা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি। সাম্প্রদায়িক অহঙ্কারে এই হিন্দুত্ব আপনাকে ভ্রান্তভাবে পাইয়া আপনার স্বাভাবিক এবং অব্যর্থ শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বিরোধের একটী সামান্য স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া তাহা ক্রমশঃ অগ্ন্যুদ্গমে পরিব্যাপ্ত হইতে হইতে বৌদ্ধে

হিন্দুতে, হিন্দুতে মুসলমানে, ভারতবাসী ও পাশ্চাত্যে ক্রমশঃ বিরাটতর রূপ ধারণ করিয়া এমন সমস্যা টানিয়া আনিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার আর তাহার মীমাংসা করিতে পারিবে না। এ বিরোধের দাবানল নির্ব্বাপিত হওয়া অসম্ভব।

সমস্যা এমন রূপ ধারণ করিয়াছে যে এই বিশাল সম্প্রদায় বাহিরের দিক হইতে তাহার কোনও রূপ সমাধান খুঁজিয়া পাইবেনা। এবং এই সমস্ত ঠেলিয়া কোনও মতে এবং কোনও দিনেই উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। অন্তরের মধ্যে তাহাকে ডুব দিতেই হইবে।

অন্যরূপ হইবার হইলে এতদিনে মুসলমানের সঙ্গে লড়িয়া, পশ্চাত্যের নিকট প্রবঞ্চিত হইয়া সে রূপান্তর ধারণ করিত। যে বিশিষ্টতা তাহার মধ্যে এখনও এতখানি, তাহা কি সে পরিত্যাগ করিয়া যাহাদের কাছে পরাজিত হইয়াছে তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইত? মুসলমানের বাহুবল ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়বলের আঁটসাঁট পোষাক অঙ্গে মানাইবার জন্য আপনাকে সে কাটছাঁট করিয়া ছোট করিয়া লইতই। আপনার নিজস্ব শক্তিকে ভুলিয়া অথচ আপনারই পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় এতদিন সে গোঙাইত না—যেখান হইতে শক্তি পায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইত।

এই বিশাল সম্প্রদায়ের আত্মবোধ আপনার অন্তরের মধ্যে ডুব না দিলে আর আপন লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইবে না। তাহার আপনার প্রাকৃতিক গঠনের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বীজাকারে নিহিত হইয়া আছে, অনুকূল চেষ্টা বুদ্ধি উৎসাহ প্রয়োগে তাহা অঙ্কুরিত পরিবৰ্দ্ধিত করিতে পারিলেই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রমঃ প্রকাশিত হইয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিবে, কিন্তু, বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার ফলে যেন দৃষ্টিশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহারা আজ দেখিতেই পাইতেছে না,—শক্তি বলিয়া অবশ্য প্রাপ্য সুনিশ্চিত একটা কিছু আছে তাহা আর ধারণাতেই আসিতেছে না। স্বরূপে তাহাকে দেখিবে কি করিয়া? সত্যকে প্রায় মিথ্যারই মত করিয়া রূপকে সাজাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ ইহাদের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন তাঁহারা এই সান্ত্বনা মনে মনে লাভ

করিয়াছিলেন, সিঁড়ির গোড়ার ধাপ ত ধরাইয়া দিলাম যদি অন্যদিকে না চলিয়া যায়, একদিন না একদিন উপরতলায় উঠিবেই।

হায় অসম্পূর্ণ চেষ্টা! সেই নীচের ধাপের তলায়ই গড়াগড়ি দিতেছে। মন নামক জিনিষটা কেমন এক বিপরীত গঠন ধারণ করিয়াছে ঠিক ভাবে দৃষ্টিশক্তি অবলম্বন কিছুতেই সে, সাধ্য বলিয়া অবধারণা করিতে পারিতেছে না।

জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ এবং হিন্দুর সমাজ ধর্ম্ম রাজনীতি অর্থনীতি পর্য্যন্ত যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দুইটী আমাদের জীবন গঠন সম্বন্ধে চূড়ান্ত তথ্য এখনও হিন্দু নামধারী জনসঙ্ঘের কেহই যেন নিষ্পত্তি করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে।

ধর্ম্মতত্ত্বে যাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া অতীতের গৌরব, বর্ত্তমানে আমার অনুভূতি যদি অবিবেকী God-head এর উপাসকের চেতনাস্তরেই থাকে আমার বিবেক জাগ্রত হইয়া ঈশ্বরত্বের চেতনায় হৃদয়ের বোধ এবং ইচ্ছাকে উন্নত করিতে উঠিয়া পড়িয়া না লাগে, তবে যাহাকে বিশ্বাস ও অবলম্বন করিতে পারিতেছি না তাহাকে স্বীকার করিবার কাপট্যেরই বা আমার প্রয়োজন কি?

আবার কার্য্যক্ষেত্রে দেখি এরূপ যুক্তি তর্ক একেবারেই বৃথা। বিশ্বাস এবং অবলম্বন করিতে না পারিলেও এই স্বীকারকে আমরা কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে পারিনা। আমাদের লঘু মন প্রকৃতির উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ভিতরে ডুবিবার গুরুত্ব তাহাতে নাই কিন্তু ভিতরের অব্যর্থ শক্তি তাহার নিজস্ব এই সত্যের বিধান বলে তাহার উপরে ভাসিয়া বেড়ান ভিতরের বিধানেই পরিচালিত হইতেছে।

অনেক দিন আগে আমার কোনও এক প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি মনে পড়িতেছে যে প্রকৃতির সত্য চাওয়ারূপে আমাদের স্থূল বোধ শক্তির নিকটে আসিয়া ধরা দেয়। তুমি যাহা চাহিতেছ তাহারই অন্তরালে তোমার জীবনের সত্য অর্থাৎ তুমি কি ও তোমার দ্বারা কতদূর সম্ভব সেই মীমাংসা নিহিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতির মন বহির্জ্জগতের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া ভিতরে ডুবিতে আজ কুণ্ঠিত বটে কিন্তু

বহির্জ্জগতের যতখানি সে অনুকরণ করিতেছে তাঁহার কতখানি সে চায়? সমাজ সংস্কার রাজনৈতিক আলোচনা অর্থনৈতিক নূতন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ে জাতির মন তোলপাড় করিতেছে তাহার আলোচনা করিয়া তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

আমি মনে মনে যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমার সিদ্ধান্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অনুকরণ হিসাবে এই জাতিটী অন্যজাতির আচার ব্যবহার উপায় লক্ষ্য লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে, সমস্তই লঘুমনের উপরকার স্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি ভঙ্গ মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে সে ঐ সমস্ত চাহিতে পারিতেছে না। চাহিলে দেড় শতাব্দীতেও কি সে কতকগুলি জিনিষ লাভ করিতে পারিত না? সত্যই এতখানি অথর্ব্বত্ব এ জাতি পায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুসলমানের বাহুবল ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়বলের আঁটসাঁট পোষাক অঙ্গে মানাইবার জন্য আপনাকে সে কাটছাট করিয়া ছোট করিয়া লইত।

যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে বড় হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করে, তাহার অর্দ্ধস্ফুট শৈশব ও কিশোর মনস্তত্ত্ব যেমন চারিদিকের ছোট জীবন-যাত্রাকে মানিয়া লইতে পারে না অথচ আপনার মধ্যের সুপ্ত কল্পনা তখনও জাগিয়া উঠে নাই, কি যে মানিয়া লইবে তাহা অবধারণা করিতে না পারিয়া ভুলের জন্য ভুল এবং বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহ করিতে থাকে, তাহার ফলে হয়ত জীবনটা সাধারণ জীবন-যাত্রা হইতে দূরে ছিটকাইয়া চলিয়া গিয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে সাধারণের চক্ষে নষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু সেই জীবনের মধ্যে তথাপিও একটা অনির্ব্বচনীয়ের প্রভাব সেই সাধারণেই অস্বীকার করিতে পারে না—

ঠিক তেমনই হিন্দুর এই লক্ষ্যভ্রষ্ট সামর্থ্যহীন জাতীয় জীবনটা একটা অনির্ব্বচনীয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত! ইহার পরিণাম চিন্তা কেবল মাত্র নীরাশা আনে না তাহার সমপরিমাণ বিস্ময়ও আনিয়া থাকে।

সেই অনির্ব্বচনীয়কে মানব কল্পনা এখানে বহুদিন হইল লাভ করিয়াছে। জাতীয়-জীবনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে কিন্তু কেমন যেন

পিছিল পথ, আর যাহারা তাহার অভিমুখে চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে তেমন শৃঙ্খলা নাই যে দিকে যাইলে সত্বর তথায় পৌছান যায় সে দিকে এখনও জাতীয়-জীবন গিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

একটা গূঢ় কারণকে অবহেলা করিতেছি বলিয়া বোধ হয় এমন হইতেছে। আমাদের জীবন গঠন সম্বন্ধে চূড়ান্ত তথ্য দুইটীর নিষ্পত্তি করিয়া লইতেছি না এই গূঢ় কারণ ইহাও হইতে পারে।

ঈশ্বরকে জীবনে লাভ করিতে হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত অভিকল্পনা দূর করিতে হইবে! ভরসা এই যে তাহা নূতন করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই লঘু মনকে ভিতরে ডুবাইতে পারিলেই সে কাজ হইয়া যাইবে! জাতীয় ভাবসম্পদ ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত মীমাংসাই করিয়া রাখিয়াছে, ব্যক্তিগত জীবনে আমরা প্রত্যেকে তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেই হইল।

আমরা যাহা নহি আপনাকে তাহা বুঝিয়া যদি আমরা নিজেরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি তবে ঈশ্বর যাহা নহেন তাঁহাকে তাহা বুঝিয়াই বা আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না কেন? তাহাই বর্ত্তমান অবস্থা। আমরা যাহা জগতের মধ্যে, আপনাদের আমরা সেই ভাবে দেখিতে প্রস্তুত নহি! বেদান্তের ভাষায় আমরা মায়া মুগ্ধ হইয়া আছি! কিন্তু আমি বেদান্ত সত্যের মধ্যে বেদান্তের মায়াকে দেখাইতে চাহিনা। এই স্থূল চর্ম্মচক্ষে এই আধিভৌতিক স্থূল জগতে আমাদের প্রকৃতি আমাদের অনুভূতি বুদ্ধিবৃত্তি কি আশ্চর্য্য মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহা দেখিয়াই আমি অবাক! সেই মায়াকে অপসারিত করিতে যে ঈশ্বরের প্রয়োজন তিনিই আমাদের উপাস্য হউন।

(সমাপ্ত)

"মণির" মরম বাণী

(শ্রীমহীন্দ্রনাথ লাহিড়ী)

বহুদিন পৃথিবীতে আসিয়াছি আমি,
কাটিল সৌত্তর বর্ষ সংসার ধাঁধায়,
পরলোকে কিবা গতি হইবে আমার,
অস্থির করিল মোর সুস্থির হৃদয়।
সুখদা মোক্ষদা শ্রেষ্ঠা আছে বারাণসী,
যাইব তথায় মোরা সংসার তেয়াগি,
জয় বিশ্বনাথ বলে আত্ম সমর্পিব,
ভবে আনাগোনা কষ্ট অব্যর্থ মিটাব।
চৌদিকে চাঁদের হাট হাসে খেলে নাচে,
পুত্রদের পৌত্র আর নাতিদের নাতি.
জননী বলেন মোর, ইহাদের ফেলে,
কাশীবাসী হতে সাধ নাহিক আমার।
যে দেশে যে কেহ আছে আপন বলিতে,
সবাই একত্র হবে ভাগীরথী তীরে,
রাম নাম হরিধ্বনি দিবে কর্ণমূলে,
গণ্ডুষ গণ্ডুষ জল দিবে মুখে তুলে।
দেখিতে দেখিতে দুই আঁখি মুদে যাবে,
অয়ি গঙ্গে! অয়ি গঙ্গে! মুক্তি দেহ মোরে,
হৃদির অস্ফুট ডাক যাবে মা'র কাণে,
এই ভাবে মৃত্যু হয় অন্তিমের সাধ।
এই ভাবে কাশী প্রাপ্তি ভাগ্যে যদি থাকে,
সময় বলিয়া দিব লয়ে যাবে মোরে,
মাতা মোর রাজি নন কাশীবাসী হতে,
অগত্যা একাই যাব ছাড়ি গৃহস্থলি।

এই যুক্তি মনে মনে করি আন্দোলন,
বিচার বিলম্ব বিনা উঠিলাম যানে,
জীবাত্মা মিলন আসে পরমাত্মাসনে,
পুলকিত চিত্ত মোর উল্লাসে মগন।
পুত্রে একে বহুদিন করিনি দর্শন,
লক্ষ্ণৌয়েতে অবস্থান করে প্রাণাধিক,
একবার তথা গিয়া তারে দেখে আসি
তারপর আমরণ হব কাশীবাসী।
এই যুক্তি করি, থাকি লক্ষ্ণৌয়ে দুদিন
অগনন ভাঙ্গা ঢেউ আলোড়িল মন,
চুরি করি প্রবেশিল হৃদয় আগারে,
ছায়ারূপী মিথ্যা মায়া হল অন্তরায়।
মনে পড়ে ভাঙ্গা বাড়ী সহ পরিজন,
সন্তান সন্ততি আর পৌত্র পৌত্রী যত,
পঞ্চান্ন বর্ষের সাথী আর একজন,
না করিতে পদার্পণ যৌবন সামায়,
কোমল লতিকা যথা বাড়য়ে আঁকড়ি,
আঁকড়ায় সহকারে সহস্র বন্ধনে।
থাকা প্রয়োজন এবে মাতৃ সন্নিধানে,
গুরুভার লয়ে স্কন্ধে আজি ভদ্রাসনে।
মনে পড়ে ভ্রাতা বন্ধু আর দেশবাসী,
বহুকাল দূরস্থিত কন্যা জামাতায়,
দৌহিত্র দৌহিত্রী আদি নানা সম্প্রদায়,
পথের পথিক মাত্র পান্থাবাসে দেখা।
বহুকাল দেহ ধরি পাতায়ে সংসার,
ভাল করে বুঝিয়াছি অনিত্য অসার,
সকলি অসার শুধু মায়া মরীচিকা,
উচিত কি হয় আর এতে লিপ্ত থাকা।

ওহে মন এক কথা শুধাই তোমায়,
নির্লিপ্ত সাধনে শক্ত ডর কি কারণ ?
কর্ত্তব্য সাধিয়া নিজে হও অগ্রসর।
জাগিল সমস্যা মহা, মহাগুরু লয়ে,
নবতি বর্ষীয়া মার অন্তিমের সাধ,
মরিলে আগুন মুখে দেয় মোর 'মণি',
বিশাল অনন্ত বিশ্বে আছ কিহে কেহ,
অন্তিমের মনোরথ করিতে পূরণ ?
নির্ঝরে সাগর গর্ভে হিমাদ্রি শিখরে,
সঘন ঘন গগনে, বিদ্যুতের দামে,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি অষ্টমূর্ত্তি ঈশ,
গোলোকে বৈকুণ্ঠে হরি ব্রহ্মলোকে সৎ।
চরণ ধরিয়া সাধি করহে বিধান,
অঘটন ঘটিয়সী শক্তি হে তোমার,
ইচ্ছায় পূরণ হয় ভক্ত মনস্কাম,
ভক্ত পদবাচ্য নহি ! জীবতো তোমার।
দশম সংস্কার শ্রাদ্ধ সপিণ্ড করণ
সমাপন কাশীধামে, করিয়া বসিব,
মৃত্যু মোর চির বন্ধু এস সেই কালে,
আলিঙ্গন তোমায় হে দিব কুতূহলে।
চৌরাশি লক্ষ জনমে সত্যবন্ধু তুমি
যতবার ক্ষুদ্র দেহ প্রকৃতি দিয়াছে,
ভেঙ্গে দেছ তুমি বন্ধু ভাল গঠিবারে
ক্রমোন্নতি পথ মাত্র তব মধ্য দিয়া ;
ভীষণ পীড়ার কষ্ট পরিজন ত্যক্ত,
তখনি দিয়াছ শান্তি শান্তিময় কোলে ;
কোন্ সুখ আছে বন্ধু অমরত্ব লাভে,
অজরত্ব যদি তাহে নিত্য না বিরাজে।

পরিণামী নিত্যা মাতা অজ্ঞাতা প্রকৃতি,
"শূদ্র" গঠেছিলা মোরে মানব শরীর,
পরে 'বৈশ্য' পরে 'ক্ষত্র' শেষেতে 'ব্রাহ্মণ'
জন্ম যত ভবে হয় চরমে পৌঁছেছি।
পড়েছি শুনেছি আর শাস্ত্রেতে দেখেছি
মায়ের চব্বিশ তত্ত্ব 'আমি না, তা, তুমি'।
শরীর গ্রহণ করি জীব আত্মা আমি,
সেই দেহ প্রাণবন্ত আমার আশ্রয়ে।
বিশ্বদেহে সেইরূপ পরমাত্মা তুমি,
বিশ্বব্যাপী বিশ্বপ্রাণ নিখিল জগতে,
তোমার আশ্রয়ে সদা সর্ব্ব চরাচর,
সৃজন পালন ক্রিয়া আর ধ্বংস নাশ,
নশ্বর প্রকৃতি ধর্ম্ম তোমার আশ্রয়ে।
অবিনাশী আত্মা আমি যে দেহে সৃজন,
লিপ্ত ভাবে থাকি ভ্রমে মায়াতে বেষ্টিত,
স্ব ইচ্ছায় আসি কিম্বা কর্ম্মে বেঁধে আনে
অথবা করিতে পূর্ণ ভবানন্দ লীলা
'একাহং বহু ভবামি' বেদান্তে যা বলে,
কিবা সত্য কিবা ভ্রান্ত জ্ঞান তুমি একা,
'যত মুনি তত মত', বিনিয়োগ এক
এ সংসারে বহুবিধ ধর্ম্ম প্রচলিত,
একের অগ্রাহ্য মত অন্যের বিহিত।
বিনা তর্কে সর্ব্বধর্ম্ম পাতি সিংহাসন
সত্যকে সম্রাট মানি করিছে অর্চ্চন।
একা তুমি সেই সত্য নিত্য বিদ্যমান,
তোমা হতে পাইয়াছে তত্ত্বজ্ঞানী জ্ঞান।
অখণ্ডিত সত্য জ্ঞান লভেছে যে জন,
দেহ ত্যজি সত্য লোকে করিবে গমন।

অনন্ত সত্য জ্ঞানের তুমি মাত্র খনি,
সর্ব্বসত্য প্রতিপাদ্য জ্যোতির্ম্ময় মণি,
ধ্রুবতারা তব আলো লক্ষ্যে দৃঢ় করি,
নির্ভয়ে ভব সাগর পারে যাবে তরী।
হৃদয়ে সুদৃঢ় যার সত্যের মাহাত্ম্য,
কি সম্পদে কি বিপদে ত্যজে নাই সত্য,
হে সুন্দর সত্য শিব তব সেই ভক্ত,
সাযুজ্যে দখল তার হইয়াছে শক্ত।
প্রকৃতির অংশ মাত্র যতেক শরীর,
শরীরী একাই তুমি সর্ব্ব ঘটে স্থির।
তুরীয় অতীত তুমি বৈখরী অতীত।
প্রকৃত তোমার তত্ত্ব সর্ব্ব অবিদিত॥
তুরীয় আনন্দ লভে যোগ যুক্ত মুনি ;
বিজন গিরি গুহায় বাহ্যজ্ঞান রোধি
তোমার ধ্যান সাগরে মগ্ন সদা রয়,
যোগ করি জীব আত্মা বিশ্বের আত্মায়।
তীক্ষ্ণধার কাঁটাবনে করি বিচরণ
কাঁটাময় বৃক্ষ পত্র করিয়া চয়ণ
মুঞ্জরীত গুল্ম হতে পত্রভার আনে
পত্র, পুষ্প, ফল দেয় তদীয় চরণে।
মার্জ্জন করিতে রত দেবতা মন্দিরে,
নদী হতে আনে বারি পূজে নত শিরে,
এইরূপ আজীবন রত দেবার্চ্চনে,
ধ্যান ধরে বসে আছে কভু আনমনে।
দৈবযোগে কোন দিন দ্রব্যগুলি পেয়ে,
নজ বক্ষে নিজ শিরে দেয় চাপাইয়ে,
নৈবেদ্যের দ্রব্যগুলি দেয় নিজ মুখে,
সংজ্ঞাহীন এই ভাবে কতক্ষণ থাকে।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি কয়,
আবার কেন হে প্রভু আনিলে ধরায়,
কেন না হইল অন্ত পূর্ব্ব অবস্থায়
বড়ই দুর্ভাগা আমি দুর্ভাগা নিশ্চয়।
কোথা ছিল কার কাছে ধরার বাহিরে,
কি দেখিল কি শুনিল বলিবারে নারে,
জিজ্ঞাসিলে কোন কথা উত্তর না দেয়,
প্রশান্ত নয়ন তারা হৃদি কথা কয়।
হরিনাম গাথা মুখে হৃদে নিত্য ধন,
শ্রবণেতে হরিগুণ করিছে শ্রবণ
বাহ্যজ্ঞান নাহি তার তাণ্ডব নর্ত্তনে
সমাধি হইল তার পড়ে ধরাসনে।
তুরীয় আনন্দ লাভ হয় ব্রহ্মজ্ঞানে
তুরীয় আনন্দ লাভ পূজকের প্রাণে
তুরীয় আনন্দ লাভ সমাধি দশায়
সকলে নিশ্চিত পায় প্রভুর কৃপায়।
হে 'মহতো মহীয়ান অণোরণীয়ান'
বিশ্বের নিয়ন্তা ধাতা করিছ বিধান
অধিকারী ভেদে যারে যা করেছ দান
তারি মাপে তারে মুক্তি করে থাক দান।
সানুকূল ভাব যত করিয়া গ্রহণ
প্রতিকূল ভাব যত করিয়া বর্জ্জন
রক্ষা করিবেন দাসে জীবনে মরণে
শরণ লইলাম আমি প্রভুর চরণে।
ধরিব বলিলে যারে ধরা নাহি যায়
তাড়াবো বলিলে যারে তাড়ান না যায়
মনের বাহিরে যারে পাষণ্ড নাস্তিক
কিছুতে করিতে নারে তিনি ব্রহ্ম ঠিক।

দেহ মন প্রাণ আদি কোন বস্তু হতে,
যাঁহাকে কিছুই হতে পারি না ছাড়াতে,
সেই নিত্য সেই সত্য সেই সর্ব্বময়,
সেই সার বস্তু ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়।
নিত্য বস্তু তুমি একা বুধগণ রটে
হে অপরিণামী নিত্য হে সারাৎসার
তুমি বিনা যাহা কিছু অনিত্য অসার
'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্ম অস্মি'
বুলি বলা বড় সোজা ধারণা কৈ হয়?
'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বেদান্তের বুলি,
সাধা বুলি কপ্‌চাই ভাব অর্থ ভুলি
মায়ায় সৃজিত বিশ্ব মায়া কিসে ভুলি।
ব্রহ্মজ্ঞান পেতে চায় কোটী মহাজন,
সেই জ্ঞান লভিয়াছে পদ্মে কয়জন?
সর্ব্বমখণ্ডিত ব্রহ্ম অভেদ জগতে
ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তু নাহি এ বিশ্বেতে।
অভেদ জ্ঞানের জোর বড়ই বেড়েছে,
সান্নিপাতিকের তৃষ্ণা অর্থেতে হয়েছে,
উপার্জ্জন যাহা কিছু করি এ সংসারে
লৌহ বাক্সে বন্ধ করি স্ত্রী পুত্রের তরে!
কায়দা করে লাগাই তাতে চাব্‌সের তালা
আমি ছাড়া অন্য কারো সাধ্য আছে খোলা
দুর্ভিক্ষের গান গেয়ে চাঁদা নিতে এলে
যশ আশে দিই কিছু নিজ হাত খুলে।
চমৎকার ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন ভেদ নাই
স্বার্থত্যাগে বীর দেখি আমরা সবাই
এমন ধারা ব্রহ্মজ্ঞানে আর কাজ নাই
জগত ঠকাতে গিয়া নিজেকে ঠকাই।

দর্শন শাস্ত্রের পথ অতীব দুর্গম,
সেই মার্গে যেতে আমি নিতান্ত অক্ষম,
বাঁকেতে কুপথ তার আছে কত শত,
যে পথে যাইলে প্রাণ হারাব নিশ্চিত।
সৌভাগ্য সুবুদ্ধি যদি ঠিক পথে লয়,
অসাধ্য সাধন ভাবি মনে হয় ভয়।
ভেদ হীন দ্বিধা হীন হৃদে দৃঢ় বল,
মূর্খ আমি চাহি দেব মূর্খের সম্বল।
নাহি কোন প্রয়োজন শব্দ আড়ম্বরে,
বদ্ধ প্রাণ খুলে দাও জাগাও অন্তরে,
জ্ঞান গর্ব্ব ভেঙ্গে দাও বৃথা অহঙ্কার,
দিন যায় পরক্ষণে হবে অন্ধকার।
উথলে সমুদ্র বারি চন্দ্র আকর্ষণে,
কোটী চন্দ্র 'চন্দ্রচূড়' রূপ দরশনে,
ছুটিবে প্রাণের বন্যা হৃদয়কন্দর
প্লাবিত হইবে প্রাণ দিগ্‌দিগন্তর।
বিশাল অসীম প্রাণ হইবে আমার,
প্রেমামৃত সিন্ধু সনে মিশে একাকার,
প্রেমের পীযুষ স্রোতে ঢেলে দিব প্রাণ,
টানে টানে লয়ে যাবে কেন্দ্র মুখ টান।
কভু ডুবে, কভু ভেসে, পান করি সুধা,
বিভোরে পারায়ে যাব সংস্কারের বাধা,
কেটে যাবে মায়া নেশা চরণ পরশে,
অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথে হেরিব হরষে।
হৃদয়ে ফুটিবে ভাব প্রাণের আবেশে,
অবশেষে গতি হবে শ্রীচরণে মিশে,
বুঝেছি এখন আমি জ্ঞান বড় শক্ত,
নিজগুণে কৃপা করে কর মোরে মুক্ত।

সংসার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার)

নরেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় রাস্তাতেই বিনয়কে দেখিতে পাইল। সে তখন স্কুল হইতে ফিরিতেছিল। কারণ শীঘ্রই ইন্‌স্‌পেক্টর আসিবার কথা, তাই সে কতকগুলি বিশেষ কার্য্যের জন্য প্রায় প্রতিদিনই বিলম্বেই বাড়ী ফিরিত। বিনয় নরেনকে দেখিয়াই প্রথমে একটু চমকাইয়া উঠিল, এবং তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাকাইয়াই বুঝিল যে কিছু একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। কারণ তখনও সে তাহার মনের চঞ্চলবেগ সামলাইতে পারে নাই; ক্রোধে অপমানে যেন ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল। সে একজন কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র, তাহা ছাড়া গ্রামের কোন লোকের চেয়ে কোন বিষয়ে হীন নহে। তাহার পিতা কাহারও প্রত্যাশী নহেন, পরন্তু দশ জনের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও উচ্চশিক্ষিত। এ অবস্থায় কিনা কয়জন মূর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাড়াগাঁয়ের অপদার্থ মানুষ তাহাকে এরূপ ভাবে অপমানিত করিল? সে ভাবিল আমার জবাবটা নিতান্ত কম হইয়াছে। আরও কতকগুলি কড়া কথা শুনাইয়া না দেওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাজ হইয়াছে। কলেজের সহপাঠীদের লইয়া সে কতদিন সমাজ সংস্কারক সভায় যোগদান করিয়া কতভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে; এবং গ্রামে আসিয়া এই বন্ধন-ক্লিষ্ট চির পুরাতন পথাবলম্বী সমাজ রক্ষকদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠালাভ করিবার কত আশার স্বপ্ন সে আজ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ সুযোগ পাইয়াও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না,—শুধু অতর্কিত আক্রমণের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া সে কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইয়া কাপুরুষের মত চলিয়া আসিল, এই ক্ষোভটাই বার বার

তাহার চিন্তাপথে আসিয়া তাহাকে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিল। কাজে কাজেই সে বিনয়ের কথা শুনিয়াও শুনিল না, কেবল অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে লাগিল।

বিনয় কিন্তু ব্যাপারখানা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছিল, তাই সে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এরকম ভাবান্তর হলো কেন নরেন বাবু? কিছু হয়েছে নাকি?" নরেন একটু পরে উত্তেজিত ভাবেই উত্তর করিল, "না—যতদিন এই ভণ্ডগুলোকে জব্দ করা না যায় ততদিন গ্রামের কোন বিষয়েই উন্নতি হবে না। খুঁটি নাটি ছাড়া আর ওদের কোন কাজ নেই। আপনার ইনস্পেক্টর কখন আসছেন?" বিনয় এতক্ষণে ব্যাপারখানা অনুমান করিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়াই একটা কল্পনার ছবি মনে মনে গড়িয়া প্রকাশ্যে বলিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দলের সঙ্গে কিছু হলো নাকি? আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা কাণ্ড করে ফেলেছেন। আপনারা শক্তি উপাসকের ....," "হাঁ যাক আর বলতে হবে না, আমি আপনার মত নির্জীব ছেলে নই যে অপমান লাঞ্ছনা পেয়ে উল্টো নিজের উপরই অভিমানের বোঝা চাপিয়ে দেশত্যাগী হব। আমি নিশ্চয়ই দেখব তারা কতদূর কি করতে পারে। রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এরকম অভদ্র ব্যবহার আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।"

বিনয় সবই বুঝিল, কিন্তু নরেনের মানসিক অবস্থা সংপ্রতি যেরূপ তাহাতে সান্ত্বনা উত্তেজনা দুইই বিফল বিবেচনা করিয়া উভয়েই নিঃশব্দে বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, শান্তি ধূপ ও প্রদীপ লইয়া পূজার দালানে যাইতেছিল। বারান্দার সিঁড়ির দুই একটি ধাপ উঠিতেই সে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, এবং যাহাতে তাহার উপর উহাদের দৃষ্টি না পড়ে এই ভাবে তাড়াতাড়ি মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার কারণ এই যে, পূজা পাঠের ব্যাপার লইয়া নরেন প্রায়ই তাহাকে ত্যক্ত করিত; তাই সে এসব ব্যাপারে নরেনের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিত। নরেনের কিন্তু আজ সেদিকে লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা আদৌ ছিল না। সে সোজাসুজি বাহিরের

ঘরে গিয়া বসিয়াই একটা আলোর জন্য শান্তিকে ডাক দিল। শান্তি তখন পূজার দালানে প্রদীপ ও ধূপদানী রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছিল, তাই সে ডাক শুনিতে পাইল না। এদিকে সাড়া না পাইয়া নরেন খুব উচ্চৈঃস্বরে উপর্যুপরি কয়েকটা ডাকদিতেই মা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন তোর কি হয়েছে কি ? এত চীৎকার করিস্ কেন ?" "দেখনা ঘরে একটা বাতি নেই, অন্ধকারে বসি কি কোরে ?" বলিয়া নরেন নিজেই আলো আনিবার জন্য ভিতরে যাইতেছিল ; এমন সময় একটী ভৃত্য একটা হাত বাতি আনিয়া ঘরের মধ্যে রাখিল। নরেন তাহাকে বলিল, "আমার টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে এটা বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যা।"

ভৃত্যটী আদেশ পালন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। নরেন ও বিনয় একটা টেবিলের দুইপাশে দুইটী চেয়ার লইয়া বসিয়া পড়িল। বৈঠকখানা ঘরটী যদিও সাধারণ ভাবের, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজান গোছান। বাহিরের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেই প্রথমে কয়েকটী দেবদেবীর বাঁধান ছবি নজরে পড়ে। তার কতকগুলি সেকালের ধরণে আঁকা অর্থাৎ রং বাহুল্য। কয়েকটী আধুনিক আর্টিষ্টদের ছবি ; সে গুলিও বড় সুন্দর। ইহার মধ্যে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতিরও এক একটা বাঁধান ছবি বামে ও দক্ষিণে সজ্জিত। মোটের উপর ঘরটীর চারিদিকের দেওয়ালের উপরের অংশ প্রায় তসবীর দিয়াই ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেঝের মধ্যে দুইটী তক্তাপোষ পাশাপাশি রাখা, তাহাতে দুইজনের শুইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বিছানাগুলিতে এবং অন্যান্য আসবাবের মধ্যে অনেকটা স্বদেশ প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। টেবিলের উপর একগাদা ইংরাজি বই সাজান। আর একটা ছোট গোল টেবিল, একখানি Table Cloth দিয়া ঢাকা, তাহা শান্তির নিজের হাতের তৈরী। টেবিল চেয়ার ইত্যাদির অধিকাংশ জিনিষগুলিই তাঁহার বাড়ীতেই গ্রামের ছুতার মিস্ত্রীর দ্বারা প্রস্তুত। তাঁহারই যত্নে কয়েকজন মিস্ত্রী এখন উৎসাহের সহিত দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

নরেনের চা খাওয়া অভ্যাস ছিল। ঠিক সময়মত শান্তি চা আনিয়া হাজির করিল। চায়ের কাপে মুখ দিয়া সে একেবারেই প্রায় অর্দ্ধেকটুকু শেষ করিয়া বিনয়কে বলিল, "দেখুন বিনয় বাবু! আমার মনে হয় আমাদের সমাজের কতকগুল গোঁড়া সনাতনপন্থীই আমাদের সকল রকম কষ্টের মূল। তারা যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নাম দিয়ে এমন এতবড় হিন্দু সমাজটাকে পরিচালিত করতে চায় সেটাকে প্রকারান্তরে অনাচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন "তোদের ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন সব ভাতের হাঁড়িতে" বাস্তবিকই সেটা সম্পূর্ণ সত্য। কতকগুল অযথা আচারের বন্ধনে অষ্টে-পৃষ্টে নিজেকে বেধে তাদের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি বলে কোন একটা জিনিষ থাকে না। তার ফলে ভিতরের আসল মানুষটা চাপা পড়ে মরে যায়। কাজে কাজেই সমস্ত কাজই প্রাণহীন।" বিনয় এতক্ষণ একটা মাসিক পত্রিকা অবলম্বন করিয়া চিন্তাসাগরে ডুবিয়াছিল। নরেনের কথায় হঠাৎ চমক ভাঙ্গিলে নিজের অমনোযোগিতাটুকু ঢাকিবার জন্য কোন কিছু না বুঝিয়াই উত্তর করিল, "তা কতকটা বটে বৈকি।" নরেন একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তা বটে কিরকম? নিশ্চয়ই তাই। আপনি আবার এর উপরেও টীকা টিপ্পনী দিতে চান নাকি? তা হলে আপনি স্বামিজীর কথাও বিশ্বাস করেন না বলুন!" নরেন বেশ ধীরভাবেই উত্তর করিল, "স্বামিজীর কথা আমি হিন্দুর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা কম বিশ্বাস করিনা। কিন্তু সে আদর্শের অনুকরণ করতে পারি কই ভাই! ক্ষুদ্র হীন আমরা গগনভেদী সুমেরুর বিরাট কায়ের পাদমূলে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে পড়ে আছি, কিন্তু সে মহিমাময় বিরাটের কোথায় কি আছে দেখতে পাই কই? স্বামিজীর চোখে দেখ্‌তে হলে একদিকে যেমন প্রাচীনের জীর্ণ কলঙ্কভরা আচারের ঝুড়ি দেখ্‌তে হবে, আর একদিকে তেমনি নবীনের চাকচিক্যময় সোনার পাতে মোড়া আবর্জ্জনা দেখ্‌তে হবে। আমার মনে হয় ঘর্ষণে মার্জনে কলঙ্ক বোধ হয় একদিন উঠে গিয়ে আবার এই জীর্ণ প্রাচীনও পবিত্র শুভ্র হতে পারে; কিন্তু অনেক পরিশ্রম ও আদর যত্নে যে সকল আবর্জ্জনা জমা হচ্ছে তার পরিণাম কি হবে? আমাদের

শ্যাম এবং কূল দুই যে যেতে বসেছে!" নরেন চায়ের পেয়ালাটী মুখ হইতে নামাইয়া তর্কের সুরে বলিল, "কি রকম? উদারতা ও সাম্য বলে একটা জিনিষ আপনার পুরাতনে ছিলনা ওটা খাঁটি নূতন আমদানি এটা আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি। আর যদিই বা ইতিহাসের দৃষ্টির বহুদূরে কখন কোথাও একটু ছিল, তার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই এখন বুঝা যায় না। এইজন্য আমার মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম খাঁটি হিন্দুত্বের একটা গৌরবের জিনিষ।" বিনয় এতক্ষণে কথাটার একটু গভীরতা অনুভব করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না তা আমি স্বীকার করতে পারিনা। যার নাম হিন্দুত্ব তার গৌরব আপনি আপনার প্রভায় উদ্ভাসিত। এর ভিতর যে উদারতা, যে সাম্য, যে সার্ব্বজনীনত্ব ছিল ও আছে তা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। যদি আমরা তা দেখ্‌তে না পাই তবে সেটা আমাদেরই অন্তর্দ্দৃষ্টির অভাবের জন্য। যে যা চায় তাকে তাই তাই দিয়ে তার চিরদিনের পিপাসা শান্তি করতে পারে এই হিন্দুত্ব। পরম পিতা পরমেশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলে' কায়মনোবাক্যে স্বীকার করতে পারে হিন্দুত্বের উপাসক, খাঁটি করতে পারে হিন্দুত্বের উপাসক খাঁটি হিন্দু। আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে এ ছাড়া জগতের আর সবই অতি ক্ষুদ্র। তবে আমার যা আছে সেই ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ করতে গেলে আমি বল্‌ব সে একটা অতলস্পর্শী মহাসমুদ্রের মতন রত্নসম্ভার গর্ভে নিয়ে বসে আছে। আমরা তার বক্ষের সন্তান হয়েও যদি এর খোঁজ খবর না নিয়ে একেবারে তাচ্ছিল্য করে বসি তবে নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হবে। স্বামিজী একথা বোঝাতে ত্রুটী করেন নি। কিন্তু আমাদের কাণে সে কথা ভাল করে' যাইনি; কারণ আমরা বড় আরামে ভেসে চলেছি। নিশ্চল নির্জীবের মত তীরে বসে সমুদ্রের ঢেউ সংখ্যা নির্ণয় করলে যেমন রত্ন পাওয়া যায় না, আবার স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেলেও ফল সমানই। বরং কোন অচেনা নির্বান্ধব মায়াপুরীতে উপস্থিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়াও অসম্ভব নয়। আমার মনে হয় অগণ্য শিল পাথর থেকে আরম্ভ করে' নিবিড় বনানী পর্ব্বত নদী প্রভৃতি প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভগবানের

স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সুখ দুঃখের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতেও হিন্দুত্ব যেমন বেঁচে আছে তেমনটী আর কেহ পারে কিনা সন্দেহ—মহাপুরুষের ভাষায় বল্‌তে হলে', বল্‌ব পারে না। হিন্দুর উপাসনার স্থান ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ নয়, তার সাধনার ক্ষেত্র সসীম ক্ষুদ্র বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়—তাহা অপরিমেয় অনন্ত। হিন্দুত্বের ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান তখন তিনি না পারেন বা না করেন এমন কিছু চিন্তায় ও ধারণায় স্থান পায় না। তাই তার উদার দৃষ্টিতে কখন তাঁকে মূর্ত্তিমান ভক্তবৎসল করুণাময় ধ্রুব প্রহ্লাদের হরি, কখন শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী সৃষ্টি স্থিত লয় কারণ জগন্নাথ, কখন বা চক্র ধনুর্দ্ধারিন লোকনাথ রাজরাজেশ্বর, কখন কলুষনাশন হিরণ্যকেশ—কংসারি মধুকৈটভ হরে, আবার কখন পুরাণ শাশ্বত বেদ বেদাঙ্গরূপিন পুরুষোত্তম কিম্বা অব্যয়াচিন্ত্যাব্যক্ত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অক্ষর ব্রহ্ম—কেবল ওঁ। যে তার জীবনারাধ্যের অপরূপ মূর্ত্তি দেখে, তাঁর মধুর বাণী শুনিয়া শ্রবণ-শক্তি ধন্য করে, তাঁর অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া চিরতাপদগ্ধ হৃদয় শীতল করে, আবার তাঁর মধ্যে চিরদিনের মত নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তার জগতে আবার কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে ভাই !" বিনয়ের এক নিঃশ্বাসের এতগুল কথা শুনিয়া নরেন বলিল, "তা এত বড় উদারতার উদাহরণ ত ঐ সমাজের কর্ণধার ভট্টাচার্য্যের দল ? খাসা বলেছেন যাহোক !"

বিনয় তেমনি প্রশান্তভাবে বলিল, "দেখুন তাহলে বড় অন্যায় বিচার করা হয় ; কারণ ধর্ম্মের সঙ্গে ব্যক্তি বা জাতিবিশেষকে অতটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়াতে গেলে ধর্ম্মের গৌরব ক্ষুণ্ন করা হয়। ধর্ম্ম কাকেও আশ্রয় করে নাই, ধর্ম্মকে আশ্রয় করেই মানুষ উপরে উঠ্‌বে—'মানুষ' হবে—দেবতা হবে। ধর্ম্ম কখনই জাতি বিশেষকে আশ্রয় করে ছিলনা এবং এখনও নাই। মানুষ তার কার্য্যের জন্যই, ছোট হয়। যার হৃদয়ে শূদ্রত্ব সে যে বংশেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন শূদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির পক্ষেও ঐ কথা। গুণ এবং কর্ম্মানুযায়ীই যদি জাতির সৃষ্টি হ'য়ে থাকে তবে 'ব্রাহ্মণ' বল্‌তে আমরা বুঝব,—মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাঁহাদের এই গৌরবপূর্ণ পদবী লাভ

হয়েছে। আর সকল জাতিরই চরম লক্ষ্য ঐ ব্রাহ্মণত্বলাভ। তারপর ব্রাহ্মণত্ব থেকেই দেবত্বলাভ তাকে করতেই হবে। তবে ক্রিয়াহীন হৃদয়হীন যদি উচ্চ বংশোদ্ভব হয় তাকে কেমন করে' বলব যে সে ব্রাহ্মণ বা ধার্ম্মিক। যদি কেউ সাহস করে' স্পষ্টভাবে বল্‌তে পারেন আমি 'ব্রাহ্মণ' তবে তিনি ব্রাহ্মণ—তিনি হিন্দুর শিরোভূষণ; তাঁর পায়ের ধূলা পেলেও বাস্তবিকই আমি কৃতার্থ বোধ করি। কিন্তু কোথায় সে ব্রাহ্মণ আজ? যাঁর এক গণ্ডূষে জলধির জল শুষ্ক হইয়াছিল, যাঁর অলৌকিক ত্যাগের মহিমায় ভারতের প্রত্যেক স্থান পবিত্র হইয়াছিল, যাঁর তপস্যার প্রভাবে ভগবানের আসন টলিয়াছিল, যাঁর শিক্ষামন্ত্রে কত নির্জীব জড়বৎ আধারে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল, কোথায় সে ব্রাহ্মণ আজ? ষ্টেশনের 'পানিপাঁড়ে', বোর্ডিং হোটেলের পাচক ঠাকুর, ষষ্ঠী পূজার চালকলার পূজারী, আর তীর্থস্থানের মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ও সময় বুঝিয়া, গুণ্ডা ব্যবসায়ী পাণ্ডাঠাকুররাই যদি ব্রাহ্মণ হন, তাদিকেই যদি আপনি ধর্ম্মাবতার ব্রাহ্মণ বলে' ধরে নেন, তবে ধর্ম্মেরও কিছু থাকেনা ব্রাহ্মণেরও কিছু থাকে না।" নরেন বলিল, "তা যাইহোক আমাদের মধ্যে এখন ধর্ম্ম বলে কোন একটা জিনিষ ত আমি দেখ্‌তে পাইনা। ছুঁচিবাই আর আচারের ঝুড়ি এই নিয়ে ত ধর্ম্ম! এর মধ্যে আবার অতগুলো আদর্শ আপনি কোত্থেকে টেনে বের করলেন তাত বুঝতে পারলাম না। আমিত যেদিকে চাই সেইদিকে কেবল বন্ধন ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পাইনা। সকাল থেকে সমস্ত দিন রাত্রি কেবল বন্ধন। এর মধ্যে আপনার একবিন্দুও স্বাধীনতা আছে দেখাতে পারেন? বন্ধনের চোটে কলের মত জীবনটা একঘেয়ে চলে' যায়—না উন্নতি না অবনতি। এখন প্রাণ আছে কিনা তাও বুঝবার উপায় নাই।" বিনয় উৎসাহের সহিতই বলিল, "আমি তা অস্বীকার করছিনা। কিন্তু তাই বলে' যে জীবনে নিয়মানুবর্ত্তিতার কোন আবশ্যকতা নেই একথা আমি স্বীকার করতে পারি না। জগতের যে কোন সভ্য উন্নত জাতির মধ্যেই কি আপনি দেখাতে পারেন যে তারা নিতান্ত শিথিল চরিত্র যথেচ্ছাচারীর মত জীবন বহন করে' মানুষ হয়েছে? তবে তাই বলে'

নিয়ম পালনই ধর্ম্ম নয়, সেটা ধর্ম্মজীবন লাভের উপায় মাত্র। কয়েকখানা বই পড়ে' পরীক্ষায় পাশ করা যদি নিতান্ত সহজ না হয়, ধর্ম্ম জীবন লাভ করা কি তার চেয়ে সহজ যে প্রাণ যা চায় তাকে তাই দিয়েই আমি ধার্ম্মিক হ'য়ে উঠ্‌ব? আমাদের প্রাণ কি চায় ভাই! একবার অন্তরকে ফাঁকি না দিয়ে চিন্তা করুন দেখি?

যদি তার মধ্যে ধর্ম্ম বলে, ঈশ্বর বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পান তবে স্বীকার করব যে ধর্ম্মজীবন লাভ করা সহজ। প্রাতঃকালে উঠে অবধি শুইবার সময় পর্য্যন্ত আমাদের পূজা, সন্ধ্যা, আহ্নিক প্রভৃতি যে সকল নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলে জানা আছে,—তার দৈনিক অনুশীলনে যদি হৃদয়ের উন্নতি কিছু না বুঝ্‌তে পারি, তবে সেটা একরকম বন্ধনই বলতে পারেন। কারণ এমন ক'রে সমস্ত জীবন পূজা করলেও আরাধ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাই কঠোর তপস্যা, স্বার্থের সমস্ত শক্তিকে পদদলিত ক'রে যার প্রাণ শুধু ভগবান লাভের জন্যই ব্যাকুল হয় সেই ধার্ম্মিক—সেই প্রকৃত পূজারী। ঠাকুর বলতেন, "যখন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ীতে সন্ধ্যার আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠত তখন আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে মাকে কেঁদে কেঁদে চীৎকার ক'রে বলতুম, মা দিন ত গেল, কই, এখনও ত তোমার দেখা পেলুম না। তাই বলছি অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম নয়, বাহ্যিক অনুষ্ঠান ধর্ম্মজীবন লাভ করতে সাহায্য করে মাত্র। আর একটা তরুণ হৃদয়কে যদি প্রথমাবধিই নিরঙ্কুশভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে জড় জগতের প্রচণ্ড শক্তিকে অতিক্রম করে নিজে জয়লাভ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

নরেন বলিল, "তা না হ'তে পারে; কিন্তু আমি বলি,—যতদিন মানুষ জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় মুক্তির বাতাস না পেতে পারে ততদিন তাহার হৃদয় বৃত্তিরও সম্পূর্ণ বিকাশের কোনও আশা নেই। মেনে নিলাম—একটা তরুণ হৃদয়কে নিরঙ্কুশভাবে প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারপর তার মনের এতখানি দৃঢ়তা নাই যার দ্বারা সে কোন রকম আকর্ষণের বেগ সামলিয়ে নিজেকে নির্ব্বিকার রাখ্‌তে পারে। এখন এই নিঃসহায় তরুণ মানুষটার সামনে এমন সব বৈচিত্র্য পূর্ণ

জটীলতাময় সমস্যা দেখা দিল,—যাহা তার চিন্তারও অতীত। কিন্তু আমার মনে হয়, সৃষ্টি কর্ত্তা মানুষের মনে মুক্তির আকুল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আত্মরক্ষারও একটা স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন। তার দ্বারা সে যখন অভিনবভাবে আক্রান্ত হবে, তখন তার উপযুক্ত আত্মরক্ষার উপায়ও চিন্তা করবে। কারণ সে তখন বেশ অনুভব করবে যে এই আত্মরক্ষাতেই আমার মুক্তির আনন্দ। এ আনন্দের প্রেরণায় মানুষ বিপদের সম্মুখীন হ'তে ভয় করে না, ফলে সে নিজের আত্মশক্তির সঙ্গে পরিচিত হ'তে শিখে—আর মনে যে সকল সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি প্রচ্ছন্নভাবে সুপ্ত অবস্থায় ছিল—তাকে জাগিয়ে তুলে। এমনি ক'রে সে খাঁটি মনুষ্যত্বের দিকে আগিয়ে যায়। যার জীবন কখনও বিপন্ন হয়নি তার সংসারের আসল শিক্ষাও আরম্ভ হয়নি। আঘাত লাগ্‌তে পারে, এ ভয়ে যদি কেও তলোয়ার খেলার কাছেই না যায়,—সে যে কখন খেলা শিখ্‌বে তা স্বপ্নের মতই সত্যি। অতএব অসুক না বিপদ—আমি সকল সময় প্রস্তুত। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন নাহি ডরি কভু'। যে জটীলতা পূর্ণ জীবন সমস্যা বিপদের উদ্ভাবন ক্ষেত্র তারই মধ্যে আবার আত্মশক্তি স্ফূরণেরও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। তখন মানুষ বিপদকে বিপদ বলেই মনে করে; কেবল মুক্তির জন্য লালায়িত হয়ে অক্লান্ত ভাবে নিজেকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। এবং প্রথমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ছুটলেও ভবিষ্যতে প্রকৃতির কোলেই নানা অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন ক'রতে পারে। মানুষের বীরত্ব—মনুষ্যত্ব ও আত্মশক্তির পরিচয় সেইখানেই, যেখানে সে বিপদকে 'স্বাগত' ক'রে জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে। এর চেয়ে যে গতানুগতিক সরল গ্রাম্য জীবনের মূল্য বেশী তা আমার মনে হয় না।"

বিনয় বলিল, "হ'তে পারে এ যুক্তি আপনার মনের মত। কিন্তু আমি এর সবটুকু মেনে নিতে পারিনা। সকল রকম বিপদ ও অমঙ্গলকে পদদলিত ক'রে মানুষ মুক্তির সংগ্রামে জীবনোৎসর্গ করুক একথা খুবই সত্য,—কিন্তু তাই বলে অনিয়ন্ত্রিত জীবন নিয়ে কেও কখন সংগ্রামে জয়ী হ'তে পারে এটা আমার অভিজ্ঞতায় নেই। তাই—আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক

জীবন যাপন প্রণালীর মধ্যে আপনি যতটা নিরর্থক বন্ধন দেখতে পান আমি ততখানি পাই না। আমাদের বাস্তব জীবনে এরকম বন্ধনের অল্প বিস্তর কার্য্যকারিতা আছে। আমার মনে হয় অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের যদি নিতান্ত বাধাহীনভাবে তাহাদের প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়া হয়—তবে সেই নূতন জীবনের উদ্দমনায় আকাঙ্ক্ষা তাকে কোমল মধুর স্পর্শ দিয়ে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাবে। এই জন্যই কতকগুলি অকাট্য বিধিব্যবস্থা মেনে প্রথমতঃ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিতে হবে। সংযমের দৃঢ় বর্ম্ম দিয়ে নিজেকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে তবে না জয়ের আশা! অন্যথা যে মুক্তি লাভের উচ্ছ্বাস সেটা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর ব'লে মনে হয়। কারণ আমরা অনেক সময় নিজের অন্তরকেই নিজে বেশ ফাঁকি দিয়ে থাকি, তখন সেটা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ঠিক বুঝতে পারিনা। গীতাকারও বলেছেন,—"অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী।" তাই আমার মনে হয় ভাই! জীবন 'দ্বন্দ্বসঙ্কুল সংসারসংগ্রাম নিতান্ত সোজা ব্যাপার নয়। সুতরাং ভাল মন্দ চিনবার শক্তিটা প্রথমে অর্জ্জন করতেই হবে, এবং তার জন্য একটু দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে ভুক্তভোগী হতেই হবে; কিন্তু যথেচ্ছাচার বাবা নয়—মানব জীবনের স্থির লক্ষ্য সেই মুক্তি লাভই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে গৃহী বা ত্যাগী বিভিন্ন মানুষ কেবল মাত্র,

"বিবিক্ত সেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ
ধ্যান যোগ পরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।"

এ ছাড়া মুক্তির যে আর অন্য কি পথ আছে তাত বুঝিনা। অবশ্য 'মুক্তি' কথার অনেক রকম প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, যে মহাজলধি থেকে বুদ্বুদের উৎপত্তি তারই সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়া, ঘটাকাশের অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বেড়া অতিক্রম ক'রে চিরমুক্ত আত্মার মহাকাশের সঙ্গে নিজেকে বিলীন ক'রে দেওয়া।

এটা কি আপনি মানেন?—'ন্যান্যপন্থাঃ'। মান, অপমান, সুখ দুঃখ সব সমান ক'রে 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' ব'লে সাধনা আরম্ভ করতে হবে। নতুবা জীবন সংগ্রামের ধস্তাধস্তিই সার হবে। আমি অস্বীকার করি না যে, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।" কিন্তু এ বন্ধন সৃষ্টির বন্ধনের কথা বলছি না। যাতে আমার আত্মার স্ফূর্ত্তি দমে যায় তাই আমার পক্ষে বন্ধন আর যেখানে মানুষের আত্মসত্তা সকল বাধা সরিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার অবকাশ পায়, সেইখানেই আনন্দ। আবার এই আনন্দ পেতে হ'লে ধর্ম্মকে আশ্রয় করতেই হবে। ধর্ম্মই এ জাতির মেরুদণ্ড। যাহা আজকাল আমাদের শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে অপরিচিত।

আবার ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার মূলে আচারের বোঝা না থাকুক সংযম আছেই। এবং সেই সংযমেরই মূলে নিয়ম পরতন্ত্রতা অন্ততঃ কিছু আছে। নতুবা দুরন্ত ইন্দ্রিয় সকল কখনই মনকে অন্তর্মুখীন হ'তে দিবে না। তারপর মন যদি অন্তর্মুখী না হোল তবে মুক্তির আনন্দ কোথায়? বাহিরের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে যাকে আমরা আত্মার স্বাধীন বা মুক্ত অবস্থা বলে ভুল বুঝে থাকি, সেটা আমার মনে হয় মসীময় তমোগুণেরই একটা ছদ্মবেশ মাত্র। মুক্তির ক্ষেত্র সত্ত্বগুণের চিরোজ্জ্বল আলোকে সদা হাস্যময়—আনন্দময়। সেখানে কোন রকম অবসাদ নাই, চঞ্চলতা নাই, দুঃখ নাই। যতদিন মানুষ প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করতে না পারে ততদিন এ অবস্থার কোন আস্বাদই সে পায় না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে একদিকে যেমন ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি আর একদিকে তেমনি ধর্ম্মের অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী যথেচ্ছার অবাধে চলে যাচ্ছে। কে কাকে কথা বলে? তার ফলও বেশ হচ্ছে! আমাদের জীবন শক্তিহীন হ'য়ে যাওয়া কিছু অসঙ্গত নয়।"

নরেন বেশ উৎসাহের সহিত বলিল, "বস! আমিও তাই বলছি। ধর্ম্মের নামে মিথ্যা ভণ্ডামী আর অযথা গোঁড়ামিই আমাদের সকল দুঃখের মূলে। তার চেয়ে বরং প্রকাশ্যভাবে নাস্তিক হওয়াও মন্দ নয়।

তাতে ভিতরের সঙ্গে বাহিরের কথার একটা মিল থাকে। কে ভগবান? কোথায় তিনি আছেন বা তাঁর কাছ থেকে আমি কি পেতে পারি, তার কিছুই জানি না—অথচ মুখে প্রভু প্রভু করে চীৎকার করাটায় যে কি লাভ তাত আমি বুঝ্তে পারি না। আমার মনে হয় আবার সেই অদৃশ্য অজ্ঞেয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কান্নাকাটি করা হয় এক রকম mania না হয় weakness of heart ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বিনয়ের মুখ সহসা যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে স্বাভাবিক [illegible]-গর্ব্বিত ভাবে বলিল, "তা হতে পারে আপনার কাছে weakness of heart এর মধ্যে বিচিত্রতা কিছুই নেই। কারণ যে ভগবানের কোন Ideaই আপনার নেই তার সম্বন্ধে ওর বেশী ভাবতেও আপনি পারেন না। জগতের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্য সকলেরই ঐ রকম একটা কান্নাকাটির mania ছিল, কি বলেন?"

নরেন বলিল, "তা—কারও কারও এক আধটু ছিল বৈ কি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গিয়েছেন তা থেকে আমার মনে হয়, আমাদের আদর্শটা একটু বদলাতে হবে। আমাদের এখন সে দিন এসেছে, যখন মানুষ সব ভাবুকতা কবিত্ব ছেড়ে দিয়ে কাজের দিকে লাগে। এসময় কেবল—'work—work'! আপনি যদি ভাবুকতা জিনিষটা ছেড়ে দিতেন বিনয় বাবু! তবে বেশ উন্নতি করতে পারতেন।"

বিনয় বলিল, "হাঁ স্বামিজী বলে গিয়েছেন, একথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁর ভাবের একটা পূর্ণধারা আমরা ধরতে পারি না, তাই পল্লবগ্রাহীর দল এক আধটা কথা কোন জায়গা থেকে যোগাড় করে' যে ব্যাখ্যা বা সমালোচনা প্রচার করে, তাতে তাঁর অমর বাণীর অবমাননাই করে। আমি তাঁরই কথা বেদ-বাক্যের মত বিশ্বাস করি, যিনি নিজের জীবনে আদর্শ দেখাতে পারেন। 'হাজার হাজার লম্বা কথার চেয়ে একটু কাজের দাম অনেক বেশী।' আরও দেখুন ....।" কথাটা শেষ না হইতেই কিশোরীমোহন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি একটু আগেই আসিয়াছিলেন কিন্তু বাহির

হইতে তাহাদের তর্ক বিতর্কের কিছু অংশ কানে যাওয়ায় একটু অপেক্ষা করিয়া তাহাদের স্বাধীন মতামতের কিছু শুনিয়াছিলেন। এখন সহসা ভিতরে আসায় তাহারা যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

১। চিন্তামণি (নাটক —শ্রীচণ্ডিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অস্মদ্দেশীয় বর্তমান কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার প্রতি সমাজের পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ লোক চক্ষে ধারণ করা। বধূ নির্য্যাতনের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষের বলিদানে যে তুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন সেই তুলিকারই পুনর্ব্যবহার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত বর্তমান সমাজে লম্পট সাধু, শাইলক জাতীয় মহাজন, কাবলীওয়ালা প্রভৃতি পরভৃতদের স্থান যথার্থরূপে নির্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে। এই সকল চিত্র পুনঃপুন লোক সমক্ষে ধারণ করিলে সমাজের চক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ—শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র লেখক আসামী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রকাশক ব্রহ্মচারী শ্রীশ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, উজানবাজার গুবাহাটী—মূল্য চারি আনা।

৩। Lectures of Swami Abhedananda at Jamshedpur; জামসেদপুরের বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজের সুবিখ্যাত ভারতীয় বক্তৃতাবলীর মধ্যে ইহাই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ। মূল্য বার আনা মাত্র।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। আগামী ১৪ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর, রবিবার মুখ্যচান্দ্র মার্গ, গৌণ পৌষ, কৃষ্ণা ৭মী তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরমারাধ্যা জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সপ্ততি বর্ষ আবির্ভাবোপলক্ষে বেলুড় মঠে এবং কলিকাতার বাগবাজার পল্লীস্থ শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর বাটীতে (১ নং মুখার্জ্জি লেনে) বিশেষ ভজন-পূজাদির অনুষ্ঠান হইবে। পুরুষ-ভক্তগণ ঐ দিবস বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়া এবং স্ত্রীভক্তেরা বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর বাটীতে আগমন পূর্ব্বক সর্বাঙ্গ পূজা দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণে ধন্য হইবেন।

২। বরাহনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমের ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত কার্য্য বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আশ্রমে বঙ্গদেশীয় নানা স্থানের ১৭টী বালক প্রতিপালিত হইতেছে। বালকগণ যাহাতে সাধারণ লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বধর্ম্মে আস্থাবান, স্বাবলম্বী, কর্ম্মঠ ও চরিত্রবান হয় এবং ভবিষ্যতে সৎপথে থাকিয়া জীবিকার্জ্জনে ও সমাজের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়, সেইভাবে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও গঠিত করা হয়। ইহাই কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে বালকগণকে চরকায় সূতাকাটা, বেতের চেয়ার বোনা ও ছোট ছোট জিনিষ প্রস্তুত করা এবং তাঁত বোনা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্রাকারে দাতব্য চিকিৎসালয়, পথ্যাদির বিতরণ প্রভৃতিও হইয়া থাকে। এই চারি বর্ষে জমা ৭৯১৯।১০ টাকা, খরচ ৬৫৬৯৮০ টাকা। মজুত ১৩১৩্ টাকা।

৩। মাদ্রাজে মিশনের সেবাকার্য্য:—সম্প্রতি ভিজিগাগওনে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে সাইক্লোনে বহুগ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে শুনিয়া মিশন

তথায় তিনি জন সেবক প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদ সে দেশের অবস্থা শোচনীয়। শীঘ্রই বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

৪। আমাদের নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমাজের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বোধানন্দজি মহারাজ প্রায় ... বৎসর পরে, লণ্ডন হইয়া, বিগত ১৯ই ডিসেম্বর বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেণ্টাক্রুজ কেন্দ্রে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দজি মহারাজ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি ১৯০৬ সালের ১৫ই এপ্রিল নিউইয়র্ক যাত্রা করেন।

৫। অতি দুঃখের সহিত আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ বেলা ৯টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথির লেখক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-শিষ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করিয়া শ্রীপ্রভুর চরণ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন।

৬। বেলুড় মঠের পশ্চিম দিকে যে নূতন জমি মঠ হইতে লওয়া হইয়াছিল, তাহার ১ বিঘা জমি ই, আই রেলওয়ে কোম্পানী অপরাপর জমির সহিত গুদাম ঘর এবং ট্রেণ এর সাইডিং এর জন্য গ্রহণ করিতেছেন। ফলে বেলুড় গ্রাম ত এক প্রকার উঠিয়া যাইবেই এবং মঠেরও নিস্তব্ধতা এবং শান্তিভঙ্গের যথেষ্ট কারণ হইবার শঙ্কা আছে। এই কথা বিবৃত করিয়া গবর্ণরের নিকট মিশনের কর্ত্তৃপক্ষেরা এক আবেদন পত্র পাঠাইয়াছেন।